শিখা সমগ্র

সংকলন ও সম্পাদনা

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

শিখা সমগ্র

১৯২৭-১৯৩১

সংকলন ও সম্পাদনা
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

শিখা সমগ্র (১৯২৭-১৯৩১)
প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৪১০/জুন ২০০৩
বাএ ৪৩৭৬
[২০০২-২০০৩ গসফো : সংকলন ৬]

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০ কপি

পাণ্ডুলিপি
সংকলন উপবিভাগ

প্রকাশক
মুহম্মদ সিরাজ উদ্দীন
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
গবেষণা, সংকলন ও ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
মোঃ হামিদুর রহমান
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
আনওয়ার ফারুক

মূল্য
দুই শত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

SHIKHA SAMAGRA (1927-1931) : Compiled & edited by Mustafa Nurul Islam, Published by Muhammad Seraj Uddin, Director (Incharge), Research, Compilation and Folklore Division, Bangla Academy, Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2003. Price : Taka 250.00 only.

ISBN 984-07-4385-6

www.pathagar.com

নিবেদন

প্রসঙ্গত জানাই যে, দীর্ঘকাল পূর্বে বার্ষিকী 'শিখা'র সব ক'টি সংখ্যার সন্ধান পেয়েছিলাম সিলেটের কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ গ্রন্থাগারে। গ্রন্থাগারের প্রধান জনাব মুহম্মদ নূরুল হকের (প্রয়াত) কল্যাণে সংখ্যা পাঁচটি প্রতিলিপি করে নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আজকের অবকাশে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সমগ্র পাণ্ডুলিপিটি মুদ্রণোপযোগী করে প্রস্তুতির সতর্ক, আয়াসসাধ্য দায়িত্ব বহন করেছেন আমার অর্ধাঙ্গিনী ইরা ইসলাম। এবং শেষাবধি মোবারক হোসেন আর সৌভিক রেজার নিরন্তর তাগিদ, তাদের সদা সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত কাজটির সমাপ্তি আরো যে কতো বিলম্বিত হত জানি না। যুগপৎ উল্লেখ করব সেলিনা হোসেনের উদ্যোগ ব্যবস্থাপনার কথা। এরা আমার প্রাক্তন ছাত্র। অতঃপর আরেক জন, তিনি বন্ধুবর অধ্যাপক মনসুর মুসা। স্নেহভাজন প্রিয়জনের সাথে ত আনুষ্ঠানিকতার সম্পর্ক নাই ; —এইক্ষণে 'শিখা' সংকলনটি উপস্থাপনা উপলক্ষে কাছের মানুষ এদের সবার কথা ভাবতে, বলতে ভালো লাগছে।

আকাশ প্রদীপ
ইন্দিরা রোড, ঢাকা
১৪ জুন, ২০০৩

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ-কথা

আমাদের সাময়িকপত্র চর্চার ইতিহাস বিষয়ে আগ্রহী উৎসুক জন অবশ্য অবগত—একদা প্রকাশিত বার্ষিক 'শিখা' সমকালে সেই অঙ্গনে কেমন উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর ছিল। তার পর সাত দশকাধিক কাল (১৯২৭-১৯৩১ থেকে) অতিক্রান্ত, এবং সাময়িকপত্রটিও ইতোমধ্যে প্রায় একেবারেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে এসেছে। তবে বলবার যে, আপন ইতিহাস-ধারাবাহিকতার স্বার্থেই পিতৃ প্রজন্মের উদ্যোগী কৃতী পুরুষ তাঁদের কর্মকাণ্ডের সন্ধান উদ্ধারের নিতান্ত প্রয়োজন। বিষম বৈরী অমন এক দুঃসময়ে চরম রক্ষণশীল সমাজপ্রভুদের নিষেধের, আর ধর্মের খোলসে অন্ধ গোঁড়ামির মুকাবিলায় 'মুক্তবুদ্ধি' আদর্শ-প্রাণিত তাঁরা প্রতিবাদের লড়াইতে নেমেছিলেন। কিয়দংশে তাঁদের সেই সব কৃতি-কীর্তির স্বাক্ষর বহন করছে ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা'।

এইখানে আরেকটি প্রয়োজনের উল্লেখ করতে চাই। জিজ্ঞাসা, আজকের বর্তমানেও কী আমাদের সমাজ জীবনের বিশেষ কতিপয় ক্ষেত্রে 'ফতোয়া-নিষেধে'র এবং 'গোঁড়ামি তাণ্ডবে'র দাপটে আমরা পীড়িত হচ্ছি না? জবাব মোটে ইতিবাচক নয়। অতএব এই প্রেক্ষিতে পুনরায় বলব যে, পূর্ব প্রজন্মের 'শিখা' কর্মকাণ্ডের সাথে নবীন প্রজন্মের পরিচিতি এবং সম্পৃক্ততা অতীব কাঙ্ক্ষিত বিবেচনা করছি। আর প্রধানত এ উদ্দেশ্যেই বর্তমান 'শিখা সমগ্র' সংকলনটি প্রস্তুত করা গেছে।

অতঃপর উপরোক্ত প্রস্তুতির কর্মপ্রসঙ্গে সম্পর্কিত তথ্যসমূহ বিবৃত করা যাচ্ছে। যথা—ক. মুদ্রিত মূল text-এ বেশ কিছু সংখ্যক মুদ্রণ প্রমাদ রয়েছে। বর্তমান সংস্করণে সেইগুলি যথাসম্ভব শুদ্ধ করার প্রয়াস পাওয়া গেছে ; খ. মূল সংস্করণের সূচীপত্রে এবং ভিতরের text-এ মুদ্রিত প্রবন্ধ শিরোনামে এবং লেখকের নামের ক্ষেত্রে কমবেশি গরমিল লক্ষিত হয়। বর্তমান সংকলনে যথাপ্রয়োজন সঙ্গতি সাধনের চেষ্টা করা গেছে। অবশ্য পত্রিকার আদি make up (যতটা উদ্ধার করা গেছে), প্রচ্ছদ, টাইটেল পৃষ্ঠা ইত্যাদি সমেত, প্রায় তেমনই রক্ষিত হয়েছে ; গ. কেন 'শিখা'র প্রকাশনা, কেমন দেশ-কাল-পরিবেশ পটভূমিতে সেই প্রকাশনা, উদ্যোক্তা কারা ছিলেন ; পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহের বিষয় বৈচিত্র্য, বিষয় গুরুত্ব এবং ঘোষিত সামাজিক দায়বদ্ধতা ; ঘ. তখনকার কালে সমমনা আর প্রতিকূল বিরোধী পক্ষের পত্র-পত্রিকা কী কী ছিল ইত্যাদি—এই সব বিষয় নিয়ে 'শিখা সমগ্র' সংকলনটির 'মুখবন্ধে' কিয়দংশে আলোকপাত করা গেছে ; অতঃপর পাঠকের জন্য অনুসরণের সুবিধার্থে, ঘ. 'শিখা'য় প্রকাশিত প্রবন্ধ সমূহের বিষয়-ভিত্তিক বিভাজনের একটি তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ('তালিকাটি সংকলনের শেষাংশে সংযোজিত।)

'শিখা'র আলোকে বেগম রোকেয়া-কাজী নজরুল-কাজী আবদুল ওদুদ-আবুল হুসেন গোষ্ঠীর সেই সময়কে অবলোকন করে বলতে চাই যে, আমাদের বাসনা এই প্রকারের। আমার দিক থেকে বিনীত দাবি—এই লক্ষ্য সামনে রেখেই শিখা-সমগ্রের জন্য যথাসাধ্য সংস্কার পরিমার্জনা, এবং প্রয়োজন মোতাবেক সম্পাদনার কাজটি করবার প্রয়াস পেয়েছি।

মু.নূ.ই

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

বিগত শতাব্দীতে বিশের দশকের মাঝামাঝি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল বার্ষিক সাময়িকপত্র 'শিখা'। পত্রিকাটি স্বল্পায়ু ; পাঠক–প্রচার সংখ্যা তেমন যে ব্যাপক ছিল তাও নয় ; অংক গণনার হিসেবে বরং কিছুটা সীমিতই ছিল। পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়বস্তুর সাথে সমমনা যাঁরা, আলোচিত ঐ সমুদয় বিষয়ে আগ্রহী যাঁরা, সাধারণতঃ তারাই ছিলেন পাঠকগোষ্ঠী। বিশেষ আদর্শ প্রচারের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে 'শিখা'র প্রকাশনা। অতএব সেই মতাদর্শের ঘোরতর বিরোধী যাঁরা, বিরোধিতার স্বার্থেই তাঁদেরও কেউ কেউ পত্রিকাটি পাঠ করতেন। তবে মোদ্দা কথাটা যে, খেয়ালে রাখতে হবে—পঁচাত্তর বৎসর পূর্বেকার ঐ প্রকাশনা) পত্রিকা–পাঠক সম্প্রদায় তখন তেমন গড়ে ওঠেনি। তাও আবার মফস্বল শহর থেকে আঙ্গুলে গোনা কতিপয় তরুণের উদ্যোগে, এবং তদর্থে মোটে Popular চরিত্রের নয়—এই সবটা নিয়ে 'শিখা'র যাত্রাশুরু, বিচরণ। এবং নানান সব সীমাবদ্ধতা, তৎসহ চরম বাধা বিঘ্নের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও লক্ষ্য করবার যে, বিষয়গুণেই 'শিখা' সমকালে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। 'বিষয়গুর্ণ' প্রসঙ্গে বিশেষিত এই কথাটা এখন যোগ করতে চাই—অনন্যপ্রায় এক ব্যতিক্রমী চরিত্রের সাময়িকপত্র 'শিখা'। অতঃপর আরো বলব যে, আজকের বর্তমানের প্রেক্ষিতেও অতীতের সময়কার ঐ 'শিখা' নামের পত্রিকাটি কেমনতর ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

অবশ্য উক্ত প্রকারের সিদ্ধান্তসূচক বক্তব্য যথাপ্রয়োজন তথ্যসমর্থনের অপেক্ষা রাখে। আর নিশ্চয় করেই তা যুক্তি–পরম্পরার ধারাবাকিতায় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ–নির্ভর। জিজ্ঞাসা হতে পারে—দীর্ঘ কালব্যবধানে এই নতুন সহস্রাব্দের ভুবনে যখন আমাদের বসবাস, কী প্রয়োজন ধূসর হয়ে যাওয়া অতীত–উদ্ধারে, অতীত–চর্চায়? কেবলি কী নস্টালজিয়ার টানে পেছন ফিরে তাকানো, এবং পূর্ব প্রজন্মের উজ্জ্বল কতিপয়ের কর্ম–কৃতির সন্ধান নেয়া? কিংবা বড়োজোর বার্ষিকী সাময়িকপত্র 'শিখা' নিয়ে খানিক একাডেমিক আলোচনা। জবাবের প্রয়াসে এখানে বলবার যে, অবশ্য স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে নয়, সামগ্রিকতায় তবে 'শিখা' প্রসঙ্গটি অবলোকনের বাসনা।

সূচনাতে এই ধরনের গোটা কতক কথার মুখোমুখি হই—যেমন কিনা : অতীতের সেই সময়, ব্যতিক্রমী চরিত্রের সাময়িকপত্র, ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য, পূর্ব প্রজন্মের তাঁদের কৃতি ইত্যাদি সব। প্রস্তাব যে, সচেতন সৎ পাঠক অবশ্য (ইতোপূর্বে যেমনটি বলা গেছে) দেশ–কাল–সমাজ–মানুষের পটভূমিতে 'শিখা' কর্মকাণ্ডটি অনুধাবনের প্রয়াস পাবেন। আর আদপে বর্তমানের দাবিতেই ত' শেকড়ের সন্ধানে উদ্যোগী হতে হয়। নিবেদন যে, কিয়দংশে হলেও সেই প্রয়োজন মেটাবার লক্ষ্যে বর্তমান 'শিখা সমগ্র' সংকলনটি প্রস্তুত করে দেয়া গেল।

জাগতিক সংঘটনের সৃজিত কর্ম–ফসলের পশ্চাতে অবশ্য কার্যকারণ হেতু থেকে থাকে, নানাবিধ দ্বন্দ্ব–সংঘাত–সমন্বয় কাজ করে থাকে, এবং সবটাই পটভূমি–সঞ্জাত। আর যখন

www.pathagar.com

বা বিশেষ কোনো কোনো অর্জন ইতিহাস–গুরুত্বে চিহ্নিত, দায়িত্ব বর্তায় যে, সম্পর্কিত তাৎপর্যের সন্ধান তখন নিতে হয়।

অভিহিত করা গেছে 'শিখা কর্মকাণ্ড'। অতএব নিশ্চয়ই পূর্ববর্ণিত লক্ষণ–বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখতে হবে। আর তাই জন্যে বিশেষ করেই নির্দেশিত করবার যে, অকস্মাৎ কিংবা আপনা থেকেই নয় অমনতর চরিত্র–বৈশিষ্ট্যের এই সাময়িক পত্র 'শিখা'র প্রকাশনা।

প্রসঙ্গত এখানে আমাদের কমবেশি জানা অভিজ্ঞতার কথা আবারো বলে নেয়া যাক। কেউ কেউ সখের বশে পত্রিকা বার করে থাকেন ; কারুর কারুকে বা পত্রিকা–নেশাতে পেয়ে বসে ; আবার কখনো সখনো পত্রিকার জন্যেই পত্রিকা ; কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক রুটিন কর্মের বাধ্যতামূলক দায় মেটানো। এবং অবশ্য এই সমস্ত কিছু ছাড়িয়ে গিয়ে এমন রয়েছে—মানব কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বিশেষ আদর্শ/মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্র–পত্রিকার প্রকাশনা।

ইতিহাসের ছাত্র অবগত, আলোচ্য 'শিখা' সাময়িকপত্রটি শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত।

পূর্ব কথার জের টেনে এখন তবে সন্ধান—আবারো জিজ্ঞাসা, কেন 'শিখা'। বিশেষ এমনতর নামকরণই বা কেন? প্রকাশনার মূলে কী ছিল কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য আদর্শ প্রচারের তাগিদ–প্রেরণা? পত্রিকা–প্রকাশনা কর্মকাণ্ডে কারা ছিলেন উদ্যোক্তা কর্মী, কোন দেশ–কাল পটভূমিতে এই উদ্যোগ? সমর্থনে, বিরোধিতায় ছিলেন কারা? মনে করি যে, ইত্যাকার নানাবিধ অনুসন্ধিৎসার আমরা সম্মুখীন হব। এই ধরনের প্রশ্ন অবশ্য নানাবিধ আরো হতে পারে। সন্ধানে আমরা নির্দিষ্ট তেমন এক এক করে না হলেও মোটামুটিভাবে এবং গোটাগুটিভাবে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস পাব।

এই কথাটা গোড়াতেই নিবেদন করে রাখা যাক যে, আর যেমন দশটা পত্র–পত্রিকা, তদ্রূপ নয় কিন্তু 'শিখা'র প্রকাশনা। সেই সময় ধর্মের দোহাই পেড়ে অন্ধ মৌলবাদের আছর–আগ্রাসনে তখন পঙ্গু স্থবির বাঙালী মুসলমানের সমাজ জীবন। বাস্তবে সর্বার্থেই বন্দী সমাজের মানুষেরা। প্রতিবাদে প্রতিকারে 'একাট্টা' মিলেছিলেন কতিপয় তাঁরা। প্রধানতই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের তরুণ শিক্ষক ছাত্র। উদ্দেশ্য—আমরা প্রতিষ্ঠান গড়ব ; সংগঠনের জোরে আমরা আগ্রাসী অন্ধকারের অবসান ঘটিয়ে আলোকের অভ্যুদয়ের নিশানায় মুক্ত জ্ঞানের চর্চা করব। দেশময় ছড়িয়ে দেব মুক্ত বুদ্ধির সেই আলোক বর্তিকা। অতএব তাই থেকে সহজ শব্দের এ নামকরণ 'শিখা'।

এতদসহ আরো লক্ষ্য করবার যে, নামকরণটা কিন্তু বাংলায়। দীর্ঘকাল ধরেই বাঙালী মুসলমানের উদ্যোগে যে সকল সাময়িক পত্র পত্রিকার (দৈনিক, সাপ্তাহিকীরও) প্রকাশনা, নামকরণের মুখ্য প্রবণতা ছিল আরবী ফারসীতে, এবং প্রায়শঃ ধর্মীয় ব্যঞ্জনাযুক্ত। (যদিচ আদিতেই প্রথম দুটি সাপ্তাহিকীরই নাম ছিল তৎসম শব্দযুক্ত ; যত্রাক্রমে ১৮৩১–এর 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' এবং ১৮৪৭–এর 'জগদুদ্দীকে ভাস্কর'।) যাই হোক—পরের দিকে ১৮৭৭–এ বেরিয়েছিল 'মহাম্মদি আখবার', ১৮৮৪তে 'আখবারে–এমনামীয়।' আর সেই থেকে 'শিখা'র কালাবধি 'ইসলাম', 'আহমদী', 'হাফেজ', 'নুর অল ইমান', 'আহলে হাদিস', 'রওশন হেদায়েৎ', 'শরিয়তে এসলাম', 'হানাফী', 'তবলীগ', 'মোহম্মদী' ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন কী

www.pathagar.com

'সওগাত' পর্যন্ত। পরের কালেও তেমনি 'আজাদ' থেকে 'ইত্তেহাদ' 'ইনসাফ', 'ইত্তেফাক', 'পয়গাম' এই ধরনের আরো। তালিকা দীর্ঘতর করবার প্রয়োজন দেখি না। এই প্রকারের main stream-এ ব্যতিক্রমী উদাহরণের এক সময়কার 'সুধাকর' 'মিহির' 'বাসনা', এবং নজরুল সম্পৃক্ততায় 'নবযুগ', 'লাঙ্গল', 'গণবাণী' ; আর অবশ্য করেই অতঃপর ঢাকার মুসলিম সহিত্য সমাজের 'শিখা'।

বলা বাহুল্য, নামকরণের ওপরেও নিশ্চয় প্রাসঙ্গিক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

আরেকটা কথা। 'সাময়িক পত্র' বলতে পাঠক আমাদের সাধারণতঃ যে ধারণা, আলোচ্য, 'শিখা' কিন্তু কিছুটা তার বাইরে। যেমন কিনা 'প্রবাসী' 'ভারতবর্ষ' 'চতুরঙ্গ' কী 'সওগাত' 'মোহাম্মদী' ইত্যাদি—ষোলো আনা অনুরূপ বৈশিষ্ট্যে 'শিখা' তেমনতর নয়। অনুসন্ধিৎসু, সচেতন পাঠকের জানাই ত রয়েছে, আদপে বার্ষিকীটি ছিল প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র—মূলে ঢাকাস্থ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ', এবং এই সমাজের আদর্শ, দীক্ষামন্ত্র ; বৎসরভর তাঁদের কর্মকাণ্ডসমূহের ধারক, প্রচারক ঐ 'শিখা'। অর্থাৎ কিনা 'একটা নতুন কিছু করো' এই মতো হুজুগে তাড়নায় নয়, সম্পূর্ণতঃ প্রতিষ্ঠান সংগঠনের কথাই ছিল্য মুখ্য।

তাহলে প্রথমে আসছে প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা, কর্মকাণ্ড। অতঃপর তাই থেকে সাময়িক পত্রের প্রকাশনা 'শিখা'। সন ১৯২৬, বৎসরের গোড়ার দিকে ঢাকায় সংগঠিত হয়েছিল প্রতিষ্ঠান 'মুসলিম সাহিত্যে সমাজ'। পরের বৎসর ১৯২৭-এর এপ্রিলে (১৩৩৩ চৈত্রে) প্রকাশিত হয় প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র বার্ষিকী সাময়িকপত্র 'শিখা'।

উদ্যোক্তাদের অন্যতম প্রমুখ পুরুষ কাজী আবদুল ওদুদ জানাচ্ছেন, '১৩৩২ সালে-১৯২৬ খৃস্টাব্দের সূচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের পরিমণ্ডলে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নামে একটি সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, তার মূল মন্ত্র ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি'। কয়েক জন মুসলমান অধ্যাপকের উপর ন্যস্ত হয়েছিল এর পরিচালনার ভার। 'শাশ্বত বঙ্গে'র লেখক তাঁদের অন্যতম। বুদ্ধির মুক্তি অর্থাৎ বিচার বুদ্ধিকে অন্ধসংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মুক্তি দান। বাংলার মুসলমান সমাজে (হয়ত বা ভারতের মুলসমান সমাজে) এ ছিল এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। কিন্তু সেদিনে বিস্ময়কর হয়েছিল বাংলার শিক্ষিত মুসলিম তরুণের উপরে এর প্রভাব—একটি জিজ্ঞাসু ও সহৃদয়-গোষ্ঠীর সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছিল এর দ্বারা। দৃশ্যত এর প্রেরণা এসেছিল মুস্তাফা কামালের উদ্যম থেকে...।' 'নিবেদন', শাশ্বত বঙ্গ, ১৩৫৮। এই সাথে কাজী ওদুদ আরো যোগ করেছেন, 'বুদ্ধির মুক্তি' 'Emancipation of the intellect' এই মন্ত্র তাঁরা পেয়েছিলেন বহু জায়গা থেকে—কামাল আতাতুর্কের কাছ থেকে, রামমোহন রবীন্দ্রনাথ ও জাঁ-ক্রিস্তভের লেখক রোমা রোলাঁ্যার কাছ থেকে, পারসিক কবি সাদীর কাছ থেকে, আর হজরত মোহাম্মদের কাছ থেকে।'—'বাংলার জাগরণ' (১৩৬৩), পৃ. ১৯৪। বিবেচনা করি যে, অতঃপর আমরা সহজেই বুঝে নেব, তাঁদের উদ্দিষ্ট কর্মটা কী ছিল, প্রেরণা কী ছিল, উৎসমূলের ঠিকানা কোথায়। আর বাস্তবতার পটভূমিতে দেশ-কাল? প্রশ্নটি অবশ্য ইতোপূর্বেও আভাসিত করা গেছে।

এক কথায় যদি জবাব মতো—বাংলার মুসলমানের অদৃষ্টে সেই সময় প্রকৃতই বেজায় দুঃসময়। আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক তাবৎ ক্ষেত্রে। চারদিক রুদ্ধ কারাগার-খোয়াড়ে শৃঙ্খলিত মানুষ নামের পালে পালে জীব বিশেষ। অনুভূতি বঞ্চিত, চেতনাহীন, চোখ বাঁধা কলুর বলদ তুল্য ঐ তাদের যতো কায়ক্লেশে কোনো প্রকারে কাটানো দিন রাত্রি।

www.pathagar.com

অন্ধ নিয়তিই ত মেপে রেখেছে আয়ুর মাপ। এবং এদিকে ওপরতলায় দখল–নেয়া, সেজে–বসা মাতব্বর সমাজ প্রভু, হুজুর–কেবলা তাঁদের ইশারা নির্দেশই প্রশ্নাতীত চূড়ান্ত। আর কোথায় যে লুঠ হয়ে গেছে 'আশরাফুল মখলুকাৎ' মানুষের অধিকার। বরং নিত্য দিনের জীবনে পদে পদেই সদা কেতাবের দোহাই, মোল্লাকীর আর ফতোয়ার হুমকি। 'কেন'—এই প্রকারের জিজ্ঞাসা সম্পূর্ণতঃ নিষিদ্ধ। তার দরুণ নিশ্চয় করেই গজবের আলামত নেমে আসবে। মধ্যযুগিয়তার অন্ধকারে পিছুটান, যুগপৎ কবন্ধ কুসংস্কার গ্রাসিত, ইতিহাস সাক্ষ্য, এবম্প্রকারের ছিল উপরি বর্ণিত দুঃসময়ের চেহারা।

উদাহরণ টেনে জেনে রাখছি যে, জাস্টিস সৈয়দ আমীর আলী তাঁর 'Spirit of Islam' গ্রন্থে যুক্তিনির্ভর স্বচ্ছ বিবেচনায় ইসলাম–অনুধাবনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। এতদ্দরুণ রক্ষণশীল ধর্মপ্রভুদের হাতে তিনি যারপরনাই লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। দ্বীনের এলাকা থেকে তাঁকে খারিজ করে দেয়া হয়েছিল। আরেক বিশেষ উদাহরণ বেগম রোকেয়া। 'অবরোধবাসিনী' মুসলমান নারীর মুক্তির নিশানায় জীবনভর তাঁর আপোষহীন কর্মকৃতি। মৌলবাদী জোটের ওরা রেহাই দেয়নি তাঁকে। আর নজরুল ইসলাম? প্রতিকূল কাল–বিবেচনায় মোটে বিস্মিত হই না, পূর্বোক্ত ঐ বিশের দশকে যখন তাঁকে কাফের, নমরুদ, ইবলিস, খোদোদ্রোহী ইত্যাদি অপবাদে গঞ্জনায় চরম ধিক্কৃত করা হয়েছিল। নজরুল–পাঠকের সহজ জানা যে, মানুষের মৌল অধিকারের দাবিতে তিনি সাম্যের গান গেয়েছিলেন ; সর্বহারার জয় ঘোষণা করেছিলেন ; সর্বাত্মক নারীমুক্তির ডাক দিয়েছিলেন, 'মাথার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেল নারী ভেঙে ফেল ও শিকল'। ফতোয়াবাজ মোল্লাকীর রায় ঘোষিত হয়েছিল—'খাঁটি ইসলামী আমলদারী থাকিলে এই ফেরাউন বা নমরুদকে শূলবিদ্ধ করা হইত বা উহার মুণ্ডপাত করা হইত নিশ্চয়।' —'ইসলাম দর্শন', ১৩২৯, কার্তিক। অতঃপর আর কী বর্ণনার অপেক্ষা রাখে সেই সময় কেমন ছিল গোঁড়ামির শিবিরের চন্ড–প্রকৃতি। মূলের প্রস্তাবনায় ফিরে যাই। বারংবার এই কথাটাই জেনে রাখবার যে, সমাজকে অন্ধত্ব, কুসংস্কার, বন্ধন–পীড়ন থেকে মুক্ত করবার ব্রত নিয়ে সংগঠিত হয়েছিল 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। বিবেচনায় রাখছি, তাও কিন্তু metropolitan city মহানগরী কলকাতায় নয়, বেশ দূরে চারিদিকে নদীবেষ্টিত মধ্য বাংলার এক জেলা শহর ঢাকায়।

প্রসঙ্গত খেয়ালে রাখতে হবে—এ কোন ঢাকা?—মসজিদের শহর ঢাকা, সর্দার শাসিত বায়ান্ন বাজার তেপ্পান্ন গলির মহল্লানির্ভর ঢাকা। শীর্ষে ঢাকার নবাব পরিবার। সবটা মিলিয়ে রক্ষণশীলতার দুর্ভেদ্য দুর্গ। মুক্ত উদার চিন্তার আধুনিকত্ব থেকে বহুতর ব্যবধানে সেই শহর ঢাকার অবস্থান। উপকণ্ঠ রমনা গ্রীন–এ সবে তখন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে, আর ঢাকা ইন্টার ; ওদিকটায় মূল শহরে সদরঘাটের কাছাকাছি জগন্নাথ কলেজ। সীমিত এবং যুগপৎ বৈরী এই পরিবেশে মুষ্টিমেয় তাঁরা কয়েক জনায় 'মুক্ত বুদ্ধি'র আহ্বান ঘোষণা করে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, সাময়িকপত্র বার করেছিলেন।

এইখানে জেনে রাখছি, বয়েসে তরুণ ঐ উদোক্তাদের প্রায় সবাই ঢাকার বাইরের থেকে আগত, এবং সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় শক্ত ধরনের মুরুব্বি তখন তেমন দু'চার জনও ছিলেন না।

বর্ণিত তাবৎ প্রকারের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁদের অভিযান। স্বভাবতই জিজ্ঞাস্য—জোরটা কোথায়? জবাব যে, সেইটে বিশ্বাসের গভীরে, commitment-এ।

www.pathagar.com

তেমন করে বলবার প্রয়োজন বোধ করি না যে, বিশেষ ঐ প্রতিষ্ঠান নিয়ে এবং বিশেষ ঐ সাময়িকপত্র নিয়ে আদর্শের ব্রতধারী অভিযাত্রী তাঁদের সড়ক কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না মোটে। বঙ্কিম সেই সড়ক বাঁকে বাঁকে খানা খন্দকে আকীর্ণ, এবং মাঝে মধ্যেই দুর্যোগ-কবলিত। Documentation ধরনের একটি চিত্র তুলে ধরেছেন সমকালীন অপর সহযাত্রী আবদুর রহমান খাঁ তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমার জীবন'-এ (ঢাকা, ১৯৬৪)। প্রাসঙ্গিক কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে। মনে করি যে, তা থেকে ইতিহাস জানা যাবে, এবং তৎসহ আরো যে, শেষাবধি কতটা গড়িয়েছিল সেই ইতিহাস। —'এই সময়ে ঢাকার উচ্চ শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে একটা জাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়। তাঁহাদের slogan ধ্বনি হইল 'বুদ্ধির মুক্তি'। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আবুল হুসাইন, কাজি মুতাহার হুসাইন এবং কাজি আব্দুল ওদুদ। তাঁহারা বলিতেন, 'মুসলিম সমাজে অনেক গলদ ঢুকিয়াছে, মিথ্যা হাদিসের দ্বারা ঐ সবের সমর্থন চলিতেছে; অনেক সময় লোকেরা নিজেদের মতলব সিদ্ধির জন্য হাদিস সৃষ্টি করিয়াছে; যে সমস্ত হাদিস বুদ্ধির দ্বারা সমর্থিত নহে তাহা মানিতে হইবে না; কুরআনের ব্যাখ্যা যাহাই হইয়া গিয়াছে তাহা ব্যতীত আর হইতে পারিবে না, ইহা ঠিক নহে; কাল ও অবস্থা ভেদে উহার নূতন ব্যাখ্যাও দিতে হইবে।' তাঁহারা এই মত প্রচারের জন্য 'শিখা' নামে একখানি পত্রিকা বাহির করেন।' (পৃ. ১৪১, ১৪২)।

আবদুর রহমান খাঁ অতঃপর তথ্য উপস্থাপিত করছেন, 'ইহাতে ঢাকার মুসলিম সমাজনেতারা তাঁহাদের প্রতি খুব ক্রুদ্ধ হন। তাঁহারা মনে করিলেন উহারা কাফির হইয়াছে। এক দিন তদানীন্তন সমাজনেতারা বলিয়াদীর জমিদার কাজিমুদ্দীন সিদ্দিকী সাহেবের বাড়ীতে এই যুবকদের আহ্বান করেন। শামসুল উলামা মৌলানা মুহম্মদ ইসহাক সাহেব ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। আবুল হুসাইন আরবী ভাষায় লিখিয়া দিলেন, 'আমানতু বিল্লাহি...।' আবদুল ওদুদ তাঁহার স্বরচিত হজরত মুহম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। মৌলানা ইসহাক সাহেব রায় দিলেন, ইহাদের কাফির বলা যায় না। ইহারা বাঁচিয়া গেলেন; নচেৎ কি হইত তাহা খোদাই জানেন।' সহজেই অনুমেয় কেমনতর প্রতিকূল পরিবেশে 'শিখা'র লালন, কর্মকাণ্ড এবং এগিয়ে যাওয়া।

এখন 'শিখা' প্রকাশনা এবং এতদ্‌বিষয়ক পরিচিতি-বিবরণ। প্রথম বর্ষ 'শিখা'র টাইটেল পৃষ্ঠায় উল্লেখিত রয়েছে—'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র মুখপত্র (বার্ষিকী) শিখা; সম্পাদক অধ্যাপক আবুল হুসেন এম.এ, বি-এল, চৈত্র-১৩৩৩; (সর্ব্বস্বত্ব 'সমাজে'র জন্য সংরক্ষিত); মূল্য আট আনা। ঠিকানা মুসলিম হল, ঢাকা। সম্পাদক আবুল হুসেন তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কমার্স বিভাগে অধ্যাপনা করেন এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের তিনি হাউজ টিউটর। প্রকাশনার দায়িত্বে আবদুল কাদির ইতোমধ্যে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে আই.এস.সি পাশ করেছেন। পত্রিকার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কৃতি-অভিযান ইত্যাদি বিষয়ে ইতোপূর্বে বেশ খানিকটা অবগত হওয়া গেছে। তৎকালে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত যাঁরা ছিলেন প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি তাঁরা জানিয়েছেন; পত্রিকার ভূমিকা, অবদানের ওপরে আলোকপাত করেছেন এবং বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'শিখা' অভিযানের মূল্যায়ন করেছেন। প্রসঙ্গত সন্ধান নিতে চাইছি, (ইতোপূর্বে যেমন আভাসিত) যাত্রা শুরুর লগ্নে উদ্যোক্তা তাঁদের কী ছিল বলবার কথা, কেন কী উদ্দেশ্যে 'শিখা'র প্রকাশনা? সরাসরি জবাব জানতে পাঠ করব

www.pathagar.com

পত্রিকার প্রথম বর্ষ সংখ্যার সূচনাতেই প্রকাশকের 'নিবেদন' অংশ—'শিখা'র প্রধান উদ্দেশ্য বর্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তাধারায় গতির পরিবর্তন সাধন। 'শিখা'র প্রথম সংখ্যায় আমরা যে প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশ করেছি তার প্রত্যেকটি সমাজের দারুণ অভাবের এক একটি দিক লক্ষ্য করে লিখিত হয়েছে।... সে জন্য হয়ত অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করতে হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি, সমাজের প্রকৃত সহৃদয় সুহৃদবর্গের কেহই সেই অপ্রিয় সত্য হজম করতে নারাজ হবেন না—কারণ নিতান্ত আত্মীয় যে সেই ত আঘাত দিতে পারে।'

উক্ত প্রথম সংখ্যায় সংকলিত রচনাসমূহ মাত্রই নয়, সর্বশেষ প্রকাশিত পঞ্চম সংখ্যা অবধি সব কটি সংখ্যাতেই বর্ণিত উদ্দেশ্য আদর্শ অর্জনের স্বার্থে যথাপ্রয়োজন কর্ম সাধন করা হয়েছিল। সন্ধিৎসু পাঠক অনুধাবন করবেন যে, প্রধানতই 'বুদ্ধির মুক্তি' প্রশ্নে, অবাধ জ্ঞানচর্চার প্রশ্নে কদাপি আপোষের আশ্রয় নেয়া হয় নি। এবং সহজেই উপলব্ধি জন্মায়, পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যায় প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষে motto স্বরূপ মুদ্রিত হত 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।'

জানান দেয়ার অপেক্ষা রাখে না যে, যদি কাল বৈরী, সমাজে নিয়ন্ত্রণ-শাসনের শীর্ষে গোঁড়া রক্ষণশীলতার মাতব্বর অপশক্তি জোটের অবস্থান, এবং সমাজ স্থবির। আর এদিকে এঁরা একে স্বল্পবয়েসী কতিপয় জন মাত্র। আর্থ পৃষ্ঠপোষকতা বলি, তেমন প্রভাব-বলয়ের আভিভাবকত্ব বলি সেই সবও নাই—এমত হাল যখন, কত দিন আয়ু হতে পারে ঐ 'শিখা' তুল্য সাময়িকপত্রের? তবু ত পত্রিকাটি পাঁচ বৎসর কাল ১৯২৭ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে এসেছিল।

পরিস্থিতি-পরিবেশ বিবেচনায় বিশেষ করেই সম্পাদকদের কর্মোদ্যমের, কৃতির প্রশংসা করতে হয়। জেনে রাখছি যে, সম্পাদনার ঐ দুঃসাহসিক দায়িত্বে ছিলেন—প্রথম বর্ষের অধ্যাপক আবুল হুসেনের পর যথাক্রমে (দ্বিতীয়, তৃতীয় বর্ষে) অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, (চতুর্থ বর্ষে) মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, বি.এ, বি.টি., এবং (পঞ্চম বর্ষে) আবুল ফজল, বি.এ।

অতঃপর, পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয় নিয়ে কিছু কথা। প্রথম সংখ্যার প্রথম লেখাটি ছিল কাজী নজরুলের কবিতা 'খোশ আমদেদ'। তাঁর আরো একটি কবিতা বেরিয়েছিল দ্বিতীয় সংখ্যায়—'নতুনের গান'। সম্পূর্ণতই গদ্য প্রবন্ধনির্ভর এই পত্রিকায় নজরুলের কবিতার প্রকাশ ; —অবশ্য মূল্যায়িত করব যে, 'শিখা'র সাথে মৌলবাদীদের ফতোয়া লাঞ্ছিত কাজী নজরুল ইসলামের সম্পৃক্ততা বিশেষ তাৎপর্য-সত্য বহন করে।

গণনায় দেখছি, কবিতা, সম্পাদকের কথা, বিবরণ, প্রকাশকের নিবেদন, সাহিত্য সমাজের অধিবেশনসমূহে ভাষণাদি ব্যতীত 'শিখা'র পাঁচটি সংখ্যায় মোটমাট ৬৩টির মতো নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। সংখ্যার কথাটা অবশ্য তেমন উল্লেখ্য নয়। মুখ্য হচ্ছে বিষয় গুরুত্ব, বিষয় বৈচিত্র্য। এইখানে নির্বাচিত কয়েকটি নিবন্ধের তালিকা প্রণয়ন করে দেয়া গেল। ধারণা করি যে, তালিকাটি থেকে 'শিখা' বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ অন্ততঃ কিছুটা আঁচ করে নেয়া যেতে পারে।

বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা...কাজী আবদুল ওদুদ (১ম বর্ষ)
বাঙালী মুসলমানের সামাজিক গলদ...আনোয়ারুল কাদির (১ম বর্ষ)

www.pathagar.com

মুসলিম জাগরণ... নাজিরউদ্দীন আহমদ (৪র্থ বর্ষ)
তরুণ আন্দোলনের গতি ... আবুল ফজল (৩য় বর্ষ)
মুসলিম নারীর কথা ... ডাক্তার শামসউদ্দীন আহমদ (৫ম বর্ষ)
বাঙলার জাগরণ ... কাজী আবদুল ওদুদ (২য় বর্ষ)
বাঙলায় পীর পূজা ... সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ (২য় বর্ষ)
বাঙলী মুসলমানের আর্থিক সমস্যা ... রকীবউদ্দীন আহমদ (১ম বর্ষ)
সমবায় আন্দোলনে মুসলমানের কর্তব্য ... কমরুদ্দীন আহমদ (২য় বর্ষ)
পাটের কথা ... আবদুল ওহাব (৫ম বর্ষ)
বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা...আবুল হুসেন (১ম বর্ষ)
সঙ্গীতচর্চায় মুসলমান ... কাজী মোতাহার হোসেন (১ম বর্ষ)
নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ ... আবদুস সালাম খাঁ (১ম বর্ষ)
মানব প্রগতি ও মুক্তবুদ্ধি ... নাজিরুল ইসলাম (৩য় বর্ষ)
নাস্তিকের ধর্ম ... কাজী মোতাহার হোসেন (৫ম বর্ষ)।

তালিকাটির ওপর পুনরায় দৃষ্টিপাত করব। এবং অনুধাবনের প্রয়াস পাব—পটভূমিতে সেই সময় আর সেই সমাজ। ইতিহাস যে, তাই থেকে ফসলের অর্জন, সেই নাম 'শিখা'। এবং ইতিহাস—মানবকল্যাণ, সত্যের সন্ধানে প্রতিবাদের অভিযান ; আর তাই থেকে অর্জন।

সমর্থনে এখানে 'শিখা' প্রথম বর্ষ সংখ্যা থেকে তিনটি উদ্ধৃতাংশ সংযোজিত করা যাচ্ছে।

ক. 'বুদ্ধির মুক্তি না হলে ধর্ম শিক্ষা হতে পারে না। ধর্মের আদেশ ও নিষেধ পালন করার জন্য বুদ্ধির দরকার। বুদ্ধির অভাবে আমাদের ভিতর প্রকৃত ধর্ম্মভাব লোপ পেয়েছে। এখন গোঁড়মিই আমাদের ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।'— 'বাঙালী মুসলমানের সামাজিক গলদ', আনোয়ারুল কাদির।

খ. 'মাতৃভাষাই ছেলেমেয়েরা সবচেয়ে সহজে আয়ত্ত করিতে পারে ; অতএব আরবী পার্শী না বুঝিয়া পড়িলেও পুণ্য সঞ্চয় হয়। এই কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া, এই সকল বিজাতীয় ভাষা ছাড়িয়া দিয়া যদি ছেলেমেয়েদিগকে এক মনে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা এই অল্প সময়েই...কর্ম্ম ধর্ম্ম নীতি জ্ঞান লাভ করিতে পারে।'—'শিক্ষা সমস্যা', মমতাজউদ্দীন আহমদ।

গ. 'ধর্ম্মের অনুশাসন অভিনয়ের বিরুদ্ধে থাকিতে পারে, কিন্তু সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য অভিনয় করা দরকার।'—নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ', আবদুস সালাম খাঁ।

'শিখা' গোষ্ঠীর তাঁরা জগদ্দল প্রতিম সমাজ—অচলায়তনের মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছিলেন।

স্মরণ করছি সেই সময়টায় নবীন তুরস্কের নেতা কামাল পাশা বাংলাদেশে শিক্ষিত মুসলিম মানসে কেমন বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। নজরুল ইসলাম কবিতা লিখছেন 'কামাল পাশা'—'ঐ ক্ষেপেছে পাগ্‌লি মায়ের দামাল ছেলে কামাল ভাই', প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর নাটক বেরিয়েছে 'কামাল পাশা', 'Young Turks'–এর প্রেরণা অনুসরণে ইতিহাসের

ছাত্র সা'দত আলি আখন্দ লিখছেন 'তরুণ মুসলিম'। এই রকমেরটা ছিল তখন পালে নতুন হাওয়া।

মিলিয়ে নেব অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদের বর্ণনার সাথে—তখনকার নবোদ্ভিন্ন মুসলমান শিক্ষিত প্রজন্ম, এঁদের মধ্যে প্রধানতই রয়েছেন তরুণ লেখক, শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী কেমন প্রাণিত হয়ে উঠছেন আতাতুর্কের প্রেরণা থেকে। Young Turks–এর তাঁরা যেমন লড়েছিলেন মধ্যযুগিয়তার, রক্ষণশীলতার, গোঁড়ামির মুকাবিলায়। আমাদের এই দেশে তেমনি দেখি কলকাতাকেন্দ্রিক 'সওগাত' গোষ্ঠী, এবং ঢাকাকেন্দ্রিক 'শিখা' গোষ্ঠী। তখনকার সময়টাকে বুঝে নিতে মোটামুটি একই মানস দৃষ্টি–ভঙ্গীর এবং উদার চরিত্রের আর কতিপয় পত্র–পত্রিকার উল্লেখ করতে হয়। যথা—কলকাতা থেকে বেরিয়েছিল 'খাদেম' (১৯২৬), 'হিন্দু–মুসলমান' (১৯২৬), 'গণবাণী' (১৯২৬), 'সাহিত্যিক' (১৯২৭), 'নওরোজ' (১৯২৭), 'মোয়াজ্জিন' (১৯২৮) ইত্যাদি। আর ঢাকা থেকে 'তরুণপত্র' (১৯২৫), 'অভিযান' (১৯২৬), 'জাগরণ' (১৯২৮), 'সঞ্চয়' (১৯২৮) ইত্যাদি।

প্রতিপক্ষ অবশ্য ছিল বেশ শক্তিশালী, আর প্রচণ্ড দাপটের। তাদের ছিল প্রধানতঃ 'মাসিক মোহাম্মদী', 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', আর সাথে 'মোসলেম দর্পণ' (১৯২৫), 'ইসলাম নূর' (১৯২৬), 'শরিয়তে এসলাম' (১৯২৬) ইত্যাদি সব।

এখন লক্ষ্য করা যাক—ঐ বিশের দশকেই যেমন 'ইসলাম দর্শন', 'মোসলেম দর্পণ', 'মোহাম্মদী' নজরুলের বিরুদ্ধে জেহাদে নেমেছিল, অনুরূপ তীব্রতায় জেহাদতুল্য আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল 'মোহাম্মদী' জোট কাজী আবদুল ওদুদ তথা 'শিখা' গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে।

তথাপি, সৎ মানুষের কল্যাণ স্বার্থে পক্ষ নিতেই হয়। অন্ধ শাস্ত্রবিধির কারাগার থেকে 'বুদ্ধির মুক্তি', 'Emancipation of the intellect', —তথা আলোক তীর্থে উত্তরণ। 'শিখা' সেই কালে মশাল হাতে পথের সন্ধান দিয়েছিল। বলা গেছে 'Young Turks' –এর সাথে সেতুবন্ধন প্রয়াসের কথা। আমাদের সেই পিতৃপুরুষ তাঁরা ছিলেন ঐ দুঃসময়ে 'তরুণ মুসলিম'। এবং কেন বিস্মৃত হব 'সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার' মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে একদা সংগঠিত হয়েছিল 'Young Bengal' আন্দোলন। অবশ্যই তাঁদেরও ছিল প্রতিবাদের আওয়াজ। পুনরায় জেনে রাখছি, প্রায় শত বর্ষ কাল–ব্যবধানে 'শিখা' গোষ্ঠীরও তেমনই।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

www.pathagar.com

বিষয়-ভিত্তিক সূচীপত্র

কবিতা

খোশ আমদেদ ... কাজী নজরুল ইসলাম.... ১ম বর্ষ, ১৯২৭
আবাহন ... মুনশী হাবিবুল্লা ... ১ম বর্ষ, ১৯২৭
নতুনের গান .... কাজী নজরুল ইসলাম .... ২য় বর্ষ, ১৯২৮

সাহিত্য, ভাষা

বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা... কাজী আবদুল ওদুদ... ১ম বর্ষ, ১৯২৭
ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগ ... আনোয়ারুল কাদির ... ২য় বর্ষ, ১৯২৮
মুসলিম সাহিত্য সমাজ... মোহিতলাল মজুমদার ... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
আরবী ভাষা ও কাব্য .... ফসীহ ... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
আরবী কাব্য ... মোহাম্মদ কাসেম... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা ... কাজী আবদুল ওদুদ ... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
Muslim Literary Conference : My Impression ...
K.C. Mookherjee ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
বর্ত্তমান বাংলার মহিলা ঔপন্যাসিক ... বরুণাকণা গুপ্তা ... ৪র্থ বর্ষ, ১৯৩০
সাহিত্যে শুচিতা ... সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ... ৪র্থ বর্ষ, ১৯৩০
রবীন্দ্রনাথ ও বৈরাগ্য বিনাস .... মোতাহের হোসেন চৌধুরী ... ৪র্থ বর্ষ, ১৯৩০

সঙ্গীত, নাটক, শিল্পকলা

বাংলার লোক-সঙ্গীত ... আবদুল কাদের ... ১ম বর্ষ ১৯২৭
সঙ্গীত চর্চ্চায় মুসলমান ... মোতাহার হোসেন ... ১ম বর্ষ ১৯২৭
নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ .... আবদুস সালাম খাঁ ....১ম বর্ষ ১৯২৭
মোগল যুগে চিত্র-চর্চা ... আবদুস সালাম ... ২য় বর্ষ, ১৯২৮
স্থাপত্য-চর্চায় মুসলমান ... আবদুল মঈদ চৌধুরী ... ২য় বর্ষ ১৯২৮
ময়মনসিংহের গীত ... মোসলেমউদ্দীন খাঁ ... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯

সমাজ, ধর্ম, জাগরণ

বাঙালী মুসলমানের সামাজিক গলদ... কাজী আনোয়ারুল কাদির ... ১ম বর্ষ, ১৯২৭
হজরত মুহম্মদের প্রতিভা ... শামসুল হুদা ... ১ম বর্ষ ১৯২৭
আমাদের নবজাগরণ ও শরিয়ত ... আবদুর রশীদ .... ১ম বর্ষ ১৯২৭
বাংলার জাগরণ ... কাজী আবদুল ওদুদ ... ২য় বর্ষ, ১৯২৮
বাংলার পীর পূজা ... সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ ... ২য় বর্ষ, ১৯২৮

www.pathagar.com

নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ .. ফজিলাতুন নেসা ... ২য় বর্ষ, ১৯২৮
দারার ধর্ম্ম-মত ... কাণিকারঞ্জন কানুনগো... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
ফিকাহ্‌র উদ্ভব ও পরিণতি ... মোখতার আহমদ সিদ্দিকী ... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
চলার কথা ... আকবর উদ্দীন .. ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
মানব প্রগতি ও মুক্তবুদ্ধি ... নাজিরুল ইসলাম ... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
কুসংস্কারের একটা দিক ... শামসুল হুদা .... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
ধর্ম ও সমাজ ... কাজী মোতাহার হোসেন .... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
তরুণ আন্দোলনের গতি ... আবুল ফজল ...৩য় বর্ষ, ১৯২৯
তরুণের দায়িত্ব ... ফাতেমা খানম ... ৪র্থ বর্ষ, ১৯৩০
ধর্ম ও শিক্ষা ... কাজী মোতাহার হোসেন ....৪র্থ বর্ষ, ১৯৩০
মুসলিম জাগরণ ... নাজিরউদ্দিন আহ্‌মদ ... ৪র্থ বর্ষ, ১৯৩০
নাস্তিকের ধর্ম্ম ... কাজী মোতাহার হোসেন ... ৫ম বর্ষ, ১৯৩১
মোহদ্দেস প্রসঙ্গ ... নূর আহ্‌মদ আবুজ্‌ জোহা... ৫ম বর্ষ, ১৯৩১
মুসলিম নারীর কথা ... শামসুদ্দীন আহমদ... ৫ম বর্ষ, ১৯৩১

শিক্ষা

শিক্ষা সমস্যা ... মমতাজউদ্দীন আহমদ... ১ম বর্ষ, ১৯২৭
বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা... আবুল হুসেন ... ১ম বর্ষ ১৯২৭
মোসলেম ভারতে শিক্ষাচর্চা ... আতাউর রহমান ... ২য় বর্ষ, ১৯২৮
ইউরোপে শিক্ষার আদর্শের ক্রমবিকাশ ... আবদুর রহমান খাঁ ... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯

অর্থনীতি, রাজনীতি

বাঙালী মুসলমানের আর্থিক সমস্যা ... রকীবউদ্দীন আহমদ ... ১মবর্ষ, ১৯২৭
মুসলমানের আর্থিক সমস্যা ... আনোয়ার হোসেন ... ১ম বর্ষ, ১৯২৭
সমবায় আন্দোলনে মুসলমানের কর্ত্তব্য... কমরুদ্দীন আহমদ ... ২য় বর্ষ, ১৯২৮
বাংলার লুপ্ত শিল্প ... রকীবউদ্দীন আহমদ...২য় বর্ষ, ১৯২৮
বৈদেশিক বাণিজ্য ও বাংলার মুসলমান... এ.কে. আহমদ খাঁ ...২য় বর্ষ, ১৯২৮
কোরানে মানবের স্থান ও অর্থনীতি ... কমরুদ্দীন আহমদ... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
আমাদের রাজনীতি ... আবুল হুসেন ... ৫ম বর্ষ, ১৯৩১
পাটের কথা ... আবদুল ওহাব ... ৫ম বর্ষ, ১৯৩১

ইতিহাস এবং অন্যান্য বিবিধ প্রসঙ্গ

মানব মনের ক্রমবিকাশ ... কাজী মোতাহার হোসেন ...২য় বর্ষ, ১৯২৮
আব্বাসীয় যুগ ... কাজী আকরম হোসেন ... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
ইউরোপীয় সভ্যতায় মুসলিম স্মৃতি ... আবদুর রশীদ ... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
দার্শনিক ইবনে রোশদ ... মমতাজউদ্দীন আহমদ ... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
ইসলাম ও শরীর চর্চা ... বিলায়েত আলি খাঁ ... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯

www.pathagar.com

স্যার সৈয়দ আহমদ ... আবুল হুসেন ... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে জগৎ ও জীবন ... উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ৪র্থ বর্ষ, ১৯৩০
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ... কামাল উদ্দীন .. ৪র্থ বর্ষ, ১৯৩০
গ্যেটে ... কাজী আবদুল ওদুদ ... ৪র্থ বর্ষ, ১৯৩০
বৃটিশ ভারতে মুসলমান আইন... আবুল হুসেন ... ৪র্থ বর্ষ, ১৯৩০
সভ্যতার উত্তরাধিকার ... কামালউদ্দীন ... ৫ম বর্ষ, ১৯৩১
ভারতের আদর্শ ... আলী নূর ... ৫ম বর্ষ, ১৯৩১
আল্-বেরুনী ... আবদুল ওদুদ ... ৫ম বর্ষ, ১৯৩১
ইউরোপে এখানে ওখানে কিছু দিন... আবদুল হাকিম ... ৫ম বর্ষ, ১৯৩১
হিন্দু-মুলসমানের কথা ... আবদুর রশীদ .. ৫ম বর্ষ, ১৯৩১
স্বাধীন ভারতের দাস... নাজির উদ্দীন আহমদ ... ৫ম বর্ষ, ১৯৩১
মিলন সৌধ ... মোসলেমউদ্দিন খাঁ ... ৫ম বর্ষ, ১৯৩১

অভিভাষণ, বিবরণী, পরিশিষ্ট ইত্যাদি

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ... এ. এফ. রহমান ... ১ম বর্ষ, ১৯২৭
সভাপতির অভিভাষণ ...তসদ্দুক আহমদ .. ১ম বর্ষ, ১৯২৭
বার্ষিক বিবরণী ... সম্পাদক (আবুল হুসেন) ... ১ম বর্ষ, ১৯২৭
পরিশিষ্ট (বার্ষিক সম্মিলনের বিবরণ) ... সম্পাদক ১ম বর্ষ, ১৯২৭
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ... মাহমুদ হাসান ... ২য় বর্ষ, ১৯২৮
সভাপতির অভিভাষণ...আবদুর রহমান খাঁ...২য় বর্ষ, ১৯২৮
দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্যবিবরণী ... সম্পাদক (কাজী মোতাহার হোসেন) ... ২য় বর্ষ, ১৯২৮
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ... মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ ... আবুল মোজাফফর আহমদ ... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী ... সম্পাদক (কাজী মোতাহার হোসেন) ... ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
পরিশিষ্ট (তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণী) ... সম্পাদক .. ৩য় বর্ষ, ১৯২৯
অভ্যর্থনা ... সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন ... ৪র্থ বর্ষ, ১৯৩০
অভিভাষণ ... নাসিরউদ্‌দীন আহমদ ... ৪র্থ বর্ষ, ১৯৩০
সম্পাদকের কথা ... আবদুর রশীদ ... ৪র্থ বর্ষ, ১৯৩০
অভ্যর্থনা ... আবদুর রব চৌধুরী ... ৫ম বর্ষ, ১৯৩১
অভিভাষণ ... হাকিম হাবিবুর রহমান ... ৫ম বর্ষ, ১৯৩১
পঞ্চম বার্ষিক বিবরণী ... সম্পাদক (আবুল ফজল) ... ৫ম বর্ষ, ১৯৩১

www.pathagar.com

‘মুসলিম সাহিত্য সমাজে’র মুখপত্র
(বার্ষিকী)

শিখা

প্রথম বর্ষ, ১৩৩৩ চৈত্র

www.pathagar.com

‘মুসলিম সাহিত্য সমাজে’র মুখপত্র
(বার্ষিকী)

শিখা

প্রথম বর্ষ, ১৩৩৩ চৈত্র
প্রথম সংস্করণ

সম্পাদক
অধ্যাপক আবুল হুসেন এম. এ., বি.এল.
চৈত্র ১৩৩৩

[সর্ব্বস্বত্ব ‘সমাজে’র জন্য সংরক্ষিত]

মূল্য : আট আনা

প্রকাশক
আবদুল কাদের
মুসলিম হল, ঢাকা।
(‘মুসলিম সাহিত্য সমাজে’র তরফ হইতে)

প্রাপ্তিস্থান
অধ্যাপক আবদুল আজিজ তালুকদার এম. এ.
মজিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা
ও
ঐ লাইব্রেরী, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা

ঢাকা, সাত রাওজা, ইসলামিয়া প্রেসে
মুন্সি আহমদ আলি দ্বারা মুদ্রিত

www.pathagar.com

প্রকাশকের নিবেদন

আমাদের সম্পাদক সাহেব তাঁর কার্যবিবরণীতে বলেছেন যে, এই 'সমাজে'র মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে 'চিন্তা-চর্চ্চা করা'। সত্যই পরিপুষ্ট চিন্তাই সাহিত্যের খোরাক জোগায়। আজ এক বৎসর চিন্তা-চর্চ্চার ফলে আমরা এই 'শিখা' প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। 'শিখা'র প্রধান উদ্দেশ্য বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের জীবন ও চিন্তা ধারার গতির পরিবর্ত্তন-সাধন। 'শিখা'র প্রথম সংখ্যায় আমরা যে প্রবন্ধগুলি সন্নিবেশিত করেছি তার প্রত্যেকটি সমাজের দারুণ অভাবের এক একটি দিক লক্ষ্য করে লিখিত হয়েছে। (সবগুলিই 'সাহিত্য সমাজে'র বার্ষিক সম্মিলনে পঠিত হয়েছিল।) সে জন্য হয়ত অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করতে হয়েছে। কিন্তু আমরা মনে করি, সমাজের প্রকৃত সহৃদয় সুহৃদবর্গের কেহই সেই অপ্রিয় সত্য হজম করতে নারাজ হবেন না—কারণ নিতান্ত আত্মীয় যে সেই ত আঘাত দিতে পারে। এই প্রবন্ধগুলি কাহারও কাহারও নিকট নীরস মনে হবে—বিশেষত যখন তাঁরা দেখবেন এ সংখ্যায় কোন হালকা গল্প নাই বা মিষ্টি কবিতা নাই। সে জন্য পাঠকবর্গের নিকট ত্রুটি স্বীকার করি, কেননা আমাদের দুঃস্থ সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা চিন্তা করলে আনন্দের হাসির পরিবর্ত্তে বেদনার অশ্রুতে জীবন ভরে উঠবে। আশা করি, সমাজের সারথিগণ আমাদের এই মনোভাবের প্রতি একটু দরদের দৃষ্টি দিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

আজ 'শিখা' নানা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে বের হয়েছে। নানা কারণে ইহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করা যায় নাই। আমরা কায়মনে প্রার্থনা করি ভবিষ্যতে 'সমাজে'র অধিকতর উদ্যোগী কর্ম্মী-সংসদ ইহাকে সর্ব্বতোভাবে সুন্দর ও শ্রীসম্পন্ন করে তুলবেন।

www.pathagar.com

প্রথম বৎসরের কর্মী সংসদ

মৌলভী এ. এফ. এম. আবদুল হক (মুসলিম হল)
মৌলভী এ. জেড. নূর আহমদ (ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ)
মৌলভী আনোয়ার হোসেন (ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ)
মৌলভী আবদুল কাদির (ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ)
অধ্যাপক আবুল হুসেন এম. এ., বি. এল. (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

www.pathagar.com

সূচিপত্র

খোশ আমদেদ (গান) কাজী নজরুল ইসলাম ৭
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ : এ. এফ. রহমান এম. এ. (অক্সফোর্ড) ৮
সভাপতির অভিভাষণ : খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ বি.এ., বি.টি ১২
আবাহন (কবিতা) : মুনশী হাবিবুল্লা ২১
বার্ষিক বিবরণী : সম্পাদক ২৮
বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা : অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এম.এ ৩৫
বাঙলার লোক-সঙ্গীত : আবদুল কাদের ৪৫
বাঙ্গালী মুসলমানের আর্থিক সমস্যা : রকীবউদ্দীন আহমদ এম.এ ৫৫
বাঙ্গালী মুসলমানের সামাজিক সনদ : অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদির এম.এ., বি.টি. বি.এস ৬৩
হজরত মুহম্মদের প্রতিভা : শামসুল হুদা ৭৫
সঙ্গীত চর্চ্চায় মুসলমান : অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এম.এ ৭৭
শিক্ষা-সমস্যা : অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ এম.এ. ৯১
আমাদের নবজাগরণ ও শরিয়ত : আবদুর রশীদ বি.এ., বি.টি ৯৮
নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ : আবদুস সালাম খাঁ, বি.এ ১০৪
বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা : আবুল হুসেন বি.এ., বি.টি ১১০
মুসলমানের আর্থিক সমস্যা : আনোয়ার হোসেন ১২১
পরিশিষ্ট ১২৬

www.pathagar.com

‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব’

‘খোশ আমদেদ’
(গান)
কাজী নজরুল ইসলাম

আসিলে কে গো অতিথি উড়ায়ে নিশান সোনালি।
ও চরণ ছুঁই কেমনে দুই হাতে মোর মাখা যে কালি॥
দখিনের হাল্‌কা হাওয়ায় আস্‌লে ভেসে সুদূর বরাতী।
শবে’রাত আজ উজালা গো আঙ্গিনায় জ্বল্‌ল দীপালি॥
তালিবন ঝুমকি বাজায়; গায় “মোবারক–বা’দ” কোয়েলা।
উলসি’ উপ্‌চে প’ল পলাশ অশোক ডালের ঐ ডালি॥
প্রাচীন ঐ বটের ঝুরির দোল্‌নাতে হায় দুলিছে শিশু।
ভাঙ্গা ঐ দেউল–চূড়ে উঠল বুঝি নৌ–চাঁদের ফালি॥
এল কি অলখ্‌–আকাশ বেয়ে তরুণ হারুণ–আল্‌–রশীদ।
এল কি আল্‌–বেরুনী হাফিজ খৈয়াম কায়েস গাজ্জালী॥
সানাইয়াঁ ভয়রোঁ বাজায়, নিদ–মহলায় জাগ্‌ল শাহ্‌জাদী।
কারুণের রূপার পুরে নূপুর–পায়ে আস্‌ল রূপ–ওয়ালী॥
খুশির এ বুলবুলিস্তানে মিলেছে ফর্‌হাদ ও শিরীঁ।
লাল এ লায়লি লোকে মজনুঁ হর্দম চালায় পেয়ালী॥
বাসি ফুল কুড়িয়ে মালা না–ই গাঁথিলি, রে ফুল–মালি!
নবীনের আসার পথে উজাড় ক’রে দে ফুল ডালি॥

www.pathagar.com

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

এ. এফ. রহমান এম. এ. (অক্সফোর্ড)

সমবেত সাহিত্যপ্রাণ সুধীমণ্ডলী,

অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আমি সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' একটা নূতন উদ্যম—আমাদের সমাজের নূতন জাগরণের একটা সামান্য চিহ্ন। আপনারা যে দয়া করে তাহার সফলতা কামনা করে এই সাহিত্য সমাজের উৎসাহ বর্ধন করবার জন্য এসেছেন, সেজন্য আমাদের সকলের আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সাহিত্য চর্চ্চার এই ক্ষীণ ধারাটুকু যাতে স্রোতে পরিণত হয়, সে জন্য এই বার্ষিক সম্মিলনের সৃষ্টি। আপনাদের ন্যায় সাহিত্যানুরাগীদের শুভদৃষ্টি আমাদের প্রতি থাকলেই আমাদের সব আশা সফল হবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির সাদর সম্ভাষণ জানাবার পর আর বিশেষ কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু যাঁরা আমাকে এই উচ্চ পদে অভিষিক্ত করেছেন তাঁরা ত ছাড়বেন না। তাই সংক্ষেপে দু'চারটি কথা নিবেদন করছি। আমি দেশের ও সমাজের সামান্য সেবক। আমি যা নিবেদন করছি তা কোন গভীর জ্ঞানের কথা নয়, তবে যে যৎসামান্য আমার অভিজ্ঞতা জন্মেছে তাই বলতে চাই।

শুনেছি পরাধীন জাতির (Subject Race-এর) কোন পলিটিক্স নাই। কথাটা সত্য না মিথ্যা তা আপনারাই বিচার করবেন। কিন্তু আমি দেখি আমাদের দেশে politics ছাড়া আর কিছুই যেন নাই, আর তাও যেন এক ধরনের। আমরা যেন কিছু একটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলবার জন্যই ব্যস্ত। কিছু গড়ে তুলবার জন্য যেন আমাদের উৎসাহই নাই। দূরবীন দিয়ে শাসনকর্ত্তাদের দেখতে দেখতে নিজেরা যে কি বা কি হয়ে যাচ্ছি তা ভাববার সময়ই হয় না। মুসনলমানদের কথা বলছি, তাঁরা যেন অতীতের স্মৃতির সৌরভেই মুগ্ধ, ঠিক যেন গোরস্থানে স্মৃতি স্বম্ভগুলো 'জেয়ারৎ' করে পুণ্যভাগী হয়েই তাঁরা নিশ্চিত হন। অবশ্য ঐতিহাসিকেরা বলবেন যে, অতীতই ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শক। আমরা যে ভবিষ্যতটার কথা ভাবতেই চেষ্টা করি না, যে জাতি এককালে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ছিল এবং সর্ব্বজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেছিল, আজ যেন সর্ব্বত্রই তার অধঃপতন। আমাদের মধ্যে অতীতের সে রকম কোন চর্চ্চাও নাই,—ভবিষ্যতেরও কোন আদর্শ নাই। আমাদের সামাজিক জীবন এত লক্ষ্যহীন বলেই আমরা সাহিত্য চর্চ্চায় এত উদাসীন। ইতিহাসে দেখা যায় যে কোন দেশ বা জাতি উন্নতি করেছে—পূর্ব্বে সাহিত্যই তার জীবনী শক্তি ফুটিয়ে তুলেছিল। সাহিত্য জীবনী শক্তির পরিচায়ক। বলবার মত কথা থাকলে ভাষার অভাব হয় না। আর বলবার মত কথা না থাকলেই সাহিত্যেরও সৃষ্টি হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস পাঠ করে পরীক্ষা পাশ করাই জীবনের উদ্দেশ্য নয়। ইতিহাস জ্ঞানের আকর। কিন্তু সেই জ্ঞান শুধু নিজে উপলব্ধি করা জ্ঞানীর মত কাজ নয়। জ্ঞান বা সত্য প্রচার করা, সমাজ, দেশ, পৃথিবী সত্যের আদর্শে গড়ে তোলা, সেই হলো মানুষের মত কাজ। আর সেখানেই সাহিত্যের আশ্রয় নিতে হবে।

www.pathagar.com

অতীতের সমুজ্জ্বল ছবি আঁকতে হলে, ভবিষ্যতের আদর্শ দেখিয়ে দিতে হলে বা সত্যের সৌন্দর্য বিকাশ করতে হলে সাহিত্যই একমাত্র উপায়। সত্যের মত সাহিত্যও সীমাবদ্ধ নয়। যেমন পৃথিবীর সাহিত্যে আমার অধিকার আছে, তেমনি আমাদের সাহিত্য সত্য হলে পৃথিবী তা আপন করে নেবে। জাতীয় জীবন-সংগ্রামে সাহিত্য একটি অস্ত্র। যুদ্ধের সময় জাতীয় সঙ্গীত যে কাজ করে শান্তির কালে সাহিত্যও ঠিক সেই কাজ করে। যে জাতির পরিবর্ত্তন নাই, তার কোন ইতিহাস নাই। যে জাতিতে সাহিত্য-চর্চ্চা নাই তারা নিজেদের ইতিহাসের উপর সমাধি মন্দির তুলে দিয়েছে।

আজকার সাহিত্য সম্মিলনের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে এবং যাদের জন্য এই 'সাহিত্য সমাজে'র সৃষ্টি তাদের নিকট দু একটি কথা নিবেদন করছি। আমারই জীবনে এমন একটা সময় দেখেছি যখন নিজের ভাষাটা না জানাই সভ্যতার চিহ্ন বলে ধরা হতো ; আর নিজের ভাষাও একটু ইংরেজীর অনুকরণে না বলতে পারলে সভ্যতার একটু হানি হতো। ফলে, একটা দলের সৃষ্টি হচ্ছিল যাঁরা ইউরোপ ও এশিয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন। নিজের দেশের প্রতি তাঁদের কোন সহানুভূতি ছিল না; ভিন্ন দেশও তাঁদের প্রতি কোন সহানুভূতি করতো না। অবশ্য আজ সে অবস্থাটা কেটে গেছে। তাতে একটু উপকারও হয়েছে। একটা প্রতিক্রিয়ার ফলে আমরা আজ জাতীয় আত্মসম্মান ফিরে পেয়েছি। বৈদেশিক সভ্যতা যে নিতান্ত সজোর ; সুতরাং সর্ব্বগ্রাসী তা বুঝতে পেরেই সাহিত্যের দ্বারা নিজেদের সামাজিক জীবন গড়ে তুলবার একটা উৎসাহ আমাদের হয়েছে। বাংলার আকাশে রবিও উদয় হয়েছে অনেকগুলো তারাও ফুটেছে। তবুও, একজন ইউনিভার্সিটির ছাত্রকে যদি কোন ভিন্নজাতির দশজন বিখ্যাত লোকের নাম করতে বলি সে অনায়াসেই তা পারবে। নিজের দেশের দশ জনের নাম করতে হলে, সে অনেকটা ইতস্ততঃ করবে। শেষে হয়তো দশজনকে খুঁজেই পাবে না। নিজেদের ভাষায় অবনতি ও নিজেদের সাহিত্যে ঔদাসীন্যই তার কারণ। আবার আমাদের নিজেদের উপরে বিশ্বাস এত কম যে, আমরা যাই লিখি বা বলি, ইউরোপের একটা 'হল মার্কে'র ছাপ না পড়লে সে জিনিষটাকে খাঁটি বলে গ্রহণ করতেই আমরা রাজী নই। এমন কি আমাদের কোন কোন ঐতিহাসিক এই দেখাতেই ব্যস্ত যে, ইউরোপে পূর্ব্বকালে যা ছিল, বা আজ যা হয়েছে, বা হচ্ছে, ভারতেও ঠিক সে সবই ছিল। তা ছাড়া যেন ভারতের সভ্যতাই প্রমাণ করা যায় না। কালিদাসকে ভারতের শেক্সপীয়ার না বললে যেন কালিদাসের মর্যাদা রক্ষা করা যায় না। এগুলো বলবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, শুধু আমাদের মনের গতি দেখিয়ে দেওয়া। অনুকরণ প্রবৃত্তিটা এত প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, নিজের উপর ক্রমশ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি। পৃথিবীকে নূতন কিছু দেবার আমাদের অধিকার বা ক্ষমতা আছে, তার ধারণাই যেন আমাদের হয় না। সাহিত্যের চর্চ্চা করলে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে—অতীতের জ্ঞানের আলো ভবিষ্যতের তিমির ভেদ করে পথ দেখিয়ে দেবে, এই আমার বিশ্বাস। মুসলমানদের এ বিষয়ে অগ্রগামী হওয়া উচিত। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলেই হচ্ছে সেই প্রথম মুসলমানদের জ্বলজীবন্ত উৎসাহ। তাঁরাই প্রচার করেছিলেন, 'জ্ঞান, ধর্ম্ম, কত কাব্য কাহিনী।'

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলি। একটা বিষম আন্দোলন শুনতে পাই যে, বাংলাদেশে মুসলমানদের মাতৃভাষা কি? দুই উপায়ে তার নিষ্পত্তি হতে পারে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে যদি statistics নেওয়া যায় ; অর্থাৎ বাংলাদেশে কত মুসলমান আছে, কত পুরুষ, কত স্ত্রী,

www.pathagar.com

কার কি ভাষা? তবে অংক শাস্ত্রের সাহায্যে একটা নিষ্পত্তি হয়। তা না হলে মাতৃজাতিকে জিজ্ঞাসা করতে হয় যে, তাঁদের ভাষা কি? কিন্তু এই আন্দোলনের আর একটু অংশ আছে। বাঙ্গালী মুসলমানদের মাতৃভাষা কি হওয়া উচিৎ? এই সমস্যার মীমাংসা আপনারা করবেন। তবে আমার মনে হয়, আমার যদিও বিশেষ জানা নাই যে, জাতি বা ধর্ম্ম হিসাবে ভাষা হয় নাই ; দেশ হিসাবেই ভাষা হয়েছে। এক এক দেশের এক এক ভাষা। সুতরাং যে দেশে আমাদের বাস, তার ভাষাও আমাদের। এ স্থলে মুসলমানদের অন্তরের কথাটুকুও বলা উচিত। তাঁদের ধর্ম্ম একটা প্রগাঢ় একতার সৃষ্টি করেছে। অন্ততঃ ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হলেও মুসলমান সমাজে সাধারণভাবে উর্দ্দু প্রচলিত আছে। যে কারণে হউক উর্দ্দুকে মুসলমানের ভাষা বলে গণ্য করা হয়েছে। এবং এই ভাষার বলেই মনের দিক থেকে একটা একতা আছে। সেই একতাটা নষ্ট করতে মুসলমানেরা স্বীকৃত হন না। এই জন্যই এ আন্দোলনের মীমাংসো হয় না। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, যে দেশে বাস, সে দেশের ভাষা না জানলে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়, তা সহজেই বুঝতে পারেন। ঠিক যেন মনে হয়, পেছনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। যদিও এ বিষয়ের তর্ক ও মীমাংসা আপনারা করবেন, আমার মনে হয় না যে, বাঙ্গালী মুসলমানের বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা করতে বা তার উৎকর্ষ সাধন করতে কোন বাধা বিঘ্ন হতে পারে। এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে, বাংলার স্বাধীন মুসলমান সুলতানেরা বাংলাভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলেন। সম্ভবত তাঁদেরই উৎসাহে বাংলা ভাষা 'সাহিত্যিক' ভাষা হয়েছে। সংস্কৃত রামায়ন ও মহাভারতে প্রথম আকৃষ্ট হয়ে বাংলার অধিপতি নাসির শাহের (১২৮২–১৩২৫) আদেশে মহাভারত বাংলায় অণূদিত হয় এবং বিদ্যাপতি এই নাসির শাহ্‌কে সঙ্গীতে অমর করেছেন। কোন মুসলমান অধিপতি না রাজা কংসনারায়ণ কৃত্তিবাস দ্বারা রামায়ন বাংলায় অনুবাদ করিয়েছিলেন তা ঠিক জানা যায় না ; কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, নাসির শাহের উদাহরণ স্মরণ করেই এটা করা হয়েছিল।

হোসেন শাহ্ বাংলা ভাষার patron ছিলেন। ভাগবত পুরাণ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করবার জন্য তিনি মালাধর বসুকে নিযুক্ত করেন। হোসেন শাহ গৌড়ের কাছে যে মাদ্রাসা তৈরী করেছিলেন তার উপরে তিনি লিখে দিয়েছিলেন যে 'হজরত মুহম্মদ (স.) বলেছেন, যদি চীনদেশে যেতে হয় তবুও জ্ঞানের অনুসরণ কর।' এই মহৎ বাণীই আজ আমাদের আদর্শ হউক।

হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ এবং তাঁর পুত্র ছুটী খাঁ মহাভারতের বাংলা অনুবাদে অক্ষয় কীর্ত্তি রেখে গিয়েছেন। ফেনীর নিকটে পরাগলপুরের প্রাসাদে কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রতিদিন বাংলা মহাভারতের আবৃত্তি করতেন এবং ছুটী খাঁর আদেশে কবি শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্ব্ব বাংলায় অনুবাদ করেন। এই মুসলমান অধিপতি ও শাসনকর্ত্তাদের উৎসাহে বহুসংস্কৃত ও ফার্সী গ্রন্থ বাংলায় অণূদিত হয়। সংস্কৃতে অনুরাগী ব্রাহ্মণেরা বাংলা ভাষাকে বড় ভালো চোখে দেখতেন না, কিন্তু মুসলমান সলুতানদের উৎসাহেই বাংলার ক্রমোন্নতি হয়। পরবর্তী হিন্দু রাজগণও মুসলমানদের অনুকরণে বাংলা ভাষার অনেক উৎকর্ষ সাধন করেন। প্রায় প্রতি রাজদরবার বিখ্যাত বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি দ্বারা অলংকৃত হয়েছে। ক্রমে বাংলা সংস্কৃত ও ফার্সীর প্রতিযোগী হয়ে উঠল। এ ছাড়া কত মুসলমান কবি বাংলাতে কত 'লোকসঙ্গীত' সুধা লিখে গিয়েছেন তার তো সীমাই নাই। এটুকু বলবার উদ্দেশ্য এই যে,

www.pathagar.com

মুসলমানের উৎসাহে বাংলা সাহিত্যের এত উন্নতি। এখন যদি বাঙ্গালী মুসলমান আবার বাংলা সাহিত্যের প্রতি মনোনিবেশ করেন তবেই তাঁরা জাতীয় কীর্ত্তি অক্ষুণ্ন রাখতে পারবেন। মুসলমান জাতির ইতিহাস যিনিই পড়েছেন তিনিই জানেন যে, সাহিত্যে তাঁদের অমর কীর্ত্তি। আধুনিক মুসলমানদের সাহিত্যবিমুখ হওয়া আর জাতিকে খর্ব্ব করা ও সর্ব্বনাশের পথে তুলে দেওয়া এক কথা।

আর একটি কথা। দেশের জাতীয় উন্নতির একটা হাওয়া চলছে, কিন্তু দেশের আকাশে সাম্প্রদায়িক বিবাদের কালো মেঘও দেখা দিয়েছে। একে অন্যের বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে না জানতে পারলেই মনোবিবাদ হয়। এই সাম্প্রদায়িক মনান্তর দূর করবার জন্য সাহিত্য কতটা সাহায্য করতে পারে, তা বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। সেদিক দিয়েও প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমিকের সাহিত্য জিনিষটার সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ করা প্রয়োজন। আজ মুসলমান যদি শুধু নিজেদের দাবী দাওয়া নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, আর জ্ঞান–জগতের সহানুভূতি আকর্ষণ করতে না পারেন, তবে তার উন্নতি এখনও অনেক দূরে।

আপনাদের অনেক সময় নষ্ট করেছি। প্রথমেই বলেছি দূরবীণ দিয়ে নিজেদেরকে দেখবার চেষ্টা করেছি, তাই কিছু অপ্রিয় কথাও বলতে হয়েছে। কিন্তু যে নিজের দোষ–ত্রুটিটুকু ধরতে পারে সেই কৃতকার্য হতে পারে। এই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' একটা অসীম অভাব দূর করবার জন্যই হয়েছে। এ আমাদের জাতীয় জীবনে একটি নূতন স্পন্দনের চিহ্ন। এই ক্ষীণ প্রবাহটুকু কালে একটি স্রোতে পরিণত হয় এই প্রার্থনা করি। এই সাহিত্যের পূজায় আপনারা যে কষ্ট স্বীকার করে নিজ নিজ অর্ঘ নিয়ে যোগদান করেছেন তজ্জন্য অভ্যর্থনা সমিতি চিরকৃতজ্ঞ। আপনারা আমাদের অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনাদের উপযুক্ত অভ্যর্থনার উপকরণ আমাদের নাই। গঙ্গাপূজা গঙ্গাজলেই হয়।

'তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে, একি বিষম কাণ্ডখানা!
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়।
আয় প্রচণ্ড, আয়রে আমার কাঁচা।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

www.pathagar.com

সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ
মৌলভী তসদ্দুক আহমদ বি.টি.

যে দিন বন্ধুবর মৌলভী আবুল হোসেন আজিকার এই সভায় পৌরহিত্য করিবার জন্য তাঁহার ফরমান জারি করিয়া বসিলেন সে দিন কী হৃদ্‌কম্পই না উপস্থিত হইয়াছিল ! অনেক অজুহাত পেশ করিয়াও যখন রেহাই পাইলাম না তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা এই গুরুভার গ্রহণ করিতে রাজি হইলাম। তখন ভাবি নাই ভারটা কিরূপ গুরুতর হইতে পারে। একদিকে বন্ধুবর্গের অপ্রীতিভাজন হইবার ভয়, অপর দিকে নিজেকে এই সাহিত্যিকমণ্ডলীর নিকট হাস্যাস্পদ করিবার আশংকা দুই দিকের টানে যে কি নাজেহাল হইয়াছিলাম, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত কেহ বুঝিবে না। অবশেষে 'আমিত্ব'-কেই আড়াল করিয়া দাঁড়ান স্থির করিলাম; বন্ধুবর্গেরই জয় হইল। আজিকার সভার সকল সাফল্য, সকল গৌরব আমার প্রীতিভাজন বন্ধুবর্গেরই ; আমি তাহার জন্য বিন্দুমাত্রও দায়ী নহি।

বন্ধুগণ, আজিকার এ সম্মানের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আপনাদের এই শুভ অনুষ্ঠানে যে আমাকে এত ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দিবার সুযোগ দিয়াছেন তজ্জন্য নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি। আজ এই সভায় যে দুই চারি কথা বলিব তাহা হয়ত কাহারও ভাল লাগিবে, কাহারও লাগিবে না। তবে এটুকু ঠিক যে, যে সমাজে বাস করি সেই সমাজ ও তাহার সাহিত্য সম্বন্ধে নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ ভাবিয়াছি তাহাই অকপটে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। প্রশংসার আশা বা নিন্দার ভয় করিব না। কারণ আমি বেশ জানি যে এই জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া পৌরহিত্য শেষ হইলে পুনরায় আমার সেই নিভৃত গৃহকোণটির আশ্রয় গ্রহণ করিতে আপনারা আমাকে কেহই বাধা দিতে পারিবেন না। দেশের আইন তাহাতে আপনাদিগকে একটুও সাহায্য করিবে না।

নিজের কথা এতটা বলা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, কারণ জানি যে নিজের কাছে যতই মধুর হউক না কেন, অপরের নিকট তাহা সর্ব্বদাই শ্রুতিকটু। কিন্তু মাতৃভাষার এমনি মহিমা যে কথা মাতৃভাষা বলাটাই যেন আনন্দের বলিয়া মনে হয়। বাংলা যে আমার মাতৃভাষা সে কথাটা আপনাদের সমক্ষে জোর গলায় বলিতে আমার একটুও দ্বিধাবোধ হয় না। কারণ তাহা না হইলে আমার নিজের মা-কেই অস্বীকার করিতে হয়। এতটা অধোগতি আপনাদের আশীর্ব্বাদে এখনও আমার হয় নাই। তবু নাকি শুনি এই বাংলাদেশে এখনও অনেক মুসলিম আছেন যাঁহারা বাংলাভাষাকে তাঁহাদের মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বা অপমানবোধ করেন। তাঁহারা নাকি বলেন 'শরিফ' অর্থাৎ সদ্বংশজাত মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে মাতৃভাষাটাকে না বদলাইলে চলিবে না। আপনারাই পাঁচজনে বিচার করুন শিক্ষকতা করি বলিয়াই কি নিজের মা-কেও বেত্র হস্তে তাড়না করিব, 'অতঃপর তুমি তোমার ভাষা বদলাইয়া ফেলিবে, নতুবা তোমাকে মা বলিয়া স্বীকার করা আমার পক্ষে অপমানজনক হইবে?' এই বাংলাদেশের লোক সংখ্যা ৪,৭৫,৯২,৪৬২

www.pathagar.com

তার মধ্যে ২,৫৪,৮৬,১২৪ জন মুসলিম নরনারী। বন্ধুগণ, ভাবিয়া দেখুন এই এতগুলি মুসলিম নরনারীর ঘর, বাড়ী কাটিয়া খাট, বিছানা, বাক্স, তোরঙ্গ, জমি জিরাত সিন্দবাদের ন্যায় স্কন্ধে লইয়া 'শরাফত হাসেল' করিবার জন্য যেখানে বাংলা ভাষা নাই এরূপ প্রদেশে উঠিয়া গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করা কি সম্ভবপর? অপর পক্ষে উর্দ্দু ভাষাকে বাংলাদেশের পল্লীগ্রামসমূহে কলমের জোরে চালাইবার যে নিস্ফল প্রয়াস কিছুদিন পূর্ব্বে হইয়াছিল তাহাও বোধহয় আপনাদের অনেকের নিকট অবিদিত নহে।

বাঙ্গালী মুসলিম সাহিত্যের অভাব

এক সম্প্রদায় বলেন, 'আমরা বাঙ্গালী মুসলমান যে ভাষায় কথা বলি তাহা ঠিক বাংলা নয়; উর্দ্দু, ফার্সী, আরবী–বহুল এক মিশ্র ভাষা। সেই ভাষাই আমাদের সাহিত্যের ভাষা হওয়া উচিত।' কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা মস্ত গলদ রহিয়া গিয়াছে। 'আমির হামজা' বা 'হাতেম তাইয়ের পুঁথি', 'কাসাসুল–আম্বিয়া' বা 'সোনাভানের পুঁথি' যে ভাষায় রচিত তাহা আমাদের সমাজের বহুতর ব্যক্তির আদরের জিনিষ হইতে পারে কিন্তু তাহা সাহিত্য হিসাবে পৃথিবীর লোকের নিকট আদরণীয় বা অনুকরণীয় কোন কালেই হয় নাই। তাহা হইলে আজ শুধু বটতলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া তাহা পৃথিবীময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত।

সাহিত্য জিনিষটা কাহারও একচেটিয়া সম্পত্তি নহে; সকলেরই তাহাতে সমান অধিকার। এই বাংলাদেশে আমরা হিন্দু মুসলিম দুইটি বৃহৎ সম্প্রদায় বহুকাল যাবৎ একত্র বাস করিয়া আসিতেছি। সাহিত্যকে গঠন করিবার জন্য ও পুষ্ট করিবার জন্য আমাদের উভয়েরই সমান অধিকার। কিন্তু বলিতে লজ্জা বোধ হয় আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমরা এতদিন সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম। যখন বাংলা সাহিত্য হিন্দু সমাজের বহু কৃতী সন্তানের দ্বারা শণৈঃ শণৈঃ গঠিত, পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতেছিল তখন আমরা কেবল সমরখন্দ ও বোখারা, আরব ও ইস্পাহানের স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম আমলে যেমন অদূরদর্শী জননায়কগণের প্ররোচনায় পড়িয়া আমরা 'কাফের' হইবার ভয়ে ইংরাজী ভাষাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম, বাংলা ভাষার উদ্বোধন কালেও আমরা সেইরূপ দূরে দাঁড়াইয়া নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছি, আর পরের গালি খাইয়া নীরবে হজম করিয়াছি। আমি এখানে সেই হোসেন শাহী যুগের মুসলিম কবিগণের কথা উত্থাপন করতেছি না, কারণ যদিও তাঁহারা এখন প্রত্নতত্ত্ববিদগনের খোরাক যোগাইতেছেন তথাপি সমাজের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিবার জন্য আমাদের সাহিত্য জীবনকে কতদূর কর্ম্মঠ ও বলিষ্ঠ করিয়াছেন তাহা আমাপেক্ষা আপনারাই নিশ্চয়ই ভাল বুঝিবেন। আসল কথা প্রধানতঃ যে উপাদান দিয়া জাতীয় জীবন গঠিত হয় তাহা নির্ধারণ করিতে আমাদের বহু কালক্ষয় হইয়াছে; এখনও সম্যক উপলব্ধি হইয়াছে কিনা সন্দেহ। তবে আশা হয় আপনাদের ন্যায় অনুষ্ঠানের যতই বৃদ্ধি হইবে ততই পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। আমরাও জনসমাজের অপর দশজনের ন্যায় আদৃত, সম্মানিত হইতে থাকিব।

মানুষ সংসারে একাকী বাস করিতে পারে না। সঙ্গ বা সমাজবদ্ধ হইয়া থাকাই তাহার অভ্যাস। সমাজের উত্তরোত্তর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের সম্বন্ধ নানা প্রকারে ক্রমে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠে। এই সম্বন্ধ নির্ণয় ব্যাপারে

www.pathagar.com

মানুষ ভাষার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করে এবং অপরের নিকট নিজেকে বোধগম্য করে। মনের ভাবকে মূর্ত্তরূপে প্রকট করিবার জন্য মানুষের কী প্রচেষ্টা! সঙ্গীতে, কাব্যে, চিত্রে অর্থবোধক শব্দের আকারে, নানা উপায়ে মানুষ স্বীয় মনের ভাব ব্যক্ত করে। সুতরাং ব্যাপক অর্থে যে যে উপায় দ্বারা মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাই সাহিত্য। যে জাতির এই সকল উপায় যত কম সেই জাতি সাহিত্য হিসাবে তত দরিদ্র। এই মাপকাঠি দিয়া দেখিলে বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ আজ পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজ অপেক্ষা কত দরিদ্র! সাহিত্য আমাদিগকে জ্ঞান দান করে, আনন্দ দান করে, কর্ম্মের জন্য প্রেরণা সঞ্চার করে। আমরা এমনি হতভাগ্য যে আমাদের না আছে জ্ঞান লাভ করিবার শক্তি, না আছে আনন্দ উপভোগ করিবার ক্ষমতা, না আছে কর্ম্মের জন্য উৎসাহ। যে সাহিত্যের অমৃতধারা আমাদিগকে নানা জ্ঞানে পুষ্ট করিতে পারিত, নূতন বলে বলীয়ান করিতে পারিত, কর্ম্মে উৎসাহিত করিতে পারিত, আমরা অর্ব্বাচীনের ন্যায় তাহা অবহেলা করিয়া আসিয়াছি। আজ আমরা অপরাপর সম্প্রদায়ের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হই, কিন্তু আমাদের দুরবস্থার জন্য যে আমরাই প্রধানত দায়ী তাহা এক বাতুল ব্যতীত আর কে অস্বীকার করিবে?

মুসলিম সাহিত্যের প্রকৃতি

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, আমাদের সাহিত্যের প্রকৃতি কি হইবে? বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমাদের আবহমান কালের অবহেলার জন্য তাহা ভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক এরূপে গঠিত হইয়াছে যে, তাহাতে আমাদের নিজস্ব কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের পূর্ব্বতন ইতিহাস, আমাদের সমাজ, আমাদের আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, বাংলা সাহিত্যের অপর উপাসকগণের হইতে বিভিন্ন। অথচ বাংলা সাহিত্যই আমাদের একমাত্র সাহিত্য। এই অবস্থায় সেই সাহিত্যকে আমাদের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে আমাদের বাঁচিবার উপায় কি? আমার মনে হয়, যে দেশে আমরা বাস করি, যে দেশের আবহাওয়ায় আমরা প্রতিপালিত, সে দেশের অপরাপর সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত থাকিয়াও আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম। যদি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলি, তাহা হইলে আমরা মুসলিম বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য নহি। সাহিত্য যখন সকলেরই সম্পত্তি, তখন সকলেই তাহার কলেবর বৃদ্ধি করিবার সমান অধিকারী এবং সে জন্য সমান দায়ী। আমি আমার অংশটুকু দিলাম, আপনি আপনার অংশটুকু দিলেন, এইভাবেই সাহিত্য বাড়িয়া উঠিবে। হিন্দু ভ্রাতৃগণ তাহাদের অংশ পর্যাপ্ত পরিমাণে দিয়াছেন এবং দিতেছেন, আমরা আমাদের অংশ দিই নাই। এখন দিতে আরম্ভ করিয়াছি। ক্রমেই আমাদিগকে অধিকতর পরিমাণে দিতে হইবে। তখন আমরা বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলিম দুই ভাই একই ভাষা-জননীর পীযূষধারা পান করিয়া বলীয়ান হইব।

তারপর দেখুন চেনা পরিচয় হইলেই তবে আত্মীয়তা হয়। সাত শত বৎসরের উপর হইয়া গিয়াছে আমরা একত্র বাস করিতেছি কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, এই দুই সম্প্রদায় পরস্পরকে কতটুকু চেনেন। বরং মুসলিম হিন্দুকে কিছু চেনেন কিন্তু হিন্দু মুসলিমের সম্বন্ধে খুবই কম জানেন। ইহার জন্য তাহাদিগকে দোষ দিতে পারি না। কারণ আমরা

www.pathagar.com

আমাদের পরিচয় এতদিন দিই নাই। এখন দিতে হইবে। নহিলে দেশের ভায়নক অকল্যাণ হইবে। এই বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমরা তাঁহাদিগকে আমাদের প্রকৃত পরিচয় দিব। তখন দেখিবেন পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি কত বাড়িয়া যাইবে। যদি আমাদের মধ্যে বাস্তবিক কোন গুণ থাকে, যদি আমাদের ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম তাঁহারা অবগত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবেন সৌহৃদ্য ও সখ্যভাব স্থাপিত হইতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব হইবে না। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের বিরোধ থাকিতে পারে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের অনৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু যদি আমরা সকলেই প্রকৃত মনুষ্যপদবাচ্য হই তাহা হইলে সুপরিচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একের অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির অভাব দূর হইবে। এই মিলন সাহিত্যের ভিতর দিয়াই সাধন করিতে হইবে। রাজনৈতিক প্যাক্টের দ্বারা কখনও সম্ভবপর হইবে না।

মুসলিম সাহিত্যের আদর্শ—ইসলাম

আমাদের সাহিত্য কি করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে তাহাই এখন ভাবিবার বিষয়। বন্ধুগণ, অতীতকালে আমরা নবাব ছিলাম, বাদশাহ ছিলাম, সেই স্বপ্ন দেখিতে আমি আপনাদিগকে বলিতেছি না। সেই স্বপ্নের নেশায় এতদিন ভরপুর ছিলাম বলিয়াই আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। পারিপার্শ্বিক জগতকে বিস্মৃত হইয়া যখন মানুষ কেবল অতীতকালেই বাস করিতে চায় তখন সংসার পথে তাহাকে কেবল টক্কর খাইতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া অতীতকে একেবারে ভুলিতে পারি না। মনুষ্যজীবনে, সমাজজীবনে অতীতের অনেক রেখাপাত থাকিয়া যায়, সেগুলিকে মুছিয়া ফেলা যায় না ; মুছিয়া ফেলা সমীচীনও নয়। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ বড় ঘনিষ্ঠ। অতীতকে বিস্মৃত হইবার উপায় নাই, কারণ তাহা বর্ত্তমানের সহিত এক সূত্রে অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। আমরা অতীত হইতে আমাদের প্রাণশক্তি গ্রহণ করিব। অতীতের শিক্ষা, দীক্ষা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস, কলাশিল্পকে বর্ত্তমান কালোপযোগী করিয়া জগতের সমক্ষে আমাদের গৌরব পতাকা উড্ডীয়মান করিব। আমাদের নাই কি? ছিল না কি? যে ধর্ম্মে হযরত রসূল করিম মুহম্মদ মোস্তফা (স.)–এর ন্যায় নেতা, পথপ্রদর্শক, উপদেষ্টা আছেন, যে ধর্ম্মে কোরান মজিদের ন্যায় অমূল্য গ্রন্থ বিদ্যমান, সেই ধর্ম্মাবলম্বীগণের দুনিয়ার পাথেয় সংগ্রহ করিবার জন্য আবার চিন্তা?

মানুষ স্বভাবতঃই অনুকরণপ্রিয় এবং সেই অনুকরণ সে তাহাকেই করিতে চায় যাহার প্রতি তাহার ভক্তি ও শ্রদ্ধা বিশেষভাবে বিদ্যমান। হজরত মুহম্মদ মোস্তফা (স.)–কে অনুকরণ করিতে না চায় এমন কোন ভক্তপ্রাণ মুসলিম আছে? এইখানে বোধ হয় ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, আমাদের সমাজে যে 'মিলাদ পাঠে'র ব্যবস্থা আছে কিন্তু তাহার ন্যায় বড় প্রহসন আর কিছু হইতে পারে কিনা সন্দেহ। আমরা ভক্তিভরে হজরত মুহম্মদ (স.)–এর নাম শ্রবণ করি, চোখে 'বোসা' (চুম্বন) দিই, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত জীবনী সম্বন্ধে কয়জন খোঁজ রাখি? নানা প্রকারের অলৌকিক, আজগুবি গল্পের অবতারণা করিয়া তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করিয়াই আমরা মিলাদ সমাপন করি। শিরনী (মিষ্টান্ন) বস্ত্রপ্রান্তে বাধিয়া হৃষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া যাই। যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলে আমাদের কিঞ্চিতমাত্রও উপকার হইত তাহা আমাদের নিকট চিরদিন লুক্কায়িত থাকিয়া যায়। বন্ধুগণ,

www.pathagar.com

ধর্ম্ম জিনিষটা গৃহকোণে উঠাইয়া রাখিবার জিনিষ নয়। আবশ্যক মত তাহাকে সম্ভ্রমের সহিত উচ্চাসন হইতে নামাইয়া, করণীয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তির পর পুনরায় সেই আসনে উঠাইয়া রাখিলেই কর্ত্তব্য শেষ হয় না। ধর্ম্ম দৈনন্দিন জীবনের ভিতর দিয়া সদা প্রবহমান। কথাবার্ত্তা, কাজকর্ম্ম, প্রত্যেক বিষয়েই ধর্ম্মাচরণ আবশ্যক। তাহার জন্য হজরত মুহম্মদ (স.)–এর ন্যায় আদর্শ ও মহামূল্য কোরানের উপদেশাবলী থাকিতে আমাদিগকে অন্যত্র যাইবার আবশ্যক কি? 'মুসলিম' বলিয়া শুধু গগণভেদী চীৎকার করিলে বা মসজিদের সম্মুখে বলপূর্ব্বক বাজনা বন্ধ করিলেই জীবনটাকে 'সেরাতুল মোস্তাকিম' (সরল পথে)–এ চালিত করা সম্ভবপর হইবে না। আমাদের সমাজে একদল লোক আছেন যাঁহারা বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালনে পাকা মুসলিম, কিন্তু ইসলামকে তাঁহারা বড় সংকীর্ণ করিয়া দেখেন ; ইসলামের সার্ব্বভৌমিক উদারতা তাঁহাদের প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে না। সামান্য কারণেই তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, ইসলাম এমনি ক্ষণ ভঙ্গুর যে ব্যক্তি বিশেষের সামান্য ভুলচুকেই ইসলামের সর্ব্বনাশ হইবে, ইহা রসাতলে যাইবে। আর এক সম্প্রদায় আছেন যাঁহারা মুসলিম বলিয়া পরিচয় দেন ; মুসলিমের ন্যায্য গণ্ডা আদায় করিবার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করেন। কিন্তু ইসলামের অবশ্য করণীয় হুকুমগুলি মানিয়া চলা দুর্ব্বলতার চিহ্নস্বরূপ মনে করেন ; মুসলিম বলিয়া পরিচয় দিয়াই সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হইবার দাবী করেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, বাক্যে এবং কার্যে সামঞ্জস্য না থাকিলে অপরের শ্রদ্ধা সহজে পাওয়া যায় না। যাহা বিশ্বাস করি বলিয়া মুখে প্রচার করি, তাহা যদি কার্যে পরিণত করিতে পরাঙমুখ হই, তাহা হইলে আমি চরিত্রবান বলিয়া শ্লাঘা করিতে পারি না। Reformed Hindus–এর ন্যায় Reformed Muslims হইতে পারি কিন্তু খোদ ইসলামকে সংস্কার করিতে গেলে ভিত্তিটাই শিথিল হইয়া যাইবে। তাহার উপর সৌধ স্থাপনের চেষ্টা করা বৃথা হইবে। জীবন সংগ্রাম বলুন, বিজ্ঞান বলুন, শিল্প বলুন, সাহিত্য বলুন, সবই একটা আদর্শের অপেক্ষা করে। সেই আদর্শ না থাকিলে সাধনায় স্পৃহা হয় না ; আবার সাধনা না থাকিলে সিদ্ধি লাভও হয় না। আমাদের সাহিত্যকে ইসলামের আদর্শে গড়িয়া তুলিতে হইবে। প্রকৃত ইসলাম দ্বারা তাহাকে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। ইসলামের সঞ্জীবনী সুধায় শিঞ্চিত হইয়া আমাদের সাহিত্য অমর হইবে। প্রত্যেক মুসলিম নরনারী সেই সাহিত্যসুধা পান করিয়া অমর হইবে। প্রত্যেক মুসলিম বালক বালিকার শিরায় শিরায় তন্তুতে তন্তুতে সেই শক্তি তাড়িত প্রবাহের ন্যায় কার্য করিবে। সাহিত্যকে এরূপ গড়িতে হইলে অক্লান্ত পরিশ্রম আবশ্যক, প্রকৃত সাধনা আবশ্যক, আলস্য পরিহার আবশ্যক। এই নিগৃহীত, অনাদৃত, অবজ্ঞাত বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের আপনারাই ভবিষ্যৎ কর্ণধার, ভবিষ্যৎ আশাস্থল। এটুকু আশা করা কি অন্যায় হইবে যে, আপনারা ইসলামের সেই উচ্চ আদর্শকে বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া নিজেরাও বরেণ্য হন, মুসলিম সমাজকেও ধন্য করেন?

প্রাতঃস্মরণীয় স্যার সৈয়দ আহমদ, মৌলানা শিবলী, হালি, নজির আহমদ বেলগ্রামী, মোহসেনুল মুলক, একবাল, গালেব প্রমুখ মনীষিগণ উর্দ্দু সাহিত্যকে পৃথিবীর মধ্যে এক অতি উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছেন। আমাদের বাঙ্গালী মুসলিম সমাজেও এইরূপ লোকের আবির্ভাব আবশ্যক। আপনাদের ন্যায় নবীন কর্মীর দল যতই পুষ্ট হইবে ততই সে আশা পূর্ণ হইবার সময় নিকটবর্তী হইবে সন্দেহ নাই।

www.pathagar.com

মুসলিম সাহিত্য গঠনের উপায়

ইসলামের ভাবধারা ও অনুপ্রেরণা আপাতত আবরী,ফার্সী এবং উর্দ্দু ভাষার মধ্যেই নিবদ্ধ। সাধারণের মধ্যে এইসব ভাষার প্রচলন আমাদের বাংলাদেশে তত বেশি নাই। ইহার কোনটিকেই দেশবাসীর মাতৃভাষা বা জাতীয় ভাষা করাও সম্ভবপর নহে। সুতরাং এই সকল ভাষাবিদগণের নিকট আমাদিগকে বহুদিন পর্য্যন্ত ইসলামের ভাবধারার জন্য ঋণী থাকিতে হইবে। যাঁহার ঐ সকল ভাষা জানেন তাঁহাদিগকে বাংলা ভাষায় ইসলামের আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আবশ্যকমত ইসলামী ভাবাপন্ন শব্দাদি ধীরে ধীরে বাংলা ভাষায় প্রচলন করিতে হইবে। তাহাতে হিন্দু সাহিত্যিকগণ প্রথম প্রথম আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন কিন্তু আপনাদের শব্দের প্রযুজ্যতা বা ভাবের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিলে তাঁহারা তাহা গ্রহণ না করিয়া পারিবেন না। ভাষা ও সাহিত্য এইরূপেই শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হয়। জীবিত ভাষামাত্রেই এইরূপে তাহার বর্ত্তমান সম্পদ লাভ করিয়াছে। আমাদের কোন কোন নবীন কবির আরবী ও ফারসী শব্দবহুল পদ্য সাহিত্য আপাতত টীকা, টিপ্পনী সম্বলিত হইলেও সেই সময় সুদূরপরাহত নয় যখন সেগুলি সাহিত্যের বুকে বেমালুম স্থায়ী আসন অধিকার করিয়া বসিবে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। সমাজে বলুন, সাহিত্যে বলুন এমন কি মানব-শরীরেও যখনই কোন নূতন কিছু প্রবেশাধিকার লাভ করিতে চায় তখনই বিষম দ্বন্দ্ব, তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। কিন্তু কালে সেই নূতনই পরম পুরাতন, পরম মিত্র হইয়া দাঁড়ায়। আজ যদি টেবিলকে পীঠিকা, থিয়েটারকে রঙ্গমঞ্চ, সিনেমাকে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আদালতকে ধর্ম্মাধিকরণ বলিতে যাই তাহা হইলে আপনারা প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও মনে মনে নিশ্চয়ই হাসিবেন। সেরূপ নিপুণ শিল্পীর ন্যায় আপনি যদি ইসলামী ভাব বা উক্ত ভাব সম্বলিত বৈদেশিক শব্দসমূহ সহজ সরলভাবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করান তাহা হইলে ভাষা সাহিত্যের উপর নিশ্চয়ই কোন অত্যাচার করা হইবে না। তাই বলিয়া ইদানীং মক্তব ও মাদ্রাসার জন্য মধ্যে মধ্যে যে এক প্রকার অস্বাভাবিক সাহিত্য দেখিতে পাই তাহাতে সাহিত্যের পুষ্টি সাধন না হইয়া বরং অনিষ্টই হইবে বলিয়া অশংকা হয়। এ সম্বন্ধে আমার মত এই যে, এই কার্য অত্যন্ত নিপুণতার সহিত করিতে হইবে এবং যিনি এ বিষয়ে এত সিদ্ধহস্ত নন তিনি যদি এ চেষ্টা না করেন তাহা হইলে ভাল হয়। যাঁহারা এ কাজে পাকা, তাহারাই করুন; আমরা সকলে তাঁহাদের অনুসরণ করি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলিয়া পারিলাম না। বঙ্গ সাহিত্যের কোন কোন খ্যাতনামা লেখকের অনুকরণে আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল লেখক দেখা দিতেছেন যাঁহারা তাঁহাদের অর্থটা ভাষার বাঁধুনিতে ও ভঙ্গীতে লুকাইয়া রাখিতে চান। তাঁহারা ইচছা করিয়াই অর্থটাকে দুর্ব্বোধ করেন অথবা নকলের নাকালের মধ্যে পড়িয়া করেন তাহা বুঝিতে একটু কষ্ট হয়। হয়তবা আমারই বুদ্ধির দোষ; কিন্তু আমার মনে হয় 'বড্ড বোঝা যাচ্ছে' এই ভয়ে যদি ইচছা করিয়াই দুর্ব্বোধ হন তাহা হইলে তাঁহারা পাঠকবর্গের প্রতি অবিচার ত করেনই, পরন্তু সৎসাহিত্যেরও সৃষ্টি করেন না। সৎসাহিত্য তাহাকেই বলিব যাহা আপনার ভিতরকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে জগতের লোকের নিকট তাহাদের উপকারার্থে নিবেদিত হয়। এরূপ সৎসাহিত্যের সৃষ্টি করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন। আবার শিক্ষার জন্য আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শিক্ষার আগার। জন্মাবধি মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা লাভের সময়। আমরা স্কুল কলেজে বিদ্যাভ্যাস করি; বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

হইহে বহির্গত হইয়াই মনে করি, আমাদের শিক্ষার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। কিন্তু তাহা নহে। সংসারক্ষেত্রেও আমাদের যথেষ্ট শিক্ষার বিষয় আছে। প্রকৃত শিক্ষার্থী কখনও বলে না 'আমি সব শিখিয়াছি, আমার আর শিখিবার কিছু নাই।' এই সংসাররূপ বিদ্যামন্দিরে বিনয়াবনত হইয়া যেখানে যেটুকু ভাল পাই তাহাই লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা জাগ্রত, সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকাই শিক্ষার্থীর ধর্ম্ম। দাম্ভিকতা ও অহংকার শূন্য হইয়া আমাদিগকে সংসার পথে চলিতে হইবে। তবেই আমরা গৌরব লাভ করিব ; সম্মানিত হইব। সাহিত্য প্রচারকল্পে এইরূপ তপশ্চরণ করিতে পারিলেই আমরা কৃতার্থ হইব।

শিক্ষার বাহন

সাহিত্য সৃষ্টির জন্য যে শিক্ষার এরূপ প্রয়োজন সেই শিক্ষার বাহন কি হইবে তাহা লইয়া আমাদের দেশে এক বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। আমার মনে হয়, এই আন্দোলনের মধ্যে অনেকটা কৃত্রিমতা আছে। কারণ যাহা সহজ, সরল বুদ্ধিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান তাহাকে তর্কের জালে আচ্ছন্ন করিয়া আসল কথাটাকে হারাইয়া ফেলি কেন? মানুষের ভাবসমুদ্রে যখন আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখনই ভাষার সৃষ্টি হয়। ভাবরাশি যদি আমার মাতৃভাষাতেই প্রথম মূর্ত্ত হয় তাহা হইলে তাহার প্রকাশই বা কেন অন্য ভাষাতে হইবে? হইতে পারে ইংরাজি আমাদের রাজভাষা, হইতে পারে উর্দ্দু, আরবী, ফার্সী আমাদের ধর্ম্মের ভাষা, কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষার বাহন হইবার জন্য উহাদের একটিও ত উপযুক্ত নহে। ইংরাজি শিখিলে আমাদের সংসার জীবনে উন্নতি হইতে পারে, আমাদের নিকট জ্ঞানরাজ্যের দ্বারোদ্ঘাটন হইতে পারে ; উর্দ্দু, আরবী, ফার্সী শিখিলে আমরা ইসলামের তত্ত্ব ও তথ্য সমূহ অনেক জানিতে পারি সত্য, কিন্তু যখন এই সকল জ্ঞানরাশিকে আমার নিজস্ব করিতে হইবে, আমার রক্ত, মাংস, অস্থির ন্যায় আমারই এক মানসিক ও নৈতিক উপাদানে পরিণত করিতে হইবে, তখন তাহা মাতৃভাষা ব্যতিরেকে কিরূপে সম্ভবপর হয় আমি বুঝি না। এ সম্বন্ধে আমি অধিক বলিতে চাহি না, কারণ ইতিপূর্ব্বে ইহার অনেক আলোচনা হইয়াছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই আপনাদের কাছে নিবেদন করিলাম।

আধুনিক ভাষা শিক্ষার আবশ্যকতা

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা আবশ্যক। জগতটা আজকাল ক্রমেই ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিতেছে। নানাদেশের, নানা ভাষার লোক আসিয়া আজ আমাদের কুটির দ্বারে আঘাত করিতেছে। আমরা কূপমণ্ডুকের ন্যায় মাথা লুকাইয়া থাকিলে আর চলিবে না। সুতরাং অপরের সহিত মনের ভাবের আদান-প্রদান করিবার জন্য, লেনদেনের জন্য মাতৃভাষা ব্যতীত আমাদিকের আরও কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করা দরকার। আজকাল পাশ্চাত্য প্রদেশসমূহে মাতৃভাষা এবং ব্যক্তিবিশেষের জন্য একটি প্রাচীন ভাষা ব্যতীত এক বা তদধিক আধুনিক ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। বাঙ্গালী মুসলমানের জন্যও আমার মতে অন্তত দুইটি আধুনিক ভাষা শিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যেহেতু ইংরাজি রাজভাষা, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রধান ভাষা এবং সাহিত্যের হিসাবে বড় সম্পদশালী ভাষা, অতএব ইংরাজি আমাদিগকে শিখিতেই হইবে। তারপর উর্দ্দু ভাষাও আমাদের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। উর্দ্দু ভাষা আয়ত্ত করা বিশেষ কঠিন নহে, যেহেতু ইহাকে জীবিত ভাষা বলা

www.pathagar.com

যাইতে পারে। তারপর উর্দ্দু ভাষার সাহায্যেই বঙ্গীয় মুসলমানের পক্ষে সাহিত্যকে আমাদের উপযোগী করা অল্পায়াস সাধ্য হইবে। এজন্য আমি উর্দ্দু ভষা শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী। তবে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমার আর একটি বক্তব্য এই যে, সর্ব্ব সাধারণের জন্য উর্দ্দুর কোন প্রয়োজন নাই। যাঁহারা কেবল উচ্চ শিক্ষাভিলাষী কেবল তাঁহাদিগকেই উর্দ্দু শিক্ষা করিতে হইবে। যেমন ফরাসী বা জার্ম্মান না জানিলে আজকাল কোন পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করা যায় না, সেইরূপ এখানেও এই নিয়ম হওয়া আবশ্যক যে, উচ্চ শিক্ষাভিলাষী মুসলিম ছাত্রমাত্রেই উর্দ্দু ভাষাভিজ্ঞ হইবে। তারপর আরবী আমাদের কোরানের ভাষা ; যাঁহারা কোরানের রত্নরাজি আহরণ করিবার জন্য অনুবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন না, তাহাদিগের মূলভাষা শিক্ষা করা দরকার। এই ভাষা–শিক্ষাবিভ্রাট লইয়া আমাদের বহু সময় কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ইচ্ছা থাকিলে পথও আবিষ্কৃত হয়। আমরা যদি মুসলিম বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করি, তাহা হইলে আমাদিগকে আয়াস স্বীকার করিতে হইবে। প্রকৃত সাধকের ন্যায়, ভক্তের ন্যায় বিনম্রভাবে অথচ দৃঢ়তার সহিত এই কঠিন সমস্যার সমাধানে কৃত সংকল্প হইতে হইবে। আলাদীনের প্রদীপ আমাদিগকে কেহ হাতে তুলিয়া দিবে না। একদিনেই আমাদের 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'কে সর্ব্ব বিষয়ে গরীয়ান করিতে পারিব না।

মুসলিম সাহিত্যিকগণের কর্ত্তব্য

বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে আমাদের অভাব এবং মুসলিম সাহিত্যিকগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে দুই চারি কথার উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। নবীন লেখকদিগের মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাই, তাঁহারা সাহিত্যের আসরে নামিয়াই অন্তত কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিবার জন্য এক দুর্নিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাহাদের কবিত্বের পরিচায়ক স্বরূপ চাঁদের আলো, কোকিলের কুহুধ্বনি, পত্রের মর্ম্মরশব্দ, স্রোতস্বিনীর কুলকুল, রাগিনী হইতে আরম্ভ করিয়া চটিজুতা, পুঁইশাক্, মিনি বিড়াল প্রভৃতি কোন বিষয়ই বাদ যায় না। বোধহয় এটা কাল–মহাত্ম্যের দরুনই হয়। যৌবনের প্রথম উন্মেষে সমস্ত পৃথিবীটাই রঙ্গীন মনে হয়। তখন কল্পনা রথে চড়িয়া বাস্তব জগতের উপর কেবল চোখ বুলাইয়া যাওয়া হয়। সুতরাং সংসারের বন্ধুর, কংকরময় পথগুলি তখন চোখে পড়ে না। তারপর যত বয়ঃবৃদ্ধি হইতে থাকে ততই বাস্তবের সহিত পরিচয় ঘণীভূত ও গাঢ়তর হয়। তখন কবিত্ব, হাহুতাশ, ধীরে ধীরে উড়িয়া যায়। ইহা হইতে আপনারা মনে করিবেন না যে, আমি কাব্য সাহিত্যের নিন্দা করিতেছি। কাব্যের যে কি মহিয়সী ক্ষমতা তাহার প্রমাণ ইতিহাসে ভূরিভূরি রহিয়াছে। তবে তাহা কাব্যের মত কাব্য হওয়া চাই। আমার বলার উদ্দেশ্য এই যে, বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের এখন যে ঘোর দুর্দ্দিন তাহাতে আমার কল্পনার দাস হইয়া আল নশকরের আকাশ কুসুম গড়িয়া কালক্ষয় করিলে আর চলিবে না। সমাজকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং তাহার জন্য আল্লাহতালা যাহাকে যেটুকু ক্ষমতা দিয়াছেন তাহার ষোলআনা সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। ধরুন শিশু–সাহিত্য ; মুদ্রাযন্ত্রের অনুগ্রহে আমাদের দেশের সেই পুরাতন কথকতা, গৃহের বৃদ্ধাদিগের সেই কেচ্ছা–কাহিণী সবই লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। তাহাদের স্থান অধিকার করিবার জন্য দক্ষিণারঞ্জন, যোগীন্দ্র সরকার, সুকুমার রায় চৌধুরীর ন্যায় আমাদের মুসলিম সমাজে কয়জনের আবির্ভাব হইয়াছে? যা দুই একজন দেখা দিতেছেন তাঁহারাও যথেষ্ট

www.pathagar.com

সহানুভূতি পাইতেছেন কিনা সন্দেহ। বালকদিগের জন্য জলধর সেনের ন্যায় পাকা লেখকও কলম ধরিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। কিন্তু আমরা সে দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দিতেছি বলিয়া মনে হয় না। অথচ শৈশব এবং কৈশোরই ভাল বীজ বপন করিবার প্রশস্ত সময়। চরিত লেখকই বা সে রকম আমাদের মধ্যে কই? বস্ওয়েল, হালি, যোগীন্দ্র বসুর ন্যায় চরিতাখ্যায়ক কি আমাদের বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে জন্মিতে নিষেধ আছে? ওমর খাইয়ামের অনুবাদ করেন কান্তি বাবু, নরেন্দ্র বাবু। কোরান ও হাদিসের অনুবাদ করেন গিরীশবাবু। আমরা কবে আমাদের মহামূল্য রত্নরাজি অনুবাদের সাহায্যে পৃথিবীর সমক্ষে উপস্থিত করিব? বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্', একবালের 'তারানা' আমাদের মধ্যে কবে শুনিব? রামেন্দ্রসুন্দরের বিজ্ঞান কথা, দ্বিজেন্দ্র লালের হাস্য কৌতুক, রবীন্দ্রনাথের চিরকুমার সভা, দিলীপ কুমারের সঙ্গীত–চর্চ্চা, পুলিনদাসের লাঠি খেলা সবই আমাদের মধ্যে চাই। তবেই আমাদের সাধনার ফল পাইব। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবি, দার্শনিক হইতে না পারি, জগদীশ বোস বা প্রফুল্ল চন্দ্রের ন্যায় বৈজ্ঞানিক হইতে না পারি, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ন্যায় ঔপন্যাসিক হইতে না পারি কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের আদর্শ ছোট হইবে কেন? খোদার আরশ টলাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে স্থান না দিয়া যদি আমাদের প্রকৃত অভাব মোচনে সকলে নিজ নিজ সামর্থ্যানুসারে বদ্ধপরিকর হই তাহা হইলে সাফল্যের গৌরবে মণ্ডিত হইতে আমাদের অধিক বিলম্ব হইবে না। আপনাদের আজিকার এই অনুষ্ঠান দেখিয়া মনে হয় রোগ নির্ণীত হইয়াছে। প্রতিকারের ব্যবস্থাও অচিরেই হইবে।

বন্ধুগণ, আসুন আমরা সকলে মিলিয়া সেই পরম করুণাময় সর্ব্বনিয়ন্তা আল্লাহতালার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের সকল চেষ্টা, সকল পরিশ্রম সার্থক করুন, আমাদিগকে বিজয়মাল্যে বিভূষিত করুন, আমাদের সাহিত্যসেবাকে সফল করুন। আমিন!

www.pathagar.com

আবাহন

মুনশী হাবিবউল্লা (মোক্তার), মুন্সিগঞ্জ

১

কুহেলি তিমির সরায়ে দূরে,
তরুণ তপন উদিছে ধীরে,
পূরব গগণ রঞ্জিয়া;
হাসিছে জগত পরশে তার,
নাহি আর হৃদে দুঃখের ভার,
গিয়াছে বেদনা কমিয়া।

২

শান্ত স্নিগ্ধ মধুর বায়
কাঁপিয়ে পাতা ধীরে বয়ে যায়,
কুসুম-সৌরভ বিলিয়ে;
কনক-মুকুট পরিয়া শিরে,
ঊষা বালা আজি এসেছে ধীরে,
নূতন সাজে সাজিয়ে।

৩

দিকে দিকে তার মধুর হাসি,
বিলিয়ে দিতেছে আনন্দ রাশি,
সোনার থালা ভরিয়া;
বসন্ত-সখা কোকিল কূজন,
কোবিদ গণের শুভ আগমন,
গাইছে হর্ষে মাতিয়া।

৪

জাগিয়া জগতে সকল জাতি
সাহিত্য-সেবায় লভিছে খ্যাতি,
হতেছে উন্নত সবে;
মোস্‌লেম শুধু ঘুমায়ে থাকি,
দীনতা হীনতা আনিয়া ডাকি,
কাঁদিছে করুণ রবে।

www.pathagar.com

৫

নেহারি আজি জাতীয় দুর্গতি,
মর্ম্ম দাহনে পুড়ি দিবা রাতি,
আজিকে কয়টি ভাই
করেছে প্রতিজ্ঞা, মুসলেমগণে
মানুষটি করা চাই!

৬

সাহিত্য–কুঞ্জের কুসুম–রতন,
করিয়া তাঁদের হৃদয় হরণ,
মোহিছে সকাল সাঁঝে;
স্নিগ্ধ মধুর শান্ত এ দান
লভিয়া তাঁহারা নূতন প্রাণ
গড়িবে বঙ্গের মাঝে।

৭

করিয়া যতন জাগাবে জাতি,
মুস্‌লিম হৃদয়ে জ্ঞানের ভাতি
ফুটাবে আঁধার নাশি;
ধরম করম জ্ঞান বিজ্ঞানে,
সাহিত্য–সেবার সুধারস দানে
হাসাবে মধুর হাসি।

৮

সাহিত্য–কুঞ্জের কোকিল তাঁরা
সুমধুর গানে মাতায়ে ধরা,
এসেছে মুস্‌লিম হলে;
শুনি সে কথা মর্ত্ত্যে উষাবালা
এসেছে হর্ষে, লয়ে ফুলমালা
পরাতে তাঁদের গলে।

৯

ঢাকার বক্ষের দুইটি তারা
তসদ্দুক, রহমান দিয়েছে সাড়া,

www.pathagar.com

উঠাতে জাতির কূলে ;
ওদুদ, হোসেন, কাদের
আনোয়ারুল কাদির সনে এদের
নামিছে সাগর জলে।

১০
ইংরেজী উর্দ্দুতে অগাধ পণ্ডিত
হলেও তাঁহারা, বাংলায় সঙ্গীত
গাইবে বাসনা মনে ;
সুমধুর মাতৃ-ভাষা বাঙ্গালা বিহনে
পারিবে না জাগাইতে নিদ্রিত মুসলিম
বুঝেছেন এতদিনে।

১১
এতই যে তাঁহারা সকলে মিলিয়া
সাহিত্য-সাধনার মধ্য দিয়া
জাতিরে তুলিতে চান ;
'সাহিত্য-সমাজ' করিয়া গঠন
ডাকিছে সবায় করিয়া যতন
রাখিতে জাতির মান।

১২
সেই সাধনার অর্ঘ্য হ'বে,
পবিত্র সুন্দর আছে যা'ভবে,
বঙ্গ মাতার দান ;
জনমি আমরা যেভাবে প্রথম
ডাকিতে শিখেছি মায়েরে আপন
হরষে ভরিয়া প্রাণ।

১৩
উর্দ্দু পারশী কিম্বা আরবী ভাষা,
কভু নহে মোদের মাতৃ-ভাষা,
বঙ্গ যে জনম ভূমি ;
জনমি হেথায় বলেছি প্রথম,
বাংলা ভাষায় কিবা অতুলন,
'মা' শব্দ মধুর বাণী।

www.pathagar.com

১৪

তাঁহারা সকলে মিনতি করিয়া
বলিছে ভাইকে দু'হাতে ধরিয়া
উঠরে থেক না ঘুমে ;
উঠি তাড়াতাড়ি করিয়া যতন,
শিক্ষা ক্ষেত্রে এবে হও আগুয়ান
নাশ হ অজ্ঞান ধূমে।

১৫

শত বাধা-বিঘ্ন চরণে মথিয়া
শিক্ষার দিকেতে পড়িলে ঝুঁকিয়া
লভিবে মানিক মতি ;
ধরমে করমে জ্ঞান গরিমায়,
উন্নতি-শিখরে উঠিবে নিশ্চয়,
ফুটিবে শান্তির ভাতি।

১৬

শায়েস্তা খাঁ, ইসলাম খাঁ নবাব রতন
ছিল যার বক্ষ ! মাঝে হয়ে জ্যোতিমান
মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম ;
অতীত-গৌরব সেই মুসলিম-নগরী।
জাহাঙ্গীরাবাদ ; আজি শোক দুঃখে পুড়ি
হের দহিছে মরম।

১৭

লালবাগ দুর্গে এবে ভগ্ন কলেবরে
দাঁড়াইয়া থাকি যার বক্ষের উপরে
দিবস শর্ব্বরী ;
শায়েস্তা খাঁ নবাবের বিপুল বিক্রম
ছিল কত বঙ্গে তাহা করি বিঘোষণ
ফেলিছে নয়ন-বারি।

১৮

শায়েস্তা খাঁ নবাবের হৃদয় প্রসূন
পরী বিবির শেষ চিহ্ন সমাধি-ভবন
বিষণ্ন বদনে হায় !

www.pathagar.com

দাঁড়াইয়া যার বুকে করিছে ঘোষণ
জীবন, যৌবন, ধন বৃথা আস্ফালন
মরু–মরীচিকা প্রায় !

১৯

নাহি আর শৌর্য্য বীর্য্য বিষয় বৈভব
হারাইয়া ঢাকা তার অতীত–গৌরব
ভুগিতেছে দুঃখ রাশি।
হেরি তাহা বুড়িগঙ্গা আকুল পরাণ
গাহিতেছে জল–তরঙ্গে বিষাদের গান
কাঁদায়ে দুকূল–বাসী।

২০

নবাব আবদুল গণি, সলীম
ছিল যার বক্ষমণি শশাঙ্ক প্রতিম
বঙ্গভূমি উজলিয়া।
করেছেন ধর্ম্ম কর্ম্ম বহু অর্থ দান,
জাতির উন্নতি তরে সতত যতন,
কায়মন সমর্পিয়া।

২১

তাঁদের বংশের গৌরব–কেতন
হাবিব, নাজিম, আরো সুধীজন
আলোকিত যাহার বুক ;
ইসলাম–গৌরব, জাতির সম্মান,
রাখিছে সতত করি প্রাণপণ,
পরিহারি নিজ সুখ।

২২

নয়ন–মোহন মস্‌জিদ শত,
দাঁড়ায়ে যাহার বুকে অবিরত,
বলিছে মানব কুলে ;
ইসলাম পবিত্র–মহান উদার
কেবলই শান্তি, সাম্যের আধার
এস হে উহার কোলে।

www.pathagar.com

২৩

আওলিয়া, দরবেশ, শাহ সুফীগণ
যার বক্ষ মাঝে অই করিয়া শয়ন
লভিছে অনন্ত সুখ ;
ভকতি বিশ্বাস লয়ে শত শত জন
আসিয়া করিছে সেই সমাধি দর্শন
নাশিতে হৃদয় দুঃখ।

২৪

সেই নগরী 'ঢাকা' মোসলেম গৌরব,
নাই আজি তার বুকে মোসলেম বৈভব,
ধনরত্ন শৌর্য্য বীর্য্য নাহি আর হেথা ;
মোসলেম–গৌরব–রবি চিরকাল তরে
নিভেছে, হেরিয়া তাই হৃদে পেয়ে ব্যথা
কাঁদিতেছে দিবা নিশি ;
শত দুঃখ কষ্ট তার অশ্রুরূপে গলে
গড়ায়ে পড়েছে যেন বুড়িগঙ্গা–জলে
নিবারিতে শোক রাশি।

২৫

আসিয়াছ হেথা আজি মিলন মন্দিরে
মুস্‌লেম সুধীজন ; করি আবাহন—
তোমরা যে মুসলেমের অমূল্য রতন
কি দিয়া তোষিব আজি তোমা সবাকারে ;
নাই যে মোদের ঘরে রজত কাঞ্চন
মণি মুক্তা চুণী পান্না হীরা জহরত ;
আছে শুধু একমাত্র স্বর্গীয় রতন
ভকতি কুসুম সদা হৃদে বিরাজিত।
দীনহীন ঢাকাবাসী—সাহিত্য–কুঞ্জের
দয়েল পাপিয়া কোকিল পেয়ে নিজ ঘরে
মালা গাঁথি সেই ফুলে আনিয়াছি এবে
পরা'তে তাঁদের কণ্ঠে প্রফুল্ল অন্তরে।
লও সবে কৃপা করে গরীবের দান,
শুভুক সুন্দর হয়ে স্বর্গীয় মহান্।

www.pathagar.com

২৬

বাজায়ে সেতার এস্রাজ মুরজ বীণে
গাও আজি সবে মিলি উত্থান গান ;
ভৈরবী মল্লার আর দীপকের তানে,
জাগাও বিশ্ববাসী মোস্‌লেম পরাণ।
টেনে আনি পথ হারা মুসলেম সবায়,
জ্ঞানালোক প্রদানিয়া সাহিত্য বিজ্ঞানে
করিবারে সমুন্নত এই বসুধায়,
করিয়াছ যে বাসনা এ শুভ লগনে
সাফল্য মণ্ডিত হবে খোদার ফজলে,
তোমাদের সে উদ্দেশ্য এই মহীতলে।

'যুগধর্ম্ম ধর্ম্মগুরু ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জননী। জীবনের বহু ভঙ্গিমতায় সে যুগধর্ম্মের প্রকাশ। যে ধর্ম্মশাস্ত্র এই প্রকাশ লালায়িত যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করে সে ধর্ম্মশাস্ত্র মানুষের কাজে না লেগে কীটের খাদ্যে পরিণত হয়।'

—হুসেন

www.pathagar.com

বার্ষিক বিবরণী

সম্পাদক

যে জাতির সাহিত্য নাই তাহার প্রাণ নাই—আবার যে জাতির প্রাণের অভাব সে জাতির ভিতর সত্যকার সাহিত্য জন্মলাভ করতে পারে না। এ কথাটি ভাল করে বুঝবার মত শক্তি বোধহয় বাঙ্গালী মুসলমানের এখনও হয় নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গালী মুসলমানের সকল দৈন্যের কারণ প্রাণের অভাব—আর সে অভাবের কারণ যে সাহিত্যের অভাব সে কথা বুঝিয়ে বলবার সময় বোধহয় আমাদের আর নাই। এই সাহিত্যের অভাব ঘুচাবার জন্য আজও আমাদের সমাজে কোন সত্যকার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে বোধ হয় না। সে অনুষ্ঠান সৃষ্টি করতে হলে সর্ব্বাগ্রে চাই আমাদের জীবনকে সরস, সুন্দর ও বৈচিত্র্যবিপুল করে তোলা ; আমাদের যুগযুগান্তের আড়ষ্ট বুদ্ধিকে মুক্ত করে জ্ঞানের অদম্য পিপাসা জাগিয়ে দেওয়া। কিন্তু তা তো রাতারাতি হওয়া অসম্ভব। সে জন্য একখানি গৃহনির্ম্মাণ বা একটি আলমারী কিনে নূতন পুরাতন কতকগুলি পুস্তক ভরতি করলেই যে আমাদের অভীপ্সিত অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হবে তাও আমাদের ধারণার বহির্ভূত। যে জিনিষ থাকে তার কাটতিও থাকে—কিন্তু যে জিনিষ থাকে না তার জন্য ক্ষুধা সৃষ্টি করতে হয়। আজ আমাদের সাহিত্য নাই, তাই তার জন্য আগে ক্ষুধা সৃষ্টি করা আবশ্যক। এ জন্য যদি সহিষ্ণু চিন্তাশীল গুটিকতক লোক স্ব স্ব চিন্তাধারা একমুখী করে সমাজের নিস্পন্দ জীবনের উপর আঘাত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্ব স্ব জীবন সম্পদপূর্ণ ও আনন্দে ভরপুর করে তুলতে পারেন তবে সমাজের প্রাণ জেগে উঠতে পারে। সমাজপ্রাণ একবার জাগলেই তার ক্ষুধাও জেগে ওঠে—ক্ষুধা নিবারণের জন্য তখন বুদ্ধিও সজাগ হয়ে ওঠে এবং জ্ঞানের পরিধি ক্রমে বর্দ্ধিত হয়ে চলে। আমেরিকার বিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক জেম্‌স বলেন :

"The renovation of nations begins always at the top among the reflective members of the state and spreads outward and downward." অর্থাৎ জাতির নবজীবন শুরু হয় রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় চিন্তাশীল নাগরিকগণের মধ্যে—তাঁদের গুটিকয়েক ব্যক্তির চিন্তাস্রোতই ক্রমে সমাজের নিম্নস্তরে ও চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হয়ে চলে এবং কালক্রমে উহা সমস্ত সমাজকে পুনর্জীবিত করে তোলে। আজ আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণকে সম্মিলিত করে তাদের চিন্তাধারা কেন্দ্রীভূত করতে হবে। আর সে চিন্তাধারা প্রকাশ করতে হবে বিপুল জনসংঘের ভাষায়। তবেই সমাজের কর্ণে তা পৌছুবে। সেই ভাষাই হচ্ছে সে চিন্তাস্রোতের নদীগর্ভ।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে স্নেহাস্পদ শ্রীমান আবদুল কাদের প্রমুখ আমাদের কয়েকজন নবীন সাহিত্য-প্রাণ বন্ধু মিলে গত বৎসর ১৯শে জানুয়ারী শ্রদ্ধাস্পদ মৌঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবের পৌরোহিত্যে এই সাহিত্য সমাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার ১১ দিন পরে

www.pathagar.com

এই শিশু সমাজের জাতক্রিয়ার পৌরোহিত্য করেছিলেন একজন কুলীন ব্রাহ্মণ—আমাদের চুলপাকা নবীন গল্পনিপুণ শ্রদ্ধেয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

প্রথম অনুষ্ঠান সভায় মাত্র পাঁচ জনের উপর এই সমাজের ভার অর্পিত হয়। মৌঃ এ. এফ. এম. আবদুল হক, মৌঃ আনোয়ার হোসেন, মৌঃ আবদুল কাদের, মৌঃ এ. জেড. নূর আহমদ ও সম্পাদক। মজা এই যে কোন সভাপতি নির্ব্বাচিত হন নাই; কিম্বা কোন বিধি উপবিধিও রচিত হয় নাই ; কিম্বা কোন চাঁদাও নির্ধারিত হয় নাই। যৎকিঞ্চিৎ সাহিত্যানুরাগই এই সমাজের চাঁদার হার। এই সমাজের প্রধান উদ্দেশ্য চিন্তা চর্চ্চা ও জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও রুচি সৃষ্টি এবং তদুদ্দেশ্যে জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে নবীন পুরাতন সর্ব্বপ্রকার চিন্তা ও জ্ঞানের সমন্বয় ও সংযোগ সাধন। এই উদ্দেশ্য সাধন কল্পে গত বৎসর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হইয়াছে। বিষয় কয়টি এই—

১. রবীন্দ্র কাব্যের স্বরূপ—মৌঃ এম. তাহেরুদ্দিন
২. শতকরা পঁয়তাল্লিশ—মৌঃ আবুল হুসেন
৩. সম্মোহিত মুসলমান—মৌঃ কাজী আবদুল ওদুদ
৪. বাহাই ধর্ম্ম—মৌঃ আবুল ফজল
৫. সাহিত্যে সৃষ্টি—শ্রীযুক্ত বাবু হেমন্তকুমার সরকার
৬. হিন্দু মুসলমান সমস্যার একটা দিক—মৌঃ আনোয়ারুল কাদির
৭. ইমদাদুল হক্ স্মরণে—মৌঃ কাজী আবদুল ওদুদ
৮. বাংলা বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষার বাহন—মৌঃ খোন্দকার ফয়জুদ্দিন ও মৌঃ আবুল হুসেন

দুঃখের বিষয়, ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে পরলোকগত স্বজাতিবৎসল স্বামী শ্রদ্ধানন্দজীর নৃশংস মৃত্যু সংবাদে সমাজের ষষ্ঠ অধিবেশন স্থগিত হওয়ায় মৌঃ আনোয়ারুল কাদির সাহেবের সন্দর্ভটি পঠিত ও আলোচিত হয় নাই। সমাজের তৃতীয় অধিবেশন প্রধানতঃ স্বর্গীয় কাজী ইমদাদুল হক্ সাহেবের শোক প্রকাশের জন্যই হয়েছিল। সেই সভায় তাঁর একখানি 'জীবন আখ্যায়িকা' রচনা করবার জন্য একটি ছোট কমিটি গঠিত হয়েছিল। সেই কমিটির একটি বৈঠকে তাঁর জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করবার জন্য উপায় নির্দ্ধারিত হয়েছিল এবং সেই উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তাঁর বন্ধুবান্ধবের মধ্যে কেহই আমাদের ঐ কার্যে সাহায্য করেন নাই। সুতরাং আমরা যা জানি তা নিয়ে তাঁর একখানি জীবনী লেখার জন্য উক্ত কমিটি প্রয়াসী হয়েছেন।

এই পর্য্যন্ত বল্‌লেই বোধ হয় সমাজের এক বৎসরের কাজের হিসাব দেওয়া হয়ে যায়। কারণ আয় ব্যয়ের ত কোন হাঙ্গামা ছিল না। কিন্তু আমার মনে হয় এই সম্মিলনে আমাদের সমাজের চিন্তাধারা কোনপথে চলতে চায় তার কিছু ইঙ্গিত দেওয়া উচিত। তা করতে হলে আলোচিত বিষয়গুলির সারমর্ম্ম খুব সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

'রবীন্দ্রকাব্যের স্বরূপ' প্রবন্ধে লেখক রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিপুল বৈচিত্র্য-বিলাসী প্রাণের প্রকাশ কিরূপ করে হয়েছে তাই বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখিয়েছিলেন। তাঁর প্রবন্ধের আলোচনায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ যোগ দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

১. মৌঃ এ. এফ. এম. আবদুল হক :
তিনি রবীন্দ্রনাথ ও কবি হাফিজের সহিত যে সাদৃশ্য আছে তা দেখিয়ে লেখকের তারিফ করেন।

২. মৌঃ আবদুল কাদের :
তিনি রবীন্দ্র কাব্যে চির যৌবনের আরতি ও অগ্রগতির সুরের কথা উল্লেখ করেন।

৩. মৌঃ রেজাই করিম :
তিনি বলেন, "রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসৌন্দর্যের পিপাসা তাঁকে চিরনবীন রেখেছেন। তিনি বিশ্বের প্রতি সৃষ্টিকণার সহিত আত্মীয়তা বোধ করেছেন ও তা প্রকাশ করেছেন। এইটাই আমাদের অনুকরণীয়।"

৪. মৌঃ কাজী আবদুল ওদুদ :
তিনি বলেন, 'বড় কবিকে বুঝতে হলে নিজের চিত্তকে শত দিকের খাদ্য সংগ্রহে ছড়িয়ে দিয়ে পুষ্ট করে তুলতে হবে। বড় কবিকে বুঝতে হলে বড় চিত্ত চাই। তা আমাদের কৈ? জীবনের নানা দিকে রবিবাবুর চোখ পড়েছে—তাঁর চিত্ত বিশ্বের রূপ রস গন্ধে ভরে উঠেছে—তাই তিনি খোদার ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হয়েছেন এবং মানুষের কর্ম্মশক্তিতে তাঁর বিশ্বাস জেগেছে।'

৫. সভাপতি—চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি বলেন, "আজ আমি 'মুসলিম সাহিত্যসমাজে'র পৌরোহিত্য করতে এসে অত্যন্ত আশান্বিত হয়েছি।

এই 'সমাজে'র দ্বারা যে আমাদের রাষ্ট্রীয় অনৈক্য অনেকখানি দূরীভূত হবে তা আশা করা কঠিন নয়। হিন্দু ও মুসলিম কৃষ্টির (culture) সমন্বয়েই আমাদের মুক্তি। যাক্, রবীন্দ্রনাথ আমাদের এ যুগের Representative man, এই 'সমাজে'র প্রথম অধিবেশনেই তাঁর কাব্যের আলোচনা শুভ লক্ষণ সূচনা করেছে। তাঁর কাব্য হতে আমরা এই শিক্ষালাভ করি যেন সংস্কারকে ডিঙ্গিয়ে মনকে মুক্ত করে সত্যকে ও মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারি।'

'শতকরা পঁয়তাল্লিশ' প্রবন্ধে লেখক বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনের উপর সরকারের এই ব্যবস্থা কতখানি কুফল বিস্তার করবে তাই দেখিয়েছেন। শতকরা পঁয়তাল্লিশের মোহে আমাদের নবীন সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষা ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর হবে ; কর্ম্মস্রোতে ভাটা পড়বে ; মন সংকীর্ণ হবে ; মস্তিষ্ক শ্রমবিমুখ হবে। তারা জীবন সমস্যার জন্য ক্ষমতা অর্জ্জনে পরাঙ্মুখ হবে। সমাজের মধ্যে বিভিন্ন দিক হতে জীবনের স্রোত আনবার সকল চেষ্টা ক্রমে ক্রমে রুদ্ধ ও শিথিল হয়ে যাবে। এই কথাটা নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিয়ে 'শতকরা পঁয়তাল্লিশ' যে আমাদের ভবিষ্যত উন্নতির অন্তরায়, লেখক প্রাণ দিয়ে তা অনুভব করে এই প্রবন্ধে প্রকাশ করেছেন।

এই প্রবন্ধে লেখক যে মত প্রকাশ করেছেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনাটা একটু তীব্রই হয়েছিল।

১. মৌঃ আনোয়ার হুসেন বলেন, 'বিশেষ ব্যবস্থা (concession) দুর্ব্বলতার পরিচায়ক—এতে আমরা ক্রমশঃ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে একেবারেই চেষ্টা করছি না। তবে Concession তুলে দেওয়ার সময় আসেনি।'

www.pathagar.com

২. মৌঃ এ. জেড. নুর আহমদ বলেন, 'কর্ম্মী হতে হবে—তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অন্তরায়। নব প্রবর্ত্তিত মদ্রাসা শিক্ষার ফল অনেক ভাল।'
৩. মৌঃ আবদুল ওদুদ বি. এ বলেন, 'শিশুদিগকে বাঁচাতে হলে যেমন Protection চাই তেমন মুসলমানকে বাঁচাতে হলে Concession চাই; নতুবা Competition-এর চাপে সে পিষে যাবে।'
৪. মৌঃ কাজী আবদুল ওদুদ এম. এ. বলেন, 'আজ individual-এ individual-এ সংঘর্ষ নাই; আজ সংঘর্ষ class-এ class-এ। আর সে classকে শক্তিশালী করে তার গুটি কয়েক গগনচুম্বী প্রতিভা। শুধু mediocre নিয়ে জাতি বাঁচে না। Concession সে প্রতিভার অন্তরায়। ইহাতে কেবল mediocreই সৃষ্ট হবে। সুতরাং অবশেষে অন্যান্য জাতির সংঘর্ষ যখন প্রবল হবে তখন concession লালিত আমরা কিছুতেই টিকে থাকতে পারব না। আজ লেখক যে পথ দেখাচ্ছেন সে পথ বিপদ-সঙ্কুল সন্দেহ নাই, কিন্তু সে পথ দেখিয়ে তিনি যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। আজ যাঁরা এইরূপ দুঃসাহস ও ভুলের পরিচয় দেবেন তাঁদের নির্দ্দেশিত পথের পথিক আমাদের হতে হবে। নতুবা ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'
৫. মৌঃ মুহম্মদ ইসমাইল বি.এ. বলেন, 'আজ নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হয়েছে। আমরা ক্রমেই দুর্বলতার পথেই চলেছি। কনসেসন আমাদের আরও দুর্বল করবে। Bengal partition-এর কথা মনে পড়ে কি? কে তা তুলে দিল? পূর্ব্ববঙ্গের শতকরা ৭৫ জন মুসলমানের কান্নাকাটি বিফলে গেল কেন? আমাদের সমাজে towering genius জন্মাচ্ছে না কেন? লেখক আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে concesson তার একটি কারণ বলে নির্দেশ করে ভবিষ্যতের মঙ্গলের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে বলছেন। সে জন্য তিনি ধন্য-বাদার্হ।'
৬. শ্রদ্ধেয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, 'কে এত কটু কথা এমন মধুর করে বলতে পারে? যে নিতান্ত আত্মীয়। আমাদের ভারতীয় জাতি রসাতলে যাচ্ছে। আপনারা হয়ত আমাকে সন্দেহ করবেন কারণ আমি হিন্দু—লেখক মহাশয় তা বলেই দিয়েছেন যে 'আমরা কনসেসন চাই হিন্দুকে সন্দেহ করি বলে।' কনসেসন আকাঙ্ক্ষাকে ক্ষুদ্র করে। আকাঙ্ক্ষা যেখানে ক্ষুদ্র, আত্মা সেখানে ক্ষুদ্র, চিত্ত সেখানে দুর্ব্বল হয়ে যায় এবং মনুষ্যত্ব সংকুচিত হয়ে ওঠে।'
৭. সভাপতি খাঁ সাহেব আবদুর রহমান খাঁ বলেন, 'লেখক আজ দার্শনিকের মত নির্ভয়ে কথা বলেছেন। Practical politician ছোট সত্যকে আঁকড়ে ধরে আর দার্শনিক বড় সত্যকে প্রতিষ্ঠা করে। আজ লেখকের উপসংহার হতে আমি আপনাদিগকে এই কথা গলা ছেড়ে বলতে চাই যে, আমাদের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত ক্ষুদ্র হয়ে যাচ্ছে। আপনারা সেই আকাঙ্ক্ষাকে উচ্চ হতে উচ্চে উন্নয়ন করুন।'

স্বর্গীয় কাজী ইমদাদুল হক সাহেবের স্মৃতিসভায় তাঁর উদ্দেশ্যে আমাদের তিন জন ছাত্রবন্ধু তিনটি কবিতা পাঠ করেন।

www.pathagar.com

১. মুজমাদার মুহম্মদ ইদ্রিস (২) বিলায়েত আলি খাঁ (৩) মুহম্মদ আবদুল হক ; এবং দুইটি প্রবন্ধ পঠিত হয়—(১) কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবের 'ইমদাদুল হক স্মরণে' ও (২) এম, তাহেরুদ্দীন সাহেবের 'স্মৃতি-তর্পণ'।

কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব পরলোকগত কাজী সাহেবের সাহিত্য-সেবা, সুরুচি মার্জ্জিত বুদ্ধি, মুক্ত সংস্কার, শিষ্টাচার, প্রশস্ত অন্তর প্রভৃতি সম্বন্ধে বেশ কতকগুলি কথা শুনিয়েছিলেন। এ স্থলে তার বিস্তৃত বিবরণ অনাবশ্যক। কারণ এই প্রবন্ধটি লেখকের 'নব পর্য্যায়' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

স্মৃতি তর্পণে স্বর্গীয় কাজী সাহেবের সাহিত্য সেবা সম্বন্ধে বিবৃত হয়। অনেকেই তাঁর জীবন নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেন। সকলেই একমত হন যে, তিনি বাঙ্গালী মুসলমানের আড়ষ্ট বুদ্ধির দরজায় আঘাত না করে নিজের জীবনে মুক্তবিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে জীবনকে বেশ সরস সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ করে তুলছিলেন। সেই হিসাবে বাঙ্গালী মুসলমানের এই যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর আদর্শটি অনেক মূল্যবান।

এই শোক সভার শেষভাগে 'বাংলা বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত' এই কথার আলোচনা শুরু হয়। মৌঃ মুঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেব একথা বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলে মৌঃ খোন্দকার ফয়জুদ্দীন সাহেব উহা সমর্থন করতে গিয়ে নাতিদীর্ঘ একটি সন্দর্ভ পড়েন। তারপর স্যার আবদুর রহিমের উক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করার ভয়েই হোক বা তাঁর উক্তির প্রতি শ্রদ্ধা করেই হোক সমবেত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে এ সম্বন্ধে একটু চাঞ্চল্য দেখা যায়। তখন অগত্যা সভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়।

'সাহিত্যে সৃষ্টি' সম্বন্ধে বাবু হেমন্ত কুমার সরকার বলেন 'আমাদের সাহিত্যে প্রাণের অভাব ঘটেছে সে জন্য কোন নবসৃষ্টি হচ্ছে না। একা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎবাবুর কতকটা বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যে বর্ত্তমানে কোনও সৃষ্টি চোখে পড়ে না। তার কারণ আমাদের জাতীয় সমস্যা অনেক কম। রাষ্ট্র সমস্যাই আমাদের সমস্ত দৃষ্টি ঘুলিয়ে দিয়েছে। গৃহ ও সমাজের কোন সমস্যা রূপ পরিগ্রহ করে নাই। বাঁধাবাঁধির জন্য কোন সমস্যা মাথা তুলতে পারে না। জাতির জন্মের প্রসব বেদনাই সাহিত্য সৃষ্টি করে। সে প্রসব বেদনার জন্য চাই চিন্তাশীল সাহিত্যিকের কেন্দ্রীভূত চিন্তা ও তপস্যা। তাও আমাদের হওয়ার উপায় নেই Indian Penal Code-এর নিস্পেষণে আজ আমাদের সাহিত্য অত্যন্ত অনুকরণ চলেছে যে অনুকরণে সৃষ্টি নাই। আজ যে Freedom movement করছি তা আমাদের জীবনের উৎস থেকে ওঠে নি। আমরা পশ্চিমকে একটুখানি অনুকরণ করছি, যেমন পোষাক পরিচ্ছদ, কথাবার্ত্তা, চলাফেরায় পশ্চিমকে অনুরকরণ করেছি। আবার আমাদের সাহিত্যিকগণ বড় ঘরের সন্তান। তাঁরা আমাদের ছোট ঘরের দুঃস্থজীবনের সঙ্গে পরিচিত নন বলে তাদের সঙ্গে তাঁরা কোন সহানুভূতি করতে পারেন না। তাদের জীবন আজ আমাদের সাহিত্যে আঁকতে হবে। তাদের সেই অন্ধকার কুটিরে হয়ত বা কত প্রতিভার আবির্ভাব হত। তারা আমাদের বড় ঘরের খেয়াল খোশ মেজাজ রক্ষা করতে ব্যস্ত। তাদের জীবনে অবসর কৈ? অবসর সাহিত্য সৃষ্টির একটা উপকরণ। আজ তাই আমাদের সমগ্র সমাজ মনকে প্রাণের রসে সিঞ্চিত সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। নতুবা সাহিত্য গজাবে না।' এই সভায় কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব তাঁর বিখ্যাত কয়েকটি গান গেয়ে সভাগৃহ আনন্দে পূর্ণ করেছিলেন।

www.pathagar.com

'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের দুরবস্থার কারণ নির্দ্দেশ করতে চেষ্টা পেয়েছেন। তিনি বলেন, "আজ আমাদের বুদ্ধি নিঃসাড় হয়ে পড়েছে—আমরা স্থূল বিশ্বাসে জড়িয়ে গিয়ে বুদ্ধির ঘরে তালা দিয়ে রেখেছি। কয়েকটি ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে আমরা দুনিয়ার এত ভাঙ্গাগড়া, পরিবর্ত্তন, আবর্ত্তন কিছুতেই সাড়া দিতে চাই না। ইসলাম আজ শত শত বৎসর ধরে চলেছে নানা দেশ, নানা আবহাওয়া, নানা জাতির মধ্য দিয়ে—তাতে তাকে দেশ কালের প্রভাবে কিছু কিছু স্বরূপ বদলাতে হয়েছে। আজ আমরা তা না স্বীকার করে ইসলাম, ইসলাম বলে ধর্ম্মের জোশ ও বড়াই প্রকাশ করি। আজ আমাদের ইসলামের গৌরব রক্ষা করতে হলে যুগধর্ম্মের সত্যকে আশ্রয় করতে হবে এবং সেই সত্যে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। তবেই ভরসা।'

এ প্রবন্ধ লেখকের 'নবপর্য্যায়ে'র মেরুদণ্ড বললে অত্যুক্তি হবে না। কাজেই উহার বিস্তৃত আলোচনা এ স্থলে অনর্থক। পরিতাপের বিষয়, এ প্রবন্ধের কোন সমালোচনা হয় নাই।

'বাহাই ধর্ম্ম' প্রবন্ধে মৌঃ আবুল ফজল সাহেব স্বীয় উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। আধুনিক মুসলমানদের আচার অনুষ্ঠানের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে বাহাউল্লা বাহাই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন। বাহাই ধর্ম্মের মূল মন্ত্রগুলি ইসলামের নব সংস্কার বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। লেখক সাহেব প্রথমতঃ ধর্ম্মের উৎপত্তির কারণ একটু আলোচনা করে বাহাই ধর্ম্মের উৎপত্তি ও প্রচার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। প্রবন্ধটি মাঘের ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এ স্থলে তার বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

ছয়জন এই প্রবন্ধ সমালোচনা করেছিলেন। সকলেই লেখকের কথাগুলি বিশদ করে বলারই চেষ্টা করেছিলেন। প্রবন্ধটি অনেকটা ঐতিহাসিক। সুতরাং চিন্তার দিক দিয়ে কিছুই আলোচনা করবার ছিল না। সবাই বাহাই ধর্ম্মের মূল তথ্য কটি শুনে বললেন, 'এ ত ইসলামেরই এক নব শাখা, বাহাই ধর্ম্মই ইসলামের ভবিষ্যত ইঙ্গিত করছে।'

অতঃপর সভাপতি খাঁ সাহেব আবদুর রহমান খাঁ বলেন, 'বাহাই ধর্ম্ম ইসলামের উপর এক আঘাত সূচনা করে। আমরা স্থির হয়ে আছি। কিন্তু যুগধর্ম্ম চায় আমরা নড়ি। বাহাউল্লা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, ইসলামের নব ব্যাখ্যা না হলে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমগ্র মানব সমাজ তাকে গ্রহণ করতে পারবে না। যুগধর্ম্মের নব বেদনায় ইসলামকে আজ উদ্বোধিত করতে হবে। সেজন্য আমাদিগকে জাগতে হবে। কিন্তু সে জাগরণের জন্য চাই সেই নির্ভীক বীর, যে ইসলামকে আজ পুনঃপুন আঘাত করতে কুণ্ঠিত হবে না। সেই আঘাতেই ইসলামের সত্য নবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করে মানব জাতির কল্যাণের পথ প্রশস্ত করবে। বাহাই ধর্ম্মের আলোচনা হ'তে আমি এই কথাটিই আপনাদের মনের উপর বসাতে চাই।'

আপনারা এখন বুঝতে পারলেন, এই 'সমাজ' কি চায় এবং কোন পথ ধরতে চাচ্ছে। গতানুগতিক পথ হ'তে আমাদিগকে ফিরতেই হবে একদিন। কিন্তু সে নিদারুণ লজ্জা ও ব্যর্থতার জন্য অপেক্ষা না করে আজ আমাদের সাবধান হতে হবে। এই 'সমাজ' সেই কথা প্রচার করতে চায়।

আপনাদের কেহ কেহ হয়ত মনে করবেন এ 'সমাজে'র নাম 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' হওয়ায় হিন্দু সাহিত্যিকগণের কোন সম্পর্ক এতে নাই। কিন্তু এই বার্ষিক বিবরণ হতে আপনারা

www.pathagar.com

বুঝবেন যে এ সমাজ কোন একটি বিশিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। কিংবা এ কোন এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গঠিত হয় নাই। সাহিত্য সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য ; আর সেই সাহিত্য মুসলমানের প্রাণ ও জীবন ফুটিয়ে তোলাই ইহার অন্যতম উদ্দেশ্য। আশা করি আপনারা এই এক বৎসর বয়স্ক শিশুর সুদীর্ঘ জীবন কামনা করবেন ও সহানুভূতি দ্বারা একে পুষ্ট করতে সহায় হবেন।

আমার এ বিবরণ সম্পূর্ণ হবে না যদি আমি এ স্থলে আমাদের নবীন গায়ক ও কর্ম্মীদের উদ্দেশ্যে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ লিপিবদ্ধ না করি। শ্রীমান অর্দ্ধেন্দু ভূষণ মুখোপাধ্যায় ও গোলাম আহমদ 'সমাজে'র প্রত্যেক অধিবেশনে সঙ্গীতালাপ করে সভার আনন্দ বর্দ্ধন করেছেন। এতদ্ব্যতীত আবদুল কাদির, নূর আহমদ, আনোয়ার হোসেন ও আবদুল হকের ঐকান্তিক চেষ্টা ও যত্ন বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। তাদের একাগ্রতা ব্যতীত 'সমাজে'র কোন কাজই সম্ভবপর হত না। তারাই এ 'সমাজে'র প্রাণ বললে অত্যুক্তি করা হবে না। খোদা তাদের ঐক্য ও একাগ্রতা আরও দৃঢ় করুন যাতে করে এ 'সমাজ' উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে ধাবিত হতে পারে।

www.pathagar.com

বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা

কাজী আবদুল ওদুদ এম. এ.

বাংলার লোকদের দোষ-ত্রুটি নিশ্চয়ই খুব কম নয়। তবু মনে হয়, এদেশের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরেই লেখা থাকবে, কেননা অপেক্ষাকৃত অল্প কালের ব্যবধানে মানুষের চিত্তের অপূর্ব্বতার নব নব প্রকাশ এদেশে ঘটেছে। কিন্তু বাংলার ঐতিহাসিককে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, বাংলার গৌরবসামগ্রী এই যে সমস্ত আন্দোলন, যেমন বৈষ্ণব আন্দোলন, ব্রাহ্ম আন্দোলন, স্বদেশী-আন্দোলন ইত্যাদি এ সমস্তের অন্তরে মুসলমান নামধেয় বাংলার এক বিশাল মানব সমাজের কি দান, তাহলে মোটের উপর তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন ভিন্ন তাঁর হয়ত আর গত্যন্তর থাকে না।

বাংলার মুসলমানের আত্মপ্রকাশের এই দীনতা লক্ষ্য করেই আমাদের কোন কোন সমালোচক বলতে চান—বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা, আর্থিক-সমস্যা, শিক্ষা-সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্নভাবে বিচার করে দেখবার অবসর কোথায়? সেই গোটা সমাজটাই যে একটা সমস্যা।

এই শ্রেণীর সমালোচকদের কথার গুরুত্ব অনেকেই উপলব্ধি করবেন সন্দেহ নাই। বাংলার মুসলমান সমাজের বয়স কম নয়, অন্যূন সাত আট শত বৎসর হবে ; এই দীর্ঘ কালেও সে সমাজ যদি এমন কোনো শক্তিমানের সূতিকাগার না হয়ে থাকে—যাঁর কর্ম্ম প্রেরণায় সেই সমাজের লোকদের অন্তরে নব নব আশা ও উম্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে ও অন্যান্য সমাজের লোকের চিত্তে শ্রদ্ধা ও আনন্দ জেগেছে, তা হ'লে তার অবস্থা শুধু শোচনীয় নয় অত্যন্ত চিন্তনীয়। তারই ইঙ্গিত ক'রে যদি কেউ বলেন, বাংলার মুসলমান-সমাজ হীন উপকরণে গঠিত, তবে তাতে শুধু অসহিষ্ণু হয়ে আর কি লাভ হবে।

কিন্তু বাস্তবিক কি বাংলার ইতিহাসে মুসলমানের কিছুমাত্র দান নাই? সেকালের মুসলমান নবাব-বাদশাদের দানের কথা ধরতে চাই না ; বাংলার সাধারণ মুসলমান, যাঁরা পুরুষানুক্রমে এই বাংলার মাটির উপর জন্মেছেন ও শেষে এই মাটিতেই দেহরক্ষা করেছেন, তাঁরা কি সর্ব্বপ্রকারে এতই দরিদ্র ছিলেন যে শুধু প্রাণ-ধারণের অতিরিক্ত কোন-কিছু কল্যাণকর কাজে আত্মনিয়োগ করবার সৌভাগ্য তাঁদের হয় নাই যাতে করে শনৈঃ-শনৈঃ-গ্রথিত দেশের ভাব ও কর্ম্মসৌধে তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত থাকতে পারে? এই প্রশ্নটি এক সময়ে আমাকে কিছু বিব্রত করেছিল। কিন্তু শীঘ্রই এই কথাটি বুঝে আনন্দিত হয়েছিলাম যে, বাংলার উপর মুসলমান তরু শুধু নিষ্ফল হয়ে দাঁড়িয়ে নাই। অতীতের কুক্ষি ঘেঁটে দেখবার তেমন সুযোগ আমার হয় নাই, তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে দেখতে পাই, বাংলা স্মরণীয় নীল-বিদ্রোহে প্রধানতঃ মুসলমান চাষীই লড়েছিল, অন্যায়ের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে প্রাণপণ বলে সে-ই বলেছিল—'মানব না'। স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'নীল দর্পণে' এক 'তোরাব'কে অমর করেছেন। কিন্তু মুসলমান চাষী সম্প্রদায়ে 'তোরাব' একশ্চন্দ্র নয়, বহু

www.pathagar.com

নক্ষত্রের অন্যতম। আর বহুদেববিহীন, অস্পৃশ্যতা-নির্ম্মুক্ত মুসলমান সমাজের কোলেই এই 'তোরাব'-এর দল শোভে ভাল।

এই নীলবিদ্রোহের মুসলমান চাষীর কথার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার শিক্ষা বিস্তারে মহসীনের দানের[১] কথা, ঢাকা নগরীর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ঢাকার নবাবদের দানের কথা মনে হয়েছিল, আর তারই সঙ্গে মনে হয়েছিল, এঁরা ত মুসলমান সমাজে নিঃসঙ্গ নন। কি কারণে নিশ্চয় করে বলা শক্ত, ধনবান মুসলমানেরা ধনকে কোনদিন বহুমূল্য মনে করতে পারেন নাই, তার দানের ধারা অনায়াসে তাঁদের চার পাশে ছড়িয়ে পড়তে বাধা পায় নাই ; আর তাতে করে মানুষের অঙ্গনে নিত্যই নব নব আনন্দ-কুসুম ফুটেছে। একালের চাঁদমিয়া, ফাজেল মোহাম্মদ, মোহাম্মদ হোসেন প্রভৃতিরও দানের কথা যখন ভাবতে যাই তখন বুঝতে পারি, অর্থব্যয়ে চিরঅকাতরচিত্ত মুসলমানের এঁরা অযোগ্য উত্তরাধিকারী নন।—এই যে, মানুষের দল, মুখের ভাষা যাদের ভিতরে অকর্ম্মণ্য, কিন্তু যাদের জীবনের ভিতরে উপলব্ধি করা যায় যেন আদিম কর্ম্মের নীরব বীর্য্য, অথবা আদিম প্রকৃতির প্রাচুর্য্য, এদের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনবগত থাকা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু দেশের জীবনোৎসবে এদের সেবার স্পর্শ লাগে নাই, অথবা ভবিষ্যতে এদের এই প্রাণ-অবদান জাতির আঙ্গিনায় 'রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠ্‌বে না', একথা অবিশ্বাস্য বলে ভাবতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়।

২

সাহিত্য জীবন বৃক্ষের ফুল, জাতি বা সমাজ বিশেষের মগ্নচৈতন্যের রসের যোগানে তার বিকাশ ঘটে। সেই গূঢ় রস বাংলার মুসলমান সমাজের অন্তরে সঞ্চিত আছে কি না তাদের সাহিত্য-সমস্যার আলোচনা সম্পর্কে তার সন্ধান নিশ্চয়ই অপ্রয়োজনীয় নয়। কিন্তু শক্ত প্রশ্ন এই হবে, সাহিত্যে সেই রসের যোগ্য স্ফূর্ত্তি আমরা কবে দেখ্‌ব? এর উত্তরে যদি বলা যায়, তা কি করে বল্‌ব, তাহলে অনেকে শুধু বিরক্তই হবেন না, ক্ষুণ্ণও হবেন। কিন্তু এ ভিন্ন এ প্রশ্নের আর কিইবা উত্তর আছে? সাহিত্যের বিকাশকে কতকটা তুলনা করা যেতে পারে ফুল ফোটার সঙ্গে। ফুল গাছের মূলে আমরা পরম যত্নে জল ঢালতে পারি, দেশ বিদেশ থেকে তার জন্য ভাল সারও আনতে পারি, তবু ফুল ফুট্‌বে কিনা, অথবা ভাল ফুল ফুট্‌বে কিনা, সে সম্বন্ধে যেমন হুকুম করতে পারি না, সাহিত্য সম্বন্ধেও তেমনি সমাজের ভিতরে স্কুল-কলেজ-লেবরেটারির স্থাপনা, বিচার বিতর্কের সৌকর্য্যসাধন, ইত্যাদির পরও পরম আগ্রহে কালের পানে চেয়ে থাকা ভিন্ন 'আর আমাদের কি করবার আছে?

সাহিত্য-সমস্যা বাস্তবিকই কোনো সমাজের সত্যকার সমস্যা নয়। সাহিত্যের বিকাশ যখন কোনো সমাজের ভিতরে মন্দগতি অথবা হতশ্রী হ'য়ে আসে তখন বুঝতে হবে, হয়ত তার এক মৌসুম শেষ হ'য়ে গেছে, তারপর কিছুদিন কতকটা নিষ্ফল ভাবেই কাটবে অথবা তার জীবনায়োজনে বড় রকমের ত্রুটি উপস্থিত হয়েছে। এই শেষের অবস্থা যে কোন সমাজের পক্ষে মারাত্মক।

---

১ তাঁর দানে প্রথম ৩০ বৎসর হিন্দু মুসলমান সমভাবে উপকৃত হয়েছেন।

www.pathagar.com

বাংলার মুসলমান সমাজে এ পর্য্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের উদ্গম হয় নাই, শুধু এই ব্যাপারটিই তার আত্মসম্মানের পক্ষে হয়ত মারাত্মক নয়। কিন্তু সে-সমাজের লোক যে এ পর্য্যন্ত জাতীয় জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তেমন গৌরবের আসন লাভ করতে পারে নাই, বরং তাদের মর্য্যাদা সম্বন্ধে জানতে হলে অনুসন্ধান করে জান্‌তে হয়, এতেই তার অবস্থা সম্বন্ধে আপনা থেকে এসে পড়ে। আর, তার অবস্থা ভাল করে চেয়ে দেখ্‌তে গেলে চোখে পড়ে, সত্যই বাংলার মুসলমানের জীবনায়োজন মারাত্মক ত্রুটিতে পরিপূর্ণ যাতে করে মনুষ্যত্বের পূর্ণাঙ্গ পর্য্যাপ্ত বিকাশই সেখানে সম্ভবপর হচ্ছে না,—সাহিত্য-সৃষ্টির কথা সেখানে ভাবা যায় কি করে?

এ সম্পর্কে নানা গুরুতর কথার সম্মুখীন আমাদের হতে হয়। বলা যেতে পারে, সে সমস্তের কেন্দ্রগত কথা এই—ইসলাম কিভাবে মানুষের জন্য কল্যাণপ্রসূ হবে সেই কথাটাই হয়ত আগাগোড়া আমাদের নূতন করে ভাবতে হবে। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীরা ইসলামের যে রূপ দিতে প্রয়াস পেয়েছেন তা যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন, অন্ততঃ তাকে আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে যে ভাবে লাভ করেছি তার সম্বন্ধে অস্পষ্টতার অপবাদ দেওয়া সম্ভবপর নয়। স্পষ্টভাবেই আমাদের সামনে গ্রহণীয়রূপে বিধৃত ইসলাম নারীর অবরোধ সমর্থন করেছে, সুদের আদান-প্রদানের উপর অভিসম্পাত জানিয়েছে, ললিতকলার চর্চ্চায় আপত্তি তুলেছে, আর চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের দৃঢ়কণ্ঠে বলে দিয়েছে, তোমাদের সমস্ত চিন্তা সব সময়ে যেন সীমাবদ্ধ থাকে কোরআন ও হাদিসের চিন্তার দ্বারা। এই সমস্ত কথাই আমাদের নূতন করে ভেবে দেখতে হবে, ভেবে দেখতে হবে, মুসলমান সমাজের মানুষের কর্ম্ম ও চিন্তার স্বাধীনতায় এইভাবে যে অনেকখানি নূতন রকমের প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত করা হয়েছে এতে করে কি সত্যকার কল্যাণ লাভ হয়েছে—এই সমস্ত ব্যবস্থার পিছনে যে সাধু উদ্দেশ্য আছে এ কথা বুঝতে পারা কষ্টসাধ্য নয়। সংযম ও পবিত্রতা, পরিশ্রম ও করুণ প্রাণতা, এবং সুন্দর ও মহনীয়ের প্রতি নিবিড় শ্রদ্ধা—এ সমস্তের কথা যাঁরা মানুষকে বল্‌তে চেয়েছেন তাঁরা নিশ্চয়ই মানুষের শ্রদ্ধার পাত্র। কিন্তু আমাদের নূতন করে ভেবে দেখবার প্রয়োজন এই জন্য যে, সংযম ও পবিত্রতাকে নারীর অবরোধের দ্বারা, পরিশ্রম ও করুণ প্রাণতাকে সুদের আদান প্রদান নিষেধের দ্বারা, ও সুন্দর মহনীয়ের প্রতি শ্রদ্ধাকে মানুষের বুদ্ধি শৃঙ্খলিত করার দ্বারা সম্ভবপর করে তুল্‌তে প্রয়াস পেলে অসম্ভব কিছুর প্রতি হাত বাড়ানো হয় কিনা, অন্যকথায়, তাতে করে মানব প্রকৃতির উপর অত্যাচার করা হয় কিনা, যার জন্য সমস্ত উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।

যতটুকু বুঝবার ক্ষমতা আমাদের হয়েছে তাতে মনে হয়, ইসলামের যে-রূপ দিতে প্রয়াস পাওয়া হয়েছে, অথবা মানুষকে ইসলামের সার সত্য গ্রহণের উপযোগী করবার জন্য যে পথে চালিত করতে চেষ্টা করা হয়েছে, তাতে করে মানুষের উপর সত্যই অত্যাচার করা হয়েছে। যে ব্যবস্থায় বড় সত্যের পানে মানুষের চিত্তের আকর্ষণ অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে ইসলামের সমাজ-ব্যবস্থায় তার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নাই; সে-ব্যবস্থায় যতখানি বিজ্ঞান-দৃষ্টি আছে তার চাইতে অনেকখানি বেশি আছে ব্যস্ততা ও অসহিষ্ণুতা। দৃষ্টান্ত দিয়ে কথাটি বোঝাতে চেষ্টা করব। ইসলামের শ্রেষ্ঠ সত্য তৌহীদ মানবচিত্তের চির মুক্তির বাণী। বার বার মানুষ তার কীর্ত্তির শৃঙ্খলে আদর্শের শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে। Every idea is a prison, every heaven is a prison। আর সেই বন্ধনের

www.pathagar.com

সামনে বার বার দাঁড়িয়ে বলবার যোগ্য এই বাণী—'নাই, আল্লাহ্ ভিন্ন আর কেউ উপাস্য নাই' ; আর সাম্য এই মুক্তি ও অগ্রগতির চির সহচর। মানুষের এই অগ্রগতিতে সংযমের প্রয়োজন নিশ্চয়ই কিছুমাত্র কম নয়—যেমন নদীর জন্য কূলের বাঁধের প্রয়োজন কিছুমাত্র কম নয়। কিন্তু কূলের বাঁধের পত্তন করে ত নদীর সৃষ্টি হয় না, নদীর প্রবাহ আপন প্রয়োজনে কূলের বাঁধের সৃষ্টি করে চলে। মানুষের অগ্রগতির জন্যও প্রয়োজনীয় যে সংযম তারও তেমনিভাবে ভিতর থেকে জন্ম হওয়া চাই, বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া সংযমের সত্যকার মূল্য মানুষের জীবনে কত সামান্য। তাই মানুষের যে বন্ধু চান, ইসলামের এই বড় সত্যের পানে মানুষের চিত্ত উন্মুখ হোক, তাঁর কাজ কি এই হওয়া উচিত নয় যে, মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন পরিপোষণ ও পরিবর্ধনের সহায়তা তিনি করবেন? কেননা সর্ব্বাঙ্গীন পরিপোষণ ও পরিবর্ধন যার হয় নাই এই দূরের পথের যাত্রী হবার সত্যকার অধিকার তার কোথায়? এর পরিবর্ত্তে বাইরে থেকে বিধি-নিষেধ ও অবরোধ চাপিয়ে চাপিয়ে যে সব মানুষকে সংযত করবার চেষ্টা করা হয়েছে তাদের চিত্তের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তির ত কিছুমাত্র অবকাশ দেওয়া হয় নাই! তারা যে বড় জোর অর্দ্ধ-বিকশিত মানুষ! তারা কি করে হবে মুক্তিপথ-যাত্রী!

তারপর ললিতকলার চর্চ্চাকে যে মুসলমান সমাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা হয়েছে, কোন্ মস্তিষ্কবান ব্যক্তি একে সমর্থন করতে পারেন? নিশ্চয়ই নেতাদের এই হুকুমে মুসলমান তার এত দীর্ঘজীবন সৌন্দর্য্য ও আনন্দবিহীন হয়েই কাটায় নাই ; কিন্তু আমাদের ভেবে দেখবার দিন এসেছে যে, সাধারণ সমাজের সম্মতিক্রমে আনন্দ ও সৌন্দর্য্য চর্চ্চাটা করতে পারে নাই বলে তার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তিতে কতখানি বাধা পড়েছে।

এখানে হয়ত কথা উঠবে, ইসলামে অনেকখানি Puritanism আছে, এবং তার জন্য আমাদের লজ্জিত হবার দরকার করে না। আমি নিজেও ইসলামের এই Puritanic ধাতের জন্য লজ্জিত নই ; শুধু এই কথাটুকু বলতে চাই যে, Puritanism এক বৃহৎ মানব সমাজের শ্রেণী বিশেষের করণীয় হ'তে পারে, তাতে করে সেই সমাজের স্বাস্থ্যের ও সৌন্দর্য্যের কিছু আনুকূল্যই ঘটে। কিন্তু Puritanism-কে এক বৃহৎ মানব-সমাজের বরণীয় করে তুলতে প্রয়াস পেলে Puritanism ব্যর্থ হয়ই, সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজেরও দুর্ভাগ্যের অবধি থাকে না।

এর একটি দৃষ্টান্ত প্রায় সমসাময়িক কালের বাংলাদেশে আমরা পাই। বাংলা সাহিত্যে বাংলার উচ্চশ্রেণীর মুসলমানের বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য কোন দান নাই ; 'অর্থাৎ এমন দান যার জন্য বাংলার চিত্তে শ্রদ্ধা জেগেছে, তা আপনারা জানেন। কিন্তু বাংলার লোকসঙ্গীতে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের দান সাদরে গৃহীত হয়েছে যেমন পাগলা কানাইয়ের গান, লালন ফকিরের গান ইত্যাদি। এইসব গানের ভিতরে বুঝতে পারা যায়, ইসলামের একেশ্বরতত্ত্ব গান-রচয়িতাদের মনে স্থান পেয়েছিল। আর তারই সঙ্গে তাঁদের চারপাশের বাউল সাধনা, বৈষ্ণব সাধনা ইত্যাদি মিশেছিল,—সবমিলে কোন এক অসীমের সংবাদে তাঁদের চিত্ত তৃপ্ত ও মধুর হয়েছিল। মাতৃভাষায় রচিত এইসব গান এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেছে, আর চাষীদের অভাবগ্রস্ত জীবনে আনন্দ ও তৃপ্তি দিয়েছে—তাদের অনন্তের ক্ষুধা অনেক পরিমাণে মিটিয়েছে। কিন্তু মানুষের অন্তরের বেদনার প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন আমাদের আলেম সম্প্রদায় শাস্ত্রের ভয় দেখিয়ে শিক্ষা সাধনাহীন সমাজের

www.pathagar.com

পৃষ্ঠপোষকতা আদায় করে পল্লীর মুসলমান চাষীর এই গানের ফোয়ারা বন্ধ করে দিয়েছেন। পরিপূর্ণ ইসলাম মানুষের জন্য যে কল্যাণ ও শান্তি বহন করে, এঁদের সাধ্য নাই সেই সম্পদ এই চাষীদের দ্বারদেশে এঁরা পৌঁছে দেন ; শুধু মাঝখান থেকে হালাল হারাম সম্বন্ধে দুই একটা হুকুম শুনিয়ে ও Puritanism-এর গোঁয়ার্তুমিতে এদের জীবন নিরানন্দ করে দিয়ে তাঁরা কর্ত্তব্য শেষ করেছেন। এই চাষীদের জীবনকে কিছু সুন্দর ও মহান করবার জন্য এইসব গানের কতখানি সামর্থ্য ছিল আমাদের পুনরায় সেকথা ভাবতে হবে না কি?

এ সম্পর্কে একটি ভাববার মতো কথা আমাদের সামনে এসে পড়েছে। সেটি এই যে, কী নিজের সমাজে কী অন্য সমাজে সত্যকার মুসলমানের চেষ্টা হোক তাঁর উপলব্ধ ইসলামের স্বরূপ মানুষের সামনে ফুটিয়ে তোলা। সেই চেষ্টায় তাঁর কিছুমাত্র শৈথিল্য প্রকাশ না পাক। কিন্তু ঠিক তেমনিভাবে অপরের ইসলাম বা ইসলামের অংশ-বিশেষের গ্রহণ-ব্যাপারেও স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন থাকুক। 'ধর্ম্মে বল প্রয়োগ নিষেধ' কোরআরে এই মহতী বাণী মুসলমানের জন্য সত্য হোক।

এ কথাটি বলবার একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। অন্য সমাজের লোকদের উপর ধর্ম্মের ব্যাপার কিছুতেই আমরা জবরদস্তি করতে পারি না এ কথা আমাদের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিই মনে স্থান দেন। কিন্তু মুসলমান সমাজের ভিতরকার লোকদের জন্যও যে এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য সে কথা ভাবতে আমাদের অনেকেই হয়ত রাজী নন। এ সম্বন্ধে বাংলার শিক্ষিত মুসলমান একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে এক সময়ে আমার কথা হয়েছিল। ধর্ম্ম বিষয়ে ব্যক্তির স্বাধীনতা মানতে হবে, আমার এই কথার উত্তরে তিনি প্রশ্ন করলেন, তাহলে মুসলমান কাকে বলব? আমি বলেছিলাম—যাদের সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে, অর্থাৎ যারা সমাজে জন্মেছে অথবা এতে আশ্রয় নিয়েছে। তাঁর সঙ্গে এই তর্ক হচ্ছিল আমাদের উভয়ের। জনৈক বন্ধুর কোন তথাকথিত অনৈসলামিক কথার আলোচনা সম্পর্কে। কিন্তু তিনি আমার মত মানতে কিছুতেই রাজি হতে পারছিলেন না। শেষে একটি কথা বলে তাঁকে ভাবিয়ে তুলতে চাইলাম। বললাম, দেখুন, আজ উনি যা বলেছেন, হয়ত দুদিন পরে নিজেই ওখান থেকে ফিরে আসবেন। একটা struggling soul-এর বেদনা আমাদের সমাজ বুঝবে না! কিন্তু তিনি অম্লান বদনে বল্লেন, তা যখন তাঁর শেষ হয়ে যাবে, তখন যেন আবার তিনি মুসলমান সমাজে ফিরে আসেন।

মুসলমান সমাজের কর্ম্মকর্ত্তারা যে কি আশ্চর্য্যভাবে পাষাণ প্রতিমার সেবক পাণ্ডাদের মতো পাষাণচিত্ত হয়ে পড়েছেন, মানুষের মনের কত কামনা, কত বেদনা, কত ভাঙ্গাগড়া, এ সম্বন্ধে তাঁরা যে কত চেতনাহীন হ'য়ে পড়েছেন, সে সব কথা আজ না ভাবলে আমাদের দুর্দ্দশার পরিমাণ উপলব্ধি করা যাবে না। মানুষের জীবন সুন্দর হোক, কল্যাণময় হোক, সেখানে যেন আমি আমার সশ্রদ্ধ সেবা পৌঁছে দিতে পারি, এ ভাব যেন তাঁদের মনের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষে না। তার পরিবর্ত্তে মানুষের মাথায় কতকগুলো বিধি-নিষেধ ছুঁড়ে মেরেই আল্লাহ্‌র সৈনিক হওয়ার গৌরব তাঁরা উপলব্ধি করতে চান।

মুসলমান সমাজে যে সমস্ত নরনারী বাস করে তারা শুধু মুসলমান নয়, তারা মানুষ—দেশ বিদেশের নানা ধর্ম্মের নানা বর্ণের মানুষের আত্মীয়। সেই বিশ্ব বৃহৎ মানব সমাজের নানা আশা-আকাঙ্ক্ষার চেষ্টা বিফলতার মধ্য দিয়ে উৎসারিত হচ্ছে এই বাণী যে,

www.pathagar.com

মানুষ দুঃসাহসী, তার অনন্ত ক্ষুধা, জড় জগতের বন্ধনই সে মানতে রাজি নয়, চিন্তার জগতের ত কথাই নাই।—মানুষের এই বাণীর সার্থকতার কোন আয়োজন কি মুসলমান সমাজে করতে হবে না? যা সুন্দর শুধু তাই দিয়ে দৃষ্টি আবৃত করে কি মুসলমান তার সৌন্দর্য্য বুঝতে পারবে? না একথাও সে বুঝবে যে, এর জন্য সত্যকার প্রয়োজন হচ্ছে সেই সুন্দর বস্তুকে কিছু দূরে স্থাপন করা, যাতে করে সমস্ত জগত তার চোখে প্রতিভাত হবে, তারই সঙ্গে মিলিয়ে সেই বস্তুর সৌন্দর্য্য সে উপলব্ধি করবে? চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির মুক্তি, (emancipation of intellect) এতে শুধু মানুষের অধিকার থাকা উচিত নয়, এই হচ্ছে তার জীবন পথে বিধাতার দেওয়া পাথেয়। যেমন করেই হোক এই পাথেয়ের ব্যবহার মানুষ করে, তবে অনেক সময়ে ভয়ে ভয়ে করে বলে তার অন্তর প্রকৃতির যথোপযুক্ত পুষ্টিলাভ হয় না।

সাহিত্য জ্ঞানের সুরভি, তাই জ্ঞানচর্চ্চা সমাজে অব্যাহত থাকলে সাহিত্যের জন্য আর কোন ভাবনা থাকে না। কিন্তু সে জ্ঞানচর্চ্চার জন্য প্রয়োজনীয় মুক্ত বুদ্ধির, অথবা তারও চাইতে বেশী প্রয়োজনীয় সমাজ জীবনে বৈচিত্র্যের—মুক্ত বুদ্ধি যার সন্ততি। অবরোধ ও নিরক্ষরতার চাপে আমাদের সমাজের অর্দ্ধেক শক্তি ব্যক্তিত্বহীন ও অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে ; সেই অর্দ্ধেকের সংস্পর্শে এসে অপরার্দ্ধেরও চিত্তবিকাশের অবকাশ কোথায়? মানুষের চিত্ত যার আঘাতে জেগে উঠবে সেই বৈচিত্র্য এমনি করেই আমাদের সমাজে দুর্লভ হয়ে পড়েছে।

সুন্দর ও সবল জীবনের জন্য যত কিছুর প্রয়োজন তার এত অভাব বাংলার মুসলমান কি করে পূরণ করবে, এ কথা ভাবতে গেলে সত্যই অবসন্ন হয়ে পড়তে হয়। কিন্তু আশার অবকাশও যে নাই তা নয়। বাংলার মুসলমান সমাজের অন্তরে সেই গূঢ় জীবনরস যদি সত্যই সঞ্চিত থাকে তবে তার এই সংকট সময়ে তার কোলে তার বীরপুত্রদের জন্ম হবে, যারা তার সমস্ত অভাব সমস্ত বন্ধন ঘুচিয়ে দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের যোগ্য সূতিকাগার রূপে, তৌহীদের যোগ্য বাহন রূপে। ইসলামের যে তৌহীদ-মুক্ত নির্ব্বারিত জ্ঞান ও পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্বের শিখরই তার যোগ্য অধিষ্ঠান ভূমি। মুসলমান অকারণে ভীত হয়ে সেই অমূল্য মাণিককে অন্ধ বিশ্বাসের গুহায় লুকিয়ে রেখে তার সার্থকতা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

৩

সাহিত্যের বিকাশের জন্য সত্যকার প্রয়োজন হচ্ছে সুব্যবস্থিত সমাজ-জীবনের, জীবনের বহু ভঙ্গিমতাকে যথেষ্ট যত্ন ও শ্রদ্ধা নিয়ে লালন করবার। সেইদিক দিয়ে যে সব ত্রুটি বাংলার মুসলমান সমাজে রয়েছে তার মারাত্মকতা কত বেশী তাই একটু বিস্তৃত ভাবে বলতে প্রয়াস পেয়েছি। তবু হয়ত পরিষ্কার করে বলতে পারি নাই। আপনারা নিজেদের চেষ্টায় সেই অসম্পূর্ণতা পুষিয়ে নেবেন।[১]

---

১. এ সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে পড়ছে। ইসলামের ইতিহাসের অমৃতফল বলে মুসলমান যে সব নিয়ে গর্ব্ব করেন সেই মোতাজেল্য দর্শন, সূফী সাহিত্য, মোগল স্থাপত্য যাঁদের কীর্ত্তি—তাঁরা আমাদের অবলম্বিত ইসলাম-ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই।

www.pathagar.com

কিন্তু কেউ কেউ বলতে পারেন, কালের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের সমাজ-ব্যবস্থার আবশ্যক পরিবর্ত্তন আপনা থেকে হয়ে যাবে ; কাজেই সে-সব কথা না তুলে বর্ত্তমানে সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব কথা বাংলার মুসলমানের চিত্তকে আন্দোলিত করছে তার যোগ্য মীমাংসার চেষ্টা করাই সমীচীন—তাতে করেই ধীরে ধীরে আমাদের সব ত্রুটি স্খালিত হয়ে যাবে, আর আমাদের সমাজও সুন্দর ও সুব্যবস্থিত অবস্থায় দাঁড়াতে পারবে। একথার উত্তরে শুধু এই বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, কালের ভাণ্ডারে অনন্ত রত্ন রয়েছে কিন্তু প্রাণপনে না চাইলে তার কাছ থেকে কিছুই আদায় করা যায় না। এই প্রাণপণ চাওয়ারও পিছনে অবশ্য ইতিহাস আছে। কিন্তু এ বিষয়ে কখনো যেন আমাদের ভুল না হয় যে, যারা পেয়েছে তারা সমস্ত দেহমন দিয়ে চেয়েছে। তা ছাড়া সাহিত্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে সব সমস্যা আজকাল বাংলার মুসলমানের চিত্তকে আন্দোলিত করছে বলে বোধ হচ্ছে সে সব বাস্তবিকই তাঁদের সামনে প্রবল চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে নাই। উর্দ্দু-বাংলা সমস্যা যে সত্যই তাঁদের জন্য কোন সমস্যা নয়। তার প্রমাণ ত বাংলার মুসলমান সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা তাঁদের সামান্য ক্ষমতার ভিতর দিয়েও প্রতিনিয়তই দিচ্ছেন ; আর বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী শব্দের ব্যবহারের অনুপাত-সমস্যাও সাহিত্যে বাঙ্গালী মুসলমানের খুব অল্পদিনের শিক্ষানবিশীর পরিচায়ক। আরো কিছুদিন গেলেই ও সম্বন্ধে তাঁদের খেয়াল আপনা থেকে দুরস্ত হয়ে যাবে এমন আশা করা যায়। কেননা সাহিত্যের জন্য প্রয়োজন শুধু শব্দের নয়, বর্ণ ও গন্ধযুক্ত শব্দের। অন্য কথায় শব্দের গায়ে বর্ণ ও গন্ধ মাখিয়ে দিতে পারে এমন চিত্তের, এতটুকুও বুঝবার ক্ষমতা বাঙ্গালী মুসলমানের হবে না এ ধারণা নিয়ে তাঁদের সাহিত্য সমস্যার আলোচনা করা নিশ্চয়ই বিড়ম্বনা। তবে এই সব সমস্যার সম্পর্কে একটি কথা ভাববার আছে। এইসব সমস্যার ভিতর দিয়ে বাংলার আধুনিক মুসলমানের বিশেষ কামনা ফুটে বেরুতে চাচ্ছে, সেটী এই—'বাংলার মুসলমানকে সত্যকার মুসলমান হতে হবে'।

মুসলমানের এই মনোভাবের বিশ্লেষণ করলে প্রধাণতঃ দুইটি চিন্তাধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তার একটিকে বলা যেতে পারে প্রতিক্রিয়া, অন্যটী ক্ষোভ অথবা অনুশোচনা। বাংলা সাহিত্য আজ জগতের দৃষ্টি একটুখানি আকর্ষণ করতে পেরেছে এবং তাতে এর সত্যকার অধিকার আছে। কিন্তু তবু সত্যের অনুরোধে সাহিত্যরসিকদের নিশ্চয়ই বলতে হবে, এ সাহিত্য এখনো খুব বেশী পরিমাণে সাম্প্রদায়িক সাহিত্য ; মানুষের দুঃখ ও আনন্দের প্রকাশের চাইতে হিন্দুর বিশেষ দুঃখ ও বিশেষ আনন্দের চর্চ্চাই এতে বেশী। 'বাংলার মুসলমানকে মুসলমান হতে হবে এ হচ্ছে অনেক পরিমাণে মুসলমানের অন্তরে বাংলা সাহিত্যের হিন্দুত্বের প্রতিক্রিয়া। এখানে হয়ত তর্ক হবে—হিন্দুও মানুষ, আর বিশেষকে নিয়েই সাহিত্যের কারবার। কিন্তু তাতে করে আমার কথাটির ঠিক উত্তর দেওয়া হবে না। আমি এখানে বাংলা সাহিত্যের দারিদ্র্য সম্বন্ধে এই কথাটুকু বলতে চেয়েছি যে, বাংলা সাহিত্যে হিন্দুর যে চিত্র ফুটিয়ে তুলতে প্রয়াস পাওয়া হয়েছে বা হচ্ছে তা অনেকখানি অস্বাভাবিক রকমে হিন্দু, অর্থাৎ বিশ্বের আঙ্গিনার এক পাশে তার বিশেষ রুচি ও বিশেষ দুঃখ নিয়ে ফুটে উঠে যে হিন্দু জগতের সঙ্গে তার অবস্থার মোকাবেলা করতে চাচ্ছে সে হিন্দু নয়, কিন্তু বিশ্বের মানবযাত্রীদের পাশ কাটিয়ে তার চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার কূটতর্কে সময় কাটাচ্ছে যে হিন্দু সেই হিন্দু।

www.pathagar.com

অবশ্য যারা একবার নীচে পড়ে গেছে তাদের উদ্ধারের ইতিহাস অনেক পরিমাণে যে ঘুরপাক খাওয়া ইতিহাস হবে এ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আমাদের এই অভিশপ্ত দেশের দুর্ভাগ্যের জের যে আমরা কতকাল টেনে চলব তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এইখানে যে হিন্দুর হিন্দুত্বের সংঘাতে তার প্রতিবেশী মুসলমানের অন্তরে শুধু সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাই জেগেছে।

ক্ষোভ অথবা অনুশোচনার ভাবটিকে এই প্রতিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু সেই ক্ষোভ অথবা অনুশোচনার ভিতরে যে আর একটী কথা আছে সেটি না বুঝলে আধুনিক বাঙ্গালী মুসলমানের উপর অনেকখানি অবিচার করা হবে। সেটি তার মনের এই একটী বেদনার কথা যে, ইসলাম সুন্দর, ইসলাম মহান, কিন্তু তার যোগ্য প্রকাশ আমরা আমাদের সাহিত্যে দেখ্‌ছিনে কেন?—এই যে বাঙ্গালী মুসলমানের অন্তরে একটুখানি সত্যকার বেদনা জেগেছে এ তার শুভাদৃষ্টেরই পরিচায়ক—

"আমার ব্যথা যখন আনে আমায়
তোমার দ্বারে,
"তুমি আপনি এসে দ্বার খুলে দাও
ডাক তারে॥"

কিন্তু এ সম্পর্কে আমাদের সামান্য একটু নিবেদন করবার আছে। সাহিত্যে যে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃস্টান নাই তা নয় ; কিন্তু সাহিত্যিক হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খৃস্টানের আর সাম্প্রদায়িক হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃস্টানের এক চেহারা নয়। সাম্প্রদায়িক হিন্দু অথবা মুসলমান তার দৈনন্দিন কাজ ও ব্যবহারের ভিতর দিয়ে প্রধানতঃ জগতকে এই বুঝতে প্রয়াস পায় যে, সে আগে হিন্দু অথবা মুসলমান তারপরে মানুষ। কিন্তু সাহিত্যিক হিন্দু অথবা মুসলমান অন্তরে অন্তরে জানে সে আগে মানুষ, তারপরে হিন্দু অথবা মুসলমান। মানুষের অন্তরের গভীরতম আনন্দ ও বেদনা নিয়েই সাহিত্যের কারবার, সেইখানে সাহিত্যিক মানুষকে তার সম্প্রদায় ও জাতির আবরণ উন্মোচিত করে দেখেছে তাই মানুষে মানুষে আত্মীয়তাই সে বেশী করে উপলব্ধি করে। সুতরাং সাহিত্যে জাতি ও ধর্ম্ম-ভেদ যেন কতকটা একই ফুলের দেশ ও কালের ভেদ—ভেদ শুধু পাপড়ির বিন্যাস ও রঙ্গের গাঢ়তার বৈচিত্র্যে।

তাই বাংলার সাম্প্রদায়িক মুসলমান আজ ক্ষোভে দুঃখে অপমানে ও কতকটা সত্যকার বেদনায় ইসলামের যে চিত্র মনে মনে আঁকছেন, বাংলার সাহিত্যিক মুসলমানের হাত দিয়ে তারই অবিকল প্রতিচ্ছবি নাও বেরুতে পারে, বরং সেই সম্ভাবনাই বেশী। তবে ইসলাম সম্বন্ধে যদি সত্যকার বেদনা তার চিত্তে জেগে থাকে তবে সাহিত্যে তার এক অনুপম রূপ নিশ্চয়ই ফুটে উঠবে। কিন্তু সাহিত্য যেমন চিরদিন অনুপম তেমনি চিরদিন অভিনব, তাই সাম্প্রদায়িক মুসলমান তার এই কামনার ধনকে প্রথমে নাও চিনে উঠতে পারে।

সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালী মুসলমানের মনের গোপনে আরো বহু সমস্যা আছে, যেমন ইসলামের প্রাচীন ইতিহাসের কোন্ কোন্ পর্য্যায়ের দিকে আমাদের আজ বেশী করে চাইতে হবে অথবা আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যের কোন্ কোন্ অংশ আমরা সাদরে গ্রহণ করব,

www.pathagar.com

কোন্ কোন্ অংশ বর্জ্জন করে চলব, ইত্যাদি। কিন্তু এসব বিচারে প্রবৃত্ত হতেও আমরা প্রস্তুত নই, কেননা আগে থাকতে এসব বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া আর টাকা পাবার আশায় টাকার থলি তৈরী করা সমান রকমের আহম্মকি। এসব বিচার করবে প্রত্যেক সাহিত্য স্রষ্টা নিজে, আর কি গ্রহণ করবে আর কি বর্জ্জন করবে সেটি নির্ভর করবে তার রুচি ও শক্তির উপরে। তবে একটি কাজ করে বাংলার সাম্প্রদায়িক মুসলমান বাংলার সাহিত্যিক মুসলমানদের কিছু সাহায্য করতে পারেন, সেটী হচ্ছে, কোরআন হাদিস ও প্রাচীন মুসলমান গ্রন্থকারদের ভাল ভাল বইয়ের বাংলা তর্জ্জমা প্রকাশ করা। অনেক সময় দেখা গেছে, অতি সামান্য উপকরণ থেকেও সত্যকার সাহিত্যস্রষ্টাদের হাতে অনেক বড় সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে। একটী ফুলকি তাঁদের কল্পনায় আগুন ধরিয়ে দেবার জন্য যেন যথেষ্ট। কিন্তু সেই সামান্য উপকরণটুকুও ত হাতের কাছে চাই।

আর একটী কথা বলে এই আলোচনা শেষ করব। আমাদের কোনো কোনো সাহিত্যিক আদর্শ ও অনুপ্রেরণার জন্য আমাদের আজকাল চাইতে বল্ছেন উর্দ্দু সাহিত্যের দিকে। সে চাওয়াটা মোটেই দূষণীয় নয়, বরং যত বেশী চিত্তের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয় ততই আমাদের জন্য মঙ্গলকর। কিন্তু এর ভিতরে যে একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, বাংলা সাহিত্যে বাংলার মুসলমানের অনুপ্রেরণা দেবার মত কিছু নাই স্পষ্ট ভাষায়ই বলতে চাই—ওটী দেখার ভুল। উর্দ্দু সাহিত্যের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নাই ; তবে যে সমস্ত সাহিত্যিকের নামোল্লেখ করে বাঙ্গালী মুসলমানকে তাঁদের প্রতি ভক্তিমান হতে বলা হয় তাঁদের কয়েকজনের লেখার সঙ্গে আমার অল্প কিছু পরিচয় আছে এবং সেই পরিচয়ের বলে আমি বরং এর উল্টো কথাই বলতে চাই, —বলতে চাই, বাংলার মুসলমানের অন্তরে প্রেরণা দেবার মতো জিনিষ বাংলাদেশে ও বাংলা সাহিত্যেই বেশী আছে।

বাংলার গত একশত বৎসরের ইতিহাস যে কোন দেশের পক্ষে গৌরবের ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাসের স্রষ্টাদের এ পর্যন্ত সাধারণতঃ দেখা হয়েছে হিন্দুর চোখ দিয়ে, অর্থাৎ, সামান্য সাফল্য-লাভে গর্ব্বিতচিত্ত হিন্দুর চোখ দিয়ে। সেই আস্ফালন থেকে মুক্ত হয়ে অথবা তাতে বিরক্ত না হয়ে যদি তাকানো যায় এই শত বৎসরের রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, মধুসূদন, রাজনারায়ণ, রামতনু, কেশবচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির দিকে—যদি ভাবা যায় একটা মুমূর্ষু হাতির দেহে জীবন ফিরিয়ে আনবার জন্য কি প্রাণপণ সাধনা এঁরা করেছেন, সে সাধনায় কত উদ্বেগ, কত অভিমান, কত নৈরাশ্য, কত উল্লাস, তখন এইসব শক্তিমানদের কারো কারো জাতি-অভিমান বিজাতি-বিদ্বেষ ইত্যাদির অর্থ আপনা থেকে পরিষ্কার হয়ে আসে ; আর সত্য ও কল্যাণের পথে আমাদের অগ্রজরূপে এঁদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা-নিবেদনও আমাদের অন্তরে সহজ হয়ে পড়ে।

তারপর বাংলা সাহিত্যের কথা। এর ভিতরে দোষ যে ঢের আছে সে সম্বন্ধে আগেই কিছু বলা হয়েছে ; কিন্তু সমস্ত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও এতে ভাল যেটুকু সম্ভবপর হয়েছে তাকে ডিঙ্গিয়ে যাবার মতো কিছু উর্দ্দুতে পাই নাই ; বরং বড় সাহিত্যের যে একটি শ্রেষ্ঠ লক্ষণ মুক্ত-বুদ্ধি, তার যতটুকু বিকাশ বাংলাতে হয়েছে ততটুকুও সেখানে চোখে পড়ে নাই। তা ছাড়া চিন্তার জগতেও বাঙ্গালী মুসলমান শুধু টুপি দেখে আত্মীয় ঠাওরাবে এ

www.pathagar.com

মনোভাব সম্বন্ধে শুধু এই বলা যায় যে, যত শীগ্গির এ দূর হয়ে যায় ততই আমাদের লজ্জা কমে।

দেশে দেশে দিকে দিকে মানুষ যে যেখানে সত্য ও কল্যাণের সন্ধানী হয়েছে সে আমার ভাই, একথা যদি মুসলমান প্রাণ খুলে না বল্তে পারে তবে বৃথাই তার সাম্য ও একেশ্বর-তত্ত্বের অহংকার। আর শুধু মুসলমানের সাহিত্য সৃষ্টি নয়, তার সমস্ত নবসৃষ্টির উৎস এইখানে বাঁধা পড়ে ক্রন্দন করছে।

www.pathagar.com

বাংলার লোকসঙ্গীত
আবদুল কাদের

উত্তরে রাজমহলের বিস্তীর্ণ পাহাড়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্ব্বে আসাম ও আরাকান পর্ব্বতরাজি, আর দূর পশ্চিমে বিন্ধাচল, এই বিচিত্র প্রকৃতি ঘেরা ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার বৃহৎ উপত্যকাটীতে আবহমান কাল ধরিয়া ভক্তের পর ভক্ত, ভাবুকের পর ভাবুকের আবির্ভাব ঘটিয়াছে ; আর চিন্তা ও প্রেমের স্রোত একের পর একে আসিয়া সমস্ত ভূভাগখানিকে আন্দোলিয়া, মাতাইয়া দিয়া গেছে। পৃথিবীতে এই দেশখানি নিতান্ত অল্প পরিসর হইলেও ইহার মূল্য পৃথিবীর ইতিহাসে অল্প নহে। ইহার মাটীর এমনি ধারা যে ইহার অধিবাসী আপনা হইতেই কোমল ভাবুক প্রাণ ; ইহার জাতিটাই কবির জাতি। আর গেঁয়ো কৃষকের দল—তারা যে মাতা বসুন্ধরার স্বভাব শিশু, চির আনন্দবাদী সন্তান। বিশেষতঃ বাংলার চাষী-নিতান্ত সরল স্বভাব সহজ ভাষী ; তারা ফসল বোনা, নিড়ানি দেওয়া আর ফসল কাটার সাথে সাথে বিভিন্ন ঋতু বিবর্ত্তনের নিকট ভোগ সংস্পর্শে থাকিয়া থাকিয়া আরো অধিক করিয়া কবিপ্রাণ ! এমনতর হওয়াটা নিতান্তই স্বাভাবিক—কারণ কৃষিপ্রধান দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহ মানুষের চিরন্তন সুকুমার বৃত্তিগুলিকে সুপ্রকাশের পথে বিপুলভাবে সাহায্য করে। কৃষকেরা সারাজীবন প্রকৃতির বুকের কাছে থাকিয়া থাকিয়া তাহা হইতে প্রচুর রস সঞ্চয় করে ; তাহাদের সেই রস-স্নিগ্ধ সরল অন্তরে প্রকৃতির লীলা-বৈচিত্র্য অতি সহজেই প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিতে পায়। ভরা বর্ষার অপরাহ্নে ভাটীয়ালবাহী 'মধুকর' পানসীর হালে বসিয়া, গো-খুর রেণু-রাঙ্গা গো-চারণের মাঠে 'কংকে'র মতো উদাস বাঁশী হাতে লইয়া, জোছনা রাতে সারিন্দা বা একতারার ঝংকারে কিম্বা ক্লান্ত ঘুম-পাওয়া দ্বিপ্রহরে মন্দিরা বাজাইয়া বাজাইয়া তারা আগত ঋতু বা কালের সহিত সায় দিয়া যায়। পশ্চিমেও শ্রাবণ-বাদলের গুরু গর্জ্জনে চাষীরা 'কাজরী' গানের বর্ণোৎসবে বাহির হয় ; জীবনকে বৎসরকার চাওয়া শ্যামলানন্দে আপ্লুত করিয়া লয়।

বৌদ্ধ যুগের মানিক চাঁদ, আদিকবি মীননাথ, চাঁদ কবি হইতে আরম্ভ করিয়া সেদিনের গোস্বামী কৃষ্ণকমল পর্য্যন্ত বাঙলার চাষী দেশের প্রাদুর্ভূত কবি বা পদকর্ত্তাগণের আদর্শ ও ভাবধারার সাথে যোগ ও ভোগ দিয়া চলিয়াছে ; কবিওয়ালা ঈশ্বর গুপ্তের পর হইতে এই সমঝদাররা আর পা মিলাইয়া চলিতে পারিল না ; তাহারা কোটীশ্বর দাসের ভাসান যাত্রা আর আমীর সাধুর বিরহ-বিলাপ নিয়াই আপনার ভাঙ্গা খড়ের ঘরে আত্মভোলা হইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। দেশের পরবর্ত্তী কবির ভাগ্যে বিদেশের নোবেল প্রাইজ ঘটিল, কিন্তু চাষীর তন্দ্রাস্তব্ধ কানে উক্ত কবিগোষ্ঠীর আবির্ভাব-সংবাদটাও পৌছিতে পাইল না। এই কবিরাও এই উপেক্ষিত সম্প্রদায়ের পানে একটু সহানুভূতির চক্ষে চাইবার বা তাঁহাদের নব পথে ইহাদের জীবনের সত্যকে একটুখানি গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিল না।

www.pathagar.com

হিন্দুধর্ম্মের অবাধ্য সন্তান বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সেই যুগে সংস্কৃতের অবাধ্য সন্তান প্রাকৃত বাঙলা সাহিত্যমণ্ডপ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, সেই যুগের অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর কৃষকেরা যোগীপাল, মহীপাল, গোপীপাল প্রভৃতি বৌদ্ধরাজন্য বর্গের নীত সূত্রে গাথা স্তুতি গানে নিতান্ত আমোদিত হইত। এই স্তুতি গান গৌড়ীয় যুগেও পল্লীতে সঙ্গীতানুষ্ঠান সমূহের পৃষ্ঠপোষকদের নামে স্তুতি রচনার প্রচলন আছে, অবশ্য তাহা নানা অবস্থা বিপর্য্যায়ের পর ভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে। কবীন্দ্র ও গুণরাজ খাঁ যেমন করিয়া পর্য্যায়ক্রমে নসরত খাঁ ও পরাগল খাঁর স্তুতি গান গাহিয়াছেন, যেমন করিয়া বিজয়গুপ্ত কানা হরিদত্তকে তাচ্ছিল্য করিয়া সে স্থলে নিজের আসন পাতিতে আসিয়াছেন, তেমন করিয়া আজকালও গ্রাম্য কবিওয়ালা ও গায়েনগণ তাহাদের অভ্যর্থনাকারী ও গুরুজীর বন্দনার সাথে সাথে অনেক স্থলে বিগত বা বিপক্ষীয় গায়েনগণের খুঁৎ বা অপযশ গাহিয়া তাহাদের পালা আরম্ভ করে।

বাঙলার লোকসঙ্গীতে 'মেয়েলী সঙ্গীত' এক উপাদেয় জিনিষ। বসন্ত রায়ের ব্রতের গীত', 'খেলা-কীর্ত্তন' বা 'গোপিনী-কীর্ত্তন', ধামালী' বা 'ধামাইল', 'সহেলা' বা 'সই' পাতার গীত', 'বিবাহের গীত' প্রভৃতি এই 'মেয়েলী-গীতি'র অন্তর্ভুক্ত। 'বিবাহের গীত'—'স্নানের গীত', 'বরযাত্রার গীত', 'অন্নপাল', 'বাসর-মিলন' প্রভৃতি অংশে বিভক্ত। বেতনভোগী মেয়েরা ২/৩ জনে গলা মিলাইয়া এই 'বিবাহের-গীত' গাহিয়া থাকে। বৌদ্ধদের আমল হইতে আহরিত এই আচারটিকে আজও পাড়াগাঁ বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

ছড়াই হইয়াছে বাঙ্গালী কৃষকের গানের আদি সম্পদ। ময়নামতীর গান, নাথ-গীতিকা সূর্য্যের ছড়া, রূপকথা, চণ্ডী ও মনসার আদি গান, এই সকল ছড়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ছড়া-বাঙলার সমস্ত হেলা-খণ্ডেই ছড়াইয়া ছিল।

প্রাচীন বাংলা গানের পুষ্টি সাধনে সত্যনারায়ণ, দক্ষিণের রায়, পদ্মাবতী ও চণ্ডী বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে। শিব-সংকীর্ত্তন, শিব-মাহাত্ম্য, প্রভৃতি তখনকার শৈব কীর্ত্তনিয়াদের সৃষ্টি। শনির পাঁচালী, ষষ্ঠির পাঁচালি প্রভৃতির পাশাপাশি "হরিলীলা" বলিয়া সত্যনারায়ণের যে 'ব্রত-কথা' শুনা যায়, তাহাতে 'সুলোচনা ও মাধবে'র এক উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। গেঁয়ো কৃষকেরা আজো ২/৩ জনে মিলিয়া একত্রে সুর করিয়া সুন্দরীর গীত, বড়ুই'র গীত, বানিয়ার গীত প্রভৃতি গীতের পাশে 'মাধবের গীত' নামে আখ্যাত এক প্রকার গীত গাহিয়া থাকে। 'সুন্দরীর গীতে'র সুন্দরীর স্বামী 'কানাই'র, 'মাধবের গীতে'র সর্পদংশিত 'মাধবে'র মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। উক্ত 'ব্রতকথা'র মাধব, 'মাধবের গীতে'র মাধব ও 'কানাই'র মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক আছে? রামেশ্বরের মিশ্রদেবতা সত্যপীরের কথা ও শিব-কীর্ত্তন—বিশেষ করিয়া ভক্ত রামপ্রসাদের পর হইতে শ্যামাকীর্ত্তন অধিকভাবে পল্লীতে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সেই যুগে এই ভাব সাধারণ মানুষের জীবনে যে কতটুকু বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহার ধারণার একটি উপাদান—মৃজা হুসেন আলী ও জাফর খাঁর মতন দুইজন মুসলমান শাক্ত কবির আশ্চর্য্য আবির্ভাব। মৃজা হুসেন আলী কালী পূজাও করিত বলিয়া কথিত আছে।

কবি জনার্দ্দন যে ছড়াগুলি ব্রতকথার রূপে জন সমাজে ছড়াইয়া ছিলেন, পরবর্ত্তীকালে মঙ্গলচণ্ডীর ভক্ত যুগল কবি কঙ্কন ও অন্যান্যরা সেই সকলকে গাঁথিয়া গাঁথিয়া ষোল পালা গানে বিস্তৃত করিয়াছিলেন। শিব সংকীর্ত্তন ও রায়-মঙ্গলকে ছাড়াইয়া নানা কারণে

www.pathagar.com

চণ্ডীর গীতিই দেশে অধিক সমাদর ও প্রসার লাভ করিয়াছিল। এই চণ্ডীর কীর্ত্তি সম্বলিত চণ্ডীকাব্য, পদ্মপুরাণ, শ্রীধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতিতে যে সকল উপাখ্যান রহিয়াছে তন্মধ্যে পদ্মপুরাণের বিপুলার নয়ন-গলানো কাহিনী পল্লীতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্তি ও প্রতিপত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। লহ্না, খুল্লনা, ফুল্লরার কাহিনী যে কেন চাষীদের মাঝে এতটুকু সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারিল না, তাহার যথেষ্ট হেতু রহিয়াছে। এই সর্প-সংকুল ও ব্যাঘ্র সমাকুল বাংলার জনপদে দক্ষিণের রায়ের, বিশেষ করিয়া সর্পভীত কশ্যপ মুনির মন হইতে উৎপন্ন মনসার আরতি গেঁয়ো চাষীদের সন্ত্রস্ত অন্তরের সর্ব্বপ্রধান পূজা হইয়াছিল। আবার বিষহরি ও চণ্ডীর পূজা তৎকালে বিশেষ অর্থকরী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যবসা ছিল। তাই ৩১ জন কবিকে আমরা মনসা-গীতি রচনা করিতে দেখিতে পাই। আজ যখন পল্লী যাত্রাওয়ালারা গাহিয়া যায়—

'জাগহ ওহে বেহুলা—সায় বেণের ঝি,
তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি?'
—কেতকা দাস

তখন 'পাণ্ডুনাগ' 'ধাঙগুড়িয়া সাপ' বা কোন অদৃশ্য সর্প-দংশনের চকিত বিষ-বেদনায় যেন গেঁয়ো চাষীর প্রাণের কোমল তন্ত্রী রনিয়া রনিয়া ওঠে। 'এই বার বুঝা যাবে চান্দ বাণিয়া' (দ্বিজ বংশীদাম) ... 'চাঁদের ছয় পুত্র আজি আসহ দংশিয়া' (রাবণ পণ্ডিত) প্রভৃতি বিকট উক্তিতে মনসার সর্ব্বধ্বংসী ক্রোধ ও ধূর্ত্ততা, এবং তাহারই পাশে চাঁদ বেনের অদ্ভুত বীরত্ব, দৃঢ় ব্রত, সবার উপরে বেহুলার রূপ, সৌম্য মূর্ত্তি, দৃঢ় পাতিব্রত্য, অটল, অতুলনীয় সতীত্ব, হাস্য মনে সকল দুঃখ সহন—প্রভৃতিতে বিভূষিত হইয়া যে স্বর্গীয় চিত্রটী শ্রোতাদের চক্ষুর সম্মুখে পরে পরে মূর্ত্ত হইয়া ভাসিয়া উঠে—সরল চাষীর মন তাহাতে অশ্রুজলে আকুল হইয়া ধনা মনার প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে পদে পদে লখিন্দরের জীবন ভিক্ষা করিয়া করিয়া কলার কল্প মান্দাসে সম্মুখে অগ্রসর হয়। এই ভাসান সঙ্গীত জগতের সম্পদ ভাণ্ডারে এক অভাবনীয় অভিনব সামগ্রী।

এই ভাসান-গীতি দেশের সাধারণ অসাধারণ সকল মানুষের জীবনে যে কি আশ্চর্য্যভাবে কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহার একটা নিদর্শন—"দস্যু কেনারামের পালাগীত" যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা পাইবেন। এই পালা-গীতোক্ত ঘটনা ষষ্ঠদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিশোরগঞ্জ জালিয়ার হাওরে ফুলেশ্বরী নদীর তীরে ঘটে। ময়মনসিংহে এই গীত মধুমালা, কাঞ্চনমালা, পুষ্পমালা, শঙ্খমালা, মালঞ্চমালা প্রভৃতি গীতি উপাখ্যানের উৎপত্তি ঘটিয়াছে।

মুকুন্দরাম কবি কঙ্কনের বিফলমনা 'কালকেতু ব্যাধ'কে 'কংস নদী'র তীরে কতকটুকু জল খাইয়া অবসন্নদেহে বিশ্রাম করিতে দেখি। এই কংস নদী কোথায়? ময়মনসিংহের কংসনদীর দক্ষিণে 'বাঘরার হাওরে' 'দেওয়ান ভানা'র কাহিনী—আশেপাশেই 'ছুরত জামাল', 'দেওয়ান ঈশা খাঁ মছলন্দ আলি', 'জুলুমৎ খাঁ', 'ফিরোজ খাঁ দেওয়ান', 'কটু মিঞা', 'বাহাদুর খাঁ', 'মনহর খাঁ দেওয়ান', 'পহ্লন খাঁ', 'গহুর রাজা ও সাহারবানু', 'দেওয়ান মদিনা', 'রূপবান', 'তৈমুম গুনাল ও চৈতন শীলা', 'জানে আলম ও আঞ্জে নাহার' প্রভৃতি পালাগীতগুলি সমসাময়িক পল্লী কবিদের দ্বারা রচিত ও কীর্ত্তিত হয়। ত্রিপুরা, উত্তর-পূর্ব্ব ঢাকা, দক্ষিণ পশ্চিম ছাতক, পূর্ব্ব ময়মনসিংহ প্রভৃতি ভূভাগ সমূহে এই পালাসঙ্গীতগুলি

www.pathagar.com

গাহিয়া আজিও গায়েনরা দীর্ঘরাত্রি জাগরণ করিয়া থাকে। এই গীতিগুলির বিশেষত্ব—ইহাতে ধনধান্যময়ী বঙ্গ পল্লীর সহজ সৌন্দর্য্য সরল গ্রাম্য ভাষায় ও ভাবে সুব্যক্ত। ইহাতে কৃত্রিমতা বা অতি কল্পনার ছড়াছড়ি নাই, আছে নিতান্ত সরল অনুভূতি। শাস্ত্র বা সংস্কারের বাধাবন্ধন এই গীতিগুলির চরিত্রে দাগ কাটিতে পারে নাই। মুকুন্দরাম, ঘনরাম, বিজয়গুপ্তের উপর যে সংস্কৃত আদর্শ প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহা এইখানে কোন প্রকার প্রভাব বা দৌরাত্ম্য ঘাটাইতে পায় নাই। বাংলা গ্রাম্য গানের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হইয়াছে সংস্কৃতপূর্ব্ব যুগে, আর এই গাথাগুলি রচনার আমলে। এই পালাসমূহের বর্ণিত জনপদগুলি প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজনৈতিক প্রভাব, সেনবংশ প্রতিষ্ঠিত নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম কৌলীন্য বা আচার উপদেশ, শরীয়তের দৃঢ় অনুশাসন ও কামরূপবাসীদের শেষকালের তান্ত্রিকতা প্রভৃতি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই ইহার সম্পদ হিসাবে দাশুরায়ের পাঁচালিকেও শ্রেষ্ঠত্বে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছে। পল্লীতে নানা প্রকার বিপ্লবই এই গাথাগুলির উৎপত্তি পক্ষে সহায়তা করিত। পল্লীর সত্য ও প্রাণকে পরম বেদনায় উপলব্ধি করিয়া পল্লীর কবি তাঁহার সাময়িক ঘটনার সন্নিবেশে এই পালাগীত রচনা করিতেন। উত্তর পশ্চিম ত্রিপুরার 'ওলফৎ আলির গীত' যাঁহারা শুনিয়াছেন তাঁহারা পালাগীতের একবিধ উৎপত্তি মীমাংসায় সন্দিহান হইবেন না নিশ্চয়।

এই পালাগীতের প্রায় সমস্তগুলিতেই 'বারমাস্যা' নামে এক সাধারণ উপাদেয় অংশদৃষ্ট হয়। আদিকাল হইতে প্রচলিত গ্রামের বিদ্যাসুন্দর গুলিতে এবং ভেলুয়া প্রভৃতি গীতি পুঁথিতেও এই বারমাস্যা বাদ পড়িয়া যায় নাই। উপাখ্যান সম্বলিত বারমাস্যা ছাড়া ছোটো ছোটো স্বাধীনভাবে রচিত শুধু বারমাস্যাও বৃদ্ধাদের মুখে পাওয়া যায়। বার-মাস্যাগুলিতে রচকের সমসাময়িক যুগের ষড় ঋতুর বিবর্ত্তন বিকাশ, তৎকালিক সাধারণ জীবন যাপন, আহার বিহার পোষাক পরিধান প্রভৃতি সম্বলিত নানা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তত্ত্বের সন্ধান মিলে। বিপুলার ও লীলার বারমাসি দুই, চার, দশ লাইন মুখস্ত গাহিতে পারে না, এমন চাষী আজো উত্তর ত্রিপুরায় অল্প দৃষ্ট হইবে। বারমাসি বাঙ্গালী চাষীর অতি আদরের ও সম্ভোগের সামগ্রী 'চাঁদ বিনোদে'র জাতি ভাই কৃষাণেরা আজিও—

'পঞ্চগাছি বাতার ডুগুল হাতেতে লইয়া।
মাঠের পানে যায়—বারমাস্যা গাইয়া॥'

পৌরাণিকী নীলাম্বর ও ছায়ার স্বর্গভূমিতে শাপভ্রষ্ট হইয়া পরজন্মে কালকেতু ও ফুল্লরা রূপে আবির্ভাবের স্বরূপে এই সকল পালা গীতের কোনো কোনোটিতেও আমরা নায়ক নায়িকাদের পূর্ব্বজন্মের একটা রহস্য-ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে দেখিতে পাই। বিপুলার গীতে—

'বেউলার পূর্ব্বকথা শুন মন দিয়া॥
উষা অনিরুদ্ধ নামে গন্ধর্ব্ব আছিল।
নৃত্যগীত করিবারে ইন্দ্রপুরে গেল॥
কাঁচা মৃত্তিকার সরা তাতে ভর করি।
দেবেরে মোহিতে নাচে উষা যে সুন্দরী॥

www.pathagar.com

হংসাসনে বিষহরি আইলা নিজ কাজে॥
পদ্মার কপটে উষার তাল যে ভাঙিল।
ক্রুদ্ধ হৈয়া দেবরাজ শাপ তারে দিল॥'

শাপে অনিরুদ্ধ লক্ষীন্দর ও উষা বেহুলা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। আমরা 'পালী' নামক অন্যতম গীতিরও প্রায় সবগুলিতে গায়েনদেরে প্রারম্ভেই একটা পূর্ব্বজন্মের ইতিবৃত্ত গাহিতে দেখিতে পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ—'গুলেবাকাউলি'র পালী গীতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। গানের ভিতর দিয়া পূর্ব্বজন্মের একটা ব্যাখ্যা বৌদ্ধদিগের আমল হইতে বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। আমরা জীবনকে আদি অন্ত রহিত একটা প্রহেলিকা ধারণা করি। কিন্তু এই গ্রাম্য কবিগণ জীবনের আদ্যন্ত নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন।

বৌদ্ধ আদর্শের এমনতর প্রভাব বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য অংশেও পরিদৃষ্ট হয়। এমন কি বিদ্রোহী বৈষ্ণব সাহিত্যের উপরও ইহার প্রভাব নিতান্ত অল্প নহে। গুণরাজ খাঁ ও তৎপরবর্ত্তী সমস্ত পদকর্ত্তা ও কবিওয়ালাদের নিজকে 'নির্গুণ' 'অধম' 'দীনহীন' 'দাস' প্রভৃতি বলিয়া আখ্যাত করাটা বৌদ্ধদের হইতে আমদানী করা বিনয়। এই বিনয়-নিষ্ঠা পল্লী বৈষ্ণবদের জীবনেও আশ্চর্য্যভাবে রূপ নিয়াছিল। সাধারণ প্রাকৃত বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধদের সৃষ্টি ও দান। বলিতে গেলে সংস্কৃতাদর্শ ধ্বংসকারী বৌদ্ধরাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নির্ম্মাতা। বৌদ্ধদের শূন্যবাদের দুরন্ত প্রভাব পরবর্ত্তী জাতিসমূহ এমনকি এই বিংশ শতাব্দীর সভ্য বাঙ্গালীও কোনোমতে এড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। তৎকালিক মায়াবাদ নানাভাবে জীবনে বনাম সাহিত্যে প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছে। এই সভ্যযুগেও ব স্থলে ম, ও ন স্থলে ল প্রভৃতি কথিত ভাষায় প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা বৌদ্ধদের স্বেচ্ছাকৃত বিকৃতির প্রভাবান্বিত ফল। বৌদ্ধ আমলের গান-গোপীচান্দের ভয় প্রদর্শনে অদুনার—

'তুমি হবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা
রাঙ্গা চরণ বেড়িয়ে লমু পালাইয়া যাবু কোথা'

এই উত্তর—নানাভাবে বাংলা গীতি-সাহিত্যে ও মুর্শিদ্যাগানে বারংবার আহরিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ সভ্যতার অন্তর্দ্ধানে শৈব ধর্ম্ম বিষয়ক কীর্ত্তনই বাংলায় প্রথম বিকশিত হয়। অতঃপর শাক্তদের ও বৈষ্ণবদের প্রাধান্য এই শিব-কীর্ত্তন আর অধিক দূর বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পায় নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের প্রাদুর্ভাব ঘটে। পদাবলী বাংলার জনপদ ছাইয়া ফেলে। স্বয়ং চৈতন্যদেব স্বরূপকে দিয়া বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস পড়াইয়া শুনিতেন। ব্রজবুলিরে চরম শোভা দাতা গোবিন্দ দাসের বহু ভঙ্গিম ও বহুরঙ্গে বিকশিত পদাবলী বঙ্গ-পল্লীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছায়াপাত করে ; গণসমাজ লৌকিক দেবদেবীর মণ্ডপে অশ্রু ধৌত রাধিকাকে আপনাদের দুঃখ বেদনা দিয়া গড়িয়া বরণ করিয়া লয়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উদ্দাম পূর্ব্বরাগের প্রেমাবেশ হিন্দু মুসলমান সকলদের মধ্যে একটা ভাবোন্মত্ততা জাগাইয়া দিয়াছিল। তাই আমরা সেই যুগে সৈয়দ মর্ত্তুজা, ফকীর হবিব প্রভৃতি সাতজন মুসলমান বৈষ্ণব কবির সাক্ষাৎ পাই। শ্রীরাধিকাকে উল্লিখিত কবিরা আপনাদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত অনাদ্যনন্ত কালের জাগ্রত শ্রীকৃষ্ণরূপী তেচনার বিলাসরূপিণী হলাদিনী শক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। পাগলা কানাই-এর গান এ স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রামের নিরক্ষর চাষী তাহার প্রিয়তমা বধূর মধ্যেই যুগ যুগান্তর ধরে চলে-আসা রাইকে অপেক্ষা করিতে

www.pathagar.com

দেখিয়াছে—আবার সে বাস্তব জগতের এই মানসীর মধ্য দিয়াই বাঁশীর সুরে সুরে সেই অনাদি সুরলক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে উদাস হইয়া ছুটিয়াছে। শ্রীচৈতন্য প্রভু যেমনভাবে ভাববিহ্বল অবস্থায় হরিনাম করিতে করিতে তমালকে জড়াইয়া কাঁদিয়াছেন, কদম্ববৃক্ষ দেখিয়া অজ্ঞান হইয়াছিল, পুণ্যনগরের ব্রাহ্মণের কথায় কৃষ্ণোদ্দেশে যমুনার জলে ঝাঁপ দিয়াছেন, কিম্বা মেঘ দেখিয়া কৃষ্ণ ভ্রমে আকুলিত হইয়া উঠিয়াছেন, বাঙ্গলার চাষীও তেমনিভাবে উন্মত্ত হইয়া গাহিয়াছেন—

'আমি কি হেরিলাম জলে গো, নবীন কালিয়া রূপ।
কি হেরিলাম, কি হেরিলাম, কি হেরিলাম গো॥
কালা-ভঙ্গী কর‍্যা দাঁড়াইয়াছে চওড়া তমালতলে।
কালা-যার পানে চায়, তারে মারে যুগল নয়ানে গো॥
কেহই বলে মেঘ-ই মেঘ-ই, কেহ-ই বলে কালা।
তোমরা নি দেখ্যাছ সই মেঘের গলায় মালা গো॥
যদি কালা মেঘ হইত, যাইত রে ঝরিয়া।
তবে কেন দেখিতাম রূপ কদম্ব হেলাইয়া গো॥

সেই মুর্শিদ্যা গান-গেঁয়ো বাঙ্গালীর কান্নাতুর হৃদয়ের আদি গান, তাহাতে বৈষ্ণব লীলামাধুর্য্যের যথেষ্ট সংমিশ্রণ রহিয়াছে। মুর্শিদ্যা গানে বৌদ্ধ নিদর্শন মায়াবাদ ও লুই সিদ্ধাইর গুরুবাদ, বৈষ্ণবের লীলাবাদ ও অবতারবাদ, ইসলামের পীরবাদ ও সুফীবাদ এক আশ্চর্য্য সমন্বয় ও সঙ্গৎ লাভ করিয়াছে। কেচ্ছা, রাখালী, পালী, বারমাস্যা, সকল প্রকার গ্রাম্য গানের অশ্রুধারায় নিষিক্ত হইয়া এই মুর্শিদ্যা গানের ক্রমোৎপত্তি। এই কান্নার সাধনা—আত্মমুক্তির বেদনার সুরে সিক্ত, পল্লীপ্রাণের করুণ অভিব্যক্তি! যে গানে মুর্শিদ, অর্থাৎ গুরু অর্থাৎ মানুষ ভজনা রহিয়াছে—তাহাই মুর্শিদি গান। বৌদ্ধরা যেমনভাবে অনুষ্ঠানাদি করিয়া প্রেত আনয়ন করিত. মুর্শিদি দলের লোকদেরও তেমনিভাবে সাধারণত দরগাতে উরূছের অনুষ্ঠান করিয়া 'গাছা' আনিতে দৃষ্ট হয়।

বাংলাদেশে সাধারণ ইসলাম যেভাবে প্রচারিত হয়, তাহা জন সমাজ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। আলেমদের দেওয়া ইসলাম বাঙ্গালী চাষীর, জীবনে অনেকাংশে আশ্চর্য্য রকমে বিফলিত হইয়া গিয়াছে—শরিয়তের হুবহু প্রচলন বাঙালার মাটী সহিতে পারে নাই। তাই মুসলমান চাষী সঙ্গীতাদি সম্পর্কে শরিয়তি নিষেধকে উপেক্ষা করিয়া বৈষ্ণবীয় লীলাবাদের ছায়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। শাহ্জালাল ও প্রসিদ্ধ বার আউলিয়াগণ বাংলার পল্লীতে যে আদর্শ ও তত্ত্বজ্ঞান বহন করিয়া আনেন, বাংলার তত্ত্বজ্ঞান ভক্তরা সেই সমূহকে আপনাদের ভাব ধারায় বিমিশ্রিত করিয়া একটু উপভোগ্য করিয়া লয়। পতিশ্চমাগত আওলিয়াগণ যত বড় জাগ্রত জীবন ও বীর্য্যবন্ত মারফতী সাধনাই নিয়া এদেশে আসুননা কেন, এদেশের শাহ্ ঈলাল ফকীর, কুসুম দীয়ার ফকীর, তিনু ফকীর, কালু ফকীর, গণী ফকীর প্রমুখ ভক্তগণ প্রচারিত মারফতী বিদ্যা ও সুফীবাদকে আপনাদের জীবনে বৈষ্ণবীয় লীলামাধুর্য্যে ঢালিয়া গ্রহণ করিলেন।

মারফতী গানে যে আমরা অধিক ও বিশেষ করিয়া হজরত আলী, বিবি ফাতিমা, এমাম হাসান, হোসেনের প্রশংসাদি শুনিতে পাই—তাহার কারণ উক্ত পন্থী ফকীরদের মতে হজরত আলীই হইয়াছেন 'সাঁই দরদী'কে পাইবার পথের একমাত্র সিংহ দরজা। তাই আধুনিক

www.pathagar.com

ফকিরী গানে বিশ্বমাতা (?) বিবি ফাতিমা সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত তত্ত্বাদিসংকুল উপাখ্যান সংলগ্ন হইয়া আছে।

মুর্শিদ্যা গানে আমরা দেহতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব বিষয়ক গভীর ভাবাত্মক নানা জটিল মীমাংসার সন্ধান পাই। মানুষ এই জীবনের রহস্যগুলি জ্ঞাত হইবার জন্য চিরকালই অল্প বিস্তর সন্ধানী। নিজেদের মধ্যে সেই সন্ধানী শক্তির অপ্রাচুর্য্য হেতু অক্ষমদের এই পীরের আশ্রয় লওয়া ব্যাপারটা মানবসুলভ। বাঙলার পল্লীতে যে সাধু ফকীর এহেন দুই একটা জটিল প্রশ্নের যৎকিঞ্চিৎ সমাধান করিতে পারিয়াছেন, তাহারই চতুঃপার্শ্বে দুর্ব্বল নিরক্ষর লোকেরা দলে দলে মুরীদে সাজিয়া কিছু আলোক লইতে আসিয়াছে। আমরা লালন ফকীর, শ্যানাল ফকীরের লক্ষ লক্ষ শিষ্য দেখিতে পাই। লালন ফকীর ধর্ম্ম মতে হিন্দু, ব্রাহ্মণ বা মুসলমান, কোনো মতেই সম্পূর্ণভাবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তাঁহার হজ, কোরবানী প্রভৃতি সম্পর্কে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাসকল এক বিশ্ব ধর্ম্মের মুক্ত সুরের আভাস দেয়। তিনি মদিনার হজরত মুহম্মদকে আসল মুহম্মদ বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই, তাঁহার মতে সত্যকার নবি অন্ধকার, ধন্ধকার, নৈরাকার, কুয়াকার এই চারি 'কারে'র উপরে অবস্থিত। যাহা হউক লালন ফকীরের তত্ত্বাদি—

'কোন্ বনে গেলিরে কানাই? ও তুই দাঁড়ারে—
আমি পথের পদচিহ্ন পাই',

প্রভৃতি লীলা-রস-সিক্ত সঙ্গীতকে ছাড়াইয়া স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভানুশা, ঈলাল শা'র তত্ত্ব মীমাংসা রাধা-কৃষ্ণের লীলাবাদের কুয়াসা কাটিয়া মানুষের সামনে তুলিতে পারে নাই। ভানুশা একখানে গাহিতেছেন—

'ও শ্যাম কালিয়াও, কালাকালা বলি যারে,
সে থাকে গোয়ালার ঘরে
সেকি জানে প্রেমের বেদনা,
বন্ধেরে নিয়া এত প্রেম জ্বালাও॥'

ঈলাল শা'র একটি গানে আছে—
সই সই, কালারে যদি পাইতাম গো॥'

বস্তুতঃ তাঁহাদের সঙ্গীতে শুধু অনন্তের সন্ধান আর বিরহের কান্নাই গুমরিয়া ওঠে।

পল্লী অন্তরের এই রাধা কৃষ্ণ মালাধর বসুর ভাগবতের রাধা কৃষ্ণ নয়। বিরহী সারিন্দার ঝংকারে, মেঠো বাঁশীর সুরে সুরে, গো-চারণের মাঠে, ত্রিবেণীর ঘাটে, ভজনালয়ের আড়ালে বসিয়া বাংলার লোক সাধারণ আপনাদের দুঃখ বেদনা বিরহ দিয়া এই রাধা কৃষ্ণকে কল্পনা করিয়াছে; আর গংকুড়ের ধ্বনির সাথে সাথে ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরিয়াছে। আরবী ভাষায় নিতান্ত ব্যুৎপন্ন বিংশ শতাব্দীর সংরক্ষণবাদী মুসলমান মৌলবী সাহেবও এই বৈষ্ণবাদর্শের দুরন্ত প্রভাব হইতে কোনো মতে মুক্ত হইতে পারেন নাই। নিম্নে একটি গানের উল্লেখ দ্বারা মন্তব্যটা স্পষ্ট করিয়া দিতেছি—

'সোনা বন্ধু ও—তুমি বই আর কে আছে সংসারে ও॥
এছারা জীবনের আশা, আমায় করলে নৈরাশা
আর কি অমন জনম দিবা মোরে, ও বন্ধো॥

www.pathagar.com

ও বন্ধুও ! একদিন রাত্রে কুঞ্জে এসে দুই একাসনে
হস্ত দিলা মাথার পরে ও
ছাড়বে না ছাড়বে না বলে, কত আশা দিয়াছিলে
এখন সে সব কথা নাই। তোমার অন্তরে, ও বন্ধো॥
ও বন্ধুও ! দেখেছি এই ব্রজপুরে, ধেনু ব্যস মাঠে চরে,
গাভী যখন যায় চলে দূরে ও
বৎস যখন হাম্বা করে, গাভী আয় গো ত্বরা করে
সেরূপ আমি আহাদ পড়্যাছি তোর দূরে ও বন্ধো॥'

পরবর্ত্তী যুগের মহাজন পদাবলী বা মুসলমানদের এই মারফতী গানের পূর্ব্বরূপ রহিয়াছে বৌদ্ধযুগের সহজিয়া সিঙ্গার গানে ও দোহায়। বৌদ্ধ সহজিয়ারা লোকপ্রিয় পট মঞ্জরী বঙ্গাল রাগে জনসাধারণে তাহাদের প্রচার গাহিয়া আমোদিত হইত। 'কাহ্ন' সম্বোধনটা সেই যুগেও দৃষ্ট হয়। বুঝিবা তাহারই মোহন প্রভাবে অনেক মুসলমানী মারফতী গানে 'গউর' 'কালা' ও 'কানাই' সম্বোধনটা নিতান্ত প্রচলিত হইয়া গেছে। মারফতী ফকীরদের মধ্যে একটি সাধারণ কাহিনী এমনতর শোনা যায়। একদা হজরত আলী আসিয়া হজরত মোহাম্মদকে জ্ঞাত করান যে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুরের আঘাতে তাঁহার নামাজের নিত্য ব্যাঘাত ঘটে ; অতএব আদেশ পাইলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মস্তকচ্ছেদ করিতে প্রস্তুত। হজরত শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে হজরত আলীকে তাহার মুখাবরণ উন্মোচন করিয়া বদনমণ্ডল দেখিয়া লইতে আদেশ করেন। আদেশ মতো বাঁশীর সুর অনুসরণ করিয়া করিয়া যখন আলী বংশীবাদনে সমাহিত মন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইলেন, তখন ক্রোধে তাঁহার হস্তস্থিত জুলফিকার কাঁপিয়া উঠিল।—কৃষ্ণকে হত্যা করিতে তিনি প্রস্তুত হইয়াছেন ; হঠাৎ হজরতের শেষ অনুরোধ তাঁহার মনে উদিত হইল। তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীকৃষ্ণের মুখাচ্ছাদন মোচন করিয়া চকিত হইয়া দেখিলেন যে, যাহাকে তিনি বধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন তিনি যে হজরত মোহম্মদ স্বয়ং ইত্যাদি। মোহাম্মদ ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়ই যে একই ব্যক্তি এই মিথ্যা ধারণাই গ্রামের বিস্তর মুসলমানদের মধ্যে গাঢ়তর রূপে বদ্ধমূল। এই অংশে রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণে'র প্রভাব অনেকটা রহিয়াছে। এই রামাই পণ্ডিত কবীরের মতো একজন প্রবর্ত্তক কবি ; ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মিলন ইচ্ছায় তিনি সদ্ধর্ম্মের প্রচলন করেন। তৎকালে তীর্থিক ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের ধর্ম্ম বিতণ্ডার ফলে পশ্চিম বঙ্গে এই সদ্ধর্ম্মের ও পূর্ব্ববঙ্গে গোরক্ষনাথ প্রবর্ত্তিত নাথমার্গের উৎপত্তি ঘটে। হাড়ি পা, কানু পা প্রভৃতি এই নাথ মার্গেরই প্রচারক কবি।

আনন্দ বঞ্চিত হইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। শুধু ধর্ম্মের গোঁড়ামি আর অনুশাসন জীবনে কয়দিন একাধিপত্য করিতে পারে? তাই বাংলায় প্রচারিত সাধারণ ইসলাম রূপ বদলাইয়া আনন্দ মাধুর্য্যের সহিত নিজেকে জীবনে খাপ খাওয়াইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে। এই জন্যই তথাকথিত ফকির ও শা'দের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় হইতেই লক্ষ লক্ষ লোককে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে দেখিতে পাই। অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির দরুন নব ব্রাহ্মণ্য সমাজের মেরুদণ্ড নিতান্তই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল—বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসারের সাথে সাথে শ্রীচৈতন্যের উদ্বেল ভক্তি ও প্রেমোচ্ছ্বাস পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণবদের জীবনের বিলাস মত্ততা ও ব্যভিচারের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিল। যাত্রা অভিনয়ে শ্রীভগবানের মানবরূপে আবির্ভাবের

www.pathagar.com

যে দৃশ্যসকল দেখা যায়, তাহাই হইয়াছিল তৎকালীন বৈষ্ণবদের তপস্যাহীন জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। অতএব সেই যুগে আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে তথাকথিত ফকিরদের দ্বারা এহেনভাবে প্রচারিত ইসলামের একেশ্বরবাদ, সুফীবাদ,সর্ব্বমৈত্রী সমস্ত বাঙলাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত, তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে। তাই শরিয়ত প্রচারকদিগকে এই মুসলমান বাউলদের জীবনের সত্য ও সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করিতে অনুরোধ করি। বাউল ধ্বংস ফতোয়া ঝাড়িলে শুধু চলিবে না ; বাউল ফকীরদের আদর্শকে আজ সম্ভবমতো শুদ্ধ করিয়া সাংসারিক বৈচিত্র্যমুখী আনন্দকামী জীবনে আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

বৈষ্ণবলীলাবাদের চরম পরিণতি রহিয়াছে গ্রাম্য 'গাড়ুগানে'। এই গানে সাধারণতঃ অনেকস্থানে দুই দলে গাওয়া হয়। কিংকিনীর সুরে সুরে চাষী যুবকের মন সম্মুখের সমস্ত ভোগ কামনার ছবি হইতে অতি দূরে উদাস হইয়া চলিয়া যায়। বন্দনা ভজনা সালাম হইতেই সমের সাথে সাথে সমস্ত জনসভা চীৎকার করিয়া উঠে। প্রত্যেক পালা বিভিন্ন অংকে বিভক্ত যথা—বংশী, গোষ্ঠ, বিরহ, সন্ন্যাস, সিনান, জল-ভরণ, উদাস, বিচ্ছেদ, সখী, সন্ধ্যা, নিন্দুয়া বা নিদ্রা, স্বপন, ভোর, কোকিল, প্রভাত, ফুলতোলা প্রভৃতি। এই অঙ্কগুলিতে রাধাকৃষ্ণের জীবনের সাধারণ কল্পিত ঘটনা সম্বলিত সঙ্গীত, সঙ্গীতের খেয়াল ও সম একে একে গীত হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের ভজনাদি এই গীতিখণ্ডগুলিতে এক পরমাশ্চর্য্য সরল রূপ লাভ করিয়াছে। এই যে অনুষ্ঠানে মিলনের কোন অংশ নাই, শুধু একটানা বিরহ আর অনন্তের প্রতীক্ষা।

উত্তর পূর্ব্ব ঢাকাতে অল্প দিন পূর্ব্বে 'নিমাই সন্ন্যাস' গাহিবার জন্য গুষ্ট ও খেলা নামে যুগল কবিওয়ালার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। প্রতিভাবান বীর কবি ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে'ও আমরা মুসলমানী প্রভাব বিস্তরভাবে দেখিতে পাই। বহুকাল দুই সমাজের একত্র বসবাসের ফলে হরি ঠাকুরকে উর্দ্দু জবানে বক্তৃতা করিতে দৃষ্ট হয়। কিন্তু গুষ্ট ও খেলার সন্ন্যাস গীতি এই শতাব্দীর হইলেও ইহাতে কোন প্রকার মুসলমানী বা বাহিরের প্রভাব তেমন পরিলক্ষিত হয় না।

বাঙ্গালী মুসলমানের বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভাবমুক্ত যে গান পল্লীতে প্রচলিত আছে সে—'জারি' গান। 'জঙ্গনামা' প্রভৃতি পুঁথি মুখস্ত ও হজম করিয়া গ্রাম্য জারিওয়ালা এই গানের সৃষ্টি করিয়াছে। পল্লীর ধর্ম্মবিপ্লব, রাজনৈতিক গোলযোগ, সামাজিক হট্টগোল বা কোন প্রকার দাঙ্গা হাঙ্গামাদি কেন্দ্র করিয়া এই গান সাধারণতঃ রচিত হইত ও হয়। এই জারি গানের পেছনে পল্লীর এক সুন্দর ইতিহাস পাওয়া যায়। 'কবিগানে'র মতো এই 'জারিগান'ও দুই পক্ষে আড়াআড়ি করিয়া অগ্রহায়ণ বা পৌষের অপরাহ্নে কাঁধ ধরিয়া ধরিয়া গীত হয়। দলের কবি মুখে মুখে গান রচনা করিয়া দিয়া যান, আর সকলে সমস্বরে তাহা গাহিয়া যায়। ইহাতে প্রতিপক্ষের উপর অজস্র কটূক্তি, বিদ্রূপ বর্ষণ করা হয়, ও সাথে সাথে পাল্টা জওয়াব প্রদত্ত হয়। সঙ্গীত সমাপ্তির পর দুইদলে একত্রে ভূরি ভোজনের সময় জয় পরাজয়ের নির্দ্ধারণটা নিয়া সরল রহস্যালাপ করা হয়।

'পালী' গান বলিয়া যে গান 'গায়েন'রা শীতের রাত্রে গাহিয়া থাকে, সেই গানের উপকরণই বোধহয় সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন পুঁথি লেখকগণ তাঁহাদের পুঁথি সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত বিদ্যাসুন্দরের উপখ্যানটিও পল্লী হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছিল। 'বানেছা' 'শামারুক'

www.pathagar.com

প্রভৃতি পালীগীতের সহিত উক্ত নামীয় পুঁথিগুলির মিল যথেষ্ট রহিয়াছে। এই গীতের উপাদেয় চৌদিশি বন্দনা—

'পূবেতে বন্দনা করলাম পূবে ভানুশ্বর
একদিকে উদয় রে ভানু, চৌদিকে পশর'—

ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধেক গান ও অর্দ্ধেক কথা বিমিশ্রিত যে কেচ্ছা গাওয়া হয়, তাহাতে রূপকথার অনেক কাহিনী পরিদৃষ্ট হয়। হাল্কা আমোদ লাভের জন্য গেঁয়ো চাষীরা এই গানের বৈঠক করিয়া থাকে। অনেকে অনেক কিছু উপলক্ষে এই গান মানতও করিয়া থাকে। ইহার পিছনে এক অদ্ভুত সংস্কার সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে।

পল্লী বালক বালিকারা শেষ চৈত্রে দারুণ অনাবৃষ্টির দিনে 'মেঘ রাজার গান', পুতুল বিয়েতে 'বিয়ের গান', 'নায়রে আসার গান' ঘোর বাদলার দিনে বৃষ্টিভেজা 'শিবা ঠাকুরের বিয়ের গান' প্রভৃতি গাহিয়া থাকে। তাহারা কেচ্ছা ও রাখালী শুনিতে শুনিতে মাঝে নায়ক নায়িকার আবেদন উত্তর, বাদ প্রতিবাদ প্রভৃতি মূলক অনেক 'কেচ্ছার গান' শুনিয়া থাকে।

আজকাল অন্নচিন্তায় পল্লীর কৃষক সঙ্গীত চর্চ্চার অবকাশ করিতে পারিতেছে না। তাহার উপর সংরক্ষণশীলদের দৌরাত্ম্যে তাহাদের জীবন যেভাবে সঙ্গীত-রস হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে, তাহাতে অতি অল্পকালের মধ্যেই বাঙ্গালী মুসলমানের সমস্ত প্রকার লোক-সঙ্গীত যে লুপ্ত হইয়া যাইবে, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। বাংলার লোক সঙ্গীতে বাঙ্গালী মুসলমানের কি পর্য্যন্ত দান ও সৃষ্টি রহিয়াছে তাহার সীমা নির্দ্দেশ সুসাধ্য নহে। কারণ উক্ত বিষয়ের উপকরণ চাষীদের মুখে মুখে—তদ্ব্যতীত সম্মুখে সংগৃহীত উপাদান কিছুমাত্র নাই। অত্যল্পকাল পরই এই raw materials'ও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। অতীতের এই গৌরবের উপকরণসমূহ সংগ্রহ করার পক্ষে আজ পর্যন্ত মুসলমান সমাজে যথেষ্ট উদ্যম দৃষ্ট হয় নাই। ইহা একটা জাতির পক্ষে গূঢ় পরিতাপ ও দুর্নিবার লজ্জার বিষয়, বলিতে হইবে।*

---

* এই প্রবন্ধে লেখক বৈষ্ণবধর্ম্মকে একটি মৌলিক ভাবধারা বলে মনে করে কয়েকটি মত প্রকাশ করেছেন—তাহা ঐতিহাসিক সত্যসম্মত নয়। ইসলামের প্রভাবই যে বৈষ্ণবভাবধারার জননী সে কথা অনেকখানি প্রমাণিত হয়েছে, যদিও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবেই শ্রীচৈতন্য সাধারণ হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। ইতিহাসের কথা না হলে বোধহয় লেখকের মতের বিপক্ষে আমাদের বলবার কিছু ছিল না। ইসলামের সূফীবাদ যেমন হজরত মুহম্মদকে বেড়ে' রূপ পরিগ্রহ করেছে, সেরূপ বৈষ্ণবীয় লীলাবাদ শ্রীকৃষ্ণকে বেড়ে লালিত হয়েছে। সে ভাবধারা আদি উৎস হয়ত ইসলাম আবির্ভাবের পূর্বেও কোন ঐতিহাসিক যুগে ছিল, কিন্তু ইসল্যামের সাম্য, একেশ্বরতত্ত্ব, মুহম্মদের প্রতি ভক্তি, পীরভক্তি প্রভৃতি আদর্শ সে ভাবধারার একটি শ্রী ও রূপ দিয়েছে এবং সেইটাই বাংলার ধাতের জিনিষ। এজন্য অনেক মুসলমান কবি বা ফকিরের গানে বৈষ্ণবীয় ভাব দেখে বিস্মিত হতে হয়। আবার মুসলমান ও বৈষ্ণবের মধ্যে যে ঐক্য দেখা যায় সেটা হয়ত তাদের পূর্ববর্ত্তী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব হতেই প্রাপ্ত ; কারণ অনেক বৌদ্ধ বাঙ্গালী পীরের হাতে মুরিদ হয়ে মুসলমান হয়েছিল।

সম্পাদক

www.pathagar.com

বাঙ্গালী মুসলমানের আর্থিক সমস্যা

রকীবউদ্দীন আহ্‌মদ এম.এ.

বাঙ্গালার বিশাল মুসলিম সমাজের জাতীয় চিহ্ন স্বরূপ যে ছবিটি আজ জগতের সম্মুখে মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে সেইটি তাহাদের নিদারুণ অভাব। অবশ্য দুই চারিটি পরিবার আছে যাহারা পিতৃ পুরুষদের দুঃখক্লিষ্ট অর্জ্জিত অর্থের বৃথা অপচয়ে নিজেদের বিলাসপ্রিয় আকাঙ্ক্ষাহীন জীবনকে অর্থহীন সম্ভোগে টানিয়া আনিয়াছে ; —হয়ত পরবর্ত্তীদের কোন সংবাদই নাই—কিন্তু অধিকাংশ মুসলিমকেই অর্থের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব এবং শক্তির অভাব চতুর্দ্দিক হইতে এমনিভাবে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়াছে যে, তাহারা হাড় ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়াও—উচ্চ জীবনের কথা ত দূরে, কেবল দৈনন্দিন জীবনের অতি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিও সংগ্রহ করিতে অক্ষম। তাহারা বাঁচিয়া আছে শুধু বাঁচিবারই জন্য—বিশ্বপতির অসীম স্নেহ ও প্রকৃতির অযাচিত দান গ্রহণ করিবার মত শক্তি তাহাদের নাই।

সমগ্র ভারতের প্রায় ৩২ কোটি অধিবাসীর মধ্যে মুসলিমের সংখ্যা অন্যূন ৬ কোটি ৯০ লক্ষ। যদিও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্থানে শতকরা মোটে ১০ জন হিন্দুর বসতি তথাপি অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশেই মুসলিমের সংখ্যা সমধিক আর এখানেই তাহারা পথভ্রষ্ট। উত্তালতরঙ্গ বঙ্গোপসাগরের উন্নতশিরে চরণ রাখিয়া, শত শাখাময়ী গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের পদরজঃ বক্ষে ধারণ করিয়া, প্রকৃতির নিভৃত-নিলয়ে এই বিংশতি শতাব্দীর বঙ্গমাতা তাহার দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ মুসলিম সন্তানকে কেবল মুসলমানই করিয়া রাখিয়াছে, মানুষ করে নাই। তাই মাতৃদ্রোহী আমরা বাংলার আকাশ বাতাস লুট করিয়া কবি-কল্পিত 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' লঙ্ঘন করিয়া অভাবের বিপুলতায় অপমান করিতে চাই।

বিগত দুইশত বৎসরের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজ আমরা এমন একস্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, যাহার চারিপাশেই অন্ধকার, ঘোর অন্ধকার। মুসলিম এখন শক্তিহীন, নির্বীর্য্য। বাঙ্গালী মুসলমান কেন এত নিঃস্ব, এত দিশেহারা কোনখানে তাহাদের ব্যথা—প্রত্যেক পরিবারের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় ঘটনাবলী হইতে তাহাদের দুঃখের কারণ বাহির করিয়া তবে সকলের বিশেষ করিয়া শিক্ষিত শ্রেণীর সমবেত প্রচেষ্টা দ্বারা সেই দুঃখের অবসান করিতে হইবে। সামাজিক জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে সাহিত্যের ভিতর দিয়া। কিন্তু সেই সাহিত্য নিতান্ত অপূর্ণ যাহা কেবল ভাষা ও ভাবের লীলাভূমি, বাস্তব জীবনের কর্ম্ম ক্ষেত্রের সহিত যাহার কোন সম্বন্ধ নাই, অথবা যাহা বহু বিস্তীর্ণ বহুরূপী হইয়া সমাজের বিচিত্র কর্ম্মধারাকে মাথায় তুলিয়া নেয় না।

মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ইতিহাস জানিতে হইলে প্রথমেই দেখিতে হইবে তাহার আয় ব্যয়ের পথ। অসীম উন্মুক্ত আকাশের নিম্নে প্রান্তর মেখলা উলঙ্গ পল্লী গ্রামের 'শান্তি

www.pathagar.com

নিকেতনে' কাটিতেছে লক্ষ মুসলিমের লক্ষ্য-বিহীন শৃঙ্খলাবদ্ধ অশান্ত জীবন। চাষা তাহাদের নাম, মাটি তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র, রোগ তাহাদের অভিভাবক, মূর্খতা তাহাদের অভ্যাস' আর সর্ব্বোপরি দৈন্য তাহাদের চির সহচর। চারিদিকে এই ভীষণ মৃত্যুর সম্মুখে এখনও যে তাহারা বাঁচিয়া আছে এই তাহাদের গৌরব।

প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে যখন বিদেশী পণ্যদ্রব্যে ভারতবর্ষ পূর্ণ হইতে লাগিল, সেই সময় হইতেই ভারতের বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশের 'কাঁচামাল' বহির্ভরিতের পথ অবলম্বন করিয়াছে। ইংলন্ডে বাষ্পচালিত শিল্প যন্ত্রাদি প্রচুর খাদ্য সরবরাহ করিবার মানসে ১৮৩০ খৃস্টাব্দ হইতেই ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গীয় কৃষির উন্নতির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। কিন্তু কমিশন-এর পর পর কমিশন বসিয়াও আজ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই।

ইংরেজী ১৯১৯-'২০ সালে প্রকাশিত কৃষি সমাচারে পরিলক্ষিত হয় যে, বাংলাদেশে দুই কোটি চৌচল্লিশ লক্ষ ছিয়ান্নব্বই হাজার আটশত একরভূমি, এক কোটি দশ লক্ষ ষাট হাজার ছয়শত উনত্রিশ জন লোক দ্বারা আবাদ হইয়া থাকে। অতএব স্পষ্টই দেখা যায়, একজন লোক গড়ে ২.১১ একর ভূমির অধিক চাষ করিতে পায় না। ইহাই বাঙ্গালী কৃষকের দরিদ্রতার প্রধান কারণ। কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিয়া অত সামান্য পরিমাণ ভূসম্পত্তির উপর কোন জাতিই অধিকদিন বাঁচিতে পারে না। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই বৎসরের কয়েকদিন তাহারা অসহ্য পরিশ্রম করে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে কর্ম্মহীনভাবে পড়িয়া থাকিতে হয়। ইংলন্ড এবং ওয়েলস্ প্রদেশে একত্রে অন্যূন দুই কোটি ষাট লক্ষ একর জমির চাষ হইয়া থাকে। তাহাতে সবেমাত্র বার লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আটশত উনষাট জন কাজ করে। অতএব ইংলন্ডের হার জন প্রতি বাংলাদেশের দশ গুণ বা একুশ একর। যদিও ভিন্ন ভিন্ন দেশে মাটির উর্ব্বরতা শক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তথাপি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে কৃষি কর্ম্ম সম্পন্ন হইতে আমাদেরও খাদ্যের অভাব হইত না। জাপান দেশে কেবল এক কোটি সত্তর লক্ষ একর ভূমির উপর পাঁচ কোটি ষাট লক্ষ লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। আর আমরা তার দ্বিগুণ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও অন্নদায়ে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছি। তদুপরি এখনও বাংলাদেশে প্রায় তিষট্টি লক্ষ একর পতিত জমি আছে যাহার উপর সামান্য আয়াসে কৃষি কর্ম্ম চলিতে পারে।

বঙ্গদেশের এই অত্যল্প পরিমাণ উৎপন্ন দ্রব্যের উপরই শতকরা ৭৭.৩ জন লোক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ফলে আমরা দিন দিন অন্নহীন শক্তিহীন হইয়া অকাল মৃত্যুর শরনাপন্ন হইতেছি। যতদিন আমরা শারীরিক ও মানসিক শক্তির পুনরুদ্ধার করিতে না পারিব, ততদিন রাজনীতি, সমাজনীতি বা ধর্ম্মনীতি কোন নীতিরই পূর্ণ সাধন হইবে না। যাহার শক্তি নাই তাহার মুক্তি কামনা বৃথা।

বর্ত্তমান মুসলিমের অর্থনৈতিক জীবনের এই ভীষণ দুর্গতির অনুকূলে যে সকল কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে তন্মধ্যে

১. প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা (dependence upon nature)
২. অনুন্নত কৃষি প্রণালী (crude method of cultivation)

www.pathagar.com

৩. উত্তরাধীকারী স্বত্বের আইন (the law of Inheritance)
৪. ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড সম্পত্তি (small holding)
৫. অতিরিক্ত ঋণ (heavy indebtedness)
৬. জন সাধারণের অজ্ঞতা (ignorance of the mass)
৭. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (permanent settlement) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বঙ্গে কৃষি মেঘরাজের দ্যুত-ক্রীড়া। সময়মত আবশ্যকানুসারে বৃষ্টি না হইলে কৃষক হার মানিতে বাধ্য। কাজেই কোনো বৎসর অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টি হইলে তাহাদের দুঃখ দৈন্যের সীমা থাকে না। জল সেচন প্রণালী দ্বারা অনাবৃষ্টির সহিত কোনো প্রকারে যুদ্ধ করা যায় বটে, কিন্তু দেশের খাল বিল ও শুষ্ক নদীসমূহের পুনঃ সংস্কার দ্বারা জল নিকাশের সুব্যবস্থা না হইলে অতি বৃষ্টির উৎপীড়ন হইতে কোনো মুক্তি নাই। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডিপুটি ডিরেক্টার স্মিথ সাহেব বলিয়াছিলেন যে, কৃষি বিজ্ঞানের সাহায্যে পাটের পরিমাণ শতকরা সত্তর ভাগ বেশী এবং ধান ও অন্যান্য শস্য ফসলাদি প্রায় দ্বিগুণ হারে বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। কিন্তু কালচক্রের ধীর পরিবর্ত্তন ও মানব বুদ্ধির ক্রম বিকাশের অন্তরালে থাকিয়া আমাদের কৃষক শ্রেণী এত অজ্ঞ এবং তাহাদের কৃষি প্রণালী এত স্থূল যে আজ পর্যন্তও তাহারা আদি মানব প্রতিষ্ঠিত কৃষিনীতির অতি সাধারণ নিয়মগুলিরও কোনো সুপরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই। অন্যদিকে উত্তরাধিকারী স্বত্বের আইন বলে আমাদের ভূসম্পত্তি শত শত ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে যে, বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করার পথ এক প্রকার রুদ্ধ (অসম্ভব)। আর যদিওবা কাহারও ইচ্ছা হয়, তথাপি অর্থের অভাবে সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না। তদুপরি ঋণ/ঋণের বোঝা এত ভারী যে পিতা পিতৃমহ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌত্র দৌহিত্র পর্য্যন্তও তাহা বহন করিতে পারে না। রোদ-বৃষ্টির পুতুল লাঙ্গলবাহী কৃষক সম্বৎসর প্রাণপন পরিশ্রম করিয়াও কেবল সুদ দিয়াই টিকিতে পারিতেছে না। আজকাল সমবায়-ঋণদান-সমিতির আইন প্রচলিত হওয়ায় কৃষকদের একটুকু আশ্বাস হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদের পরিবর্ত্তন বিরোধী অভ্যাসের বিরুদ্ধে এখনও তাহারা সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে সক্ষম নহে। অবশেষে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর অমঙ্গল বিধান, পুচ্ছবিহীন ধূমকেতু, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ১৩৪ বৎসর পূর্ব্বে যখন লর্ড কর্ণওয়ালিস এই বিধান সংস্থাপন করেন তখন বাংলাদেশ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলতায় পরিপূর্ণ। কাজেই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (১) রাজস্ব নিরাপদ ও নিশ্চয় করা এবং (২) অবাধ্য প্রজা ও গভর্ণমেন্টের মাঝখানে এমন একশ্রেণী লোক তৈরী করা, যাহারা প্রজাকে কঠোর শাসনে আবদ্ধ রাখিয়া সরকারের 'সুপুত্র' নামে অভিহিত হইবে। ইহা গভর্ণমেন্টের পক্ষে লাভজনক হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রজাকে অধঃপাতের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অভয়বাণীতে বাংলার কৃষক আজ অমিতব্যয়ী অদূরদর্শী। এইজন্যই তাহারা উচ্চ হারে টাকা কর্জ্জ করিয়া চাষাবাদ করিতেছে, তথাপি এই মায়ায়-ঘেরা মাটি ছাড়িয়া অন্যান্য শিল্পানুষ্ঠানে মন দিতে পারে না। জমি বন্ধক রাখিয়া ধার করিতে পারে

www.pathagar.com

বলিয়াই অর্থের সামান্য অভাব হইলেই কুসীদজীবীর শরণাপন্ন হয়, ভবিষ্যতের কথা একবারও ভাবিয়া দেখে না। এই বাংলাদেশে প্রায় তের লক্ষ বিশ হাজার লোক, যাহারা জমিদার বা তালুকদার নামে পরিচিত তাহারা কেবল প্রজাদের খাজনার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। ফলে কৃষকগণ অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অত্যধিক পরিমাণে অতিরিক্ত ট্যাক্স দিতে বাধ্য হয়। যে স্বত্ব নিশ্চয়তার স্নিগ্ধ ছায়াতলে রাখিয়া সরল স্বভাব চাষীকে মিথ্যা গৌরবে গৌরবান্বিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই স্বত্বই যে প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে ধ্বংসের পথে আকর্ষণ করিতেছে, সে কথা কি বিশ্বব্যাপী চীৎকার করিয়া বলিলেও বাঙ্গালী কৃষক বিশ্বাস করিবে? যদি এই বিধানই সর্ব্বতোভাবে সমীচীন হইত, তাহা হইলে পুনঃপুন প্রজাস্বত্বের আইন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইত কি?

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৌজন্যে বাঙ্গালী আজ শিল্পহীন কর্ম্মহীন। সমগ্র বাংলাদেশে শিল্পের উপর নির্ভর করিয়া আছে। মোটে শতকরা সাড়ে সাত জন; স্টীমার ও রেলওয়েতে শতকরা দেড় জন, চাকুরিতে হাজারে এক জন (মুসলমান তিন হাজারে এক জন) এবং বাণিজ্যে শতকরা পাঁচ জন। এই প্রদেশের প্রায় তিন ভাগের দুইভাগ অধিবাসীই সাধারণ কৃষক। তন্মধ্যে প্রায় তিরানব্বই লক্ষ লোকজন রীতিমত পরিশ্রম করে, আর অবশিষ্ট দুই কোটি তের লক্ষ লোকই তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। তদুপরি প্রতি এক লক্ষ লোকের মধ্যে নয়শত বায়ান্ন জন একেবারে কর্ম্মহীন। পরমুখাপেক্ষী অলস এই অকর্ম্মন্যদের মধ্যে মুসলিমের সংখ্যাই অধিক।

কৃষি ব্যতীত অন্যান্য কাজকর্ম্মে মুসলমানদের সংখ্যা অতিশয় সামান্য। হিন্দুদের তুলনায় তাহারা মোটে পাঁচ জনে একজন। বাংলার মধ্যস্থিত বাণিজ্য প্রধান কেন্দ্রসমূহে মুসলমান নাই বলিলেই হয়। বর্ত্তমানে প্রতি মাইলে শ্রীরামপুরে আটশত একান্ন জন হিন্দু, বৈদ্যবাটীতে নয়শত পঁয়ত্রিশ জন, কোন্নগর চাম্পদানীতে সাতশত সাতচল্লিশ জন এবং টিটাগড়ে সাতশত পঁচিশ জন। শিল্প–বাণিজ্যের প্রধান স্থান শহর, আর শহরে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে ঢাকাতে প্রতি মাইলে পাঁচশত পঁয়ত্রিশ জন হিন্দু এবং চারশত সাতান্ন জন মুসলমান এবং পাঁচশত ঊনাশি জন হিন্দু, আর মুসলমান ব্যবসায়ীদের মধ্যে অধিকাংশই গাড়োয়ান, খালাসী ও দরজী; যদিচ অনেক অনুসন্ধানের পর দুই একটা বস্ত্র বা মনোহারী দোকান পরিলক্ষিত হয়। চর্ম্ম ব্যবসায় ঢাকাই মুসলমানের একচেটিয়া বন্দোবস্ত কিন্তু এমন কোন উচ্চাভিলাষী মুসলিম নাই, যিনি সুশিক্ষিত চর্ম্ম বিশারদের সাহায্যে এইখানে একটা ট্যানারি খুলিতে পারেন।

চাষীদের মধ্যে যেমন মুসলমানগণ হিন্দুদের দ্বিগুণ, জমিদারদের মধ্যে তেমনি হিন্দুগণ মুসলমানদের দ্বিগুণ। শক্তিশালী ভূম্যধিকারীদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। মোগলদের সময়েও এইরূপ অনেক ঘর হিন্দু জমিদার ছিল, কিন্তু তখন মুসলিম জমিদারের সংখ্যাই ছিল বেশী। দূরদর্শিতার অভাবে ক্রমে আমাদের প্রায় সবগুলি জমিদারই কপর্দ্দকশূন্য হইয়া পড়িয়াছে; আর যে কয়েকটা আছে তাহাও একপ্রকার পতনোন্মুখ। কেবল এক ত্রিপুরাতেই সরাইল, বরদা খাত ও দোল্লাই পরগনার অন্তর্গত বড় বড় মুসলিম জমিদারী–গুলি হিন্দুদের হস্তগত হইয়াছে। তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া বিগত ১৯২১

www.pathagar.com

সালের সেন্‌সস কার্য্যের অভিজ্ঞ সুপারিনটেন্ডেন্ট টমসন সাহেব লিখিয়াছেন যে, (১) মুসলমানদের উত্তরাধিকারী স্বত্বের আইন এবং (২) বিশেষতঃ হিন্দুদের চতুর নীতিই এইজন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। উচ্চপদে মুসলিমগণ সর্ব্বদাই হিন্দু কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন। ইংরেজদের আগমনের প্রারম্ভে মুসলমানগণ স্পষ্টভাবে তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পারে নাই। অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত স্বত্বাধিকারীকে ক্রয় বিক্রয়ের শক্তি প্রদান করে। আর বিলাস-পরায়ণ মুসলমানদের অসাবধানতার সুযোগ পাইয়া হিন্দুগণ নিজ নিজ নামে সম্পত্তি ক্রয় বিক্রয় ও জমিদারির সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে থাকে। তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এইখানেই রহিয়াছে যে, বর্ত্তমান কালের প্রায় সবগুলি হিন্দু জমিদারই বৃটিশ রাজের আগমনের পর হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন হিন্দুগণও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু একটি মুসলমানও কি তাহাদের স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে? হইতে পারে হিন্দু কর্ম্মচারিগণ প্রভুভক্ত ছিল না, কিন্তু এই কথাটিও সম্পূর্ণ মিথ্যা নহে যে রমণীর নূপুর নিক্কনের মধুর ঝংকার ও আলবোলার শ্যামল স্নেহের বাঁধন কাটিয়া মুসলিম আমিরগণ সম্পত্তি রক্ষার মত সামান্য কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পছন্দ করিতেন না।

এই সকল দৈব দুর্ঘটনার নিষ্পীড়নে বাঙ্গালার মুসলিম আজ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে—

(১ম) ধ্বংসমুখী, অমিতব্যয়ী জমিদার শ্রেণী, যাহাদের বিলাসপ্রিয় সন্তান সন্ততিগণ সুশিক্ষার অভাবে হীন চিত্ত হইয়া পড়িয়াছে।

(২য়) ঋণদায়গ্রস্ত ভগ্নস্বাস্থ্য, জীবন ধারণে অনিচ্ছুক মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যাহাদের শত শহস্র লক্ষী ছাড়া কুসন্তান, ম্যাট্রিকুলেশন আই.এ. আর কেহ বা বি.এ., এম.এ. পর্যন্ত পাশ করিয়া হতশ্রী ভবঘুরের মত নিজেদের কর্ম্মহীন জীবন স্বপ্নের মত কাটাইয়া দিতেছে।

(৩য়) নিরন্ন উপবাসী, অনুন্নত স্বভাব শ্রমিকদল চির অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকিলেও কেহ যাহাদের কথা কল্পনাও করিবে না।

(৪র্থ) (ক) পরমুখাপেক্ষী নিরুপায় ভিক্ষুকের দল ; ও (খ) কতগুলি অর্ধশিক্ষিত লোক যাহারা ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে ও ভণ্ডামী করিয়া প্রতি গ্রামে নিজদের স্বার্থসাধন করিয়া ফিরিতেছে। তাহারা এত নির্লজ্জ যে, মানুষের উপর চড়িয়া বেড়াইতেও কোনো প্রকার সংকোচ বোধ করে না। আর তাহারাই চিরকাল কেবল এই শিক্ষাই দিয়া আসিতেছে যে, 'অর্থ অসার, অর্থের চিন্তা করিলে মানুষ জাহান্নামী হয়'। কিন্তু এই অসহায় দরিদ্র কৃষকদের উপর তাহারা নিজেও কি কম দৌরাত্ম্য করিয়াছে? একদিকে অর্থ উপার্জনে নিষেধের বিড়ম্বনা, অন্যদিকে নিজেদের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিবার কঠোর আদেশ বাঙ্গালী মুসলিমকে এমন বিকৃত মস্তিষ্ক করিয়া তুলিয়াছে যে, আজ তাহারা সর্ব্বহারা সর্ব্বত্যাগী হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু কামনা করিতেছে, তথাপি পীরের আদেশ অমান্য করিতে অক্ষম।

আর কত বিশ্রী আমাদের পল্লীগ্রামগুলি! যাঁহারা পল্লীর প্রকৃত সংবাদ রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, পল্লীবাসী কত অনুদার, কত উচ্ছৃঙ্খল। গ্রামে জুমার মস্‌জিদ,

www.pathagar.com

পাঠশালা এই সকল সামাজিক অনুষ্ঠানে মত বিরোধ ঘটিলে গোপনে কত শস্য ক্ষেত্র উৎপাটিত হইয়া যায় ; মিথ্যা মোকদ্দমায় কত ভিটাতে ঘুঘু চরে। তার উপর স্বায়ত্ব শাসনের রাজ প্রসাদ। ইউনিয়ন বোর্ডের নব্য নির্ব্বাচন পদ্ধতি অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে এমন একটা অশুভ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি করে, যাহার প্রভাব শুধু রাজনৈতিক জীবনে নহে, সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ভয়ঙ্কর হইয়া দেখা দেয়। অশিক্ষিত জনসাধারণের হাতে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রদান করা আর পাগলের হস্তে বিষপাত্র প্রদান করা একই কথা।

কবির 'পল্লীরানী' অন্নদায়ে আজ রুক্ষমূর্ত্তি উন্মাদিনী সাজিয়াছে। একটু যত্ন সহকারে লক্ষ্য করিলে মনে হয় যেন তাহার উপর সান্ত্বনা বিহীন নিরানন্দ সমাজের চির দৈন্যের একটা অব্যক্ত বেদনা গম্ভীর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে মুসলিম পল্লীতে হাডুডু'র মত উল্লাস, গাজী কবিতার বীরত্ব কাহিনী ও ভাসান সঙ্গীতের আশ্বাসবাণী থাকিয়া থাকিয়া বসন্ত বাহারের তালে তালে শ্রান্ত কৃষকের সকল অবসাদ দূর করিত, আজ সেইখানে অশ্রু সজল ভৈরবী গানের শোক উচ্ছ্বাস বিরাজমান। কে বলিবে মুসলিম সমাজের এই অশুভ বিবর্ত্তন তাহাদের আত্মকর্ম্মের চরম বিকাশ, না নিয়তির তীব্র পরিহাস ?

বাংলার এই অধঃপতিত মুসলিম জাতি তরুণ শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে আর উঠিতে পারিবে না। চাকরির অভাবে অনেক উচ্চাভিলাষী উন্নতশির মুসলিম যুবক ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের শত সহস্র নিরুপায় ভাইদের রক্ষা করিতে হইলে তাহাদিগকে আবার নূতন উদ্যমে মাতিয়া উঠিতে হইবে।

১। পল্লী সংস্কার সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবন্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের প্রচার করা,

২। গ্রামের পাঠশালা ও মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষকদের সাহায্যে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা,

৩। গ্রামে গ্রামে সভা সমিতি করিয়া অজ্ঞ জনতাকে আলোক চিত্রের সাহায্যে বক্তৃতা প্রদান করা,

৪। তরুণ কৃষকদের মধ্যে কৃষি সমিতি সংস্থাপন করা, এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া আমাদের [illegible]তিশীল লোক সমাজে একটা নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে হইবে।

বেকার যুবকদের সাহায্যে প্রতি বাজারে অংশ বিক্রয় প্রকরণে ক্রয় বিক্রয়ের যৌথ ভাণ্ডার (Co-operative Stores) খুলিলে চাকরি ও অর্থ উভয় সমস্যারই কিয়ৎ পরিমাণে সমাধান হইতে পারে। পাট, ধান ইত্যাদি প্রধান শস্য ফসলাদির যৌথভাবে বিক্রয় করিবার (Co-operative Sales) বন্দোবস্ত করিতে পারিলে কৃষকের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাইবার যথেষ্ঠ সম্ভাবনা আছে। গ্রামে নিম্ন শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে কৃষি ও শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া কৃষকগণ যাহাতে নিজেদের উৎপন্ন শস্যে শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে, এই উপায় অবলম্বন করিয়া কর্ম্মহীন মুসলিমকে কর্ম্মে নিয়োগ করিতে হইবে। মুসলমান পাট তৈরি করে, কিন্তু পাটে কি হয় তাহা জানে না। চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ ইত্যাদি বাণিজ্য কেন্দ্রে অংশ বিক্রয় প্রকরণে পাটের চটকল স্থাপন করিলে কৃষি সমস্যার জটিলতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে দূরীভূত হইতে পারে।

www.pathagar.com

আজ বাঙ্গালী মুসলিমের আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছে। যাহাতে তাহারা মিতব্যয়ী পরিণামদর্শী হইতে পারে, যাহাতে বিবাহাদি অনুৎপাদক কার্য্যে সামান্য অভাব হইলেই কুসীদজীবির শরণাপন্ন হইয়া নিজেদের ভূসম্পত্তি উজাড় করিয়া না ফেলিয়া সমবায় ঋণ দান সমিতির প্রচার দ্বারা তাহাদিগকে সেই পথ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া মুসলিমের যদি সুদের ব্যবসা করিতে হয়, তাহাও শ্রেয়, তথাপি সর্ব্বহারা হইয়া পরমুখাপেক্ষী হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। চৌর্য্যবৃত্তি, ভিক্ষাবৃত্তি ইত্যাদি অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া লাঞ্ছিত, অপমানিত জীবন যাপন করার চেয়েও কি সুদ গ্রহণ নিন্দনীয়? এক সময় ছিল যখন গ্রীস, রোম, মিশর, বেবিলোনিয়া, আরব এবং ভারতবর্ষ ইত্যাদি প্রধান সভ্যাভিমানী দেশসমূহে অর্থ ব্যবসায়ীকে অনেক ঘৃণার চক্ষে দেখিত। কিন্তু এক্ষণে আর সেই দিন নাই। নীতি সাধনের বদান্যতা মানুষকে আলস্যপ্রিয় ভিক্ষুকে পরিণত করিয়াছে, স্বকীয় স্বত্বের পূর্ণ নিয়োগ না করিলে তাহার মুক্তি নাই। এইখানেই প্রবীণের বিরুদ্ধে নবীনের প্রথম অভিযান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন আমেরিকার কৃষিদ্রব্যে সমগ্র ইংলন্ড ছাইয়া ফেলিতেছিল, যখন ইংরেজ কৃষকগণ বিদেশী প্রতিযোগিতার ক্রমাগত আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়িল, তখন রবার্ট আওয়েন, আলফ্রেড্ টাউন্‌সেন্ড এবং বেন্‌থাম–এর মত সামান্য কয়েকজন লোকমাত্র চাষীদের মধ্যে এমন একটা নূতন জাগরণ আনিয়াছিলেন, যাহার ফলে এক্ষণে ইংলন্ডের কৃষকগণ বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেয়েও অধিক ধনবান। জাপানের বর্ত্তমান উন্নতির মূলে জাপানের যুবক শক্তি। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এই যুবকগণই নানা প্রকার বক্তৃতা প্রদান, পাঠাগার স্থাপন ও কৃষি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়া সমস্ত দেশকে জাগাইয়া তুলিয়াছে।

বাংলাদেশেও এমন একশ্রেণী লোকের প্রয়োজন হইয়াছে, যাহারা গ্রামে গ্রামে প্রচার কার্য্যের সাহায্যে অন্ধ মুসলিম সমাজে আলো দান করিবে। মুসলিমের কৃষি শিল্প, বাণিজ্য ব্যবসায়, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং ধর্ম্ম ও কর্ম্মের একতান বিশিষ্ট পুষ্টি সাধন করিতে হইলে প্রত্যেকটি যুকবেকই ধ্বংসের উপরে তাহার আত্ম প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতে হইবে। তাহাকে সঞ্চয় করিতে হইবে হজরত আলীর (মত) শক্তি, নেল্‌সনের (মত) কর্ত্তব্য জ্ঞান, আবুবকরের (মত) বিশ্বাস, নেপোলিয়নের আত্মবোধ, যশিদা টরাজিরোর শিক্ষা জ্ঞান এবং হজরত মুহম্মদের ক্ষমা ও আত্মত্যাগ।

এই বাংলাদেশে অন্যের যাহা অধিকার মুসলিমের তার চেয়েও বেশী অধিকার আছে। বখতিয়ার খিলজি হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলার শেষ নবাব পর্য্যন্ত এইস্থানে তাহার বীরত্বের দাবী, জন্মের দাবী। বীর্য্যবান মীর কাসেম রাজভাণ্ডার শূন্য হইয়া গেলে প্রজাদের হিত সাধনের জন্য সমস্ত শুল্ক প্রত্যাহার করিয়াছিলেন ; আর এতদিন পর হৃতসর্ব্বস্ব মুসলিম যুবক বাংলার লুপ্ত গরিমা পুনরুদ্ধার করিতে সামান্য চেষ্টাও করিবে না? জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার বিপুল সম্ভার বুকে নিয়া পার্শ্বে এত বড় একটা হিন্দু সমাজ উজ্জ্বল হইয়া বিরাজ করিতেছে, আর মুসলিম পরশ্রী কাতর চিত্তে, নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকিবে? তাহারও আশা আছে, ভবিষ্যত আছে। সেই ভবিষ্যতের দ্বার উদঘাটন করিতে যাইয়া হয় সে রুদ্রতেজে জাগিয়া উঠিবে, না হয় চিরতরে

www.pathagar.com

আত্মদান করিবে। এইখানেই তাহার 'শহীদ' নীতির স্পষ্ট অভিব্যক্তি, কর্ম্মজীবনের 'পুলসিরাত'।

বাংলার ঘরে ঘরে মুসলিমের সত্যমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠুক ; ভারতের স্থানে স্থানে তাহাদের আত্মশক্তির উদ্বোধন হউক ; জগতের দেশে দেশে দিশে দিশে ইস্‌লামের অগ্নি পরীক্ষার দাবানল জ্বলুক ; আকাশে বাতাসে জলে স্থলে বিশ্ব চরাচরে, 'তৌহিদে'র পুণ্যবাণী 'মাভৈ' রবে কাঁপিয়া উঠুক।

www.pathagar.com

বাঙ্গালী মুসলমানের সামাজিক গলদ

কাজী আনোয়ারুল কাদির এম.এ., বি.টি., বি.এল.

'সমাজ মাত্রই অতি গুরুতর বস্তু। সমাজ শাসনে পিতা, পোষণে মাতা, দুঃখে সহোদর, সুখে মিত্র।'

মুসলমান সমাজটি একটি অতি গৌরবের বস্তু। ইহার ইতিহাস অপূর্ব্ব। ইহার বন্ধন প্রণালী অভিনব এবং অনন্য সাধারণ। ইহার আদর্শ পবিত্র এবং ইহার আভ্যন্তরিক বল এত অধিক যে যত গরীবই হুউক না কেন ইহার মৃত্যু অসম্ভব। ইহা প্রাচীন মিশরীয়, আসীরীয়, পারসিক, গ্রীক এবং রোমীয় সমাজের কবর থেকে উঠে নূতন জন্ম নূতন দৃষ্টি ও নূতন শক্তি নিয়ে সমগ্র জগতকে মোহিত স্তম্ভিত করেছে। ইহার বয়স অল্প, কিন্তু 'সিংহ শাবক ক্ষুদ্র হলেও মদবিমলীন হাতীরে হানে।' তাই শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সুসভ্য ইংরাজ লর্ড স্বেচ্ছায় মুসলমানের ধর্ম্ম গ্রহণ করেছেন। বাস্তবিক ইসলামের সাম্য এমন চমৎকার, ইহার (পালন) Practice এত সহজ, সুন্দর ও স্বাভাবিক যে, আশা করা যায় যে, এমন একদিন আসবে যখন সকল মানুষই ইসলামকে বরণ করে নিতে বাধ্য হবে। যেমন বাধ্য হয়েছেন গুরু নানক, রাজা রামমোহন, স্বামী দয়ানন্দ প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকগণ। ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গঠন করেছেন। কিন্তু তাঁরা যে পথে চলতে চেয়েছেন, সে পথ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে ইসলামের দ্বারা। এদেশের অত্যন্ত রক্ষণশীল অতি প্রাচীন ও বিরাট হিন্দু সমাজও ইসলামের প্রভাবে অনেকখানি বিচলিত। হিন্দু সমাজের মূল ভিত্তি জাতি ভেদ আজ ইসলামের সংস্পর্শে টলমলায়মান। আশা করা যায় যে, ভবিষ্যতে এই জাতিভেদ চলে যাবে এবং মানুষে মানুষে ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্থাপিত হবে। নামের জন্য কিছু এসে যায় না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান, শিখ, ব্রাহ্ম, এগুলি শুধু নাম। নাম যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে ইসলাম কতখানি কাজ করেছে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

ভবিষ্যতে কি হবে, না হবে, সে ভবিষ্যতেই বুঝা যাবে। আপাততঃ আমরা দেখতে চাই, হজরত মুহম্মদ জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য যে যে পথ নির্দ্দেশ করে গিয়েছেন, আমরা ঠিক সই পথে চলছি কি না। বর্ত্তমানে যাঁরা ইসলামের খলিফা এবং যারা এই সমাজভুক্ত, তাঁদের কার্য্যকলাপের উপর আমাদের মুসলিম সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। শুধু একটা delicious hope নিয়ে সুখে নিদ্রা দিলে ভবিষ্যৎ যে অন্ধকার তা কাকেও বলে দিতে হবে না। আজকাল মুসলমান সমাজ যে রাহুগ্রস্থ অবস্থায় কাল কাটাচ্ছে এ সত্য গোপন করে কোন লাভ হবে না। এ দেশে অতীতে মুসলমান শাসনকালে যে সমস্ত অনাচার ও অত্যাচার হয়েছে, তার ফল যেমন ভোগ করছি আমরা আজকাল, আমরা যদি না শোধরাই তাহলে আমাদের পরবর্ত্তী সমাজের যে কি অবস্থা হবে, তা আমাদের ভেবে দেখা দরকার। অতীতের অনাচারের ফলে যে আমাদের এই দুর্দ্দশা একথা কেহ কেহ স্বীকার করতে নাও পারেন? কিন্তু বর্ত্তমানের সুকৃতির ফলে যে আমাদের ভবিষ্যৎ ভাল হবে একথা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করবেন না।

www.pathagar.com

বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে পিতার শাসন, মাতার পোষণ, ভ্রাতার সহানুভূতি, বন্ধুর প্রীতি এগুলির কিছুই নাই। তাই সমাজ একেবারে অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে। সমাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দায়িত্বজ্ঞান, সততা, অর্থ ও একতা এগুলির কিছুই নাই। যে সমাজে এগুলির অভাব সে সমাজ কখনও উন্নতিপথে অগ্রসর হতে পারে না। শুধু যে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারে না তা নয়, এই জীবন সংগ্রামের জগতে তার বেঁচে থাকার আশা করা অন্যায়। এখানে যে যোগ্য সেই টিকে থাকতে পারবে। যে অযোগ্য সে টিকবে না। আমাদের সমাজকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে চাই আমরা, তবে আমাাদর সমাজকে বেঁচে থাকার যোগ্য হতে হবে।

আমাদের যোগ্য হওয়ার কতকগুলি অন্তরায় আজকাল দেখতে পাওয়া যায়। প্রধান অন্তরায় হচ্ছে আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীনতা। বাংলার মুসলমান সমাজের বয়স নিতান্ত কম নয়। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে আমাদের মধ্যে একজন রুশো, একজন পেসটালজী, একজন হারবার্ট স্পেন্সার জন্মান নাই। আমাদের সমাজ একজন রাজা রামমোহন, একজন বিদ্যাসাগর, একজন বঙ্কিমচন্দ্র, একজন পিয়ারীচরণ, একজন রামতনু লাহিড়ী, একজন রাজনারায়ণ বসু কি একজন স্যার আশুতোষ তৈরী করতে পারে নি। ইহার একমাত্র কারণ, আমরা শিক্ষা চাই না। আমরা বিদ্যা চাই না, জ্ঞানের মর্য্যাদা বুঝি না, সাহিত্যের আদর করি না। তাই আমাদের মধ্যে বিদ্বান নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, সাহিত্যিক, দার্শনিক ঐতিহাসিক নাই। আমরা দান ভালবাসি, তাই আমাদের মধ্যে দাতা আছে এবং দাতা আছে বলেই ভিক্ষুকের অভাব নাই। সেইরূপ আমরা যদি শিক্ষা ভালবাসতাম তবে শিক্ষাদাতা, শিক্ষিত জন ও শিক্ষান্বেষী কোনটির অভাব হইত না।

শিক্ষার আদর আমরা করি না একথা সত্য। শিক্ষা আমরা চাই না এ কথা আরো সত্য। উচ্চ গভর্ণমেন্টের কর্ম্মচারী ১০০০ টাকার উপর বেতন পান। তিনি সরকারী বাড়ীতে থাকেন। তাঁর দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে পরের বাড়ীতে রেখে দিয়েছেন। কেননা তিনি বলেন যে, ছেলে যে স্কুলে পড়ে সে স্কুল তাঁর কোয়ার্টার্স (সরকারী বাড়ী) থেকে অনেক দূরে। জন স্টুয়ার্ট মিলের পিতা কুসংসর্গ থেকে বাঁচিয়ে সুশিক্ষার জন্য ছেলেকে কখনই কাছ ছাড়া হ'তে দেন নাই। এই দুই পিতার নিজ নিজ সন্তানের শিক্ষার জন্য আগ্রহ তুলনা করলে কি বলা উচিত যে, আমরা শিক্ষা চাই বা শিক্ষা ভালবাসি? আমাদের অভিভাবকগণ শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন। তাঁদের অনেকেই বালকদের শিক্ষার জন্য কেবল স্কুল কলেজের উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত। বালিকাদের শিক্ষার কথা মনেও স্থান পায় না।

একদল অভিভাবক আছেন যাঁরা এখনও স্কুল কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হয় সে শিক্ষার বিরুদ্ধে। তাঁরা যে কোন্ শিক্ষার সপক্ষে তা ঠিক করে বলা কঠিন। প্রথমে তাঁরা ইংরাজী শিক্ষা কাফেরী এলেম বলে বর্জ্জন করার ফতোয়া দিয়েছিলেন। তাঁরা ধর্ম্ম শিক্ষা চান। ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য কলিকাতা, ঢাকা ইত্যাদি স্থানে মাদ্রাসা ছিল। মাদ্রাসা পাশ করে পেটের অন্নের সংস্থান হয় না। তখন কি করা যায়? অধুনা নূতন ধরনের মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে। এখানে ইংরেজী শিখতে বাধা নাই। তবে বেশী ইংরেজী শিখলে হয়ত গোনা হবে এরূপ ভাব মনের কোন কানচি খুঁজলে বোধ হয় বেশ কিছু কিছু পাওয়া যাবে। যা হ'ক এই সমস্ত নূতন মাদ্রাসা থেকে পাশ করে আমাদের যুবকগণ জীবন সংগ্রামে কতটুকু জয় লাভ করতে সক্ষম হবে তা এখনও বলা যায় না। তবে মোটের উপর বোঝা যাচ্ছে যে আমরা

www.pathagar.com

বুদ্ধির মুক্তি চাই না। আমরা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, অংক, দর্শন, বিজ্ঞান আর যত যা কিছু সব বাদ দিয়ে ধর্ম্ম শিক্ষাটুকু হ'লেই বস্ বলতে চাই। তাও কি কখনও হয়? কবি বলেছেন—

'দ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি
সত্য বলে আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?'

বুদ্ধির মুক্তি না হলে ধর্ম্ম শিক্ষা হতে পারে না। ধর্ম্মের আদেশ ও নিষেধ পালন করার জন্য বুদ্ধির দরকার। বুদ্ধির অভাবে আজকাল আমাদের ভিতর প্রকৃত ধর্ম্মভাব লোপ পেয়েছে। এখন গোঁড়ামিই আমাদের ধর্ম্ম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। গোঁড়ামির দরুন আমাদের অবস্থা যা হয়েছে তা ভাবলে আতংক উপস্থিত হয়। কোনো কিছু বলার জো নাই। সমাজের প্রচলিত অর্থহীন কোনো সংস্কারের বিরুদ্ধে কোনো কথা বললে, যে বলবে তাকে তখনই কাফের, জাহেল, গোমরাহ্, গাঁওআর ইত্যাদি বলা হবে। যা হউক আমাদের এই গোঁড়ামির প্রধান কারণ এই যে, আমরা ধর্ম্মের সব বিধি নিষেধগুলির কতকগুলি সহজ অর্থ ক'রে নিয়েছি। এইরূপ সহজ অর্থ করার দরুনই যে আমাদের এই দুর্দ্দশা, একথা অস্বীকার করার সময় চলে গেছে। ফলাফল দেখে বিচার করা মানুষের স্বভাব। নিরপেক্ষ চোখ দিয়ে দেখলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, অর্থহীন কংকালসার সংস্কারের স্তূপ আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না।

সহজ অর্থ করার দরুন আমাদের ধর্ম্মেও সার কথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এই, রসুলোল্লাহর নামে দরুদ পড়া, রসুলোল্লাহ্র না'ত, মিলাদ শরীফ, ঈদ, বকর ঈদের সময় কিছু ঘটা আর বক্তৃতায় নামাজ রোজা, হজ্ব যাকাৎ ফেৎরা এগুলির প্রশংসা করা। এগুলির পেছনে যে আরো কিছু থাকতে পারে সে দিকে দৃষ্টি দেবার কোনো দরকার সমাজ অনুভব করতে চান না। আমাদের মানুষ হ'তে হবে—বলবান, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, মানুষ হ'তে হবে, একথা আমাদের মনেও হয় না। নামাজ রোজা যদি অর্থশূন্য হয় তবে সে নামাজ রোজায় কতটুকু ক্ষতি বৃদ্ধি। যদি নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহু আকবার বলার সময় সেই 'রহমানুর রহিম মালিকি ইয়াওমিদ্দিনের' ধারণা মনে না জাগে, যদি মালিকি ইয়াওমিদ্দিন বলার সঙ্গে সঙ্গে নিজের অপরাধের কথা মনে ক'রে ভয়ে শরীর ও মন শিহরিয়া না উঠে, যদি সেই শিহরণের সঙ্গে সঙ্গে 'ইয়া কানাআবোদো ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন' বলে সচকিত হয়ে সেই জীবন-স্বামীর কৃপা ভিক্ষার কথা মনে না জাগে, যদি প্রাণের গভীরতম নিকেতন থেকে 'এহদেনাস সেরাতুলি মোস্তাকিম' না বলতে পারি, তবে সে নামাজের সার্থকতা কোথায়? যদি 'সোবহানা রব্বেল আজীম ও সোবহানা রব্বেল আলা'র অর্থ না বুঝি তবে রুকু ও সেজদার সার্থকতা কোথায়? প্রতি ওয়াক্তে নামাজের সময় যদি নিজের দোষ গুণের হিসাব না লই, যদি অনুভব না করি যে তাঁরি সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরি কাছে আমার দুঃখ বেদনা নিবেদন করছি, নিজকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি, নিজের দুর্ব্বলতা অনুভব ক'রে অনুতপ্ত হৃদয়ে যদি সেই করুণা সিন্ধুর করুণা ভিক্ষা না চাই তবে নামাজের মূল্য কতটুকু? আর যদি 'ফাওয়া এলুল্লেন মোসাল্লিনাল্লাজিনা হুম আন সালাতিহিম সাহুন' মানে এই হয় যে, দিনের মধ্যে পাঁচবার স্থান বিশেষে দাঁড়িয়ে কিছু কসরৎ কর, তাহলে সেই মহাপবিত্র মহান পয়গাম্বর হজরত রসুলে করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হেস্সালামের প্রতি ঘোর অবিচার করা হবে। নামাজের এইরূপ সহজ অর্থে গোঁড়া মুসলমান সন্তুষ্ট হতে পারে, কিন্তু জগৎ সে

www.pathagar.com

মুসলমানকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখবে না। ফলেও দাঁড়িয়েছে তাই, বর্ত্তমান জগৎ মুসলমানকে কাঁটা মনে করছে। এদিকে এই সহজ অর্থের ফলে মুসলমান নিজেও ধর্ম্মে কোনো মজা পাচ্ছে না।

মানুষের জীবন নানা স্বাদের জন্য লালায়িত। শারীরিক বলের অধিকারী হওয়ায় যেমন স্বাদ আছে, মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বলের অধিকারী হওয়ায়ও ঠিক সেইরূপ বা ততোধিক স্বাদ আছে। মানুষ আপনা আপনি সে সব স্বাদ পেতে চায়। শুধু হুকুম পালনে সে স্বাদ পাওয়া যায় না। বিশেষ করে যদি হাকিমকে পুরোপুরি না জানা যায়, আর তার গুণে পুরোপুরি মুগ্ধ না হওয়া যায়। আমাদের হজরত তের শ বৎসর দূরে পড়ে আছেন। সমাজের নেতাদের উচিত সমাজভুক্ত জনগণকে সেই পবিত্র পয়গাম্বরের সম্যক পরিচয়ের সুবিধা করে দেওয়া। তা না করে শুধু হাওয়াই প্রশংসা করে আর কেতাব আছে, কোরান আছে, পড়ে দেখ, এই সোজা পথ দেখিয়ে দিলে তারা তা মানবে কেন? সত্যকে পাবার জন্য সেই মহাপুরুষের কঠোর সাধনা, তাঁর ত্যাগ, জীবনব্যাপী আবেগ তপস্যা, জগতে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা এসবের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনে বর্ত্তমান। নিজেদের জীবনে সেই ত্যাগ, সেই সাধনা, সেই তপস্যা বাদ দিয়ে যদি আমাদের সমাজের নেতারা জনগণের কাছ থেকে প্রকৃত ভক্তি আশা করেন, তবে সে আশা বৃথা। আমাদের যাঁরা ধর্ম্মগুরু হওয়ার দাবী রাখেন, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তাঁদের অনেকের জীবন সুন্দর নয়। তাঁরা নিজেরা খুব সুস্থ চিত্ত, জ্ঞানবান, বলবান বুদ্ধিমান মানুষ নন। তাঁদের মুখের কথার দামও তাই খুব বেশী নয়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মৌলবী মৌলানারা জনগণের উপযুক্ত আহার যোগাতে পারছেন না। ফলে ধর্ম্মের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা জন্মাচ্ছে না। আমাদের মধ্যে অনেক স্থলেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিকটা একেবারে লোপ পেতে বসেছে। এসব দিকে স্বাদ পাবার সুবিধা ও সুযোগ না পেয়ে পাশবিক ধর্ম্ম পালন করে স্বাদ মিটাতে হচ্ছে। মানুষ স্বাদ মিটাতে বাধ্য।

অনেক সময় দেখা যায় যে, আমাদের অনেকেরই বেলায় জীবনে নীতি বা শ্লীলতা বলে যে জিনিষটা, তার অনেকখানি অভাব। আদিম দিনে নারী ছিল তার (পুরুষের) প্রথম ও প্রধান সম্পত্তি, তার ইন্দ্রিয় ক্ষুধার খাদ্য, তার পরিশ্রম করার যন্ত্র, তার বাণিজ্যের পণ্য, তার আদান প্রদানের শ্রেষ্ঠ উপহার। যদি আপনারা অনুমতি করেন তবে আমি বলতে চাই যে, আমাদের সমাজ সেই আদিম দিনের অবস্থায় উপনীত হয়েছে। অনেক স্থলে দেখা যায় যে, আমাদের মধ্যে ও পশুর মধ্যে মূলতঃ কোনো পার্থক্যই নাই। পশুর মত কেবল মাত্র আহার নিদ্রা ও আর একটা ব্যাপারই হচ্ছে আমাদের কার্য্য এবং শুধু বংশ বিস্তারই আমাদের অস্তিত্বের একমাত্র সার্থকতা। খবরের কাগজে যে সমস্ত অনাচারের কথায় জগতের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হচ্ছে, সেগুলি বাদ দিলেও অনেক সম্ভ্রান্ত ও অর্ধ সম্ভ্রান্ত পরিবারেও একথা অনেকখানি সত্য। বিনা কারণে দু, তিন, চার বিবাহ ত অনেক স্থলেই দেখতে পাওয়া যায়। কোনো কোনো জায়গায় ধর্ম্ম সঙ্গত হিসাবে নয় বটে, পাশবিক ধর্ম্ম চার-এর অধিক নারীর সঙ্গেও থাকে। এবং কখনও কখনও সন্তান সন্ততিরাও উত্তরাধিকার সূত্রে এটা পেয়ে আসছে। এমনও শুনা যায় যে, আমাদের মধ্যকার গণ্যমান্য ধার্ম্মিক পুরুষেরাও কখনও কখনও সুন্দরীর মোহে পড়ে চার বিবির এক বিবিকে বিনা

www.pathagar.com

অপরাধে তালাক দিয়ে সেই সুন্দরীর (কুমারীই হউক বা বিধবাই হউক) পাণি গ্রহণ করতে বাধা অনুভব করেন নাই। ধর্ম্মের সহজ অর্থের মানে এই। আর তার সার্থকতা এইখানে। আর কলমা ক'রে নেওয়াটা আবার এমনই সোজা যে, কেবল মোহর ঠিক হ'লেই হ'ল। বাড়ীতে মামাটি দেখতে সুন্দরী, অমনি তাকে কলমা ক'রে নেওয়া হল। কলমা করে নিলেই সাত খুন মাফ। কারণ ধর্ম্মের সহজ অর্থবাদীদের মতে কিছুই অন্যায় হ'ল না। এদিকে সে মামাটির স্বামী কিছু গোলমাল করতে চেয়েছিল, তা কিছু টাকা সুদে ধার করে নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করা গেল। লোকটা অভাবগ্রস্থ ; টাকা পেয়ে মনে করল বেশ ত ভালই হল খাবারও কিছু যোগাড় হল। আর আবার একটা নূতন বিবি পাবার সুযোগও হল। জেনা করা মহাপাপ, তার সহজ অর্থ এই হল যে, কলমা করে ফেল। হারামকে হালাল করার এরূপ ব্যবস্থাকে প্রশংসা করা যায় না।

পশু–প্রকৃতি এত প্রবল হয়েছে যে, অনেক সময় ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে প্রতিবেশী সমাজের পতিতা নারীদের কলমা করে নিয়ে আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এই সব ভ্রষ্ট–চরিত্র পতিতা কি কখনও বলবান, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান, চরিত্রবান সন্তানের জননী হতে পারে? তবে কেন সমাজ এর জন্য লালায়িত? আমার মনে হয়, ভ্রষ্ট–চরিত্র নর–নারীদের বাহির থেকে এনে আমাদের সমাজের বোঝা বাড়ানোর মত শক্তি বর্ত্তমানে আমাদের নাই। সমাজে যারা আছে তাদের হেদায়েৎ করা, প্রথমে নিজের ঘর সামলানো সমাজের প্রধান কর্ত্তব্য। অবশ্য যদি কেউ আশ্রয় চায় ইসলাম এত নির্ম্মম নয় যে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠা বোধ করবে।

একবার শুনলাম, একজন বিখ্যাত পীর সাহেব এক প্রিয় মুরিদের বালিকা স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে চক্রান্ত করে মুরিদকে বললেন, তোমার বিবি তালাক হয়ে গেছে। মুরিদ বেচারা তার স্ত্রীরূপে মুগ্ধ ছিল। পীরের ফতোয়া শুনে সে প্রমাদ গুনল। যা হক পীর সাহেব বললেন, 'তা একটা উপায় আছে। তুমি বিবি তালাক দেও, আমি নেকাহ্ করি, পরে আমি ছেড়ে দিলে তুমি নেকাহ্ করবে। অন্য কারও সঙ্গে নেকাহ্ হলে তোমার স্ত্রী যেরূপ সুন্দরী তাতে সে হয়ত ছাড়তে চাইবে না, আর আমি ত বুড়া মানুষ, আমাকে অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই।' আমাদের শরা অনুসারে কেহ কোনো কারণে বিবি তালাক দিলে সেই বিবিকে নিয়ে পুনরায় ঘর সংসার করার পূর্ব্বে ঐ বিবির অন্য একজনের সঙ্গে নিকাহ্ ও কিছুকাল ঘর সংসার করা দরকার, এ খবর ত আমাদের জানা আছে। এখানেও তাই হল। পীর সাহেব নাকি ঐ বিবিকে ছাড়তে চান নাই। পরে নানারূপ কথা কানে এসেছে। আমাদের মধ্যকার আজকালকার পীর সাহেবদের সম্বন্ধে নানা কথা কানে আসে। এ সম্বন্ধে দুঃখ নিবেদন করে সহানুভূতি পাবার আশা কম। পীর সাহেবদের বদদোয়া, তাঁর বংশধরগণের লাআনৎ, সমাজের অন্যান্য জনগণের অভিশাপ, এগুলি তো আছেই। তার উপর আবার কথা হচ্ছে যে, আমরা দুর্ব্বল মানুষ, পদে পদে ভুল, পদে পদে বিপদ তো লেগেই আছে। যখনই একটা বিপদ এসে উপস্থিত হবে, তখনই সমাজ বলবে এবং বিশ্বাস করবে যে, পীরের বদ দোয়াতেই এরূপ হয়েছে। সমাজের কার্য্য–কারণ সম্বন্ধজ্ঞানহীন জনগণের ভক্তি ক্রমেই বেড়ে যাবে এই ভয়েও পীর সাহেবদের বিরুদ্ধে কিছু বলার ইচ্ছা থাকলেও বলতে বাধা বোধ হয়। আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান পীর সাহেবরা এবং তাঁদের আল আওলাদরা সমাজকে উন্নতির পথ দেখানো ত দূরের কথা, জলে ডুবাতে যে বসেছেন, সে কথা ভাবতে চোখে জল

www.pathagar.com

আসে না এমন. নির্বোধ জগতে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যাবে শুধু আমাদের এই বাংলার মুসলিমসমাজে।

অবশ্য পীর ফকির ওলি দরবেশেরও ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা জগতে ইসলামের যতগুলি দান তার অন্যতম। এ জিনিষটা কাজে লাগাতে পারলে খুবই ভাল। কিন্তু আমাদের সমাজে প্রকৃত শাসন না থাকার দরুণ আমরা পীর ফকিরকে যাচিয়ে নিতে পারছি না। তাই অনেক মেকী চলে যাচ্ছে। বুদ্ধির মুক্তি হলে এসব মেকী সহজেই ধরা পড়বে। অনাচার, অত্যাচার, ব্যাভিচারের উপযুক্ত শাসন তখন সম্ভবপর হবে।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে মোটের উপর আমার বক্তব্য এই যে, আমাদের প্রিয় পয়গম্বর হজরত রসুলে করিম সাল্লাল্লাহো আলায়হেস্ সালাম ধর্ম্মের যে এমারত্ রচনা করে গিয়েছেন তা আমরা ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছি। তিনি পুতুল ভেঙ্গে যে নিরাকার অথচ চেতনশক্তি আল্লাহ্ তাআলার পূজা করতে বলেছেন, তা আমরা ভুলে গিয়েছি। এখন আমরা আবার কতকগুলি অনুশাসনরূপী অর্থহীন পাষাণ প্রতিমার পূজায় নিযুক্ত। এরূপভাবে আমাদের দুর্দ্দশা ঘুচবে না এবং ইসলামকে জীবন্ত রাখতে পারব না। ইসলামকে জীবন্ত রাখার জন্য আমাদের সমাজে যে যে গোঁড়ামি ঢুকেছে তা সমূলে উৎপাটন করতে হবে।

একতাই হচ্ছে সমাজের বন্ধন। ইসলামের একতা ভ্রাতৃভাবের উপর নির্ভর করে। আমরা বলি, আমরা সকলেই বাবা আদম ও হাওয়া মা'র বংশধর। কিন্তু আজকাল আমাদের ভিতর জাতিভেদ এসে ঢুকেছে। এইটাই সমাজের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল। আমাদের ভিতর একতার প্রধান অন্তরায় হচ্ছে বংশের বড়াই। যে ভ্রাতৃত্বের উপর নির্ভর করে মুসলমান সমাজ সমস্ত জগতকে মুগ্ধ, স্তম্ভিত ও দিশাহারা করেছিল, সে ভ্রাতৃভাব আজ আমাদের মধ্যে নাই। ভারতবর্ষে এসেই শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান এই চারি বর্ণের পরিচয় তো পাওয়া গিয়েছিলই। এখন ত দেখা যায় হাজার রকমের পদবী আতরাফ, আশরাফ, শরীফ, রাজীল, সৈয়দ, খোন্দকার, কাজী, মোল্লা, মুফতী, মুনসী, শাহ্, পীর সিদ্দিকী, হুমায়নী, হাশেমী, ফারুকী, সরদার, জোতদার, বিশ্বাস, গোলদার, মণ্ডল, দফাদার আরো কত কী তার অন্ত নাই। দুই বাহু বিস্তার করে পরম আবেগে ভাই মুসলমান বলে যাদের শাহান শাহ্ বাদশাহ্ বুকে বুকে ভিক্ষুকের সঙ্গে আলিঙ্গন দিয়েছেন, সেই মুসলমান আমরা বলি কি না, ওরা আতরাফ, আমরা আশ্‌রাফ, আমরা শরীফ আর ওরা রাজীল। গোলামের সঙ্গে নিজের কন্যার বিবাহ দেওয়ার মত উদারতা যে জাতির রাজাদের ছিল, যে জাতি যোগ্যতায় মুগ্ধ হয়ে বিজাতীয়ের কন্যাকে রাজরাণীত্বে বরণ করে নিয়েছে আর অধঃপতনের দিনে তাদের মধ্যে এত সঙ্কীর্ণতা ঢুকেছে এ দেখে না জানি সেই মানব প্রেমিক পবিত্র পয়গাম্বর কত আফসোস করছেন। অবশ্য আমি মানি যে, পরিচয়ের জন্য কিছু তারতম্যের দরকার হতে পারে কিন্তু তাই বলে মানুষ মানুষকে ঘৃণার চক্ষে দেখবে, হেকারৎ করবে, এ আমার বুদ্ধির বাইরে। এ সম্বন্ধে বেশী আলোচনা করতে ইচ্ছা নাই। কারণ সংস্কার এত দৃঢ় হয়ে আছে যে, যত কিছু বলা হ'ক না কেন, উপযুক্ত শিক্ষা না পেলে এ সংস্কার থেকে, মুক্তি পাবার ভরসা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এখানে একটা কথা বোধ হয় অবান্তর হবে না। বংশের তারতম্য করতে গিয়ে আমাদের শিক্ষিত বা তথাকথিত সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রায় উঠে যেতে বসেছে। এর ফলাফল কী হবে তা ভেবে দেখা দরকার।

www.pathagar.com

ভ্রাতৃভাবের অভাবের দরুন পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সহানুভূতির অভাব হয়েছে। দ্বেষ হিংসায় সমাজ ক্রমেই অবনতির দিকে চলেছে। এখন আমাদের একমাত্র ভরসা Concession বা সরকারের দান বা অনুগ্রহের উপর। পরের দয়ার দানে প্রকৃত শক্তি অর্জ্জন সম্ভবপর হবে না। পরে কতটুকু দিতে পারে, আর তাতে কি পেট ভরে? আমাদের মধ্যে কেহ কেহ বলতে চান যে, অবস্থা অনুসারে কিছু special treatment বা বিশেষ ব্যবস্থা দরকার, না হলে চলে না। এমন চলা আমার মতে না চলা অপেক্ষা লজ্জাকর। বহুকাল ধরে ত আমরা কনসেসন কনসেসন করছি। পেয়েওছি ত কিছু কিছু ; কিন্তু অগ্রসর হয়েছি কতটুকু? সরকারের দয়ার আশায় প্রকৃত মানুষ হওয়ার চেষ্টা আমাদের মধ্যে একদম নাই। থাকতে পারে না। যাদের কন্‌সেসনের দিকে দৃষ্টি তাদের আত্মসম্মান জ্ঞান জন্মাতে পারে না। যাদের আত্মসম্মান জ্ঞান নাই তারা পরপ্রত্যাশী হতে বাধ্য। পরপ্রত্যাশীর অন্য নাম ভিক্ষুক। ভিক্ষুক সমাজের লজ্জা, সমাজের বোঝা, উন্নতির কাঁটা। ধনী আত্মীয়ের উপর উদরান্নের জন্য নির্ভর করা যেমন ভিক্ষাবৃত্তিরই নামান্তর, সরকারের দিকে কনসেশনের (দয়ার) জন্য তাকিয়ে থাকাও সেইরূপ ভিক্ষুকতা। আমাদের বিদ্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শ্রমশীলতা, কোনোরূপ যোগ্যতা নাই, বরং—সমস্ত বিষয়ে অন্যের চাইতে কম, অথচ সরকারের দয়ার উপর নির্ভর করে শতকরা ৮০ জনের চাকুরি চাই, এ ভাবটা যত শীঘ্র আমাদের মধ্য থেকে দূর করা যায়, ততই আমাদের মঙ্গল, প্রতিবেশীর মঙ্গল, জগতের মঙ্গল। নচেৎ আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকব। জগত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বলছে ও বলবে, ঐ যে সব ভিক্ষুকের দল।

আমাদের কেহ কেহ বলবেন, চাকুরি ভিন্ন উপায় কি? বেশ ত চাকুরি যদি আমরা চাই, তবে উপযুক্ত হয়েই চাই না কেন? উপযুক্ত হওয়ায় আপত্তি কেন? এইরূপ কনসেশন পেয়ে আমাদের মধ্যে যারা চাকুরি পেয়েছেন তাঁদের অনেককেই দেখা যায় যে তাঁরা হীনবীর্য্য, খোশামুদে বা cipher হয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন। তাঁদের ভিতরের দারিদ্র্য ঢাকার জন্য বাইরের আড়ম্বর, পোষাক পরিচ্ছদ, আহার বিহারের ঘটায় তাঁদের টাকা পয়সা উড়ে যায়। নিজেরা অযোগ্য, ঘরে ও বাইরে তাঁদের সন্তান সন্ততিরও উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করার ক্ষমতা নাই। ফলে দাঁড়াচ্ছে এক পুরুষ দুই পুরুষেই সব উন্নতি খতম। ঘরের খুঁটি না থাকলে প্যালা দিয়ে কতকাল ঝড় থেকে বাঁচিয়ে রাখা যায়? ও সব কনসেসানে আমাদের মুক্তি নাই। আমাদের নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে শিখ্‌তে হবে।

কেহ কেহ বলছেন কিছু টাকা পয়সা না হলে স্কুল কলেজে পড়ান যায় না। ছেলে মেয়ে কি করে মানুষ করা যাবে? কিন্তু মানুষ যে হতে চাইবে তাকে কেউ রুখতে পারে না। বিদ্যাসাগরকে কে রুখেছিল? নবীন সেনকে কে রুখেছিল?

চাকুরি ভিন্ন অন্য উপায়ের দিকে দৃষ্টি দেবার সময় এসেছে। চাকুরি কটা আর ক'জনে পাবে? অন্য উপায় আছেও যথেষ্ট। চাষবাস, ব্যবসা, বাণিজ্য কি আমাদের ভরণ পোষণের উপায় করে দিতে পারে না? এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমির ক্রোড়ে বসে বঙ্গ মাতার জন্য পীযূষ অবহেলা করে 'মেলিন্‌স ফুড' খেয়ে স্বাস্থ্যরক্ষার আশা কি উচিত, না যায়? ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিদেশী মাড়োয়ারী সূরতী পার্শী ইত্যাদি বড় বড় সওদাগরেরা যদি এদেশে ঐ পথ অবলম্বন করে ক্রোড়পতি হয়ে বহু বি.এ., বি.এস.সি., এম.এ.,

www.pathagar.com

এম.এস.সি.কে চাকর নকর করে রাখতে পারে তবে আমরা কেন পারি না? আমাদের সমাজে হাফেজ মোহাম্মদ হুসেন সাহেবের মত আরো ঢের দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। এসব দিকে আমরা যেতে চাই না, কারণ আমাদের দৃষ্টি রয়েছে ঐ কনসেসনের দিকে। যতদিন কনসেসনের মোহ না কাটবে ততদিন আমরা এদিকে কৃতকার্য্য হতে পারব না। যেদিন ঐ মোহ কেটে যাবে সেই দিনই আমরা বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে দেখতে পাব উন্মুক্ত গগনের মুক্ত আলোকে যে, মাতা বসুন্ধরা মোটেই বাঙ্গালী নন ; মোটেই কৃপণ নন। স্বাধীন চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবো সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদের কিছুই কম করে দেন নি ; আর তখন আমাদের মাথা হাত পা চক্ষু কর্ণ সকলেই আমাদের সাহায্য করবে। উপায় আপনিই এসে হাজির হবে। তখনই আমরা 'ইন্না আতয়না কাল কাওসার' কোরাণ শরীফের এই মহাবাণীর প্রকৃত সার্থকতা উপলব্ধি করতে পারব।

অবশ্য যদি দু'এক জন লোক নূতন পথে চলেন এবং সমাজ তাঁদের গতিবিধি সম্বন্ধে সহানুভূতি না দেখায়, তা হলে এই দু'একজনকে হয়ত হাবুডুবু খেতে হবে। হয়ত তাঁরা সফলকাম হতে পারবেন না। তাঁদের সফলতার জন্য সমাজের সাহায্য এবং উৎসাহ একান্ত দরকার। সমাজে একতা ও ভ্রাতৃভাব না থাকলে সে উৎসাহ অসম্ভব।

আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের প্রতি বিদ্বেষ আমাদের সমাজের আর একটি গলদ। প্রতিবেশীর সহিত শত্রুতা করা কোনোও মতে উচিত নয়। ইসলাম জগতে শান্তির বার্ত্তা বহন করে আনার দাবী করে। কোনো জাতির প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করলে শান্তি স্থাপন করা যায় না। তাছাড়া হিন্দু মানুষ। হিন্দুকে ভালবাসতে শিখিতে হবে। মানুষকে ভালবাসতে না শিখলে মানুষের উপকার করা যায় না। আর হিন্দুরা নিজেদের মধ্যে একরূপ সুখ শান্তিতেই আছে বলে মনে হয়। তাই বলে তাদের দুঃখ দারিদ্র্য আমাদের চেয়ে কিছু কম নয়। তাদের হিংসা করে আমাদের নিজেদের শক্তিক্ষয় ভিন্ন অন্য কোনো লাভ হবে না।

আপাততঃ ধর্ম্মান্ধ মুসলমান মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে যে অশান্তির সৃষ্টি করেছেন তা কখনই প্রশংসনীয় নয়। এদেশে মুসলমান বাদশাহরা নিজেদের প্রাসাদেও মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে বাধা অনুভব করেন নি, আমরা কি মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ করতে পারি না? আমাদের নিশ্চয়ই কিছু অসুবিধা হয় এতে, কিন্তু এতে আমাদের গোনা হবে, একথা আমি স্বীকার করতে রাজী নই। হিন্দুরা বাজনা বাজাবে, আমরা ত বাজাব না? তাদের সবিনয়ে অনুরোধ করা গেল, তারা যদি না শোনে, তাতে আমাদের কেন গোনা হবে? যদি কেউ বলেন, তাতেও আমাদের গোনা হবে, তবে তাঁদের কাছে আমি সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, কি করতে বলেন তারা এর জন্য? এর জন্য কি সব মুসলমানের জান দিতে হবে? যদি তাই হয় তবে তার জন্য কি সকলেই প্রস্তুত? আর এরজন্য জান দিতে যাওয়াটা কি প্রকৃতপক্ষে উচিত? তাছাড়া যেটা কাজে পরিণত করা হবে না, সেটা বলে শুধু গোঁড়ামির পরিচয় দেওয়ার সার্থকতা কি? এই লড়াই—এ যে সব মুসলমান অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তাদের পরিবারের অবস্থা কি? আর যে সব গরীব মুসলমান কাঁথা কাপড় বিক্রী করে স্ত্রীপুত্রের মুখের অন্ন বন্ধ করে টাকা পয়সার শ্রাদ্ধ করে জেলের হাত এড়িয়ে সপরিবারে অনাহারে মরতে বসেছে তাদের অবস্থা কি, তা কি কেউ ভেবে দেখেছেন?

www.pathagar.com

গান বাদ্য আমরা বলছি আমাদের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ; কাজের বেলায় কি আমরা তা মানছি? যাত্রা, থিয়েটার, বায়স্কোপ, ঘোড়দৌড় ইত্যাদি ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যাপারে মুসলমানরা কি কম ভিড় করছেন? শিক্ষিত মুসলমান পরিবারের মধ্যে এমন কটি আছে যেখানে হারমোনিয়াম, গ্রামোফোন কখনও শোনা হয়নি, বা সেতার বা এসরাজ নিয়ে গান বাজনা হয় নি? নাই বললে মোটেই বেশী বলা হয় না। তাহলে এ গান বাজনায় এত আপত্তি কেন? যারা নিজেরা চুরি করে তারা পরকে চুরি করতে নিষেধ করলে শোনায় কেমন? আর এ নিষেধের মূল্য কতটুকু? মুসলমান যদি গান বাজনা হারাম করত, তাহলে মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ করার যে দাবী আমরা করতে চাচ্ছি, সে দাবীর জোর বেশী হত—না এখন বেশী। মুসলমান নিজের বাড়ীতে বাজনা বাজাচ্ছেন, অনেকেই নানারূপ গোনা'র কাজে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে সমাজ একেবারে চুপ, কিছু বলছে না, অথচ অন্য ধর্ম্মাবলম্বী লোক তাদের ধর্ম্মপালন করবে তাতে আমাদের আপত্তি। যাঁরা বাজনা বাজাতে আপত্তি করেছেন, বা দেখছেন তাঁদের দৃষ্টি হার জিতের দিকে, কিন্তু আমাদের মনে রাখা উচিত, 'ইন্নাল্লাজিনা লা-ইয়োহেববুল মোফসিদীন।'

আমাদের অনেকে মনে করছেন, হিন্দুরা আমাদের গরু কোরবানীতে আপত্তি ক'রে অনেক স্থানে জয়ী হয়েছে। এখন যদি তারা তাদের বাজনা বাজিয়ে যায় তাহলে ক্রমে ক্রমে সর্ব্ববিষয়ে ওদের কাছে আমাদের হেরে যেতে হবে। শেষে মুসলমান সমাজ একেবারে বিলুপ্ত হবে। আমাদের গোঁড়ামির দরুন আমাদের অবস্থা যা হয়েছে তাতে বিলুপ্ত হতে কতটুকু বাকী ঠিক করা দায়। অবশ্য যদি এ সমাজ বিলুপ্ত হবার উপযুক্ত হয়, তবে বিলুপ্ত হওয়াই যে জগতের মঙ্গল।

আমাদের সমাজের পুরুষেরা অযোগ্য অক্ষম কনসেসন্ প্রত্যাশী, পরমুখাপেক্ষী। মেয়েরাও তেমনি অশিক্ষিতা, বিলাসী, গৃহিনীপনায় অপটু, শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যহীন। সংসারে সর্ব্ববিভাগে সুবন্দোবস্তের অভাব, সময়মত স্নান, সময়মত আহার অসম্ভব ; ঘরদোর, বিছানা বালিশ সব নোংরা, কাপড় জামার অযত্ন, টাকা পয়সা কোনো কিছুতেই বরকত নাই, চারিদিকে বিশৃঙ্খল, এক একটি পরিবার যেন এক একটি জমাট নিরানন্দের পাহাড়। হাড়ভাঙ্গা মেহনত করে বুকের রক্ত জল ক'রে অর্থ উপার্জন করে পুরুষ। সেই অর্থের যদি সদ্ব্যবহার না হয় তা হলে মানুষের শরীর মেজাজ চরিত্র কেমন হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। এদিকে ছেলেপিলেরা শাসন মানে না, তাদের চাকর বাকরের হাওয়ালা করে দেওয়া হয়। গরীব হলে ত কথাই নাই বাড়ী থেকে দূর করে দেওয়া হয়। রাস্তার এইসব ছেলেপিলেরা শুনে ও শিখে সহধর্মী বালকগণের মধুর গীত ঝংকার, যাতে তারা কারও মা বোনকে পর্যন্ত বাদ দেয় না ; স্থলচর, জলচর সকল জন্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে দেয়।

রাস্তায় চলতে মুসলমান বালক বালিকার অস্বাভাবিক আলাপ ও গতিবিধি দেখলে আপনারা রাগই করুন আর যাই বলুন মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা অনুভব করি। আমার মনে হয় আমার চক্ষু ও কর্ণ জন্মের মত অপবিত্র হয়ে গেছে। স্বপ্নের অতীত নূতন, অতি নূতন, তার চেয়েও নূতন আলাপ কানে শুনেছি এবং যে যে দৃশ্য রাস্তায় দেখেছি, তা প্রকাশ করার কথা ভাবতেই পারা দায়। আরো এর চাইতে ক্ষোভের বিষয় কি হবে যে, কোনো কোনো সন্তান সন্ততির পিতা আমাকে বলেছে ওসব কিছু আমাদের শেখা দরকার, না হলে ওদের

www.pathagar.com

যদি কেউ গাল দেয় ত ওরা চুপ করে গাল শুনে আসবে? সমাজ কি এসব বিষয় শাসন করার কথা কখনও ভাবছে।

এই সমস্ত ছেলেদের আর শাসনে আনা যায় না। অবশ্য মারের ভয়ে তারা সামনে বেশ জড় সড় লেহাজ তমিজ দোরস্ত, কিন্তু পড়াশুনার বেলায় একেবারে উল্টা। বাবা গালি দেন 'যেমন মা তেমনি ছা', মা বলেন 'ও ওদের রক্তের গুণ'। ঝগড়াঝাটি কথা কাটাকাটিতে সময় কেটে যায়, বাড়ীতে সবার মেজাজ রুক্ষ। ছেলেপিলেদের ভালবেসে আদর যত্ন করে পড়ানোর চেষ্টা হয় না। তারাও মা বাপের উগ্র চেহারা দেখে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। দু'এক দিন হয়ত বাবা বসলেন ছেলেদের নিয়ে পড়াতে। ছেলে পড়াশুনা কিছু হয়ত বলতে পারল না, আর অমনি প্রহার। এত মার মুসলমান ছেলেরা খায় যে, তা ভাবলে তাদের জীবনটা যে চোর ডাকাতের জীবনের মত হবে না, এ আশা করা অন্যায়। সন্তানের প্রতি এমনি নির্ম্মম ব্যবহার অন্য কোনো জাতের লোকে করে বলে আমার ধারণা নাই। এই নির্ম্মমতা আবার ব্যাপক হ'য়ে পড়ে। যে স্ত্রী পুত্র পরিবারকে ভালোবাসতে পারে না, সে কাকেও ভালবাসতে পারে না। তাই সহিষ্ণুতা প্রেম, প্রীতি সবই হারিয়ে বসে সে। দেখতে পাওয়া যায়, মতের একটু বিরুদ্ধে একটা কথা কেউ বললেই অমনিই সে হিন্দুঘেঁষা নয়ত আতরাফ বা রজীল কওমের লোক, নয়ত একদম জাহেল ইত্যাদি গালে যদি সে না শোধরায়, তা হলে সে একেবারে কাফের। সামান্য মতের বিরুদ্ধে কথা বল্‌লে সাত পুরুষের সম্পর্ক ভুলে যাই। যাদের প্রাণে ভালবাসার এত অভাব তারা কেমন করে বড় হবে, বা ভাল হবে।

ছেলে পিলেকে লেখাপড়া শিখাতে হলে তাদের ভালবেসে শিক্ষা দিতে হবে ; তাদের কিছু স্বাধীনতাও দরকার। সমাজেও স্বাধীনতা দরকার। নিজের জন্য নিজের ভাববার অধিকার মানুষকে দিতে হবে। বুদ্ধির মুক্তির দরকার। কেবল বিধি নিষেধের স্তূপের চাপে কাহিল থাকলে বুদ্ধির মুক্তির সম্ভাবনা নাই। কেবল (authorityর) দোহাই দিয়ে বা কেতাবের উপর নির্ভর করে চললে আমাদের উন্নতি হবে না। আমি অবশ্য বলছি না যে কেতাব অমান্য করতে হবে। আমি বলতে চাই, কেতাব পড়ে তার অর্থ বার করতে হবে। অর্থ মানে সহজ অর্থ নয়। আমার নিজের জীবনের মধ্যে কেতাবের বাণীর অর্থ খুঁজতে হবে। এটুকু স্বাধীনতা দিতে হবে। সমাজকে তা সহ্য করার মত উদারতা শিখতে হবে। না হ'লে ফল এই দাঁড়াবে যে, আমরা মিথ্যাবাদী বা কপটাচারী হব, অথবা সমাজচ্যুত হব। সমাজচ্যুত হওয়া বরং ভাল, তবু মিথ্যাবাদী বা কপটাচারী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এইরূপ এক একজন করে যদি বাদ দেওয়া যায়, তবে সমাজ থাকবে না। কেউ কেউ বলবেন যে, ওরূপ একগুঁয়ে দু'চার জন লোক সমাজচ্যুত হ'লে সমাজের কিছুই এসে যায় না। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। ক্রোড়পতিও পথের কাঙ্গাল হয়, বাদশাহ্‌দের বংশধরেরাও ভিক্ষুক (কনসেসন প্রত্যাশী) হ'তে বাধ্য হয়েছে। বাস্তবিকই মুসলমান সমাজ এইরূপ করে অনেকখানি দুর্ব্বল হয়েছে। এক সময় জাস্টিস আমীর আলী কাফের আখ্যা পেয়েছিলেন এবং সমাজ থেকে তিনি দূরে দূরে বাস করেছেন। এইরূপ আরো ছোট বড় অনেকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যারা সমাজকে পাশ কাটিয়ে চলেছে। সমাজের বন্ধন অনেকখানি শিথিল হয়ে পড়েছে। শিয়া সুন্নির ঝগড়া এবং সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়ে হানিফী ও মোহাম্মদীদের লজ্জাকর ঝগড়ায় সারা সমাজটা অতিশয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

www.pathagar.com

হাতের পাঁচটি আঙ্গুল সমান নয়। তবু সর্ব্ব কর্ম্মে দেখতে পাওয়া যায়, তাদের ভিতর কি চমৎকার মিল। যে কোনো কাজে সবাই মিলে একে অন্যের বা আর সবার সাহায্য করছে এবং প্রত্যেকটি আঙ্গুলের অস্তিত্বের সার্থকতা ফুটে উঠছে, যেমন অন্যের সঙ্গে তার সহযোগিতায়, তেমনই তার আপন আপন কাজেও। মানুষের বেলায়ও ঐরূপ পাঁচ জনের পাঁচটা মত সহ্য করে নিতে হবে। এরই নাম toleration। এই toleration–এর অভাবেই আমাদের বন্ধুত্ব ভ্রাতৃত্ব নাই। একে অন্যের সাহায্য করতে কমই দেখতে পাওয়া যায়। একে অন্যের জন্য ভাবে না। মোটের উপর আমাদের চালচলন রীতিনীতি দেখে আমাদের সমাজকে একটি সমাজ বলতে ইচ্ছা হয় না। সমাজ বলতে যে বন্ধন বোঝা যায়, সে বন্ধন ব্যক্তিকে ব্যক্তির সঙ্গে বান্ধে। সে বন্ধন নাই। আমাদের সমাজে প্রত্যেকে প্রত্যেকের চাইতে অনেকখানি দূরে। আত্মীয়তা, নিকট সম্বন্ধ নাই। এখানে ঢাকায় দেখি ইউনিভার্সিটির প্রফেসারেরা তাঁদের ছাত্রদের সঙ্গে আপনি সম্বোধন করেন। শিক্ষক ছাত্রে যদি এতখানি আত্মীয়তার অভাব থাকে, সেখানে যুবকগণের কাছে কি আশা করা যায়?

একবার শুনেছিলাম ড. সোহরাওয়ার্দ্দি দুঃখ করে বলেছিলেন, 'I have the misfortune to belong to the Muhammadan Community'। আমাদের ছাত্রমহলে এ নিয়ে খুব একটা জোর আন্দোলন চলেছিল এবং অপ্রিয় সমালোচনাও হয়েছিল। ড. সোহরাওয়ার্দ্দি একথা বলেছিলেন কিনা জানি না, তবে উত্তরকালে আমি এ কথাটা অনেকবার মনে মনে বলতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের সমাজের গলদসমূহের কথা যখন মনে হয়, যখন কনসেসনের কথা ভাবি, যখন শাদী-নেকাহ্, পোলাও-কোর্ম্মা, আর শারাফতের কথা শুনি, খবরের কাগজে নারীর উপর অত্যাচারের কথা চোখে পড়ে, মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে খুন খারাবির দৃশ্য মনে পড়ে, তখন ড. সোহরাওয়ার্দ্দির কথায় যে একসময় চটেছিলাম, তার জন্য মনে মনে লজ্জিত হই। এবং তাঁর কথাটা মেনে নিতে ইচ্ছা হয়। এসব কথা মনে হলে বলি, ইসলাম যে শান্তির জন্য লালায়িত বলে দাবী করে, সে দাবী আল্লাহ্‌র দরবারে গ্রাহ্য হবে কিনা জানি না, তবে মানব সমাজের দরবারে যে তা সন্দেহ করা হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

সব হারিয়ে আমরা এখন চাচ্ছি লাঠি, ছোরা, তরবারি ও সরকারের দয়ার দানের সাহায্যে জিততে। লাঠি, ছোরা, তরবারি, এমন কি গোলাগুলির সাহায্যে যে জয়, সে টেকেনা, একথা আমাদের (মুসলমানদের) অনেক পূর্ব্বে বোঝা উচিত ছিল। ইতিহাসের পৃষ্ঠা ওল্টালে দেখা যায় যে, মুসলমান এ সবের কোনোটা বাদ দেয় নাই। বাদশাহ্‌দের হুকুমে দেশে দেশে রক্তের গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে। আর্ত্তের আর্ত্তনাদের গগনমণ্ডল প্লাবিত হয়েছে। কিন্তু কৈ সে প্রতাপ? কোথায় আজ সেই হীরামুক্তা মণি মানিক্যের ঘটা ; কোথায় আজ সেই দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরেরা।

'রাজ্য তব স্বপ্ন সম গেছে ছু'টে,
সিংহাসন গেছে টুটে,
তব সৈন্য দল
যাদের চরণভার ধরণী করিত টলমল

www.pathagar.com

তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি 'পরে।
বন্দীরা গাহে না গান,
যমুনাকল্লোল–সাথে নহর মিলায় না তান।
তার পুরসুন্দরীর নূপুরনিক্কন
ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
ম'রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
কাঁদায় রে নিশার গগন।'

এই ত হ'য়েছে। এর পর আরো কি হবে, তা জানেন তিনি যিনি 'আলেমুল গায়েব রাব্বিল আলামীন মালিকি ইয়াওমিদ্দীন'।

তাই বলি—যদি থাকে প্রাণ তবে আসুন আমরা সবাই একবার সমাজকে বলি—

'ওরে তুই ওঠ আজি
আগুন লেগেছে কোথা?'

www.pathagar.com

হজরত মুহম্মদের প্রতিভা
শামসুল হুদা

বিশ্ব যখন সত্যপথ হারিয়ে ফেলে অন্য এক পূতিগন্ধময় দুর্গম পথে অভিযান চালিয়ে নেয়, বিশ্ব মানব যখন মানব ধর্ম্ম ছেড়ে নানারূপ জড়ধর্ম্মপন্থী হয়ে পড়ে, তখনি মহাপুরুষগণ স্বর্গের শান্তি নিয়ে আসেন মানবের কল্যাণার্থে, বিশ্বকে মুক্তি দিতে। তাঁরা আসেন সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে এবং তাঁদের সে সত্য যুগ যুগ ধরে চিরন্তন হয়ে বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মানবের শুভ চেষ্টায় উন্মুখ হয়ে থাকে। হজরত মুহম্মদ তাঁর সমগ্র জীবনের ভিতর দিয়ে এই চিরন্তন সত্যটাকে তুলে ধরেছিলেন বিশ্বের সম্মুখে এবং সেটা আজও উজ্জ্বল, জ্যোতিষ্মান হয়ে রয়েছে মহামানবের ইতিহাসে। মহাপুরুষদের বুঝতে হলে তাঁদের জীবনের সত্য সাধনাটুকুকে আগে বুঝতে হবে। হজরত মুহম্মদকে বুঝতে হ'লে, তিনি সমগ্র ইসলামকে কতটুকু সত্য দিয়ে খাঁটি করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সেটুকু বুঝতে হবে সকলের আগে। আধুনিক মুসলমান সমাজ যেমনি করে তাঁর জীবনের অস্বাভাবিক রোমাঞ্চকর ঘটনা বৈচিত্র্য দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, এ ঠিক তাঁকে বুঝা নয়। যাঁরা তাঁর দৈবশক্তির দিকে সাগ্রহ চিত্তে তাকান, তাঁরা ঠিক তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করেন না, বা বুঝবার এতটুকু শক্তি তাঁদের নাই।

আমরা এখানে আধুনিক মুসলমানগণ তাঁকে কেমন করে বুঝতে চেষ্টা করেছেন, এবং তিনি কি, কতটুকু, তা নিয়ে আলোচনা করব। আগেই বলেছি, তাঁর জীবনের সমগ্র সত্যটুকুকে বিচার করে তাঁকে বুঝতে হবে। সত্যটুকুকে বাদ দিয়ে যদি তাঁর উপর অন্ধ ভক্তি আনয়ন করা হয়, তবে এক বিরাট মানবত্বের অবমাননা করা হবে। তাঁর এই সত্যটুকুর বিকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর সাধনায়, ত্যাগে এবং মানব-কল্যাণ ইসলামে। এখানে মানব-কল্যাণ বিশেষণটি প্রয়োগ করার উদ্দেশ্য এই যে, ইসলাম জীবাত্মার আনন্দ উপলব্ধির এবং মানব মুক্তির এক সুমহান পন্থা। আর ইসলাম শুধু কতকগুলো আদেশ-নিষেধ মেনে চলা লোকদের জন্য নয়। ইহা সমগ্র বিশ্বমানবের। এখন যারা এটাকে আদর্শ বলে নেয়, নিক এবং যারা এতটুকু বুঝে না, তারা বুঝতে চেষ্টা করুক। তাঁর জীবনের সাধনা কোথায়? সেখানেই আমরা তাঁর সাধনাকে সম্পূর্ণ প্রকটিত দেখতে পাই, যেখানে তাঁর প্রচারিত তৌহিদতত্ত্ব জ্বরাপীড়িত মুমূর্ষু মানবকে এক সত্য পথের ইঙ্গিত দেয়। আর ত্যাগ মাহাত্ম্য দেখতে পাই তাঁর আড়ম্বর-বিবর্জ্জিত সাংসারিক জীবনে, আর প্রচারিত সাম্যমন্ত্রে এবং একান্ত তাঁর পরের জন্য জীবনের অস্থায়ী সুখ সম্ভোগ বিসর্জ্জনে।

তাঁর আবিষ্কৃত ইসলামের কতটুকু সত্য। জীবনের চরম লক্ষ্য এবং আত্মার উপলব্ধিতে জীবন্ত সত্যের বিকাশ। হজরত মুহম্মদ ইসলামকে এই সত্য ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে রেখে গেছেন। তাঁর সমগ্র জীবনের সাধনা ত্যাগ, আর মানব মুক্তির জন্য সুগভীর গবেষণার সমষ্টি হ'ল ইসলাম। আমরা ইসলামের যে সকল আদেশ নিষেধের প্রচলন দেখতে পাই, এগুলো হ'ল জীবাত্মার আনন্দ উপভোগের এক সুখপ্রদ পন্থা। এই আদেশ নিষেধ সমুদয়কে

www.pathagar.com

নিতান্ত বিকৃত ক'রে পালন করার মত বিড়ম্বনা আর নাই। আধুনিক মুসলমান, বিশেষ করে বাংলার মুসলমান কিন্তু এসব আদেশ নিষেধের বড় একটা ধার ধারে না। তারা ইসলামের আদর্শ সত্যটুকুকে কত ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে নিবদ্ধ করে রেখেছে। ইসলামের কতগুলো আদেশ নিষেধ চিরন্তন জাগতিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর প্রতি প্রাণের প্রচণ্ড টান আমরা দেখতে পাই প্রথমেই 'খোদাতালা একমাত্র উপাস্য' এই মহামন্ত্রে। কিন্তু এই মহামন্ত্র মুসলমান প্রাণের আবেগ দিয়ে গ্রহণ করছে পীরের পায়ে সেজদা করতে শিখে, দাদাপীরের কবরে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে গিয়ে। 'জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জ্ঞানান্বেষণ কর'—ইসলাম যে শুধু এই মহাকর্ত্তব্যকে অনুমোদন করেছে, তা নয় ; ইসলাম আরো বলেছে, 'শহীদের লোহু হতে পণ্ডিতের কলমের কালি সহস্রগুণ শ্রেয়।' মুসলমান আজ একথা মেনে চলে কি? চারিদিকে আজ এ হাহাকার আমরা শুনতে পাই, 'মুসলমান হীনবীর্য্য হয়ে পড়েছে।' তাঁদের এই অধঃপতনের কারণ ইসলামের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা প্রদর্শন। 'মুসলমান মাত্রই পরস্পর ভ্রাতা'—একথা তাদের নিকট ধর্ম্ম পুস্তকের পৃষ্ঠায় কতগুলো আঁচড় বই কিছুই নয়। মুসলমান এখানেই হজরত মুহম্মদের কঠোর আদেশের প্রতি সম্পূর্ণ অবহেলা প্রদর্শন করেছে। 'জেনা ক'রো না, মদ্যপান ক'রো না, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করো না'— এগুলো নিষেধের সমষ্টিকে বাড়িয়ে তুলেছে মাত্র। স্বার্থোদ্ধার কোরানের এক কঠোর বাক্যে যেন পরিণত হয়েছে। আর্ত্তের হাহাকার, দুঃখীর মরম ফাটা কাতরাণি বীণাতানের মত আধুনিক মুসলমানদের কর্ণে এসে অমৃত বর্ষণ করছে। কোরানের স্পষ্ট বাণী 'তোমাদের ভাইদের মনে কষ্ট দিও না', 'প্রাণ দিয়ে পরোপকার করো'—এসব কথা যেন হজরত মুহম্মদের সঙ্গে সঙ্গে স্বর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

মুসলমান হজরত মুহম্মদকে আদর্শ ধরে জীবনযাত্রা শুরু করে বলে তা'দের গর্ব্ব। কিন্তু বিরাট যে মহাপুরুষ যিনি তপস্যায়, কর্ম্মে, প্রেমে এবং বিচিত্রতায় জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের অন্যতম, কয়জন তাঁকে সত্যিকার করে জানে? তাঁর জীবনের জটিল ভঙ্গিমার আবর্ত্তে পড়ে কতজন ঘুরপাক খেয়ে মরছেন। তাঁরা মহাপুরুষের অপূর্ব্ব সৌম্য মূর্ত্তি কল্পনা করেই আত্মহারা হয়ে পড়ছেন। তাঁর ভিতরের সৌন্দর্য্য, চিত্তের উদারতা, আর মানবত্বকে এঁদের কল্পনা নিতান্ত আড়াল করে চলেছে। এঁদের কাছে মহাপুরুষের জীবনেতিহাস এক অদ্ভুত রূপ ধারণ করে আছে। 'সুগভীর কূপের জলে বালতি পড়ে গেছে এবং সে বালতি হজরত মুহম্মদ এত নিচু থেকে হাত বাড়িয়ে তুলে নিয়েছেন, আর তিনি অঙ্গুলির ইশারায় এত দূরে আকাশে যে চন্দ্র, তাকে দিখণ্ডিত করে ফেলেছেন'—এগুলোই হ'ল বর্ত্তমান মুসলমানদের নিকট তাঁর জীবন্ত সাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি। তারা জানে এমনিতর কত চমকপ্রদ কাহিনী কত মহাপুরুষের জীবনে ছিল। তাঁর জীবনের সত্যিকার নিদর্শন যেন কালের পটে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। তাঁর মহাজীবনের সে তেজোময় বীরত্ব, অবারিত ত্যাগ, উজ্জ্বল মনীষা, গভীর সাধনা আর নিঃস্বার্থ প্রেম—বর্ত্তমান জড়বাদী মুসলমানের কাছ থেকে পাওয়ার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব আধুনিক মুসলমানদের বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানদিগকে 'সম্মোহিত' আখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁর প্রদত্ত এ আখ্যাটি যে সম্পূর্ণ মানানসহি হয়েছে, তা' এদের প্রচলিত ধর্ম্ম কর্ম্ম এবং জীবনের লক্ষ্য নিরীক্ষণ করলে সম্পূর্ণ অনুভব করা হয়। বাস্তবিক হজরত মুহম্মদের দিকে তাঁর অনুবর্ত্তী ভক্তগণ যে দৃষ্টিতে চেয়েছেন, তাতে তাঁর জীবনের একান্ত সত্য, ইসলামের

www.pathagar.com

মাহাত্ম্যটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এসব ভক্তগণ যে তাঁর কঠোর সংযমী ভক্ত নয়, তা' নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলকে মানতেই হবে। এখানে মহাপুরুষের সাধনা পুরো রকমে ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাঁর সংযম সাধনা এখানে (আধুনিক মুসলমানদের কাছে) এক অপূর্ব্ব বিপরীত ফল ফলিয়েছে। তাঁর পরবর্ত্তী ইসলামের মহান সাধকবৃন্দ তাঁর সে সাধনাকে নিতান্ত স্বাভাবিক ক'রে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি।

বর্ত্তমান মুসলমান সমাজ হজরত মুহম্মদকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না। হয়ত একথা শুনে অনেকে আঁতকে উঠবেন। মহাপুরুষের পায়ে জীবনের সব লক্ষ্য উজাড় করে দিলে, তাঁকে শ্রদ্ধা করা হয় না ; তাঁকে সত্যকার শ্রদ্ধা করা হয় তখন যখন তাঁর সাধনাকে প্রাণের আবেগ দিয়ে গ্রহণ করে আত্ম প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত করা হয়। মুসলমান সমাজ হজরত মুহম্মদকে এতটুকু শ্রদ্ধা করে নিজেকে গৌরবান্বিত করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাদের প্রাণ নাই ; এজন্য তারা মহাপ্রাণের আদর করতে জানে না। মহামনা হজরত মুহম্মদের বিরাট বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংসারিক জীবন বিশ্বমানবের দৈনন্দিন কর্ম্মে যোগ সাধনায় যতখানি অবলম্বনযোগ্য মুসলমানদের বিচার বুদ্ধিতে আজিও তা যেন ধরা পড়ে নাই।

www.pathagar.com

সঙ্গীত-চর্চ্চায় মুসলমান

মোতাহার হোসেন

কাব্য, চিত্র, ভাস্কর্য্য ও সঙ্গীত, এই চারটি বিদ্যাকে 'আলঙ্কারিক কলা' বলা যাইতে পারে। ইহারা নানাবিধ রসের প্রকাশক ও উদ্দীপক। 'এই চারটি বিদ্যারই সমান উদ্দেশ্য—সেই উদ্দেশ্য স্বভাব-বর্ণন। কথার দ্বারা স্বভাবের অনুকরণ করা কাব্যের কার্য্য, রং দ্বারা স্বভাব অনুকরণ চিত্রের কার্য্য, গঠন ও আকৃতি দ্বারা স্বভাব অনুকরণ ভাস্কর্য্যের কার্য্য। সেইরূপ সুরের দ্বারা স্বভাব অনুকরণ করা সঙ্গীতের কার্য্য কেবল মানব মনের ভাব ও আবেগ বর্ণনা করাই সঙ্গীতের একমাত্র কার্য্য নহে—বাহ্য জগতের সমুদয় শব্দময় কার্য্য সঙ্গীতের বর্ণনীয়।' এজন্য কণ্ঠ যেখানে অপরাগ সেখানে আমরা বংশী, তার বা অন্য কোন যন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করি। আবার কথা ও সুরের ভিতরকার গতিচ্ছন্দও একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। ছন্দপতন হইলে সুমিষ্ট সুরও বেসুরা বোধ হয়—তাহার রসোদ্দীপিকা শক্তি অনেকাংশে কমিয়া যায়। এইজন্য সুরগুলি তালে তালে সুসঙ্গত-ভাবে উচ্চারণ বা বাদন করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে বোধ হয় শারীরিক গতিভঙ্গী, করতালি, পদক্ষেপ প্রভৃতির ব্যবহার হইত। পরে সেইগুলি উৎকর্ষ লাভ করিয়া নৃত্যকলায় পরিণত হইয়াছে। এখন আমরা গান, বাদ্য ও নৃত্য তিনটিকে সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া জানি।

রসানুভূতি মানবজাতির প্রকৃতিদিও অমূল্য সম্পদ। এজন্য সৃষ্টির আদিকাল হইতে সঙ্গীত সকল দেশে, সকল জাতির মধ্যেই কোন না কোনভাবে বিদ্যমান আছে। সভ্য সমাজ হইতে অতিদূর দূরান্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিবাসীদের মধ্যে একতারা বা দোতারা এবং দুই বা ততোধিক ছিদ্রবিশিষ্ট বংশীর ব্যবহার দেখা যায়।

মানুষের এই স্বাভাবিক বৃত্তি যতই চাপিয়া রাখা যাউক না কেন, কোন না কোন রূপে তাহার প্রকাশ অবশ্যই হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ধার্ম্মিক মুসলমানগণ প্রায় কোন সময়েই সঙ্গীতকে প্রীতির চক্ষে দেখেন না। তথাপি দেখিতে পাই, উচ্চকণ্ঠে সুললিত স্বরে আজান দেওয়া হয়, কেরাত করিয়া সুমিষ্ট স্বরে কোরাণ শরিফ পাঠ করা হয়। ইহা ছাড়া পরমার্থ সম্বন্ধীয় গজল, কাওয়ালী প্রভৃতির অন্ত নাই। মিলাদ শরিফে যে প্রকারে দরূদ পড়া হয়, এবং হজরতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে ওজনে সমস্বরে 'সালাম আলায়কা' পড়া হয়, তাহাকে নিশ্চয়ই সঙ্গীত আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। শাস্ত্রকারেরাও আমোদে নিয়ম-নাস্তি হিসাবে বিবাহের সময় যে বাজাইয়া গান করা জায়েজ রাখিয়াছেন। ইহা হইতে অন্ততঃ এটুকু প্রমাণ হয় যে, নানারূপ সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক বিধি নিষেধের ভিতরেও অনুষ্ঠানপ্রিয় মুসলমানগণের স্বাভাবিক সঙ্গীত স্পৃহা চরিতার্থ করিবার যৎসামান্য পন্থা আছে।

www.pathagar.com

হজরত মুহম্মদ আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে আরব দেশে এক শ্রেণীর গায়ক ছিলেন, তাঁহারা পল্লীতে পল্লীতে ভ্রমণ করিয়া দফ, তার, কামান্দাজা কিম্বা গসবা সহযোগে গান করিতেন। ইহারা একাধারে কবি ও গায়ক দুইই ছিলেন। আরবদের ন্যায় কবিতাপ্রিয় জাতির মনোরঞ্জনের জন্য গানের শুধু সুর হইলেই যথেষ্ট হইত না—অর্থ ও পদবিন্যাসের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইত। বোধ হয় সে গানের প্রকৃতি অনেকটা সুরসমন্বিত আবৃত্তি কিম্বা আমাদের দেশের কবি গানের মত ছিল।

ইসলাম প্রচারের প্রথম দিক দিয়া অনেক দিন যাবত আরব সঙ্গীত বিশেষ কোন উৎসাহ পায় নাই। তাহার কারণ, সে সময় লোকের মন আধ্যাত্মিক উন্নতি চিন্তায় অতিশয় ব্যগ্র ছিল, এবং জাতির উন্নতির জন্য যে সমস্ত গুণ অনুশীলন করিলে সত্বর কার্য্যসিদ্ধির সম্ভব তাহাই প্রাণপণ উৎসাহে অভ্যাস করিতে করিতে সঙ্গীতের উপযুক্ত অবসরও তেমন ছিল না। বিশেষতঃ হজরত মুহম্মদ ধর্ম্মাভ্যাস হিসাবে সঙ্গীতের উপকারিতা অস্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহার প্রমাণ, তিনি বলিয়াছেন, 'পানিতে যেমন শেওলা জন্মায়, সঙ্গীত বা গীত হইতে হৃদয়ে তেমনি কৃত্রিমতা জন্মে' ; 'যদি সঙ্গীতকে আরাধনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে সে আরাধনা কেবল হাত-তালি এবং বংশীবাদনেই পর্য্যবসিত হইবে।'

যদিও শুনা যায়, হজরত ওমর (৬৩৪ খৃ: অ:) কবিতা বা গান রচনা করিতেন এবং হজরত ওসমান (৬৪৪ খৃ: অ:) ইবনে সৌরেজ নামক গায়কের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তবুও ইহাদের সময় সঙ্গীত জনসমাজের একপ্রকার অনাদৃত অবস্থায়ই ছিল। Salvador সাহেব তাঁহার গ্রন্থে দেখাইয়াছেন যে, হজরত আলীর (৬৫৬ খৃ: অ:) খেলাফত সময় সাহিত্য, কাব্য ও অন্যান্য ললিত কলার ন্যায় সঙ্গীত-চর্চ্চার দিকেও লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। হজরত মাবিয়ার (৬৬১ খৃ: অ:) রাজত্বকালে গ্রীস দেশের অনেকাংশ আরবদের অধিকারভুক্ত হয়। তখন তিনি রাজসভার অসংখ্য সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিককে গ্রীক সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য গ্রন্থরাজি অনুবাদ করিবার আদেশ দেন। এইরূপে অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে গ্রীকদের বহু সঙ্গীত গ্রন্থও আরব্য ভাষায় অনূদিত হয়। এই সময় হইতে আরব সঙ্গীতে গ্রীক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইতিপূর্ব্বেই আরবীয়েরা পারস্য দেশ জয় করিয়া তাহাদের সঙ্গীতকে আপন করিয়া লইয়া এক বিশিষ্ট সঙ্গীত পদ্ধতির সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছিলেন—যাহাকে আরব্য-পারস্য সঙ্গীত রীতি বলে।

আমরা দেখিতে পাই, অষ্টম শতাব্দীতে সঙ্গীত আরবদের শিক্ষার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি কয়েকজন খলিফাও সঙ্গীত বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। খলিফা এজিদ (৬৮০ খৃ: অ:) সঙ্গীত রচনা করিতেন, প্রথম ওলিদ (৭০৫ খৃ: অ:) বংশীবাদনে অভ্যস্ত ছিলেন। খলিফা আবুল আব্বাস (৭৪৯ খৃ: অ:) এবং মনসুর (৭৫৪ খৃ: অ:) গায়ক ও বাদকদিগকে যথেষ্ট সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতেন। খলিফা মাহ্‌দী (৭৭৫ খৃ: অ:) নিজে সুগায়ক ছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র বিশ্ববিখ্যাত হারুন-অর-রশিদকেও রীতিমত সঙ্গীত শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই হারুণ-অর-রশিদ খলিফা হইবার পর

www.pathagar.com

(৭৮৬ খৃ: অ:) সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস দর্শন, সঙ্গীত, উপন্যাস প্রভৃতির উন্নতিকল্পে যেরূপ অবারিতভাবে রাজকোষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, উক্ত কীর্ত্তি কাহিনী আজও আরবের মুখে মুখে ধ্বনিত ও গীত হইয়া থাকে। তিনি যেমন একদিকে অগণিত মসজিদ নির্ম্মাণ করেন, সেইরূপে অন্যদিকে অসংখ্য স্কুল কলেজেরও প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমস্ত বিদ্যালয়ে সঙ্গীতও রীতিমতভাবে আলোচিত হইত—এমন কি কয়েকটিতে কেবলমাত্র সঙ্গীতই শিক্ষা দেওয়া হইত।

নবম শতাব্দীতে সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক পুস্তকাদি লিখিত হয়। কবি সালিল ৭৮০ খৃষ্টাব্দে 'শব্দ বিজ্ঞান' ও 'তাল-জ্ঞান' নামক দুইখানা পুস্তক লিখিয়া যায়। আর একজন লেখক ওবেদুল্লা-বিন্-আবদুল্লা 'স্বর ও সঙ্গীতের সুর-বৈচিত্র্য' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তারপর ৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত দার্শনিক আলকিন্দী সঙ্গীত বিষয়ক ছয়খানি বৃহৎ পুস্তক প্রকাশ করেন : (ক) রচনা প্রকরণ, (খ) স্বর বিবরণ, (গ) প্রাথমিক সঙ্গীত, (ঘ) লয় ও তাল প্রকরণ, (ঙ) বাদ্যযন্ত্র, (চ) কবিতা ও সঙ্গীতের সমন্বয় রহস্য। তাঁহার শিষ্য আসমত-বিন-মুহম্মদ 'সঙ্গীত বিজ্ঞান প্রবেশিকা' নামক একখানা বৃহৎ পুস্তক রচনা করেন।

আরবদের মধ্যে কেবল যে পুঁথি লেখা বিদ্যারই বিশেষ আলোচনা হয়, তাহা নহে। ক্রিয়াসিদ্ধ সঙ্গীতেও বড় বড় ওস্তাদ আরবদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। (১) ইব্রাহিম মসৌলী (৭৪২ খৃ: অ: – ৮০৩ খৃ: অ:) আরব সঙ্গীতের পিতৃস্থানীয়-কারণ তিনি নিজে ত একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেনই, তাহা ছাড়া তিনি অসংখ্য কৃতবিদ্য শিষ্য তৈয়ার করিয়া যান। (২) জোবায়ের-ইবনে-দাহমান রাজসভায় বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। এমন কি তিনি পুরস্কারস্বরূপ দুইটি গ্রামের জায়গীর লাভ করেন। (৩) মাবেদ-মাদিনী গায়করূপে সমস্ত আরব দেশ ভ্রমণ করিয়া যশোলাভ করেন। (৪) জাসিদ হা'ওরা সর্ব্বপ্রথমে অন্তঃপুরে সুশিক্ষিতা গায়িকা দ্বারা গান করাইবার প্রথা প্রচলিত করেন। (৫) কোরায়েশ সঙ্গীত সাধন বিষয়ে একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন। (৬) খলিফা মোতাওয়াক্কিনের পুত্র আবু আয়কা তিনশত গীত রচনা করেন। (৭) মসৌলীর পুত্র ইসহাক অনেক সঙ্গীত গ্রন্থের প্রণেতা ও প্রচারক ছিলেন। (৮) সুকবি এবং সুগায়িকা ওরায়েব অনেক গীত রচনা করেন—তাঁহার নাকি একুশ হাজার তান কণ্ঠস্থ ছিল। ইহা ছাড়া মুহম্মদ ইব্নল হারেস, সেলসেল, মোকারিক, আল গারিদ, ইবনে জর্জ্জে সুমা প্রভৃতি বিখ্যাত ছিলেন। এই শেষোক্ত দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী সভা গায়ক ছিলেন। খলিফা হারুনের রাজত্বকালে অনেক নূতন গীত রচিত হয়। তৎসমুদয় সংগ্রহের নিমিত্ত জালেদ ইব্নল এবং অন্য দুইজন গায়ক লইয়া এক কমিশন গঠন করা হয়। তাঁহারা নব সঙ্গীতের এক প্রকাণ্ড খসড়া প্রস্তুত করেন।

কিন্তু বোগদাদের গৌরব বেশীদিন অক্ষুণ্ন থাকে নাই। আমরা এখন বোগদাদকে যশের উন্নততম শিখরে আরূঢ় রাখিয়া এইবার আরবাধিকৃত স্পেনের রাজধানী কর্ডোভার দিকে দৃষ্টিপাত করিব। স্পেনীয় খলিফা প্রথম হাকাম (৭৯৬ খৃ: অ:) কর্ত্তৃক আহূত হইয়া বোগদাদের একজন বিখ্যাত ওস্তাদ, সারজাব কর্ডোভায় আগমন করেন। ইনি পূর্ব্বকথিত খ্যাতনামা ইব্রাহিম মসৌলীর একজন উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। ইনি ৮২১ খৃষ্টাব্দে

www.pathagar.com

কর্ডোভায় এক সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শীঘ্রই সেভিল, গ্রাণাডা, ভ্যালেন্‌শিয়া এবং টলেডো নগরেও সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। কর্ডোভার বিদ্যালয় পরিণামে উপপত্তিক ও ক্রিয়াসিদ্ধ উভয়বিধ সঙ্গীতের জন্যই বিখ্যাত হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে যেমন তানসেন, স্পেন, আরব ও মিশরে তেমনি আল ফারাবীর (৯৫০ খৃ: অ:) নাম ঘরে ঘরে প্রচারিত। তাঁহার সঙ্গীত পুস্তক এখনও সম্মান সহকারে রক্ষিত আছে। আলীহিস্পাহী (৯১৮ খৃ: অ:) আর একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সহস্র বৎসর অতীত হইয়াছে, তথাপি 'কিতাবুল আগানী'তে তাঁহার সঙ্গীত ও অন্যান্য রচনা পাঠ করিয়া লোকে আনন্দ লাভ করে। গ্রাণাডার লোকপ্রিয় গায়ক আবু-বকর-এবনে বাজেহ্ আরস্তুর 'শব্দ-বিজ্ঞানে'র সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। ঐ যুগের আরও কয়েকজন গায়কের নাম-বিনজায়দান, রাব্বি ইউনুস, রাব্বি মুসা, ওয়াদিল, মোহেব, আবিল এবং সরজাবের শিষ্য মৌসালী।

আরবদে সঙ্গীত ও সঙ্গীত পুস্তক সম্বন্ধে উপরে যে বিবরণ দেওয়া গেল তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আরব সঙ্গীত বেশ পরিণত অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল। এই সঙ্গীত যে কেবল আরবদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। বস্তুতঃ পার্শী, তুর্কী, মিশরী, তাতারী প্রভৃতি সমুদয় মুসলমান জাতিই প্রায় তুল্যরূপে এই সঙ্গীত ঐশ্বর্য্যের রসভোগ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ আরবী মুসলমানদের কোরানের ভাষা। এজন্য অন্যান্য ভাষার তুলনায় এই ভাষার প্রভাব স্বভাবতঃ ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান জাতির উপর অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ ইসলামের মূলীভূত এককতার ফলে যাহা এক দেশের মুসলমানদের সম্পদ, তাহা শীঘ্রই সর্ব্বাদেশীয় মুসলমানের সাধারণ সম্পদে পরিণত হয়। আর একটা প্রধান কারণ, তখন আরবেরাই কি বল-বিক্রমে, কি জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য দর্শনে পৃথিবীর অন্য সমুদয় জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এজন্য তাঁহাদের অনুকরণ করা তখন অন্য জাতির পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। আরবদের নিকট হইতেই তৎকালীন ইউরোপ জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত হন। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় সঙ্গীত ব্যাপারেও ইউরোপ আরবের নিকট বিশেষতঃ আরবাধিকৃত স্পেনের নিকট ঋণ সূত্রে আবদ্ধ।

স্পেনে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়-কার্য্য সংঘটিত হয়। সেখানকার সঙ্গীত বিদ্যালয়গুলিতে যে কেবল আরব-পারস্য পদ্ধতি অনুসারেই শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা নহে। লুপ্তপ্রায় গ্রীক পদ্ধতির পুনরুদ্ধার করিয়া তাহাও ঐ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। কালক্রমে উভয় পদ্ধতিই কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়া এক অভিনব পদ্ধতির সৃষ্টি হয়। আজ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-আরবে প্রাচীন প্রথা প্রচলিত থাকিলেও স্পেন, আলজিরিয়া, টিউনিস, মিসর, প্রভৃতি স্থানে এই মিশ্র পদ্ধতি অনুসারেই গান গাওয়া হইয়া থাকে। আজও মাদ্রিদের রাজপথে আরব-পারস্য গ্রীক-রীতির তানমূলক গান যথেষ্ট শোনা যায়, তাহা বোধ হয় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর গান। এরপর ইউরোপীয় সঙ্গীতে অনেক পরিবর্ত্তন, অনেক উন্নতি হইয়াছে। তাঁহাদের এখন আর তাল প্রধান (melodic) সঙ্গীত নাই। এখন তাহা সংযোগ-প্রধান (harmonic music)। এমন কি, পূর্ব্বকালে গীর্জ্জায় যে তান-প্রধান গ্রেগরীয় সঙ্গীত

(Gregorian Music) শুনা যাইত, তাহাও এখন সংযোগ-প্রধান করিয়া গাওয়া হয়। প্রাচীন রোমীয়দের আটটি 'গ্রাম' বা স্বরান্তর প্রকাশের ধারা ছিল। গ্রীক ও আরবেরা চৌদ্দটি 'গ্রাম' ব্যবহার করিতেন। কিন্তু বর্ত্তমান ইউরোপে কেবলমাত্র 'major scale' এবং স্থলবিশেষে 'minor scale' এই দুইটি মাত্র 'গ্রাম' ব্যবহার করা হয়। এজন্য আজকাল ইউরোপের অনেক সঙ্গীতজ্ঞ বলিতেছেন যে, কেবল একটি বা দুইটি মাত্র 'গ্রাম' অবলম্বন করিয়াই যেমন বিচিত্র সংযোগ-প্রধান সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, পরিত্যক্ত 'গ্রাম'গুলি পুনরায় গ্রহণ করিয়া তাহাদের সাহায্যেও পরস্পর সংযোগে এই প্রণালীতে সহস্র সহস্র উৎকৃষ্ট ভাবোদ্দীপক সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়া বর্ত্তমান সঙ্গীতের বৈচিত্র্য শতগুণ বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে।*

যাহা হউক, এইবার আমরা ইউরোপের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের ভারতীয় সঙ্গীতের উপর মুসলমানের প্রভাব কিরূপ কাজ করিয়াছে, সংক্ষেপে তাহাই একটু আলোচনা করিব। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ভারতীয় সঙ্গীত ও আরব্য-পারস্য সঙ্গীত উভয়েই সম-প্রাকৃতিক। উভয়েইও তান-প্রধান সঙ্গীত এবং তবলা বা ঐরূপ কোন তাল-রক্ষণ যন্ত্রের সহিত গীত বা বাদিত হয়। উভয়েরই রাগ-রাগিণীর দৃঢ় বন্ধন আছে—পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ন্যায় লৌকিক প্রভাবের ততটা স্থান নাই। যে গমক বা মীড় ইউরোপীয় সঙ্গীতজ্ঞের কানে বিষবৎ লাগে, তাহা ভারতীয় ও আবরীয় সঙ্গীতের একটা শ্রেষ্ঠ ভূষণ। আবার যন্ত্র হিসাবেও ভারতের বীণা, আরবের রবাব ; ভারতের বেহালা, আরবের কামান্দজা ; ভারতের মুরলী, আরবের গসেবা ; ভারতের ঢোল, আরবের দফ ; ভারতের ত্রিতন্ত্রী, আরবের কৌইএ বা কিথারা ; ভারতের জয়ঢাক, আরবের আতাম্বর। এইরূপে দেখা যায় যে, ভারতে যে কাজের জন্য যে যন্ত্র আছে, আরব, পারস্য, তাতার প্রভৃতি দেশেও সেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত অনুরূপ যন্ত্র বর্ত্তমান আছে।

ভারতীয় সঙ্গীত মুসলমানী সঙ্গীতের সমভাবাপন্ন হওয়াতে এদেশের পাঠান ও মোগল বাদশাহাদের পক্ষে তাহার রস গ্রহণ করা সহজ হইয়াছিল। রস গ্রহণ করিতে না পারিলে, তাঁহারা ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি এতটা মনোযোগ দিতেন কিনা সন্দেহ। বাস্তবিক পক্ষে মুসলমান বাদশাহরা এদেশের সঙ্গীতকে যেভাবে উৎসাহিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা অন্যত্র পাওয়া দুষ্কর। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে ভারতীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিয়া লইয়া তৎসহ আরব-পারস্যের নূতন রাগ রাগিনীর সংমিশ্রণে অতি বৈচিত্র্যময় মনোহর সঙ্গীতের সৃষ্টি করেন। রাগ-রাগিনীর সংখ্যা এত বর্দ্ধিত হয় যে, তাহাদিগকে ঠাট হিসাবে, গাইবার সময় হিসাবে, ঔড়ব খাড়ব হিসাবে প্রভৃতি নানা উপায়ে শ্রেণী-বিভাগ করা হয়। এ কাজটি মুসলমানেরাই করিয়া গিয়াছেন। তাহা না করিলে বর্ত্তমানে আমরা যে সমস্ত রাগ রাগিনীর পরিচয় পাই, তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া যাইত, সন্দেহ নাই। দ্বাদশ মল্লার', 'অষ্টাদশ কানাড়া', 'সপ্ত-সারঙ্গ', নব-নট', 'দ্বাদশ চৌড়ী' প্রভৃতি নাম

* Salvador Daniel কৃত Arab Music and Musical Instruments' নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

হইতেই, মুসলমান বাদশাহ্দের আমলে ভারতীয় সঙ্গীত যে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'গীত-সূত্র সারে'র উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, 'মুসলমান সম্রাটদিগের সময় হিন্দু ও মুসলমানে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। এজন্য তৎকালে সঙ্গীতের যে প্রকার চেষ্টা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বকালাপেক্ষা অধিক ব্যতীত অল্প নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিতাই উন্নতির প্রধান কারণ ও উত্তেজক। অতএব তাহারই প্রভাবে হিন্দুস্থানী লোকের সঙ্গীত-জ্ঞান, রচনা-কৌশল এবং কর্ত্তব্যশক্তি প্রভৃতির যথেষ্ট উৎকর্ষ হইয়াছে। কেননা, নবাব বাদশাহ্রা ভূয়োভূয়ো উৎসাহ-দান দ্বারা বহুকাল ঐ প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্রোত প্রবল রাখিয়াছিলেন। সেই সময়ে নূতন নূতন রাগ-রাগিনীর সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি হইয়াছে, নূতন নূতন সঙ্গীত যন্ত্রেরও সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রকার উন্নতির অনেক লক্ষণই দেখা যায়। কেবল সঙ্গীতের দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত গ্রন্থের অনুশীলন হয় নাই বলিয়া, সঙ্গীতের অবনতি হওয়া স্বীকার্য্য হইতে পারে না। ঐ সকল গ্রন্থে বর্ণিত ২২.প্রকার শ্রুতি, ২১ প্রকার মূর্চ্ছনা, ২৩ প্রকার গমক, ৬৩ প্রকার বর্ণালঙ্কার, শত সহস্র প্রকার তান, ইত্যাদির কেবলমাত্র নাম শিখিয়া ওস্তাদদিগের কি উপকার হইত?'

অতি প্রাচীন কালে যে সমস্ত রাগ-রাগিনী ছিল, বর্ত্তমানে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কারণ উন্নতি হইলে প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হয়। ইহার উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আদিম কালে অর্থাৎ বৈদিক যুগে মাত্র তিনটি স্বরে গান হইত। পরে ক্রমে ক্রমে সপ্তস্বরের সৃষ্টি হয়। 'কুশলীব যখন রাজসভায় রামায়ণ গান করিয়াছিলেন তখন তাহা শুদ্ধ সপ্ত স্বরেই গীত হইয়াছিল। বিকৃত বারস্বর যোগ ছিল কিনা সন্দেহ।'* 'কৌশল এক হইলেও আদিম মানব হৃদয়ে তাহার সর্ব্বাংশ স্ফূর্ত্তি পায় নাই বলিয়াই একেবারে স্বরের উনিশ জন্ম হয় নাই। ইহাও ক্রমে হইয়াছে।'* মুসলমানদিগের সময়েও সুর সংখ্যার দিক দিয়া না হউক, বৈচিত্র্যের দিক দিয়া সঙ্গীতের অনেক উন্নতি হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে 'উৎপত্তি ভিন্ন গান ও গৎ প্রভৃতি কর্ত্তবাংশের উদাহরণ কিছুই পাওয়া যায় না।'* 'প্রাচীন কালের ব্যবসায়ী লোকে যে ঐ সকল সংস্কৃত গ্রন্থের মতানুসারে সঙ্গীত সাধনা করিত, তদ্বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে।'

সুতরাং প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীতের সহিত আধুনিক হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের তুলনা করা বড়ই দুষ্কর। তবে শুনা যায়, দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশে এখনও নাকি প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারেই সঙ্গীত চর্চ্চা হইয়া থাকে। তাহাকে কর্ণাটী ও দ্রাবিড়ী সঙ্গীত বলে। তাহা ছাড়া মহারষ্ট্রীয় ও বাঙ্গালী সঙ্গীতও হিন্দুস্থানী সঙ্গীত হইতে ভিন্ন। কলিকাতায় সর্ব্বপ্রকার সঙ্গীতই আলোচিত হইয়া থাকে। কিন্তু গুণিগণ সকলে একবাক্য হইয়া মুসলমান প্রভাবান্বিত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকেই শ্রেষ্ঠ ও মনোহর বলিয়া স্বীকার করেন—

---

* ডাক্তার রামদাস সেন মহাশয়ের 'ঐতিহাসিক রহস্য' তৃতীয় ভাগ হইতে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।
* কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "গীতসূত্র সারের' উপক্রমণিকা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

তাই এদেশে কর্ণাটী, মহারষ্ট্রী বা বাঙ্গালী ওস্তাদ অপেক্ষা হিন্দুস্থানী ওস্তাদদেরই সমাদর অধিক।

পাঠান রাজত্বকালে সম্রাট আলাউদ্দিন খিলজী স্বয়ং উত্তম গায়ক ছিলেন। বিখ্যাত সাধক ও গায়ক আমীর খসরু তাঁহার সভাকবি ছিলেন। এই সময় দক্ষিণ দেশে নায়ক গোপাল নামক একজন বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন। তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া সমুদয় বিখ্যাত ওস্তাদকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে আলাউদ্দীনের রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু এখানে আমীর খসরুর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁহাকে পরাভব স্বীকার করিতে হয়। কিভাবে তাঁহাদের প্রতিযোগিতা হইল, এবং কিরূপে জয় পরাজয় নির্ণীত হইল, তাহার কোন বিবরণ এ পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিতে পারি নাই। আমীর খসরুর চেষ্টা ও উৎসাহেই প্রথমে মুসলমানেরা হিন্দু–সঙ্গীত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইনি সেফদা; ইমন, ইমন কল্যাণ, ইমন পুরিয়া ও ইমন বেহাগ রাগিনী সৃষ্টি করেন। আবার ইনিই বীণার অনুকরণে সেতার যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। কথিত আছে, বর্ত্তমান কালে যে ঢং এ ধ্রুপদ গাওয়ার রীতি আছে, গুণি–শ্রেষ্ঠ আমীর খসরুই তাহার প্রবর্ত্তক। মোগল সম্রাট আকবর শাহের সময় স্বনামধন্য তানসেন তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। তানসেনের কীর্ত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ কাহিনী প্রচলিত আছে ; সে সমস্ত আর বলিবার আবশ্যক নাই। তিনি দরবারী কানাড়া, মিয়া সারঙ্গ, মিয়া মল্লারের সৃষ্টিকর্ত্তা। আকবর বাদশাহের রাজত্বকাল ভারত–সঙ্গীতের এক গৌরবময় যুগ। তাঁহার উৎসাহ না পাইলে কখনই হরিদাস স্বামী, তানসেন তানতরঙ্গ, মানতরঙ্গ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের গায়ক এবং বীণ্‌কার ফিরোজ খাঁর ন্যায় গুণী ব্যক্তি এত সুপরিচিত হইতে পারিতেন না এবং পরবর্ত্তী যুগের সঙ্গীতের উপর তাঁহারা এরূপ স্থায়ী চিহ্নও অংকিত করিয়া যাইতে পারিতেন না।*

জৌনপুরের অধীশ্বর সুলতান হোসেন সিরকী 'খেয়াল' গানের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাহা ছাড়া ইনি সোহাটোরী, সুখরাইটোরী, নাচারীটোরী, জৌনপুরীটোরী, সুলতানী বারোয়াঁ, পিলু, মালিগৌরা, হোসেনী কাড়ানা ও সাহানা রাগিনীর সৃষ্টি করেন। মিঞা বখশু সুখল বেলাওল ও বাহাদুরী টোরি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। লাক্ষ্ণৌ নিবাসী গোলাম নবী টপ্পা গানের সৃষ্টি–কারক।

ইহা ছাড়া তানসেনের পুত্রদ্বয় মানতরঙ্গ, তানতরঙ্গ, তানসেনের ছাত্রদ্বয় চাঁদ খাঁ, সুরজ খাঁ, বিখ্যাত খেয়ালীদ্বয় সদারত্ন, অদারঙ্গ, কলাবৎ নূর খাঁ, টপ্পাগায়ক হাম্‌দম্‌, সদারঙ্গের শিষ্যদ্বয় শক্কর, মাখ্‌খন, গোলাম রসুল, মুহম্মদ খাঁ, মজ্জু খাঁ, সেখ বিচ্ছু, মির্জ্জা আক্কেল, মিয়া গম্ভু, বীণ্‌কার নাসির আহম্মদ, হাস্‌সু খাঁ, করিম খাঁ, হার্দ্দু খাঁ, কাশী নিবাসী বীণ্‌কার মহম্মদ খাঁ, সারঙ্গী নবী বক্স, বড় মিঞা, ছোট মিঞা, বীণ্‌কার ওয়ারিশ,আলী খাঁ, রবাবী বাসদ খাঁ, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সান্দকলী খাঁ, সেচারী এমদাদ খাঁ, শারদী উজির খাঁ, প্রভৃতি গুণিগণ সমগ্র ভারতব্যাপী যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। একটা বিশেষ

---

* আকবর বাদশাহ স্বয়ং উৎকৃষ্ট পাখোয়াজী ছিলেন। ইহাদের অধিকাংশ নামই ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'সঙ্গীত–সার' হইতে গৃহীত।

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, এই সকল গায়কেরা স্বয়ং অসংখ্য সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং যন্ত্রীরাও প্রত্যেকে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর গৎ প্রস্তুত করিয়া সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন।

খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি গান পূর্ব্বে ছিল না। এগুলি বাদশাহী আমলের সৃষ্টি। এজন্য ইহাদের প্রকৃতি ও বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে এদেশে কেবল ধ্রুপদ বা (ধ্রুবপদ) গানেরই প্রচলন ছিল, এবং তাহার যথেষ্ট উন্নতিও হইয়াছিল। প্রবন্ধ, হোরি (বা হোলি গান), তেলেনা, যুগলবন্ধ রাগমালা প্রভৃতি ধ্রুপদের অন্তর্গত। ধ্রুপদের রচনা বিস্তৃত, এবং তাহা অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই চারি অংশ বা কলিতে বিভক্ত। প্রথম অংশে সুর, মধ্য-সপ্তকে থাকিয়া রাগিনীর মূর্ত্তি প্রকাশ করে ; দ্বিতীয় অংশে মধ্য-সপ্তক হইতে তারা-সপ্তক পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া আবার অবরোহণ ক্রমে আস্থায়ীর সহিত মিলিত হয় ; তৃতীয় অংশে সাধারণতঃ মধ্য-সপ্তক হইতে মন্দ্র-সপ্তকে অবতরণ করিয়া নানা বৈচিত্র্য প্রকাশ করে ; তৎপর চতুর্থ অংশে আবার তারা-সপ্তক পর্য্যন্ত উঠিয়া রাগিনীর সম্পূর্ণ বিস্তার দেখাইয়া ক্রমে আস্থায়ীর সহিত মিলিত হয়। ধ্রুপদ গান করা বড় কঠিন কার্য্য। তাহার কারণ এই নহে যে, কঠিন কঠিন তালে ধ্রুপদ গান করা হয়। কিন্তু প্রকৃত কারণ এই যে, ধ্রুপদের পদ অতি দীর্ঘ, তাহাতে অনেক দমের প্রয়োজন। ধ্রুপদের সহিত মৃদঙ্গ বা পাখোয়াজের সঙ্গত হয়। সাধারণত চৌতাল, ধামার, সুর-ফাঁক, ঝাঁপতাল, রূপক ঢিমে তেতাল, প্রভৃতি তালই বিলম্বিত লয়ে ধ্রুপদে ব্যবহৃত হয়। মৃদঙ্গের চামড়ার উপর ভিজা ময়দার ঢিপি করিয়া তাহার উপর আঘাত করিলে যে অতি গুরুগম্ভীর আওয়াজের সৃষ্টি হয়, তাহার তালে তালে রাগরাগিনীর বিস্তার পূর্ব্বক যে ধীর মন্থর গতিতে ধ্রুপদ গাওয়া হয়, তাহাতে সমগ্র মজলিসে এক শান্ত, সৌম্য, উদাত্ত ভাবের সৃষ্টি হয়। প্রাচীনকালে ধ্রুপদের বাগ্‌বিন্যাস কিরূপ ছিল, তাহা বিশেষ করিয়া জানিবার উপায় নাই। এখন তানসেন দুঁদি খাঁ, মিঞা বক্‌সু, বাবা সুরদাস প্রভৃতির রচিত অনেক উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদগান প্রচলিত আছে। এখন এইগুলিই প্রাচীন ধ্রুপদের মধ্যে পরিগণিত। পাঞ্জাব প্রদেশে ধ্রুপদের চর্চ্চা অধিক। সেখানকার সঙ্গীতাধ্যাপক মৌলাদাদ ও ইলিয়াস বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

জৌনপুরের অধীশ্বর সুলতান হোসেন সিরকী ধ্রুপদ ভাঙ্গিয়া খেয়াল গানের সৃষ্টি করেন। খেয়ালের রচনা ধ্রুপদ অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত। ইহার মাত্র দুইটি কলি আছে, আস্থায়ী ও অন্তরা। কদাচিৎ তিন চারটি কলিও থাকে। খেয়ালের রচনা একটু দীর্ঘ হইলে এবং কিছু শ্লথ করিয়া গাইলে, ইহাকে ধ্রুপদ হইতে পৃথক করা দুষ্কর হইয়া পড়ে। কারণ ধ্রুপদের অধিকাংশ তালই জলদ-ভাবে খেয়ালে ব্যবহৃত হয়। তবে 'ধ্রুপদের সুর-ফাঁক, তেওরা, সওয়ারী তালের ন্যায় ছন্দ খেয়ালে ব্যবহার নাই', আবার 'খেয়ালের আড়া ও মধ্যমান তালের ন্যায় ছন্দ ধ্রুপদে ব্যবহার নাই।' খেয়ালে ক্ষুদ্র তান বা গিট্‌কারী ব্যবহৃত হয়, ধ্রুপদে হয় না। আবার ধ্রুপদে যে প্রকার গমক ব্যবহৃত হয় খেয়ালে তাহা হয় না।

www.pathagar.com

হিন্দী খেয়ালের মধ্যে সদারং ও অদারঙ্গের হিন্দী খেয়ালই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এজন্য তাহাই অধিক প্রচলিত। সদারঙ্গ, অদারঙ্গ বাদশাহ মহম্মদ শাহের দরবারের সম্মানিত গায়ক ছিলেন। খেয়াল ও ধ্রুপদ উভয়ই ঈশ্বর-বিষয়ক গানের উপযোগী। খেয়ালে সুরের খেলা অধিক হয় বলিয়া, ইহা ধ্রুপদ অপেক্ষা মিষ্ট। পক্ষান্তরে ধ্রুপদের গতি ধীর ও গম্ভীর বলিয়া বিরাট ভাব প্রকাশের জন্য ইহাই অধিকতর উপযোগী। মোটের উপর সঙ্গীত মানুষের প্রাণের ভাষা এবং তাহার আদর জনসাধারণের রুচির উপর নির্ভর করে। রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে গানের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। এজন্য খেয়াল প্রথমাবস্থায় ধ্রুপদী ওস্তাদদের ব্যঙ্গসহ্য করিয়াও এ যাবত জীবিত আছে—এমন কি ধ্রুপদকে প্রায় আসনচ্যুত করিয়া ফেলিয়াছে।

খেয়ালের পর টপ্পা। টপ্পার মূল অর্থ লম্ফ, তাহা হইতে চাঞ্চল্য বা অস্থিরতা। বোধ হয় টপ্পার গতিভঙ্গী চঞ্চল ও লঘু বলিয়া এই প্রকার গানের 'টপ্পা' নাম হইয়াছে। টপ্পা বলিতেই আমরা শোরী মিঞার টপ্পা বুঝি। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু লক্ষ্ণৌ নিবাসী জানি খাঁর পুত্র গোলাম নবীই টপ্পার সৃষ্টিকারক। শোরী নাম্নী তাঁহার এক প্রিয়তমা প্রণয়িনী ছিলেন। এজন্য তিনি গাইবার সময় শোরী মিঞার ভণিতা দিয়া গাইতেন। কাপ্তেন উইলার্ড সাহেবের মতে টপ্পা রীতির গান পাঞ্জাব প্রদেশের উস্ট্র চালকদের জাতীয় সঙ্গীত ছিল। 'শোরী মিঞা' সুকৌশলযুক্ত সাধনা দ্বারা ঐ গানকে বিশেষ সুললিত ও কারিগরী বিশিষ্ট করিয়া ইহাকে সভ্য সঙ্গীত আসরে গাইবার উপযুক্ত করিয়াছিলেন। তদবধি উহা সভ্য সমাজে আদর লাভ করিয়া আসিতেছে। সভ্য-সমাজে প্রচলিত টপ্পারীতির গান অল্পদিন হইল সৃষ্ট হইয়াছে। এজন্য এখনও ইহার আয়তন ক্ষুদ্র এবং সমস্ত রাগিনীতে টপ্পা গান গাওয়াও হয় না। প্রাচীন রাগিনীর মধ্যে কেবল ভৈরবী, খাম্বাজ, কালেংড়া, দেশ, সিন্ধু প্রভৃতি কয়েকটি এবং আধুনিক রাগিনীর মধ্যে কাফি, ঝিঁঝিট, পিলু, বারোয়াঁ, মাঝ, ইমনি ও লুম এই কয়েকটি মাত্র টপ্পায় ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তাই বলিয়া এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয় যে, টপ্পাধরণে অন্যান্য রাগিনী গাওয়া সম্ভবপর নহে। ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে হইতে নিশ্চয়ই টপ্পায় আরও অধিক সংখ্যক রাগিনীর ব্যবহার হইবে। তাহা ছাড়া সম্ভবতঃ টপ্পার আয়তনও বর্দ্ধিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইহাতে সঞ্চারী ও আভোগ যুক্ত হইবে। তাহার লক্ষণ এখনই দেখা যাইতেছে। 'প্রায়ই দেখা যায়, ওস্তাদেরা পিলু, ঝিঁঝিট, বারেয়াঁ প্রভৃতি আলাপ করিবার সময় ইহাদের সঞ্চারী ও আভোগের উপযোগী অঙ্গ বাহির করিবার চেষ্টা করেন। এইরূপ চেষ্টার ফলে এইসব আধুনিক রাগিনীও বর্দ্ধিত হইয়া প্রাচীন রাগের তুল্য হইয়া যাইবে।' বলা বাহুল্য, প্রাচীন রাগ রাগিনী সমূহও এইরূপ ধারাবাহিক চেষ্টার ফলে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে।* অনেকের ধারণা আছে যে, আদি রসাশ্রিত গানকেই 'টপ্পা' বলে। কিন্তু তাহা নহে। কারণ আদিরসের গান খেয়াল ও ধ্রুপদেও বিস্তর আছে। তবে টপ্পার প্রকৃতি লঘু এবং গতি চঞ্চল ও দ্রুত হওয়াতে ভগবৎ প্রেমের শান্ত ভাবের সহিত ইহার তেমন সামঞ্জস্য

* কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'গীত-সূত্রসার' (৮২ পৃ:)

www.pathagar.com

হয় না। এইজন্য সচরাচর ইহাকে হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ, আনন্দ. প্রণয় প্রভৃতি লঘু প্রকৃতির গানই গাওয়া হয়।

ঠুংরী জাতীয় যে গান লাক্ষ্ণৌয়ে প্রচলিত, তাহা টপ্পারই অন্তর্গত। শোরী মিঞার রচিত গানকেই ওস্তাদেরা টপ্পা বলিয়া থাকেন। তাহা ছাড়া অন্যান্য টপ্পাকে নামান্তরে ঠুংরী বলা হয়। খেয়ালের সঙ্গে যেমন ধ্রুপদের নিকট সম্বন্ধে, সেইরূপ টপ্পার সহিতও খেয়ালের নিকট সম্বন্ধ। এক শ্রেণীর গান আছে, যাহা টপ্পা ও খেয়ালের মধ্যবর্ত্তী—উভয়ের প্রকৃতিই ইহাতে বর্ত্তমান। এজন্য ওস্তাদেরা ইহাকে 'টপ-খেয়াল' নাম দিয়াছেন। .

ইহা ছাড়া খেয়াল টপ্পার অন্তর্গত 'কাওল-কালওয়ানা', 'গুল্-নকশ', 'জিগর', 'সোহেলা, 'গজল' এবং 'দেওয়ালী গান'* মুসলমানেরা সৃষ্টি করিয়া এদেশে প্রচলিত করিয়াছেন। কাজী মামুদ নামক একজন গুজরাটী গায়ক প্রথমে 'জিগর' গানের সৃষ্টি করেন। আজমীর শরীফের দিকে 'কাওয়াল' নামক এক শ্রেণীর গায়ক আছেন, তাঁহাদের গানকে 'কাওল-কালওয়ানা' এবং তালকে 'কাওয়ালী' তাল বলে। অনেক সময় এই গানকে 'কাওয়ালী' গান বলে। হিন্দুদের যেমন কীর্ত্তন, মুসলমানদের মধ্যে তেমনি ; 'কাওয়ালী' ধর্ম্ম সঙ্গীত রূপে ব্যবহৃত হয়।

সঙ্গীতে উৎসাহদাতাদের মধ্যে সম্রাট আলাউদ্দিন, সম্রাট আকবর, বাহাদুর শাহ, মহম্মদ শাহ্ এবং পরবর্ত্তীকালে মেটেবুরুজের নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে মুসলমানদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে, এ যাবত কাল মুসলমানরা সেই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়েছেন। এখন পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিখ্যাত গায়ক, বাদক প্রভৃতি বেশীর ভাগই মুসলমান। এমন কি বর্ত্তমান হিন্দুস্থায়ী সঙ্গীত উৎপত্তি হিসাবে হিন্দু সঙ্গীত হইলেও, তাহা ক্রিয়া-সিদ্ধাংশকে কি ভাষা হিসাবে, কি ঢং হিসাবে মুসলমানী সঙ্গীত বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

যন্ত্র হিসাবে ধরিতে গেলেও, বীণা ভারতের আদি যন্ত্র—ইহাতে রাগাদির আলাপ করা হয়। আবার ইহার সমকক্ষ রবাব যন্ত্রও এদেশে (বিশেষ দিল্লীর নিকটবর্ত্তী রামপুরের নবাব দরবারে) প্রচলিত আছে। রবাব আরবীয় যন্ত্র। ইহাতেও ভারতীয় রাগাদির সুন্দর আলাপ হয়। বীণার আওয়াজ হৃদয়স্পর্শী হইলেও অত্যন্ত ক্ষীণ। এজন্য মুসলমানেরা বীণাকে বড় করিয়া শরদ যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। বীণা বা শরদে রীতিমত আলাপ করিতে হইলে বহু বর্ষ ব্যাপী সাধনার দরকার।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমীর খসরু বীণার অনুকরণে সেতার যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। প্রথমে ইহাতে মাত্র তিনটি তার সংযোজিত থাকিত। ক্রমে পাঁচ তার, সাত তার হইতে হইতে এখন ইচ্ছাধীন বহু সুতার যুক্ত হইয়া থাকে। ছোট সেতার গৎ বাজাইবার পক্ষেই বিশেষ উপযোগী। রাগ-রাগিনীর বিস্তৃত আলাপের নিমিত্ত বাদশাহী আমলে সেতারকে বড় করিয়া অধিক তার

---

* দেওয়ালী রাগ সম্বন্ধে ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর 'সঙ্গীত সারে'র ৩৮৭ পৃষ্ঠার ফুটনোট দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

যুক্ত করিয়া সুর-বাহার যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। যিনিই এ যন্ত্র শুনিয়াছেন তিনিই ইহার সুর-বাহার নামের সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছেন।

বংশী এদেশের অতি প্রাচীন যন্ত্র। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এই যন্ত্রের সৃষ্টিকারক কিনা তাহা প্রত্নতত্ত্ববিদেরাই বলিতে পারেন। আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, তিনি মোহন বাঁশরী বাজাইয়া গোপিনীদের মনোরঞ্জন বা মনোহরণ করিতেন। বাস্তবিক বংশীর স্বর এমন সুমিষ্ট ও চিত্তহারী যে, তাহাতে মন উধাও হইয়া যেন কোন এক মায়াময় স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে। গভীর রাত্রে কিম্বা সায়ংকোলে উদাস করা বাঁশীর সুরে শ্রবণ মন আকৃষ্ট হয় না, এমন লোক খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কোমল ও প্রেম-বিহ্বল উদাসভাব ভারত বাসীর জাতীয় বিশিষ্টতা। বাঁশীতে এই দুইটি 'ভাব প্রকাশিত হয় বলিয়া সমাজের স্তরে স্তরে, এমন কি (অন্য সমস্ত বিষয়ে পশ্চাৎপদ) কৃষকদের মধ্যেও ইহার আদর হইয়াছে। কিন্তু ইহার সুর অতি ক্ষীণ এবং আনন্দের সুর যেন ইহাতে ঠিক ধরা দেয় না। এ অভাব দূর হইয়াছে বাদশাহী আমলের শানাই দ্বারা। উৎসবে এবং নহবতে শানাই বাজে। ইহার স্বর জোরাল এবং আনন্দ ব্যঞ্জক।'

কানুন যন্ত্র আরবদেশ হইতে কাবুল ও ভারতবর্ষে আনীত হয়। মিঞা তানসেনের বংশধর পিয়ারসেন কানুন বাজাইয়া খ্যাতি লাভ করেন। আজকাল কানুনের ব্যবহার খুব কমিয়া গিয়াছে। আরব্য কানুনে ৭৫টি ছোট বড় তার সংযোজিত আছে। জলতরঙ্গে যেমন ছোট বড় পেয়ালায় আঘাত করিয়া নানারূপ স্বর উৎপাদিত করা হয়, কানুনেও তেমনি এই সমস্ত তারে কাঠি দ্বারা আঘাত করিয়া স্বরোৎপাদন করিতে হয়।

গানের সহিত সঙ্গীতের জন্য সারঙ্গী এদেশের অতি প্রাচীন এবং উৎকৃষ্ট যন্ত্র। কোমলকণ্ঠী গায়িকা বা বাইজীদের গানের সহিত এবং আধুনিক সৃষ্ট যাত্রাগানেই আজকাল ইহার প্রচলন দেখা যায়। তাহা ছাড়া অন্যত্র ইহার আদর বড় দেখা যায় না। কাশীধামের প্রসিদ্ধ সারঙ্গী নবী বক্স, সেতার ও সারঙ্গী এই দুইটি যন্ত্রের সমাবেশ করিয়া এস্রাজ বা এসরার যন্ত্রের সৃষ্টি করেন। তদবধি ভদ্র সমাজে, বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষিত সমাজে মহিলাদের ভিতর ইহার প্রভূত আদর হইয়াছে। গায়ক গায়িকার কণ্ঠের সহিত সারঙ্গীর ন্যায় এস্রাজেরও উত্তম মিল হয়। কণ্ঠ সঙ্গীতের অনুকরণ করিতে অন্য কোন যন্ত্রই এই দুইটির সমকক্ষ নয়।

খেয়াল সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তবলারও সৃষ্টি হয়। পাখোয়াজের গুরুগম্ভীর ধ্বনির সহিত খেয়ালের সামঞ্জস্য হইতেছে না দেখিয়া ওস্তাদেরা পাখোয়াজ দ্বিখণ্ডিত করিয়া তবলার সৃষ্টি করেন। সঙ্গে সঙ্গে তবলার উপযোগী বোলবানীও প্রস্তুত হইয়া গেল। ক্রমে বোলবানীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় নানারূপ কৌশলে তবলা বাজাইবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। তাহার ফলে খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী প্রভৃতি গানের লজ্জ (মনোহারিত্ব) শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয় ঢোলককেও আধুনিক যন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা মুসলমান রাজত্বের সময়, কিম্বা তৎপূর্ব্বে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন।

www.pathagar.com

যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, মুসলমানদের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয় সঙ্গীত, বিশেষতঃ আমরা যাহাকে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত বলি, তাহার প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। এইবার বর্ত্তমান ওস্তাদদের অনেকের ভিতর যে একটা প্রধান দোষ স্পর্শ করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। আজকাল ওস্তাদ সম্প্রদায় অধিকাংশই নিরক্ষর হওয়াতে তাঁহারা সঙ্গীতের প্রাণবস্তুটা যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। গান আরম্ভ করিয়াই কেবল মুখভঙ্গী ও তানের পর তান, তানের পর তান। গানের পদ পূর্ব্ব হইতেই জানা না থাকিলে, বৈঠকে শুনিয়া তাহার অর্থ বোধ করিবার আশা দুরাশা। তাঁহারা যাহা উচ্চারণ করেন, তাহা অস্পষ্ট এবং ভ্রমপূর্ণ। সঙ্গীতের মনোহারিত্বের দিকে ইহাদের লক্ষ্য কম, ওস্তাদি দেখাইবার বা তবলাবাদকের সহিত ঝগড়া করিবার প্রবৃত্তিই যেন অধিক। কাজে কাজেই ওস্তাদি গান সাধারণ লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিতেছেন না। ফলে ওস্তাদেরা ক্রমে ক্রমে সাধারণত লোকের সহানুভূতি হওতে বঞ্চিত হইতেছেন। গান চিত্তাকর্ষী করিতে হইলে, তাহার সহিত প্রাণের সংযোগ থাকা চাই—নইলে রস সঞ্চার হইবে কোথা হইতে? প্রাণের যোগ সাধন করিতে গেলে হয়ত বা রাগরাগিনীর প্রাচীনরূপ কিছু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইতে পারে। কিন্তু তাহাতে দোষ কি? চিরকালই ত সেইরূপ হইয়া আসিয়াছে। প্রতিভার আবির্ভাবে চিরকালই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্ধন ছিন্ন হইয়া নূতন নূতন বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও পরিণামে নূতনেরই সর্ব্বদা জয় হইয়াছে। বাংলার সঙ্গীত নূতনের ঢেউ লাগিয়াছে। কীর্ত্তন, ভাটিয়ালী, টপ্পা, পাঁচালী প্রভৃতি ত আছেই, তাহার উপর ব্রহ্ম সঙ্গীত যুক্ত হইয়াছে। আবার কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ নূতন নূতন সুর উদ্ভাবন করিয়া শিক্ষিত সমাজের মনোরঞ্জক অসংখ্য সরস গানের সৃষ্টি করিয়াছেন। এগুলি সাধারণত টপ্পা ঠুংরী ধরণে গীতি হইয়া থাকে। হিন্দুস্তানী ওস্তাদেরা লোক ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া এখনও ইহার উপর হাড়ে হাড়ে চটা। তাঁহাদের এই উদারতার অভাবে বাংলাদশের আশানুরূপ সঙ্গীতের উৎকর্ষ হইতেছে না। কিন্তু বর্ত্তমানে সঙ্গীতধারা যে দিকে প্রবাহিত হইতেছে তাহাতে বোধ হয় যে, ওস্তাদেরাও শীঘ্রই আত্মাভিমান ত্যাগ করিয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। তখন তাঁহাদের নিপুণ কণ্ঠে সুকৌশলযুক্ত হইয়া রবীন্দ্র-সঙ্গীতের চমৎকারিত্ব আরো বর্দ্ধিত হইবে। এজন্য আশা হয় যে, সেদিন খুব সন্নিকট যখন আমরা বাংলাদেশে এক গৌরবময়, তেজোময়, প্রাণময়, অভিনব সঙ্গীতের যুগ দেখিতে পাইব।

উদ্বোধন সঙ্গীত*

কমল বনের মধুপ রাজি
এস হে কমল ভবনে।
কি সুধা গন্ধ এনেছে আজি
নব-বসন্ত পবনে॥

www.pathagar.com

অমল চরণ ঘেরিয়া পুলকে
শত শতদল ফুটিল
বারতা তাহারি দ্যুলোকে ভূলোকে
উঠিল পূর্ণ গগনে।
গ্রহে তারকায় কিরণে কিরণে
বাজিয়া উঠিছে রাগিনী
গীত-গুঞ্জন কূজন-কাকলি
আকুলি উঠিছে শ্রবণে ;
সাগর গাহিছে কল্লোল গাথা,
বেণু বাজাইছে শঙ্খ
সাম-গান উঠে বন পল্লবে
নির্ম্মল-গীতি জীবনে॥"

এই গানটি সর্ব্বপ্রথমেই সম্মিলনের উদ্বোধনার্থে গীত হয়—স. শি:

www.pathagar.com

শিক্ষা-সমস্যা

মমতাজউদ্দীন আহ্‌মদ এম.এ.

শিক্ষার দুইটি দিক আছে Cultural এবং Practical—শারীরিক মানসিক বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন এবং আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধন। প্রথমতঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন—ইহা শারীরিক ও মানসিক ব্যায়াম-স্বরূপ। পুরাকালে অনেকের ধারণা ছিল যে, আত্মার উন্নতিসাধনে শরীর একটি অন্তরায় মাত্র ; তাই কেহ কেহ আত্মার উন্নতির জন্য শরীরকে যথাসম্ভব নির্য্যাতন উৎপীড়ন করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সভ্য জগতে এরূপ সন্ন্যাস ধর্ম্মের সমর্থন করা হয় না। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষভাবে অকাট্য প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়া দিতেছে যে, মন শরীরের সহিত অতি ঘনিষ্ট ভাবে সংশ্লিষ্ট। একের ভালমন্দ অন্যে পায়। তাই শরীরের সুস্থতা নষ্ট করিয়া আত্মার উদ্ধার করিতে গেলে আধ্যাত্মিক উন্নতি দূরের কথা, আধ্যাত্মিক অবনতি উন্মত্ততায় পর্য্যবসিত হয়। পক্ষান্তরে আমরা ক্রমবিকাশবাদ অনুসারে মানবেতর জীবের বংশধর হইলেও, বিবেক বুদ্ধির আবির্ভাবে আমরা নূতন জাতিতে পরিণত হইয়াছি। আমরা আর মানবেতর জীবদের মত জীবনযাপন করিতে পারি না। অধ্যাপক হাক্‌সলী সাহেব তাঁহার Ethics and Evolution নামক Romancs Lecture-এ ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাই জন স্টুয়ার্ট মিল বলেন, সুখী শূকরের চেয়ে অসুখী সক্রেটিস হওয়া ভাল—'It is better to be a socrates dissatisfied than a pig satisfied' অতএব আমাদের পক্ষে আত্মা এবং শরীর দুইটিই সমোপযোগী এবং কোনোটারই পৃথকভাবে পূর্ণ বিকাশ বা পরিপুষ্টিসাধন সম্ভবপর নয়। তাই শরীর মন দুইটিরই যাহাতে যুগপৎ উৎকর্ষসাধন হয় সেইরূপ শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা।

দ্বিতীয়তঃ Practical বা কাজের দিক দিয়া দেখিলে শিক্ষার উদ্দেশ্য আমাদের সুখ সমৃদ্ধি বর্ধন। শিক্ষা আমাদিগকে জ্ঞান দান করে। শিক্ষা দ্বারা আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে মানবজাতি অতীতযুগে এবং বর্ত্তমানে প্রকৃতির সম্বন্ধে, জড়জগৎ, জীবজগৎ, মনোজগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন এবং ঐ জ্ঞানের সাহায্যে ইহাদিগকে মানবজাতির কল্যাণার্থে কাজে লাগাইবার জন্য কল-কারখানা, সামাজিক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি যে সকল উপায়, কৌশল-কৌশলাদি আমরা আয়ত্ত করিয়া প্রকৃতিকে আমাদেরও কাজে লাগাইতে পারি, এবং এই উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আমরা নূতন জ্ঞান অর্জ্জন এবং তদ্বারা অভিনব উপায় উদ্ভাবন ও অবলম্বন করিয়াও ক্রমশঃ মানবজাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াইয়া তুলিতে পারি। সক্রেটিস প্রমুখ প্রাচীন মনীষিগণের ধারণা ছিল যে জ্ঞানই ধর্ম্ম। কিন্তু এই নব যুগের বার্ত্তা হচ্ছে জ্ঞানই বল।

www.pathagar.com

প্রকৃতিকে বিজ্ঞান বলে আমরা যতই ঘনিষ্টভাবে জানিতে পারিতেছি ততই দেখিতে পাইতেছি যে, প্রকৃতি অতি সুনিয়মে নিয়ন্ত্রিত। আমরা প্রকৃতির নিয়মাদি জানিয়া প্রকৃতিকে তাহারই নিয়মাদির সাহায্যে ক্রমশঃ আমাদের বশে আনিতে পারিতেছি এবং আমাদের কাজে লাগাইয়া আমাদের শারীরিক মানসিক বৃত্তিগুলির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিবর্ধ্বিত করিতে পারি। অতএব শিক্ষা একদিকে আমাদিগকে উৎকৃষ্ট পরিপুষ্ট শারীরিক মানসিক বৃত্তিগুলি স্বরূপ ক্ষমতা দেয় এবং অন্যদিকে জ্ঞানরূপ অস্ত্র দান করে, য'দ্বারা আমরা প্রকৃতিকে জয় করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারি। যে জাতি প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়া শারীরিক মানসিক বৃত্তিগুলির পরিপুষ্ট করিয়াছে, কার্লাইলের mens sana incorpore sano সুস্থ শরীরে সুস্থ মন লাভ করিয়াছেন এবং জ্ঞান অর্জ্জন করতঃ প্রকৃতিকে বশে আনিয়া আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক, আচার ব্যবহারাদি সেই জ্ঞানানুযায়ী গঠিত করিয়া মানব জাতির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে যত বেশী কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে তত বেশী সভ্যতার দাবী করিতে পারেন। শারীরিক মানসিক উৎকর্ষসাধন এবং মানব জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ব্যতীত সভ্যতার আর কি মাপকাঠি হইতে পারে?

অতএব প্রকৃত শিক্ষা দ্বারাই আমরা বাঁচিয়া থাকিবার শক্তি এবং সভ্যতা লাভ করিতে পারি।

গত বৎসর বাংলায় শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারী রিপোর্টে দেখা যায় যে, প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলমান ছাত্র বেশ আছে কিন্তু স্কুল কলেজে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা শতকরা তের/চৌদ্দ মাত্র, স্কুল কলেজে মুসলমান মেয়েদের সংখ্যা শতকরা একজনও হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু মাদ্রাসা গত বৎসর ৫০টি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ছাত্র সংখ্যাও সেই অনুপাতে বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রথমিক শিক্ষায় মুসলমান ছেলেরা পাঠশালা মক্তব যেখানেই পড়ুক সাধারণতঃ দুই এক বৎসর তাহারা কোরান শরীফ পড়িয়াই কাটাইয়া দেয়। তারপর বাংলা এবং উর্দ্দু একসঙ্গে পড়িতে আরম্ভ করে। কেহ কেহবা সঙ্গে একটু পার্শী বয়েত পড়ে। বাংলা পড়াটা তাদের পক্ষে বাহুল্য বা বিলাসিতা মাত্র। বলা বাহুল্য আরবী, পার্শী, উর্দ্দু, কেতাব কোরান ছেলেমেয়েরা আদৌ না বুঝিয়াই পাঠ করে। সাধারণতঃ মুসলমানদের মধ্যে একটা কুসংস্কার প্রচলিত আছে যে, আরবী-কোরান শরীফ, এমন কি আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু যে কোনো কেতাব না বুঝিয়া পড়িলেও পুণ্য হয়। শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে উর্দ্দু ভাষায় কথাবার্ত্তা বলাটা বেশ সুশিক্ষার, পরিমার্জ্জিত রুচির এমন কি আভিজাত্যের পরিচায়ক মনে করেন। ভাষা ভাব প্রকাশ করিবার অস্ত্রমাত্র। অবস্থাভেদে বিভিন্ন ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। কোনো ভাষা সম্বন্ধে বিশেষ মাহাত্ম্য বা ঐশ্বরিক অনুগ্রহাদি কিছুই নাই। অতএব অর্থগ্রহণ করিতে না পারিলে কোন ভাষায় লিখিত পুস্তকাদি ধর্ম্ম গ্রন্থই হউক আর যাই হউক, পাঠের কোনও সার্থকতা নাই। বরং এরূপ নিরানন্দ একঘেয়ে খাটুনীতে ছেলেদের বুদ্ধিশক্তির প্রখরতা নষ্ট হয়। আমরা মুসলমান অতি দরিদ্র, শতকরা নিরানব্বই

www.pathagar.com

জনই ছেলেকে আট/নয় বৎসর বয়সের বেশী পড়াশুনায় রাখিতে পারি না। তাদের সাহায্য ব্যতীত জীবিকা উপার্জ্জন অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই এই আট/নয় বৎসর বয়সেই তাদের শিক্ষা সমাপ্ত করিতে হয়। বর্ত্তমানে আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু, বাংলা পড়িয়া ছেলেরা কোনটাই এই অল্প সময়ে কার্য্যোপযোগী মত আয়ত্ত করিতে পারে না। কাজেই তাদের শিক্ষাটা বরং সময় ও শক্তির অপব্যয় মাত্র। ছাত্র জীবনের সঙ্গে তাদের লেখা পড়ার জীবনও শেষ হয়। মাত্র এইটুকু সার্থকতা হয় যে, কেহ কেহ মধ্যে মধ্যে কোরান শরীফখানা একটু একটু পড়ে এবং স্মরণ থাকিলে দুই একটি পার্সী বয়েত বা উর্দ্দু গজল আওড়ায়। মাতৃভাষাই ছেলেমেয়েরা সব চেয়ে সহজে আয়ত্ত করিতে পারে। অতএব আরবী ফার্সী না বুঝিয়া পড়িলেও পুণ্য সঞ্চয় হয় এই কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া এই সকল বিজাতীয় ভাষা ছাড়িয়া দিয়া যদি ছেলে মেয়েদিগকে একমনে বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহারা এই অল্প সময়েই ভাষা কার্য্যোপযোগী মত আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারে এবং স্বাস্থ্য, কৃষি, সর্ব্ববিধ বিষয়ে পুস্তকাদি পড়িয়া এবং কোরান শরীফ ও অন্যান্য ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্রগুলিও বাংলায় পাঠ করিয়া অর্থ গ্রহণ করতঃ কর্ম্ম-ধর্ম্ম-নীতি জ্ঞান লাভ করিতে পারে।

কুসংস্কারের বশীভূত হইয়া অনেকেই গান-বাজনা খেলাকে নিতান্তই ঘৃণার চক্ষে দেখেন। গীত সঙ্গীতের মত আর কিছুতেই এত বিশুদ্ধ আমোদ পাওয়া যায় না ; এবং আমারমনে হয় গীত সঙ্গীত যেন আমাদের আত্মারও উন্নতি হয় ; নীচ ভাব দূর হইয়া যায়। ইহার পরশে যেন আমাদের হৃদয়ের গভীরতম তন্ত্রী বাজিয়া উঠে। খেলায় এরূপ অনেক শিক্ষা হয়, যাহা পাঠশালায় পুস্তকাদি পড়িয়া লাভ করা যায় না। খেলায় আমোদের সহিত ব্যায়াম হয়, সাহস বাড়ে, একতা, সহযোগিতা, পরস্পর সহানুভূতি ও নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষা হয়। অতএব পাঠশালাগুলিতে গীতসঙ্গীত, খেলাদি প্রবর্ত্তন করা অত্যাবশ্যক। মেয়েদের শিক্ষার আরও একটা বড় অন্তরায় পর্দ্দা। একটু বয়স হইলেও মেয়েরা পর্দ্দার খাতিরে পাঠশালায় যাওয়া বন্ধ করে। দরিদ্র মুসলমানগণ ত আর প্রত্যেক বাড়ীতে মাস্টার বা মিস্ট্রেস রাখিয়া পড়াইতে পারে না। তাই মেয়েদের পড়াটা ৭/৮ বৎসর বয়সেই শেষ হয়। পর্দ্দা মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য অতএব ভবিষ্যৎ জাতির শিক্ষা, স্বাস্থ্যেরও সর্ব্বনাশ করিতেছে। শারীরিক মানসিক উৎকর্ষ সাধন এবং সুখ স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানই সভ্যতার সার্থকতা। এই মাপকাঠি দ্বারা বিচার্য্য। অতএব সত্যের তাড়নায় বলিতে হইবেই যে, যদিও অনেকেই মনে করেন যে, তথাকথিত পর্দ্দা যতই কড়াভাবে বজায় রাখা যায় ততই আভিজাত্যের পরিচায়ক, প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা ততোধিক বর্ব্বরতা ও অসভ্যতার নিদর্শন।

শিক্ষার দুইটি অঙ্গ (১) শিক্ষা প্রণালী এবং (২) শিক্ষার বিষয়— দুইটিই যে দিন দিন উন্নত হইতেছে ইহা এই যুগে সর্ব্বাদিসম্মত। ক্রমবিকাশবাদ আমাদের মোহ ভাঙ্গাইয়া দিয়াছে। এখন সকলেই ভাবে কলিযুগ চলিয়া গিয়াছে, সত্যযুগ অতীতে নয়, ভবিষ্যতে আমরা ক্রমেই উহার দিকে অগ্রসর হইতেছি। মানবজাতি সভ্যতায় উত্তরোত্তর ক্রমোন্নতি অস্বীকার করা যায় না। তাও প্রত্যেক যুগের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ঐ যুগের উপযোগী

www.pathagar.com

থাকে। তার পরের যুগে আরও উন্নত বিজ্ঞান, দর্শন ইহাদের স্থান অধিকার করে। এইরূপে জগৎটি চলিয়াছে। যারা এই নিয়মের বিরুদ্ধাচারণ করে তারাই জীবন সংগ্রামে অকৃতকার্য্য হইয়া সভ্যতায় পাছে পড়িয়া থাকে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে শৈশবকালে যে জামা স্বাস্থ্যকর তাহাই যৌবনে বা প্রৌঢ়াবস্থায় ব্যবহরি করিতে গেলে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হয় এবং শরীর বর্দ্ধনে বাধা জন্মায়। উহা রাখিতে হইলে শরীরের বর্দ্ধনানুযায়ী ইহার প্রসারণ দরকার অর্থাৎ জামা বদলাইতে হইবে। সেইরূপ আমাদের জাতীয় জীবনেও সামাজিক আচার-ব্যবহার, শিক্ষাদির ধারা সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বের, তখনকার মনীষিগণ ঐ যুগের জন্য যাহা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা সমাজের এই বর্দ্ধিত অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে। অলৌকিক সলৌকিক যাই হউক, সনাতন বলিয়া গায়ের জোরে বজায় রাখিতে চাহিলে সমাজের স্বাভাবিক বর্দ্ধনে বাধা দিয়া সমাজকে অধঃপাতের দিকে টানিয়া লইয়া যাওয়া হইবে। সনাতন হইলেও অবস্থাভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করিতে হইবেই।

আমাদের মাদ্রাসার শিক্ষাপ্রণালী এবং শিক্ষার বিষয় পাঠ্যপুস্তকাদি দুই ই শত শত বৎসর পূর্ব্বের। তাই এই যুগের উপযোগী নয়, অনেক পাছে পড়ে আছে। পাঠ্যপুস্তকাদি একরূপ environment স্বরূপ এবং ইহাদের অনুযায়ী চরিত্র গঠিত হয়। তাই এই বহুকাল অতীত যুগের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া তাহাদের যে চরিত্র গঠিত হয়, তাহা এই যুগের উপযোগী হয় না। জ্ঞানার্জ্জন বিষয়েও তদ্রূপ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জ্ঞান প্রকৃতিকে বশে আনিয়া আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধিত করবার একটি অস্ত্র। দিন দিন জ্ঞানের উন্নতিতে নূতন নূতন জ্ঞানরূপ অস্ত্র আবিষ্কৃত হইতেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে যেরূপ যাঁহারা সাবেকী অস্ত্রকৌশল ব্যতীত নূতন অস্ত্রকৌশল ব্যবহার করিতে পারেন তাঁহারাই জয়ী হন, সেইরূপ ব্যক্তিগত এবং জাতিগত জীবন সংগ্রামেও যাঁহারা নূতন জ্ঞানরূপ নূতন অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারাই জয়ী হইয়া শারীরিক মানসিক উৎকর্ষ সাধন এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধন করতঃ সভ্যতায় অগ্রগামী হয়। কিন্তু মাদ্রাসায় এই নূতন জ্ঞান দেয় না। অতএব মাদ্রাসা-শিক্ষা শিক্ষার cultural এবং practical দুইদিকেই অসম্পূর্ণ, ক্ষতিজনক, অতএব সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। ওল্ড স্কীম মাদ্রাসার জায়গায় আজকাল নিউ স্কীম নামক মাদ্রাসার একটা নূতন edition বাহির হইয়াছে। Old edition-এর দোষগুণ নূতন edition-এ পূর্ণ মাত্রায়ই বর্ত্তমান আছে। তদ্ব্যতীত ইহাহে ইংরাজী-বাংলা যোগ করায় বরং আগের মত শাস্ত্রজ্ঞানটাও তাহাদের হয় না—তাহারা jack of all trades master of none. যদি ইহা লোককে ফাঁকি দিয়া ইংরাজী পড়ার দিকে ধাবিত করিবার জন্য অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তবে ইহার দোষগুণ স্বতন্ত্রভাবে বিচার্য্য।

তদুপরি মাদ্রাসা-শিক্ষায় ইসলামিক ইতিহাস, দর্শন, শাস্ত্র, সাহিত্যও শিক্ষা হয় না। ছাত্র জীবনে কেবল শারীরিক মানসিক উৎকর্ষ-সাধন এবং অধ্যয়নের রীতিনীতি শিক্ষা হয়। জ্ঞানার্জ্জনের ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে ছাত্র জীবনের পরে বহু বৎসর অধ্যয়ন, গবেষণা করিতে হয়। কিন্তু মাদ্রাসার ছাত্রগণ ত

www.pathagar.com

ঐরূপ কিছুই করেন না। তাঁহারাও আমাদেরই মত চাকুরীর তালাসেই থাকেন। পদ খালি থাকিলে তাঁহারা মাদ্রাসার মৌলবী হন, নতুবা নূতন মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া লন। কেহ কেহ বা পীর সাজিয়া বা ওয়ায়েজ সাজিয়া পুরোহিতের ব্যবসায় গ্রহণ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করেন। নিজেরাও বর্ত্তমান যুগের কিছুই জানেন না। কিন্তু যাহা জানেন, তাহারাও ব্যবসায়ের খাতিরে অপলাপ করিয়া সমাজের কুসংস্কারগুলির সায় দিয়া সেইগুলি আরও দূরীভূত করেন। কারণ কোনরূপ বিপ্লববাদ প্রচার করিলে তাঁহাদের ব্যবসায় মারা যায়। তদুপরি অশিক্ষিত লোক সাধারণতঃই একটু অত্যধিক ধর্ম্মপ্রাণ। তাহাদের এই দুর্ব্বলতা আরও বাড়াইয়া দিয়া তাহাদিগকে সংসারে উদাসীন করিয়া এই দরিদ্রদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ এই ব্যবসায়ী পুরোহিতগণ পীর ও ওয়ায়েজের বেশে লুটিয়া লয়। মাদ্রাসা-শিক্ষা যতই বেশী চলিতে থাকিবে এইরূপে সমাজের বোঝা ততই বাড়িবে। এই সভ্য জগতে কেবল পুরোহিত্যের দল তৈয়ারী করিয়া কি কোনও জাতির উদ্ধার সম্ভবপর? জাতি হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে চাই বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, দার্শনিক।

Islamic studies শিক্ষার জন্যও মাদ্রাসার পরিবর্ত্তে তাঁহারা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়িতে পারেন, এরূপ আট/দশটি মেধাবী ছাত্র যথেষ্ট বৃত্তি লইয়া Islamic studies অধ্যয়নে জীবনটি উৎসর্গ করিতে পারেন, এবং অন্যান্য ধর্ম্মের গ্রন্থাদি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন পাঠ করিয়া ইসলামিক এবং অন্যান্য দেশে ভ্রমণ করিয়া আর্থিক, নৈতিক, সামাজিক অবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিজের ঐহিক ও পারত্রিক জ্ঞান অর্জ্জন করতঃ ইসলামের ধর্ম্মোপদেশ, ইসলামের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শনকে সেই জ্ঞানের আলোতে দেখাইতে পারেন। এইরূপে তাঁহারা ইসলামকে কেবল মুসলমানদের নিকট কেন, সমগ্র জগতের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারেন। এরূপ না করিলে ধর্ম্মটিও বজায় রাখা দিন দিন সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। আজকাল বিজ্ঞান দর্শনের যুগ। ধর্ম্ম প্রচারকগণও বিজ্ঞান দর্শন এড়াইয়া চলিতে পারিবেন না। আধুনিক বিজ্ঞান দর্শনাদির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ধর্ম্মগ্রন্থাদি বুঝাইতে হইবে, নতুবা ধর্ম্মটি অপার্থিব এবং অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। অনেক স্থলে বা হাস্যস্পদও হওয়া বিচিত্র নহে। বাহুবলে ধর্ম্মপ্রচার বা রক্ষা সভ্যজগতে অসম্ভব। ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইলে, ধর্ম্মের বাঁধন দৃঢ়ীভূত করিতে হইলে ইহাকে বিবেকের অনুমোদনাযায়ী সুমার্জ্জিত করিতে হইবে। ধর্ম্ম জিনিষটা আমাদেরই হিতের জন্য। খোদাতালা All perfect, তাঁহার কোন কিছুতে প্রয়োজন নাই, কিন্তু যদি ধর্ম্মকে আমাদের দৈনন্দিন জীবন হইতে সরাইয়া রাখা হয়, তহার সমস্যা সমাধানে অকেজো হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের উদ্দেশ্যও সাধিত হইবে না, ইহার বাঁধানও শিথিল হইয়া পড়িবে।

পূর্ব্বের আলোচনায় ইহা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হইবে যে, মাদ্রাসা-শিক্ষায় Islamic studies অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া অসম্ভব। তাঁহারা বাস করেন অতীত যুগে এবং সর্ব্বদাই আসমানের নামে মনের বাসনায় মশগুল। উল্লিখিত বিবরণের আট/দশ জন লোক দ্বারা ইসলামিক শিক্ষার কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে পারে এবং প্রাথমিক শিক্ষা প্রণালী উল্লিখিত আদর্শে সংশোধিত হইলে, বাংলার মধ্যে এই মুষ্টিমেয় পণ্ডিতগণের অধ্যয়ন ও গবেষণার ফল ঘরে

www.pathagar.com

ঘরে প্রচারিত হইতে পারে। অতএব এই দরিদ্র সমাজ বৎসর বৎসর হাজার হাজার মৌলভী তৈয়ারী করিয়া তাঁহাদের জীবন নাশ করিয়া এবং সমাজের আবর্জ্জনা বাড়াইয়া কি লাভ করিতেছে?

আমার শিক্ষার আদর্শ অনুযায়ী মুসলিম শিক্ষা-প্রণালীর সংশোধন করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষার আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু বিজাতীয় ভাষা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া এবং নূতন পুরাতন সকল মাদ্রাসা বন্ধ করিয়া স্কুল কলেজের শিক্ষা প্রণালী অবলম্বন করা উচিত। হিন্দুগণের ত বিশেষ সংস্কৃত বিদ্যালয় নাই, তাই বলিয়া কি তাঁহাদের সংস্কৃত শিক্ষা হইতেছে না? আমাদের মাদ্রাসা বন্ধ হইলে চলিবে না কেন? স্কুল কলেজের বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালীতেও দোষ আছে বটে, কিন্তু এর চেয়ে ভাল শিক্ষা-প্রণালীর অভাবে, আমাদের ইহাই অবলম্বন করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, আমরা মুসলমান দরিদ্র, স্কুল কলেজের খরচ চলে না, মাদ্রাসা-শিক্ষা অপেক্ষাকৃত সুলভ। অতএব অশিক্ষিত থাকার চেয়ে মাদ্রাস-শিক্ষাও ভাল। কিন্তু আমার মনে হয়, মাদ্রাসার কুশিক্ষার চেয়ে অশিক্ষাই ভাল। কারণ তাতে জাতীয় শক্তির অপব্যয় হয় না। যাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভে অসমর্থ তাহারা প্রাথমিক শিক্ষা উত্তমরূপে পাইলেই যথেষ্ট। সকলের উচ্চ শিক্ষা লাভ না হইলেও বিশেষ আসে যায় না। বেকার সমস্যা ও অর্থ ব্যয় মাদ্রাসা শিক্ষা ও স্কুল শিক্ষা দুই বেলাই আছে। তবে মুসলমান সমাজ মনে করে যে, মাদ্রাসা শিক্ষায় অর্থোপার্জ্জন হইলে দীন দুনিয়া, দুইটিই হাসিল হয়। অর্থোপার্জ্জন না হইলেও অন্ততঃ আখেরাতের পথ পরিষ্কার হইবে কোনও সন্দেহ নাই। যদি আমাদের সমাজের এই সকল কুসংস্কার দূর করা যায় এবং মুসলিম জনমত মাদ্রাসা-শিক্ষার প্রতি যেরূপ সুপ্রসন্ন ইংরাজী শিক্ষার প্রতিও এই সুনজর হয়, তাহা হইলে ইংরাজী শিক্ষাও নিশ্চয়ই অনেকটা সুলভ হইয়া পড়িবে।

আমি শিক্ষার যে আদর্শ অংকন করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং বর্ত্তমান বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের শিক্ষার যে চিত্র আপনাদের সম্মুখে ধরিয়া ঐ আদর্শানুযায়ী ইহার দোষগুণ বিচার করিয়া দোষ দূরীকরণার্থে যে পথ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, সে বিষয়ে আমার সঙ্গে মতভেদ হইলেয, আমার বিশ্বাস, এইটুকু সত্য সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, সুশিক্ষা ব্যতীত সমাজের কোনও রূপ সংস্কার বা উন্নতি সাধন অসম্ভব। অতএব শিক্ষার কিরূপ আদর্শ হওয়া উচিত এবং ঐ আদর্শ কি উপায় অবলম্বনে কার্য্যে পরিণত করা যায় সেই বিষয়ে সমাজের শুভাকাঙ্ক্ষী সকলে পরস্পর আলোচনা সমালোচনা করিয়া কোনও স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া সমবেতভাবে কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ না করিলে এই জটিল সমস্যার সমাধান ত হইবেই না, বরং আমাদের সমাজের অধঃপতন আরও ক্রমবর্দ্ধিত হইবে ও দ্রুত গতিতে চলিবে।

অতএব শিক্ষা সমস্যার সমাধান কল্পে কিরূপে সমবেত চেষ্টা করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে দুই একটি কথা বলিতে চাই। প্রথমে ছোট ভাবে আরম্ভ করাই শ্রেয়ঃ। ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব্ব বঙ্গের প্রত্যেক জেলার সদরে স্থানীয় শিক্ষিত মুসলমানগণকে লইয়া একটি করিয়া মুসলিম সাহিত্য সমিতি গঠন করিলে, তাঁহারাও আবার নিজ নিজ সমিতির অধীনে প্রত্যেক মহকুমায় একটি করিয়া সমিতি গঠন করিয়া লইতে পারেন। পরে সমগ্র বাংলাদেশে এরূপ

www.pathagar.com

Organisation করা যাইতে পারে। ফলে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে ভাবে আদান প্রদানের সুবিধা হইবে এবং এই সকল ছোট বড় কেন্দ্রগুলির মধ্য দিয়া সমগ্র পূর্ব্ব বাংলার কেন বাংলার শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান এবং শিক্ষার উন্নতিকল্পে সমবেত চেষ্টা সম্ভবপর হইবে। কালে এই ছোট বড় মহকুমা ও জেলা সমিতিগুলি শিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্র হইয়া উঠিতে পারে। এরূপ দেশব্যাপী সমবেত চেষ্টা ব্যতীত শিক্ষা সমস্যার সমাধান সম্ভবপর নয়।

'খোদাতায়ালাকে জান্‌তে হলে তাঁর সৃষ্ট-বস্তুর সহিত সম্যক্ পরিচয় করা আবশ্যক। এই পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ধর্ম্ম ও জীবন সামঞ্জস্য লাভ করে।'—আবুল হুসেন

'শাস্ত্র ফেলে ধর শাস্ত্রকার
শাস্ত্রের চেয়ে মানুষ বড়'—আবুল হুসেন

www.pathagar.com

আমাদের নবজাগরণ ও শরিয়ত

আবদুর রশীদ বি.এ., বি.টি.

আমার এ প্রবন্ধের নাম শুনিয়া হয়তো অনেকে চমকিয়া উঠিবেন। কেহ হয়তো মনে করিবেন, আমি বুঝি আমাদের আলেম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতেছি। কেহবা মনে করিবেন, আমি আমাদের বিশ্ব-বিশ্রুত ইমাম সাহেবদের ত্রুটি বা গলদ ধরিবার জন্য গবেষণা করিতেছি। কিন্তু আমি বলিতেছি, এ দুইয়ের কোনটিই আমার উদ্দেশ্য নহে। আলেম সম্প্রদায়ের প্রতি দোষারোপ করা আমি সময়ের ও শক্তির অপব্যবহার বলিয়া মনে করি এবং ইমাম সাহেবদের নিন্দাবাদ করাকে আমি আধুনিক জ্ঞান-গরিমার অনাবশ্যক ঔদ্ধত্য বলিয়া মনে করি। শরিয়ত আমাদের ধর্ম্মবিধান। মানসিক ও শারীরিক শৃঙ্খলা বিধানের জন্য শরিয়তের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, আমার বিশ্বাস, প্রত্যেকটি বিধানের বৈজ্ঞানিক কারণও পাওয়া যাইবে। তবে কথা এই যে, সময় বা যুগের পরিবর্ত্তনের আমাদের যে নূতন নূতন প্রয়োজনীয়তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে শরিয়তের গূঢ়মর্ম্ম অটুট রাখিয়া আমরা তাহা আধুনিক জীবন যাপনের সহায় বা উপযোগী করিয়া লইতে পারি। এইরূপ করিয়া লইবার অর্থ ভাব বা মর্ম্মের পরিবর্ত্তন নহে, কেবল বহিরাবরণের যুক্তিমূলক পরিবর্ত্তন। আমার বিশ্বাস, এই পরিবর্ত্তনে ধর্ম্মের প্রতি মোটেই অশ্রদ্ধা দেখান হইবে না এবং আল্লাহতা'লার নির্দ্দেশকে মোটেই অসম্মান করা হইবে না।

মানব স্বভাবের এক বিশেষত্ব এই যে, ইহা সহজেই কোনো বিশেষ নিয়মের প্রকৃত মর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া বহিরাবরণকে আঁকড়িয়া বসিয়া থাকে। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে তুরস্কে নব জাগরণের সংবাদ পাইয়া দুইজন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী তুরস্কের আভ্যন্তরীণ অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য কনস্টান্টিনোপলে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাদিগকে তুরস্কের নবনির্ম্মিত একখানা জাহাজ দেখান হইল। জাহাজের লোকেরা আগন্তুকগণকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জাহাজের বিভিন্ন অংশ দেখাইতে লাগিলেন। প্রথম শ্রেণীর আরোহিগণের কক্ষ, দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহিগণের কক্ষ, ডাইনিং হল, মিটিং রুম প্রভৃতি কোনটিই বাদ গেল না। প্রথম শ্রেণীর কক্ষে একটি বোতামের দিকে আগন্তুকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া জাহাজের লোকেরা বলিলেন, 'ঐ বোতামটি কি জন্য বুঝিতে পারিলেন কি? শয্যায় শয়ন করিয়া এই বোতামটি টিপিলেই আপনার মুখের নিকট আপনা আপনিই একটি সিগারেট আসিয়া উপস্থিত হইবে।' উক্ত বোতামের নিকট আর একটি বোতাম ছিল, সেইটি কি জন্য আগন্তুকেরা তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, জাহাজের লোকেরা বলিলেন, 'এই শয্যাটি স্প্রিং-এর। ঢেউ এ জাহাজ দুলিলে এই শয্যাটি তত দুলিবে না। তবুও যদি আপনি ইহাতে শুইয়া অশান্তি বোধ করেন, তবে এই বোতাম টিপিলেই এক প্রকার গোলাপী বাষ্পে এই কক্ষ ছাইয়া যাইবে। এই বাষ্পের সুস্বপ্ন যুক্ত তন্দ্রা আনিবারও ক্ষমতা আছে। স্প্রিং-এর শয্যা কিনা, তাই জাহাজের দোলার সহিত শয্যাখানি একটু দুলিলে আপনি হয়তো দেখিবেন যে,

www.pathagar.com

আরব্যোপন্যাসের কাস্‌কাস দৈত্য আপনাকে শয্যাসহ একেবারে পরীরাজ্যে লইয়া যাইতেছে। পরীরাজ্যের রাণী দক্ষিণ হাওয়া ভোগ করিবার জন্য তাঁহার তেতলার কক্ষে দক্ষিণের জানালা খুলিয়া শুইয়া ছিলেন, আপনার পালংকখানি কিছু বৃহৎ বলিয়া হয়তো কক্ষে ঢুকানো গেল না, কিন্তু আপনি দেখিবেন দক্ষিণ হাওয়া পরীরানীর জুল্‌ফী খুলিয়া ফেলিতেছে এবং মেশ্‌ক-বু সমস্ত কক্ষখানি ভরপুর করিয়া ফেলিয়াছে।' এই সকল কথা শুনিয়া আগন্তুকেরা বলিলেন, 'আচ্ছা' বেশ, এসব খুব দেখিলাম, এখন চলুন দেখি ইঞ্জিন ঘরের দিকে।' তখন জাহাজের লোকেরা মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বলিলেন,— 'সেইটিই যে আমাদের অভাব। এ জাহাজের ইঞ্জিন নাই।' তখন আগন্তুকেরা চলিয়া যাইতে যাইতে বলিলেন, 'তবে এতসব না দেখিলেও চলিত। ইঞ্জিন না থাকিলে এ জাহাজে কি কাজ হইবে?' ইত্যাদি—

আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম আমাদের সর্ব্বপ্রকার সাধনারই এই প্রতিচ্ছবি। সেইজন্যই বলিতেছি, এখনও যদি আমরা কেবল বাহিরের দিক লইয়া মারামারি কাটাকাটি করিয়া সময় কাটাই, তবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। যদি শরিয়তের প্রত্যেক নিয়মের গূঢ়মর্ম্মের দিকে ঢুকি তাহা হইলে কখনও বিজ্ঞানে ও শরিয়তে সমন্বয় হইতে বিলম্ব হইবে না। শরিয়ত ও বিজ্ঞান মিলিত হইলে আমাদের উন্নতি কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। জগতে মুসলমান হইয়া বাঁচিয়া থাকার আবশ্যকতা থাকিলে, শরিয়তেরও আবশ্যকতা আছে। আবার আধুনিক জগতে যে জাতি বিজ্ঞানে যত উন্নত তাহার আসন তত সুদৃঢ়। আধুনিকই বা বলি কেন? জগতে চিরকালই বৈজ্ঞানিক জাতির নিকট অবৈজ্ঞানিক জাতির পরাজয় পাইয়াছে। রাজা পুরুর সৈন্যগণ সেকান্দারের সৈন্যগণ অপেক্ষা কম শৌর্য্যশালী ছিল না। সেকান্দারের শৌর্য্যের নিকট পুরুর শৌর্য্য কখনও হার মানে নাই। হার মানিতে হইয়াছিল প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুর বিজ্ঞানকে। আজকাল এই কথা একপ্রকার চক্ষুর সম্মুখেই প্রমাণ হইতেছে যে, বিজ্ঞান অবহেলা করিয়া কোনো জাতি জগতে আপন অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিবে না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই—মুসলমানের পক্ষে শরিয়ত ও বিজ্ঞান এই উভয়ই মানিয়া চলা সম্ভবপর কিনা? আমি বলি সম্ভব।

প্রথমে ধরা যাউক ধনাগমের কথা। অর্থ পরমার্থ না হইতে পারে, কিন্তু জগতে তাহার প্রয়োজন আছে। এই ঢাকা শহরে এমন মসজিদও অনেক আছে, যাহার মেহরাব সংলগ্ন ভূমিটুকুও ভিন্নজাতির নিকট বিক্রি করিয়া ফেলিতে হইয়াছে এবং ভিন্ন জাতি সেই স্থানকে মলমূত্র ত্যাগের স্থানে পরিণত করিয়াছে। দারুণ অর্থহীনতাই কি ইহার জন্য দায়ী নহে? হজরত রসুল করিম দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, 'আল্‌ফকর ফখরী' অর্থাৎ 'দারিদ্র্যই আমার গৌরব।' জাতি হিসাবে মুসলমান যদি এই হাদিস অনুযায়ী দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া লয়, তাহা হইলে অন্য উন্নত জাতি সমূহের সমক্ষে তাহার অস্তিত্ব কেমন করিয়া থাকিবে? বর্ত্তমান কালে পৃথিবীর যে যে স্থানে মুসলমানের অস্তিত্ব লুপ্ত হইতে বসিয়াছে—তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, 'অর্থহীনতা'। এখন জিজ্ঞাস্য এই, যদি বাস্তবিক অর্থহীনতায় জগৎ হইতে মুসলমান জাতির নাম লুপ্ত হয়, এবং শেষ বিচারের দিন হজরত রসুল করিম জিজ্ঞাসা করেন, "জগৎ পৃষ্ঠ হইতে আমার নাম ও আমার ধর্ম্ম লুপ্ত করিয়া আসিয়াছ?" তখন আমরা এই বলিয়া মুক্তি পাইব কি যে, 'হজরতই তো

www.pathagar.com

বলিয়াছিলেন,—আলফক্কর ফখরী। আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই না। চরমপন্থী শরিয়তবাদীরা বলিবেন, 'বাণিজ্য কর, ধন বৃদ্ধি হইবে।'

'বাণিজ্য দ্বারা ধন বৃদ্ধি হয়' একথা সত্য. কিন্তু অন্য দশ জাতির সহিত, প্রতিযোগিতায় আমাদের বাণিজ্য টিকিবে কেমন করিয়া? তাহাদের পেছনে যে ব্যঙ্ক রহিয়াছে। ব্যঙ্ক ব্যাপারে হাত দিলেই যে আমাদের সুদ খাওয়া হইবে।

আমি বলিতে চাই, সুদ যে আমাদের জন্য নিষেধ হইয়াছিল, তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্যই। অন্য দশ প্রকার গঞ্জনার সহিত এ গঞ্জনা সাধারণতঃ মুসলমান জাতির উপর বর্ষণ করা হয় না যে, ইহারা 'শাইলকে'র জাতি। কিন্তু লাভজনক পাপটি মুসলমান করেন না বটে, ক্ষতিজনক পাপটি সকল জাতির চেয়ে বেশী করেন। অর্থাৎ বঙ্গ দেশের সুদ দাতা শতকরা নব্বই জনই মুসলমান।

পবিত্র কোরান শরীফে সুদ নিষেধ বলিয়া বাণী আসিয়াছিল। প্রত্যেক মুসলমানই এই বাণীকে শ্রদ্ধা করিতে বাধ্য। জঘন্য কুসীদজীবী যে কেবল অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া, বা অর্থ অধিকার করিয়াই আনন্দ লাভ করে—তাহার জন্য সুদ একশত বার নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। কিন্তু দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত ব্যাংক না থাকিলে যখন আমাদের বাণিজ্য জগতের অন্য দশ জাতির প্রতিযোগিতায় টিকিবে না, তখন আমাদের মধ্যে ব্যাঙ্ক স্থাপন রূপ পন্থা অবলম্বন না করিয়া উপায় কি? যদি মুসলমান জগতে বাঁচিয়া থাকিতে না পারে, তবে দীন ইসলাম রক্ষা করে কে? তাই বলিতেছি, এই অসাধারণ অবস্থায় ব্যাঙ্ক ও কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এই জাতীয় সুদ নিষিদ্ধ সুদরূপে গণ্য হওয়া উচিত নয়। কেননা মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে ত ধর্ম্ম কর্ম্ম বাঁচিয়া থাকিবে। মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের মঙ্গলের জন্যই আমাদিগকে বিভিন্ন প্রকারের বিধি দান করিয়াছেন, আর আমরা তাহা আমাদের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত না করিয়া কেবল একটা অনাবশ্যক নিয়মের জন্য জিদ করিয়া মনে করিতেছি 'আমরা খুব ধার্ম্মিক।'

এই স্থলে আমি হজরত রসুল করিমের জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। হজরত রসুল মোয়াদ নামক এক ব্যক্তিকে ইয়ামেনের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইবার কালে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কোন নীতি দ্বারা সেই দেশ শাসন করিবেন। মোয়াদ উত্তর করিলেন, 'কোরানের নিয়ম দ্বারা'। তখন হজরত বলিলেন, 'যদি এমন কোনও ঘটনা ঘটিয়া উঠে যার জন্য কোরানে কোন নির্দ্দেশ না পাও'? তখন মোয়াদ বলিলেন, 'আমি হজরত রসুল করিমের প্রতিপালিত নিয়মাবলী হইতে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিব'। তখন হজরত বলিলেন, 'যদি তাহাতেও কোনো নির্দ্দেশ না পাও?' তখন মোয়াদ বলিলেন, 'তখন আমি নিজের বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিব।' তখন হজরত তাঁহার এই মত অত্যন্ত আনন্দের সহিত সমর্থন করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, মুসলমান জাতির সম্মুখে যে কতগুলি অসাধারণ সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, মুসলমান জাতির অধিকাংশ তাহা স্বীকার করিতে চাহিতেছেন না। এই অসাধারণ সমস্যার বেলায় নিজের বিচার ও বিবেক বুদ্ধিরও যে যথেষ্ট স্থান আছে, তাহা তাহারা স্বীকার করিতেছেন না।

তিরমিজি হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবু হোরেরা বলিয়াছেন, হজরত রসুল করিম বলিয়াছেন, 'তোমরা এমন এক যুগে বাস করিতেছ যে, যদি এই সময় বিধি বিধানের এক দশমাংশও ছাড়িয়া দাও, তবে ধ্বংস হইবে। ইহার পর এমন এক যুগ আসিবে যখন কেহ আদিষ্ট বিধি-বিধানের এক দশমাংশ পালন করিলেও সে মুক্তি পাইবে'। যে যুগে হজরত ধর্ম্ম

www.pathagar.com

প্রচার করিয়াছিলেন, সেই যুগে মানুষ একবার একেশ্বরবাদীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াও পরে পৌত্তলিকতার দিকে অলক্ষিতে প্রত্যাবর্ত্তিত হইত। তখনকার দিনের খৃষ্টানেরাও প্রকৃত খৃষ্টান ছিলেন না। এইজন্য হজরত এমন কোনো প্রথার সহিত সহজে আপোষ করিতে চাহিতেন না, যে প্রথা পালন করিয়া মানুষের আবার পৌত্তলিকতার দিকে ফিরিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। জীবের ছবি অংকন এই সকল কারণেই নিষিদ্ধ হইয়াছিল। তিরমিজি বর্ণিত উপরোক্ত হাদিস হইতে একথাও স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হজরত তাঁহার প্রেরিত পুরুষ জনোচিত দিব্যজ্ঞান দ্বারা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সময়ের আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনে নূতন নূতন অবস্থার আবির্ভাব হইবে এবং নূতন নূতন জীবন–সমস্যা লইয়া মুসলমানকেও সংগ্রাম করিতে হইবে। তাই তিনি বলিয়াছিলেন, 'এমন এক যুগ আসিবে যখন কেহ আদিষ্ট বিধি বিধানের মাত্র এক দশমাংশ প্রতিপালন করিলেও সে মুক্তি পাইবে'। সে সামাজিক বিপ্লবের যুগ আজকাল আসে নাই কি?

আমি আবার বলিতেছি আমাদের ধর্ম্মাত্মা ইমাম সাহেবদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা আমি গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করি। তাঁহাদের বিচার বুদ্ধি, জ্ঞান ও সূক্ষ্মদর্শিতা যে অসাধারণ ছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদের মীমাংসাই যে শেষ—একথা বলিলে খোদ পয়গম্বর সাহেবের সর্ব্বযুগের উপযোগী দী'ন ইসলামের এমন কি সর্ব্বদর্শী আল্লাহ্‌তালার সুবিচারকে অপমান করা হইবে।

মোটের উপর, কুসীদজীবীদের ন্যায় সুদের ব্যবসায় করা প্রকৃতই গর্হিত কার্য্য বলিয়া আমি মনে করি, কিন্তু জাতীয় ধনবৃদ্ধি ও ধন সংরক্ষণের নিমিত্ত ব্যাঙ্ক স্থাপন ও কো–অপারেটিভ প্রণালীতে ঋণদান ও ঋণ গ্রহণ করিয়া দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করা আমি ধর্ম্ম–বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি না।

তারপর পর্দ্দা প্রথা সম্বন্ধে বলিতেছি। প্রত্যেক জাতির পতনের ইতিহাস পাঠ করিলে এই একটি লক্ষণ সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইবে যে, তাহারা মূল্যবান নিয়মসমূহের প্রকৃত মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া তাহার বাহ্যিক প্রতিপালন লইয়া ব্যস্ত থাকে। আমাদের পক্ষেও তাহাই হইয়াছে। পর্দ্দা প্রথার অবলম্বন কোনো কোনো অবস্থায় নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু পর্দ্দা অর্থ যদি এই হয় যে, স্ত্রীলোককে জানালাবিহীন ঘরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, এবং বাড়ীর চারি দেওয়ালের মধ্য হইতে বাহির হইয়া বহির্জ্জগতের কোনো অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পর্দ্দার উপকার একটি হইলে, অপকার একশতটি হইয়া থাকে।

কিন্তু স্ত্রীলোককে খোলাখুলিভাবে পুরুষের ন্যায় চলাফেরা করিতে দেওয়ার প্রথা আনয়ন করিতে চেষ্টা করা কিছুতেই সঙ্গত হইবে না। এই প্রথার কুফল ইউরোপ স্বীকার করিতে চাহিতেছে, কিন্তু ভাষা বা স্থান পাইতেছে না। স্ত্রীলোকের মস্তিস্ক সর্ব্বত্র পুরুষের চেয়ে কম শক্তিশালী না হইতে পারে, মাঝে মাঝে কোন কোন স্ত্রীলোক হাইকোর্টের সর্ব্বোচ্চ বিচারপতির আসন যোগ্যতার সহিত অলংকৃত করিতে পারেন। এমন কি কোন কোন অসাধারণ মহিলা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ সাম্রাজ্যও যোগ্যতার সহিত পরিচালন করিতে পারেন। কিন্তু স্ত্রীলোক ও পুরুষ—উভয়েই মানবের সন্তান, সুতরাং সমান' এ যুক্তির বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। স্ত্রীলোক পুরুষের অস্থাবর সম্পত্তিরূপে গণ্য না হইতে পারে, কিন্তু স্ত্রীলোকের কার্য্যক্ষমতা প্রকৃতির বিধান অনুসারেই সীমাবদ্ধ। জীব–জগতে পুরুষের প্রাধান্য অনিবার্য্য। ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি যতদিন জীবন জগতের ধর্ম্ম থাকিবে, এবং

www.pathagar.com

জীব শরীরের কার্য্য থাকিবে, ততদিন সভ্যতা ও শীলতার খাতিরে সভ্য মানব সমাজে স্ত্রীলোককে সাধারণত, পুরুষ চক্ষুর একটু অন্তরালে রাখা আবশ্যক হইবে।
আমি যে প্রকার পর্দ্দা অবলম্বন করা আবশ্যক মনে করি, তাহা কখনও উন্নতির পরিপন্থী নহে। সভা সমিতিতে মহিলাদের জন্য একটু আড়ালে ভিন্ন স্থান থাকিতে পারে। স্কুল কলেজ ও তাহাদের জন্য ভিন্ন হইতে পারে। পার্ক ও বায়ু সেবন স্থানে তাহাদের জন্য একটু ভিন্নস্থান থাকিতে পারে। পরিশেষে সুদৃশ্য বোরকা পরিধান করিয়া তাঁহারা স্থানান্তরে গমন করিয়া তাহাদের গমনাগমন সহজ করিয়া লইতে পারেন এবং স্বাধীন মুক্ত হাওয়ার উপকারিতা গ্রহণ করিতে পারেন। বল-ডানসিং-এ আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু সভা সমিতিতে যোগদান, দেশের সর্ব্বাঙ্গীন হিতকারী আন্দোলনে যোগদান ও প্রত্যেক ব্যাপারে পুরুষের প্রকৃত সহায় স্থল হওয়া তাহাদের একান্ত আবশ্যক। মোটের উপর, পর্দ্দানীতি মান্য করা অর্থ জানালাহীন ঘরে চিরকাল আবদ্ধ থাকা নহে—আপন মান সম্ভ্রম ও সতীত্বের গৌরব সম্বন্ধে সতত জাগরুক থাকিয়া জগতে সকল কার্য্য পুরুষের অংশীদার হওয়া।*
এইরূপ চিত্রাংকন, সঙ্গীত সর্ব্বত্রই যদি আমরা নিয়ম ও নীতির কেবল বাহ্যিক অনুসরণের দিকে দৃষ্টি না দিয়া তাহার প্রকৃত মর্ম্মানুযায়ী কার্য্যকরি, তাহা হইলে ধর্ম্মের প্রতি তো অশ্রদ্ধা দেখান হইবেই না, বরং তাহাই প্রকৃত ধার্ম্মিকতা বলিয়া গণ্য হইবে।
সর্ব্বশেষে ইসলামিক প্রার্থনা পদ্ধতির কথা বলিতেছি। আমাদের প্রার্থনা বা 'নামাজ' আমাদের চিরন্তন প্রথাতেই অর্থাৎ আরবী ভাষাতেই হওয়া আবশ্যক। আমরা জগতে সকল মুসলমান যে ইহারই দ্বারা একই বন্ধনে আবদ্ধ। যতদিন আমাদের 'নামাজ' আরবী ও কোরানের ভাষায় প্রচলিত থাকিবে ততদিন ইসলাম ধর্ম্মের একটা বিশিষ্টতা বিদ্যমান থাকিবে। যদি আরবী ভাষায় নামাজ পড়া উঠিয়া যায়, তবে ইসলামিক সভ্যতা বলিয়া জগতে কোনো কথা থাকিবে না।
এখন একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রার্থনা বা 'নামাজ' স্রষ্টার নিকট একটা আত্মনিবেদন বৈ আর কিছু নহে। যাহার মাতৃভাষা আরবী তাহার প্রাণের আবেদন নিবেদন সে আরবীতেই করিতে পারে এবং নামাজের নির্দ্দিষ্ট সূরা উচ্চারণ করিলেও সে তাহা সম্যক অর্থবোধের সহিত সমাধান করিতে পারে। এই অবস্থায় প্রার্থনার যাহা প্রকৃত অর্থ তাহা তাহার দ্বারা সম্যক সাধিত হইবে। কিন্তু বাঙ্গালী আরবী না জানিলেও আরবীতে প্রার্থনা করিলে তাহা 'অবৈজ্ঞানিক হয় না কি?' এই প্রশ্নের উত্তর আমি এইভাবে দিতে চাই। তুমি বাঙ্গালী, তুমি তোমার প্রাণের আবেগ বাঙ্গালাতেই তোমার প্রভুর নিকট নিবেদন কর। কিন্তু ধর্ম্মে আদিষ্ট অংশ আরবীতেই শরিয়তের নিয়মানুযায়ী সাধন কর। বরং সেই জন্য কতক আরবী শিখিয়া লও। তাহাও যদি না পার তবে অন্ততঃ এই শরিয়তানুযায়ী আরবী প্রার্থনার সময় যদি একথাও তোমার খেয়াল থাকে যে এই সকল বাণী জগতের স্রষ্টা কোন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মারফৎ তোমাদের মঙ্গলের জন্য জগতের প্রেরণ করিয়া ছিলেন তাহা হইলেও তোমার প্রার্থনা সফল হইবে। জগতে পবিত্র কোরান শরীফের উচ্চভাব নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রই

* লেখকের পর্দার নূতন ব্যাখ্যায় আমাদের কিছু আপত্তি আছে। তিনি নারীর সতীত্ব রক্ষার জন্যই ব্যস্ত, কিন্তু পুরুষের সীতত্বও যে পক্ষান্তরে আবশ্যক, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। পুরুষের জন্যই নারীর উপর যত নির্য্যাতন। মোট কথা নারীর স্বাধীনতার সীমা তার জ্ঞান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। সেই জ্ঞানই সর্ব্বাগ্রে চাই। তখন পর্দা আপন সীমা ঠিক করবে—সম্পাদক।

www.pathagar.com

মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তুমি মুসলমান, কোরান শরীফের ন্যায় মহান, পুস্তককে বুঝিতে ও চিনিতে চেষ্টা করা তোমার কর্ত্তব্য। আমার শেষ বক্তব্য—এই 'জগতের সকল মুসলমান একই বন্ধনে আবদ্ধ'। এই কথার অর্থ স্বদেশ জন্মভূমির মমতা ত্যাগ করা নহে। জগতে যাহারা স্বদেশকে ভালোবাসে না তাহারা 'জিপসী' জাতির দলভুক্ত হইবার উপযুক্ত। আপন প্রতিবেশীর প্রতি সহৃদয় থাকা পবিত্র কোরানের আদেশ। যে ভূমিতে আমি ও আমার প্রতিবেশী বাস করি তাহার প্রতি তাহার মঙ্গলের প্রতি উদাসীন থাকা আর ধর্ম্মদ্রোহিতা প্রায় সমান।'

একদিন আমার কোন বন্ধু বলছিলেন, 'মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা দেখে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করি।' তার উত্তরে আমি বলেছিলুম, 'ঠিক ঐ জন্যই আমি মুসলমান বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ করি না'। মুসলমানের ইতিহাসে আমি গর্ব্ব অনুভব করি না। আমি তার বর্ত্তমানের দুর্গতির জন্য গৌরব অনুভব করি। তার কারণ, এই দুঃস্থ সমাজে জন্মগ্রহণ করে মানুষকে নানা প্রকারে সেবা করবার প্রচুর সুযোগ লাভ করতে পারব। জগতের মহাপুরুষগণ চিরদিনই দুঃস্থ অধঃপতিত জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাদের জীবন-স্মৃতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক।—আবুল হুসেন

www.pathagar.com

নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ

আবদুস সালাম খাঁ

মুসলমান সমাজের দুরবস্থার কথা আজকাল অনেকেই আলোচনা করিতে শুনি। আলোচনা একেবারে শুধু আলোচনায় রহিয়া গেলেও যে তার ভিতরে কিছু মঙ্গল হয়, এই ধারণায় আমিও সমাজ সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা বলিতে চাই। সমাজ যখন আমাদের লইয়াই তখন উহার উন্নতি করিতে হইলে আমাদেরই করিতে হইবে। বাহির হইতে মেহেরবাণী করিয়া হাত ধরিয়া কেহ উঠাইতে আসিবে না, উপরন্তু পারিলে দাবাইয়া রাখারই চেষ্টা করিবে। গোটা সমাজের সর্ব্বনাশ লক্ষিত হইলে, উহার অন্তর্গত নেহায়েত ছোট খাটো লোকেরও কিছু বলিবার অধিকার আছে, এই বিশ্বাসই আমাকে আজ এখানে দাঁড়াইতে সাহস দিয়াছে।

মুসলমান কথাটা ভাবিতে গেলে, দিনের সঙ্গে আলোর মত তার ধর্ম্মটি প্রথমে মনে পড়ে। বাস্তবিক আমার মনে হয়, ধর্ম্ম যদি মানবের সমস্ত কার্য্যে সমস্ত বিষয়ে সাহায্য করিতে না পারে, তবে তার কোনো সার্থকতাই নাই। ধর্ম্মের প্রভাবে যদি সমাজ উত্তরোত্তর পঙ্গু হইয়া পড়ে, তবে ধর্ম্মের আসল লক্ষ্যেরই কোনো অর্থ থাকে না। দৈনন্দিন জীবন হইতে আরম্ভ করিয়া মানব জীবনের যতগুলি ধারা আছে সবগুলির ভিতর দিয়া মানুষকে মানুষ ভাবে বাঁচিয়া থাকায় সহায়তা করিতে পারিলেই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। ধর্ম্মের যদি এমন কোনো অনুশাসন থাকে, যাহাতে সমাজের বৃহৎ মঙ্গল সাধনের পথে বাধা পড়ে, তাহা হইলে আমার ত মনে হয়, এমন অনুশাসন না মানিলেও খোদার কাছে গুণাহ্‌গার হইতে হইবে না। সমাজের যদি এমন অবস্থা হয় যে, পূর্ব্বের ধরা-বাঁধা গতির বাহিরেও কিছু করা আবশ্যক, তাহা হইলে পূর্ব্বে ছিল না বলিয়া হা-হুতাশ করিলে ফল মন্দ ছাড়া ভাল হইতে পারে না। টেনিসনের সেই Old order changeth yielding place to new. God fulfills Himself in many ways—কথাটা পুরান হইয়া গেলেও তার ভিতরকার মস্ত বড় সত্যটা আজকাল মুসলমান সমাজের চোখ খুলিবার পক্ষে নেহায়েত জরুরি হইয়া পড়িয়াছে। কোন্ হারুন-অর রশিদের আমলে যাহা বর্ত্তমান ছিল, সেই গুলির ভিতরে থাকাই ওয়াজেব, আর যাহা ছিল না, বা গণ্ডির বহির্ভূত তাহার অবতারণা করাই বেদাত—এই উৎকট ধারণা যে সমাজের অন্তরে স্থান পাইবে, দুনিয়ার বুকে অবস্থাটা উহার আমাদের মত হওয়াই সম্ভব। পৃথিবীর যাবতীয় জাতির ভিতরে একটা প্রকাণ্ড রকমের দৌড়ের পাল্লা লাগিয়াছে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, কেবল দৌড়। যে যত আগে যাইয়া সুবিধা ও লাভের ভাগী হইতে পারে, এই পণ। March on! 'আগে চল, আগে চল', চতুর্দ্দিকে ঐ এক বাণী, ঐ একইও রব ! এই জীবন মরণ দৌড়ের পাল্লায়, যে জাতি বা সমাজ একটু গাফলাতি করিবে, হোঁচট খাইবে, বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে ভয় পাইবে, বা পুরানের সসম্মান দৃষ্টির মায়া কাটাইয়া বর্ত্তমানে সঙ্গে তাল

www.pathagar.com

রাখিয়া চলিতে না পারিবে, অস্তিত্ব উহার নিজের কাছেও মালুম হইবে না। এই তাল রাখিতে গিয়া হয়ত ধর্ম্মের সঙ্গে একটু একটু তাল ঠোকাঠুকি হইতে পারে। কিন্তু উপায় নাই, বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ত মহাদৌড়ে যোগ দিতেই হইবে। আর যদি বাঁচিয়াই না থাকা যায়, তবে ধর্ম্মের সম্মান রক্ষা করিবে কাহারা? সমস্ত ধর্ম্মটা জগতের ইতিহাস হইতে মুছিয়া যাওয়ার চাইতে বোধ হয় কিছু কিছু ওলট পালট করা শ্রেয়।

এ সব কথা আগে বলিলে হয়ত শির কতল হইত, গর্দ্দান যাইত, বা কুত্তা দিয়া খাওয়ানো হইত। কিন্তু মুসলমান-দুনিয়ার চক্ষু বোধ হয় অর্দ্ধ উম্মীলিত হইয়াছে। তাই সে ভয় এখন আর নাই। এই পরিবর্ত্তনে তুর্কীকে আর যেই না দিক, আমি বাহাদুরী ও ধন্যবাদ দিতে খুব রাজী আছি। এত অল্পদিনে এমন সহজভাবে, বিশ্ব মুসলিমের আপত্তি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তুর্কী যে ভাবে আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়াছে, তাহাতে আতংকও হয়, গৌরবও বোধ হয়। এই সেদিনের বহু বিবাহের গলায় ফাঁসির আইনটাতে বাস্তবিক আমি বড় খুশিও হইয়াছি, বিস্মিতও হইয়াছি। মনে হইয়াছে, এইত চাই। ইউরোপের অন্যান্য শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতে হইলে আভ্যন্তরীণ অবস্থা খুব শক্ত করিয়া লইতে হইবে। Dynamic পৃথিবীতে static সমাজ যে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, এ সত্য আবিষ্কার করিতে গবেষণার দরকার পড়ে না। অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে নজর চতুর্দ্দিকেই দেওয়া দরকার। শরিয়ত খেলাফৎ উঠাইয়া দিয়াছে বলিয়া তুর্কীকে জাহান্নামে পাঠাইতে পারি, কিন্তু বড় জাহান্নাম হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এরকম ছোটখাটো জাহান্নামে দুই একবার কিছু সময়ের জন্য যাওয়ায় আর যাহারই আপত্তি থাকুক, আমার নাই। ধর্ম্মের সঙ্গে চলৎ-শক্তি সম্পন্ন সমাজের বিরোধ বরাবরই হইয়াছে, হইবেও, কিন্তু এ বিরোধের দিকে লক্ষ্য করিলে একূল ওকূল দুই কূলই যাওয়ার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে।

ধর্ম্ম ও শরিয়ত সম্বন্ধে এতগুলি কথার অবতারণা আমার করিতে হইত না—হয়ত বা ইহাকে কেহ কেহ অবান্তর বলিয়াও দোষ দিতে পারেন, কিন্তু যে নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে আজ আমি আপনাদের সম্মুখে বলিতে সাহস পাইয়াছি, তাহার বিরুদ্ধে শরিয়তের পক্ষ হইতে বহু আপত্তি উত্থাপন করা যাইতে পারে বলিয়াই উপরোক্ত কথাগুলি বলিতে বাধ্য হইলাম। সমাজের মঙ্গলই শরিয়তের চরম উদ্দেশ্য ; ... তাই আমি দেখাইতে চাই যে, নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে শরিয়তের নিষেধ থাকিলেও উহার ভিতরই আমরা শরিয়তের আসল লক্ষ্য সাধিত হইতেছে দেখিতে পাইব।

প্রথমেই চোখে পড়ে অভিনয়ের বিরাট appealing শক্তি। সমাজের সাধারণ লোক খুব বিখ্যাত বাগ্মীর বক্তৃতায়ও যত না উপস্থিত হয় তাহার তিনগুণ হয় যে কোনো বাজে অভিনয়ে। একদিনের 'ওথেলোর' অভিনয় দুনিয়ায় হাজার হাজার ছোট খাটো ইয়াগোর যে অভিজ্ঞতা দিতে পারিবে, তাহা দেওয়া, বহু বক্তৃতা ও অসংখ্য কেতাবের পক্ষেও তত সহজ হইবে না, একথা জোর করিয়া বলা চলে। এই appeal করার শক্তি একটা বিরাট জিনিষ। সমাজের উন্নতি ও সংস্কারের পক্ষে এরকম একটা mechanism বড়ই উপযোগী। ইহার সাহায্যে সাধারণের মন বেশ গোপনে ও সুনিশ্চিতভাবে গড়িয়া তোলা সম্ভবপর হয়। বক্তৃতা খুব abstract বলিয়া আজকাল Lantern lecture-এর প্রচলন হইয়াছে। এর উদ্দেশ্য অবশ্য এই যে, সাধারণ লোকে চোখের সামনে কিছু বাস্তব না দেখিলে, তাহাদের মনের উপর একটা স্থায়ী ছাপ পড়ে না।

www.pathagar.com

তাই Lantern lecture–এর সাহায্য নেওয়া দরকার হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু একথা বোধহয় কিছুই বাড়াইয়া বলা হইবে না যে, অভিনয়ের মধ্য দিয়া আমরা Lantern lecture–এ সমস্ত উপকারগুলি ছাড়াও আরও অনেক কিছু পাই। বক্তৃতা ও অভিনয়ে, পার্থক্য ঐখানে যে বক্তৃতা কেবল শিক্ষাপ্রদ আর অভিনয় শিক্ষাপ্রদ ত বটেই, interestingও যথেষ্ট পরিমাণে। বক্তৃতা শুনিতে যাইয়া ঘুম আসে, অভিনয় দেখিতে গেলে দৃশ্যের পর দৃশ্যে উৎকণ্ঠা, ভয়, আশা, জাগ্রত হইয়া উঠে। অভিনয়ে যে কেবল ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পতনই দেখিবে তাহা নহে, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারের ফল, একতা, শিক্ষা ও ব্যবসায় উন্নতির মনোহর চিত্র, মানব জীবনের গূঢ় রহস্য, সৃষ্টির বৈচিত্র্য ইত্যাদি দেখিয়া সাধারণের ধারণার যে গতি হইবে, তাহাতে উহা সমাজের পক্ষে কোন অবস্থায় না জায়েজ ত নয়ই, বরং অত্যন্ত জায়েজ বলিলেও বোধ হয় অপরাধ হয় না। বরিশালের মুকুন্দ দাসের যাত্রা বাংলার বোধ হয় এমন কোন পল্লী নাই যেখানে না হইয়াছে। হিন্দু সমাজ ও সংসারের যে উপকার ঐ সামান্য যাত্রায় হইয়াছে তাহা বোধহয় হিন্দু সমাজের বড় বড় মনীষিদের পক্ষেও এত অল্প সময়ে করা সম্ভব হইত না। বরপণ প্রথা, কুশিক্ষা, কুসংস্কারের মূলোচ্ছেদন করিতে মুকুন্দ দাসের আপ্রাণ চেষ্টাকে বাংলার চিন্তাশীল মাত্ররেই মারহাবা দেওয়া উচিত।

মুসলমান সমাজেও এই রকম বহু মুকুন্দের আজ বিশেষ দরকার পড়িয়াছে। অভিনয়ের ভিতর দিয়া সমাজকে তার দুর্ব্বলতা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলে যে প্রভূত উপকার হইবে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। সমাজ সেবার পক্ষে অভিনয় বাস্তবিকই জরুরী। প্রথমতঃ শিক্ষার বহুল প্রচলন মুসলমানের আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা। ঐ একটা কথার উপরে আমাদের উন্নতি, অবনতি নির্ভর করে। শিক্ষার অভাবে বর্ত্তমান মুসলিম–ভারত কি ভাবে জগতের কাছে হেয়, নিপীড়িত, দলিত হইয়া দিন দিন অবনতির নিম্ন স্তরে চলিয়া যাইতেছে সে কথা দৃষ্টি থাকিলেই বোঝা যায়। সমাজের কেবল দুই চারজন লোক শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত হইলে, সম্মান ও আদর সে সমাজের থাকে না। শিক্ষায় আমরা সকল সম্প্রদায়ের অনেক পশ্চাতে। শিক্ষার অভাবে প্রথমতঃ সমাজে ও দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক ব্যক্তির কি হীন অবস্থা হয়, অপরপক্ষে শিক্ষার সম্মান, যশঃ সুখ ইত্যাদি অংকন করিয়া যদি অভিনয়ের ভিতর দিয়া লোক চক্ষুর সম্মুখে ধরা হয়, তাহা হইলে ফল তাহার নিশ্চয়ই সমাজের পক্ষে শুভ হয়।

গ্রামের মাতব্বরের অত্যাচার, জমিদারের গোমস্তার অন্যায় উৎপীড়ন, ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা, উকিল, মোক্তার মুহুরীর বে–আইনী আবদার অনাচারের ভয়াবহ ছবি যদি অশিক্ষিত চিন্তাহীন লোকের চোখের সম্মুখে দৃশ্যের পর দৃশ্য ঘটিত হয়, তাহা হইলেই একবারও তাহারা চোখ বুঝিয়া চিন্তা করিবার অবসর করিয়া লয় ও বোঝে। যদি শিক্ষা আজ তাহাদের থাকিত তাহা হইলে এইসব অত্যাচার করিবার ব্যাধ তাহার না হইলেও শিকার তাহারা হইত না। জমিদারের অত্যাচার ও মুসলমান প্রজার সর্ব্বস্বান্তের একটি করুণ কাহিনী আপনাদের কাছে বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। মুসলমান সমাজে লাঠিয়ালের অভাব এখনও পড়ে নাই। আর হাতে লাঠির সঙ্গে মাথা গরম হওয়ার যে একটা চিরাচরিত সম্বন্ধ আছে তাহা হইতেও তাহারা বঞ্চিত হয় নাই। সকল জমিদারের অন্ততঃই দুইচার ঘর এরূপ লাঠিয়াল আছে। একবার আমাদের ওদিকে দুই জমিদারের একটা জমি

www.pathagar.com

নিয়া বিবাদ বাধিল। নায়েব মহাশয় হাঁক ছাড়িলেন, অসিমদ্দি ! সে বলিল, হুজুর ! নায়েব বলিলেন, দেখ হে জমিদার থাকেন দূর কলিকাতা, তবে তাঁর আশা ভরসা, মান ইজ্জত সব তোমাদের হাতে।. জমিদার পিছনে আছেন, একবার এ জমিটার দখল দিয়ে দাও।' অসিম বলিল, 'বলেন কি হুজুর, আপনি যদি হুকুম দেন, তা হলে জান থাকতে আমরা কয় বাপ বেটায় ও রকম একখান কেন কত জমি দখল করতে পারি? নায়েব আশ্বস্ত হইল, জমিও দখল হইল—কিন্তু অপরপক্ষে খুন হইল দুইটা। দুপুর রাত্রে পুলিশ তাড়ায় অসিমদ্দি নায়েবের বাড়ীতে হাজির। নায়েব মহাশয় তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বলিলেন, 'ধন্য তোরা কয় বাপ বেটা, তসিম। আগেকার দিনের বীরত্বটা তোরা এখনো বাঁচিয়ে রেখেছিস। আর মামলাতে বোধ হয় হাজার চারেক টাকা লাগবে আর তার কমে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত কি করেই বা হয়? দুই হাজার টাকা জমিদার পক্ষ থেকে আমি আদায় করে দেব, জমিদার কি তা না দিয়ে পারবে? তাঁর ইজ্জত রক্ষা হয়েছে ; সে কি কম কথা। আর বাকি দুই হাজার তা তোদের চালিয়ে দিতে হবে।' অসিমদ্দির জান ত ছিলই না, চোখও কপালে গেল। বলেন কি নায়েব মহাশয়, আপনি গরীবের মা বাপ, আমাদের অবস্থা ত জানেনই। অত টাকা দেওয়া ত দূরের কথা, এক সঙ্গে দেখিও ত নাই কোনদিন।' তবে উপায়? গরীবের মা বাপ উপায় বাতলাইয়া দিলেন—বাড়ী বন্ধক–আপনার জন নায়েব মহাশয়ের কাছে। সপুত্র অসিমদ্দি শ্রীঘর হইতে না ফিরিল ভালই, আর যদি নেহায়েত ফিরিলই সর্ব্বস্বান্ত অসিমদ্দি খরচের হিসাবের লম্বা ফর্দ্দের এক বর্ণ বুঝিতে পারিল না। টাকা শোধও দিতে পারিল না। অগত্যা নায়েব মহাশয়কে সালাম ঠুকিয়া নিরুদ্দেশ বা চুরি করিতে বাহির হইল. । এই শোচনীয় পরিণাম—একবার যদি অশিক্ষিত মুসলমান সমাজ এই অহরহ–ঘটা করুণ কাহিনীর চিত্র দেখে, মুহূর্ত্তের জন্যও কি ভাবিবে না, কি করিয়া এই দুরবস্থা হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়? সমাজের এই দিকটায় নাট্যাভিনয়ের কোন সার্থকতাই কি নাই?

আমার মনে হয়, স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা অভিনয়ের ভিতর দিয়া বেশ হৃদয়গ্রাহী ও সুন্দর করিয়া ফুটাইয়া তোলা যায়। দেশ ও সমাজের উপযুক্ত মানুষ হইতে হইলে উপযুক্ত মা'র পুত্র হইতে হয়। একথা মানিতে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে না। স্ত্রী শিক্ষার উপরে সমাজের ভবিষ্যতের অনেক ভাল–মন্দ নির্ভর করে। তাই আমার মনে হয়, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মা'র পার্থক্য দেখাইয়া, শিক্ষিত মা কি করিয়া পুত্রকে ভবিষ্যতের জন্য গড়িয়া তুলিতে পারেন বা পারা উচিত, ও অশিক্ষিত মাতা পুত্র–স্নেহে অন্ধ হইয়া কি করিয়া স্ব–হস্তে পুত্রের সর্ব্বনাশের রাস্তা প্রস্তুত করেন—উহার খবর জানিলেও বার আনি মায়ের সাবধান হইবার ইচ্ছা একটু প্রবল হইবে না কি?

মুসলমান সমাজের বহু বিবাহ প্রথা সমাজ গাত্রের যে প্রতিদিন কত রক্ত শোষণ করিতেছে তাহার হিসাব দেখিতে গেলে, বাস্তবিকই দুঃখও লাগে, অনুশোচনাও আসে। বহু বিবাহের পরিণতি কোনখানে? একবার যদি কল্পনা করা যায়—ঐ হতভাগ্য তার চতুর্দ্দিকে ডজন খানেক ছেলেমেয়ে কন্যারা সব বয়স্কা হইয়াছে, বিবাহ দিবার সামর্থ্য নাই। পুত্রেরা শিক্ষার অভাবে জুয়াচোর, গুণ্ডা হইয়া গেছে—স্ত্রীদের ভিতর বনিবনাওর অভাবে বাড়ী ঝগড়ার কুরুক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে, মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সুখ কাহাকে বলে না জানিয়া বাড়ী–ঘর মহাজনের হাতে ও অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের খোদার হাতে সোপর্দ্দ করিয়া যদি চক্ষু

www.pathagar.com

বুঁজেন, তাহা হইলে সমাজের গতি উন্নতি কি অবনতির দিকে যাইবে, সে কথা আপনারাই ভাবিয়া দেখুন।

মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর যাঁহারা একটু আভিজাত্যের গৌরব করেন, বা যাঁহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল, তাঁহারা পুরানো বাঁদী-প্রথা বৃটিশ শাসনেও ঠিক সেই রকম শান-শাওকাতের সঙ্গেই বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে বাহাদুরি, সম্মান ও গৌরব কতদূর বর্দ্ধিত হয় তাহারাই জানেন। কিন্তু এই বাঁদী সম্প্রদায় যে তাঁহাদের মালিক সম্প্রদায়ের কি ভীষণ সর্ব্বনাশ করিতেছে সে কথা চিন্তা করিবার অবসর ঐ আভিজাত্যাভিমানী মুসলমান সমাজের এখনও হয় নাই। ধনী মুসলমান যুবকের অসচ্চরিত্রতার বীজ প্রথম রোপিত হয় বাড়ীতে। যৌবনের প্রথম উন্মেষে যখন রঙ্গিন চোখে জগতের দিকে তার জন্তু-ধর্ম্ম নিয়ে চায় তখন সহায়হীন বাঁদীবর্গ কেউ বা মনিবের হুকুম তামিল না করিলে তার শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া, আর কেউ বা অন্যান্য বাঁদীদের ও গোলামের দিকে গর্ব্বভরা সৌভাগ্যের হাসি হাসিয়া মনিবের ইহকাল ও পরকাল দুই কালেরই জাহান্নাম সৃষ্টির সাহায্য করে। এই ত ইতিহাস। মুসলমান জমিদার পুত্রের বিদ্যা বুদ্ধি বড় একটা হয় বলিয়া ত জানি না। সমাজের এই বিরাট সর্ব্বনাশা ক্ষতি ঐ সামান্য বাঁদীদের দ্বারাই বেশীর ভাগ হয়, একথা আমি জোর করিয়া বলিতে চাই।

এই ত গেল বড় লোকের ইতিহাস। এখন গীরব, অশিক্ষিত, অনুন্নত কৃষক সম্প্রদায়ের কেচ্ছা বর্ণনা করিতে গেলেও বিশেষ আরাম লাগে না। বউ চুরি, বউ ছিনানো, একই ক'নের দুই তিন জনের সঙ্গে বিবাহ, তালাকের মামলা ইত্যাদিতে বৃটিশ রাজের বিচারালয় মুসলমান দ্বারাই ভর্ত্তি হয়। ইহাতে যে কোন অর্ধশিক্ষিত সমাজের ও অন্যান্য সমাজ ও জগতের কাছে লজ্জায় মাথা হেঁট হইয়া আসে। কত খুনচোষা অর্থ এই সব মামলাতে ব্যয় হইয়া গৃহস্থ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে। আমার মনে হয় অভিনয়ের সাহায্যে সমাজের এই দৈনন্দিন অনাচারের কুফল দেখাইলে হতভাগ্য সমাজের কিছু উপকার হইতে পারে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমাজ নূতন করিয়া গড়িয়া তোলার পক্ষে, অভিনয়ের সাহায্য একেবারে উপেক্ষার বস্তু নহে। গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল বসু বা দ্বিজেন্দ্রলাল—নাটকের ভিতর দিয়া অমর ত হইয়াছেনই, উপরন্তু হিন্দু সমাজের ক্রমোন্নতি ও চিন্তাধারার পরিবর্ত্তন হইয়াছে অনেকটা ঐ মহাপুরুষদের জন্য। সামাজিক নাটক লেখার পক্ষে মুসলমান সমাজে খোরাকের বিশেষ অভাব পড়িতে পারে না। পূর্ব্বে সমাজের যে সব দোষ দেখান হইয়াছে, উহা অবলম্বন করিয়া যদি নাটক লেখা হয়, ও তাহা সমস্ত স্থানে অভিনীত হয় তাহা হইলে সমাজের চেহারা অনেকটা বদলাইয়া যাইবে। মুসলমান সমাজে লেখক—যেমন দরেরই হউক—অভাব নাই। তাঁহারা যদি মেহেরবানী করিয়া উপন্যাস ও কবিতা লেখার ব্যর্থ প্রয়াস ছাড়িয়া দিয়া এদিকে মনোযোগ দেন, তাহা হইলে সমাজের সেবা তাঁহারা করিতে পারিবেন। ইসলামের কড়া অনুশাসন সত্ত্বেও কবি ও জারির দল মুসলমান সম্প্রদায়ে এখনও বর্ত্তমান আছে। অল্প কিছু উচ্চাঙ্গের নাটক যদি এদের দিয়া গ্রামে গ্রামে অভিনীত হয়, তাহা হইলে ঐ তুচ্ছ কবি ও জারির দলও সমাজের প্রভূত উপকারে আসিবে। ধর্ম্মের অনুশাসন অভিনয়ের বিরুদ্ধে থাকিতে পারে, কিন্তু সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য অভিনয় করা দরকার। ইংলণ্ডে ধর্ম্ম প্রচারের জন্য এক কালে Miracle ও

www.pathagar.com

Mystery play হইত। এখনও সমাজের ও দেশের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া Bernard Shaw, Galsworthy প্রভৃতি শক্তিশালী নাট্যকারগণ তাঁদের শক্তি নাটক প্রণয়নে প্রয়োগ করিয়া দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই সব সামাজিক নাটকে অনেক সময় গবর্ণমেন্টকেও আইন বদলাইতে হইয়াছে, নতূন আইন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছে, দেশের লোকের চোখও খুলিয়াছে। সাধারণ লোককে আর কিছুই নয় কেবল চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেই হয়, তাহারা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে, ও দরকারোপযোগী কাজ করে।

আজ এখানে অনেক সাহিত্যিক সমবেত হইয়াছেন। তাহারা যদি মনে করেন যে, সত্যই অভিনয়ের বিশেষ প্রয়োজন মুসলমান সমাজের জন্য আজ হইয়াছে, তাহা হইলে সমাজের এই দিকটায় নজর দিয়া নাটক লিখিলে, আমরা তাঁহাদের কাছ হইতে যাহা প্রত্যাশা করি তাহাই পাইয়া কৃতার্থ হইব।

www.pathagar.com

বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা

আবুল হুসেন এম.এ., বি.এল.

বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনের দিকে যখন দৃষ্টিপাত করি তখন দেখি যে জীবন নিতান্ত হীন, নিতান্ত দরিদ্র্য, নিতান্ত সংকীর্ণ। অর্থ বলুন, রুচি বলুন, আনন্দ বলুন, কিছুই সে জীবনে নাই। মানুষের জীবনধারণের জন্য যতটুকু না হলে চলে না, সেইটুকু মাত্রই তার সম্বল। চতুর্দ্দিক হতে তার সমস্ত সম্পদ সরে যাচ্ছে। সমাজের গৌরব যা দিয়ে বাড়াতে হয় তার কিছুই তার নাই বললে অত্যুক্তি হবে না। আজ বাঙ্গালী মুসলমান দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট, কোনটিতেই নাই। সম্পদ ও কল্যাণ যে পথে আসে সে পথ তার পক্ষে রুদ্ধ হয়ে আছে। কেবল ভিক্ষুক, কারা নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, পরপদদলিত, পরাশ্রয় ভিখারীর দল বেড়ে চলেছে। আজ প্রায় দেড়শত বৎসর হতে চলল বৃটিশ পতাকা এদেশে উড়ছে। সেই পতাকার তলে দাঁড়িয়ে হিন্দু আজ বিশ্বজ্ঞানের অধিকারী হয়ে বিশ্বসম্পদ আহরণ করতে শুরু করেছে। দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট প্রভৃতি সমস্ত বিভাগে হিন্দু আজ প্রতিপত্তি অর্জ্জন করে স্বদেশ স্বজাতি ও স্বধর্ম্মের গৌরব বর্দ্ধন করেছে। আর আমরা মুসলমান সমস্ত সম্পদের পথ রুদ্ধ করে অবনতির চরম সীমায় দ্রুত অগ্রসর হয়েছি। এই পার্থক্যের কারণ কি? কেন মুসলমানের এ দুর্গতি?

এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দিতে গেলে বলতে হবে, আমাদের শিক্ষা নাই—আমরা জ্ঞানের সঙ্গে বহুদিন হতে বিরোধ করে বসেছি এবং দর্শন, বিজ্ঞান ও আর্টকে আমাদের শিক্ষাকেন্দ্র হতে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছি—এই ভয়ে, পাছে তাতে আমাদের ধর্ম্ম নষ্ট হয়। ধর্ম্ম আমাদের এতই নাজুক! বৃটিশের সঙ্গে ইউরোপের জ্ঞানদীপ্ত মন যখন এদেশে আসল এবং আমাদের আড়ষ্ট মনকে আঘাত করল তখন হিন্দু সে আঘাতে জেগে উঠে সে মনকে আলিঙ্গন দ্বারা বরণ করে নিল, আর আমরা সে আঘাতে জাগতে ত চাই-ই নাই, বরং চোখ রাঙিয়ে সে মনকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। ইউরোপের জ্ঞানকে আমরা প্রত্যাখ্যান করেছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজ পর্য্যন্ত আমরা আমাদের সে নিদারুণ ভুলের কোন সংশোধনেরই চেষ্টা করি নাই। বরং সে ভুলকে বর্ত্তমানে আমরা আরো জোর করে আঁকড়ে ধরেছি। অথচ এই বলে আমরা সান্ত্বনা পাই যে, একদিন মুসলমানই ইউরোপকে তার দর্শন, বিজ্ঞান শিখিয়েছিল। কিন্তু এটুকু আমরা বুঝি না যে, আজ আমরা কড়ার ভিখারী—আমাদের মুখে সে গর্ব্ব, সে আস্ফালন আদৌ শোভা পায় না।

আজ যদি আমরা সে গৌরবের অধিকারী হতে চাই এবং তার দাবী করতে চাই, তাহলে আবার আমাদের মধ্যে ইবনে-খলদুনের মত ঐতিহাসিক, আল-গাজ্জালী, ইবন্ রোশ্দ, ইবন্ সিনার মত দার্শনিক, হজরত ওমরের মত চরিত্রবান রাষ্ট্রবিদ, গেবরের মত বৈজ্ঞানিক, আবু হানিফার মত তত্ত্বদর্শী প্রতিভার আবির্ভাব হওয়া চাই। তাহলে আমরা অতীতের সত্যকে প্রমাণ করতে পারব। নতুবা আমাদের মুখে সে অতীতের গৌরব কাহিনী অন্যের নিকট অলীক উপকথা বলে প্রতীয়মান হবে। নিজেকে খাড়া করে, নিজেকে সৃষ্টি করে, অতীতকে

www.pathagar.com

নূতন করে সৃষ্টি করা। এই নব সৃষ্টি সুশিক্ষার উপর নির্ভর করে। হিন্দু আজ নানা শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করে নানা জ্ঞানে বিভূষিত হয়ে তার অতীতের প্রতি বর্ত্তমান জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। আজ আমরা তাদেরও সমকক্ষ হতে পারছি না কেন? তার কারণ, আমাদের সুশিক্ষার অভাব। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি চিত্ত-বিকাশ ও মস্তিস্ক-সম্প্রসারণের অন্তরায় হয়েছে। এই শিক্ষা পদ্ধতি কেমন করে যুগের প্রয়োজন মিটাতে পারে সেই হচ্ছে সমস্যার সমস্যা।

দেশের কল্যাণ বৃদ্ধি যদি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মোটের উপর বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি যে কি হিন্দু কি মুসলমান কাহারও পক্ষে উপযোগী নয়, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মুসলমানদের শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা বিভিন্ন এবং তার ফলও বিভিন্ন। এজন্য আমি এস্থলে শুধু মুসলমানের শিক্ষাসমস্যা সম্বন্ধেই বলতে চাই। এই শিক্ষা পদ্ধতির ফলে মুসলমান সমাজ যে, অনেকটা অন্যান্য উন্নতিমুখী জাতির উপর ক্রমশঃ বোঝাস্বরূপ হয়ে উঠছে তা এখনই ভাল করে সমঝে দেখা প্রয়োজন। বর্ত্তমান জগতের যে যে দেশে মুসলমান আছে সেই সেই দেশে তাদের অবস্থা নিতান্ত হীন। তাদের দুরবস্থা তত্তৎদেশের অমুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন আমাদের শ্রদ্ধেয় শহীদুল্লাহ্ সাহেবের পত্রে পড়লাম যে, ফ্রান্সের মুসলমান সম্প্রদায়ের অবস্থা বাংলার মুসলমানদের চেয়ে খুব ভাল নয়। গত বৎসর অধ্যাপক লিমের মুখে শুনেছিলাম চীনের কোটি কোটি মুসলমান নিতান্ত দুঃস্থ নিরক্ষর ও নির্ব্বোধ। এ সমস্ত কথায় আস্থা স্থাপন আমরা নাও করতে পারি। কিন্তু একথা ঠিক যে, বর্ত্তমান জগতের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য কোন দেশের কোন মুসলমান কোন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি কিছুই করেন নি। বর্ত্তমান দর্শন, বিজ্ঞান, আর্ট ঘেঁটে দেখুন—মুসলমানদের সৃষ্টি কিছুই নাই বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। অবশ্য আমার জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ। যদি কেউ আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন তবে আমি খুব বাধিত হব। কিন্তু যদি এই কথা সত্য হয়, তাহলে কি খুব লজ্জার কথা নয়। এই যে জ্ঞানের রাজ্যে মুসলমান একদিন নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কার ক'রে মানুষের শ্রীকল্যাণ ও জ্ঞানকে বহুমুখী করে ছড়িয়ে দিয়েছিল তারই বংশধর আজ বিপুল অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। এটা ভাববার কথা।

মুসলমানের এই দুর্গতির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে Dr. Crozier তাঁর 'Progress and Civilisation গ্রন্থে বলেছেন,

> 'Islam did open up an outlet for social aspect of human thought and aspiration but soon its secret structure began to reveal itself and was found to be incapable of expansion, devoid of sympathy and fatal to material and intellectual advancement. The Koran professed to be not only a spiritual revelation but a scientific treatise ; to close not only the book of inspiration but the book of knowledge. It accordingly discouraged all attempts of of man to discover the order of the world and thereby to improve his condition ; while its central doctrine led him to repose indolently on the decrees of an inexorable fate. The consequence was under

www.pathagar.com

> this belief human mind stagnated ; as we see at this hour in those nations that are deeply imbued with its spirit, progress, civilisation and morality lie rotting together.'

অর্থাৎ সত্যই ইসলাম মানব চিন্তার ও আকাঙ্ক্ষার সামাজিক দিকটা বিকশিত করবার জন্য একটা পথ উন্মুক্ত করেছিল ; কিন্তু শীঘ্রই ইহার মূল ভিত্তি ও গঠন প্রকাশিত হয়ে পড়ল—ফলে দেখা গেল ইহার উপর সৌধনির্ম্মাণের আর উপায় নাই—এবং ইহা বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও জ্ঞান বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোরান যে কেবল ধর্ম্মগ্রন্থ বলে দাবী করে তাহা নহে ইহা সর্ব্বজ্ঞানের ভাণ্ডার বলে পরিচিত। কোরানের আবির্ভাবে শুধু যে খোদার বাণী রুদ্ধ হয়েছে তাহা নহে, সঙ্গে জ্ঞানও রুদ্ধ হয়েছে। কোন পুস্তক নাই বা হবে না, যা কখন কোরানের সমকক্ষ হবে, এই হ'ল মুসলমানের ধর্ম্মমত। কাজেই, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী মুসলমান জগতের রহস্য উদ্ঘাটনের সর্ব্বচেষ্টা ত্যাগ করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার স্বকীয় জীবনের শ্রী ও সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টাও ত্যাগ করেছে। তকদীরের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়েছি সে নিষ্কৃতি লাভ করতে চাচ্ছে। এতে মুসলমানের মন ও কর্ম্মস্রোত রুদ্ধ হয়ে গেছে। তাই দেখতে পাই, যেখানে মুসলমান সেখানেই উন্নতি, সভ্যতা ও নৈতিক বল সমস্তই একাধারে ধ্বসে যাচ্ছে'। একথা হয়ত ষোল আনা ঠিক নয়, কিন্তু এর মধ্যে যে সত্যটুকুর ইঙ্গিত আছে সেটা আজ প্রণিধানযোগ্য।

এখন আমাদের ঘরের দিকে তাকাই। আজ আমরাও যে উন্নতিমুখী হিন্দু সম্প্রদায়ের সকল শুভ চেষ্টায় আমাদের দুর্ব্বুদ্ধি ও দুর্গতির দ্বারা বিঘ্ন ঘটাচ্ছি তা বোধ হয় প্রমাণ করতে হবে না। তারই কারণ নির্দ্ধারণ করা এ প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য। আজ আমাদের কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করতে হবে যে, বৃটিশ এদেশে পুরাপুরি আধিপত্য বিস্তার করেই দেশবাসীর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করেছে। প্রথমতঃ সে ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু মুসলমানের আইন কানুন জানতে হলে তাদের পরিচিত ভাষা ও গ্রন্থের চর্চ্চা করা প্রয়োজন। এজন্য ওয়ারেনহেস্টিংস ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা এবং জোনাথান ডানকান্ ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে বেনারাস সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলিকাতা মাদ্রাসা সর্ব্বপ্রথম বৃটিশ প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্র। সরকার এই উভয় শিক্ষাকেন্দ্রে প্রভূত অর্থ ব্যয় করতেন। ১৭৮৪ অব্দে বাংলার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষার বিস্তার দ্রুত চলতে থাকে। স্যার উইলিয়াম জোন্স্ প্রমুখ পণ্ডিতগণের গবেষণায় আরবী ও সংস্কৃত বিদ্যার চর্চ্চা বহুল পরিমাণে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ১৮১৩ অব্দে লর্ডমিন্টো দেশীয় বিদ্যার সঙ্গে ইউরোপীয় জ্ঞানচর্চ্চার প্রস্তাব করেন। কিন্তু ১৮২৩ অব্দ পর্য্যন্ত মিন্টোর প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ১৮২৩ অব্দে উক্ত টাকা আরবী ও সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত করবার জন্য ব্যয় করা হয়।

ইতোমধ্যে দুইটি কারণের আবির্ভাবে সরকারের শিক্ষা-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তিত হয়। প্রথম কারণ খৃষ্টান পাদ্রীদের চেষ্টা এবং দ্বিতীয় কারণ ইউরোপীয় শিক্ষার জন্য কলিকাতার তৎকালীন চিন্তাশীল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন হিন্দু নেতৃবর্গের স্বতঃপ্রণোদিত দাবী ও আন্দোলন। স্কটিস চার্চ্চ, কলেজ ও মাদ্রাজ খৃষ্টিয়ান কলেজ পাদ্রীদের কীর্ত্তি। আর হিন্দু কলেজ হিন্দু নেতৃবর্গের সেই আন্দোলনের ফল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত করবার

www.pathagar.com

প্রয়োজন এখানে নাই, কিন্তু যে মহাপুরুষ এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ ছিলেন, তাঁর দুই একটি কথা এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন মনে করি। রাজা রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম 'ইউরোপীয় শিক্ষা'র জন্য ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি ইংরাজীতে দক্ষ হয়েছিলেন।. শুধু ভাষায় নয়, ইংরাজী দর্শন, ইতিহাস ও কালচরে তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ হয়েছিলেন। তখনও দেশে ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রামমোহন শিক্ষাক্ষেত্রে নূতন প্রণালী অবলম্বন করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। এই নবপদ্ধতি দ্বারা তিনি দেশবাসীর গতানুগতিক স্থিতিশীল মনের উপর পাশ্চাত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং অতীতের কুসংস্কার ও ধারণা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত উজ্জ্বল হয়ে দেশবাসীকে গলা ছেড়ে এই নব শিক্ষায় আহ্বান করেছিলেন। কলকাতায় যখন প্রথম সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব হয়, তখন তিনি তার প্রতিবাদ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের পরিবর্ত্তে আধুনিক আর্টস কলেজের আদর্শে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ জেম্‌স্‌ বলেন"To him must be ascribed the introduction of liberal education in Bengal." অর্থাৎ বাংলার আধুনিক শিক্ষার জন্য সমুদয় বাহাদুরি রামমোহনের প্রাপ্য। তিনি এই সম্পর্কে বড়লাট লর্ড আমহার্স্টকে যে পত্র লিখেন তার মধ্যে তিনি সংস্কৃত শিক্ষার বিরুদ্ধে অনেক কথা প্রকাশ করেন। এ স্থলে তিনি বলেন, "This Seminary (proposed sanskrit School) similar in character to those which existed in Europe before the time of Lord Bacon, Can only be expected to load the minds fo youth with grammatical niceties and metaphysical distinctions of little or no practical use to the possessors or to society. অন্য এক স্থলে তিনি বলেন, "If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system of the Schoolmen which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner the Sanskrit system of education would be the best Calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing Mathematics, Natural philosophy, chemistry, Anatomy, with other useful sciences which may be accomplished with the sums proposed by employing a few gentlemen of talent and educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus." এই পত্রে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ফার্সী আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষায় যে এদেশের কোন কল্যাণ সাধিত হবে না এবং ইংরাজী শিক্ষা ব্যতীত যে দেশের কুসংস্কার দূরীভূত হবে না তাহা রামমোহন সম্যকরূপে উপলব্ধি করেছিলেন। এই দূরদর্শিতার ফলে এদেশের যুগসঞ্চিত দৃঢ়নিবদ্ধ ধারণাকে উচ্ছেদ করতে তিনি যে বিপুল সহায় হয়েছেন তা বলাই বাহুল্য। বাংলা তথা ভারতের সৌভাগ্য যে সে যুগে রামমোহনের মত মহাপুরুষ

www.pathagar.com

জন্মেছিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে মহাচেতা ডেভিড হেয়ার ও স্যার এডওয়ার্ড হাইড্ ইস্ট সংযুক্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু দুঃখের সহিত লিখ্তে হবে যে, সে যুগে এমন কি আজ পর্য্যন্ত মুসলমান সমাজে রামমোহনের মত পাশ্চাত্য জ্ঞানদীপ্ত প্রতিভার আবির্ভাব হয় নাই। রামমোহন যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য আন্দোলন করেন তখন মুসলমান রাজ্যহীন হয়ে ক্ষোভে দুঃখে ইংরাজকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখতে থাকে। সুতরাং ইংরাজী শিক্ষার কথা তার মুখে উঠ্তেই পারে না। মানুষ সাধারণতঃ প্রাচীনপন্থী স্থিতিশীল। শিক্ষাক্ষেত্রে একথাটি আরও সত্য। ওয়ারেন হেস্টিংস এই দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে মুসলমান সমাজকে স্থির করবার জন্য কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত করেন। দূরদর্শী হিন্দু নেতৃবর্গ কালবিলম্ব না করে এবং মুসলমানের মত আক্ষেপে দিন না কাটিয়ে পাশ্চাত্য দর্শন-বিজ্ঞানকে আয়ত্ত করবার জন্য হিন্দু কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেন ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে। হিন্দু কলেজ কালক্রমে প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হয়। মুসলমান সমাজ কলকাতা মাদ্রাসা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকল। কলকাতা মাদ্রাসার পর চট্টগ্রাম, ঢাকা, হুগলী মাদ্রাসা ব্যতীত সরকার ১৯২৬ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালী মুসলমানদের জন্য অন্য কোন শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন নাই, কিংবা ১৯২৬ সালের প্রতিষ্ঠিত সা'দাত কলেজ ব্যতীত মুসলমান সমাজ স্বাধীনভাবেও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে নাই। তার কারণ মুসলমান সমাজে তার জন্য তীব্র কোন আন্দোলন হয় নাই। হিন্দু নেতৃবর্গ যাহা ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করতে সরকারকে বাধ্য করেছিলেন তাহাই মুসলমান সমাজ পেয়েছে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মাত্র ১৯২৬ সালে। এই হিসাবে ধরলে বলতে হবে মুসলমান সমাজ হিন্দু সমাজের একশত নয় বৎসর পশ্চাতে। এই একশ নয় বৎসরের জের যদি পূরণ করতে হয় তাহলে যে আজ মুসলমানকে কি করা উচিত তাহাও মুসলমান নেতৃবর্গ অবগত নন। যদি ১৮১৭ সালের হিন্দু কলেজের শিক্ষকদের সহিত বর্ত্তমান ইসলামিয়া কলেজের শিক্ষকদের তুলনা করি তাহলে বুঝতে পারা যায়, মুসলমান সমাজে প্রকৃত শিক্ষার জন্য কোন ক্ষুধা নাই, কিম্বা তার জন্য কোন আকাঙ্ক্ষাও নাই। ডিরোজিওর মত শিক্ষক হিন্দু সমাজের শিক্ষাকে কতখানি উন্নত করেছেন, তা ভাবলে সত্যই ইসলামিয়া কলেজের ব্যবস্থা দেখে নিতান্ত নিরাশ হতে হয়। বর্ত্তমান মুসলমান সমাজ কি ডিরোজিওর মত লোককে আর এখন পেতে পারেন? কখনও নয়। এমন অবস্থায় ইসলামিয়া কলেজের যে সমস্ত বিষয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাহা আরও অধিকতর উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের হাতে দেওয়া উচিত ছিল। এইরূপ অল্প উপকরণ দিয়ে এই কলেজ কেমন করে মুসলমানের জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত করতে সমর্থ হবে তা ভেবে পাই না। যে সমস্যার সমাধানকল্পে হিন্দু সমাজ হিন্দু কলেজ পেয়েছিল, আজ একশত বৎসর পরে আমাদের সেই সমস্যাই বিষম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ঐ সমস্যা ঠিক ১৮১৭ সালের ব্যবস্থা দ্বারা সমাধান করলে প্রকৃত সমাধান পাওয়া যাবে না। আজ আমাদের নূতন করে সে সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে।

একশত বৎসর পূর্ব্বে হিন্দু সমাজ সংস্কৃত শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞানকে বরণ করেছিল—আর একশত বৎসর পরে আমরা সেই আরবী শিক্ষাকেই পুনঃপ্রবর্ত্তিত করেছি নব প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাসমূহে। প্রাচীন শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করে যে প্রকৃত শিক্ষা হয় না, সে বুদ্ধি আজও

www.pathagar.com

আমাদের হয় নাই। আজ তাই আমরা প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে একটুখানি ইংরাজী জুড়ে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিচ্ছি।

সেনসাস্ ঘেঁটে দেখি একটি হিন্দু ছেলে আট বৎসর বয়সে যা আয়ত্ত করে, ঠিক তাই আয়ত্ত করে একটি মুসলমান ছাত্র এগারো বৎসর বয়সে। কাজেই শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষতঃ উচ্চ শিক্ষায় মুসলমান হিন্দুর কাছে হটে যেতে বাধ্য। এর কারণ মুসলমানদের ধর্ম্মশিক্ষার জন্য উৎকট উদ্বিগ্নতা। শিশু কথা না বলতে শিখতেই দুর্ব্বোধ্য আরবী শব্দের সঙ্গে লড়াই করতে বাধ্য হয়। হয় পিতা না হয় শিক্ষক বেত্রহস্তে সেই আরবী শব্দ কণ্ঠস্থ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। প্রতিদিনি প্রাতে যখন শিশু প্রকৃতির মনোরম দৃশ্যের সহিত একটু পরিচয় করবে ঠিক সেই সময় তাকে কোরাণ বগলে কি কাঁধে করে মসজিদে যেতে হয়। সেখানে উস্তাদজীর সেই নিদারুণ বেত্রাঘাতের সহিত তার জীবনযুদ্ধ আরম্ভ হয়। সেই নিষ্ঠুরতার দৌরাত্ম্যের মধ্যে মুসলমান ছাত্রের ধর্ম্মশিক্ষা আরম্ভ হয়। অতি কষ্টে আরবী শব্দ কণ্ঠস্থ করতে করতে তার শিক্ষার প্রতি তীব্র ঘৃণার উদ্রেক হয়। সুকুমারমতি শিশু অনেকেই এই নিষ্পেষণের চাপে একেবারে ভেঙ্গে পড়ে। একদিকে তাদের সম্মুখে আরবী ভাষা অন্যদিকে উস্তাদজীর তাম্বি ও বেত্রাঘাত—এই উভয় সংকটের মধ্যে মুসলমান শিশুর শিক্ষা শুরু হয়। এই জবরদস্তির ফল যে বিষময় হয়েছে, সমাজপতিরা আজও তা খতিয়ে দেখছেন না। কোরাণ খতম করে অনেকেই শিক্ষার হাত হতে চির বিদায় গ্রহণ করে এবং উত্তরকালে তারাই নানাবিধ অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। কোন দার্শনিক বলেছেন, morality enforced is immorality in fact, জবরদস্তিতে ধর্ম্ম শিক্ষা দিলে তার ফল বিপরীত ফলে। মুসলমান সমাজের মধ্যে আজ যারা নানা কু-আচারে লিপ্ত তাদের বাল্যজীবনের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, তাদের অনেককেই উস্তাদজীর একমাত্র সম্বল সেই বেত্রঘাত খেতে হয়েছে এবং সেই বেত্রাঘাতই তাদিগকে বিপথে চালিয়েছে। শিক্ষার প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা যে এহেন কোরাণ শিক্ষার আশু ফল তা প্রমাণ করার জন্য বেশী কষ্ট পেতে হয় না। যে সমস্ত ছাত্র মসজিদে কোরাণ পড়েছে তাদের কয়জন শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি করেছে? আর যারা সৌভাগ্যক্রমে কোরাণ শিক্ষার পর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তারা সাধারণতঃ পরিণত বয়স্ক। কিন্তু তাদের মস্তিস্কের শক্তি দুর্ব্বোধ্য ভাষা কণ্ঠস্থ করতে করতে যথেষ্ট পরিমাণে কাহিল হয়ে পড়ে এবং তাদের মানসিক স্ফূর্ত্তি একেবারেই থাকে না। এমন অবস্থায় মুসলমান ছাত্র অনেকটা আধমরা হয়েই যেন শিক্ষা লাভ করতে যায়। তার নিকট হতে বেশী আশা করাই বাতুলতা। এজন্য আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

বৃটিশের প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃ মুসলমান সমাজের সারথিগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করলেন। সে ফতোয়ার বিষময় ফল আজও সমাজের শিরায় শিরায় বর্ত্তমান। কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর মুসলমান শিক্ষার্থী মাদ্রাসাতেই ভর্ত্তি হয়েছে, কিন্তু ইংরাজী বিদ্যালয়ে খুব কম আকৃষ্ট হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাই বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। মুসলমান হতে উত্তীর্ণ হয়ে মৌলবী সাহেবগণ গ্রামে গ্রামে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়ে স্ব স্ব উদরান্নের সংস্থান করেছেন। তাঁদের সেই ধর্ম্ম ব্যবসায়কে উঞ্ছবৃত্তি ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। তাঁরা পল্লীতে পল্লীতে ঘুরে নিরক্ষর, গোমরাহ, নির্ব্বোধ মুসলমানকে শিষ্যত্বে বরণ করে তাদের মূর্খতাকে ক্রমশঃ পাকিয়ে তুলেছেন। যে সমস্ত উপাখ্যান, উপকথা এবং ইসলামের প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ মুহম্মদকে নানা

www.pathagar.com

কুসংস্কারের আবর্জ্জনায় আবৃতি করে তাদের সম্মুখে ধরেছেন এবং তদ্দ্বারা শ্রমক্লান্ত পানাহার অন্বেষণে সদাব্যস্ত পল্লীবাসী মুসলমানদের ধারণা ও বুদ্ধিকে যেরূপে বিকৃত করেছেন, তাতে আজ তারা এক অপরূপ জীবে পরিণত হয়েছে। তাদের জীবনে শ্রী নাই—তারা এ দুনিয়ার সৌন্দর্য্য, সম্পদ, সুখ বৃদ্ধির জন্য কোন আকাঙ্ক্ষাই পোষণ করতে শিখে নাই। কালক্রমে শিক্ষা ও সম্পদ অর্জ্জনের উপযোগী জ্ঞানের অভাবে যখন গ্রাম্য মুসলমানের সঙ্গতি কমতে শুরু করল ও সঙ্গে সঙ্গে মৌলবী সাহেবগণের উঞ্ছবৃত্তিও অর্থলাভের প্রতিকূল হতে লাগল। তখনই তাঁরা অর্থকরী অর্থাৎ 'চাকরী করা' বিদ্যা ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তখন ইংরাজী শিক্ষা জায়েজ করবার জন্য নানা হাদিস খুঁজে বের করা হল। তাঁরা গ্রামে গ্রামে দুই একটি ছেলেকে ইংরাজী বিদ্যালয়ে দিতে থাকলেন, এবং তাঁদের আদর্শ দেখে নিরক্ষর পল্লী বাসী মুসলমানও ইংরাজী বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী হল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ইংরাজী বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্র ক্রমাগত বর্ধ্বিত হয়েছেন। ১৮৭৪ অব্দে ক্রফট সাহেব তাঁর রিপোর্টে লেখেন, 'অবস্থাপন্ন মুসলমান ছাত্র ইংরাজী বিদ্যালয়ে দ্রুত প্রবেশ করেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি দেখান, '১৮৭২ অব্দে ঢাকা বিভাগে মাত্র ৮৫৬ জন মুসলমান ছাত্র ছিল এবং ১৮৭৪ অব্দে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে ১৩২৬১ জন ছাত্র হয়।' ভূদেব বাবুও বলেন, 'দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, পাবনা প্রভৃতি জেলার ভদ্র মুসলমানগণ কোরাণ শিক্ষা ব্যতীত আরবী বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে নাপসন্দ করেন এবং ক্রমশঃ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলি তাঁদের আদরণীয় হয়ে উঠছে।'

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আরবী শিক্ষার প্রতি মুসলমান জনসাধারণের বিশ্বাস ও ভক্তি এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষ অক্ষুণ্ণ হয়ে রইল। বিশেষতঃ মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ মৌলবী সাহেবগণ তাঁদের পেশা বহাল রাখবার জন্যই হোক, বা অন্য কারণেই হোক, ঐ বিশ্বাস অটল করে রাখতে সহায় হলেন। পক্ষান্তরে ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমান আরবী শিক্ষার প্রতি বীতশ্রদ্ধা হয়ে উঠলেন। এইরূপে মুসলমান সমাজের শিক্ষিত সম্প্রদায় দুইটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। উভয় দলের সঙ্গে কোন রফা বা বনিবনাও হ'ল না। বরং একে অপরের নিন্দা অপবাদ দিয়ে সমাজের জনসাধারণকে বিব্রত করতে লাগলেন। জনসাধারণ মৌলবী সাহেবদেরই প্রভাবে যুগসঞ্চিত কুসংস্কার-পীড়িত হয়ে ইংরাজী শিক্ষিতগণকে ঘৃণা করতে লাগল। তারা তাঁদের প্রচারিত ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রভাবে যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে থাকল। প্রকৃত শিক্ষার কথা তাদের কানে কে পৌঁছায়? ইংরাজী শিক্ষিতগণ সরকারের চাকুরীতেই জীবন কাটাতে লাগলেন। ক্রমে মুসলমান সমাজে চিন্তাশীল লোকের আবির্ভাব হল না। ইংরাজী ও আরবী শিক্ষিতের পরস্পর দ্বন্দ্ব-দ্বেষাদ্বষী প্রবল হতে প্রবলতর হতে লাগল। ইংরাজী শিক্ষা দ্বারা আরবী শিক্ষাকে আধুনিক দর্শন-বিজ্ঞানের প্রভাবে নূতন করে প্রবর্ত্তিত করবার কথা মুসলমান সমাজের মনে জাগল না। আরবী শিক্ষা যে আধুনিক জগতের জীবন সমস্যা সমাধানের অনুকূল নয়, সে কথাও মুসলমান আদৌ বুঝল না। মধ্যযুগের প্রবর্ত্তিত কালাম, মনতক, বালাগাৎ শিক্ষার জন্য শক্তি ও অর্থক্ষয় যে বর্ত্তমান যুগের পক্ষে অনেকখানি নিরর্থক সে কথা গলা ছেড়ে বলবার মত শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব আজও মুসলমান সমাজে হয় নাই। ইংরাজী ও আরবীর যে সমন্বয়ে বর্ত্তমান যুগের প্রয়োজন সিদ্ধ হতে পারে তেমন সমন্বয়ের চেষ্টা আজও হয় নাই। ফলে ইংরাজী আরবী দ্বন্দ্ব এখনও প্রবলরূপে বিদ্যমান থাকায় সমাজ মনের ঋজুতা ও একাগ্রতা সম্ভবপর

www.pathagar.com

হচ্ছে না। কিন্তু এই দ্বন্দ্ব চুকিয়ে ফেলবার জন্য কিছু চেষ্টা যে হয় নাই তা বলা যায় না। দুঃখের বিষয় সে চেষ্টায় এমন কোন শক্তিমান পুরুষের হাত পড়েনি, যাঁর জ্ঞান ও রুচি প্রাচ্য প্রতীচ্যের সংযোগসাধন করতে পারে এবং মুসলমানের মুক্তির জন্য যাঁর বুদ্ধি ও অনুভূতি সম্পূর্ণ সজাগ। যে চেষ্টা হয়েছে তার ফলে ১৯১২ সালে পুরাতন আরবী মাদ্রাসাগুলির পরিবর্ত্তে নূতন মাদ্রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরিবর্ত্তন কিছুই হয় নাই—পাঠ্য তালিকায় ইংরাজী ও বাংলা সংযুক্ত হয়েছে মাত্র। পুরাতন শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করার ব্যবস্থা যেমন ছিল, তেমনি রয়েছে। ইংরাজী যুক্ত হয়েছে, কেননা তা না হলে চাকুরী পাওয়া দুষ্কর। সরকারের ঘরে চাকুরী জোটাতে হলে ইংরাজী জানা দরকার। কিন্তু জনসাধারণ শুধু ইংরাজী শিখতে নারাজ অথচ চাকুরীর জন্য উদ্বিগ্ন। এমন অবস্থায় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত না করে কিংবা আধুনিক জগতের দাবীর দিকে লক্ষ্য না করেই নব মাদ্রাসা-শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করা হ'ল। তাতে পুরাতন মাদ্রাসার সমস্তই থাকল কেবল এক ফার্সীর পরিবর্ত্তে ইংরাজী ভাষা ও উর্দ্দুর পরিবর্ত্তে বাংলা শিখবার ব্যবস্থা করা হল। এই পদ্ধতি মুসলমান সমাজের যে মনঃপুত হয়েছে তা সরকারের কাগজপত্র হতে প্রমাণ করা যায়। মুসলমান জনসাধারণ এখন ছাত্রকে মধ্য ইংরাজী বা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে পাঠায় জুনিয়র ও সিনিয়র মাদ্রাসায়। তাদের ধারণা এক গুলিতে দুই বাঘ পড়বে—দীন'ও হবে দুনিয়াও হবে। ছেলেরা ইংরাজী শিখে আর কাফের হবে না। তাদের লুঙ্গি, টুপি, কুর্ত্তা সমস্তই ঠিক থাকবে—মনের মধ্যে কোন বদখেয়াল ঢুকবে না। মাতাপিতার আর শংকার কারণ থাকবে না। এমন চমৎকার শিক্ষা পদ্ধতি আর কোথায় পাওয়া যাবে? এইরূপে জনসাধারণের অন্ধ-বিশ্বাসকে এমনি করেই ব্যবহার করা হয়েছে যে M.E. ও H.E. School হতে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। শিক্ষা বিভাগের রিপোর্টে দেখি—

১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫	১৯২৫-২৬
H.E. School-শতকরা ১৫.২%	শতকরা ১৪.৪%	১৩.২%
M.E. School- শতকরা ১৯.৪%	শতকরা ১৮.৫%	১৬.৪%

কারণ মক্তব ও নবপ্রবর্ত্তিত মাদ্রাসা ক্রমশ বেড়ে চলেছে এবং মুসলমান অভিভাবক এই মাদ্রাসাতেই ছাত্র পাঠাতে অতিশয় উদ্বিগ্ন।

১৯২৩-২৪	১৯২৪-২৫
মাদ্রাসা—৩৪৬	৩৭৪
ছাত্র—২৬, ১৫৬	৩১, ৬১৩
সরকারী ব্যয়—৩, ৩৯, ২৯৬্	৬, ১৯, ৭৭৬্

শতকরা ৪২ জন মুসলমান ছাত্র মক্তবে পড়ে। নব মাদ্রাসার শিক্ষা যে আদরণীয় হচ্ছে তার কারণ ইহাতে আরবী ও ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ভাল করে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, এই শিক্ষায় মুসলমান সমাজের জীবন শ্রীসম্পন্ন হবে না—তার মন জাগবে না—রুচি ফিরবে না, বুদ্ধি বিকশিত হবে না—জগতের জ্ঞান গ্রহণ করতে তার শক্তিও বাড়বে না। শুধু ভাষা শিখলেই যে জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, বুদ্ধি বিকশিত হয়, মন সম্প্রসারিত হয়, কর্মশক্তি বাড়ে, এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হয়েই বোধ হয় প্রবর্ত্তকগণ নব-মাদ্রাসা-শিক্ষার

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু শিক্ষাতত্ত্ববিদগণ একবাক্যে বলবেন, এরূপ ধারণা নিতান্ত ভুল। মন বিকশিত ও বুদ্ধি সজাগ করতে যে সমস্ত বিষয় বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ ছাত্রের সামর্থ্যানুসারে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন, সেগুলি প্রকৃষ্ট উপায়ে শিক্ষার ব্যবস্থা যে শিক্ষা-পদ্ধতিতে থাকে না, সে পদ্ধতি জীবন সমস্যার সমাধান করতে পারে না। যে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নাই—সে শিক্ষা পঙ্গু, যেমন যে জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নাই সে জীবন অন্ধ। যে শিক্ষা হৃদয়কে প্রশস্ত করে না, বুদ্ধিকে জাগ্রত করে না, চিত্তকে মার্জ্জিত করে না, সংসার হতে মুক্তি দেয় না, সে শিক্ষা জাতির প্রাণ বিনাশ করে। সংকীর্ণ মন নিয়ে কোন জাতি টিকে থাকতে পারে না। শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বেশ বলেছেন, 'মনোজগতে যে জাতি একঘরে সে জাতি পতিত'।

মাদ্রাসা শিক্ষার পরিণাম চিন্তা করলে আমার ঐ কথাটাই মনে পড়ে। আজ নব-মাদ্রাসায় বর্ত্তমান জগতের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস বা আর্টস কিছুরই স্থান নাই, অথচ যে সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রে এই সমস্ত বিষয়ের স্থান করা হয়েছে, সেখানে মুসলমান যাচ্ছে না। আর কিছুকাল পরে মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা সাধারণ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিতান্ত কম হয়ে যাবে। তখন এই নব-মাদ্রাসা হতে উত্তীর্ণ ছাত্রগণও তাদের সংকীর্ণ মন, স্বল্প দৃষ্টি আড়ষ্ট বুদ্ধি নিয়ে মুসলমান সমাজকে জগতের অন্যান্য শক্তিমান জ্ঞানদীপ্ত জাতির সম্মুখে নিতান্ত হেয় বলে প্রতিপন্ন করবে। নব-মাদ্রাসা-শিক্ষা পদ্ধতি শিক্ষা ও জীবনের সঙ্গে যোগ সাধন করতে পারে নাই। এরূপ শিক্ষা মনকে মুক্তি দিতে পারে না, শক্তিও বাড়াতে পারে না। আর যদি জীবনের সঙ্গে শিক্ষা খাপ না খায়, মনকে মুক্ত করতে না পারে, সে শিক্ষা জীবনকে সরস সুন্দর করতে পারে না। যে শিক্ষা মনকে মুক্ত ও শক্তিশালী করতে পারে না সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।

এস্থলে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি, এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। শিক্ষার উদ্দেশ্য দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন। কোন দেশে কোন কালে কোন এক ব্যক্তি শিক্ষার উদ্দেশ্য একান্ত করে চিরকালের জন্য নির্দ্ধারিত করতে পারে না। যুগ-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনও পরিবর্ত্তিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়ও পরিবর্ত্তিত হয়। মানুষের জীবন বিবিধ উপকরণ দ্বারা পুষ্ট হয়। সেই সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ করবার শক্তি অর্জ্জন এবং মানুষের মস্তিষ্ক, হৃদয় ও হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্পূর্ণ বিকাশ সাধনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে শিক্ষার আবশ্যক তাতে মানুষ আপনার শক্তি প্রখর করে জগতের রহস্য অবগত হয়, সমাজের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং বিশ্বস্রষ্টার অপরূপ শক্তিতে আস্থাবান হয়ে তাঁর দিকে ক্রমশঃ আকৃষ্ট হয়। ব্যক্তি হিসাবে মানুষকে জানতে হবে—কি তার বর্ত্তমান, কি তার অতীত এবং ভবিষ্যতে কি তাকে হতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয় ও মনকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করতে হবে। বুদ্ধি প্রখর হলে তার দৃষ্টি শক্তি বাড়ে, এবং হৃদয় সম্প্রসারিত হলে প্রেম ও অনুভূতি জাগে। যে শিক্ষা হৃদয় ও মনের চর্চ্চায় বিঘ্ন ঘটায়, সে শিক্ষা জাতির পক্ষে মারাত্মক। হৃদয়, মন, ইন্দ্রিয়াদির বিকাশ সাধনের সঙ্গে ধর্ম্মস্পৃহাকেও জাগ্রত করতে হবে। তবেই মানুষের সমুদয় শক্তি প্রখর হবে। এইরূপে মানুষের সম্ভাবনাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। যে শিক্ষা দ্বারা, সে শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক উন্নতি ও ঐশীগুণ সাধন। এজন্য হজরত বলেছেন, 'তাখাল্লাকু বি আখলাকিল্লাহ্, (খোদার গুণাবলি লাভ করতে চেষ্টা কর)। মানুষের চরম

www.pathagar.com

বিকাশের প্রথম পথ হচ্ছে মুক্ত বুদ্ধি (emancipation of intellect), যাতে জগতের প্রয়োজন অনুসারে, যুগধর্ম্মের ইঙ্গিত অনুসারে স্বীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করা সহজ হয়। অতীতের কোন যুগ বিশেষের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে যারা বর্ত্তমানকে অস্বীকার করে—তাদের বুদ্ধি মুক্ত নয়। সুতরাং তাদের শিক্ষাও অসম্পূর্ণ। বর্ত্তমান জগতে যে সমস্ত জাতি জগতের জ্ঞান ও সুখ বৃদ্ধি করতে প্রাণপণ করছে তারাও একদিন অতীতের কোন ধর্ম্মগুরুর বাণীকে নিরন্তন সত্য মনে করে সম্মোহিত হয়েছিল। জগত আপন মনে নানা আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিল। কিন্তু তাদের কোন খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ একদিন কোন্ বিদ্রোহীর চরম আঘাতে জেগে উঠে দেখে—যে সত্য তারা আঁকড়ে বসে আছে সে সত্য কোন সমস্যাই তাদের সমাধান করতে পারছে না। তখন থেকে তারা সে সত্যকে পরিবর্ত্তনশীল জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ব্যস্ত হয়েছে। তা করতে গিয়ে তারা অনেক প্রাচীন সত্যকে ত্যাগও করেছে। তার কারণ তাদের বুদ্ধি মুক্ত হয়েছে। বুদ্ধি মুক্ত হলে জগত ও জীবনই যে পরম সত্য, তা বুঝতে শক্ত হয় না। তখন মানুষ আপনার সম্পদ শ্রী সমস্ত একে একে আয়ত্ত করতে সমর্থ্য হয়। তখনই সে সমাজের সমস্ত অভাব পূরণ করতে ও তার দাবী রক্ষা করতে পারে। সমাজ স্থির হয়ে থাকে না—জগত যেমন চলে সমাজও তেমনি চলে। আপনা হতেই সমাজ-মন পরিবর্ত্তন লাভ করে। মানুষ শিক্ষা দ্বারা বিকশিত-শক্তি সমাজের উন্নতি সাধনে, ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনে ব্যবহার করে। পরিবর্ত্তনশীল সমাজের অভাব ও দাবী অনুসারে মানুষের শক্তি প্রবল হওয়া আবশ্যক। তজ্জন্য শিক্ষা-পদ্ধতিও ক্রমশঃ সেই শক্তিকে প্রখর করবার জন্য পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক। জীবনের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হওয়া আবশ্যক। যুগ বিশেষের মন্ত্র ও শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করাই শিক্ষার চরম পদ্ধতি বলে গণ্য হলে সে শিক্ষা জীবনকে সংযত সুন্দর করতে পারে না। সেরূপ শিক্ষার অধীনে যাঁরা একেবারে অপরিচিত। ফলে, দুঃখ দৈন্যই তাদের ভাগ্যে ঘটে। জীবন যা চায় সে শিক্ষা তাঁকে তা দেয় নাই। আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা অনেকটা এই দোষে দুষ্ট। বিশেষতঃ মুসলমানদের শিক্ষা-পদ্ধতি আর জীবনধারা একেবারে পৃথক।

যুগধর্ম্মকে অস্বীকার করে যে জাতি শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত করে সে জাতি হতভাগ্য। মন ও হৃদয় সম্প্রসারণের জন্য মানুষের অনন্ত আকাঙ্ক্ষা আছে। সেই বিপুল আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করতে সমাজের সাধু, বিজ্ঞ, শক্তিমান নরনারীর সমবেত চেষ্টা প্রয়োজন। সেই আকাঙ্ক্ষা একবার জাগলে অন্ধকারের মধ্যে আলোকস্তম্ভের মত উহা মানুষকে নব নব শুভ চেষ্টায় আহ্বান করে মনুষ্যত্ব-বিকাশ ও মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য। সে আকাঙ্ক্ষা জাগাতে হলে সর্ব্বপ্রথম চাই উপযুক্ত শিক্ষা-পদ্ধতি। কিন্তু নব-মাদ্রাসা শিক্ষা-পদ্ধতি বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের পক্ষে উপযোগী যে হয় নাই, তা প্রমাণ করা খুব শক্ত নয়। পাঠ্যতালিকাটি বিশ্লেষণ করলে তা বেশ বুঝা যায়। বিষয়গুলির সমাবেশ কোন শিক্ষানীতি দ্বারা সমর্থন করা যায় না। সুদূর অতীতের চিন্তাধারা-প্রসূত সূত্রসমূহ মুখস্ত করাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাতে চিন্তার স্বাধীনতা স্ফূর্ত্তি লাভ করে না। কারণ সে সূত্রকে অকাট্য সত্য বলে শিক্ষার্থীকে মেনে নিতে হয়। সে তার পারিপার্শিক জীবন হতে লব্ধ জ্ঞান দ্বারা সে সূত্রকে সমালোচনা করতে পারে না। সে শিক্ষা তাকে দেওয়া হয় না। এই যে শুধু মেনেই নেওয়া' এর চেয়ে শিক্ষার বিড়ম্বনা আর কি হতে পারে? এতে চিত্তবৃত্তি বিকশিত হয় না, বুদ্ধি স্তম্ভিত বিড়ম্বিত হয়ে ক্রমশঃ

www.pathagar.com

জড়তায় আচ্ছন্ন হতে থাকে। ধারণ-শক্তি এতে রুদ্ধ হয়ে যায়। চিন্তাস্রোতে ভাটা পড়ে। মাদ্রাসা-শিক্ষা মস্তিষ্কের খাদ্য জোগায় না। গণিত যাতে বুদ্ধি বিকশিত হয়, তার মাত্র যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া হয়। তার মধ্যে আবার বীজগণিত গরহাজির। বর্ত্তমান লজিক, বর্ত্তমান ইতিহাস ভূগোল—যাতে মনের স্ফূর্ত্তি হয়, দৃষ্টি খোলে, হৃদয়-বৃত্তি বিকশিত হয়—তার স্থান মাদ্রাসায় নাই। মাদ্রাসার ইতিহাসের পাঠ্য-সীমা দেখলে মনে হয় ইসলামের ইতিহাস হজরত আলীর সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরের ইতিহাস পাঠ্যোপযোগীই নয় এদের নিকট। জগতের সঙ্গে পরিচয় করতে হলে যে সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন তার কিছুরই ব্যবস্থা হয় নাই। সাহিত্য ও কাব্য, যাতে জীবনের রুচি ও সৌন্দর্য্যগুণ বর্দ্ধিত হয়, তার স্থান অতি সামান্য। এই শিক্ষায় ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মজীবন দু'টি পৃথক করতে শেখায় না। এতে এই ধারণা জন্মায় যে, ধর্ম্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করলে ধর্ম্মজীবন লাভ ঘটে। ফলে, অনেক সময় দেখা যায় অনেক মৌলভী সাহেব ধর্ম্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হয়েও নিতান্ত গর্হিত জীবন যাপন করেন। তাঁরা কিছুতেই বুঝেন না, ধর্ম্মহীন যাপন করতে হলে শুধু ধর্ম্মশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করলেও চলে না। সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাপনের সমুদয় কায়দা-কানুনও শিখতে হয়, হৃদয় ও মনোবৃত্তিগুলির চর্চ্চা করতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রকে কণ্ঠস্থ করে শিকেয় তুলে রাখলে চলে না। তাকে অন্যান্য পুস্তকের সংসর্গে এনে আয়ত্ত করতে হয়, বুঝতে হয়, জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয় এবং তজ্জন্য আবশ্যক হলে কিছু কিছু ত্যাগও করতে হয়। কারণ জীবন আমাদের কাছে শাস্ত্রের চেয়ে সত্য। 'জীবন নানা শাস্ত্রকে সৃষ্টি করে'—আজ আমাদের এই কথা ভাল করে বুঝে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করতে হবে। নতুবা এ জীবন সুন্দর ত হবে না, বরং ধর্ম্মজীবনও আমাদের গর্হিত হতে থাকবে।

কেহ কেহ বলেন, মাদ্রাসায় ছেলেরা অল্প খরচে লেখাপড়া শিখতে পায়। কথাটি ঠিক। কিন্তু একথা হয়ত আপনারা জানেন-'সস্তার তিন অবস্থা'। সস্তা জিনিষ সব সময়ই আক্রা। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর অনেকেই জায়গীর থেকে পড়েন। এই জায়গীরে যাঁরা থাকেন তাঁদের জীবন অতি কঠোর। কিন্তু জায়গীরে থেকে শিক্ষা লাভ করে তাঁরা যতটুকু লাভ করেন, আমার মনে হয়, তাঁরা তার দশগুণ বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হন। জায়গীরে থেকে গৃহ প্রভুর হুকুম তামিল ও সুনজর বজায় করতে করতে শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা যে দিন দিন কত হীন হয়ে পড়ে তা বলাই বাহুল্য। মাদ্রাসা শিক্ষার্থীর দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় তার জীবন কত ক্ষীণ, আকাঙ্ক্ষা কত দুর্ব্বল, সাহস কত কম, মুখ কত বিশীর্ণ! সমস্ত চেহারাতে যেন তাঁর দৈন্য ফুটে পড়ছে, জীবনের স্বাদ যেন তাঁর ফুরিয়ে গেছে—কোন বস্তুতেই যেন তার আর স্পৃহা নাই। এরূপ জীবস্মৃত হয়ে এই ঝঞ্ঝাপীড়িত সংসারে তাঁর পথ কেটে বের করতে হয়! কিন্তু সে পথ কাটতে যে শক্তির দরকার সে শক্তি অর্জ্জন করার শিক্ষা মাদ্রাসা হতে পাওয়া যায় না।

তারপর মাদ্রাসায় যেরূপ প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করা হয় তাহাও শিক্ষার্থীর মনোবিকাশের অনুকূল নয়। শৈশবেই মাতৃভাষার সহিত পরিচয় ঘটবার আগেই আরবী প্রাথমিক ও তার উর্দ্দু তর্জ্জমা কণ্ঠস্থ করতে করতে শিশুর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। আট/দশ বৎসর বয়সেই একটি বালককে তিনটি ভাষা পড়তে হয়, আরবী, উর্দ্দু ও বাংলা। তার দুই বৎসর পরই ইংরাজী তার উপর চাপে. বার বৎসর বয়সে তাকে চারটি ভাষার সহিত যুঝতে যুঝতে জুনিয়ার

www.pathagar.com

মাদ্রাসার সীমা অতিক্রম করতে হয়। তার পূর্ব্বেই এইরূপ নিষ্ঠুর পাঠ্যপদ্ধতির চাপে অনেককে শিক্ষা ক্ষেত্র হতে চিরবিদায় গ্রহণ করতে হয়। এই ব্যবস্থার বিহিত প্রতিকার সত্বর করা প্রয়োজন। নতুবা আর কিছু কাল পরে দেখব আমরা ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি বিভাগে চিরদিনের তরে গরহাজির হয়েছি। হিন্দু সম্প্রদায় উত্তরোত্তর নানা জ্ঞান আহরণ করে শক্তিমান হবে আর আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপে লুকিয়ে থাকব। জগতের সঙ্গে আমরা একেবারে যোগ হারিয়ে ফেলব। শুধু ইংরাজী ভাষা আমাদের রক্ষা করবে না। ইংরাজী ভাষার সঙ্গে ইংরাজী দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য প্রভৃতি গ্রহণ করতে হবে, হজম করতে হবে, তার উপর আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের যুগধর্ম্মসম্মত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে হবে। এজন্য আমাদের শিক্ষা একমুখী করতে হবে। কেমন করে করা দরকার তা ভাবতে হবে।

এখন আমি আমাদের শিক্ষা সমস্যার মাত্র একটি দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রয়াস পেয়েছি। এই সমস্যার অন্যদিক যথা স্ত্রীশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা এস্থলে করতে গেলে আপনাদের ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলব। এরই মধ্যে আপনাদের ধৈর্য্যের অনেকখানি পরীক্ষা হয়েছে।

উপসংহারে আমি এই বলতে চাই যে, আজ আমাদের সকল দুর্গতির কারণ হচ্ছে আমাদের আড়ষ্ট বুদ্ধি—অন্ধ বিশ্বাস, বর্ত্তমান জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এবং বর্ত্তমান জগতের জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কহীনতা। তার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকখানি দায়ী। মুসলমান সমাজের ঐক্য-সাধন বা একদিল করতে হলে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি একমুখী করতে হবে--জগতের সমস্ত বিদ্যা বর্ত্তমান জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে। আজ আমাদের সকল শুভ চেষ্টা আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিকে মুক্ত করতে নিয়োজিত হোক্।

www.pathagar.com

মুসলমানের আর্থিক সমস্যা

আনোয়ার হোসেন

বাঙ্গালী মুসলমানের আর্থিক সমস্যা অতি জটিল। ইহা আমাদের জীবন মরণেরই সমস্যা। মুসলমানের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থার কারণ, এর প্রতিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে সোজাসুজিভাবে দুই এক কথা বলিব।

বাংলার মত সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যামলা ভূমিতে বাস করিয়া বাঙ্গালী মুসলমান কেন যে নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারিতেছে না, এ প্রশ্নের মীমাংসা কে করে? বাংলার মাটিতে সোনা ফলে জানি। কিন্তু সোনার মালিক মুসলমান নয়। জমিদার-মহাজন সব গ্রাস করিয়া বসে। বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়ের রক্ত শোষণ করিবার এক অতি সুন্দর ব্যবস্থা। কৃষক সম্প্রদায়ের স্বচ্ছলতা বহুল পরিমাণে জমির বন্দোবস্তের উপর নির্ভর করে। ফ্রান্স, দেনমার্ক, আয়র্ল্যান্ড প্রভৃতি দেশের কৃষির উন্নতি তথাকার ভূস্বামী ও প্রজার মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান তার উপর অনেকখানি নির্ভর করে। বাংলার কৃষককে উচ্চহারে খাজনা দিতে হয়; কিন্তু গভর্ণমেন্ট এর কতটুকু পায়? জমিদার সম্প্রদায় Middle men রূপে মোটা ভাগটাই আত্মসাৎ করে। কর্ণওয়ালিসী বেদ-এর দোহাই দিয়া এরা আজ অচল ও অটল হইয়া বসিয়া আছে।

"Next to war, pestilence and famine the worst thing that can happen to a rural community is absentee bandlordism." (professor Carver) দুর্ভাগ্য বাংলাদেশেও এইরূপ absentee landlordism বিদ্যমান। কাজেই প্রজার অবস্থা যে কখনও স্বচ্ছল হইবে সে আশা সুদূর পরাহত। দেশের উপর এই যে ভীষণ অভিশাপ, ইহার কবল হইতে মুক্তি লাভের উপায় কি? এদেশে প্রজা ও জমিদারের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা মোটেই প্রজার পক্ষে গৌরবজনক নয়। 'Serfdom is the normal condition of their miserable existence and exhausting toil is their pitiful traseeb.'* বলিতে ইচ্ছা হয় যে, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোন সভ্যদেশের উপযোগী নয়।

জমির সঙ্গে যাহাদের রক্ত মাংসের সম্বন্ধ জমিতে তাহাদের স্বত্ব ও অধিকার আরও নিরাপদ, নিখুঁত করিতে হইবে। দুঃস্থ মুসলমান কৃষক সম্প্রদায়কে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে জমিদারের সঙ্গে তাহাদের সম্বন্ধ আরও দৃঢ় করিতে হইবে।

মুসলমান অমিতব্যয়ী। একথা অতি নির্ম্মল সত্য সন্দেহ নাই। অন্তর যাহাদের শুষ্ক সম্পদহীন ও অসুন্দর তাহারাই বাহিরে নিজেকে সুন্দর প্রতিপন্ন করিবার জন্য অতি ব্যস্ত। লোকে কি বলিবে এই ভয়ে আমরা এত জড়সড় হইয়া পড়িয়াছি যে, স্বপ্নাবিষ্টের মত কেবলই নিজেকে অন্যের চক্ষে বৃহদাকার প্রতীয়মান করিবার চেষ্টা করিতেছি। এরূপ ভণ্ডামী ও আত্ম-প্রবঞ্চনা আর কত দিন চলিবে? অন্যের চক্ষে ধূলি দিয়া নিজেকে বড় করিতে

---

* A. Hussan : Helots of Bengal [Peace]

www.pathagar.com

যাওয়া কত বড় মূর্খতা তাহা ভাবিবার প্রবৃত্তি আমাদের হয় কি? তারপর আমাদের অভিজাত সম্প্রদায়ের কথা। তাঁহারা আপন আভিজাত্যের গৌরবটুকু বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট পারিবারিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য অবহেলা করিয়া, অনায়াসে বাহ্য জাঁকজমকের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে পারেন। শহরে দেখিয়াছি, অন্তঃপুরের শৃঙ্খলার চেয়ে বৈঠকখানার শৃঙ্খলার দিকেই মনোযোগ দেওয়া হয় বেশী। ঘরের চাল, ডাল না থাকুক ক্ষতি নাই—কিন্তু বৈঠকখানায় চা, বিস্কুটের পারিপাটি খুব দেখিতে পাওয়া যায়। এভাবে দিন দিন আমরা ভ্রান্ত আত্মগৌরবের মোহে পড়িয়া নিজেকে জগতের চক্ষে অতি ক্ষুদ্র প্রতিপন্ন করিতেছি মাত্র। অনুভূতিহীন আমরা, শত আঘাতেও আমাদের চেতনার সঞ্চার হয় না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিতর আমরা নিজেকে গুটাইয়া রাখিতে চাই। জাতির অধঃপতনের এ সব পূর্ব্ব সূচনা নয় কি?

আমাদের standard of living আয়ের অনুপাতে অনেক উচ্চ। Sir P.C. Roy ১৯২৩ সনে দিনাজপুর জিলা কনফারেন্সে বলিয়াছিলেন, 'ময়মনসিংহ ও রাজশাহী প্রভৃতি জায়গায় সমস্ত বড় বড় জমিদারীগুলি হিন্দুর হাতে গেল কেন? মুসলমানেরা জমিদারী অচিরেই সব খেয়ে বসে থাকে। আমি কোলকাতায় দেখেছি, যে মুসলমান দিনে এক টাকা রোজগার করে সে পাঁচ সিকা খরচ করে। হিন্দু এক টাকা রোজগার করলে অন্তত চারি গন্ডা পয়সা জমাবে' ইত্যাদি—মুসলমানের বিরুদ্ধে এই যে অভিযোগ ইহার একটুকুও মিথ্যা নয়।

সময়ে অসময়ে মহাজনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা আমাদের একেবারে অভ্যাসগত হইয়া পড়িয়াছে। বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক ব্যাপারে তাহারা অযথা ব্যয় করে। অত্যধিক ঋণজালে জড়িত হওয়া অনেক সময় আর্থিক স্বচ্ছলতা ও গৌরবের লক্ষণ বলিয়া অনেকে মনে করে। আমাদের সমাজে দুইচারি জন জমিদার বা সম্পত্তিশালী ব্যক্তি যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের ঋণের দায় সমস্ত সম্পত্তির মোট মূল্যের চেয়েও অনেক বেশী।

আমাদের ব্যবসায় বুদ্ধি মোটেই নাই। আমাদের মধ্যে সততার বড় অভাব। ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিতে হইলে যে সব গুণ থাকা দরকার, তাহা অনেক মুসলমান ব্যবসায়ীর মধ্যেই দেখা যায় না। পরস্পর বিশ্বাস, সরলতা, কর্ম্মদক্ষতা ইত্যাদি গুণের অভাবে মুসলমান আজ কোন কারবারেই শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারিতেছে না। যে সব কারবারে হাজার হাজার টাকার দরকার তথায় দশজন মুসলমান একত্র হইয়া মূলধন সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না।

মুসলমান ছোট খাটো দোকানদার অভদ্র। অবশ্য এর যে ব্যতিক্রম নাই আমি তা বলি না। ক্রেতা দোকানদারের নিকট কেবল জিনিষটাই আশা করে না, একটু সৌজন্য ও মধুর ব্যবহারও চায়। কিন্তু শহরে কিংবা মফঃস্বলে কোথাও মুসলমান দোকানে দোকানদার-সুলভ ভদ্রতা, আপ্যায়ন, সৌজন্য কিংবা সততা পাওয়া যায় না। এ অপ্রিয় সত্য আজ আমাদিগকে মাথা পাতিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

মুসলমানের সম্পত্তি বণ্টন ব্যাপারে পুরা democracy রাজত্ব করে। ইসলামিক দায়ভাগ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়াই সকলের ধারণা। কিন্তু ইহা দ্বারা পৈত্রিক সম্পত্তিতে এত অসংখ্য অংশীদারের স্থান করিতে গিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সম্পত্তি উড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটা কথা আছে যে, মুসলমানের সম্পত্তি খরিদ করিতে যাওয়ার অর্থ মোকদ্দমার সৃষ্টি করা। বিরাট জমিদারী অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া শূন্যে

www.pathagar.com

মিশিয়া যায়। সম্পত্তির যাহারা ভাবী উত্তরাধিকারী তাহারা স্বভাবতঃই সম্পত্তির লোভে বা আশায় নিশ্চিন্ত, নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকিয়া দিবাস্বপ্ন দেখে। সাধনা করিয়া যে জীবনকে নানা দিক দিয়া সুন্দর ও সম্পদশালী করিয়া তুলিতে হইবে এ কথা তাহারা ভাবিয়াও দেখে না। Democracy জিনিষটা আপাতদৃষ্টিতে সুন্দর বলিয়া মনে হয়। Politics-এর ক্ষেত্রে এর চোখ রাঙ্গানীতে সকলে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এ যে মানুষকে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সুখী ও শান্ত করিতে পারিবে না—তাহার লক্ষণ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। মুসলমানের সম্পত্তি বণ্টন ব্যাপারে democracy-র এই আদর্শ আরও ছোট করিলে কী দোষ হয়?

মুসলমানের সম্পত্তিতে কখন ত উত্তরাধিকারীর অভাব পড়িয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কাজেই অতি নিকট উত্তরাধিকারীর অভাবে যদি কেহ স্বীয় সম্পত্তি কোনও সামাজিক সদনুষ্ঠানে অর্পণ করিতে চায়, তাহা কদাচিত সম্ভবপর হয়। এই democracy অযথা ধ্বংসকর মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র।

এস্থলে শিক্ষা সমস্যার কথাও উল্লেখ করিতে হয়। অবশ্য বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতি যে বাঙ্গালীকে unemployment problem-এর সম্মুখীন করিয়াছে একথা হিন্দু মুসলমান উভয়ের বেলায়ই প্রযোজ্য। কিন্তু মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা আরও একটু জটিল। মাদ্রাসাগুলি মাত্র একদল ভিক্ষুকের সৃষ্টি করিতেছে। পরের গলগ্রহ হইয়াই এদের জীবন নির্ব্বাহ করিতে হয়। ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং ও অন্যান্য technical শিক্ষার দিকে আমাদের ঝোঁক মোটেই পড়িতেছে না। গ্রামের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত অভিভাবকগণ ছেলেকে মাদ্রাসা পাশ করাইতে পারিলেই নিজেকে ধন্য মনে করেন।

সমাজে ভিক্ষুকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। সবল স্ত্রী, পুরুষ কেবল কর্ম্মবিমুখতাবশতঃই নীচ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন। এদের watch word হইল সংসার অস্থায়ী, সাংসারিক উন্নতির জন্য অতি বাড়াবাড়ি করিয়া লাভ কি? এই যে তাহাদের বুক ভরা সন্তোষের ভাব, একে দমাইয়া দেয় কার সাধ্য? সমাজের রক্ত এরা পরগাছার মত শোষণ করিতেছে। সামাজিক ধনসম্পদের এক অতি মূল্যবান অংশই এরা গ্রাস করিয়া বসে।

Charity-র অজুহাত দিয়া অনেকে এদের এ নীচ কাজে উৎসাহ দিতে পারেন বটে, কিন্তু Charity-র উপর এদের একটা জন্মগত অধিকার আছে মনে করিয়াই যেন এরা আজ কর্ম্মহীন, উদ্যমবিহীন, নীরস পশুজীবন যাপন করিতেছে। ভিক্ষাবৃত্তিকে যথাসম্ভব দমন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আমরা এদিকে সমাজ-সংস্কারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

তারপর সুদের কথা। ইসলামী শরিয়ত সুদের আদান প্রদান নিষেধ করিয়াছে। কিন্তু এ যুগে আমরা অন্য জাতিকে সুদ দিয়া পরিপুষ্ট করিতেছি, কিন্তু সুদ গ্রহণ করা যায় কিনা তাহা লইয়াই আমরা তর্ক করিয়া মরিতেছি। এ বিংশ শতাব্দী বিরাট শিল্প-কারখানার যুগ। তেরশত বৎসর আগে দুনিয়াটা যেখানে ছিল, আজ আর সেখানে বসিয়া নাই। সভ্যতার গতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের ধারা, রীতিনীতি প্রভৃতি সবই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মুসলমানও যে বাংলাদেশে বাস করিয়া পরিবর্ত্তন চায় না, কে বলিবে? বর্ত্তমান যুগের অর্থনীতি শাস্ত্র জোর গলায় বলিতেছে, মূলধনের জন্ম দিতে হইলে সুদ প্রথারও প্রশ্রয় দিতে

www.pathagar.com

হইবে। কারণ বিপুল মূলধন ব্যতীত উৎপাদনের ক্ষেত্রে দ্রুতগামী দুনিয়ার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যায় না। সুদের নাম শুনিলেই আমাদের গা শিহরিয়া উঠে। সুদের গন্ধও আমরা সহ্য করিতে পারি না।

সেভিংস ব্যাংকের সুদ পর্য্যন্ত অনেকে গ্রহণ করিতে চান না। জীবন-বীমা আমরা সমর্থন করি না। এসব ক্ষেত্রে আমরা অতি মাত্রায় উদাসীন। কিন্তু বেশী দিন উদাসীন থাকিলে জীবন বাঁচান দায় হইবে। বর্ত্তমান জগতের উপর Banking system-এর প্রভাব খুব বেশী। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে সুদের গন্ধ আছে বলিয়া মুসলমান সেদিকে ঘেঁষিতেছে না। আমাদের সমাজে সঞ্চিত টাকা নাই বলিলেই হয়। আর যাহাদের আছে তাহারাও টাকা ভূগর্ভে প্রোথিত বা বাক্সে ভরিয়া রাখা বা নানারূপ কুকাজে উড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন কাজে টাকা খাটাইবার সুযোগ বা সুবিধা করে না। তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, সমাজের ভিতর সুদপ্রথা অতি সঙ্গোপনে স্বীয় স্থান দখল করিবার আয়োজন করিতেছে। সুদের কবলে পড়িয়া দুঃস্থ কৃষক নিজের বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত হিন্দু মহাজনের হাতে তুলিয়া দিতেছে। কৃষকরূপে টিকিতে হইলে মুসলমানকে ঋণ গ্রহণ করিতেই হইবে। বর্ত্তমান জগতের অর্থনৈতিক ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া টিকিতে হইলে আজ মুসলমানকে সুদ সমস্যার মীমাংসা আশু করিতে হইবে।

মুসলমানকে সাংসারিক স্বচ্ছলতার দিকে আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হইবে। আমাদের সাংসারিক বুদ্ধি যথাযোগ্য পরিপক্ক নয়। যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিজকে নূতন আবহাওয়ার উপযোগী করিয়া লইতে পারিতেছে না। কুসংস্কার ও সামাজিক অন্যায় প্রথা এখনও তাহাদের জীবন অনেকখানি ধ্বংসের পথে টানিতেছে। আভিজাত্যাভিমান মুসলমানকে পুরাদমে পাইয়া বসিয়াছে। চামরার কারবার নাকি ভদ্র মুসলমানের নিকট ঘৃণ্য। পল্লীগ্রামের অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে একজন চর্ম্ম, ব্যবসায়ী খাঁটি মুসলমানের স্থান সমাজে অনেকখানি নিম্নে। হিন্দু সমাজকে আমরা বরাবর জাতি বিচারের জন্য নিন্দা করিয়া আসিয়াছি ; কিন্তু আজ মুসলমান সমাজও caste system-এর চাপে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। একটা জাতির সামাজিক জীবন ও আর্থিক জীবন খুব ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। আমাদের সামাজিক জীবনে বহু দোষ ঢুকিয়াছে। কাজেই অর্থ সম্পর্কেও আজ আমরা বড় হইতে পারিতেছি না।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

বার্ষিক সম্মিলনের বিবরণ

বিগত ২৭শে ফেব্রুয়ারী রবির বেলা ১২টায় 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মুসলিম হল আয়তনে এক বিরাট সাহিত্য মজলিস বসেছিল। মজলিসের বিস্তৃত কার্য্যসূচী অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায়, ৮শে ফেব্রুয়ারী সোমবার প্রাতেও সাড়ে সাত হতে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত মজলিসের কাজ চালাতে হয়েছিল। এই মজলিসে আমাদের 'সমাজে'র বার্ষিক বিবরণীটি পঠিত হয়েছিল। সাধারণতঃ প্রত্যেক অনুষ্ঠানের বার্ষিক অধিবেশনে নববর্ষের জন্য নির্ব্বাচন কার্য্যও গত বৎসরের কার্য্যবিবরণী পাঠ—দুইটি একসঙ্গে হয়ে থাকে। কিন্তু আমরা উক্ত মজলিসে নির্ব্বাচন কার্য্যটি সমাধান করতে পারিনি। আশা করি তার জন্য কৈফিয়তের কোন প্রয়োজন হবে না।

'সাহিত্য সমাজে'র বার্ষিক উৎসবে চতুর্দ্দিক হতে সাহিত্য প্রাণ ব্যক্তিবর্গ এসে যোগ দিয়ে মজলিসের সৌন্দর্য্য ও গৌরব বর্দ্ধন করেছিলেন। এই মজলিস দেখে অন্য সম্প্রদায়ের কোন এক ব্যক্তি বলেছেন, 'মুসলমান সমাজে সাহিত্যের এত বড় আসর সম্ভবপর হতে পারে, তা আমরা কখনও ধারণাও করতে পারতাম না। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে, মুসলমান সমাজে প্রাণের সঞ্চার হয়েছে।' এই উক্তি হতে বুঝতে পারা যাবে যে, বার্ষিক সম্মিলনটি আমাদের বেশ জমেছিল এবং উৎসবটিও একটু ঘটা করেই করা হয়েছিল। সর্ব্বপ্রথম সম্মিলনের কার্য্য আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বেই বিস্তৃত কার্য্যসূচী দেখে অধ্যাপক আবদুল হাকিম সাহেব একটু আপত্তি উত্থাপন করেন। সূচী অনুসারে কোরান আবৃত্তির পর একটি গান গাওয়ার দরকার ছিল। কিন্তু গান দ্বারা কোরানের অবমাননা হতে পারে এই ভয়ে গানটি একটু দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। সুতরাং অধ্যাপক সাহেব যথাসময়ে 'আলকমর' সুরার একরুকু আবৃত্তি করতে শুরু করলে সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হয়ে কোরাণের 'তাজিম' বজায় করেন। আবৃত্তির মধুর সুর থেমে যেতেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মুসলিম হলের প্রভোস্ট মিঃ এ. এফ, রহমান তাঁর অভিভাষণ পাঠ করতে উঠে কার্য্যসূচীর পরিবর্ত্তন ঘোষণা করেন। অভিভাষণ পাঠ করে তিনি সম্মিলনের সভাপতি খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ সাহেবকে তাঁর আসন গ্রহণ করতে আহ্বান করেন। সভাপতি সাহেব আসন গ্রহণ করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি উদ্বোধন সঙ্গীতটি গাইতে লাগলেন।

গান থামলে মুন্সীগঞ্জের মোক্তার মুনশী হাবিবুল্লা সাহেব তাঁর আবাহন কবিতাটি পাঠ করেন। তখন সভাপতির অভিভাষণ এবং আমাদের 'সমাজে'র কার্য্যবিবরণী পঠিত হয়। তারপর মৌলবী আক্কাস আলী খাঁ সাহেব 'অনাদি অনন্ত' এই গানটি গাইতে থাকেন—এবং গান

www.pathagar.com

শেষে হলে শ্রীমান আনোয়ারুল হক তাঁর সেতার শুনিয়ে দেন। তখন জোহরের নামাজের জন্য পনর মিনিট অবকাশ দেওয়া হয়। পুনরায় ২-১৫ মিনিটের সময় মজলিসের কাজ শুরু হয়।

প্রথমেই একটি গান ছিল। কিন্তু নমাজের পরই গানটি কারো কারো মতে কেমন খারাপ লাগে বলে গানটি কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়। তখন অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব জলদগম্ভীর সুরে তাঁর 'সাহিত্য সমস্যা' প্রবন্ধটি পাঠ করেন। প্রতি শব্দ যেন মর্ম্মে গিয়ে পৌঁছছিল। সারা মজলিস নীরবে তাঁর কবিত্বপূর্ণ শব্দ লালিত্যে মুগ্ধ হয়েছিল। তাঁর প্রবন্ধ শেষ হলে অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি তাঁর কোমল মধুর কণ্ঠে 'মোর বীণা উঠে কোন সুরে' গানটি গাইতে লাগলেন। এতে মজলিসের আনন্দ বেশ জমে উঠেছিল। গান থামল, আর অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব তাঁর 'সঙ্গীত চর্চ্চায় মুসলমান' প্রবন্ধ পাঠ করতে আহূত হন। প্রবন্ধটি শুনে মজলিসের সকলই একবাক্যে তাঁর সিদ্ধহস্তের ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন। তাঁর প্রবন্ধে গবেষণা, অনুসন্ধান ও প্রাঞ্জল ভাষা একাধারে বিদ্যমান। এরই মধ্যে সাড়ে তিনটা বেজে গেল। তখন কার্য্যসূচীর ধারাবাহিতা উপেক্ষা করে সভাপতি সাহেব অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদির সাহেবকে তাঁর 'সামাজিক গলদ' নামক তীব্র প্রবন্ধটি পাঠ করতে আহ্বান করেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধ পড়তে শুরু করলে কিছুক্ষণ পরই মজলিসের চতুর্দ্দিক হতেঁ একটি অসহিষ্ণুতা ও চাঞ্চল্যের ভাব দেখা যেতে লাগল। প্রমাদগুণে সম্পাদক সভাপতির ফরমান নিয়ে পাঠককে তার প্রবন্ধটি সংক্ষেপ করতে অনুরোধ করেন। প্রকৃতপক্ষে, নামানুসারে প্রবন্ধটি নানা অপ্রিয় সত্যের দৃষ্টান্তে পূর্ণ ছিল। লোকসমাজে সদরে দাঁড়িয়ে এমন করে টানা সোজা উলঙ্গ ভাষার আমাদের সমাজের অন্তরালে লুক্কায়িত নানা অপ্রিয় ব্যাপার সম্বন্ধে খুলে বলবার দুঃসাহস দেখিয়ে কাজী সাহেব মজলিসের বিরাগভাজন হয়েছিল বটে, কিন্তু এই দুঃসাহসের পরিণাম একদিন সুখকর হবেই। কারণ এতে আমাদের সমাজের সারথিগণ হয়ত সত্বরই ঐ সমস্ত সামাজিক রোগসমূহের প্রতিকার বা নিরাময় করবার জন্য বদ্ধপরিকর হবেন।

কাজী সাহেব তাঁর প্রবন্ধ শেষ করবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সভাগৃহে উপনীত হন। প্রবন্ধের অপ্রিয় কথা শুনতে শুনতে মজলিস অনেকটা উগ্র হয়ে উঠেছিল। ঠিক সেই সময় কবির আগমনে চাঞ্চল্যটা কথঞ্চিৎ কমে গেল। সেই অবসরে লেখক তাঁর বক্তব্য শেষ করে ফেললেন। তখন কবি সম্মিলনের সভাপতির সম্বর্দ্ধনার উদ্দেশ্যে রচিত 'খোশ্ আমদেদ' নামক গানটি গাইতে বসে গেলেন। গানের ভাব ও ভাষায় মজলিস নিতান্ত মুগ্ধ হয়েছিল। গান শেষ হলে সভার কার্য্য আসরের নমাজের জন্য পুনরায় বিশ মিনিট কাল স্থগিত রাখা হল। এই অবসরে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ হতে নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণের অভ্যর্থনাকল্পে যে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগের আয়োজন করা হয়েছিল তা সম্পন্ন করা হল।

পুনরায় ৫-১০ মিনিটের সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। তখন মৌঃ রকীব উদ্দীন আহমদ তাঁর 'আর্থিক সমস্যা' পাঠ করতে আহূত হন। তার কণ্ঠস্বর মৃদু ও তত উচ্চ না হওয়ায় তিনি মজলিসের মনোযোগ ধরে রাখতে পারেন নাই। তাঁর পড়া শেষ হলে শ্রীমান মুহম্মদ সেরার

www.pathagar.com

'মানের আসন, আরাম শয়ন' গানটি গাইলেন। তারপর শ্রীমান শামসুল হুদা তার 'হজরত মুহম্মদের প্রতিভা' এবং মৌঃ আবদুর রশীদ সাহেব তাঁর 'আমাদের নবজাগরণ ও শরিয়ত' প্রবন্ধ পাঠ করেন। তখন সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। মগরিবের ওয়াক্ত খুব নিকট। সভাপতি সাহেব তখন পরদিন প্রাতের জন্য বাকী প্রবন্ধগুলি রেখে দিয়ে সমালোচনার জন্য মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলি সাহেবকে আহ্বান করেন। সৈয়দ সাহেব ভূয়সী প্রশংসা ও শত আশীর্ব্বাদ করে তাঁর বক্তব্য শেষ করলে কাজী নজরুল তাঁর গজল গেয়ে সেদিনকার মত সভার কার্য্য 'মধুরেন সমাপয়েৎ' করেন।

পরদিন প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় কাজী নজরুলের গজল দিয়ে সভা উদ্বোধন করা হয়। গজলের পর কবি নিজে তাঁর নূতন কবিতা 'খালেদ' আবৃত্তি করেন। শুনতে পাওয়া যায় এই আবৃত্তিতে কয়েকজন স্থিতিশীল মৌলভী সাহেবের চোখ দিয়ে নাকি অশ্রু বের হয়েছিল। যাহোক, 'খালেদ' কবিতাটি যে সার্থক হয়েছে তা কবির আবৃত্তির দ্বারাই অনেকখানি প্রমাণিত হয়েছে। আবৃত্তি শেষ হলে শ্রীমান আনোয়ারুল হক তাঁর সেতার শুনিয়ে দেন। তখন সম্পাদকের ডাক পড়ে। তিনি তাঁর শিক্ষাসমস্যা' প্রবন্ধ পাঠ করতে শুরু করেন। শুনা যায় মাদ্রাসাপন্থীরা বিষম চটে গিয়েছেন। তারপর মৌলভী আবদুস সালাম খাঁ তার নাট্যাভিনয় ও মুসলিমসমাজ' নামক প্রবন্ধটি পড়তে লাগলেন। তাঁর প্রবন্ধ শুনে কেউ বিশেষ চটেছেন বলে মনে হয় না। তবে কেউ কেউ বলেছেন, 'তাও কি সম্ভব'। মেয়ে সেজে রঙ্গমঞ্চে নাচাকুঁদা কি জায়েজ ? একেবারে হারাম, নাউজবিল্লাহ।' এর মধ্যে সাড়ে নয়টা বেজে যায়। অগত্যা সময়াভাবে আরও পাঁচটি প্রবন্ধ পঠিত বলে গৃহীত হয়। এ সমস্ত প্রবন্ধ ও আলোচনা 'সমাজে'র কর্মী সংসদ 'শিখা' নাম দিয়ে একটি বার্ষিক সংখ্যায় মুদ্রিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন। ইহাতে প্রায় দুইশত টাকারও অধিক ব্যয় হবে। এ টাকার জন্য 'সমাজের' সমবেত চেষ্টা আবশ্যক।

কার্য্যসূচীর ধারা অনুসারে সমালোচনার জন্য অধ্যাপক আবদুল হামিদ সাহেব আহূত হন। তিনি বিস্তৃত কার্য্যসূচীর একটু সমালোচনা করে 'মজজিদের সম্মুখে বাদ্য' সম্বন্ধে তাঁর মত ঘোষণা করেন। তিনি যুবকদিগের কাজের জন্য আহ্বান করেন—'ইসলাম কাজ চায়— খোদাই মুসলিমের উদ্দেশ্য'—এই কথা কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি বাংলায় বক্তৃতা করেছিলেন। এটা সাহিত্য সমাজের' একটা কৃতিত্ব বলতে হবে।

দ্বিতীয় সমালোচক মৌলভী আবদুর রব চৌধুরী সাহেব। তিনি বলেন, 'ওদুদ সাহেব যা বলেছেন তা খাঁটি কথা ; কিন্তু সাহিত্য তৈরী করতে হবে আগে, সেজন্য ইসলাম ধর্ম্মকে ছাড়লে চলবে না। এখানে যে সমস্ত প্রবন্ধ পঠিত হয়েছে তাতে দেখতে পেয়েছি সকলেই ধর্ম্ম নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে চেয়েছেন। কিন্তু ধর্ম্মের উপর আঘাত করলে চলবে না। তিনি 'শিক্ষা সমস্যা' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন, 'লেখক কোন প্রোগ্রাম দেন নাই। মাদ্রাসারও অনেক উপকার আছে।'

তৃতীয় সমালোচক মৌলভী মোখতার আহমদ সিদ্দিকী (মক্তব সাব ইন্‌স্পেক্টর)। তিনি তাঁর পকেট হতে কাগজের তাড়া বের করতেই সভাপতি সাহেব শংকিত হয়ে তাঁকে সতর্ক করে দেন যেন তিনি বেশী সময় না নিতে পারেন। তিনি তাঁর তাড়া তুলে ধরে বলেন, 'আমি এখানে নানা দলিল দিয়ে প্রমাণ করেছি যে, না বুঝে ধর্ম্ম করা আর না করা একই কথা।

www.pathagar.com

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে জোর গলায় বলতে পারি যে, মুসলমানের ধর্ম্ম নাই তার জীবন নিতান্ত কুৎসিৎ।'

চতুর্থ সমালোচক আমাদের তরুণ অধ্যাপক মৌলভী মমতাজুদ্দীন আহমদ। তিনি খুব উচ্চকণ্ঠে মাদ্রাসা শিক্ষাও না বুঝে ধর্ম্মশিক্ষার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, 'আমরা আরবী, ফার্সী, উর্দ্দু প্রভৃতি বিজাতীয় ভাষার চাপে একেবারে রসাতলে যাচ্ছি। এর একমাত্র উপাদ মাদ্রাসাগুলি তুলে দেওয়া। নতুবা আমাদের বুদ্ধি বলুন, জ্ঞান বলুন, অর্থ বলুন, মুক্তি বলুন, কিছুই সম্ভবপর হবে না।'

এই সময় কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব উঠে বলেন, 'আজ আমি এই মজলিসে আমার আনন্দ বার্ত্তা ঘোষণা করছি। বহুকাল পরে কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়েছে। আজ আমি দেখছি এখানে মুসলমানের নূতন অভিযান শুরু হয়েছে। আমি এই বার্ত্তা চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করে বেড়াব। আর একটি কথা—এতদিন মনে করতাম আমি একাই কাফের কিন্তু আজ দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম যে, মৌলভী আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ কতকগুলি গুণী ব্যক্তি দেখছি আস্ত কাফের। আমার দল বড় হয়েছে এর চেয়ে বড় সান্ত্বনা আর আমি চাই না।'

অতঃপর দশটা বেজে গেল। সভাপতি সাহেব তখন তাঁর উপসংহার আরম্ভ করেন। তিনি বলেন, আজ দুইদিন ধরে আমরা এখানে বস্তা বস্তা ময়লা কাপড় ধুয়েছি। মাঝে মাঝে এরূপ করে ময়লা পরিষ্কার না করলে সমাজের মন-রুদ্ধ হয়ে যায়। এতে আমাদের দুঃখ ও ক্ষতি নাই। ঘরে আবর্জ্জনা জমলে যেমন নিষ্ঠুর হস্তে সম্মার্জ্জনী দিয়ে ঘরটি বেশ করে ঝাঁটিয়ে দেওয়া দরকার—তেমনি সমাজে আবর্জ্জনা জমলে ঐরূপ নিষ্ঠুরভাবে ধুয়ে ফেলা দরকার। আজ আমরা যে ভাঙতে চেয়েছি বিদ্রোহী হয়ে ভাঙ্গতে চাচ্ছি সেটা শুভ লক্ষণ মনে করতে হবে। আমাদের মনে ঐ ময়লা আবর্জ্জনা দূর করবার স্পৃহা জেগেছে। কিন্তু বন্ধুগণ, শুধু ভাঙলে চল্‌বে না, গড়তেও হবে। আমাদের আজ সৃষ্টি করতে হবে নব নব উদ্ভাবনা জাগুক ও নব নব চেষ্টা আমাদের হোক্। আজ আপনারা প্রতিশ্রুত হয়ে গৃহে ফিরে যান যে, 'আমরা সৃষ্টি করব' আজ যদি জগতের সঙ্গে মেলামেশা করে জগদবাসী হয়ে গৌরব অর্জ্জন করতে চাই, তবে আমাদের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে। আমাদের ইচ্ছা নব সৃষ্টিতে লাগাতে হবে। নতুবা শুধু ভেঙ্গেই গেলে লুপ্ত হয়ে যেতে হবে। আর আমাদের ঘুমুলে চলবে না—

তাই খোদার কাছে প্রার্থনা করি—'আপনারা বড় হোন। আপনারা আমাদের এই আসন গ্রহণ করুন। আমাদের চেয়ে বড় হেন। ইসলামকে নব মন্ত্রে নব সৃষ্টি দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্পদশালী করুন।'

অবশেষে ধন্যবাদ দিতে উঠে জনৈক আগন্তুক কতকগুলি অবান্তর কথা বলে মজলিসের বিরক্তিভাজন হয়েছিলেন।

কবি নজরুল ইসলাম তখন গজল গেয়ে এই বৎসরের মত মজলিসের সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

এস্থলে বার্ষিক উৎসবের আয়োজন কিরূপে হয়েছিল তার কিছু আভাস লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন মনে করি। 'সমাজে'র কর্মী-সংসদ একদিন হঠাৎ প্রস্তাব করলেন যে, এবার 'সমাজে'র বার্ষিক অধিবেশন ঘটা করে করতে হবে। তার জন্য স্থানীয় সাহিত্য-সুহৃদ

www.pathagar.com

জনমণ্ডলীর সহানুভূতি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। তখন একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করতে মতলব আঁটা গেল। এতদিন সাহিত্যচর্চ্চা অলিগলিতে নিবদ্ধ ছিল। এখন সমাজের সর্ব্বপ্রকার লোককে 'সাহিত্য সমাজে'র অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন মনে করে কমিটি মি. এ. এফ. রহমানকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করার প্রস্তাব করেই তাঁর সম্মতি গ্রহণ করেন এবং তাঁকে বাঙ্গলা ভাষায় তার অভিভাষণ লেখার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি স্বীকৃত হলে কমিটি তখন সোৎসাহে অন্যান্য গণ্যমান্য সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গকে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য করতে ছুটাছুটি করেন। অনেকেই প্রতিশ্রুতি দিলে—সম্মিলনের সভাপতির জন্য কমিটি মাথা ঘামাতে লাগলেন। ঢাকার বাইরে কারও কথা চিন্তা করা অর্থাভাবে অসম্ভব হয়েছিল। অগত্যা স্থানীয় সাহিত্যানুরাগী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কমিটির মনোযোগ নিবদ্ধ হল। অনেক কষ্টে খাঁন বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ সাহেবকে হাত করা গেল। তখন বাংলার সর্ব্বত্র আহ্বান পত্র পাঠান হ'ল। সাহিত্য 'সমাজ'কে এই সুযোগে বাংলার সুপরিচিত সাহিত্যিকের সহিত পরিচিত করে তোলা হয়েছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের চাঁদার উপরই সম্মিলনের সমস্ত কাজ নির্ভর করেছিল—একশত নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়ের জন্য কিছু জলযোগেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। সম্বলহীন 'সমাজে'র পক্ষে এরূপ প্রোগ্রামে হাত দেওয়া নিতান্ত দুঃসাহসের কাজ বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু পরে আমরা বুঝতে পেরেছি আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে খোদা সে ইচ্ছা পূর্ণ করেন।

এই সুযোগে কমিটি 'সমাজে'র তরফ থেকে কবি কাজী নজরুল ইসলামকে একটি অভিনন্দন দেওয়ার মতলবও এঁটে তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তিনি একখানি সুন্দর পত্র* লিখেছিলেন। অভ্যর্থনার সমস্ত আয়োজনের জন্য অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক কাজী আবদুর রশীদ সাহেব সম্পূর্ণরূপে দায়ী। তাঁর চেষ্টা ও যত্ন না থাকলে আমাদের বার্ষিক উৎসব এত ঘটা করে করা সম্ভবপর হ'ত না।

এজন্য আয়ব্যয়ের যে হিসাব তিনি দিয়েছেন তা এই :

জমা			খরচ
অভ্যর্থনা সমিতির		অভ্যর্থনা সমিতি গঠন	
সভ্যগণের ফি	১০৬	জন্য গাড়ী ভাড়া	২
ডেলিগেট ফি	৮	বিজ্ঞাপন ও চিঠির কাগজ	২
সম্পাদক	১২৸৶	আহ্বান–লিপি ছাপান	৩
খাঁ বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ	২৫		
	১৫১৸৶	স্ট্যাম্প	২৸৵
		লেফাফা	৸
		সম্মিলনের আয়োজন,	
		অভ্যর্থনা ইত্যাদি খরচ	৩৩৶
		চাঁদার জন্য গাড়ী ভাড়া	২
		অর্গান আনা ও পাঠান খরচ	১

* পৃষ্ঠা ২৬৮, ২৬৯, ২৭০

www.pathagar.com

*দ্রষ্টব্য — অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের ও ডেলিগেটদের নাম মুদ্রিত করা গেল

নিমন্ত্রণ পত্র ছাপান খরচ	২॥.
চিঠির কাগজ	॥৶.
লেফাফা	॥.
অভ্যর্থনা সমিতির অভিভাষণ ছাপান	৬॥.
ঐ কাগজ	২৸.
ফুলের তোড়া ও মালা	৩৲
জলযোগের জন্য খরচ	৪৬৸৶.
পান	৵.
ডেলিগেটের আহার	৪৲
সভাগৃহ সাজান ইত্যাদির জন্য মুটে খরচ	৬৴.
সভাপতির অভিভাষণ ছাপান খরচ	২৫৲
বিস্তৃত কার্য্যসূচী ছাপান	৭৲
	১৫১৸৶.

সম্পাদক

www.pathagar.com

[সম্পাদকের নিকট লিখিত]

কলেজিয়েট স্কুল, ঢাকা
২/২/২৭

প্রীতিভাজনেষু—
আপনার কল্যকার পত্র পাইয়াছি। আপনাদের প্রদত্ত সম্মান আমি মাথায় করিয়া লইতাম যদি আমার তাহা পাইবার এতটুকু যোগ্যতাও থাকিত। আপনারা বন্ধু, তাই আপনাদের এরূপ ভুল হইয়াছে। বন্ধুকে কি কেহ ছোট দেখে? তাই বলিয়া সাধারণের উপর এত বড় একটা অবিচার হইলে তাহা সকলে নির্ব্বিকার চিত্তে গ্রহণ করিবে কেন? আপনাদের উৎসবে আমি যোগ দিব, আনন্দ উপভোগ করিব। আমাকে এরূপ নিষ্ঠুরভাবে সে আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিবেন কেন? সভাপতি হওয়া কি আমাকে সাজে? আমি যে সাহিত্যের প্রাঙ্গণেও কোনদিন ঢুকিতে সাহস করি নাই, মন্দিরে প্রবেশ করা ত বহু দূরের কথা। আপনাদের উৎসব জয়যুক্ত হউক, কিন্তু আমাকে পুরোহিত করিবেন না। আমার ও পেশাও নয়, উহাতে আমার আসক্তিও নাই।

আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী

তসদ্দুক আহমদ

[সম্পাদকের নিকট লিখিত]

প্রিয় আবুল হুসেন সাহেব,

কৃষ্ণাগনর
১০–২–২৭

আপনার সাদর আমন্ত্রণ–লিপি নব ফাল্গুনের দখিন হাওয়ার মতই খুশ্ খবরী নিয়ে এসেছে। আমার শরীর জ্বরের উপর্য্যুপরি আক্রমণে জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছে। তাই মন আমার এ আনন্দ বার্ত্তা পেয়ে যত হাল্‌কাই হয়ে উঠুক, শরীর হয়ত তেমন হাল্‌কা হয়ে উঠতে পারছে না। আমার শরীর যদি এমনি ভারী হয়ে থাকে আর কিছুদিন, তা হ'লে এর ভার কোনো রেলগাড়ীই বইতে সমর্থ হবে না। আমার বর্ত্তমান অভিভাবক জ্বর, তারই আদেশের প্রতীক্ষা করছি।

বসন্তের হাওয়া জ্বরা ও জ্বর সইতে পারে না। তাই আশায় বসে আছি, কখন আসবে দখিন হাওয়া—আসবে আমার রোগ শয্যায় ফুলের আমন্ত্রণ–লিপি।

আপনাদের আনন্দ মহ্‌ফিলে আমার বাঁশী যদি নাই বাজে, তা হলেও আপনাদের খুশীর 'জাম' অপূর্ণ থাকবে না। ঢাকার অতগুলি কচি–কিশোরের কচি কণ্ঠের সুরে সুরে আপনাদের সুর লোক মস্‌ত্ হয়ে উঠবে। এ আমি অত্যুক্তি করচি নে।............ আপনাদের উৎসব দিনের

www.pathagar.com

'মুত্‌রিব' হবার গৌরব আমায় দিতে চান, কিন্তু যে গান আমি গাঁথব, তার সুর যে আপনাদের মনের বেণুকুঞ্জে। কোন আনন্দ-মাণিক আপনাদের উৎসবের মালার মধ্যমণি কোন বেদনা-সুন্দর এর দেবতা, কোন প্রকাশোন্মুখ অন্তরে এর পূজা-বেদী-এর আভাস না পেলে আমি কি করে আগমনী গান রচনা করি? যদি আমাকেই গাইতে হয় এ আনন্দ জলসার আগমনী, তা হ'লে আপনাদের উৎসবের অন্তরের কথা—যাকে কেন্দ্র ক'রে সুর লক্ষ্মীর নৃত্য চলবে—শীগ্‌গীর জানাবেন।

আর, আমার বাণী? তার প্রকাশ কি শোভন হবে আপনাদের নৌরোজের মজলিসে? আমার সরস্বতী অশ্রুমতী,—বেদনা-শতদলে তার চরণ। যুগযুগান্তরে অশ্রুর অঞ্জলি এসে পড়ছে তাঁর পায়ে। এ ক্রন্দসীর গান শুধু একটানা ক্রন্দন। আনন্দ-উৎসবের নৌরাতির দীপ শিখা নিভে যায় এর হতাশ্বাসে। তবু হয়ত সে দুঃস্বপ্ন দেখার মত সুন্দরের নেশায় আনন্দ গান গেয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। চোখের জলে ধোওয়া সে সুর। বেদনায় রাঙা সে হাসি। আমার বাণী শিল্পীর বাণী নয়, আমার বাণী বেদনাতুরের কান্না। আমার সুরলক্ষ্মী স্বর্গের উর্ব্বশী নয়, মর্ত্তের শকুন্তলা-বিরহ-শীর্ণা অশ্রুমুখী পরিত্যক্তা শকুন্তলা, উৎপীড়িতা লায়লি। আপনি আমার লেখা পড়ে মনে করছেন, হয়ত আবার আমার জ্বর এসেছে। নৈলে এত বক্‌ছি কেন?

আপনারা যদি নেহাত না ছাড়েন, যেতেই হবে। কিন্তু একথা সত্য যে, তাতে আপনাদের উৎসব রজনী বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠবে না। আপনার পত্র পেলে সেইরূপ ব্যবস্থা করব।

আমার আন্তরিক প্রীতি ও ভালোবাসা নেবেন সকলে। আপনাদের সুন্দর-পূজার আয়োজন সার্থক হোক, সুন্দর হোক, পূর্ণ হোক্। ইতি—

প্রীতিসিক্ত

নজরুল ইসলাম

[অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট লিখিত]

২৭/২/২৭

সশ্রদ্ধ অভিবাদনান্তর নিবেদন—

মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র সম্বাৎসরিক মিলনোৎসবে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া আমন্ত্রণ করিয়াছেন, ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও সম্মানিত বোধ করিতেছি। এই অনুষ্ঠানের কল্পনা শ্রবণাবধি আমি সাগ্রহে অদ্যকার উৎসবের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অপ্রতিবিধেয় কারণে আমি ইহাতে যোগদান করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিলাম না। আজ এক সপ্তাহ যাবত আমার মা গুরুতররূপে পীড়িত আছেন। আজ তাঁহার অসুস্থতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, আমার পক্ষে আজ বাহির হওয়া সম্ভবপর নয়। বন্ধুবর অধ্যাপক আবুল হুসেন সাহেব, বন্ধুবর অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব, স্নেহভাজন কবি আবদুল কাদির প্রভৃতি আমার মা'র অসুস্থতার সংবাদ জ্ঞাত আছেন। সুতরাং আমার ভরসা আছে, আপনারা সকলে আমার অনুপস্থিতির অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

www.pathagar.com

সাহিত্যের প্রসারিত ক্ষেত্রে আমাদের জাতীয় মিলনের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত করিতে হইবে। এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাংলার উদারচিত্ত ভাবপন্থী সাহিত্যিকগণের অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। অতএব এইরূপ সম্মিলন যতবেশী হয় ততই দেশ ও সমাজের পক্ষে মঙ্গল।
ভগবানের আশীর্ব্বাদে আজিকার অনুষ্ঠান সাফল্যে মণ্ডিত হউক, ইহা আমি সর্ব্বান্তকরণে কামনা করিতেছি। ইতি—

বিনয়াবনত

শ্রীপরিমল কুমার ঘোষ
সম্পাদক, 'দীপিকা'
সম্পাদক, বিশ্বভারতী সম্মিলনী
সম্পাদক, পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য–সমাজ।

[অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট লিখিত]

চট্টগ্রাম,
২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭

সবিনয় নিবেদন,
................এতদিনে আমার জীবনের কাম্য সাফল্যমণ্ডিত হইতে চলিয়াছে দেখিয়া আমার আনন্দের অবধি নাই। জাতীয় জীবনে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা যতদূর, তাহা সমাজের তরুণ যুগবকগণ এতদিন বুঝিলে আমাদের সাহিত্যের অবস্থা অন্যরূপ ধারণা করিত।
.....আমাদের সাহিত্য–চর্চ্চা অধুনা একরূপ নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহাও আবার একটা সুসম্বন্ধ প্রণালীর উপর চলিতেছে না। আমাদের মধ্যে এখন যে অল্প স্বল্প সাহিত্য–চর্চ্চা চলিতেছে, তাহা যেন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া চলিয়াছে। একদল লেখক মুসলমানী অপ্রচলিত ও সাধারণের অবোধ্য শব্দ বহুল ভাষার পক্ষপাতী এবং অন্য দল সংস্কৃত ভাষার পক্ষপাতী। ফলে এক দলের ভাষা অমুসলমান জাতির নিকট অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। ভাষায় এরূপ জাতিভেদ থাকা উচিত কিনা, তাহার আলোচনা ও মীমাংসা হওয়া বিশেষ আবশ্যক। প্রাচীন পুঁথির 'মুসলমানী বাঙ্গালার' পুনঃপ্রচলনে বর্ত্তমান জাতীয় জীবনের মঙ্গল সাধিত হইবে না অমঙ্গল সাধিত হইবে, তাহার চিন্তা ও আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। 'সাহিত্য সমাজে'র এই মজলিসে এই গুরুতর সমস্যার একটা আলোচনা ও মীমাংসা হইতে দেখিলে বিশেষ সুখী হইব।

বিনীত

আবদুল করিম (সাহিত্য বিশারদ)

www.pathagar.com

[সম্পাদকের নিকট লিখিত]

জনাব .... আপনারা অতিমহৎ অনুষ্ঠানে হাত দিয়াছেন। দয়াময় আপনাদের এ সাধনাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন, এই প্রার্থনা করি। আপনার—

ইব্রাহীম খাঁ

[অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট লিখিত]

জনাব .... বঙ্গীয় মোসলেম সাহিত্যের উন্নতির জন্য আপনারা যেরূপ সচেষ্ট হইয়াছেন তাহাতে আপনারা অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। খোদাতালা আপনাদের উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত করুন।

একান্ত অনুগত

শেখ হবিবর রহমান (সাহিত্য রত্ন)

মুসলিম সাহিত্য সমাজ, ঢাকা

বার্ষিক সম্মিলন, ১৯২৭

বিস্তৃত কার্য্যসূচী

১। উদ্বোধন (কোরান) – অধ্যাপক আবদুল হাকীম, এম.এ

২। (ক) 'অনাদি অনন্ত' (গান) আক্‌কাস আলি খাঁ, বি,এ

(খ) সেতার – আনোয়ারুল হক

৩। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

৪। সম্মিলনের সভাপতির আসন গ্রহণ

৫। (ক) সম্বর্দ্ধনা (গান) – অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, এম.এ

(খ) আবাহন – মৌলভী হবিবুল্লা, মোক্তার, মুন্সীগঞ্জ

৬। সভাপতির অভিভাষণ

৭। সাহিত্য বার্ষিক বিবরণী পাঠ – সম্পাদক

নমাজ [জোহর]

৮। 'মোর বীণা উঠে কোন্ সুরে' (গান)– অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি – এম.এ

৯। সাহিত্য সমস্যা – অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ – এম.এ

১০। সঙ্গীত চর্চ্চায় মুসলমান – অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, এম.এ

১১। আর্থিক সমস্যা – মৌলভী রকীব্ উদ্দীন আহমদ, এম.এ.

১২। (ক) 'লোক সঙ্গীত' – অবদুল কাদের [পঠিত বলিয়া গৃহীত]

(খ) 'তত্ত্ব ও সাহিত্য' – মোহাম্মদ কাসেম [পঠিত বলিয়া গৃহীত]

১৩। (ক) 'জড়িয়ে গেছে সরু মোটা' (গান) – অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন

(খ) 'খালেদ' আবৃত্তি – কাজী নজরুল ইসলাম [২৮শে প্রাতে]

www.pathagar.com

১৪। (ক) 'সামাজিক গলদ' – অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদির এম.এ. বি,টি, বি–এল
(খ) 'খোশ আমদেদ' (গান) – কাজী নজরুল ইসলাম
১৫। (ক) হজরত মুহম্মদের প্রতিভা – শামসুল হুদা
(খ) আমাদের নব জাগরণ ও শরিয়ত' – মৌলভী আবদুর রশীদ, বি.টি
১৬। শিক্ষা সমস্যা – অধ্যাপক আবুল হোসেন, এম.এ. বিএল [পরদিন প্রাতে]

নমাজ [আসর]

নিমন্ত্রিত ভদ্র মহোদয়গণের অভ্যর্থনা
(ক) সেতার – আনোয়ারুল হক্ [পরদিন প্রাতে]
(খ) 'মানের আসন, আরাম শয়ন' (গান) – মুহম্মদ সেরার
১৭। (গান) – কাজী নজরুল ইসলাম
১৮। সমালোচনা –
(ক) মৌলভী সৈয়দ এমদাদ আলি
(খ) ডাঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার
(গ) ডাঃ সুশীল কুমার দে
(ঘ) অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়
(ঙ) অধ্যাপক মমতাজ উদ্দীন আহ্‌মদ [পরদিন প্রাতে]
(চ) মৌলভী আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী [অসুস্থ]
(ছ) অন্যান্য —
(আবশ্যক হইলে, সোমবার প্রাতে ৮টা হইতে ১০টা)
১৯। অন্যান্য প্রবন্ধ ও প্রস্তাব [সময়াভাবে স্থগিত]
নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ ..... আবদু সালাম খাঁ, বি.এ.
২০। সভাপতির উপসংহার
২১। ধন্যবাদ – খাঁ সাহেব আবদুর রহমান খাঁ, এম.এ. বি.টি. [অনুপস্থিত]
২২। সঙ্গীতালাপ – কাজী নজরুল ইসলাম

অভ্যর্থনা সমিতি

মিঃ এ. এফ. রহমান [সভাপতি]
খাঁ সাহেব আবদুর রহমান খাঁ [সহকারী সভাপতি]
মৌলভী আবদুল খালিক [সহকারী সভাপতি]
খান বাহাদুর কমরুদ্দিন আহমদ
মিঃ এ হাকীম
মৌলভী আবদুর রব চৌধুরী
শ্রীযুত চারু বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুত পরিমল কুমার ঘোষ
মৌলভী আবুল কাসেম
মৌলভী মুহম্মদ ইউসুফ

www.pathagar.com

মৌলভী আনোয়ারুল কাদির
মৌলভী কাজী আবদুল ওদুদ
মৌলভী আবদুল আজীজ তালুকদার
মৌলভী মখ্‌লেসুর রহমান
মৌলভী সৈয়দ হাসান আলী চৌধুরী
মৌলভী আবদুল হাকীম বিক্রমপুরী
মৌলভী মুহম্মদ হবিবুল্লা (মোক্তার, মুন্সীগঞ্জ)
মৌলভী মম্‌তাজ উদ্দীন আহমদ
মৌলভী এস. আই. বোরাহ
মৌলভী আবদুর রশীদ (কলেজিয়েট স্কুল)
মৌলভী আলি আকবর খাঁ
মৌলভী আবদুস সোবহান
কাজী আবদুর রশীদ (সম্পাদক)

ডেলিগেট

১। মৌলভী আক্‌কাস আলি খাঁ – উত্তরবঙ্গ ছাত্র সমিতি, ঢাকা
২। মৌলভী এ. এফ. নাজিরুজ্জামান সিদ্দিকী – সিরাজগঞ্জ মুসলিম যুবক সঙ্ঘ
৩। মৌলভী এ. এম. মনিরুজ্জামান সিদ্দিকী – ঐ
৪। মৌলভী কে. এম. জয়নুল আবেদিন – সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসা

প্রকাশক – আবদুল কাদের
মুসলিম হল, ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র মুখপত্র

(বার্ষিকী)

শিখা

দ্বিতীয় বর্ষ

www.pathagar.com

প্রাপ্তিস্থান
মডার্ণ লাইব্রেরী
৭৪ নং নবাবপুর রোড, ঢাকা

ঢাকা সাতরাওজা ইসলামিয়া প্রেসে
মুন্সি আহাম্মদ আলী দ্বারা মুদ্রিত

www.pathagar.com

নিবেদন

অতীব পরিতাপের বিষয় যে, দ্বিতীয় বর্ষের 'শিখা' প্রকাশ করিতে বহু বিলম্ব ঘটিয়া গেল। যে সমস্ত কারণে এই বিলম্ব ঘটিয়াছে তাহা বিবৃত করা নিষ্প্রয়োজন। তবে আশা করা যায়, ভবিষ্যতে আমরা ক্রমশ ঐ সমস্ত কারণ দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিব।

এই বৎসরের 'শিখা' প্রকাশ করিতে যাঁহারা বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমান আবদুল কাদির ও সাহিত্যরত্ন আবদুল মজিদের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইহারা প্রেসের কাজে, প্রুফ দেখা ইত্যাদি ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে এবার 'শিখা' প্রকাশ করা অসম্ভব হইত। এজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে ও 'সমাজের' তরফ হইতে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করিয়াই শেষ করি। সেটিই হইতেছে 'ছাপার ভুল'। এজন্য আমরা বড়ই লজ্জিত। কিন্তু অবস্থার বিপর্য্যয়ে এই ত্রুটি দূর করিতে পারি নাই। সেজন্য পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। আশা করি 'শিখা'র জন্ম ও বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁহারা কথঞ্চিৎ পরিচিত তাঁহারা আমাদের এই ত্রুটির জন্য সহানুভূতি করিতে পারিবেন।

এবারকার 'শিখা'র জন্য যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার মধ্যে অনেকগুলি 'জাগরণ' ও 'সওগাতে' পত্রস্থ করা হইয়াছে। অর্থ ও সময় অভাবে 'শিখা'তে সেগুলির স্থান দিতে না পারিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত। আশা করি, লেখকগণ সেজন্য মনঃক্ষুণ্ন হইবেন না, বরং ভবিষ্যতেও তাঁহারা তাহাদের পূর্ব্ববৎ সহানুভূতি দ্বারা 'শিখা'কে সার্থক করিয়া তুলিতে যত্নবান হইবেন। ইতি

সম্পাদক

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বর্ষের কর্ম্মী-সংসদ

আবদুস সালাম খাঁ বি.এ.
এ. এম. তাহেরুদ্দীন এম.এ.
বিলায়েৎ আলী খাঁ বি.এ.
খান মুহম্মদ আতাউর রহমান
মৌলভী গোলাম আহাম্মদ
আবদুল কাদির
মোহাম্মদ আবদুর রশীদ বি.টি (সহকারী সম্পাদক)
কাজী মোতাহার হোসেন এম.এ. (সম্পাদক)

www.pathagar.com

সূচীপত্র

নতুনের গান : কাজী নজরুল ইসলাম ১৪৫
অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ : মিঃ মাহমুদ হাসান বি.এ. (অক্সফোর্ড) ১৪৭
সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ : খান সাহেব মৌলভী আবদুর রহমান খাঁ এম.এ, বি.টি ১৪৯
দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্য বিবরণী : সম্পাদক ১৬২
বাংলার জাগরণ : অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এম.এ ১৭০
সমবায় আন্দোলনে মুসলমানের কর্ত্তব্য : খান বাহাদুর মৌলভী কমরুদ্দীন আহমদ বি.এ ১৮০
মোগলযুগে চিত্র চর্চ্চা : মৌলভী আবদুস সালাম এম.এ ১৮৭
বাংলার লুপ্ত শিল্প : অধ্যাপক রকীবউদ্দীন আহমদ এম.এ ২০১
বাংলায় পীর পূজা : সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ বি.এ ২১২
মানব মনের ক্রমবিকাশ : অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এম.এ ২১৯
ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগ : মৌলভী আনওয়ারুল কাদির এম.এ., বি.টি ২৩০
স্থাপত্য চর্চ্চায় মুসলমান : মৌলভী আবদুল মঈদ চৌধুরী বি.এ ২৩৭
মুসলিম ভারতে শিক্ষা-চর্চ্চা : মৌলভী আতাউর রহমান ২৪৪
বৈদেশিক বাণিজ্য ও বাংলার মুসলমান : অধ্যাপক এ.কে. আহমদ খাঁ এম.এ ২৫৭
নারীজীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ : মিস ফজিলাতুন নেসা এম.এ ২৬৩
পরিশিষ্ট ২৬৭

'শিখা'য় অপ্রকাশিত প্রবন্ধের তালিকা*

১. মূর নির্ব্বাসন—মৌলভী আবদুর রসিদ, বি.টি.—'সওগাতে' প্রকাশিত
২ প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলমান—মিসেস ফাতেমা খাতুন—'জাগরণে' প্রকাশিত
৩. নারীর কথা—খুরশীদ জাহাঁ বেগম—'জাগরণে' প্রকাশিত
৪. বাংলয়া পীর পূজা—মৌলভী মোসলেম উদ্দীন খাঁ—'জাগরণে' প্রকাশিত
৫. কৃষি সমস্যা—মৌলভী আনোয়ার হুসেন—'জাগরণে' ও 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত
৬. ইংরাজী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগ, ২য় অংশ—মৌলভী আনোয়ার-উল কাদির, এম.এ., বি.এল., বি.টি., বি-ই.এস.—'জাগরণে' প্রকাশিত
৭. মানব ও ইসলাম—মৌলভী সিরাজুল ইসলাম—'জাগরণে' প্রকাশিত

---

* উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল।
স. শি.

www.pathagar.com

শিখা

'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।'

নতুনের গান*

নজরুল ইসলাম

চল্ চল্ চল্।
উর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল,
নিম্নে উতলা ধরণী তল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল্।।

ঊষার দুয়ারে হানি' আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।
'তাজা-ব-তাজার' গাহিয়া গান
সজীব করিব গোরস্থান,
আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।

কোরাস :

উর্ধ্বে আদেশ হানিছে বাজ
শহিদী ঈদের সেনারা সাজ
দিকে দিকে চলে কুচকাওয়াজ
খোলরে নিঁদ মহল।
চল্‌রে নৌজোয়ান—
শোনরে পাতিয়া কান

---

* দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনী সঙ্গীত।

www.pathagar.com

নয়া জমানার মিনারে মিনারে
নব উষার আজান।
ভাঙ্‌রে ভাঙ্‌ আগল।
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌

কবে সে খেয়ালি বাদ্‌শাহী
সেই সে অতীতে আজো চাহি'
যাস্‌ মুসাফির গান গাহি'
ফেলিস্‌ অশ্রুজল।
যাক্‌রে তখ্‌ত্‌ তাউস
জাগ্‌রে জাগ্‌ বেহুঁস,
ডুবিল'রে দেখ রোম গ্রীক
কত পারশ্য রুষ।
জাগিল পুনঃ সকল!
আমরা রচিব নতুন করিয়া
ধূলায় তাজমহল
চল্‌রে চল্‌রে চল্‌॥

www.pathagar.com

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

মাহমুদ হাসান বি.এ. (অক্সফোর্ড)

শ্রদ্ধেয় সমবেত ভদ্রমণ্ডলী

আজ আপনারা আমাদের 'সাহিত্য সমাজে'র অতিথিগণকে সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করার সুযোগ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনাদের সঙ্গে আমার দিল খুলে মিলামিশা করার অসুবিধা ঢের। আমার মাতৃভাষা বাংলা নয় ; তাই বাধ্য হয়ে আজ আমাকে বিদেশী ভাষায় আপনাদের আহ্বান করতে হচ্ছে। এর জন্য ত্রুটি আপনারা মাফ করে নেবেন।

মাতৃভাষার চর্চ্চা না করলে কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। মানুষের কর্ম্মশক্তি বাড়ে মনের শক্তি বাড়লে। অচল মন কর্ম্ম-পদ্ধতি স্থির করতে অক্ষম। নিসাড় মনবিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে নিকৃষ্ট পশুর কোন প্রভেদ নাই। কারণ উভয়েরই জীবন গতানুগতিক ও সংকীর্ণ পথে নিয়ন্ত্রিত। কোন পরিবর্ত্তন তাদের জীবনে দেখা যায় না। মন সচল না হলে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে না।

অবস্থার পরিবর্ত্তনই সভ্যতা। এই মনকে সচল করে সাহিত্য। আবার সাহিত্য সৃষ্টি হয় সচল মন দ্বারা। একে অপরের উপর নির্ভর করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মনকে সচল করতে হলে মাতৃভাষার শিক্ষা দেওয়া চাই এবং মাতৃভাষায় সাহিত্য হওয়া চাই। আমি আলিগড় Education conference-এ এ কথা জোর করেই বলেছিলাম। বাংলাদেশে জোর করে উর্দ্দুকে মাতৃভাষা করতে চাওয়ার মত আহাম্মকি আর নাই। আপনারা মাতৃভাষার চর্চ্চায় মন দিয়েছেন এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলার মুসলমান এতদিন অনর্থক উর্দ্দুর পিছু পিছু ছুটে মারাত্মক ভুল করেছে। তাই আজ তারা অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের চেয়ে অনুন্নত। অবাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চ্চা চলে এসেছে বলে তাদের মন মুক্ত এবং তারা তাদের জীবনটাকে উপভোগ করে। শিক্ষাও তাদের মধ্যে অনেক প্রসার লাভ করেছে। সেজন্য সংখ্যায় লঘু হলেও সে সমস্ত মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে টেক্কা দিতে পারছে। কারণ তাদের শিক্ষা মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় বাংলার মুসলমান শিক্ষার্থীদের অনেককেই উর্দ্দু জোর করেই কণ্ঠস্থ করতে হয় মাতৃভাষাকে অবহেলা করে। আনন্দের বিষয়, যে আজকাল উর্দ্দুর নেশা ঢের কেটেছে। আমার মনে হয়, এইবার বাংলার মুসলমান তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে পারবে। এই উন্নতি আরও দ্রুত হোক এই প্রার্থনা করি।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা প্রয়োজন। আজকার এই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির আসন আলঙ্কৃত করার কথা ছিল সুযোগ্য প্রিন্সিপাল খান বাহাদুর মৌলবী মুহম্মদ মুসা সাহেবের। পরিতাপের বিষয়, তিনি কাজের ভিড়ে আজ এই সভায় উপস্থিত হতে পারেন নাই। তাই তাঁর এই আসনে আমার মত অযোগ্য অর্ব্বাচীনকে বসিয়ে আপনারা আমাকে বিশেষ লজ্জিত করেছেন। আপনাদের আদেশ আমি পালন করতে বাধ্য।

www.pathagar.com

অবশেষে আমি আমাদের আজকার সাধারণ সভাপতি সাহেবকে তাঁর গুরুভার গ্রহণ করে এই অধিবেশনের কার্য্য সমাধা করতে আহ্বান করি—এবং আপনাদের নিকট আমার অযোগ্যতা ও অর্ব্বাচীনতার জন্য মাফ চাই।
আপনারা নির্ব্বিঘ্নে ধীর স্থিরচিত্তে বাংলার মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করুন এই কামনা করি।*

“বহুকাল সাধনা করে খোদার রহমতের কণিকা লাভ করতে হয়। আজীবন ধৈর্য্য ও তিতিক্ষার সহিত বার বার ব্যর্থ হয়েও যে না-উম্মেদ হয় না সেই-ই তাঁর অপার স্নেহের সম্পদ লাভ করে ধন্য হয়। আন্তরিক প্রার্থনাই সে সাধনার প্রাণ। কিন্তু আজ ধৈয্য ও আন্তরিকতা এ দুই-ই আমাদের সমাজে মারাত্মকভাবে দুর্লভ হয়েছে—আজ আমরা ভুলে গিয়েছি কোরাণের অমর উপদেশ ط امناهيلو با لصبر والصلوة (সুরা বাক’র, আয়াত ১৫৩) يايها الذين امنوا استعينو ابالصبر والصلوة ط ان الله مع الصبرين.

—স. শি.

* এটি সহকারী সভাপতি সাহেবের ইংরেজী বক্তৃতার সার। খান বাহাদুর মুহম্মদ মুসা সাহেব অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে চিঠি পত্র বিলি হয়ে গেলে অধিবেশনের চার দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁর অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। অগত্যা সহকারী সভাপতি মিঃ মাহমুদ হাসান, M.A. (cal.) B.A (Oxon), মুসলিম হলের অস্থায়ী প্রভোষ্টকে সভাপতির কার্য্য করতে হয়েছিল

www.pathagar.com

সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ

আবদুর রহমান খাঁ

ভূমিকা

শ্রদ্ধেয় ও স্নেহাস্পদ বন্ধুগণ,

আপনারা আমাকে আপনাদের 'সাহিত্য সমাজে'র সভাপতিত্বে বরণ করিয়া আমাকে অপ্রত্যাশিত সম্মান দেখাইয়াছেন। এজন্য আমি আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। কিন্তু আমি আপনাদের নির্ব্বাচন বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিতেছি না। যে দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার আপনারা আমার উপর অর্পণ করিয়াছেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা সভাপতির অভিভাষণে নিরাশ হইবেন। কিন্তু তজ্জন্য দায়ী আমি নহি। বারবার অক্ষমতার অজুহাত পেশ করিয়াও আমি নিষ্কৃতি পাই নাই। আপনারা আমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করিয়া থাকেন, আপনাদের আহ্বান আমার শিরোধার্য্য। তাই অগত্যা কম্পিত অন্তঃকরণে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি। যে স্থলে আন্তরিক স্নেহ বিদ্যমান, তথায় দোষত্রুটি সহজেই মার্জ্জিত হয়। আশা করি, আপনারাও আমার ভুল ভ্রান্তি মাফ করিয়া লইবেন।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইতে চলিল, এই 'সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই অল্পকালের মধ্যেই ইহা আপনাকে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত করিয়া তুলিয়াছে। গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ইহার প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। উহার কার্য্যবিবরণী ও প্রবন্ধসমূহ 'সমাজে'র মুখপত্র 'শিখা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। 'শিখা' সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্রে সমালোচনা হইয়াছে। এই সমস্ত সমালোচনা হইতে আর যাহাই পাওয়া যাউক না কেন, এই কথাটি বেশ স্পষ্টরূপে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে যে, এই সমাজে'র কর্ম্মিগণ এক নূতন উৎসাহে উৎসাহিত, এক নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত। ইহারা সমাজ-গত-প্রাণ। মুসলিম সমাজের বর্ত্তমান দুঃখ দৈন্য ইহাদের মর্ম্ম স্পর্শ করিয়াছে। ইহারা উহাকে সঞ্জীবিত ও সর্ব্বগুণে বিভূষিত করিয়া বিশ্বের দরবারে একটি গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং সকল জাতির নিকট শ্রদ্ধেয় করিয়া তুলিতে চান। ইহারা সত্যান্বেষী গতানুগতিক সহজ ব্যাখ্যায় ইহারা সন্তুষ্ট নহেন। সত্যকে ইহারা শুধু মানিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইতে চান না। ইহারা চান সে সত্যকে বুদ্ধির মাপকাঠি দ্বারা ভাল করিয়া যাচাই করিয়া আপনার করিয়া লইতে। ইহারা স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে সত্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যাহা সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহা অকপটে নির্ভীকচিত্তে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করেন। সত্যান্বেষণের ইহাই একমাত্র পথ। সকল সত্যের আধার পরম কারুণিক খোদাতা'লা ইহাদিগকে সরল পথ প্রদর্শন করুন এবং ইহাদের চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করুন, ইহাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

www.pathagar.com

সাহিত্যের স্বরূপ

আমি সাহিত্যিক নহি। সাহিত্যের স্বরূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। একজন সামান্য শিক্ষিত লোক হিসাবে আমার সাহিত্য সম্বন্ধে যে ধারণা আছে তাহাই নিতান্ত সাদাসিদাভাবে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি। সাহিত্যকে জীবনের সমালোচনা বলা হয়। পারিপার্শ্বিক জীবনে যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূত হয় তাহাই সাহিত্যে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই ঘটনাগুলি সাধারণের অনুভূতিতে যেরূপ প্রতীয়মান হয়, সাহিত্যে তাহার অবিকল ছবি ফুটিয়া উঠে না। সাহিত্যিকের অন্তরদর্পণে প্রতিফলিত হইয়া উহা নূতন রঙে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পায়। যাহা ইন্দ্রিয়ানুভূত হয়। তাহা ঘটনামাত্র। আর সাহিত্যিকের মন উহাকে ছাঁকিয়া সাহিত্যে যাহা প্রকাশ করে তাহাই সত্য। এই সত্যই প্রকৃত সাহিত্যের পরিচায়ক। ইহাতেই সাহিত্যিকের আত্মপ্রকাশ হয়।

সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য দুইটি জিনিষ আবশ্যক—পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সাহিত্যিকের মন। এই দুইটি পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। প্রথমটির উপর দ্বিতীয়টি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। যখনই কোন বৃহৎ ব্যাপার সংঘটিত হয়, কোন স্থিতিশীল অনুষ্ঠানের মধ্যে গতি বা বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখনই সাহিত্যিকের মন প্রচণ্ড আঘাতে উন্মুক্ত ও প্রসারিত হয়, এবং প্রাণস্পর্শী সাহিত্যের সৃষ্টি করে। ইউরোপের সাহিত্যে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে ইউরোপে লোকের মন এরূপ সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল যে, একমাত্র বাইবেল গ্রন্থ ভিন্ন তাহাদের আলোচনার বিষয় আর কিছুই ছিল না। তাহাদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক জীবন জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কনসটান্টিনোপলের পতনে বহু সংখ্যক বিদ্যার্থী ইটালীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে ইউরোপ এক নূতন আলোক ও চেতনা প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের সাহিত্যের পুনরুত্থান হয়। ইংরাজী সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ এলিজাবেথীয় যুগ। সে যুগের সাহিত্যের মূলেও একটা প্রচণ্ড নূতন আলোক দেখিতে পাওয়া যায়।

ইংল্যান্ড তখন কল-কারখানার আবিষ্কার দ্বারা প্রকৃতির উপর বিপুল প্রভূত্ব স্থাপন করিতেছিল। নূতন আবিষ্কার ও পর্য্যটনের ফলে বহু দেশের বহু অভিজ্ঞতা তখন তাহার সাহিত্যিকের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে, যখন কোন জাতির মধ্যে একটা নূতন আলোক প্রবেশ করে, তখন তাহাদের জ্ঞান ও কল্পনার পরিধি সহসা বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এক কথায়, যখন তাহাদের জীবনে একটা নূতন স্ফূর্ত্তি অনুভূত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি হয়।

মুসলিম সাহিত্যের মূলেও ঐ একই কথা। হজরত মুহম্মদের সাধনা আরবী সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। ইসলামের প্রভাবে প্রাচীন চিন্তাধারায় অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। মোতাজেলা, সুফী চিন্তাধারা আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, তৎকালীন আরবী ও পারশ্য চিন্তাধারা ইসলামের তৌহীদের মন্ত্রে কেমন করিয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া এক নূতন পথে গতি লাভ করিয়াছিল। প্রাথমিক মুসলিম সমাজে বিভিন্ন ইসলামের চিন্তাধারা লক্ষ্য করিলেও এই কথাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, নবভাবের আবির্ভাব হইলে মানুষের মন 'গা' ঝাড়া দিয়া উঠে এবং সাহিত্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে। সাহিত্য মানব মনের পুষ্প। বড় বড় শাস্ত্রগ্রন্থ, বড় বড় কাব্য, বৈজ্ঞানিক তথ্য, দার্শনিক সত্য সমস্তই মানুষের উৎকর্ষ সমন্বিতচিত্ত ও সম্প্রসারিত মার্জ্জিত মস্তিস্কের ফল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংঘাতে

www.pathagar.com

সে মন বিকশিত হয়। তাই দেখিতে পাওয়া যায়, বড় বড় দার্শনিক সত্য মানুষের দুঃস্থ অনুন্নত সমাজের মহাপুরুষদের মস্তিস্ক হইতে প্রসূত হইয়াছে। ইউরোপে যে সমস্ত দার্শনিক সূত্র প্রচলিত হইয়াছে তাহার মূলে অনুভূতির বহ্নিতে প্রজ্জলিত চিত্ত বিদ্যমান। বেনথাম, মিল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বার্ট্রান্ড রাসেল, বার্গস, কহলার প্রমুখ দার্শনিক সমাজের প্রসব-বেদনার ফল। আবার ভারতীয় আধুনিক জাগরণের মূলে আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক দুরবস্থা। সেই দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য যে সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহারাই সাহিত্যের আধুনিক স্রষ্টা। বাংলাদেশে রামমোহনের যুগ, বঙ্কিম চন্দ্রের এবং রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে—প্রত্যেক যুগের এক একটি বিশিষ্ট সমস্যা সাহিত্যের ভিতর আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। মানুষের অজ্ঞাতে সমস্যা জন্মলাভ করে—আর সাহিত্যে তাহার রূপ গ্রহণ করে এবং সমাধানের ইঙ্গিত করে। যে সমাজে সমস্যা যত কম, সে সমাজে সাহিত্যের বৈচিত্র্য তত কম। বাংলার আধুনিক মসলমানের সাহিত্য নাই। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও পুঁথি সাহিত্যের একটি চমৎকার প্রভাব বাংলার মুসলিম সমাজের উপর বিদ্যমান ছিল। কিন্তু আজ তাহাও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছে। আজ চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, আমাদের চিন্তার ক্ষেত্র যেন উষর মরুভূমিতে পরিণত হইয়াছে। আমাদের জীবনে যেন কোন সমস্যাই নাই। তাহার কারণ, আমরা একটি কৃত্রিম ভাবধারার মধ্যে হাবুডুবু খাইতেছি। আমাদের আলেম সম্প্রদায় উর্দ্দুকে আমাদের ধর্ম্ম ভাষায় পরিণত করিয়া তুলিয়াছেন এবং আমরা উর্দ্দুকে মাতৃভাষার উপরে স্থান দিয়া মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। সেই জন্যই বোধহয় আমাদের জীবনের আনন্দ ও স্বচ্ছন্দ স্ফূর্ত্তি বন্ধ হইয়া আসিতেছে। নতুবা আমার মনে হয় পুঁথি সাহিত্য ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া আজ এক নূতনরূপ লইয়া আমাদের সাহিত্যের অভাব পূরণ করিত।

সাহিত্যের ভাষা

সাহিত্যের বাহন ভাষা। বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্যের ভাষা কি হইবে তাহা লইয়া আজ মাথা ঘামাইয়া সময় নষ্ট করিতে যাওয়া নিরর্থক বিড়ম্বনা বৈ আর কি হইতে পারে? ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, বাঙ্গলার অধিকাংশ মুসলমানই বঙ্গ ভাষা-ভাষী। সুতরাং তাহাদের সাহিত্যের ভাষা যে বাংলা হইবে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? তথাপি যে কোন কোন মুসলমান বাংলাকে তাঁদের সাহিত্যের ভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ, তাহার বোধ হয় একটা কারণ আছে। বাংলা ভাষায় তাহাদের আকাঙ্ক্ষা মিটে না ; তাঁহারা সাহিত্যে যাহা প্রত্যাশা করেন, বাংলায় তাহা পান না, এটা অতি দুঃখের বিষয় এবং এই দুঃখেই তাঁহারা বাংলাকে অস্বীকার করিয়া চলিতে চান। কিন্তু তাহা নিষ্ফল। বাংলাকেই বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহাতেই তাঁহার সাহিত্য প্রকাশ করিতে হইবে। বাংলাকে অস্বীকার করিয়াই আমরা আজ সাহিত্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় উর্দ্দুতে বাৎচিৎ করিয়া শরাফত বহাল করিবার জন্য উদ্বিগ্ন, আর আলেম সম্প্রদায় উর্দ্দুর মারফতে প্রচার কার্য্য চালাইয়া পেটের অন্ন সংস্থানে ব্যস্ত। কাজেই মাতৃভাষার চর্চ্চা হয় নাই বলিয়া আজ আমাদের এই দুর্দ্দশা। কেহ কেহ উর্দ্দুকে বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা রূপে চালাইতে চাহেন ;

www.pathagar.com

কিন্তু তাহা অতি দুরূহ। মুখের কথায় কেহ কোন দেশবাসীর মাতৃভাষা পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। শিক্ষিত সম্প্রদায় ইহা ন্যূনাধিক গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু যে ভাষা তাহারা মাতৃ-স্তন্য পানের সহিত শ্রবণ করিয়া আসিয়াছে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাহার সহিত অপর কোন ভাষার প্রতিযোগিতা চলিতে পারে না। অর্দ্ধ শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সমাজে উর্দ্দুর প্রচলন অতি আয়াস সাধ্য এবং পর্দ্দানশীন মাতৃ জাতির মধ্যে উহার প্রবর্ত্তন একরূপ অসম্ভব। সুতরাং বাংলাকেই বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্যের বাহন করিয়া লইতে হইবে।

প্রচলিত বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কোন কোন মুসলমানের একটা অভিযোগ আছে। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, উহা বাংলার মুসলমানদের ভাষা নহে, উহা সংস্কৃত শব্দবহুল। এই হেতু কতিপয় মুসলমান বাংলা ভাষার মধ্যে আরবী ও ফার্সী শব্দের প্রচলন দ্বারা উহাকে মুসলমানদের হৃদয়গ্রাহী করিবার চেষ্টায় আছেন। এস্থলে মনে রাখা কর্ত্তব্য যে, ভাষা সাহিত্যের বাহন মাত্র, উহাই সাহিত্য নহে। প্রকৃত সাহিত্যের পরিচয় উহার ভাবে এবং প্রকাশের ভঙ্গীতে। যে স্থলে এই দুইটি জিনিস বিদ্যমান আছে, তথায় ভাষায় সংস্কৃত বা আরবী ফার্সী শব্দের ন্যূনাধিক্যে সাহিত্যের ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। সংস্কৃত শব্দ বহুল হইলেও ভাষা উৎকট বিকট না হইতে পারে, আবার খাঁটি বাংলাও শ্রুতি মধুর না হইতে পারে। তদ্রূপ আরবী ফারসী বেশী থাকিতেও হয়ত তাহা বাংলা ভাষার মধ্যে বে-মালুম খাপ খাইতে পারে ; আবার উহার পরিমাণ কম হইলেও হয়ত তাহা একদিকে সাধারণ পাঠকের নিকট হৃদয়গ্রাহী না হইতে পারে এবং অপরদিকে মুসলমানদের নিকটও তাহাদের মাতৃভাষা বলিয়া গণ্য না হইতে পারে। মোট কথা ভাষায় কি পরিমাণ সংস্কৃত বা আরবী ফারসী শব্দ থাকিবে তাহা কেহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারেন না। তবে একথা ঠিক মুসলমানগণ সাহিত্যক্ষেত্রে মনোনিবেশ করিলে যে বর্ত্তমান বাংলা ভাষার মধ্যে একটু পরিবর্ত্তন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সংস্কৃতবহুল বাংলা মুসলিম সমাজে আদরণীয় হইবে না। আবার আরবী ফার্সী বহুল পরিমাণে প্রচলন করিলে তাহাও সাধারণ বঙ্গবাসী গ্রহণ করিবে না। বঙ্গবাসী হিন্দু মুসলমান বহুদিন যাবৎ একত্রে বসবাস করিয়া আসিতেছে, ইহার ফলে সাধারণ মুসলিম কথাবার্ত্তায় যে সকল বিদেশীয় শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা সাধারণ হিন্দুর উপলব্ধি করিতে আদৌ বেগ পাইতে হয় না। যদি বাংলা সাহিত্যের ভাষায় ঐ সমস্ত শব্দের প্রচলন হয়, তবে তাহাই মুসলমানদের নিকট তাহাদের মাতৃভাষা বলিয়া আদৃত হইবে।

কিন্তু প্রচলিত বাংলা ভাষার মধ্যে কতিপয় মুসলিম শব্দের প্রচলন হইলেই মুসলিম সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে না। মুসলিম বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ভাব সাহিত্যের বিশেষত্ব থাকিবে তাহার ভাবে, তাহার ভাষায় নহে। যতদিন মুসলমান তাঁহার সাহিত্যে মুসলিম আদর্শ ফুটাইয়া তুলিতে না পারিবেন, ততদিন প্রকৃত মুসলিম সাহিত্য সৃষ্ট হইবে না। অধুনা যে সমস্ত মুসলমান সাহিত্যসেবায় যোগদান করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকেই হিন্দু আদর্শে অনুপ্রাণিত। তাহাদের লেখায় এমন কোন বিশেষত্ব পাওয়া যায় না যাহা হইতে উহা মুসলমানের লেখনীপ্রসূত বলিয়া সহসা প্রতীয়মান হয়। মুসলমানের একটা নিজস্ব

www.pathagar.com

সম্পদ আছে। উহা প্রকাশ করাই মুসলিম সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ইহার এক প্রধান ফল এই হইবে যে, অপর সম্প্রদায়ের লোক মুসলমানকে ভালরূপে চিনিতে সুযোগ পাইবে এবং তাহার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তা বৃদ্ধি পাইবে। মুসলমান যদি অপর সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা ও আত্মীয়তা পাইতে আশা করেন, তবে তাঁহাকে তাহার মধ্যে যাহা শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয় আছে, তাহা তাহাদের সমক্ষে সঠিকভাবে উপস্থিত করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে, সাহিত্যের ভিতর দিয়া মুসলমান ও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মিলন আশা করা যায়। অন্য কোন উপায়ে তাহা সম্ভবপর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনেক মুসলমানের একটা বিতৃষ্ণা আছে। তাঁহারা বলেন, বাংলার বড় বড় সাহিত্যিকও মুসলমানকে নিকৃষ্টরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, মুসলমান হাতে কলম ধরিতে পারিলেই তাঁহার পক্ষে ইহার প্রতিশোধ লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এই খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কোন কোন লেখক এরূপ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন যাহা কিছুতেই সুরুচিসঙ্গত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। তাহাতে মুসলমান সমাজের গৌরব বাড়িতেছে না, বরং তাহাতে অন্য সমাজের নিকট আমাদের নিকৃষ্ট চিত্তের পরিচয় দেওয়া হইতেছে। ইহা বাস্তবিকই লজ্জার বিষয়। আমাদের এস্থলে পাল্টা হীন মনোবৃত্তির পরিচয় না দিয়া, উচ্চতর মনোবৃত্তির ও উদার সুরুচির আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, আমাদের জীবনের মার্জ্জিত রূপটি ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। মুসলমানকে যদি অপর সম্প্রদায়ের লোক ভালভাবে চিত্রিত না করিয়া থাকেন, তবে তাহার জন্য তাঁহারা যেমন দায়ী, মুসলমানও সেইরূপ দায়ী। তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল মুসলমানকে সূক্ষ্মরূপে জানিবার চেষ্টা করা এবং মুসলমানদের উচিত ছিল নিজেকে তাহাদের নিকট সঠিকভাবে প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাওয়া। গলাবাজি করিয়া কিংবা প্রতিহিংসামূলক ভাষা ব্যবহার করিয়া সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করা যায় না। সে গৌরবের সর্ব্বপ্রথম বিষয় হইতেছে আমাদের সুন্দর ও মার্জ্জিত জীবন। সেইরূপ জীবন সম্পদ আমাদের নাই। সে জন্য অন্য সমাজের লোক আমাদিগকে ঘৃণা করেন এবং নিকৃষ্ট জীবরূপে চিত্রিত করেন। সেজন্য আমরা অত্যধিক অপরাধী। আমি নোংরা থাকিলে কে আমাকে সভ্য সুন্দর বলিতে পারে? যাঁহারা আমাদিগকে কুশ্রী করিয়া আঁকিয়াছেন তাঁহাদের সামনে আমাদের জীবনের খুব ভাল ছবি ছিল না। সুতরাং, সেজন্য শিল্পীকে দোষ না দিয়া আমাদের সমাজের রূপকে দোষ দেওয়া উচিত। তাই বলি আজ আমাদের জীবনকে শ্রদ্ধেয় করিতে হইবে—সেজন্য আজ চিন্তাশীল সাহিত্যিক আবির্ভাব হওয়া চাই। সাহিত্য সমাজ সেই সাহিত্যিকের আগমন সহজ করিতে ব্রতী হউক এই কামনা করি।

জাতি হিসাবে বঙ্গীয় মুসলিম জগতের মধ্যে সভ্যতার নিম্নস্তরে পড়িয়া আছে। কে তাহাকে গালিমন্দ দিয়াছে, কিরূপে তাহার প্রতিশোধ লওয়া যাইবে এই আলোচনায় সময় ও শক্তি ক্ষেপণের অবসর তাঁহার আর নাই। তাঁহাকে একাগ্রমনে আত্মোন্নতি ও আত্ম-প্রকাশের চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাতেই তাঁহার মুক্তি ও কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে এবং তাহাতেই তাঁহার কলঙ্কমোচন হইবে।

www.pathagar.com

সাহিত্যের সৃষ্টি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, জোর করিয়া বা ফরমাইশ দিয়া কেহ সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারে না।

মুসলিম সমাজে সাহিত্য-চর্চ্চার অন্তরায়

সাহিত্য ফুলের ন্যায় আপনি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু গাছের গোড়ায় জল সিঞ্চন করিয়া যেমন উহার পুষ্টির ও পরোক্ষভাবে ফুলোৎপত্তির সহায়তা করা যাইতে পারে, তদ্রূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন দ্বারাও সাহিত্য সৃষ্টির পথ পরিষ্কার করা যাইতে পারে। এখন দেখা যাউক 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটনে সাহায্য করিতে পারে কি না। বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ বর্ত্তমানে যেরূপ সঙ্কীর্ণ জীবনযাপন করিতেছে, তাহাতে তাহাদের মধ্যে সাহিত্যের সৃষ্টি অসম্ভব। সংকীর্ণতা তাহাদের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিয়াছে। তাহাদের মানসিক পরিদৃষ্টি অতি সংকীর্ণ, তাহাদের মধ্যে উদার শিক্ষা অতি বিরল। যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার আভাস পাওয়া যায় না। যাঁহারা আলেম বলিয়া দাবী করেন, তাঁহারা কয়েকখানি ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত পৃথিবীর কোন বিষয়ের সংবাদ রাখেন না। যাঁহাদের পার্থিব বিষয়সমূহের কিছু জ্ঞান আছে, ধর্ম্ম শিক্ষার সহিত তাঁহাদের পরিচয় নাই বলিলেও চলে। যাঁহারা আরবী জানেন, তাঁহারা ইংরেজী জানেন না এবং জানা আবশ্যকও মনে করেন না। যাঁহারা ইংরেজী জানেন, তাঁহারা আরবী জানেন না এবং আরবীর মধ্যে জানার উপযোগী কিছু আছে বলিয়াও বিশ্বাস করেন না। জ্ঞানের কি ভীষণ দৈন্য আমাদের বাংলার মুসলিম সমাজে। যখন মুসলমানদের মধ্যে জ্ঞানের চর্চ্চা ছিল, তখন তাঁহারা নিজেদের মাতৃভাষা জানিতেনই, তাহা ছাড়া তখনকার দিনে যে সমস্ত ভাষায় সাহিত্যের প্রাচুর্য্য ছিল তৎসমূদয়ও নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করিয়া নূতনভাবে তাহা আলোচনা করিতেন। শুধু তাহাই নহে, যিনি গণিতজ্ঞ বা জ্যোতির্ব্বিদ ছিলেন, তিনিও সাহিত্য-চর্চ্চা করিতেন। মুসলমানগণ তখন দূরদেশে থাকিয়া যতটুকু সংস্কৃত চর্চ্চা করিতেন। আজ তাঁহারা বহু শতাব্দী হিন্দুদের সহিত একত্র বসবাস সত্ত্বেও তাহার শতাংশের একাংশ করিতেছেন না। ওমর খাইয়াম দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্ব্বিদ হইয়াও সাহিত্য সেবায় অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আর আজ মুসলিম সমাজে এমন একাগ্রচিত্ত সাহিত্যসেবীও পাওয়া দুষ্কর, যিনি একজন সাধারণ সাহিত্যিক বলিয়াও পরিচিত হইতে পারেন।

সংকীর্ণতা

ধর্ম্মক্ষেত্রেও মুসলমানদের সংকীর্ণতা অতি শোচনীয়। তাঁহারা ধর্ম্মের নামে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হন কিন্তু ধর্ম্ম কি, সে সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সঠিক ধারণা নাই। তাঁহারা ধর্ম্মের বহিরাবরণ লইয়া তর্কাতর্কি করেন কিন্তু উহার ভিতরকার আসল জিনিষটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁহারা অনুষ্ঠানকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন। কিন্তু অনুষ্ঠান যে কোন বৃহত্তর ও মহত্তর লক্ষ্যে উপনীত হইবার উপায় মাত্র, ইহা তাঁহাদের চিন্তা করিবার

www.pathagar.com

সামর্থ্য বা প্রবৃত্তি নাই। তাহারা চক্ষু বুঁজিয়া শাস্ত্রের আদেশ ও নিষেধ মানিয়া চলেন বা চলেন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহাদের মূলে যে কোন যুক্তি থাকিতে পারে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখেন না, এবং ভাবিয়া দেখাও নিষ্প্রয়োজন বা আত্মার অবনতির কারণ বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের আত্মবিশ্বাস নাই। তাই তাহারা আপন ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অপর ধর্ম্মাবলম্বীর সংঘর্ষ এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করেন। জাতীয় জীবনে এত বড় জড়তার দৃষ্টান্ত বোধ হয় আজ আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যদি সহসা এমন কোন নব আলোক (X-ray)-এর আবিষ্কার হয় যাহাতে এই নিবিড় জড়তা আলোকিত ও সমুদ্ভাসিত হইতে পারে, তবেই মুসলিম সমাজে সাহিত্যের সৃষ্টি সম্ভব হইবে। এই আলোকের প্রবেশ পথ পরিষ্কার করিতে 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' নিশ্চয়ই সাহায্য করিতে পারেন। তাহারা আপনাদের মধ্যে উদার শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতে পারেন। যাঁহারা ইংরেজী জানেন, তাহারা ইংরেজীর যোগে নানা দেশের সভ্যতা ও চিন্তাধারা সম্বন্ধে অবগত হইতে পারেন এবং তাহা ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ লোকের সম্মুখে ভাষান্তরিত করিয়া উপস্থিত করিতে পারেন। যাঁহারা আরবীতে অভিজ্ঞ তাহারা ইসলামে যাহা কিছু সুন্দর ও মনোরম এবং আধুনিক সমস্যা সমাধানের অনুকূল তাহা তরজমা করিয়া যাহারা আরবী জানেন না তাহাদের সম্মুখে স্থাপিত করিতে পারেন। এই প্রকার ভাবের আদান প্রদানে হয়ত মুসলিম সমাজে এক নূতন আলোক প্রকাশিত হইবে এবং তাহার ফলে সাহিত্য সৃষ্টির পথ সুগম হইবে।

সাহিত্য ও শিক্ষা

সাহিত্যের উৎকর্ষসাধণ করিতে হইলে শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। প্রথমতঃ যাহারা সাহিত্যের সেবা করিবেন, তাহাদের সুশিক্ষিত হওয়া আবশ্যক। সুশিক্ষিত হইতে হইলেই যে বি.এ., এম.এ. পাশ করিতে হইবে, এমন নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিকারী না হইয়াও সুশিক্ষিত হওয়া সম্ভবপর। সুশিক্ষার জন্য অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক এবং অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ হইতেই সাহিত্যের মাল-মসলা সংগৃহীত হয়। অধ্যয়ন দ্বারা অতীত ও বর্ত্তমান মনীষীগণের চিন্তাধারার সহিত পরিচয় ঘটে, সাহিত্যের দোষ-গুণ বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে, চিন্তাশক্তি প্রখর হয় এবং রুচি মার্জ্জিত হয়। পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা মানস ও বাহ্য প্রকৃতির অনেক গূঢ় তত্ত্ব গোচরীভূত হয়। যাহা জনসাধারণের নিকট নিতান্ত সামান্য ও অর্থবিহীন বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহাও পর্য্যবেক্ষণশীল লোকের নিকট অনেক সময়ে অতি সারগর্ভ ও মূল্যবান বলিয়া প্রতীত হয়।

দ্বিতীয়ত, যাঁহারা সাহিত্য পাঠ করিবেন তাঁহাদের সাহিত্য বুঝিবার এবং উপভোগ করিবার ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। যতদিন মুসলিম সমাজে বিদ্যা-শিক্ষার প্রসার না হয়, ততদিন তাঁহাদের মধ্যে সাহিত্যের আস্বাদ দানের চেষ্টা বৃথা। বাংলার সাধারণ মুসলিম বটতলার প্রকাশিত পুঁথি পড়িয়া পঠনের আমোদ উপভোগ করেন। উহাই তাহার সাহিত্য। প্রকৃত সাহিত্য পাঠ করিবার বা উপভোগ করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। তাহাকে প্রকৃত সাহিত্যের

www.pathagar.com

রস আস্বাদ করান অসম্ভব। সুতরাং মুসলিম সমাজে শিক্ষার বিস্তারে সহায়তা করণ 'মুসলিম সাহিত্য সমাজের' অন্যতম কর্ত্তব্য।

কী উপায়ে মুসলিম সমাজে শিক্ষার বিস্তার হইতে পারে, কী প্রণালী অবলম্বন করিলে তাহাদিগকে শিক্ষার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট করা যাইতে পারে, তদ্বিষয় বহু মনীষী ব্যক্তি বহু গবেষণা করিয়াছেন। এইরূপ এক গবেষণার ফলে দেশে জুনিয়র ও সিনিয়র মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইংরেজী বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা নাই বলিয়া মুসলমানগণ ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হন নাই। এই অভাব পূরণের জন্যই এই মাদ্রাসা প্রণালীর উদ্ভাবন হয়। ইহার ফলে বহু মাদ্রাসার উৎপত্তি হইয়াছে এবং তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু মানুষের কোন অনুষ্ঠানই সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ হয় না। মাদ্রাসা প্রণালীরও দোষ আছে। মুসলিম সমাজের একদল ইহাকে দূষণীয় বলিয়া ইহার বর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন এবং অপর দল ইহার পক্ষ সমর্থন করিতে যাইয়া ইহার দোষ স্বীকার করিবার সাহস পাইতেছেন না।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই নূতন প্রণালীর মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে সকল মুসলমান পূর্ব্বে আধুনিক শিক্ষার প্রতি উদাসীন ছিলেন, তাহারাও ইহার প্রতি কথঞ্চিৎ পরিমাণে আকৃষ্ট হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, এই সমস্ত বিদ্যালয়েও যে ইসলামিক শিক্ষার সুচারু ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা নহে। তথাপি ইহার প্রতি মুসলিমগণের আস্থা স্থাপিত হওয়ার কারণ এই যে, তাহারা যে মোহের বশবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগকে সর্ব্বসাধারণ মানব হইতে পৃথক রাখিতে চান, ইহাতে তাহার একটা পরিতুষ্টি হয়। তাহারা অতি ধর্ম্মপ্রাণ, তাহারা ধর্ম্মহীন শিক্ষার বিরোধী, এই কথাটাই তাহারা সব সময়ে সপ্রমাণ করিতে চান। ইংরেজী শিক্ষার ফলে লোক ধর্ম্মহীন হইয়া পড়িবে, এই ভয়েই মুসলমানগণ উহা হইতে দূরে সরিয়াছিলেন এবং এই ভয় এখনও মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার অভাবের জন্য অনেকখানি দায়ী।

এই সংস্কার দূরীকরণের উপায়ান্তর না পাওয়ায় নূতন মাদ্রাসা প্রণালীর যোগে ফাঁকি দিয়া মুসলমানদিগকে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা হইয়াছে। এই চেষ্টা যে অনেকটা ফলবতী হইয়াছে তাহাও সত্য। অনেক স্থলে মাদ্রাসা স্থাপিত হওয়াতে, এমন অনেক বালক তাহাতে যোগদান করিতেছে, যাহারা অপর কোন বিদ্যালয়ে যাইত না এবং মাদ্রাসা না হইলে সম্পূর্ণ নিরক্ষর থাকিয়া যাইত। যে কারণেই হউক মাদ্রাসা-প্রণালী জনসাধারণ মুসলমানের নিকট অপরাপর বিদ্যালয়ের শিক্ষা হইতে অধিকতর অসৃত হইয়াছে, তখন ইহাকে উপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। ইহারই যোগে মুসলমানের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা পাইতে হইবে। কোন পদ্ধতিকে দূষণীয় বলিয়া বর্জ্জন করা যত সহজ, তাহার স্থানে অপর একটি গড়িয়া তোলা তত সহজ নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে যে সমস্ত দোষ আছে, তাহার সংশোধন করা আবশ্যক। 'দীন ও দুনিয়ার' শিক্ষা একাধারে ও সমানভাবে দেওয়া হইবে এই উদ্দেশ্যেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু এই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই উদ্দেশ্য আশানুরূপ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই।

www.pathagar.com

আমার মনে হয়, এই প্রণালীর প্রধান দোষ এই যে, ইহার পাঠ্য তালিকা শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের সোপান অনুযায়ী নহে। ইহার ফলে তাহার উপর অত্যধিক চাপ পড়িতেছে, অথচ সে উহা আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না। পরীক্ষা পাশের জন্য সে কোন প্রকারে কতকগুলি শব্দ কণ্ঠস্থ করিয়া যাইতেছে কিন্তু উহার মর্ম্ম তাহার চিত্ত-বিকাশের পক্ষে সহায় হইতেছে না বলিয়া তাহার প্রকৃত শিক্ষা লাভ হইতেছে না। জুনিয়র মাদ্রাসায় সুকুমারমতি বালককে মধ্য ইংরাজী স্কুলের যাবতীয়পাঠ্য পড়িতে হইতেছে, তাহার উপর আবার আরবী, উর্দ্দু ও দীনিয়াতের ভার চাপান হইয়াছে। হাই মাদ্রাসার অবস্থাও তদ্রূপ। তথায় শিক্ষার্থীদের সহিত হাদিস, তফসির, কোরান কালাম, ফেকা, ওসুল মনতক ইত্যাদি বিষয় পড়ান হইতেছে। অথচ ইহাদের কোন একটি বুঝিবার মত বুদ্ধির পরিপক্কতাসুলভ শক্তি তাহার হয় নাই। ইহার ফল এই হইতেছে যে, শিক্ষার্থীর বুদ্ধি-বৃত্তির উন্মেষ না হওয়ায় সে একটি জীবন্ত যন্ত্রে পরিণত হইতেছে। উপরোক্ত দোষের ফলে ইহার দ্বিতীয় দোষ এই হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ইহাতে উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় হইতেছে না। যতটুকু গণিত, ভূগোল ও ইতিহাসের জ্ঞান উচ্চ শিক্ষার সোপানে সোপানে আবশ্যক হয় এবং যাহা না হইলে লোক অশিক্ষিত থাকিয়া যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, ইহাতে তাহার অভাব রহিয়াছে। প্রথম ও দ্বিতীয় দোষের অনিবার্য্য ফলস্বরূপ ইহার তৃতীয় দোষ এই হইয়াছে যে, ইহা জীবন সংগ্রামের সমস্যা সমাধান করিবার মত বুদ্ধি ও শক্তি পরিপুষ্টি করিবার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল নহে। ইহা দ্বারা শিক্ষার্থী সাংসারিক ক্ষেত্রে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাহিত সমকক্ষ করিয়া জীবিকা অর্জ্জনে সক্ষম নহে। যে শিক্ষা জীবিকা অর্জ্জনের সম্যক সহায়তা করে না তাা দুইদিন পূর্ব্বেই হউক আর পরেই হউক নিশ্চয়ই পরিত্যক্ত হইবে। কিন্তু মুসলমানদের অবস্থা এরূপ নহে যে, তাহারা শেষ পর্য্যন্ত ইহার ফলাফল দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে পারেন। তাহাদের নিকট শিক্ষাক্ষেত্রে আজ প্রতেকটি মুহূর্ত্ত মূল্যবান। সুতরাং এখন হইতেই উহার প্রতিকারের চেষ্টা করা আবশ্যক। এস্থলে আশার বিষয় এই যে, ইহাতে ইতিপূর্ব্বেই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে এবং তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষের বা জনসাধারণের পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উত্থাপিত হয় নাই।

শিক্ষা ও ধর্ম্ম

শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের সংযোগ আবশ্যক। কিন্তু এই সংযোগ প্রকৃত শিক্ষা ও ধর্ম্ম শিক্ষার প্রতিকূল হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। ধর্ম্মের নামে এই মাদ্রাসা গুলিতে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের দুর্ব্বোধ্য আরবী ভাষার শব্দগুলি কণ্ঠস্থ করিতে শক্তি ও সময় অযথা ব্যয়িত হয়। তৎসমুদয় মাতৃভাষায় শিক্ষা দিলে অধিকতর সুফল ফলিতে পারে। ইহাতে বিষয়গুলি সহজে আয়ত্ত হইতে পারে, অথচ শিক্ষার্থী পার্থিব বিষয়গুলিতে অধিকতর মনোনিবেশ করিবার সুযোগ পাইতে পারে। কিন্তু আমাদের একটি মোহ আছে, আমরা হাই মাদ্রাসায় বড় বড় আলেমের লিখিত বড় বড় কেতাব পড়াইয়া গৌরব অনুভব করি। সেই মোহকে জয় করিবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে।

www.pathagar.com

একথা যেন কেহ মনে না করেন যে, আমি এই বিষয়গুলির বা যে সমস্ত পুস্তক হইতে এই বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হয়, সেগুলির সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করি। প্রত্যেক বিষয় শিক্ষার উপযোগী এক একটি সোপান আছে। যে সোপানে ঐগুলির শিক্ষা দেওয়া হয়, ঐগুলি সেই সোপানের উপযোগ্য নহে। কলেজিয়েট ও ইউনিভার্সিটি সোপানে উহাদের শিক্ষাদান সমধিক সমীচীন হইতে পারে। উহাদের ভাষা ও যুক্তি বুঝিবার জন্য যে আরবীর জ্ঞান আবশ্যক। তাহার জন্য জুনিয়র ও হাই মাদ্রাসায় ব্যবস্থা করা উচিত। আমার মতে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার এরূপ হওয়া আবশ্যক যাহাতে আরবী ভাষার জ্ঞানের ভিত্তি ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মের সাধারণ বিধানগুলির ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় এবং বিষয়গুলির নির্ব্বাচন এইরূপ হয় যেন তাহা সাধারণ উচ্চ শিক্ষার পরিপন্থী না হয়। হাই মাদ্রাসা সোপানে সাধারণ শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইলে ছাত্রগণ উপরের সোপানসমূহে নিজ নিজ যোগ্যতা ও অভিরুচি অনুসারে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিবে। তাহা হইলে তাহারা পাঠে আমোদ উপভোগ করিতে পারিবে। এবং জীবন সংগ্রামেও কাহারও পশ্চাৎপদ হইবে না।

প্রাথমিক শিক্ষা

বর্ত্তমান সময়ে দেশে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে। মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ইহা একটি সুবর্ণ সুযোগ। মুসলমানগণ প্রধানতঃ গ্রামে বাস করেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা উচ্চ শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই গ্রাম্য পাঠশালায় বা মক্তবে বিদ্যারম্ভ করিয়াছেন। দূর ভবিষ্যতেও মুসলমানগণ গ্রামের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সম্পর্কিত থাকিবেন। সুতরাং তাহাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার করিতে হইলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। যাহাতে এই শিক্ষা গ্রামবাসী সকলে সহজে ও বিনা ব্যয়ে পাইতে পারে তজ্জন্য প্রত্যেক মুসলমানের ঐকান্তিক চেষ্টা করা আবশ্যক। একথা সত্য যে, অবৈতনিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে এবং উহার ব্যয়ভার বহনের অপর কোন ব্যবস্থা না হইলে গ্রাম্য মুসলমানদিগকে অতিরিক্ত কর দিতে হইবে। কিন্তু টাকা না হইলে এরূপ বিরাট ব্যাপার কিরূপে সম্ভবপর হইবে? মুসলমানকে এখনো অনেক কর দিতে হয়, কিন্তু এই শিক্ষাকরের মধ্যে তাহাদের প্রকৃত মুক্তি নিহিত রহিয়াছে। ইহাকে তাহার কিছুতেই ভয় করা উচিত হইবে না। খোদাতালার নাম স্মরণ করিয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া ইহার জন্য তাহাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি কোন কারণবশতঃ এই বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষার আইন আইন সভায় পাশ না হয়, তাহা হইলেও শিক্ষার বন্দোবস্ত তাহাকে করিতে হইবে এবং তাহাতে তাহাকে অধিকতর ক্লেশ ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় মুসলিম ছাত্র সংখ্যা এবং তাহাদের কৃতিত্ব দেখিলে কেহই মনে করিতে পারে না যে, এদেশে মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে এত পশ্চাৎপদ। গত প্রাইমারী পরীক্ষার ফল কলিকাতা গেজেটে ছাপা হইতেছে। তাহাতে মুসলিম বালক বালিকাগণ বহুল পরিমাণে বৃত্তি লাভ করিয়াছে এবং গুণানুসারেও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে গৌরবজনক উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। যদি প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হয়, তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা মেধাবী বলিয়া পরিগণিত হয় তাহাদের উচ্চ শিক্ষার পথ সুগম হইবে। সুতরাং মুসলিম

www.pathagar.com

মাত্রেরই ইহাতে সহায়তা করা কর্ত্তব্য। মুসলিম সাহিত্যিকগণেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট করণীয় আছে। তাহারা এ বিষয় সর্ব্বসাধারণকে ভালরূপে বুঝাইবার জন্য তাহাদের লেখনী চালনা করিতে পারেন।

স্ত্রী শিক্ষা

মুসলিম শিক্ষা–প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিলে উহা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। মুসলমানদের মধ্যে স্ত্রী–শিক্ষার একান্ত অভাব। যতদিন এই অভাব পূর্ণ না হইবে ততদিন তাহারা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য সকল ক্ষেত্রে অপরাপর সম্প্রদায়ের পিছনে পড়িয়া থাকিবেন। মাতৃজাতি জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত করেন। মাতৃক্রোড়ে শিশুর জীবনের লক্ষ্য নিরূপিত হয়, তাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অংকুরিত হয়। মাতার সম্মুখে জাতীয় জীবনের যে আদর্শ স্থাপিত হয় শিশু ঠিক সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। জাতীয় জীবনের আদর্শ যদি মাতৃগণ আপন প্রাণে অনুভব করিতে না পারেন, তবে তাঁহারা কখনও উহা তাঁহাদের সন্তানগণের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিতে পারেন না। এই হেতু যে জাতির মাতৃগণের মধ্যে শিক্ষার যত অভাব সে জাতির উন্নতির পথ তত দুর্গম। মুসলমাগণ যদি সমাজ হিসাব উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তবে তহাদিগকে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি ঐকান্তিক মনোযোগ দিতে হইবে।

এ স্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্ত্রী–শিক্ষা ইসলাম ধর্ম্মের পালনীয় বিধান হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানগণ তাহার প্রতি মারাত্মকরূপে উদাসীন ; অথচ তাহাদের অনেক প্রতিবেশীর মধ্যে ইহার বিরুদ্ধে বহুকালের কুসংস্কার প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তাহারা ইহার প্রতি বেশী মনোযোগী। মুসলমানদের এই উদাসীনতা আত্মঘাতী। ইহা তাহাদের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পরিপন্থী। যত দিন তাহারা ইহা ঝাড়িয়া না ফেলিবেন, ততদিন তাহাদের পদে পদে বিড়ম্বনা অবশ্যম্ভাবী। কিছুদিন হইল বঙ্গের ডিরেক্টর বাহাদুর মাননীয় ওটেন সাহেব ইডেন স্কুলের পুরস্কার বিতরণী সভায় বলিয়াছিলেন, মুসলানগণ এক সময়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অবহেলা দেখাইয়া তাহার জন্য আজ অনুশোচনা করিতেছেন। আজ যখন দেশে স্ত্রী–শিক্ষার সাড়া পড়িয়াছে তখন তাহাতে উদাসীনতা দেখাইলে তাহারা পুনরায় ঠকিবেন এবং একদিন তাহার জন্য তাহাদিগকে অনুতাপ করিতেই হইবে। কথাটা ঠিক। এ বিষয় আমাদের ভাবিয়া দেখা উচিত। মানুষ একবার ঠকিলে সাবধান হয়, আর আমরা কি চিরকালই ঠকিতে থাকিব ?

অনেক মুসলমান মনে করেন, বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষাদান পদ্ধতি তাহাদের বালিকাগণের উপযোগী নহে এবং সেই জন্য তাহারা তাহাদের গৃহ–শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। অবশ্য, বিদ্যালয়ের শিক্ষা অননুমোদিত হইলে গৃহ–শিক্ষার ব্যবস্থায় কিছুমাত্র আপত্তি থাকিতে পারে না। এমন অনেক কৃতবিদ্য লোক আছেন যাহারা আমাদের দেশের বালক বিদ্যালয়গুলিকেও শিক্ষার উপযুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন না এবং তজ্জন্য আপন পুত্রগণের শিক্ষার জন্য গৃহে ব্যবস্থা করেন। কিন্তু মুসলমানদের এই কল্পিত

www.pathagar.com

গৃহশিক্ষাটি যে আদৌ শিক্ষা নহে, একথা তাহাদের অনেকে অন্তরে অনুভব করিলেও মুখে স্বীকার করিতেছেন না।

এদেশের প্রচলিত স্ত্রী-শিক্ষার সংস্কার হওয়া আবশ্যক, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু তাই বলিয়া যতদিন ইহার সংস্কার না হয় ততদিন ইহার বর্জ্জন করা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহার সংস্পর্শে আসিলেই কেবল মাত্র ইহার দোষ-গুণ ভালরূপ উপলব্ধি করা যাইবে। ইহা হইতে দূরে সরিয়া থাকিলে ইহার গুণেরও পরিচয় হইবে না এবং ইহার দোষেরও সংশোধনের চেষ্টা হইবে না। সাঁতার দিয়াই লোকে সাঁতার শিখিতে পারে। শিশু হাঁটিয়াই হাঁটিতে শিখে। একথা আর কতকাল আমরা না বুঝিয়া থাকিব ?

সাহিত্য সমাজে ধর্ম্ম চর্চ্চা

আর একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। অনেক সময়ে শুনিতে পাওয়া যায়, সাহিত্য সমাজে ধর্ম্ম-চর্চ্চা হয় কেন? সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতেই ইহার উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রশ্নটি প্রায়ই উত্থিত হয় বলিয়া এস্থলে উহার পুনরুক্তি করা আবশ্যক মনে করি। জীবনের সহিত যাহা ঘনিষ্ঠরূপে সংশ্লিষ্ট তাহাই সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়। মানুষের ভাব-বৃত্তিসমূহের প্রকাশ, তাহার কার্য্য-প্রণালীর সমালোচনা, সমাজের দোশসমূহের উদ্ঘাটন সাহিত্যের অন্যতম লক্ষ্য। জাতীয় জীবনে যখন যে আদর্শ থাকে তাহাই সাহিত্যে প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে, সাহিত্যিক তাহার অনন্যসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতা বলে যাহা সমাজের পক্ষে শ্রেয় ও অনুকরণীয় মনে করেন, তাহারই আদর্শ সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থিত করেন। সাহিত্যের সৃষ্টিতে যে সমস্ত উদ্দেশ্য থাকিতে পারে তন্মধ্যে সমাজ-সংস্কার অন্যতম। এই উদ্দেশ্যে সাহিত্যিক তাহার চক্ষে যাহা নিন্দনীয় ও পরিত্যাজ্য প্রতীয়মান হয়, তাহা এরূপভাবে সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থিত করেন, যেন তৎপ্রতি সকলেরই স্বতঃপ্রণোদিত ঘৃণা ও অশ্রদ্ধার উদ্রেক হয় এবং যাহা প্রশংসাই ও কাম্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহা এরূপভাবে অবতারণা করেন যেন সর্ব্ব সাধারণের মন তাহার প্রতি অলক্ষিতে ও অজ্ঞাতসারে আকৃষ্ট হয়। মুসলমানের ধর্ম্ম তাহার সমগ্র জীবনব্যাপী একটি সমস্যা। তাহার ঐহিক ও পারত্রিক সম্বন্ধ এরূপভাবে জড়িত যে তাহাদের বিচ্ছেদ কল্পনা করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং কোন মুসলমান সাহিত্যিক সমাজ সংস্কার উদ্দেশ্যে সাহিত্য সেবায় ব্রতী হইলে তাহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তখন তাহার সহিত কাহারো মতের অনৈক্য হইলে তজ্জন্য অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নহে। শান্তভাবে তাহার প্রতিবাদ করা যাইতে পারে। তাহার মতের মধ্যে যাহা অনভিপ্রেয়, যুক্তিসহকারে তাহার খণ্ডন করা যাইতে পারে। ইহাতে একদিকে যেমন সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে, অপরদিকে তেমনি অপরের ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে পারে। কিন্তু অজ্ঞতার ন্যায় শত্রু আর নাই। যখন যিনি যে বিষয়ে আলোচনা করিবেন, সে যাহা জ্ঞাতব্য আছে তাহার তাহা যথাসম্ভব জানিয়া শুনিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। তাহা হইলে আলোচনা প্রকৃত পক্ষে সুফল প্রদ হইবে এবং তাহাতে কোন পক্ষ হইতে বিশেষ কোন আপত্তির কারণ থাকিবে না।

www.pathagar.com

উপসংহার

ইক্ষণ আমি উপসংহার করিয়া আপনাদের ধৈর্য্য পরীক্ষা শেষ করিব। যাহা আমি বলিয়াছি তাহা খুব গভীর জ্ঞান বা গবেষণার কথা নয়। আজ আমাদের সমাজের মধ্যে যে সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য ক্রন্দন করিতেছে তাহার প্রতি আপনাদের শুভ দৃষ্টি ও বিস্তৃত জ্ঞান আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। সকলেই এসমস্ত বিষয় অবগত আছেন কিন্তু আমাদিগকে এমন একটা নিঃসাড় ভাব ও ভীরুতা ঘিরিয়া রাখিয়াছে যে, আমরা একেবারে সাড়া শব্দ করিতে চাহিতেছি না। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র চেষ্টা এই নিঃসাড়তার মূলে কুঠারাঘাত করিতে সক্ষম হউক এই কামনা করি।

আজ আমার সকল প্রার্থনার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রার্থনা এই 'হে খোদাবন্দ। মুসলিম সাহিত্যিকের লেখনী শক্তিশালী হউক—তাহার চিত্ত উন্মুক্ত সম্প্রসারিত হউক—তাহার বুদ্ধি বিকশিত হউক—তাহার রুচি মার্জ্জিত হউক—মুসলিম অমুসলিম তাহার অন্তরে সমান শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠুক।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্য বিবরণী

আজ আমাদের এই 'সাহিত্য-সমাজের' বয়স দুই বৎসর পূর্ণ হইল। গত বৎসরের বার্ষিক সম্মেলনে ইহার জন্ম বৃত্তান্ত ও উদ্দেশ্যের কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদের সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের জীবনের অনুভূতি ও চিন্তা প্রকাশ করিয়া জন সাধারণের নিঃসাড় জীবনের স্পন্দন জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তবেই সমাজ বাঁচিবে। নতুবা তাহাদের প্রাণধারা রসহীন মরুভূমির ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

এ বৎসর নানা কারণে আমাদের উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আর একটু স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্য প্রথমে এ বৎসরকার পঠিত প্রবন্ধগুলিতে আমরা কি বলিতে চাহিয়াছি তাহাই বিবৃত করিতেছি।

প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করেন, মৌলভী আবুল হুসেন এম.এ, বি.এল. সাহেব। বিষয় 'আদেশের নিগ্রহ'। তিনি বলেন, ঈশ্বর এবং পরলোকে বিশ্বাস, ইহাই প্রত্যেক ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব। কিন্তু এই বিশ্বাস শুধু মুখে মুখে থাকিলে চলিবে না।—অন্তরের বিশ্বাসই প্রকৃত জিনিস। ধর্ম্ম-প্রচারকগণ যে অনুশাসন দেন, তাহার উদ্দেশ্য মানব সমাজের উন্নতি। বস্তুতঃ মানবজাতির হিতই ধর্ম্মের লক্ষ্য। ধর্ম্মের সহিত মানব প্রকৃতির মূলতঃ কোন বিরোধ থাকিলে সে ধর্ম্মকে লোকে চিরকাল শ্রদ্ধা করিতে পারে না। এ জন্য যুগে যুগে পৃথিবীর নব নব প্রয়োজন বা সমস্যার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মেরই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মুসলমানেরা ইসলামকে যেভাবে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছে, তাহাতে যথেষ্ট অন্ধ-বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া গেলেও জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় মোটেই পাওয়া যায় না। উদাহরণ স্বরূপ তিনি বলেন, দলে দলে লোক ভিক্ষা ও ঋণ করিয়া হজ্জ্ব করিতে যায়-স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণের দিকে লক্ষ্য করে না। লোকে ওজুর মসলা আওড়াইতে পঞ্চমুখ, কিন্তু পরিচ্ছন্নতার দিকে দৃষ্টি নাই। লোকে জামায়াত করিয়া নামাজ পড়িতেছে, কিন্তু একতার দিকে লক্ষ্য নাই। এইরূপ, লোকে জুমার নামাজ পড়িতেছে খোৎবা শুনিতেছে, কিন্তু সবই ব্যর্থ হইতেছে। কারণ তাহার ইহার অর্থও বোঝে না, উদ্দেশ্যও জানে না। এই জন্যই দেখা যায়, বহু মুসলমান ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের নিখুঁৎভাবে পালন করিতেছেন, কিন্তু কই, তাহারা ত কুরুচি, কর্ম্ম বা জ্ঞান, কোন ক্ষেত্রেই উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারিতেছে না। পক্ষান্তরে তাহারা কেবল ভিক্ষুক ও ব্যভিচারীর দলই পুষ্ট করিতেছে। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে তাহাদের ঈশ্বরে বা পরলোকে প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাস নাই। কিন্তু এখন অন্ধের মত নির্ব্বোধের মত শাস্ত্র আওড়াইলে বা শুধু অনুষ্ঠান পালন করিলে আর মুসলমানের মুক্তি নাই। মুসলমানকে বুঝিতে হইবে যে, কোরান

www.pathagar.com

হাদিস তাকে তুলিয়া রাখিবার জন্য নয়—জীবনে প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত। আর সমগ্র জগতে মুসলমানের একই নিরবিচ্ছিন্ন কদর্য্য ছবি। ইহা দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? মুসলমানকে বুঝিতে হইবে যে, ইসলামের সৃষ্টি হইয়াছে মানুষের জন্য। কেবল বিধি নিষেধগুলির পূজা করিবার জন্যই মানুষের সৃষ্টি হয় নাই। যদি দেখা যায় যে ইসলামের কোন বিধি মানব সমাজের উন্নতির পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, তবে নির্ভীকভাবে তাহা ত্যাগ করিয়া তৎস্থলে নূতন বিধি গড়িতে হইবে পুরাতনের মোহে হাবুডুবু খাইলে আর পরিত্রাণ নাই। ইসলামের উত্তরাধিকার আইন, সুদের ফৎওয়া এই সমস্ত বর্ত্তমান জগতের অনুপযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেগুলির পরিবর্ত্তন বা সংস্কার আবশ্যক। মহাপুরুষগণকে শ্রেণীবদ্ধ আলোকস্তম্ভের সহিত তুলনা করা যায়। একটি আলো ম্লান হইয়া থাকিলে, সেই শিখাতে অন্য আলো জ্বালোনো উচিত, এবং তাহাকে পূর্ব্বতন আলোকেরই পরিণতি বা বিবর্ত্তন বলা চলে। মূলনীতি ঠিক রাখিয়া শাস্ত্র বিধির প্রয়োজন মত একটু আধটু সংস্কার করিয়া লইলে, তাহাও হজরত মুহম্মদের ধর্ম্মই থাকিবে। সুতরাং পরিবর্ত্তনের নাম মাত্রই আঁতকাইয়া উঠিবার কোন কারণ নাই। প্রকৃত যে ধর্ম্ম যাহা খোদার অভিপ্রেত তাহার পালন করিলে আমাদের পার্থিব জীবনেরই তজ্জনিত সুফল ও শান্তি ভোগ করিতে পাওয়া যাইবে পরককালের জন্য আর দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে না।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন, কাজী মোতাহার হোসেন এম.এ. সাহেব। বিষয় 'আনন্দ ও মুসলমান গৃহ' লেখক বলেন, আনন্দ ও হাসি জীবনের একটা প্রধান লক্ষণ। হৃদয়ের প্রাচুর্য্য হইতেই তাহার জন্ম ও তাহা হইতেই পৃথিবীতে নব নব সৃষ্টির উদ্ভব হয়। যে সমাজ প্রাণ খুলিয়া আনন্দ করিতে পারে, তাহার মধ্যে সঙ্কোচ দ্বিধা ও ভীরুতার বন্ধন নাই। সে সমাজ বলবান, স্বাধীন ও প্রাণময়। এজন্য তাহাই প্রতিভার জন্মদাতা। কিন্তু মুসলমান সমাজ নির্জীব ও আনন্দহীন। উন্নত চিন্তা ও আনন্দের তৃপ্তিতে চেহারায় যে লাবণ্য ও কমনীয়তা পরিস্ফুট হয়, তাহাও ইহাদের নাই।

ইহার প্রধানতম কারণ শিক্ষার অভাব। শিক্ষা না হইলে সুরুচি জন্মে না, এবং সুরুচির অভাবে হৃদয় ও মনের উন্নত বৃত্তিগুলি বিকশিত ও চরিতার্থ হইতে পারে না। উন্নত রুচির আনন্দের যেখানে অভাব, সেখানে সহজ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্থূল আনন্দই চরম লক্ষ্য হয়। এজন্য দেখা যায়, কেবলমাত্র অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাশবিক আনন্দ লইয়াই প্রায় পৌনে ষোল আনা মুসলমান মশগুল হইয়া আছে। অধিকাংশ মুসলমান পরিবারেই বিভিন্ন ব্যক্তির ভিতর শিক্ষার অত্যন্ত অসমতা থাকায়, তাহাদের ভাব ও চিন্তা ধারায়ও পার্থক্য। প্রধানতঃ এই কারণে এবং কতকটা পর্দ্দা প্রথার শুচিবায়ুর জন্য গৃহ বলিতে যাহা বুঝায়, মুসলমানের তাহা নাই। এখানে ভাই-বোন, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, মাতা-কন্যা সকলে মিলিয়া চিন্তার ক্ষেত্রে, বুদ্ধির ক্ষেত্রে বা জীবন সমস্যার আলোচনায় এক হইতে পারিতেছে না। এজন্য ইহাদের জীবন মেরুদণ্ডবিহীন, ছায়াবাজীর ন্যায় নড়াচড়া করিতেছে বটে, কিন্তু আসলে তাহা প্রাণহীন। তাহার উপর মুসলমান সমাজ মনোরঞ্জনকর ললিত কলার চর্চ্চাকে বিশেষ শ্রদ্ধা বা প্রীতির চক্ষে দেখে না বলিয়া

www.pathagar.com

তাহাদের মধ্যে আনন্দের উপকরণেরও অভাব হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান গান গাইবে না, ছবি আঁকিবে না, পিতার সামনে হাসিবে না, বড় ভাইয়ের সামনে খেলিবে না, গুরুজনের অন্যায় কথারও প্রতিবাদ করিবে না, এমন কি কচি মেয়েরা পর্য্যন্ত মার খাইলেও চেচাইয়া কাঁদিবে না—এইরূপ হাজার হাজার আদব কায়দা ও আইন কানুনের চাপে মুসলমানের আনন্দধারা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের একমাত্র ভরসা, মৃত্যুর পর বেহেশতে প্রবেশ করিয়া সুমিষ্ট মেওয়া ভক্ষণ করিবে, আর চির-যৌবনা হুর পরীদের লইয়া অনন্তকাল ধরিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে পাইবে। পরিশেষে তিনি বলেন, আমাদের সুরুচি সম্পন্ন আনন্দের সন্ধান ও সম্ভোগ করিবার মত ক্ষমতা অর্জ্জন করিতে হইবে। তাহাতে যদি আমাদের সমাজ গৃহের কিছু সংস্কার করা আবশ্যক হয়, তবে অকুণ্ঠিতভাবে তাহাও করিতে হইবে।

তৃতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন, মৌলভী আবদুর রশীদ বি.এ., বি.টি. সাহেব। বিষয় 'মুক্তির আগ্রহ বনাম আদেশের নিগ্রহ'। তিনি বলেন, মুক্তির আগ্রহ মানুষের চিরকাল থেকেই আছে এবং চিরকালই থাকিবে। কিন্তু মানুষ যখন বস্তু বা ব্যক্তি নিরপেক্ষ হইয়া থাকিতে পারে না, তখন স্বাধীনতাও সীমাবদ্ধ হইতে বাধ্য। এজন্য আইনের প্রয়োজন। কিন্তু শাসনের কোন নির্দ্দিষ্ট ধারা,—যেমন শরিয়ত—যদি সাধারণভাবে সকলের উপরেই প্রযোজ্য, তবুও ইহাতে যে সকলের আত্মারই পরিতৃপ্তি হইবে, তাহা আশা করা অন্যায়, জগতে অভিজ্ঞতা, জ্ঞানানুসন্ধিৎসা এবং বিচারবুদ্ধিরও বিশেষ প্রয়োজন এবং মূল্য আছে। চিন্তাশীল, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতিকে শরিয়ত বা নিয়মের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিলেও তাহাদের দ্বারা জগতের বিশেষ অকল্যাণ হইবার আশঙ্কা নাই। কারণ তাহারা স্ব-স্ব জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে জীবনধারাকে যেভাবে পরিচালিত করিবেন, তাহা মোটামুটিভাবে শরিয়তের আদর্শের অনুযায়ীই হইবে, পরিপন্থী হইবার সম্ভাবনা অতি সামান্য। কিন্তু সাধারণ লোক, যাহারা চিন্তা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে অগ্রসর নহে, তাহাদিগকে নিয়মের শৃঙ্খলে না বাঁধিলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে এবং সমাজে নানা প্রকার অশান্তি ও বিঘ্ন আনয়ন করে। এই হিসাবে আদেশের বিশেষতঃ শরিয়াতের আদেশের—যা' বিশ্বের কল্যাণকামী জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদিগের অক্ষয়দান, তাহার সার্থকতা আছে। কিন্তু আদেশের একটা দিক, মানুষ সহজেই ভুলিয়া যায়। তাহারা ভুলিয়া যায় যে, আদেশের সার্থকতা ঐখানে যেখানে তাহা সত্যে পৌঁছিবার পথ নির্দ্দেশ করে। মানুষের প্রবৃত্তি অনুসারে মানুষ শীঘ্রই আদেশের দাস হইয়া পড়ে। সময়ের পরিবর্ত্তনে যে সত্য বিবিধরূপ লইয়া প্রকাশিত হইতে পারে সে কথা সাধারণ মানুষের চিন্তা করে না। যাহারা করে তাহাদিগকেও ইহারা বাধা দেয়, এই ভয়ে যে পাছে তাহাদের শাস্ত্রের ইজ্জত নষ্ট হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, লেখক বলেন, বর্ত্তমান জগতের ব্যবসায়-নীতিতে সুদের আদান প্রদান অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, তবু শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, আমাদের সমাজে সুদের প্রচলন হইতেছে না। চিত্রকলা মনে সরসতা ও সজীবতা আনয়ন করে (বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীতে যে লোকে চিত্রকে খোদার আসনে বসাইবে, ইহাও ধারণা করা যায় না। তথাপি শাস্ত্রবিদেরা এখনও চিত্রাঙ্কনকে হারাম বলিয়া ফতোয়া দিতেছেন। সত্য বটে

www.pathagar.com

সঙ্গীত সময় সময় কর্ত্তব্য বিস্মৃতি জন্মায়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহার ক্লান্তি-নিবারণী ও চিত্তহারিণী শক্তিটাই বা মানিব না কেন? অথচ সমাজে দেখিতে পাই, পবিত্র এমন কি ধর্ম্মভাবাপন্ন সঙ্গীতও দূষণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই প্রকার গোঁড়ামির ফলে আমাদের জ্ঞান চক্ষু অন্ধ হইয়া যাইতেছে এবং শুষ্ক আদর্শের অর্থহীন অনুবর্ত্তিতার ফলে, আত্ম প্রবঞ্চনা এবং পর প্রবঞ্চনা অর্থাৎ ভণ্ডামির মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। পরিশেষে তিনি বলেন, আমাদিগকে সবল ও জ্ঞানপুষ্ট হইতে হইবে। তাহা হইলে দেখিতে পাইব, প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের সহিত আমাদের বিরোধ বাঁধিতেছে না—বিরোধ বাধিতেছে দুই চারিটা সংস্কারের সঙ্গে। কিন্তু তাহা আমাদিগকে অতিক্রম করিতেই হইবে।

চতুর্থ প্রবন্ধ পাঠ করেন, তরুণ কবি আবদুল কাদির সাহেব। বিষয় 'পল্লীসঙ্গীতে লীলাবাদ।' তিনি নিজের সংগৃহীত অনেক উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের পদ আবৃত্তি করিয়া সকলের আনন্দ উৎপাদন করেন। ঘাটুগান, বন্ধের গান, মুর্শিদ্যা গান, মারফতী গান, কবি গান, কীর্ত্তন গান প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিয়া বলেন—উহার অনেকগুলি গ্রাম্য চাষীদের জীবন-রস হইতে উৎপন্ন সরস সাহিত্য। প্রথম প্রথম চাষীদের জীবনে এই সমস্ত গানের ভিতর দিয়া ইসলাম এক বিশিষ্ট রূপ লইয়াছিল। পরবর্ত্তীকালে কঠোর শরিয়তবাদী মৌলানা এবং পীরসাহেবদের কার্য্যতৎপরতায় চাষীদের জীবনরস যেন শুষ্ক হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে তাহার ধর্ম্মের যে সহজ সরল আস্বাদ পাইব, এখন আর তাহাদের সে অনুভূতি জাগ্রত নাই।

পঞ্চম প্রবন্ধ পাঠ করেন, মৌলভী আবুল হুসেন এম.এ., বি.এল. সাহেব। বিষয় 'বাঙ্গালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ'। তিনি বলেন, বর্ত্তমানে মুসলমান সব দিকে পশ্চাৎপদ। সে দরিদ্র, মূর্খ এবং কৃপার পাত্র, অথচ বেশ আত্মপরিতুষ্ট এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছে। সমাজের নের্তৃবর্গ শুধু গবর্ণমেন্টের শতকরা হিসাব লইয়া তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত কিন্তু তাহাতে জাতির মেরুদণ্ড শক্ত হইতেছে না। মুসলমান সমাজ ক্রমেই দুর্ব্বল ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছে, অথচ এই ভিক্ষার দাবী করিতে কিছু মাত্র দ্বিধা বা লজ্জাবোধ করিতেছে না। আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং সেকেলে ধরনের শিক্ষা দিয়াই কোনরূপ জোড়াতালি দিয়া কাজ সারার ব্যবস্থা হইতেছে। সমস্ত সমাজ অতীতের দিকে মুখ ফিরাইয়া অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং তাহাকে অবনতি ভিন্ন উন্নতি বলা যায় না। আর মোল্লার দল পীর সাজিয়া নিরক্ষর ও কাণ্ডজ্ঞানহীন সমাজের মাথায় হাত বুলাইয়া তাহাদিগকে বেহেশতে প্রবেশ করিবার রাজপথ বাতলাইয়া দিয়া বেশ দু'পয়সা উপায় করিয়া লইতেছে। এই পীরের দল বাস্তবিক পক্ষে কুসীদজীবী মহাজনের চেয়েও অধিক অত্যাচারী পাপী। কারণ তাহারা ধর্ম্মের ঘরে সিঁধেল চোর। তাহারা সমাজেকে চির দুর্ব্বল ও চির অজ্ঞ করিয়া রাখিতেছে এবং 'দুনিয়া ফানা হ্যায়' বলিয়া সমাজের সমস্ত কর্ম্ম-শক্তি ও উদ্যম উৎসাহের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্যনীতিতে তাহাদের আস্থা নাই। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্যের বিষয় চিন্তা করিলে হৃদয় আতংকে শিহরিয়া উঠে। কিন্তু বেচারা গ্রামবাসীরা মোল্লা মৌলভী বা পীরের কুহকে পড়িয়া সিন্নি ও তাবিজ দিয়া ব্যাধি দূর করিবার

www.pathagar.com

চেষ্টা করিতেছে। মুসলমান সমাজ আজ 'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' করিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে, কিন্তু জ্ঞান ও বুদ্ধির প্রয়োগ দ্বারা নিজেদের কোন সমস্যারই সমাধান করিতে পারিতেছে না। নেতৃগণ সমাজের জন্য থোড়াই কেয়ার করেন, তাহাদের স্ব স্ব স্বার্থ সিদ্ধি হইলেই যথেষ্ট হইল। এই সমস্ত অবস্থা দূর করিতে না পারিলে মুসলমানের ভবিষ্যৎ অতি অন্ধকারময়। অতএব এখন নবীন কর্ম্মীদের নিঃস্বার্থভাবে পূর্ণ উদ্যমে কাজ আরম্ভ করিবার সময় আসিয়াছে।

উল্লিখিত প্রবন্ধগুলি লইয়া অবশ্য কিছু কিছু আলোচনা ও সমালোচনা হইয়াছিল। কিন্তু বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিতে পারিলাম না। তথাপি আশা করা যায় যে, প্রবন্ধগুলি হইতেই লেখকগুণের তথা এই 'সাহিত্য সমাজের' মনোভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। আমরা চক্ষু বুঁজিয়া পরের কথা শুনিতে চাই না, বা শুনিয়াই মানিয়া লইতে চাই না। আমরা চাই, চোখ মেলিয়া দেখিতে, সত্যকে জীবনে প্রকৃত-ভাবে অনুভব করিতে। আমরা কল্পনা ও ভক্তির মোহ আবরণে সত্যকে ঢাকিয়া রাখিতে চাই না। আমরা চাই জ্ঞান-শিখা দ্বারা অসার সংস্কারকে ভস্মীভূত করিতে এবং সনাতন সত্যকে কুহেলিকামুক্ত করিয়া ভাস্বর ও দীপ্তিমান করিতে। আমরা ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চাই না—আমরা চাই বর্ত্তমান মুসলমান সমাজের বদ্ধ-কুসংস্কার এবং বহুকাল সঞ্চিত আবর্জ্জনা দূর করিতে। আমরা তীতের মোহে ডুবিয়া থাকিয়া সুখের স্বপ্ন দেখিতে চাই না—আমরা চাই কর্ম্ম-স্রোতে ঝাঁপ দিয়া ইসলামের ভবিষ্যতকে মহিমামণ্ডিত করিতে। আমরা জীবনকে 'ভোজের বাজি' মনে করিয়া ঐচ্ছিক উন্নতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতে চাই না। আমরা চাই জগতের সমুদয় জাতির সহিত সম্পর্ক রাখিয়া জ্ঞানবান বলবান ও ঐশ্বর্য্যবান হইয়া জীবনের পরিধি বর্দ্ধিত করিতে এবং তাহাকে পূর্ণভাবে আস্বাদ ও ভোগ করিতে। আমরা সমাজের মাথায় হাত বুলাইয়া তাহার মাতব্বর সাজিয়া ছড়ি ঘুরাইতে চাই না। আমরা চাই সমাজের চিন্তাধারাকে কুটিল ও পঙ্কিল পথ হইতে ফিরাইয়া, প্রেম ও সৌন্দর্য্যের সহজ ও সত্য পথে চালিত করিয়া আমাদের দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে। এক কথায় আমরা বুদ্ধিকে মুক্ত রাখিয়া প্রশান্ত জ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা বস্তু জগতে এবং ভাব-জগতের ব্যাপারাদি প্রত্যক্ষ করিতে ও করাইতে চাই।

আমরা এ পর্য্যন্ত কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছি তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করা বড়ই কঠিন। কারণ, মাত্র দুই বৎসর কালের সাধনা ও চেষ্টা দ্বারা যুগ যুগ সঞ্চিত ধারণা ও সংস্কারের কোন বড় রকম পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব না হইলেও, সেটা যে দুঃসাধ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে আশার কথা, যুগ ধর্ম্ম আমাদের সহায়। যাঁহারা একটু স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেছেন, তাহারাই প্রাণে এক অভিনব স্পন্দন অনুভব করিতেছেন। তাহাদের হৃদয় তন্ত্রীতে এই স্পন্দন জাগাইয়া তোলাই আমাদের প্রথম কাজ। মনে হয়, এ কাজে আমরা অনেকখানি কৃতকার্য্য হইয়াছি। ক্রমে আমরা অসহিষ্ণুতা ও একদেশদর্শিতা ত্যাগ করিয়া ধীরভাবে চিন্তা করিতে শিখিতেছি। প্রথমতঃ পর্দ্দা প্রথা সম্বন্ধে

www.pathagar.com

আমাদের ধারণা পূর্ব্বাপেক্ষা মোলায়েম হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রমাণ, আমাদের এক অধিবেশনে কয়েক জন ভদ্রমহিলা যোগদান করিয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে একজন উচ্চশিক্ষিতা মুসলমান নারীও ছিলেন। বলা বাহুল্য, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল।

দ্বিতীয়ত, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই, এক নব জাগরণ আসিয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই আমাদের যুবক দল সমাজের আনন্দহীন অবস্থা তীব্রভাবে অনুভব করিয়া, জীবনকে আর্টের ভিতর দিয়া একটু সরস করিয়া অনুভব করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। তাহার পর গত বৎসর কবি নজরুলের আগমনে তাহাদের আকাঙ্ক্ষা উদ্বেল হইয়া এই ঔৎসুক্য ও উৎসাহ কার্য্যে প্রকাশ পাইয়া অনেকটা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। এ বৎসর আমাদের সাময়িক অধিবেশনগুলিতে অনেকগুলি গান গাওয়া হইয়াছিল, এবং সুখের বিষয়, গায়কের কোন অভাব বোধ করা যায় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এমন কি গত বৎসরেও সঙ্গীতের কোন আয়োজন করিতে হইলেই, হিন্দু ভ্রাতৃদের অথবা বাহিরের লোকের সাহায্য লইতে হইত। কিন্তু এ বৎসর প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনে দুই তিনটি করিয়া গান হইয়াছিল, এবং তাহা আমাদের মুসলিম হলের ছাত্রদিগের দ্বারাই গীত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া আমরা যেরূপ নির্ব্বিঘ্নে ও স্পষ্টভাবে আমাদের মতমত প্রকাশ করিতে পারিতেছি, কিছুকাল পূর্ব্বে তাহা অসম্ভব ছিল। এখন আমাদের চিন্তাধারার সহিত সংরক্ষণশীল আরবী শিক্ষিত সমাজের ভাবধারার সংমিশ্রণ হওয়ায়, বিচার বুদ্ধি অনেকটা জাগ্রত হইয়াছে। আমার মনে হয়, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, বর্ত্তমানে ঢাকার মৌলভী ছাত্রগণ (যাহারা স্থিতিশীল বলিয়া চির পরিচিত) তাহারাও মুক্ত বুদ্ধি এবং স্বাধীন চিন্তার ক্ষেত্রে হয়ত ঢাকার বাহিরেও অনেক তথাকথিত সাহিত্যিকদের চেয়েও অধিক অগ্রসর। আমাদের চেষ্টার এই প্রাথমিক ফল বাস্তবিকই আশাজনক, এবং ইহার পরিমাণও নিতান্ত সামান্য নহে। আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র মুসলমান জগতে উন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। আমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া যতদূর সম্ভব, উচ্চতর সভ্যতাকে আহ্বান করিয়া আনিবার উপযুক্ত শক্তি ও মনোবৃত্তি অর্জ্জন করিতে হইবে।

গত বৎসর 'শিখা'য় যে একখনা ছবি দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন। তাহাদের ধারণা যে, মসজিদ ও কোরান শরিফকে আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিতে হইবে, উক্ত ছবিতে তাহাই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা বাগবিতণ্ডা না করিয়া, ছবিখানি যে অর্থে 'শিখা'য় সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছিল তাহাই সাধারণ্যে গোচর করিতেছি। ছবির বাম দিকে মরুভূমির উপর কয়েকটি খেজুর গাছ আছে। তাহাই মুসলিম জ্ঞান ও সভ্যতার জন্মভূমি। জ্ঞান ও সভ্যতার আগুন প্রথমে কিছু দিন ক্ষীণভাবে থাকিয়া, মুসলিম গৌরবের দিনে অতি উজ্জ্বল ও ব্যাপকভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে তাহা নির্ব্বাপিত প্রায় হইয়া অনেকদিন যাবত অন্ধকার ধূমমাত্রে পর্য্যবসিত ছিল। অতি আধুনিককালে সেই কুণ্ডলীকৃত ধূমরাশির অগ্রভাগে আবার এক অগ্নিশিখা দেখা

www.pathagar.com

যাইতেছে ইহা দ্বারা ইসলামের নব জাগরণ সূচিত হইতেছে। ছবির ডান দিকে দেখুন, যে মসজিদ পূর্ব্বে জ্ঞানের কেন্দ্রস্থল ছিল, তাহা বর্ত্তমানে অন্ধকার পূর্ণ, এবং সেই অন্ধকারের ভিতর একখানা বন্ধ করা কোরান শরিফ রহিয়াছে, তাহা খুলিবার লোকটি পর্য্যন্ত নাই। আর ঐ মসজিদের চতুর্দ্দিকে জঞ্জাল আবর্জ্জনা পরগাছা প্রভৃতি স্পর্দ্ধার সহিত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ইসলামের নব প্রজ্জ্বলিত 'শিখা'য় আবার অন্ধকার স্থান আলোকিত হইবে এবং জঞ্জাল আবর্জ্জনা পুড়িয়া গিয়া কোরান ও মসজিদের সত্যরূপ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইবে।

গত বৎসরের মত এ বৎসরও আমাদের কোন চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা নাই। ডেলিগেট ও অভ্যর্থনা সমিতির মেম্বরদের নিকট হইতে যাহা আদায় হয়, তাহা বার্ষিক অধিবেশনেই নিঃশেষ হইয়া যায়। এই সম্পর্কে আমরা অত্যন্ত আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, গত বৎসর শ্রদ্ধেয় সৈয়দ এমদাদ আলী সাহেব স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া আমাদের সমিতির সাহায্যার্থে পাঁচ টাকা দান করিয়াছিলেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত সে দান স্বীকার করিতেছি।

গত বৎসরের সভাপতি খান বাহাদুর তসদ্দুক আহম্মদ এম.ইডি. সাহেব এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ এ.এফ. রহমান সাহেব এ বৎসর এখানে নাই। এতদ্ব্যতীত আমাদের আরেকজন বিশেষ উদ্যোগী বন্ধু মৌলভী আনোয়ারুল কাদির সাহেবও অনুপস্থিত। আজকার দিনে তাঁহাদের কথা বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে। তাঁহারা উপস্থিত থাকিলে বড় সুখের বিষয় হইত।

শ্রদ্ধাস্পদ কাজী ইমদাদুল হক মরহুমের জীবনেতিহাস সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা আমাদের একটি সংকল্প ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেবল কমিটি গঠন করা ছাড়া, এ কার্য্য আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। তথ্য সংগ্রহের জন্য নানা স্থানে পত্র লিখিয়াও কোন সাড়া পাওয়া যায় নাই। এরূপ নিশ্চেষ্টতা বড়ই দুঃখের বিষয়। আশা করি, ভবিষ্যতে এরূপ অবস্থা আর থাকিবে না।

আমাদের সাময়িক অধিবেশনে খান বাহাদুর তসদ্দুক আহমদ সাহেব, ডাক্তার শ্রী রমেশচন্দ্র মুজমদার, খান সাহেব আব্দুর রহমান খাঁ এবং অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন ; শ্রীযুক্ত নলিনী ভট্টশালী, শ্রীযুক্ত চারু বন্দোপাধ্যায়, মৌলভী মোমতাজ উদ্দীন আহমদ, মৌলভী মোহাম্মদ আবদুর রশীদ, কাজী নুরুল হক, মৌলভী আবদুল ওদুদ, মৌলভী আমিনুর রসুল, মৌলভী নাজীর আহমদ, মৌলভী গোলাম মওলা, মৌলভী খোরশেদ উদ্দীন আহম্মদ, মৌলভী আবদুল হক, মৌলভী নাজীর আহমদ, মৌলভী আলী নূর, মৌলভী এ.কে. আহমদ খাঁ, কাজী মহব্বত আলী, মৌলভী মুসলিম উদ্দীন খাঁ, মৌলভী শফিকুর রহমান, মৌলভী মোহাম্মদ হুসেন, মৌলভী ফয়েজ আহমদ, মৌলভী আবদুল কাদের, মৌলভী আনোয়ারুল কাদির, এ.জেড নুর আহমদ, মৌলভী বেলায়েত আলী খাঁ, মৌলভী রজব আলী মজুমদার, মৌলভী আবদুস সালাম খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই আমাদের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। তৎসহ গায়কগণকে, প্রবন্ধ লেখকগণকে এবং প্রতিবারের উপস্থিত

www.pathagar.com

ভদ্রমহিলা ও ভদ্র মহাদয়গণকে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছি যে, তাঁহাদের সমবেত চেষ্টা না হইলে আমরা কিছুই করিতে পারিতাম না। আশা করি ভবিষ্যতেও ইঁহাদের সকলের ঐকান্তিক চেষ্টা উৎসাহের বলে আমাদের সাধনা ও আকাঙ্ক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

الا ان نمس الله قری ب ط

এখন, নিশ্চয়ই আল্লাহর মদদ অতি নিকটবর্ত্তী

কোরান।

www.pathagar.com

বাংলার জাগরণ

কাজী আবদুল ওদুদ

আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা এই যে বাংলার জাগরণ পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল। কথাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু পুরোপুরি সত্যও যে নয় সে দিকটা ভেবে দেখবার আছে। যাঁরা এই জাগরণের নেতা তাঁরা কি উদ্দেশ্য আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ও এই জাগরণের ফলে দেশের যা লাভ হয়েছে তার স্বরূপ কি, এই সমস্ত চিন্তা করলে হয়ত আমাদের কথা ভিত্তিশূন্য মনে হবে না। রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার থেকে আরম্ভ করে বাজনা ও গোহত্যা নিয়ে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা পর্য্যন্ত আমাদের দেশের চিন্তা ও কর্ম্মধারা, আর ডিইষ্ট এনসাইক্লোপিডিষ্ট থেকে আরম্ভ করে' বোলশেভিজম পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য চিন্তা ও কর্ম্মধারা এই দুইয়ের উপর চোখ বুলিয়ে গেলেও বুঝতে পারা যায়—আমাদের দেশ তার নিজের কর্ম্মফলের বোঝাই বহন করে চলেছে। পাশ্চাত্যের সঙ্গে তার পার্থক্য যথেষ্ট লক্ষ্যযোগ্য। এই পার্থক্য এই সঙ্গে আমাদের জন্য আনন্দের ও বিষাদের। আনন্দের এই জন্য যে এতে করে' আমাদের একটা বিশিষ্ট সত্তার পরিচয় আমরা লাভ করি অসভ্য বা অর্দ্ধসভ্য জাতির মত আমরা শুধু ইয়োরোপের প্রতিধ্বনি মাত্র নই ; আর বিষাদের এই জন্য যে আমাদের জাতীয় চিন্তা ও কর্ম্ম-পরম্পরার ভিতর দিয়ে আমাদের যে ব্যক্তিত্ব সুপ্রকট হয়ে ওঠে সেটি অতীতের অশেষ অভিজ্ঞতা পুষ্ট অকুতোভয় আধুনিক মানুষের ব্যক্তিত্ব নয়, সেটি অনেকখানি অল্প পরিসর শাস্ত্রশাসিত মধ্যযুগীয় মানুষের ব্যক্তিত্ব।

এই সঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, রামমোহন থেকে আমাদের দেশে যে নবচিন্তা ও ভাবধারার সূচনা হয়েছে পরে পরের চিন্তা ও কর্ম্মধারা কেবল যে তার পরিপোষক হয়েছে তা নয়, এমন কি প্রবলভাবে তার বিরুদ্ধাচারীই হয়েছে বেশী। আর উদ্দেশ্য আদর্শের এই সমস্ত বিরোধ একটা বীর্য্যবান সামঞ্জস্য লাভ করে আমাদের জাতীয় জীবন ও কর্ম্মের যে একটা বিশিষ্ট ধারা সূচিত করবে তা থেকেও আমরা এখনো দূরে।

২.

বাংলার নবজাগরণের প্রভাত-নক্ষত্র যে রাজা রামমোহন রায় সে সম্বন্ধে কোনো মতভেদ নাই। কিন্তু তাকে জাতীয় জাগরণের প্রভাত নক্ষত্র না বলে প্রভাত সূর্য্য বলাই উচিত, কেননা, জাতীয় জীবনে কেবল মাত্র একটি নব চৈতন্যের সাড়াই তার ভিতরে অনুভূত হয় না, সেই দিনে এমন একটি বিরাট নব আদর্শ তিনি জাতির সামনে উপস্থাপিত করে' গেছেন যে, এই শত বৎসরেও আমাদের দেশে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই যার আদর্শ

www.pathagar.com

রামমোহনের আদর্শের সঙ্গে তুলিত হতে পারে। এমন কি, এই শত বৎসরে আমাদের দেশে অন্যান্য যে সমস্ত ভাবুক ও কর্ম্মী জন্মেছেন তাঁদের প্রয়াসকে পাদপীঠরূপে ব্যবহার করে তার উপর রামমোহনের আদর্শের নব প্রতিষ্ঠা করলে দেশের জন্য একটা সত্যিকার কল্যাণের কাজ হবে এই আমাদের বিশ্বাস।

এই রামমোহন যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ ইত্যাদির দিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নাই। তবু এ কথা সত্য যে এই পাশ্চাত্য কৃষ্টির সংস্রবে তিনি এসেছিলেন পূর্ণযৌবনে। তার আগে আরবী ফার্সী ও সংস্কৃত অভিজ্ঞ রামমোহন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বাদানুবাদ করেছেন, গৃহত্যাগ করে তিব্বত, উত্তর ভারত ভ্রমণ করেছেন, আর সেই অবস্থায় নানক, কবীর প্রভৃতি ভক্তদের ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন—যাঁরা হিন্দু-চিন্তার উত্তরাধিকার স্বীকার করেও পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। এই সব ভেবে দেখলে ও তার চিত্তের উপর মোতাজেলা সুফী প্রভৃতির প্রভাবের কথা স্মরণ করলে বলতে ইচ্ছা হয়, ভারতে মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের সভ্যতা ও ধর্ম্মের সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন যে নানক, কবীর, দাদু, আকবর, আবুল ফজল, দারাশেকো প্রভৃতি ভক্ত ভাবুক ও কর্ম্মীর দল, অষ্টাবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদের রামমোহন তাদেরই অন্যতম। অবশ্য মধ্যেযুগের সমস্ত খোলস চুকিয়ে দেওয়া একেবারে আধুনিক কালের এক পরম শক্তিমান মানুষের চিত্ত ক্রমেই আমরা তাঁর ভিতরে বেশী করে অনুভব করতে পারছি। কিন্তু সেটি হয়ত তাঁর উপর আধুনিক কালের ইয়োরোপের প্রভাবের জন্যই নয়, আধুনিক ইয়োরোপ যেমন করে মধ্যযুগেরই কুক্ষি থেকে উদ্‌গত হয়েছে রামমোহনের বিকাশও হয়ত সেই ধরনেরই ব্যাপার।

এই একটি লোক রামমোহন হিন্দুর সঙ্গে তর্ক করেছেন বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত পুরাণ, তন্ত্র, সংহিতা ও সেই সমস্তের টীকা নিয়ে, মুসলমানের সঙ্গে তর্ক করেছেন কোরান, হাদিস, ফেকা, মন্তেক ইত্যাদি নিয়ে, আর খৃষ্টানের সঙ্গে তর্কে ব্যবহার করেছেন ইংরেজী গ্রীক ও হিব্রু বাইবেল ও বড় বড় খৃষ্টান পণ্ডিতের মতামত। এই লোকটিই আবার সতীদাহ নিবারণের জন্য লড়েছেন, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, চীনের সঙ্গে অবাধ বাণিজ্য, নারীর দায়াধিকার, বাংলা ব্যাকরণ, ইংরেজের শাসনের সমালোচনা ও সেই ক্ষেত্রে পথনির্দ্দেশ, এই একটি লোকেরই কর্ম্মের প্রেরণা যুগিয়েছে। এই বিরাট পুরুষের জীবন কথা ও বিভিন্ন রচনা আলোক-পথের পথিক দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের নিত্য-সঙ্গী হবার যোগ্য। কিন্তু এই আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের দ্রষ্টব্য দেশের সামনে কি নির্দ্দেশ তিনি রেখে গেলেন। সেই সম্পর্কে মোটামুটিভাবে বলতে পারা যায়, ধর্ম্মের ক্ষেত্রে তার নির্দ্দেশ এক নিরাকার পরম ব্রহ্মের উপাসনা, লোকশ্রেয় ও বিচার-বুদ্ধির দ্বারা পরিশোধিত শাস্ত্র, সেই জন্য পরে পারের উপশাস্ত্রসমূহ প্রত্যাখ্যান করে প্রত্যাবর্ত্তন মূল শাস্ত্রসমূহে ; শিক্ষার ক্ষেত্রে, ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশেষ অনুশীলন ; সমাজের ক্ষেত্রে,—লোক হিতকর অনুষ্ঠানসমূহের প্রবর্ত্তনা, যা অনিষ্টকর তা প্রাচীন হলেও বর্জ্জনীয়, আর রাজনীতির ক্ষেত্রে,— ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস-এর মত একটা কিছুর আশা রাখা। এমনিভাবে নানা আন্দোলনে সমগ্র দেশ আন্দোলিত করে' ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন—সেই যাত্রা তাঁর মহাযাত্রা।

www.pathagar.com

৩.

রামমোহন জাতীয় জীবনে যে সমস্ত কর্ম্মের প্রবর্ত্তনার সংকলন করেছিলেন তার মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দু কলেজ অনতিবিলম্বে ফল প্রসব করতে আরম্ভ করে। হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডিরোজিওর নাম চির দিনের জন্য একসূত্রে গাঁথা হয়ে গেছে। এই ডিরোজিও যে গুরুর শিষ্য 'ফরাসী' বিপ্লবের চিন্তার স্বাধীনতা বহ্নি তাঁর ভিতরে প্রজ্বলিত ছিল। ডিরোজিওর সেই বহ্নি-দীক্ষা হয়েছিল। অল্প বয়সে যথেষ্ট বিদ্যা অর্জ্জন করে' কবি ও চিন্তাশীল রূপে তিনি খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বিশ বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক রূপে নিয়োজিত হন, আর তিন বৎসর শিক্ষকতা করার পর সেখান থেকে বিতাড়িত হন। এরই ভিতরে তাঁর শিষ্যদের চিত্তে যে আগুন তিনি জ্বালিয়ে দেন তাঁর কলেজ পরিত্যাগের পরও বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁর তেজ মন্দীভূত হয় নাই। শুধু তাই নয়, নব্যবঙ্গের গুরুদের ভিতরে এই ডিরোজিওর এক বিশিষ্ট স্থান আছে। এঁর শিষ্যেরা অনেকেই চরিত্র, বিদ্যা, সত্যানুরাগ ইত্যাদির জন্য জাতীয় জীবনে গৌরবের আসন লাভ করেছিলেন, এরই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু সমাজের আচার-বিচার, বিধি-নিষেধ ইত্যাদির লঙ্ঘন দ্বারা সুনাম বা কুনাম অর্জ্জন করে সমস্ত সমাজের ভিতরে একটা নব মনোভাবের প্রবর্ত্তনা করেন।

ডিরোজিওর দলকে আমাদের কোনো কোনো সাহিত্যিক প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পেয়েছেন রামমোহনের বিরুদ্ধ দল বলে। কেননা এই দল ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন ত ছিলেনই অনেক সময় নাস্তিক ভাবাপন্ন ছিলেন। আর "If we hate anything from the bottom of our heart it is Hinduism" একথা তাদের কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবেই ঘোষণা করতেন। তবু এই ডিরোজিওর দল প্রকৃত প্রস্তাবে হয়ত রামমোহনের বিরুদ্ধ দল নয়। এই ডিরোজিওর দলের অনেকে উত্তর কালে রামমোহনের ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ও কর্ম্মী হয়েছিলেন। আর বিদ্যা, চরিত্রবল, জনহিতৈষণা ইত্যাদি গুণে এঁরা যেভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিলেন তাতে রামমোহনের বিদেহী আত্মার স্নেহাশীষই তাঁরা লাভ করেছিলেন।

রামমোহন ইয়োরোপীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের চমৎকারিত্বের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন মাত্র, কিন্তু সেই জ্ঞানের স্বাদ বাঙালী প্রকৃত প্রস্তাবে পায় ডিরোজিওর কাছ থেকে। এই স্বাদের চমৎকারিত্ব কত তা এই থেকে বোঝা যাবে যে বাংলার চির আদরের মধুসূদন এই ডিরোজিওর প্রভাবের গৌণ ফল। তা ছাড়া সাধারণত বিদ্যানুরাগী বাঙালী হিন্দু এই ডিরোজিওর প্রদর্শিত পথে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেছিলেন তা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। আজও বাঙালী হিন্দুর বিদ্যানুরাগ কমে নাই, কিন্তু ডিরোজিওর শিষ্য-প্রশিষ্যদের সেই আন্তরিকতার লালিমা একটু কেমনতর হ'য়ে গেছে বৈ কি।

কিন্তু এত গুণ ও কার্য্যকারিতা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে ডিরোজিওর দল দুই এক পুরুষের বেশী প্রাণ ধারণ করে' থাকতে সমর্থ হন নাই। আর আজ তাঁরা বাস্তবিকই নির্মূল হয়ে গেছেন। কেন এমন হয়েছে তা ভাবতে গিয়ে হয়ত বলতে পারা যায়, তাঁরা দেশের ইতিহাসকে একটুও খাতির করতে চান নাই'—পবননন্দনের মতো আস্তো ইয়োরোপ-গন্ধমাদন এদেশে বসিয়ে দিতে তাঁরা প্রয়াস পেয়েছিলেন। তবে অন্য একটি কথাও ভাববার আছে। তাঁরা যাই করুন না কেন, দীনচিত্ত তাঁরা ছিলেন না—তাঁদের কামনা-ভাবনা

www.pathagar.com

বাস্তবিকই রূপ নিয়োছিল তাঁদের জীবনে। আর সেই ডিরোজিওর শিষ্য-প্রশিষ্যদের চাইতে আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু যে সর্ব্বাংশে উন্নততর জীব তাও হয়ত সত্য নয়। তবু সেই ব্যক্তিত্ব ও সুরুচি সমন্বিত প্রাণবান সারবান অপেক্ষাকৃত সরল চিত্ত ডিরোজিও-দল আমাদের নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। অবশ্য চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন কিনা কে জানে। কে জানে এত জাতি-সম্প্রদায় বিখণ্ডিত এত শাস্ত্র-উপশাস্ত্র ভার-ক্লিষ্ট এত পূর্ণাবতার খণ্ডাবতার নিপীড়িত বাঙালী-জীবন আবার কোনোদিন বলবে কি না Derozio, Bengal hath need of thee!

৪.

রামমোহনের শ্রেষ্ঠ দান কী তা নিয়ে আগেও বাংলাদেশে তর্ক বিতর্ক হয়েছে, ভবিষ্যতের জন্যও যে সে তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা চুকে গেছে তা নয়। তবে যে সমস্ত বাদ প্রতিবাদ হয়েছে তার মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের বাদানুবাদই সুবিখ্যাত। দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বর-প্রেমিক পুরুষ ছিলেন। হাফেজের যে সব লাইন তাঁর অতি প্রিয় ছিল তার একটি এই—হরগিজম মোহরে তু আজ লওহে দিল ও জাঁ ন বরদ* তাঁর জীবনের সমস্ত সম্পদ বিপদের ভিতর দিয়ে তাঁর এই প্রেমের পরিচয় তাঁর দেশ-বাসীরা পেয়েছেন। প্রথম জীবনেই যে পরীক্ষায় তাঁকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছিল তা কঠোর-সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সর্ব্বস্ব দানে তিনি পিতৃঋণ হ'তে উদ্ধার পাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। সত্যের যাত্রাপথে 'মহান মৃত্যু'র এমনিভাবে সম্মুখীন হওয়া সমস্ত বাঙালী জীবনে এক মহা ঘটনা যাকে বেষ্টন করে বাংলার ভাবস্রোতের নৃত্য চলতে পারে হয়ত চলেছে। কিন্তু গুহাপথের যাত্রী হ'য়েও দেবেন্দ্রনাথ গভীরভাবে জ্ঞানানুরাগী ও সৌন্দর্য্যা-নুরাগী ছিলেন। তবু সংসারনিষ্ঠা, জ্ঞানানুশীলন, সৌন্দর্য্যস্পৃহা, সমস্তের ভিতরে ঈশ্বর-প্রেমই ছিল তার অন্তরের অন্তরতম বস্তু। তাই তিনি যে রামমোহনকে মুখ্যতঃ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচারকরূপে দেখবেন এ স্বাভাবিক। কিন্তু অক্ষয়কুমার ছিলেন জ্ঞান-পিপাসু ; সে পিপাসা এমন প্রবল যে এত দিনেও বাংলাদেশে সে রকম লোক অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করেছেন। এই অক্ষয়কুমার মত প্রকাশ করেছেন যে, রাজার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার। জ্ঞানানুশীলন অক্ষয়কুমারের কাছে এত বড় জিনিষ ছিল যে, এ ভিন্ন অন্য রকমের প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করতেন না। তাঁর সেই সুবিখ্যাত সমীকরণ বাংলার চিন্তার ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে। শুধু প্রার্থনার যে কিছুমাত্র কার্য্যকারিতা নাই তা প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি লিখেছেন—কৃষক পরিশ্রম করে' শস্য উৎপাদন করে, প্রার্থনা করে' নয়। একেই তিনি একটি সমীকরণের রূপ দিয়েছেন এইভাবে :—

প্রার্থনা+পরিশ্রম = শস্য
পরিশ্রম = শস্য
অতএব প্রার্থনা = 0

---

* তোমার ছাপ আমার চিত্তফলক থেকে কিছুতেই মুছবে না।

www.pathagar.com

অক্ষয়কুমারের এই মনোভাব কিছুদিন ব্রাহ্ম সমাজে ও সেইদিনের ছাত্র মহলে কার্য্যকরী হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর প্রভাব ব্রাহ্ম সমাজে অক্ষুণ্ন হয় নাই—হয়তো বা দেশের বৃহত্তর জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমন ফলপ্রসূ হয় নাই।

শেষ পর্য্যন্ত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যানই রামমোহনের পরে ব্রাহ্ম সমাজ গ্রহণ করেছিল ; আর নানা বিপর্য্যয়ের পর আজো তাঁর নির্দ্দেশেই হয়তো অধিকাংশ ব্রাহ্মের জীবন কার্য্যকরী রয়েছে।

কারো কারো বিশ্বাস দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের যে রূপ দিয়েছিলেন তা রামমোহনের উদ্দেশ্য আদর্শ থেকে পৃথক বস্তু। কিন্তু তা সত্য নয় এই জন্য যে, যে-দ্বিতবাদের উপর দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম সমাজের ভিত্তি পত্তন করেছিলেন রামমোহনের জীবনে তা'রই প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। সত্য বটে তিনি বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্য অবলম্বন করেছিলেন ; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে তাঁর মতভেদ বিস্তর ; এমন কি, অধিকাংশ হিন্দু সাধক ও দার্শনিকের অবলম্বিত Pantheistic God-এর চাইতে হিব্রু প্রফেটদের ব্যক্তিত্ব-সমন্বিত পাপ-পূণ্য ভাল-মন্দের নিয়ামক ঈশ্বরের দিকেই তাঁর চিত্তের প্রবণতা হয়তো বেশী ছিল। তবে রামমোহনের চিত্তের প্রসার ছিল অনেক বেশি, তাই ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যে রূপ দিয়েছিলেন, কর্ম্মী জ্ঞানী ও অন্তঃবাহী ভক্তিরস-সমন্বিত রামমোহনের বিরাট ইচ্ছাধারা তাতে অবলীলাক্রমে প্রবাহিত হতে পারবে তা আশা করা সঙ্গত নয়। কোনো বড় স্রষ্টাই তার সৃষ্টির মধ্যে পুরোপুরি ধরা পড়েন নাই ; রামমোহনের সূচিত ব্রাহ্ম সমাজ যদি তার বিরাট চিত্তের প্রতিচ্ছবি না হয়ে থাকে তবে তাতে দুঃখ করবার বিশেষ কিছু নাই।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্ম্মের যে রূপ দিয়েছিলেন তাতে যে শুধু তাঁর ব্যক্তি উচ্ছ্বসিত চিত্তের তরঙ্গাভিঘাতই বুঝতে পারা গেছে তা সত্য নয়। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তিভূমি নির্ণয়ে তিনি যে মনীষার পরিচয় দিয়েছেন তাতে দেশের চিত্ত বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর একটি বড় আসন লাভ হয়েছে। প্রথমে বেদকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করতে চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু দেখা গেল বেদের সব কিছু আশানুরূপ সুন্দর নয়। তারপর তিনি নির্ভর করতে গেলেন উপনিষদের উপর। সেখানেও মুস্কিল যে উপনিষদ বহু রকমের। তার উপর শুধু দ্বৈতবাদের প্রতিপাদক বচনই নয় অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদক বচনের সংখ্যাও তাতে কম নয়। এই সংকটে জ্ঞানবীর অক্ষয়কুমারের পরামর্শ মতো 'আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'-এর উপর ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করা হলো। এইভাবে মানুষের চিত্তকে যে নূতন করে এক গরীয়ান আসন দেওয়া হলো, তার অর্থ কত, ইঙ্গিত কি বিপুল, দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলার জাতীয় জীবনের সামনে থেকে আজ সে সব চিন্তা দূরে স্থিত। তাই জাতীয় জীবনে অক্ষয় কুমার-দেবেন্দ্রনাথের এই দানের জন্য তাঁদের প্রতি স্বদেশবাসীদের অন্তরের শ্রদ্ধা-নিবেদন আজো তেমন পর্য্যাপ্ত নয়।

৫.

আমরা বলেছি বাংলায় এ পর্য্যন্ত যে চিন্তা ও কর্ম্মধারার বিকাশ হয়েছে তাতে মধ্যযুগীয় প্রভাব বেশী। দেবেন্দ্রনাথের কাব্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি মানুষের চিত্তকে ব্রহ্ম পাদপীঠ বলে' সম্মান দিয়েছেন। শুধু প্রাচীন ঋষিদের যে কেবল সে অধিকার ছিল তা তিনি মানেন নাই। কিন্তু এই আবিষ্কৃত সত্যের পুরো ব্যবহারে তিনি যেন কেমন সঙ্কোচবোধ

www.pathagar.com

করেছেন। এই 'আত্মপ্রত্যয়-সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়' কথাটি তিনি পেয়েছিলেন উপনিষদ থেকে—নিজের জীবনের ভিতরে এ কথার সায় তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন। কিন্তু অনন্ত প্রয়োজনতাড়িত মানুষকে এই অমৃতের সাধনা জীবনের সমস্ত কর্ম্ম সমস্ত অবসর, সমস্ত প্রার্থনা, সমস্ত অপ্রার্থনার ভিতর দিয়ে করতে হবে শুধু বিধিবদ্ধ প্রার্থনার ভিতর দিয়েই নয়—এতটা অগ্রসর হ'তে তিনি যেন পশ্চাদপদ হয়েছেন। হয়তো বৃহত্তর মনীষা নিয়ে তিনি যদি অক্ষয়কুমারকে আত্মসাৎ করতে পারতেন তাহলে ব্রাহ্ম সমাজ তাঁর হাতে যে রূপ লাভ করত তা দেশের পক্ষে আরো কল্যাণদায়ক হতো।

দেবেন্দ্রনাথের এই যে অন্তরে অন্তরে সেই ব্রহ্মোল্লাস অনুভব করা, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ যে তার দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞান ও কর্ম্মের ভিতর দিয়ে শ্রেয়ের অন্বেষণ করে যাবে, যে অন্বেষণে মুখের প্রার্থনার প্রয়োজন সে অনুভব করতে পারে, নাও পারে। অনন্ত কর্ম্ম ও প্রেম-পুলকিত মানুষের জীবনে তা'র আরাধ্য হয়তো তা'রই জীবনের সুরভি, হয়তো তা'র জ্ঞাননেত্রে বিশ্বজগতের নিয়ামক, হয়তো বিশ্বজগতের জন্য তা'র প্রেমের বন্ধন, হয়তো কর্ম্মক্ষেত্রে তা'র চিরজাগ্রত নেতা, অক্ষয়কুমারের ভিতর দিয়ে উৎসারিত এই আধুনিক মনোভাবকে যে তিনি তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতে পারেন নাই, এই খানেই তাঁর মধ্যযুগীয়ত্ব ; এবং আধুনিক জীবনোপযোগী জগনানুরাগ সুমার্জ্জিত জীবন-যাপন ইত্যাদি সত্ত্বেও তিনি যে বৃদ্ধ বয়সে ভাবের আতিশয্যে নৃত্য করতে পেরেছিলেন হয়তো তাঁর এই প্রগল্‌ভা মধ্যযুগীয় ভক্তিই তা'র কারণ। অবশ্য মধ্যযুগীয় বলে সে জিনিষটি যে তাচ্ছিল্য বা অসম্ভ্রমের চক্ষে আমরা দেখতে প্রয়াস পাচ্ছি, সে কথা মনে করলে আমাদের প্রতি অবিচার করা হবে। এখানে শুধু এই কথাটি আমরা বলতে চাচ্ছি যে এত চেষ্টা সত্ত্বেও আধুনিক অগ্রসর জাতিদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার সামর্থ্য যে আমাদের হচ্ছে না, তা'র এক বড় কারণ—আমাদের খাঁ'রা নেতৃস্থানীয় তাঁরাও খুব কমই আধুনিক জীবনের দিকে তাকিয়েছেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রৌঢ় বয়সে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের নেতা হন। তাঁর উপর খৃস্টের জীবন ও বাইবেলের প্রভাব বিশেষরূপে কার্য্যকরী হয়েছিল। কেশবচন্দ্রের প্রকৃতির সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির যে বিশেষ পার্থক্য ছিল অনেকেই সে কথা বলেছেন। কিন্তু এক জায়গায় বড় গভীর মিলও ছিল। সেখানে হয়তো কেশবচন্দ্র দেবেন্দ্রনাথেরই মানসপুত্র—সেটি প্রগল্‌ভা ভক্তি। দেবেন্দ্রনাথ রাশভারি লোক ছিলেন, তাই তাঁর অন্তরের এই প্রগলভা ভক্তি তাঁর বাইরের চেহারা কচিৎ আলু-থালু করতে পেরেছে। কিন্তু কেশবচন্দ্র আজন্ম 'অগ্নি মন্ত্রে'র উপাসক ; এই প্রগল্‌ভা ভক্তি তাঁকে প্রায় সব ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ইত্যাদির দিকে নিয়ে গেছে। নিত্য নূতন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছেন, আর শেষে জগতের সমস্ত ধর্ম্মের সার সংগ্রহ করে এক নব বিধান বা নব ধর্ম্মের পত্তনে অনুপ্রাণিত করেছে। কেশবচন্দ্র যে শেষ বয়সে পরমহংস রামকৃষ্ণের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন সেটি কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা নয়। বাংলার চির পরিচিত প্রগলভা ভক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার এই এক অদ্ভুত পুরুষ রামকৃষ্ণের জীবনে আশ্চর্য্য পরিণতি লাভ করেছিল ; যার প্রেরণায় কেশবচন্দ্র আজীবন নানা পথে ছুটাছুটি করেছেন তা এমন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে কারো ভিতরে সঞ্চিত দেখতে পেলে সেখানে তিনি যে নিজেকে বিকিয়ে দেবেন, এ যেমন স্বাভাবিক তেমনি সঙ্গত।

www.pathagar.com

৬.

সব ধর্ম্মই কি সত্য? এ প্রশ্নের মীমাংসায় রামমোহন বলেছিলেন বিভিন্ন ধর্ম্মের ভিতরে পরস্পরবিরোধী অনেক নিত্যবিধি বর্ত্তমান। তাই সব ধর্ম্মই সত্য একথা মানা যায় না। তবে সব ধর্ম্মের ভিতরেই সত্য আছে। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের এই মীমাংসা মেনে চলেছিলেন বলতে পারা যায় যদিও উপনিষদের দিকে তিনি বেশী ঝুঁকে পড়েছিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ভক্তি প্রধান প্রকৃতির কাছে রাজার এ মীমাংসা ব্যর্থ হলো। তিনি বললেন—'Our position is not that there are truths in all religions, but that all established religions of the world are true.' এই কথাই রামকৃষ্ণ আরো সোজা করে' বললেন 'যত মত তত পথ'। যত মত তত পথ ত নিশ্চয়ই; কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—সে সব পথ একই গন্তব্য স্থানে নিয়ে যায় কি না। রামকৃষ্ণ বললেন—'হাঁ তাই যায়।' তিনি সাধনা করে দেখেছেন, শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, সুফী, খৃষ্টান ইত্যাদি সব পথই এক 'অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতিতে নিয়ে যায়। এ সব কথার সামনে তর্ক বৃথা। তবে এই একটি কথা বলা যেতে পারে যে, মানুষ অনেক সময়ে বেশী ক'রে যা ভাবে চোখেও সে তাই দেখে।

রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কেউ বলেছেন অবতার, কেউ বলেছেন উন্মাদ। কিন্তু যিনি যাই বলুন, বাংলার হিন্দু-চিত্তের উপর তার কথার প্রভাব যে অত্যন্ত বেশী তাতে সন্দেহ নাই। পৌরাণিক ধর্ম্মকে সরিয়ে দিয়ে তা'র স্থানে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু জনসাধারণের কাছে প্রতিপন্ন হয়েছে—পৌরাণিক ধর্ম্মের কিছুই বাজে নয়, তা'রই পরতে পরতে রয়েছে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, হয়তো বা তা'র চাইতেও ভাল কিছু।

৭.

বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম চর্চ্চার উপরে যে একটা মধ্যযুগীয় ছাপ মারা রয়েছে তা আমরা দেখেছি। কিন্তু বাংলার নব বিকশিত সাহিত্যে যেন এই ত্রুটির স্খলনের চেষ্টা প্রথম থেকেই হ'য়ে আসছে। বালার নব সাহিত্যের নেতা মধুসূদন আশ্চর্য্য উদার চিত্ত নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জাতি ধর্ম্ম ইত্যাদির সংকীর্ণতা যেন জীবনের ক্ষণকালের জন্যও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নাই; আর এই উদারচিত্ত কবি ইয়োরোপের ও ভারতের প্রাচীন কাব্যকলার শ্রেষ্ঠ সম্পদ যে ভাবে অবলীলাক্রমে আহরণ করে' তাঁর স্বদেশ-বাসীদের উপহার দিয়েছেন সে কথা বাঙালী চিরদিনই বিস্ময় ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। বাঙ্গালী তাঁর পরে সাহিত্যের যে নেতা বাঙ্গালী জীবনের উপর একটা অক্ষয় ছাপ রেখে গেছেন তিনিও প্রথম জীবনে শিল্পী, সুতরাং, সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা অস্পৃষ্ট। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতর কবিজনসুলভ স্বপ্ন কম। তিনি বরং নিপুণ চিত্রকর ও বাস্তববাদী স্বদেশ প্রেমিক। তাই তাঁর যে অমর কীর্ত্তি 'আনন্দ মঠ' তাতে হয়ত নায়ক নায়িকার গূঢ় আনন্দ-বেদনার রেখাপাত নাই, হয়ত এমন কোনো সৌন্দর্য্য মূর্ত্তি আঁকা হয় নাই, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে' মানুষের নয়নে প্রতিভাত হবে A thing of beauty আর সেই জন্য a joy for ever কিন্তু তবু এটি অমর এই জন্য যে এতে যেন লেখক কি একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতায় পাঠকের সামনে প্রসারিত করে' ধরেছেন, দেশের দুর্দ্দশা মথিত তাঁর রক্তাক্ত হৃদয়—যে হৃদয় তাঁর সুগভীর বাস্তবতার জন্যই সৌন্দর্য্যের এক রহস্যময় খনি।

www.pathagar.com

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত শিল্পের ক্ষেত্রে থাকতে পারেন নাই ; শেষ বয়সে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে তিনি অবতরণ করেছিলেন। তার চরিতাখ্যায়করা বলেন, শেষ বয়সে আত্মীয় বিয়োগে অধীর হয়ে তিনি ধর্ম্মে মনোনিবেশ করেন। কিন্তু 'কৃষ্ণ চরিত্রে' বঙ্কিমচন্দ্র যে শ্রম স্বীকার করেছেন, যে সুবৃহৎ আদর্শ স্বজাতির সামনে দাঁড় করাতে চেয়েছেন, তাকে আর্ত্তের কর্ম্ম না বলাই সঙ্গত। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধর্ম্মালোচনায়ও দেখতে পাওয়া যায় তাঁর দেশহিতৈষণা। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টা শেষ পর্য্যন্ত দেশের অগ্রগতিকে খানিকটা সাহায্য করলেও বেশী সাহায্য করতে পারে নাই। কেননা দেশ বলতে কেমন করে তিনি বুঝেছিলেন দেশের হিন্দু তাও আবার সকল হিন্দু নয়, সমসাময়িক সংস্কারকদের হাতে যে হিন্দু কিছু দিশাহারা হয়ে পড়েছিল সেই হিন্দু। এখানেও তাঁর সেই স্বদেশ প্রেম ; কিন্তু এ প্রেম খুব গভীর হ'লেও কিছু একরোখা, তাই শেষ পর্য্যন্ত জাতির ত্রাণকর্ত্তার বড় আসন তাঁর স্বদেশবাসীরা হয়তো তাঁকে দিতে পারবেন না।

জাতির সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ-সাধনায় রামমোহনের সুর শেষ পর্য্যন্ত তাঁর পশ্চাদবর্ত্তীরা রাখতে পারেন নাই। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি মধুসূদন যে গ্রামে সুর ধরেছিলেন তা নেমে গেল। বঙ্কিমচন্দ্রই যখন নিজেকে দেশের কল্যাণের রাজপথে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারলেন না 'অন্যে পারে কা কথা'। তাই তার সমসাময়িক সাহিত্যিকদের রচনায় পরিমাণ যতই বেশী হোক, দশের করতালিতে যতই তাঁদের সাহিত্যিক জীবন মুখরিত হয়ে থাকুক, বাংলার চিত্তের উৎকর্ষসাধনে সাহায্য তাঁরা কিছুই করতে পারেন নাই বললে চলে ; বরং ধর্ম্মের ক্ষেত্রে যে মধ্যযুগীয় ভাবোন্মত্ততা সুপ্রকট হয়ে উঠল, নানাভাবে তাকেই তাঁরা প্রদক্ষিণ করেছেন।

৮.

কিন্তু বাংলাদেশ এমনিতর একটা প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়েই চলেছে, বৃহত্তর জীবনের দিকে তার গতিরুদ্ধ, এতটা বলতে গেলে সত্যের অপলাপ করা হবে। রামমোহন যে কর্ম্ম ও চিন্তার সূচনা করে গেলেন ও তাঁর পরে কেশবচন্দ্র—বঙ্কিমচন্দ্র—রামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দের ভিতর দিয়ে তার যে একটি প্রতিক্রিয়া হলো, এসব বিরোধ কোনো এক বীর্য্যবান সামঞ্জস্যে উপনীত হয় নাই, ও তার জন্য বাঙালীর জাতীয় চরিত্র ও কর্ম্মধারা একটা সুদর্শন বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করে নাই, এ সত্য। কিন্তু এ বিরোধ চুকিয়ে দিয়ে একটা উদার বীর্য্যবন্ত জাতীয়তার দিকে চোখ কারোই যে নাই তা সত্য নয়। জাতির এ নব প্রয়োজন দুইজন চিন্তা ও কর্ম্মবীরের জীবনের ভিতর দিয়ে ফুটেছে একজন বিবেকানন্দ, অপরজন রবীন্দ্রনাথ। বিবেকানন্দ পরম হংস রামকৃষ্ণের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। রামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধি ব্যাপারটি আমরা বুঝি আর নাই বুঝি কিন্তু এ সত্য যে, তিনি বার বার জোর দিয়েছেন জগৎ হিতের উপর। এ উপেক্ষা করে বিবেকানন্দ মুক্তির প্রার্থী হয়েছিলেন, তার জন্য তিনি তাঁকে ধিক্কার দিয়েছিলেন। বিবেকানন্দের ভিতরে দোষ কম নয়,—প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র মতো সব সময়ে তিনি যেন বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে লড়বার জন্য তৈয়ার, দ্বিতীয়তঃ সন্ন্যাস ও বেদান্তের তিনি গোঁড়া, তৃতীয়তঃ ব্রাহ্মদের যে তিনি নিন্দা করেছেন তাদের ঐতিহাসিক বোধ নাই বলে' সে অভিযোগটি তাঁর সম্বন্ধেও খাটে—ব্রাহ্মদের সংস্কারের প্রয়াসের কোনো অর্থ তিনি যেন পান নাই, অথচ তিনি নিজে একজন ছোটোখাটো সংস্কারক ছিলেন না ;

www.pathagar.com

চতুর্থতঃ ভারত আধ্যাত্মিক ইয়োরোপ জড়বাদী, ভারতকে ইয়োরোপের আচার্য্য হতে হবে, এই ধরনের কতকগুলো কথা প্রচার করে স্বজাতির অন্তঃসারশূন্য দম্ভের সহায়তাই তিনি বেশী করেছেন। তবু মোটের উপর এই বীরহৃদয় সন্ন্যাসী সত্যিকার স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন হয়তো মানব প্রেমিকও ছিলেন। তাই সেবাশ্রম প্রভৃতির সূচনা করে জাতীয় জীবনে তিনি যে বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করেছেন জাতির চিত্ত-প্রসারের জন্য বাস্তবিকই তা অমূল্য ; এবং জাতীয় জীবনের দৈন্যের জন্য নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও এই সব প্রতিষ্ঠান বাংলার হিন্দু যুবককে দেশের সত্যিকার সন্তান হতে যে অনেকখানি সাহায্য করছে তাতে সন্দেহ নাই।

তারপর রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয়তার যে রূপ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার সংকীর্ণতা ভেঙ্গে তাকে বৃহত্তর করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু তাঁর আদর্শের অনুপ্রেরণা এ পর্য্যন্ত বাংলার জাতীয় জীবনে কমই অনুভূত হয়েছে ; এখন পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়ত্বের আদর্শই দেশের জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে, বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ কবি, তাও আবার সূক্ষ্ম শিল্পী গীতি কবি ;তাই যে মহা-মানবতার গান তিনি গেয়েছেন আমাদের দেশের স্থূল প্রকৃতি জনসাধারণের জীবনে কত দিনে তার স্পন্দন জাগবে তা ভেবে পাওয়া দুষ্কর।

৯.

হিন্দুর নিজের ভিতরেই মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগের সংগ্রামের যখন এই চেহারা, তখন আর এক সমস্যা দেখা দিয়েছে—হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যেভাবে উঠেছে তা একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের দুর্দ্দশার প্রমাণ। মুসলমানের দুর্দ্দশা এই জন্য যে, এ সংগ্রামে সে যেভাবে জয়ী হবার স্বপ্ন দেখে তা থেকে বুঝতে পারা যায় তার স্বপ্ন দেখারই অবস্থা। বাস্তবিক মুসলমানের অবস্থা খুবই বিস্ময়কর—এতদিন ধরে পরিবর্ত্তিত অবস্থায় বাস করেও তন্দ্রার ঘোরে দুই একটি প্যান ইসলামী বোলচাল দেওয়া ভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে কোনরূপ জাগ্রত-চিত্ততার পরিচয় সে আজ পর্য্যন্ত দেয় নাই। আর হিন্দুর জন্য আফসোসের এই জন্য যে তার এত সংস্কার চেষ্টা এত সাধনা সত্ত্বেও এই সমস্যার একটা মীমাংসা করবার সামর্থ তার হল না। এই হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, যেন হিন্দু মুসলমান উভয়েরই আচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে বিধাতার জ্বালা এক তীব্র আলো,—এর ঔজ্জ্বল্যে আমরা দেখে নিতে পারছি-বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান ও কর্ম্মের উৎসবে আমাদের স্থান কোথায়।

বাংলার যে প্রতিক্রিয়ার উল্লেখ করা হয়েছে তা অনেক সময়ে এমন সামান্য কারণে হয়েছে যা থেকে বুঝতে পারা যায় প্রাচীন সংস্কার বাঙালীর জীবনে কত বদ্ধমূল চোখ খুলে জগতকে দেখতে সে কত নারাজ। এরই সঙ্গে এ কথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে বাঙালী এ পর্য্যন্ত তার চোখ খোলার সাধনার বড় সাধক রামমোহনকে মোটের উপর প্রত্যাখান করে এসেছে। এই প্রত্যাখানের কারণ সম্বন্ধে দুটি কথা বলা যেতে পারে। প্রথমতঃ বাঙালী সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ, আর রামমোহন লোকটি যেন আগা গোড়া নিরেট কাণ্ডজ্ঞান। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গালী হিন্দুর পরম আদরের প্রতিমাপূজার বিরুদ্ধে তিনি বেশ উঁচু গলায় কথা বলেছেন। এই প্রতিবাদকারী অথচ মহাপ্রাণ রামমোহনকে বাঙালী হিন্দু শেষ পর্য্যন্ত কিভাবে গ্রহণ করবে

www.pathagar.com

বলা সহজ নয়। কিন্তু বিশ্ব-জগতের দিকে বাস্তবিকই যদি তার চোখ পড়ে তা হলে সে হয়ত দেখবে—এই প্রতিবাদকারীর কথার ভিতরেই সত্যের পরিমাণ বেশী, তাই তাঁর পথ নির্দ্দেশই অনেক পরিমাণে কল্যাণ পথের নির্দ্দেশ। তাছাড়া রামমোহনকে গ্রহণ করা বাঙালী হিন্দুর জন্য সে শুধু আয়াস সাধ্যই হবে এটি সঙ্গত নয় এই জন্য যে রামমোহনও বাঙালী সন্তান। শুধু তাই নয়, তাঁর বিশাল দেহের ভিতরে যে চিত্তটি ছিল সমস্ত অভিনবত্ব সত্ত্বেও তা বাঙালীরই কোমল চিত্ত।

মনে হয়, বাঙালীর রামমোহনকে গ্রহণ করার সব চাইতে বড় অন্তরায় এইখানে যে, সে সাধারণত ঘরমুখো আর রামমোহন অবাল্য ঘরমুখো ছিলেন না। এই ব'হিরমুখো হওয়ার সাধনাই হয়ত বর্ত্তমান বাঙালী জীবনে বড় সাধনা হয়ত এরই সাহায্যে সবলতর কাণ্ডজ্ঞান, শ্রেষ্ঠতর পৌরুষ ইত্যাদি কল্যাণ পথের সম্বল আহরণ তার পক্ষে সহজ হবে। আর এই বাহিরমুখো হওয়ার উপায়ও তার অতি নিকটে। দৈব ঘটনার বহু হাত বহু সম্প্রদায় দেশের বুকে এক জায়গায় মিলেছে। সেই মিলনকে অন্তরের দিক দিয়ে সার্থক করে তোলাই হচ্ছে বাহিরমুখো হওয়ার বড় উপায়—বাঙালীর সৌভাগ্যরূপী তার এ যুগের কবি বার বার একথা বলেছেন।

এরই সঙ্গে মুসলমানের সত্যিকার জাগরণ যদি সম্ভবপর হয়, অর্থাৎ তার নিজের ধর্ম্মাদর্শ ও সভ্যতার ভিতর থেকে এক নব জীবনের প্রেরণা সে যদি লাভ করতে পারে, তাহলে কিছু বেশী সুফল লাভের সম্ভাবনা। যে গুরু তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন—ক্ষুধা লাগলে খেয়ে নামাজ পড়ো, তাঁর অনুবর্ত্তিতায় বস্তুতন্ত্র হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। আবার সেই জন্যই বস্তুর শিকলে বন্দী হওয়াও তার পক্ষে কম স্বাভাবিক নয়। ফলে মুসলমানের হয়েছেও তাই। এই মনের বন্ধন সহজভাবে চুকিয়ে দিয়ে মুসলমান নব মানবতার ধ্বজা বহন করবার যোগ্য হবে কিনা, অথবা কতদিনে হবে, জানি না। যদি হয়, তবে বাংলার কর্ম্ম ও চিন্তার ক্ষেত্রে তার দান কম হবে না—তা হলে স্বাপ্নিক হিন্দু ও বস্তুতন্ত্র মুসলমান এ দুয়ের মিলনে বাংলার যে অভিনব জাতীয় জীবন গঠিত হবে তার কীর্ত্তি কথা বর্ণনা করবার ভার ভবিষ্যৎ সাহিত্যিকের উপর থাকুক।

www.pathagar.com

সমবায় আন্দোলনে মুসলমানের কর্ত্তব্য

কমরুদ্দীন আহমদ (খান বাহাদুর)

কোরানের সুরা আল্-হজরাতে বলা হইয়াছে যে, 'হে মানব, আমি তোমদিগকে পুরুষ ও স্ত্রী, বিভিন্ন পরিবার এবং বংশে বিভাগ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি, তোমাদিগের পরস্পরের সহিত যেন পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে।' বস্তুতঃ আল্লার নিকট সেই ব্যক্তিই সাতিশয় প্রিয় যে তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্য সমাজের প্রত্যেকেই পরস্পরের সহিত ভ্রাতৃভাব ও সাম্য স্থাপন করিয়া তাহার সেবায় ও যত্নে আত্মনিয়োগ করিবে ইহাই মুসলমানের ধর্ম্ম পুস্তক কোরানের উপদেশ বাণী। আমরা ইতিহাস ও ধর্ম্ম পুস্তকে দেখিতে পাই যে, যুগে যুগে এই ধর্ম্মোপদেশের মহিমা উপলব্ধি করিয়াই এই মানব সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। আমাদিগের হজরত রসুলও এই ধর্ম্মবাণী অনুসরণ করিয়াই জগতে শান্তি ও ভ্রাতৃভাবের মহিমা প্রচার করিতে সমর্থ্য হইয়াছিলেন।

যখন দুর্দ্দান্ত আরব জাতি একে অন্যকে হিংসা করিয়া, পশুবৎ আত্মকলহে উন্মত্ত হইয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল, ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য একে অন্যের রক্তপাত করিতে দ্বিধাবোধ করিতেছিল না, তখন আমাদের পবিত্র রসুল তাহার অমূল্য উপদেশ দানে তাহাদিগের মধ্যে যথার্থ্য ভ্রাতৃভাব স্থাপনে সমর্থ্য হইয়া সমবায় সঙ্ঘ ও একতার অলৌকিক শক্তি জগতে প্রচার করিয়াছিলেন। যাঁহারা মনে করেন সমবায় একেবারে সম্পূর্ণ বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী, মুসলমান যুগে সমবায় ছিল না বা আমাদের ধর্ম্ম পুস্তক কোরানে সমবায়ের উল্লেখ বা সমর্থন নাই এবং সেই হেতু সমবায়কে সন্দেহের চক্ষে দেখেন এবং অন্যের নিকটও সমবায়ের বিরুদ্ধে মত প্রচার করেন আমি তাঁহাদিগকে সমবায়ের স্বরূপ অবগত হইতে অনুরোধ করি। তাহা হইলে যাঁহারা শাস্ত্রানুশীলন করিয়া থাকেন তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্মপুস্তকে সমবায় নীতির বহু স্থানে উল্লেখ ও সমর্থন ও ইহার বহুল প্রচারের উদাহরণ দেখিতে পাইবেন। তাঁহাদিগের ভ্রান্ত ধারণা আপনোদনের জন্য এবং আমার মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে সমবায় শিক্ষা ধর্ম্ম-শিক্ষারই যে একটি অঙ্গ, একথা হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা করা হইয়াছে।

উপরোক্তভাবে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনের জন্য রসুল যে পন্থা অনুসরণ করিয়া স্বজাতির ও স্বধর্ম্মীর মুক্তির পথ সুগম করিয়াছিলেন, তাহা কি বর্ত্তমানে প্রচলিত সমবায় নীতিরই অনুরূপ নয় ? একবার আপনারা ৬২২ খ্রস্টাব্দের সেই স্মরণীয় দিনের কথা মনে করুন, যেদিন তিনি গভীর রজনীতে আকবা পর্ব্বতোপরি ১২ জন আনসারীর সহিত দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই প্রতিজ্ঞায় শর্ত্তগুলি কি বর্ত্তমান যুগের অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট সমবায় নীতিরই সম্পূর্ণ অনুরূপ নয় ?

www.pathagar.com

বর্ত্তমানে যেমন সম অবস্থাপন্ন ১০/১৫টি লোক একত্র হইয়া প্রাথমিক সমবায় সমিতি গঠন করিয়া, একে অন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, পরস্পর সমভাবে দায়ী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয় সেইরূপ ঐ ১২ জন আনসারী ও আমাদের রসুল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন যে সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে সকল অবস্থায় সকল সময়ে তাঁহারা এক হইয়া কার্য্য করিবেন। এক সুতায় গাঁথা মালায় যেমন ফুলের অস্তিত্ব পৃথকভাবে লোপ হইয়া যায় এবং ভেদের অবসানে মালারই সৃষ্টি হয়, তেমনি তাঁহাদের একত্ব ঘুচিয়া একতার সৃষ্টি হইয়াছিল। সমবায় সমিতির অসীম দায়িত্বের কথা শুনিয়া যাঁহারা চমকাইয়া উঠেন, তাহারা একবার আক্‌বা পাহাড়ের মিলন গ্রন্থির কথা মনে করিবেন ; সমবায়ে আর তাহাদের বিতৃষ্ণা আসিবে না ; অসীম দায়িত্বের নামে আর তাঁহারা চমকাইয়া উঠিবেন না। বাস্তবিক পক্ষে সমবায় নীতি চিরদিনই মুসলমান ধর্ম্মানুমোদিত এবং সমবায়ই মানব সমাজে ভ্রাতৃভাব স্থাপনের ও এককালে স্বকীয় ও পরকীয় উন্নতি সাধনের একটি শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই রসুলের নির্দ্দেশিত পথ অনুসরণ না করিয়াই মুসলমান সমাজ আজ এমনভাবে স্বকীয় গৌরব নষ্ট করিতে বসিয়াছে।

এই ত গেল ইসলামে অসীম দায়িত্বের একটি উদাহরণ। রসুল ও তাঁহার সঙ্গীগণ যে উপরোক্তভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা সমবায় ক্রয় বিক্রয় সমিতির অনুরূপ সমিতিও স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন মক্কা হইতে মদিনায় গমন করিয়ছিলেন তখন তাঁহাদিগের আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। দারিদ্র্যের তীব্র দংশনে জর্জ্জরিত হইয়াও তাহারা আপাত মধুর পাপ লব্ধ সমৃদ্ধির কামনা করেন নাই। খোদার অজস্র আশিষ বারি যাঁহার উপর নিয়ত বর্ষিত হইতেছিল সেই রসুলের গৃহে একদা একজন অতিথি আসিয়াছিলেন। তিনি খাদ্যের অভাববশতঃ অতিথি সৎকারে অসমর্থ্য হইয়া আবু তালহা নামক তাহার একজন প্রতিবেশীকে ঐ অতিথির অভ্যর্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। তালহাও রসুলের সম অবস্থাপন্ন, তাঁহার গৃহেও মাত্র এক ব্যক্তির উপযোগী আহার্য্য ছিল। তিনি তাঁহার সমস্তই ঐ অতিথিকে দান করিয়া নিজে অভুক্ত রহিলেন এবং অতিথির প্রীতির জন্য অনশনজনিত বিষাদ দূর করিয়া সুমধুর হাস্যের সহিত তাঁহাকে সেবা করিতে লাগিলেন। দারিদ্র্যের এমন নিষ্ঠুর উপহাস অথচ ত্যাগের এমন জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। এমন দিনেও তাহারা আল্লার অস্তিত্বে বিশ্বাস হারান নাই, তাহার পরম শক্তিতে বিশ্বাসহীন হন নাই। তাহারা খোদার দয়ায় নির্ভর করিয়া আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন ইয়া কানা বোদো ওয়া 'ইয়াকা নাস্তাঈন' অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমরা তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি এবং তোমার নিকটেই সাহায্য প্রার্ত্তনা করিতেছি। এই প্রচণ্ড বিশ্বাস বলেই তাঁহারা জগতে শান্তি ধর্ম্ম স্থাপন করিতে সমর্থ্য হইয়াছিলেন।

মক্কাবাসীরা ছিলেন বাণিজ্য-বাবসায়ী এবং মদিনা বাসীরা ছিলেন কৃষি ব্যবসায়ী। আবদুর রহমান বেনউক নামক এক ব্যক্তি আনসারীদিগের কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, কেবল মাত্র আল্লার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, মদিনাবাসীদিগের সমস্ত

www.pathagar.com

কৃষিজাত দ্রব্য যাহা পূর্ব্বে নানা জাতীয় ব্যবসায়ীদিগের মধ্যস্থতায় রপ্তানি করা হইত, তাহা তিনি একত্রে রপ্তানি করিতে লাগিলেন এবং সিরিয়া প্রদেশ হইতে সেখানে ঐ সকল কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় হইত, সেখান হইতে মদিনাবাসীদিগের ব্যবহারের জন্য পণ্য, দ্রব্য সরবরাহ করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। এই প্রকারে ক্রয় বিক্রয় ও সরবরাহের ব্যবস্থা দ্বারা যাহা লাভ হইতেছিল তাহার এক অংশ বায়তুলমালে জমা করিতে লাগিলেন। এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধভাবে কাজ করার ফলে অতি অল্পকালের মধ্যে তাঁহাদিগের এরূপ বিস্ময়কর উন্নতি হইয়াছিল যে তাহারা সামান্য দীন ভিখারী হইয়াও প্রবল পরাক্রমশালী কোরেশদিগের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। বদর, ওহোদ, আহোয়ার ও হোনানের যুদ্ধ ক্ষেত্রেই তাহাদের অলৌকিক শক্তির পরীক্ষা হইয়াছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সেই বিক্রম-কাহিনী জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে এই প্রকার উন্নতির মূলে একমাত্র সমবায় শক্তিই নিহিত ছিল। এই কার্য্যে স্বার্থান্বেষণ নাই, স্বার্থ ত্যাগ আছে, ইহাতে আত্মম্ভরিতা নাই পর সেবা আছে, ভ্রাতৃ বিদ্বেষ নাই, ভ্রাতৃ ভাব আছে ; তাই এই উন্নতি এত দ্রুত ও সুনিশ্চিত। এ মিলনে আল্লাহর আশীর্ব্বাদ আছে, এই মিলন এ সংঘ, এ সমবায় তাহারই দান। স্বার্থ ত্যাগ চিরদিনই খোদার নিকট আদরের জিনিষ—আমরা যখন উপাসনা আরম্ভ করি, তখনও সর্ব্ব প্রথমে স্বীয় স্বার্থকে মন হইতে দূর করিয়া পরম করুণাময় আল্লাহর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। বর্ত্তমানে সমগ্র পৃথিবীতে প্রচলিত সমবায়নীতি ও ভারতে প্রচলিত সমবায়ের বিধি ব্যবস্থা যে ইসলামের অনুমোদিত ও পবিত্র কোরান সঙ্গত তাহা আমরা মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। সমবায়ে কত মহাশক্তি নিহিত আছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহা হইতে অনুধাবন করিতে সমর্থ হইবেন। এই সমবায় শক্তি বলেই আজ হইতে প্রায় দেড় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা রসুল ও তাঁহার নিষ্কাম কর্ম্মী সঙ্গীগণ আত্মোন্নতি, সমাজ সেবা, ও লোক শিক্ষার অলৌকিক দৃষ্টান্তে জগতকে বিস্ময়ে অভিভূত করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে সমগ্র পৃথিবীতে এক মহা উদার শান্তিপূর্ণ সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবপূর্ণ পূণ্যময় সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া পরম পিতা আল্লাহর মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছিল।

এখন সমস্যা উঠিতে পারে যে সমবায় যদি ইসলাম ধর্ম্মেরই অঙ্গস্বরূপ, পবিত্র কোরানেও যদি সমবায় নীতির উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে তবে আবার মুসলমানের নিকট বর্ত্তমান সমবায় আইনের বিধি ব্যবস্থার প্রয়োজন কি? কিন্তু যুগ ধর্ম্মকে আমরা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারি না। সমবায় সর্ব্বতোভাবে ইসলামের অনুমোদিত। সুতরাং দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় ভারতের সমবায় আইনের যে বিধিব্যবস্থা আছে তাহাই এখন ভারতীয় মুসলমানগণকে অনুসরণ করিতে হইবে এবং ইহা ইসলাম বিরুদ্ধ হইবে না। যদি কেহ ইসলামের দোহাই দিয়া সমবায়কে ঘৃণা বা উপেক্ষা করিতে চান.বা সমবায়ের বিরুদ্ধে প্রচার করিতে প্রয়াস পাইয়া ইসলামের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার ভান করেন তবে তাহার মতকে আমরা প্রকৃত ইসলাম নামে অভিহিত করিতে পারি না। প্রকৃত ইসলাম শান্তিপূর্ণ, ভ্রাতৃত্ব ও ত্যাগের আদর্শে মহিমান্বিত। ইসলামে

www.pathagar.com

সংকীর্ণতা নাই, উদারতা আছে। ইসলামকে যদি আমরা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাই, কতকগুলি বাহ্যিক আকার ও রীতি-পদ্ধতির পরিপালনই যদি ইসলাম ধর্ম্মের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা ইসলাম নয়, তাহাকে আমরা পৌত্তলিকতারই নামান্তর বলিয়া মনে করিতে পারি।

সর্ব্বজনীন উদার ইসলাম ধর্ম্মের এই প্রকার অপ্রকৃত ব্যাখ্যায় ও স্বার্থপর সঙ্কীর্ণচেতা উপদেষ্টাগণের ভ্রান্ত মত প্রচারের ফলেই আজ ইসলামের নামে নানাবিধ অবান্তর জিনিষের আমদানী হইয়াছে। যদি আমরা মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ মনে প্রাণে সত্য ধর্ম্ম পরম পবিত্র ইসলামেরই অনুশাসন মানিয়া চলিতাম, যদি আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন শক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিয়া তাহারই অনুমোদিত ধর্ম্ম পথ হইতে বিচ্যুত না হইতাম তবে আমাদের বিরাট মুসলমান সমাজ আজ এই হীন অবস্থায় পতিত হইত না। আল্লাহ বলিয়াছেন—'আমি কাহারও অবস্থা পরিবর্ত্তন করি না যে পর্য্যন্ত সে তাহার অবস্থা নিজে পরিবর্ত্তন না করিয়াছে।'

ভ্রাতৃবৃন্দ ! কারণ ব্যতীত জগতে কোন কাজই সম্ভবপর হয় না। আমাদেরই দুরবস্থার একমাত্র কারণ যে আমাদের বিকৃত মনোভাব, তাহাতে আর কোনোই সন্দেহ নাই। খোদার সেবায় দাসত্ব নাই, তাহাতে আত্মার ও মনের সজীবতা নষ্ট হয় না। কিন্তু প্রাণহীন পৌত্তলিকতার প্রভাবে আজ এই বিরাট মুসলিম সমাজ আত্মজ্ঞান বিহীন হইয়া পড়িতেছে। যে পৌত্তলিকতাকে হজরত মুহম্মদ (আঃ) নিন্দা করিতেছেন, যে পৌত্তলিকতার প্রচারের ফলে মানুষ বহু দেবতার পূজক হইয়া সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব হারাইয়া বসে, যাহার ফলে আজ আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃবৃন্দের মধ্যে নানারূপ আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, আজ অলক্ষ্যে সেই মনোভাব ও আন্দোলন আমাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হইতেছে। প্রবৃত্তি ও বাহ্যিক রীতিনীতির যদি আমরা অতিশয় ভক্ত হইয়া পড়ি তবে আমাদিগকে প্রকৃতির নিয়মবশতঃ বহুমতাবলম্বী হইতে হইবে এবং এই উদার মুসলিম সমাজের ভিতর নানারূপ সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত মনোভাবের সৃষ্টি হইবে। এক আল্লার উপাসক না হইয়া তখন আমরা নানারূপ রুচির পূজা করিতে থাকিব। এমনই করিয়া ভেদের সৃষ্টি হওয়াতেই মানবজাতি একই পরম পিতার সন্তান হইলেও তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের অবসান হয় এবং তাহারা একে অন্যকে হিংসা করিয়া ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। যে গৃহে হজরত ইব্রাহিম এক খোদার উপাসনা করিয়াছিলেন সেই গৃহেই রসুল দেখিতে পাইলেন যে ৩৬০টি প্রতিমা স্থাপিত হইয়াছে। ঐ এক একটি মূর্ত্তি যে এক এক ব্যক্তি বা এক এক সম্প্রদায়ের আদর্শ ও প্রবৃত্তির মানস-মূর্ত্তি তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। ভেদ ব্যবধানের তাণ্ডব-লীলা দর্শনে তিনি মর্ম্মাহত হইলেন এবং হিংসা, দ্বেষ ও পশুভাবাপন্ন মানব-ভ্রাতাগণকে উদ্ধার করিবার জন্য ৪০ বৎসরব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনার ফলে যে শান্তিময় ধর্ম্ম প্রসার করিয়াছিলেন তাহা ইসলাম এবং সেই শুভ মুহূর্ত্তে কোরানে যে পবিত্র আয়াত অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা এই—'তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু, আল্লাহ তোমাদের প্রাণে প্রীতিদান করিলেন এবং সেই জন্যই ভ্রাতৃভাবের পবিত্র আশ্বাস প্রাপ্ত হইলে।'

www.pathagar.com

আজ যদি আমরা মুসলমান সমাজের দিকে লক্ষ করি তাহা হইলে দেখিতে পাই যে রসুলের কার্য্যের পূর্ব্বে আরব সমাজে বিভিন্ন আদর্শের ও বিকৃত রুচির অনুবর্ত্তিতাহেতু যেরূপ মতভেদ ও নানারূপ সামাজিক বিশৃঙ্খলা ছিল বর্ত্তমানে সেইরূপ অবস্থার সূচনা হইতেছে। মনুষ্য সমাজে একের জন্য অন্যের সমবেদনা নাই, স্বার্থ ত্যাগ স্বপ্ন কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে ; ইসলামের পবিত্র আদর্শ ভ্রষ্ট হইয়া ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ও আত্মকলহের দ্বারা আমরা খোদাতায়ালার দান জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতি শক্তির অপব্যবহার ও অপচয় করিতেছি। মানব সেবায় ও শান্তি স্থাপনে আত্মনিয়োগ না করিয়া মুসলমানগণ হিংসা দ্বেষের অগ্নি-সংযোগে নিজেদের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এত বড় একটা মুসলিম সমাজ প্রাণহীন কাঠামোর বা সাধনাবিহীন বাহ্যিক আচারের সেবক হইয়া আত্মোন্নতি না করিয়া আত্মহত্যার অভিনয় করিতেছে এবং বিশ্ব প্রতিপালক রব্বুল আলামীনের কার্য্যে বাধা জন্মাইতেছে। বহু মত প্রচারের ফলে আমরা সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ পথ খুঁজিয়া সত্যের সন্ধান পাইতেছি না। যাহারা জ্ঞানী তাহারাই এই সকল সঙ্কীর্ণতা ত্যাগ করিয়া সত্য ধর্ম্মের পূণ্য প্রতিভায় আত্ম নিবেদন করিতে সক্ষম হন। মানব সমাজের মুক্তি বিধাতা মহাপুরুষ হজরত মুহাম্মদ (দঃ) মানুষের উদ্ধারের জন্য সরল সহজ ও সত্য পথেরই সন্ধান বলিয়া দিয়াছেন। আজ যদি আমরা মনোবলে বলীয়ান হইয়া উঠিতে পারি, তবে যে সকল তথাকথিত আধুনিক ধর্ম্মনেতাগণ আমাদের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া আমাদিগকে বিপথে টানিতেছেন, তাহাদের হস্ত হইতে নিশ্চয়ই রক্ষা পাইব। ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া যথার্থ শান্তির ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য রসুল উপদেশ দিয়াছেন—'হোব্বুল অতানে মিনাল ঈমান' অর্থাৎ স্বদেশ-প্রেমই আল্লার প্রতি বিশ্বাসের যথার্থ নিদর্শন। তাহা হইলে এই সকল নায়েবগণের তথাকথিত নির্দ্দেশিত মতগুলি উপেক্ষা করিয়াও আমরা প্রকৃত মুক্তি ও শান্তি পাইতে পারি। মহা কবি হাফেজ একটি সুন্দর কথা বলিয়াছেন—

جنك مقنا دل وملت هوهر اعر ربنه پو لاندنل حقيقت
داه افسانه زلتد

'The disputes of the 72 sects put them all aside
As they did not see the truth they worked to fiction.'

তবে এখন আমাদের স্বদেশ কি তাহা চিনিতে হইবে। দেশপ্রেম বলিতে কৃষি প্রধান দেশে কৃষকের সেবা ও তাহাদের সর্ব্ব প্রকার উন্নতি সাধনই সর্ব্বপ্রথম বুঝায়। কৃষকরাই এদেশের প্রকৃত অধিবাসী, তাহারাই এদেশের মেরুদণ্ড, তাহাদিগের দুঃখে আমাদের যথেষ্ট সমবেদনা আছে—ইত্যাদি বহু বড় বড় কথা প্রতিনিয়তই আমরা অনেক অভিনেতার মুখে শুনিয়া থাকি। কিন্তু এই সকল নেতাদিগের মানুষ মাতানো বাক্যে আন্তরিকতা কতদূর আছে তাহা বলা কঠিন। তাহাদিগের কার্য্যে সাধনা নাই, ত্যাগ নাই, আত্মোৎসর্গ নাই। যাহাদের কথা ও কার্য্যে সামঞ্জস্য নাই, তাহাদের বুঝি সেই বিশ্ব নিয়ন্তার প্রতিও কোন শ্রদ্ধা নাই। যদি আমরা প্রকৃত ইমানদার ব্যক্তি হই, যদি খোদা ও রসুলের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস

www.pathagar.com

থাকে তবে এই কৃষককুলের উন্নতি সাধনকেই দেশ সেবার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সোপান বলিয়া মনে করা উচিত। যদি আমরা এই বিরাট দরিদ্র কৃষক সমাজের উপকার করিতে পারি তবে যথার্থই স্বদেশেরও উপকার করিতে পারিব এবং ইহাতেই আমাদের প্রকৃত ধর্ম্মানুশীলন হইবে।

এই দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের জল বায়ুতে মাতৃদেহের ক্ষীর ধারার ন্যায়ই আমাদের প্রকৃতিগত অধিকার আছে। এদেশকে ভালবাসিতে সকলের ন্যায় আমাদেরও অধিকার আছে। এদেশের স্বরূপ অবগত হইয়া প্রধানতঃ কৃষকের সেবাই আমাদের প্রকৃত স্বদেশ সেবা বলিয়া মনে করা উচিত। কিন্তু ঔষধ প্রয়োগের পূর্ব্বে যেমন রোগ নির্ণয় প্রয়োজন, পথ্য নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে যেমন রোগীর শারীরিক অবস্থা জানা দরকার, দেশ সেবায়ও সেইরূপভাবে কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশ করা একান্ত আবশ্যক। সমবায় কর্ম্মীগণ বহুভাবে কৃষক সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া তাদের অবস্থা এবং কিভাবে কার্য্য পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইলে এই অবস্থার অপনোদন হইতে পারে, তাহা হইতেই সহজেই বুঝিতে পারেন। কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, গো-মড়ক দেশে লাগিয়াই থাকে ; অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কারে দেশ আচ্ছন্ন, দারিদ্র্যের তীব্র দংশন কৃষকগণকে দিনে দিনে পলে পলে ধ্বংসের পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। অভাবের তাড়নায় স্বভাব বিকৃত হইয়াছে। আল্লাহর পবিত্র দান—জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা তাহারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে পারিতেছে না। এই ধ্বংস-লীলার অবসান হওয়া একমাত্র সমবায় আন্দোলনের উপরই নির্ভর করে। একমাত্র দেশে সমবায় সমিতি স্থাপন দ্বারাই অন্ন, বস্ত্র, সুখ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং অন্যান্য আর্থিক ও নৈতিক উন্নতির সাধন সম্ভবপর।

সুদের কথার অবতারণা করিয়া, সমবায় ঋণদান সমিতি সুদের কারবার করে বলিয়া যাহারা উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহাদিগকে দুই একটি কথা বলিতে চাই। তাহারা এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নিরক্ষর মুসলমানকে সমবায় আন্দোলনের ধারেও আসিতে দিতে চান না। এটি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি। আমার মনে হয় সমবায় ঋণদান সমিতির অর্জ্জিত লাভকে আমরা সুদ না বলিলেও পারি। কারণ যে অতিরিক্ত টাকা লাভ বাবদ দেওয়া হইয়া থাকে তাহা তাহাদের সকলের সম্মতিক্রমে এবং সকলের হিতের জন্য সাধারণ তহবিলে জমা হইয়া থাকে। এই টাকা কাহাকেও নিষ্পেষিত করিয়া লওয়া হয় না। দাতা এবং গ্রহীতা সমভাবাপন্ন হইয়া কার্য্য করেন এবং তাহারা একই ব্যক্তি। অন্য কোন ব্যক্তি বাহির হইতে ঐ টাকার লাভ লইতে আসে না। যেখানে সুদ আছে সেখানে দাতা ও গ্রহীতা ভিন্ন ব্যক্তি। যেখানে গ্রহীতা সুদের জের টানিতে টানিতেই হৃত সর্ব্বস্ব হইয়া যায় সেইখানেই সুদের কথা বলা চলে। যদি জাকাতের পয়সা নরকের ভয় দেখাইয়া লইবার নিয়ম আমাদের 'নায়েবে রসুল সাহেব'রা করিতে পারেন এবং যদি জেহাদের পার লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া সাধারণের হিতের জন্য, সেবার জন্য সঞ্চিত হইতে পারে ; তবে সর্ব্ব সাধারণের হিতের জন্য সমবায় সমিতি স্থাপন দ্বারা দেশসেবা করিয়া খোদার উপযুক্ত বান্দার কার্য্য কেন যে করা যাইবে না, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। কেন যে ইহাও কোরানের আদিষ্ট 'আমলে ছালেহা'র অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবে না তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য।

অনেকেই হয়ত বলিবেন যাহা আলেমগণ বলিয়াছে তাহাই করিতে হইবে। কিন্তু আমি আমার মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে সাবধান করিয়া দিতেছি যে, তাহারা কোন স্বার্থপর এবং

www.pathagar.com

অহমিকাপূর্ণ লোকদিগের কথায় আস্থা স্থাপন না করিয়া, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং শয়তানের প্ররোচনা মন হইতে বিদূরিত করেন। কেননা 'কুলফুল' মোমেনীন আরসোন্নাহু। সংশয়স্থলে চিত্তস্থির করিয়া বিবেকের আদেশ মানিয়াই চলিতে হইবে, অন্য কোথাও হইতে আমদানী বুদ্ধি শয়তানের প্রেরিত জিনিষ বলিয়া মনে করিতে হইবে। কোরানের ইহাই আদেশ 'Follow not that of which you have no knowledge. Surely the hearing, the sight and the heart, all of these shall be guided about that purpose.'

অতএব আশাকরি উপরোক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া আপনারা সমবায়কে কোরানের অনুশাসন বলিয়াই মনে করিবেন। ইসলাম অনুমোদিত পবিত্র শান্তি ও সর্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সমবায়কেই একটি শ্রেষ্ঠ পন্থা বলিয়া মনে করিবেন। এই আন্দোলনে যোগদান করিলে আত্মা ও মন পবিত্র হইবে এবং প্রকৃত দেশসেবায় নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়া 'সেরাতুল মোস্তাকিমে'র দিকে চলিতে পারিবেন।

www.pathagar.com

মোগল যুগে চিত্র-চর্চ্চা

আবদুস সালাম

মুসলমান শাস্ত্রে চিত্র ও ভাস্কর শিল্প-চর্চ্চা নিষিদ্ধ হইয়াছে কারণ উভয়ই পৌত্তলিকতা ও ঈশ্বরত্ব দাবী করার পক্ষে সহায়—'divinity presumption'-এ এর পরিপুষ্টি সাধন করে। শাস্ত্রের বিধানানুসারে শিল্পী ও শিল্পানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই নরকে যাইবার পথ প্রশস্ত করিয়া লয়। ইসলাম ধর্ম্ম প্রথম প্রচারের দিনে ঘোর পৌত্তলিকতাপূর্ণ আরব দেশে এই নিষেধ বাণী ঘোষণা করা হইয়াছিল। জগতে শান্তি স্থাপনের পর মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তির ক্রমবিকাশের সঙ্গে তখনকার এই বিধির সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কালে কালে যুগে যুগে মানব চিত্তের অদম্য উৎসাহ ও মানবাত্মার আকুল আবেদন শাস্ত্রের বাধা অতিক্রম করিয়া চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পে পূর্ণ প্রকাশ পাইল। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বাগদাদ শহরে যখন ইসলাম ধর্ম্মের পূর্ণ প্রতিভা বিরাজমান ছিল তখনও আব্বাস বংশীয় খলিফাগণ ইসলামের রক্ষক ও পরিপোষক হইয়াও চিত্র-চর্চ্চা করিয়াছিলেন। তাহাদের আদেশে রাজ দরবারে এ্যালবাম তৈয়ার করা হইয়াছিল। তবে শাস্ত্রের জয় হইয়াছিল ভাস্কর্য্যের দিক দিয়া। সব সময় সব জাতির মুসলমান অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভাস্কর শিল্প হইতে দূরে রহিয়াছিল, কিন্তু চিত্র ও স্থাপত্য শিল্পে মুসলমান উন্নতির পারাকাষ্ঠা দেখাইয়া জগতে বরণীয় হইয়া রহিয়াছে। জ্ঞানে মহীয়ান শক্তিমান মুসলমান সম্রাটগণই প্রথম শাস্ত্রের বিধি লঙ্ঘন করিলেন, শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ, নিগূঢ় উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইলেন। ধর্ম্ম আর মানুষের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি উভয়কেই একত্র যুক্ত করিলেন। কলা ও শাস্ত্র যে পরস্পর বিরোধ নহে, ধর্ম্ম ও আর্ট যে বিভিন্ন গতিতে প্রবাহিত হয় না, ইহাই তাঁহারা বুঝাইয়া দিলেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সমরখন্দ ও হিরাটে শিল্পের চর্চ্চা হইয়াছিল ও খৃষ্টীয় পঞ্চাশ শতাব্দীতে পারস্য দেশের তৈমুর বংশীয় সম্রাটদের উৎসাহে যে শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, ভারতীয় মোগল সম্রাটগণ সেই চিত্র শিল্পের বীজ ভারতে বপন করিয়াছিলেন। ভারতীয় আবহাওয়ায় তাহা পরিপুষ্টি লাভ করিয়া উত্তরকালে মোগল চিত্র জগতের সমক্ষে একটা বিস্ময়কর ও আদরণীয় জিনিষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মোগল সম্রাটগণ কেবল বিলাসপ্রিয় ছিলেন না, তাঁহারা গুণের আদর করিতে জানিতেন, জগতে যাহা সত্য সুন্দর ও প্রশংসনীয় তাহা তাঁহারা সহজেই গ্রহণ করিতে পারিতেন। শৌর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে তাঁহারা অতুলনীয় ছিলেন, তাঁহাদের যুদ্ধকৌশল, সুনিপুণ অস্ত্র চালনা, তাহাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্য তখনকার যুগের সব জাতিকেই চমৎকৃত করিয়াছিল। কিন্তু মোগলদের ইতিহাস শুধু যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস নহে, শুধু জয় পরাজয়ের ইতিহাস নহে। জগতের সভ্যতার ইতিহাসে তাঁহারা যে সব অমূল্য অনুষ্ঠান, কীর্ত্তিকলাপ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আবহমান কাল পর্য্যন্ত জগতের আদর্শ হইয়া থাকিবে। তাহাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের চেয়ে বিস্ময়কর ছিল তাহাদের আইন কানুন, শাসন পদ্ধতি, জ্ঞান গরিমা ও সর্ব্বোপরি তাহাদের শিল্প নিদর্শন।

www.pathagar.com

প্রাচ্যের রাফেয়েল বলিয়া সুবিখ্যাত কামালদ্দিন বিহ্জাদ ও মিরাক নামকবিখ্যাত চিত্রকরেরা পারস্য দেশে যে চিত্র শিল্পের চর্চ্চা করিয়াছিলেন সম্রাট আকবরের তত্ত্বাবধানে তাঁহাদেরই অনুকরণে প্রথম চিত্র শিল্প-চর্চ্চা হইত। মোগল চিত্র শিল্প প্রথম পারস্য চিত্র শিল্পেরই শাখা ছিল। আকবরের দরবারে যে সমস্ত বিদেশী চিত্রকর ছিলেন পারস্য চিত্র শিল্প হইতেই তাহারা প্রথম প্রেরণা গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে সম্রাট যখন ভারতীয় শিল্পীগণকে রাজচিত্রকর বলিয়া গণ্য করিয়া লইলেন তখন ভারতীয় শিল্পীগণের হাতে পড়িয়া পারস্য শিল্প অন্যরূপ আকার ধারণ করিল। Persian influence ক্রমেই লোপ পাইল। কিন্তু এই সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা ও মোগল চিত্র শিল্পের ধারা, ও ইহার ক্রমবিকাশ, Technicalities ও branches-এর আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এই বিষয় আর একটি ভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনার যোগ্য। তবে শাস্ত্রের নিষেধকে মোগল সম্রাটগণ কিভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের উদ্দীপনায় ও অনুপ্রেরণায় নিষিদ্ধ চিত্র শিল্পের কি রকম চর্চ্চা হইয়াছিল, তাহার আলোচনাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্রাট আকবর ইসলাম ধর্ম্ম হইতে ক্ষণ কালের জন্য বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া অনেকের বোধ হয় এই ধারণা হইতে পারে যে, তাঁহার রাজত্ব কাল হইতেই প্রথম চিত্র চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্য নহে। সম্রাট বাবর সুন্নী মুসলমান ছিলেন এবং রীতিমত নামাজাদি আদায় করিতেন। কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট সৌন্দর্য্য লিপ্সা ছিল। তিনি একাধারে সুকবি, শক্তিশালী লেখক ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তবে তাঁহার জীবনটা অনন্ত যুদ্ধ বিগ্রহের জীবন ছিল। তাই তিনি তেমনভাবে শিল্প-চর্চ্চা করিতে পারেন নাই। তিনি যে চিত্র শিল্পের একজন সূক্ষ্ম সমালোচক ছিলেন তাহা বিখ্যাত বিহ্জাদ সম্বন্ধে তিনি তাঁহার আত্ম জীবনীতে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই তাহার প্রমাণ। তিনি লিখিয়াছেন বিহ্জাদ-এর চিত্র খুবই সুন্দর, কিন্তু তিনি শ্মশ্রুবিহীন চেহারা ভাল আঁকিতে পারিতেন না, কিন্তু সব সময়ই যুগ্ম চিবুক (double chin) দীর্ঘ করিয়া আঁকিতেন, কিন্তু শ্মশ্রুপূর্ণ চেহারা নিপুণতার সহিত অঙ্কন করিতে পারিতেন।

সম্রাট বাবরের তত্ত্বাবধানে অনেক চিত্রকর কাজ করিতেন। আলোয়ারে সংরক্ষিত হস্তলিখিত তাঁহার আত্মজীবনীর ফার্সী অনুবাদ হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়। মাননীয় R.B. William প্রণীত An Empire Builder in the 16th Century নামক বহিতে তাঁহার ৭ খানি ছবি উদ্ধৃত করা হইয়াছে।[১]

হুমায়ুন বাদশাহের রাজত্বকালে চিত্র শিল্পের বিশেষ চর্চ্চা হয় নাই। বাদশাহের আত্মজীবন খুবই অশান্তিপূর্ণ ছিল। ভ্রাতৃবিরোধ ও শের শাহের দৌরাত্ম্যে রাজ্যচ্যুত হইয়া তিনি বৎসরাধিক কাল পারস্য সম্রাট Shah Jahmasp-এর রাজ অতিথি ছিলেন। বিনিয়ন আর্নল্ড সাহেব লিখিয়াছেন যে, ভারতে মুসলমান চিত্র শিল্প-চর্চ্চার পক্ষে হুমায়ুনের পারস্য অবস্থান বোধ হয় কিছু সহায়ই হইয়াছিল। চিত্রকর আবদুস সামাদ হুমায়ুন বাদশাহের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি এই শিল্পকে যথেষ্ট আদর করিতেন, কিন্তু তাঁহার সময়ের চিত্র তেমনভাবে চর্চ্চা হয় নাই। সম্রাট আকবরের দরবারে চিত্র

---

১ His work was very dainty but he did not draw beardless faces well. He used regatly to lengthen the double chin, bearded faces he drew admirably.

www.pathagar.com

শিল্প-চর্চ্চার পূর্ব্বেও কোন কোন স্থানে যে সমস্ত মোঙ্গল স্টাইলের চিত্র পাওয়া যায়, তন্মধ্যে South Kensington-এর Victoria and Albert Museum-এর ভারতীয় বিভাগে সংরক্ষিত সুতার উপর কাজ করা চব্বিশ খানি বড় চিত্র বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই ছবিগুলি কাশ্মীর প্রদেশে অঙ্কিত করা হইয়াছিল। তখন কাশ্মীর প্রসিদ্ধ 'তারিখে রসিদী' প্রণেতা হায়দর মির্জ্জা Doglat-এর অধীনে ছিল। হায়দর মির্জ্জার আদেশে ও উৎসাহেই বোধ হয় চিত্রগুলি অঙ্কিত হইয়াছিল। বাদশাহ আকবরই প্রথম চিত্র শিল্পকে রাজকীয় বিভাগে স্থান দেন। সাধারণের বিশ্বাস এই আকবর বাদশাহের ইসলাম ধর্ম্ম ও বিধি নিষেধের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ও আস্থা ছিল না বলিয়াই তিনি ধর্ম্ম-বিগর্হিত কাজ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার 'দীন-ই-ইলাহি' প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুসলমান ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া অনেক ইসলাম ধর্ম্মগর্হিত নীতি প্রচার করিয়াছিলেন কিন্তু সে সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই, প্রায় পনের শত সত্তর সাল হইতে তাঁহার দরবারে পূর্ণোদ্যমে চিত্র চর্চ্চা চলিতেছিল। রাজকীয় ঐতিহাসিক আবুল ফজল এ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিয়াছেন, 'সম্রাট আকবর যৌবনের উন্মেষ হইতেই চিত্র শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চিত্র শিল্পকে একাধারে আনন্দ দায়ক ও জ্ঞান উন্মেষক মনে করিয়া তিনি এই শিল্প-চর্চ্চায় সর্ব্ব প্রকার উৎসাহ প্রদান করিতেন।' তখন তিনি একজন ধর্ম্মভীরু মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তিনি 'আদেশের নিগ্রহ' সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রকৃতিতে যাহা সুন্দর, যাহা মনোরম ও চিত্তাকর্ষক তাহা তিনি সম্পূর্ণ উপভোগ করিতে পারিতেন। 'দীন-ই-ইলাহি' প্রচার ও ইসলাম ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবার সঙ্গে তাঁহার এই স্বভাবের কোন সম্পর্ক ছিল না। চিত্র চর্চ্চা তাঁহার শৈশবের একটা নেশা ছিল। তাই তিনি লেখা পড়ার দিকে মনোযোগ না দিয়া ড্রইং এবং পেইন্টিং-এর দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন।.

বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার যৌবনের প্রথম দীক্ষা—প্রকৃতির সৌন্দর্য্য লিপ্সা ও শিল্পানুরাগ ক্রমঃবিকাশ পাইতে লাগিল, এবং উত্তরকালে তাহা পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছিল। বিলিয়ন আর্নলড্ সাহেব তাঁহার Court painters of the Great Maguls নামক অমূল্য গ্রন্থে আকবর বাদশাহের চিত্রানুরাগের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া লিখিয়াছেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি একটা প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁহার স্বভাবগত ধর্ম্ম ছিল। সম্রাট বাবর ও তাঁহার বিখ্যাত বংশধরগণের যেমন এই সৌন্দর্য্য লিপ্সা মজ্জাগত ছিল, সম্রাট আকবরেরও তেমনি মজ্জাগত ছিল। এবং বিশ্বের এই সৌন্দর্য্য লিপ্সা ক্রমে একটা ধর্ম্মভাবে পরিণত হইয়া চিত্র শিল্পে তাহা মূর্ত্ত হইয়া উঠে। চিত্র শিল্পকে আকবর Source of knowledge জ্ঞানের উৎস বলিয়া জ্ঞান করিতেন। শাস্ত্রের নিষেধবাণী তিনি অন্ধের ন্যায় মানিয়া চলিতেন না, বুদ্ধি বিবেচনার কষ্টি পাথরে তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া লইতেন। শাস্ত্রীয় বচনের অক্ষরের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাহার মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলিতেন। তাঁহার অসাধারণ যুক্তি ও তর্কের নিকট শাস্ত্র প্রচারকেরা হারিয়া যাইতেন। শাস্ত্রকার মনে করেন—চিত্রাঙ্কন করিলে গুণা হয়, কারণ মানুষ বিশ্ব স্রষ্টার কাজে হস্তক্ষেপ করে, ঈশ্বরত্ব দাবী করিতে প্রয়াস পায়, সম্রাট আকবর প্রায়ই বলিতেন, 'It appears to me as if a painter has quite peculiar means of recognising God. For a painter in sketching anything that has life and in devising its limbs one after another

www.pathagar.com

must come to feel that he can not bestow personality upon his work, and is then foreed to think of God--the Giver of life and will then increase in Knowledge.'

অর্থাৎ—আমার মনে হয় চিত্রকরের খোদাকে চিনিবার এক বিশিষ্ট উপায় আছে। চিত্রকর যখন একটি প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কন করে এবং একটির পর একটি করিয়া সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অঙ্কন শেষ করে, কিন্তু অবশেষে প্রাণ দিতে সক্ষম হয় না, তখন স্বতঃই জীবনের সৃষ্টিকর্ত্তার কথা তাহার মনে উদয় হয়। এইভাবে তাহার জ্ঞান, ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি হয়, অতএব চিত্রের চর্চ্চায় চিত্রকরের মনে ঐশ্বরিকতার স্পর্দ্ধা আনয়ন করা দূরে থাকুক ঐশ্বরিক শক্তির নিকট মানব শক্তি যে কত ক্ষুদ্র কত নগন্য তাহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিয়া চিত্রকরের হৃদয় প্রগাঢ় ভক্তি ও বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া তোলে।

সম্রাট আকবরের যুক্তির উপর আমাদের আর কিছুই বলিবার থাকে না। ধর্ম্ম যদি সাধারণ জ্ঞানের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে, ধর্ম্মের নীতি-অনুষ্ঠানগুলি যদি সহজ বুদ্ধি বিবেচনার বাহিরে না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, আকবরের যুক্তির ভিতরে যথেষ্ট সত্য নিহিত আছে। যদি কাফের হইবার ভয় মুহূর্ত্তের জন্য হৃদয় হইতে অপসারিত করিয়া আকবরের যুক্তিটা একবার বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে তাহার যুক্তির সত্যতা সহজে উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

সম্রাট আকবরের চিত্র শিল্পের প্রতি কতটুকু যত্ন ছিল তাহা তাঁহার বিখ্যাত ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখিত আইন-ই-আকবরিতে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্রাটের চিত্র শিল্পের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও শিল্পীদিগের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখিয়া সমরখন্দ, বোখারা প্রভৃতি দূর দেশ হইতে শিল্পীগণ আসিয়া তাঁহার দরবারে সমবেত হইলেন। এদিকে ভারতের নিজস্ব শিল্পীগণ যাঁহারা হিন্দু রাজত্বের অবসান কাল হইতে একরূপ মরিয়া হইয়া রহিয়াছিলেন বাদশাহের অনুগ্রহে তাঁহারাও সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলেন—পুনরায় তুলি হাতে লইলেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যেই তুলি শিল্পে পারদর্শিতা দেখাইয়া সম্রাটের বিশেষ আদরণীয় হইয়া উঠিলেন। সম্রাট জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রত্যেককে মোটা মাহিয়ানা দিতেন ও যথেষ্ট সম্মান করিতেন। বিখ্যাত চিত্রকরগণকে তিনি মনসবদার শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতেন। সহকারী কার্য্যকর ও দপ্তরীদিগকে তিনি তখনকার দিনের মাসিক পনর টাকা হইতে ত্রিশ টাকা পর্য্যন্ত মাহিয়ানা দিয়া আহাদি শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতেন। এই মাহিয়ানা হইতেই তাহাদের ভরণপোষণ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত। তাঁহার এই বিরাট শিল্প নিকেতনে যত শিল্প অঙ্কিত হইত সম্রাট তাহা সপ্তাহে একবার করিয়া পরীক্ষা করিয়া লইতেন ও কার্য্যের নৈপুণ্য অনুসারে চিত্রকরকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া মাসিক বেতনের হার বৃদ্ধি করিয়া দিতেন।

ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখিয়াছেন 'এই সব কারণেই চিত্র শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। চিত্রকরের প্রয়োজনীয় জিনিষাদিরও অনেক উন্নতি হইয়াছিল। প্রত্যেক চিত্রের উপযুক্ত মূল্য নিরূপণ করা হইত। বিশেষ করিয়া বর্ণ সংমিশ্রণ কৌশল যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বিহ্‌জাদের অঙ্কিত চিত্রের ন্যায় সুনিপুণ চিত্র অঙ্কিত হইতে লাগিল। প্রায় শতাধিক চিত্রকর চিত্র শিল্পে দক্ষতা লাভ করিলেন ; মধ্যম রকমের চিত্রকরের সংখ্যাও কম ছিল না।

www.pathagar.com

সম্রাট আকবর আগ্রা, দিল্লী ও অন্যান্য নগরগুলিতে রাজ পুস্তকালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এশিয়ার সাহিত্য ভাণ্ডারে যত অমূল্য গ্রন্থরাজি ছিল তাহা তিনি সংগ্রহ করিয়া চিত্রে পরিশোভিত করিয়াছিলেন। আমির হামজার গল্প বইখানাতে প্রায় চৌদ্দশত চিত্র সংযুক্ত করা হইয়াছিল। মহাভারতের অনুবাদ, রজম নামা প্রণয়ন ও চিত্রাঙ্কন করাইতে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। রজম নামা এখন জয়পুর যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। Cornal Hanna সাহেব বলেন, তাঁহার নিকট রামায়ণের যে অনুবাদ আছে তাহা প্রস্তুত ও চিত্রাঙ্কন করাইতে তাঁহার তিন লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এই রামায়ণখানা বর্ত্তমানে Washington–এ আছে। আকবর–নামার গল্পগুলিতেও তেমনি চিত্রাঙ্কন করা হইয়াছিল। আকবর নামার এক শত সতের খানা ছবি এখন South Kensington–এ সংরক্ষিত আছে। এতদ্ব্যতীত চেঙ্গীসনামা, জাফর-নামা, নলদময়ন্তী, কালিলা দামনা, আয়ার দানিস, নিজামি, ওয়াফিয়াতে বাবরি ইত্যাদি গ্রন্থগুলির গল্প চিত্রে শোভিত করা হইয়াছিল। স্পেন দেশীয় পাদ্রী Sebestean Manrik ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে এদেশে ছিলেন। তাঁহার মতে রাজ পুস্তকালয়ে তখন চব্বিশ হাজার খণ্ড পুস্তক ছিল। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য গড়ে দুইশত সত্তর টাকা নিরূপণ করা হইয়াছিল। বাইবেলের গল্প হইতেও সম্রাট আকবর ছবি অঙ্কন করাইয়া তাঁহার দরবার পরিশোভিত করিয়াছিলেন।

আকবরের পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীর, শাহাজাহান, আওরঙ্গজেব এই পুস্তকালয়ে আরও অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রবিপ্লবে রাজকীয় পুস্তকাগারসমূহ বিক্ষিপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। বাদশাহদিগের অনুকরণে রোহিলাধিপতি ও অযোধ্যার নবাবের ন্যায় অধীনস্থ নবাবগণ যে ছোট ছোট পুস্তকালয় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহাও ঐরূপ বিপ্লবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ হইতে যে সব ছবি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাই সাধারণ যাদুঘরে ও ব্যক্তি বিশেষের নিকটে সংরক্ষিত আছে।

Manuscript চিত্রাঙ্কন ছাড়া সম্রাট আকবর দেওয়াল গাত্রে চিত্রাঙ্কন বা Fresco painting–এর বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। Fresco Painting গুলি এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আকবর বাদশাহ্ ফতেপুর সিক্রিতে যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সেখানে তাঁহার খাবগাহ এবং মরিয়ম বিবির প্রসাদ গাত্রে তাহার শেষ চিহ্ন দেখা যায়। E.W.Smith সাহেব তাঁহার Mugal Architecture ও 'ফতেপুর সিক্রি' নামক বইতে সে সব প্রকাশ করিয়াছেন। ফতেপুর সিক্রিতে সেই সব চিত্রের শোচনীয় ধ্বংসাবশেষ স্বচক্ষে দেখিয়া মন বিস্ময়ে ও বিষাদে বড়ই অভিভূত হইয়াছিল।

সম্রাট আকবর portrait painting (প্রতিকৃতি–অঙ্কন) খুব পছন্দ করিতেন। আবুল ফজল লিখিয়াছেন, His Majesty sat for his own likeness, and, took the portrait of his grandees সম্রাট তাঁহার নিজের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করাইয়াছিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রাজ্যের বড় বড় আমির ওমরাহগণের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করাইয়াছিলেন। এই সব Portrait প্রতিকৃতিগুলির দ্বারা অতি সুন্দর বাঁধানো এ্যালবাম তৈয়ারি করা হইয়াছিল। বাদশাহের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অধীনস্থ অমির ওমরাহগণও তাঁহাদের নিজেদের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করাইয়াছিলেন। আকবর বাদশাহ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের অধীনে যে সমস্ত

www.pathagar.com

শিল্পী কাজ করিতেন তাঁহাদের নাম সংগ্রহ করা সুকঠিন। কারণ অনেক চিত্রে চিত্রকরের নাম ছিল ও অনেকগুলিতে নাম ছিল না। আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরি'তে সে যুগের বিখ্যাত চিত্রকরের নাম লিখিয়া গিয়াছেন। সে যুগের চিত্র অনুসন্ধান করিলে প্রায় দুইশত চিত্রকরের নাম পাওয়া যায় ; তবে 'আইন-ই-আকবরি'তে কেবল ১৭জন চিত্রকরের নাম আছে।

১। মীর সৈয়দ আলি (তিনি তাব্রিজ শহর নিবাসী। তিনি আমির হামজার গল্পগুলি চিত্রাঙ্কিত করিয়াছিলেন)।

২। খাজা আবদুস সামাদ (পারস্য দেশের সিরাজ শহরের অধিবাসী। Calligraphy or Painting-এ তাঁহার পারদর্শিতার জন্য তাঁহাকে শিরি কলম বলিয়া অভিহিত করা হইত। তিনি হুমায়ুন বাদশাহের পরম বন্ধু ছিলেন এবং আকবর বাদশাহের দরবারে আসার পূর্ব্ব হইতেই চিত্রকর ও কবি বলিয়া সুবিখ্যাত ছিলেন। আকবর বাদশাহ তাঁহাকে প্রথম ফতেপুর সিক্রি নগরীর Master of the mint, পরে মুলতান শহরের দেওয়ান বা Revenue commissioner পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

৩। ফররোখ (তাঁহার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আকবর-নামার Clerk manuscript-এ তাঁহার অঙ্কিত খুব সুন্দর কয়েকখানি চিত্র আছে।)

৪। মিস্‌কিন।

৫। যশোবন্ত (যশোবন্ত গরীবের ছেলে ছিলেন। জাতিতে কাহার বা পাল্কী বাহক হইলেও চিত্র শিল্পে অর্থ উপার্জ্জন ও সম্মান লাভের সহজ উপায় দেখিয়া শিল্প-চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তিনি তুলি নৈপুণ্যে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। গরীব ঘরের এই রত্নকে আকবর বাদশাহ কুড়াইয়া লইয়া খাজা আবদুস সামাদের হাতে অর্পণ করিলেন—"One day, writes the courtly historian, the eyes of his majesty fell on him and himself handed over to the Khaja". অত্যল্প কাল মধ্যেই তাঁহার সমসাময়িক চিত্রকরগণ তাঁহার প্রতিভার কাছে ম্লান হইয়া গেলেন। তিনি সে যুগের প্রথম ওস্তাদ হইয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার একটুকু পাগলামি স্বভাব ছিল। তিনি আত্মহত্যা করিয়া নিজের জীবন সাঙ্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার অঙ্কিত অনেকগুলি চিত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।)

৬। Basawana বা বসন্ত (তিনি যশোবন্তের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। Back ground-drawing, distribution of colours এবং Portraiture-এ তাঁহার খুব হাত যশ ছিল। আবুল ফজল কোন কোন বিষয়ে তাঁহাকে যশোবন্তের উপরে স্থান দিয়াছিলেন)।

৭। কেসু, ৮। লাল, ৯। মুকুন্দ, ১০। মধু, ১১। জগন্নাথ, ১২। মহেশ, ১৩। খেমকরণ, ১৪। তারা, ১৫। ছানওয়ালা, ১৬। হরিবন্স, ১৭। রাম।

চিত্র হইতে আর একজন কেসুর নাম পাওয়া যায়, উভয় কেসুই যশোবন্তের জাতিতে পাল্কী বাহক ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি খৃষ্টীয় ছবির অনুকরণ করিয়া বাদশাহকে উপহার দিয়াছিলেন। এই লিষ্ট হইতে বুঝা যায় যে সব চিত্রকরই নিম্ন বংশজাত ছিলেন। সম্রাটই তাঁহাদের ললাটে জয় টিকা পরাইয়া দিয়াছিলেন। জগন্নাথের অঙ্কিত ময়ূর যুগল সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তার জন্য যশোলাভ করিয়াছিল।

www.pathagar.com

এক দিকে অসীম মহিমাময় সম্রাট আকবর ও অন্যদিকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী সম্রাট শাহজাহান এই দুই মহাপুরুষের মধ্যে জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিত্ব বিশেষ ম্লান হইয়া রহিয়াছে বটে। কিন্তু তিনিও তাঁহাদের চেয়ে কম গুণবান সম্রাট ছিলেন না। রাজ্যের শাসন ও প্রজাপালনের জন্য তিনি যে সকল অনুষ্ঠান রাখিয়াছেন তাহাই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। তাহার ধমনীতে তাঁহার প্রপিতামহ বাবর ও তাঁহার পিতা আকবরের রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। তাই তিনিও সৌন্দর্য্যের উপাসক হইয়াছিলেন।

সম্রাট আকবর চিত্র চর্চ্চাকে একাধারে ভোগের সামগ্রী ও জ্ঞানের সোপান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর চিত্র শিল্পকে কেবল ভোগের জিনিষ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজের শিল্প লিপ্সাকে চরিতার্থ করিবার জন্য, সৃষ্টির সৌন্দর্য্য শুধু উপভোগ করিবার জন্য তিনি চিত্র-চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন। চিত্র শিল্পের প্রতি তাঁর কতটুকু উৎসাহ ছিল, প্রাণের টান ছিল ও শিল্পীদের প্রতি তাঁর কতটুকু যত্ন ও সহানুভূতি ছিল তাহা তাঁর নিজের আত্মজীবনী ও তাঁহার দরবারের ইংরেজ রাজদূত Roe-এর নিজহস্ত লিখিত বিবরণ পাঠ করিলেই সম্যক উপলব্ধি করা যায়। সম্রাট নিজে একজন সুদক্ষ Connoisseur (শিল্প-সমালোচক) বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। এবং তাহার এই আত্মম্ভরিতার যথেষ্ট সার্থকতা ছিল। তিনি তাহার বিখ্যাত আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন, 'চিত্র আমার খুব সখের সামগ্রী। আমি চিত্রকে এমন সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি যে, চিত্রকর জীবিতই হোক আর মৃতই হোক ছবি দেখিয়া আমি তাঁহার নাম বলিয়া দিতে পারি। যদি একই প্রকারের Portrait কয়েকজন চিত্রকর দ্বারা অঙ্কন করা হয় তাহা হইলেও আমি কোন চিত্র কাহার দ্বারা অঙ্কিত হইয়াছে তাহা স্বচ্ছন্দে বলিতে পারি। এবং যদি একটি Portrait কয়েকজন শিল্পী দ্বারা অঙ্কন করা হইত তাহা হইলেও সেই একটি চিত্রের কে কোন অংশটি অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা বলিয়া দিতে পারি। বস্তুতঃ আমি কে কপোলদেশ এবং কে চক্ষের পলক অঙ্কন করিয়াছেন, কিম্বা প্রথম চিত্রকর কাজ শেষ করার পর অন্য কেহ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন কিনা তাহাও আমি স্পষ্টই নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারি।'[২]

সম্রাট জাহাঙ্গীরের কিরূপ critical power of observation (সূক্ষ্ম সমালোচনা দৃষ্টি) ছিল তাহা উপরোক্ত কথাগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়। বাস্তবিক তিনি যেভাবে পশু পক্ষী ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে মনে হয় তাঁহার অসাধারণচিত্র পরিচয়ের শক্তি ছিল।

জাহাঙ্গীর বাদশাহের চিত্রকরেরা শিল্প বিষয়ে কতটুকু পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন রাজদূত স্যার টমাস রো-ই তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

স্যার টমাস রো তাঁহার অমূল্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন, '৬ই আগস্ট তারিখে আমাকে দরবারে যাওয়ার জন্য ডাকা হইল। কারণ কোন একটি চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা। আমি কয়েক

---

২. I am very fond of pictures and have such discrimination in judging them that I can tell the name of the artist whether living or dead. If there were similar portraits finished by several artists, I could point out the painter of each. Even if one portrait were finished by several painters, I could mention the names of those who had drawn the different portions, of that single picture. In fact, I could declare with out fail by. Whom the brow and by whom the eyelashes were drawn or if every one had touched up the portrait after it was drawn by the first painter.

www.pathagar.com

দিন পূর্ব্বে সেই চিত্রখানা সম্রাটকে উপহারস্বরূপ দিয়াছিলাম। আমার ধারণা ছিল ভারত-বর্ষে আর কেহই সে চিত্রের অনুকরণ করিতে পারিবে না। আমি দরজায় আসিবা মাত্র বাদশাহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'রাজদূত যদি কোন চিত্রকর আপনার চিত্রের এমন একটি অনুকরণ করিয়া দিতে পারে যে আপনি আপনার নিজের চিত্র চিনিয়া লইতে না পারেন, তাহা হইলে আপনি তাঁহাকে কি পারিতোষিক প্রদান করিবেন?' আমি উত্তর করিলাম—চিত্রকরের পুরস্কার পঞ্চাশ টাকা। বাদশাহ উত্তর দিলেন, 'আমার চিত্রকর একজন Cavalier-সম্ভ্রান্ত সামরিক কর্ম্মচারী তাঁহার জন্য ৫০ টাকা অতি তুচ্ছ। কতক্ষণ কথা কাটাকাটির পর সম্রাট আমাকে আর একদিন তাঁহার দরবারে আসিবার অনুরোধ করিয়া সে দিনের মত বিদায় দিলেন। আর এক রাত্রে নিজের শিল্পীর কৃতকার্য্যতার জয়োল্লাস করিবার জন্য আমাকে ডাকিলেন। ছয়খানি চিত্র একখানি টেবিলের উপর ছড়ানো হইল। ছবিগুলি তাঁর নিজের চিত্রকরের দ্বারা অঙ্কিত। সবগুলিরই এতটুকু সাদৃশ্য ছিল যে আশ্চর্য্যের বিষয় আলোকের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া চিত্রগুলিকে চিনিয়া লইতে খুবই বেগ পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক খুবই কষ্টে আমি আমার চিত্রটাকে বাছিয়া লইলাম। কিন্তু আমি যে প্রথমেই আমার ছবিখানি চিনিতে পারি নাই দেখিয়া সম্রাট খুবই উৎফুল্ল ও হর্ষোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। আমি তাঁহার শিল্পীর শিল্প-চর্চ্চাকে ভূয়ো ভূয়ো প্রশংসা করিতে লাগিলাম।'.... আর একদিন বাদশাহ Sir Thomas Roe-এর একটি বন্ধুর ছবি চাহিয়া তাহার অনুকরণ অঙ্কন করিয়াছিলেন। Roe সাহেব লিখিয়াছেন In the art of imitation his painters work miracles.'

সম্রাট জাহাঙ্গীর খোদার সৃষ্ট জীব পশু পক্ষীগুলিকে খুবই ভাল বাসিতেন। জীবের প্রতি ভালবাসাটা তাঁর এত গভীর ছিল যে তিনি কোন নূতন ধরনের জীব দেখিলে রাজ চিত্রকর দ্বারা তাহার ছবি অঙ্কন করাইয়া রাখিতেন। আজকাল Photography-তে যে কাজ করা হয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের চিত্রকরেরা সে কাজ করিতেন।

সম্রাট লিখিয়াছেন 'মকাব্বান খাঁ গোয়া হইতে আমার জন্য কতকগুলি মূল্যবান জিনিষ আনিল। সে সকল উপহারের জিনিষগুলির মধ্যে কতকগুলি পশু-পক্ষী দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বে এ সকল পশু-পক্ষী দেখি নাই। এবং কেহ তাহাদের নামও জানিত না। সম্রাট বাবর তাঁহার আত্মজীবনীতে কতকগুলি জন্তুর বিশদ বিবরণ লিখিয়াছেন ; কিন্তু আমার মনে হয় তিনি কোন চিত্রকরকে তাহাদের চিত্রাঙ্কন করিতে আদেশ করেন নাই। কিন্তু এই জন্তুগুলি অতি সুন্দর ও দুষ্প্রাপ্য বলিয়া আমি তাহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম এবং তাহাদের ছবি অঙ্কন করিয়া জাহাঙ্গীর নামাতে সংযুক্ত করিয়া রাখিতে আদেশ করিলাম। কারণ পাঠকগণের নিকট তাহাদের বিবরণ হইতে যথার্থ প্রতিকৃতিই অধিকতর আমোদ ও আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হইবে।'

এইরূপ যখনই কোন নূতন ধরনের প্রাণী কিম্বা বৃক্ষ সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত তখনই সে সৌন্দর্য্য স্থায়ীভাবে উপভোগ করিবার জন্য তিনি সুনিপুণ শিল্পী দ্বারা তাহার প্রতিকৃতি অঙ্কন করাইয়া রাখিতেন। ইউরোপিয়ান ছবিগুলির মধ্যে যাহাই তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিত তাহাই তিনি ক্রয় করিয়া লইতেন ও উহার অনুরূপ আরও কতকগুলি ছবি অঙ্কন করাইয়া রাখিতেন।

www.pathagar.com

সম্রাট জাহাঙ্গীরও তাঁহার পিতার ন্যায় চিত্রকরদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন এবং তাঁহাদের কৃতকার্য্যতায় তিনি নিজেকে খুবই কৃতার্থ মনে করিতেন। তাঁহার দুর্গে কয়েকজন চিত্রকর বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। চিত্রকর যথা আবদুল হামিদের পুত্র শফিয়া খাঁকে তিনি Premier grandee-র পদে ভূষিত করিয়াছিলেন। আবুল হাসান নামক আর একজন চিত্রকরের নামোল্লেখ আছে। তাহার উপাধি ছিল নাদিরুজ্জামান। তিনি বাদশাহের দরবারের ছবি অঙ্কন করিয়া বাদশাহকে উপহারস্বরূপ দান করিয়াছিলেন। বাদশাহ তাহাতে তুষ্ট হইয়া তাহার পদোন্নতি করিয়াছিলেন। মনসুর নামে আর এক ব্যক্তি চিত্রশিল্পে সে যুগের ওস্তাদ ছিলেন। তাঁহার উপাধি ছিল নাদিরুল ব..হুলি। জাহাঙ্গীর বাদশাহ লিখিয়াছেন—আবুল হাসান ও মনসুর-এর সমকক্ষ শিল্পী আর কেহই ছিল না। ক্যালকাটা আর্ট গ্যালারিতে· মনসুরের অঙ্কিত খুব সুন্দর দুইখানা চিত্র আছে। একটি বাংলাদেশের পক্ষীর প্রতিচ্ছবি। আর একটি শ্বেত সারস পক্ষীর ছবি। সারস পক্ষীর চিত্রে সম্রাট জাহাঙ্গীরের শিল্পীর তুলি-নৈপুণ্যের পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছিল। এবং Orinthological study হিসাবে ইহা জাপান দেশীয় বিখ্যাত ওস্তাদদের অঙ্কিত চিত্রের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছিল।[৩]

জাহাঙ্গীরের আদেশানুসারে যে তুর্কী মোরগের ছবি আঁকা হইয়াছিল তাহাও মনসুরের তৈয়ারী। Havel সাহেব লিখিয়াছেন 'No chinese work could surpass the picture of the Turkey cock ordered specially by Jahangir, and now in the Calcutta Art Gallary.' তুর্কী মোরগের ছবি খানি দেখিবার জিনিস। মনুচাহার বান্দা নামে আর একজন চিত্রকরের নাম পাওয়া যায়। যে সমস্ত Protrait picture-এ সম্রাট নিজ হাতের সিল মারিয়া দিতেন, সে কার্য্যগুলি আর সবগুলির চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল ও তুলি নৈপুণ্যের চরম নিদর্শন ছিল। নানহা নামক আর এক চিত্রকরের অঙ্কিত সুরজমলের প্রতিচ্ছবি খানা খুবই সুন্দর হইয়াছিল।

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে মোগল চিত্র-চর্চ্চার চরম উৎকর্ষ লাভ হইয়াছিল। রাজ্যে পূর্ণ শান্তি বিরাজমান থাকায় তিনি স্থাপত্য ও শিল্পে গভীরভাবে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অফুরন্ত ধন ভাণ্ডার ছিল। তাই তিনি শিল্পীকে অগণিত অর্থ দ্বারা সন্তুষ্ট রাখিতেন, ও নিজের ইচ্ছানুযায়ী চিত্র অঙ্কন করাইয়া লইতেন। সম্রাট কবি শাহজাহান কতটুকু সৌন্দর্য্যের উপাসক ছিলেন অতীতের গৌরবময়ী যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া বিশ্ববিশ্রুত তাজমহল তার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহার হৃদয়ের ভাব, মনের কোমল প্রবৃত্তি শিল্পকলার প্রতি একটা গভীরতম শ্রদ্ধা ভক্তি, তাজমহলেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্থাপত্য শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিত্র শিল্পেরও উন্নতি হইয়াছিল। ঐতিহাসিকের উক্তি যে Shah-Jahan's reign marked the culmination of the Mughal civilisation.

সম্রাট শাহজাহানের আমলে অনেক বিষয়ে চিত্রাঙ্কন করা হইয়াছিল। অনেক সময়ে এক চিত্রই অনেক চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত হইত। প্রত্যেক চিত্রকরের নাম ও তাঁহার অঙ্কিত ছবিসমূহের বিবরণ দেওয়া একটা দুরূহ ব্যাপার।

· As an orinthological study it rivals the work of the best Japanese masters.

www.pathagar.com

British Museum–এ Album হইতে নিম্নলিখিত শিল্পীর নাম পাওয়া যায়। তবে চিতরমন বা কল্যাণ দাস একজন বিখ্যাত চিত্রকর ছিলেন। অনুপছতর শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকোর চিত্রকর ছিলেন। মনোহর, সমরখন্দ নিবাসী মহম্মদ নাদির, মীর হাসিম ও মহম্মদ ফাকরোল্লা খান, গোবর্ধন, ভাগবতী এই সব চিত্রকরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

Portrait painting (প্রতিকৃতি অঙ্কন) সম্রাট শাহজাহানের সময় খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। তন্মধ্যে British Museum–এ সংরক্ষিত একখানা অতি মূল্যবান album আছে। তাহাতে শাহজাহানের একজন কর্ম্মচারীর চিত্র, নাদির খাঁ কর্ত্তৃক আজম খাঁ কোফার চিত্র, আহাদ খাঁর চিত্র, শাহজাহানের দরবারের চিত্র ইত্যাদি। বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'শাহজাহানের দরবারে' ছবি খানার মূল্য দুইশত টাকা।

সম্রাট শাহজাহানের সময় পশু পক্ষী ইত্যাদিরও প্রতিকৃতি অঙ্কন করা হইয়াছিল। তখনকার শিল্পীগণ পশু পক্ষীর আচরণ বিশেষ করিয়া বুঝিতে পারিতেন, তাই তাঁহাদের পশু পক্ষীর ছবিগুলি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট হইত। মনোহর শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত দারার প্রিয় অশ্ব দীল–পছন্দের ছবিখানা অতি সুন্দর। Johnson Collection–এ অনেক সুন্দর চিত্র সংরক্ষিত আছে।

এই সব প্রাণীর ছবি ভিন্ন আকবরের ন্যায় অনেক Manuscript গল্পবাজ চিত্র দ্বারা পরিশোধিত করাইয়াছিলেন। মালওয়ার রাজা রাজ বাহাদুর ও তাঁহার প্রণয়িণী কুমারী রূপমতির গল্প খানার কয়েক প্রকারের চিত্র অঙ্কন করানো হইয়াছিল। ক্যালকাটা আর্ট গ্যালারীতে তাহার একটি সুন্দর নমুনা সংরক্ষিত আছে। এতদ্ব্যতীত লায়লী মজনু, শিরি–খসরূ (কামরান কামতা) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ রোমান্টিক গল্পগুলির চিত্রাঙ্কন করা হইয়াছিল।

অনেক শিল্পী মুলসমান ও হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীদের ছবি আঁকিতে খুব পছন্দ করিতেন। এ ধরনের ছবির ভিতর দুইটি ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উভয়টিই শাহজাহানের রাজত্বকালের। তন্মধ্যে একখানা এক ফকিরের ছবি আর একখানা কোরান পাঠরত এক মোল্লার ছবি। এই ছবিগুলি দারাশিকোর এ্যালবামে সংরক্ষিত আছে।

এই যুগের আরও অনেক এ্যালবামে খুব জাঁক–জমকশীল রাজদরবারের ছবি অঙ্কিত আছে। Johnson Collection–এর ৯,১০,১১ ভল্যুম গুলিতে কেবল স্ত্রীলোকের চিত্র দেখা যায়। কতকগুলি স্নান করিবার ছবি। আর কতকগুলি Toilet–এর ছবি। দ্বিতীয় ভাগে যে ছবিগুলি আছে তাহা অতি সুন্দর, তন্মধ্যে পারস্য পোশাকে পরিহিত (conical dress) এক রমণীর ছবিখানি অতি উৎকৃষ্ট ও মনোরম।

সম্রাট আওরঙ্গজেব একজন অনুষ্ঠান–প্রিয় মুসলমান ছিলেন। মুসলমানদের জন্য কোরান ও হাদিসে যে সমস্ত বিধি ব্যবস্থা নির্ধারিত রহিয়াছে তিনি তাঁহার দৈনন্দিন জীবনে সবগুলিই পালন করিতেন। মুসলমান ধর্ম্মে যাহা মকরূহ বা নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য তাহা কখনো তিনি নিজে করিতেন না ও তাঁহার রাজ্যে তাহার প্রশ্রয় দিতেন না। মুসলমান ধর্ম্মে সঙ্গীত চর্চ্চা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাই তিনিও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রচলিত প্রথা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার দরবারে সঙ্গীত বন্ধ করিয়া দিলেন। রাজ্যের মধ্যেও সঙ্গীত–চর্চ্চা বন্ধ করিয়া তিনি

www.pathagar.com

একটি আইন জারী করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি চিত্র শিল্পের বিরুদ্ধে কোন আইন জারী করেন নাই, কোন ঐতিহাসিক একথা স্বীকার করেন নাই। তবে তিনি স্বভাবত এই শিল্পের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কিন্তু বার্ণিয়ার সাহেবের কথামতো দেখা যায়, তখনও রাজধানীতে চিত্র শিল্পাগার ছিল। ক্রমে সম্রাটের পরিপোষকতা হারাইয়া, বিচ্যুত হইয়া সেই সব শিল্পাগার ধ্বংসপ্রাপ্ত হতশ্রী হইয়া পড়ে। দিল্লী নগরীতে আর যে সমস্ত বেসরকারী কারখানা ছিল সম্রাটের ও রাজধানীর আমীর ওমরাহগণের অনুৎসাহে সেগুলি বিলুপ্ত হইয়া যায়।

সম্রাটের অধীনে তখনও বিখ্যাত ওস্তাদ ছিল। পি. ব্রাউন সাহেব বলেন, আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে অবস্থানকালে Deccan কলম নামে মোগল চিত্র-শিল্পের আর একটি শাখার আবির্ভাব হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আওরঙ্গজেবের রাজদরবারে তখনও চিত্রকর বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদের অনুপ্রেরণাই দাক্ষিণাত্যে মোগল চিত্র-চর্চ্চার শাখা স্থাপিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, বর্ণিয়ার সাহেব বলিয়াছেন যে চিত্রকরেরা আর তেমন উৎসাহ পাইতেন না। গুণের আর তেমন আদর ছিল না। চিত্রকে আর তত উচ্চে স্থান দিতেন না। বাদশাহের ঔদাস্যে আমীর ওমরাহ বহু মূল্যবান চিত্র কম মূল্যে বিক্রয় বা ক্রয় করাইতেন। তাই বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্র-চর্চ্চাতে আর তেমন প্রাণ ছিল না। বর্ণিয়ার সাহেব লিখিয়াছেন, Want of genius therefore, is not the reason why works of superior art are not exhibited in the capital. If the artists and manufacturers were encouraged, the useful and fine arts would flourish ; but these unhappy men are combuned treated with heartness and inadequated renember for their labour. The rich will have every article at a cheap rate... The artist therefore who arrive at any eminence in their art are those only who are in the service of the kingor of some powerful Omrah and who work exclusively for their patron.'

সুবিখ্যাত ও সুনিপুণ চিত্রের লুপ্ত হওয়ার কারণ শুধু প্রতিভার অভাব নহে। শিল্পীগণকে উৎসাহ প্রদান করিলে হয়ত শিল্প-চর্চ্চা উৎকর্ষ লাভ করিত। কিন্তু এই সমস্ত হতভাগ্যদিগের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করা হইত এবং পরিশ্রমের উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করা হইত না। ধনী ব্যক্তিগণ সব জিনিষই অল্প মূল্যে খরিদ করিতে চাহিতেন। কাজেই যে সমস্ত শিল্পীগণ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই রাজ দরবারে অথবা আমীর ও ওমরাহদের অধীনে চাকুরি করিতেন।

রাজকীয় উৎসাহ হইতে বঞ্চিত হইলেও চিত্রকরদের আগের মতই চিত্র-চর্চ্চা চলিতে লাগিল। যুগের পর যুগ ধরিয়া (portrait painting) যে চিত্র শিল্পের চর্চ্চা হইতেছিল তাহা হঠাৎ বিলুপ্ত হইয়া যায় নাই। পি. ব্রাউন সাহেবের মতে চিত্রের প্রাচুর্য্য পূর্ব্বের মতই রহিল, কিন্তু নিপুণতা ও কমনীয়তা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাইল। এ যুগের চিত্রের মধ্যে প্রথমেই আওরঙ্গজেবের নিজের প্রতিচ্ছবি আমাদের দৃষ্টি পথে আসে। Johnson Collection-এ সংরক্ষিত শিখ চিত্রকর ওস্তাদ Syon Chand-এর অঙ্কিত Nawab Gyslin Khan-এর

ছবিখানি খুবই সুন্দর। ইহার দাম একশত সত্তর টাকা। মীর মোহাম্মদ খাঁ নামক আর একজন বিখ্যাত চিত্রকরের তৈরি মুহসিন খানের ছবিখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মীর মোহাম্মদ খাঁ ইটালিয়ান পরিব্রাজক মানুচী সাহেবের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে তিনি তৈমুরলঙ্গ হইতে আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত সমস্ত সম্রাট ও যুবরাজগণের ছবি অঙ্কন করিয়াছিলেন। এ যুগের—

১. চান্দ মহম্মদ কর্ত্তৃক ইসলাম খাঁ নামক একজন নিগ্রো কর্ম্মচারীর ছবি।
২. সজমল কর্ত্তৃক নবাব সাহেব কিবলু আজিজ খাঁ বাহাদুরের ছবি।
৩. মোহাম্মদ ফজল কর্ত্তৃক একটি রমণীর ছবি এবং আরও অনেক ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৩৪-৩৫ সনের অঙ্কিত ষাট খানা মিনিয়েচর ছবি পরিশোভিত কামরূপের Romance ইতিহাস এখন Bibliotheque Nationale-এর French Collection-এ সংরক্ষিত আছে।

উপরিলিখিত নামগুলি হইতে ইহা বুঝা যায় যে, রাজ দরবার হইতে বাহিরে আসিয়া চিত্র শিল্প অন্যান্য ছোট ছোট রাজন্যবর্গের দরবারে জ্যোতি বিস্তার করিতে লাগিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পরবর্ত্তী সম্রাটগণ খুবই দুর্ব্বল ছিলেন। রাজ্যে ঘোরতর বিপ্লব আরম্ভ হওয়ায় তাঁহাদের শিল্প-চর্চ্চার আকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকিলেও তাহা আর কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেন না। Court patronage-এর অভাবে রাজধানীতে আলো নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। কিন্তু অধীনস্থ আমীর ওমরাহদের দরবারে চিত্র শিল্প তাহার ক্ষীণ রশ্মি বিকীরণ করিতে লাগিল। আর Private painters গণ রাজদরবারের ছবি অঙ্কন পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় ছবির প্রতিকৃতি আঁকতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু পরিশ্রমের অনুরূপ পারিতোষিক পাইলেন না। অর্থাভাবে শিল্প-চর্চ্চার প্রতি শিল্পীদের আর তেমন অনুরাগ রহিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অযোধ্যার নবাবের দরবারে নির্ব্বানোন্মুখ প্রদীপের মত শেষ হাসিটুকু হাসিয়া চিত্র শিল্প মোগল ভারত হইতে বিদায় লইল।

মোগল যুগে চিত্র শিল্পের যে কতটুকু চর্চ্চা হইয়াছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। জগতের চিত্র শিল্পের ইতিহাসে মোগলদের Potrait ও Miniature Painting-এর স্থান অতি উচ্চে। এই সমস্ত চিত্রের বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। Vincent Smith সাহেবের Fine Arts in India and Ceylon, Havel সাহেবের Indian Sculpture and Painting, Benyon Arnold সাহেবের Court painters of the Great Mugals-এ যে সকল ছবি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিলে মোগল চিত্র শিল্পের বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা যাইতে পারে। ধর্ম্মে নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও মোগল রাজগণ যে চিত্র-চর্চ্চাকে একটা প্রাণের জিনিষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, শিল্পীকে যথাচিত আদর ও সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অনুপ্রেরণায় ভারতের চিত্র ইতিহাসে যে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন ইহাই তাঁহাদের যথেষ্ট গৌরবের বিষয়। মোগল রাজত্বের ইহাই একটি বিশেষ সার্থকতা। ধর্ম্ম ও কলা শিল্পের যুগপৎ উন্নতি সাধনাই মোগল শাসনের বিশেষত্ব ও সৌন্দর্য্য। পৌত্তলিকতা

www.pathagar.com

বা ঈশ্বরত্ব দাবীর সহায় বলিয়া যে শিল্প চর্চ্চাকে মানুষের স্বভাবগত ধর্ম্মকেও তাহার স্বাভাবিক প্রেরণাকে চাপিয়া রাখা হইয়াছিল মোগল যুগে তাহার পূর্ণ স্ফুরণ হইয়াছিল। মোগল বাদশাহগণ সুন্নি মতাবলম্বী ছিলেন। ইসলাম ধর্ম্মে তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। নিজেদের দৈনন্দিন জীবনেও ধর্ম্মের আইন কানুনগুলি বিশেষভাবে পালন করিতেন। কিন্তু তাঁহারা জ্ঞানী ছিলেন, নিরক্ষর মুসলমানদিগের মত ধর্ম্ম পালনটাকে একটা formality-তে পরিণত না করিয়া ধর্ম্মের যাহা সুন্দর, যাহা সত্য তাহাই তাঁহারা আঁকড়িয়া থাকিতেন। মূল সত্যকে পিছনে রাখিয়া কেবল কতকগুলি বাজে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া নিজেদের জীবনকে নিরানন্দ ও প্রাণহীন করিয়া তুলিতেন না।

একটি বিষয় লক্ষ্য না করিলেই চলে না। মোগল চিত্র শিল্প রাজ শিল্প ছিল। সেই জন্য সাম্রাজ্ঞীদের বা অন্তঃপুরবাসিনীদের যত ছবি দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহা তাঁহাদের অবিকল প্রতিচ্ছবি নহে। ইটালির পরিব্রাজক Manuchi সাহেব এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। অসূর্য্যম্পশ্যা হেরেম রমণীদিগকে চিত্রকরেরা কখনও দেখিতে পাইতেন না। তাই তাঁহারা বাঁদী দাসীদের ছবি অবলম্বনে কল্পনা হইতে সম্রাট মহিষীদের ছবি আঁকিয়াছিলেন।

মোগল যুগের চিত্রের মধ্যে আমরা বিশেষ কোন সামাজিক চিত্র দেখিতে পাই না। সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীদের, আমির ওমরাহ ও তাঁহাদের বেগমদের প্রতিচ্ছবি, তাঁহাদের যুদ্ধবিগ্রহ', পশু পক্ষী ইত্যাদি ছবিই বেশীর ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কখনো কখনো ফকিরের নাচ, মোল্লার কোরান পাঠ, দরবেশদের আড্ডা ইত্যাদি ধর্ম্ম জীবনের ছবিও দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুত ও বৌদ্ধ শিল্প যেমন মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও তাহার আচার ব্যবহারের ইতিহাস অঙ্কন করিয়াছিল, মোগল চিত্রে আমরা তাহা পাই না। মোগল চিত্র ছিল Secular, Realistic and Eclectic.

সম্রাট ও আমির ওমরাহদিগের উৎসাহেই ইহার উৎপত্তি ও উৎকর্ষ, তাঁহাদের বিরাগেই ইহার অবনতি ও বিনাশ। মুসলমান অতীত গৌরব গাহিতে খুব ভালবাসে, অতীতের কাসুন্দি ঘাঁটিয়াই তাহারা নিরস্ত হইয়া যায়। মোগলেরা নিজেদের জীবন যেভাবে সুন্দর ও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের পরবর্ত্তী যুগের মুসলমানগণ সভ্য জগতে বাস করিয়া, নিজেদিগকে সভ্য বলিয়া দাবী করিয়াও তাঁহাদের মত জীবনকে সুন্দর ও শক্তিশালী করিয়া গঠন করিতে পারে নাই। যে বিদ্যা ও শিল্পে একদিন মুসলমান জগতের দীক্ষা গুরু ছিল ও আজ অজ্ঞ ও মূর্খ তথাকথিত ধর্ম্মনেতাদের স্বার্থ বিজড়িত উপদেশ অনুসারে চলিয়া সেই মুসলমান নিজেদের জীবনটাকে ব্যর্থ করিয়া তুলিয়াছে। ধর্ম্মের আদেশগুলি সময়োপযোগী ছিল। ঘোর পৌত্তলিকতার যুগে চিত্র ও ভাস্কর্য্য নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়ার সার্থকতা ছিল। ভাস্কর্য্য পৌত্তলিকতার যতটুকু সহায়, চিত্রশিল্প ততটুকু সহায় হইতে পারে না। তাই মুসলমানগণ ভাস্কর্য্য শিল্পের চর্চ্চা করিতে পারে নাই। তাহাদের মানসিক বৃত্তিগুলি চিত্রশিল্প ও স্থাপত্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বর্ত্তমান মুসলমান ধর্ম্মের দোহাই দিয়া প্রাণের জিনিস চিত্রকে গ্রহণ করিতেছে না। বর্ত্তমান যুগে চিত্র শিল্প যে কেবল একটা ভোগের জিনিস তাহা নয়, জীবিকা নির্ব্বাহেরও যথেষ্ট উপায় বটে, একথা মুসলমানের চক্ষে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করিয়া দেখাইলেও তাহাদের চক্ষে

www.pathagar.com

দোজখের চিত্র ভাসিয়া উঠিবে। সুখের বিষয় বর্ত্তমান যুগে আবদুর রহমান চুখ্‌তাই, জালালউদ্দীন চুখতাই, আবদুল জলিল প্রভৃতি কয়েকজন মোগল বংশীয় চিত্রকর মোগল শিল্পের বিলুপ্ত প্রায় অতীত গৌরবের পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। 'Modern Review, 'বসুমতী' ইত্যাদি মাসিক পত্রিকাগুলিতে যথারীতি তাঁহাদের চিত্র প্রকাশিত হইতেছে। কবে তাঁহাদের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া মুসলমান জাতির ভিতরে আরও শিল্পীর আবির্ভাব হইবে এবং তাঁহাদের সুনিপুণ তুলির প্রভাবে ধর্ম্ম ভীরু, নরকভীরু জীবন্মৃত সমাজকে একদিকে প্রকৃত নিষ্ঠাবান, কর্ত্তব্য পরায়ণ ও শক্তিশালী এবং অন্যদিকে সুন্দর ও তেজোদীপ্ত করিয়া তুলিবে?

www.pathagar.com

বাংলার লুপ্ত শিল্প

রকীব উদ্দীন আহমদ

বাংলার শিল্পের ইতিহাস এক বিপুল ব্যর্থতার ইতিহাস। একদিন ছিল যখন বাংলার প্রতি জনপদে ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন না কোন গৃহে শিল্পের অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হইত। কাল-পরিবর্ত্তনের অপ্রতিহত প্রভাবে আজ যেন ঐ সকল কোন দূরান্তে নিরুদ্দেশ হইয়াছে। বর্ত্তমানে আর্থিক সমস্যার নিপীড়নে অধিকাংশ বাঙ্গালীই জীবন ধারণে অক্ষম। আর শ্রমিকদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয় সেই জীবন বড়ই নীরস, বড়ই উদাস, উহাতে স্বাদ নাই,—আছে শুধু অতীতের অতি ক্ষুদ্র করুণ-মধুর ক্ষীণ স্মৃতিটুকু, আর তারই জড়িত সুখ-স্বপনের ক্ষীণতর পুলক-শিহরণ।

আজকাল বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান ব্যবসায় কৃষিকর্ম্ম। কিন্তু এই ব্যবসায় কোন অর্থ-নৈতিক পরিণতি (Economic Evolution) অথবা বাংলার আর্থিক অবস্থার জন্ম-বিকাশের ফলে নহে। ইহা একদিকে বিদেশী শিল্পের অবৈধ প্রতিযোগিতা ও অপরিদিকে আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধীয় আপেক্ষিক-ব্যয়বাদের (Theory of comparative cost) প্রত্যক্ষ পরিণাম। এই নিয়মের বশীভূত হইয়া প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে যে দেশ যে দ্রব্য, অপেক্ষাকৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়ে উৎপাদন করিতে পারে, সেই দেশ কেবল সেই দ্রব্যই উৎপাদন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্যান্য দেশ হইতে অবশিষ্ট প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া থাকে। থিওরীর দিক দিয়া ইহা অর্থ শাস্ত্রের একটি সুন্দর ব্যবস্থা বটে, কিন্তু বাস্তব জীবনে উহার যে সকল অশুভ ব্যতিক্রম সংঘটিত হয় বিশেষতঃ যখন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা একীভূত হইয়া পড়ে তখন অর্থনৈয়ায়িকের অগাধ পাণ্ডিত্যেও কোন সুফল হয় না। অবাধ বাণিজ্য (Free Trade) সকলেরই অভিলষিত ; তবু সকল দেশেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংরক্ষণ-নীতি প্রয়োজন কেন? কারণ জাতীয়ভাবে প্রণোদিত হইয়া আজও মানুষ রাজনীতির শাসনে অর্থনীতিকে চপিয়া রাখিতে চায়।

অর্থশাস্ত্রে একটা কথা আছে 'Exports pay for the imports'— অর্থাৎ আমরা বিদেশ হইতে যত টাকার মাল আমদানী করি ঠিক তত টাকার মাল আমাদিগকেও বিদেশে রপ্তানি করিতে হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আগমনের পূর্ব্বে বাংলাদেশ হইতে যে সকল দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হইত অধিকাংশই ছিল শিল্প দ্রব্য। এক্ষণে আর্থিক ও অন্যবিধ ঐতিহাসিক কারণে ঐ সকল শিল্প নষ্ট হওয়ায় বাঙ্গালী শিল্পীগণ কৃষিক্ষেত্রে বিতাড়িত হইয়া বিদেশী শিল্প-যন্ত্রের খাদ্য সরবরাহ করিতেছে। পূর্ব্বে যে সকল পণ্য দ্রব্য দেশে উৎপন্ন হইত, তন্মধ্যে মসলিন, সিল্ক, তসর, পট্টবস্ত্র, কাগজ, চিনি, লৌহ, লবণ, নীল, চা, সোরা, বাঁশের জিনিষ, শাঁখা, মাটির বাসন এবং নানা প্রকার রং বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

বস্ত্রশিল্প

এই প্রবন্ধ যোগেন বাবুর 'ঢাকার ইতিহাস', ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার প্রণীত Statistical Account, Imperial Gazetteer of India এবং অন্যান্য আর্থিক ইতিহাস (Economic History) ও গভর্ণমেন্ট প্রকাশিত পুস্তকাবলী পাঠে লিখিত।—লেখক

অতি প্রাচীন কালেও ভারতীয় বস্ত্র সমগ্রে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। মিঃ ইয়েটস তাঁহার Tesitrinum Antipuorum' গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে খৃষ্টের জন্মের শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতের কার্পাস বস্ত্র গ্রীস দেশে বিক্রী হইত। প্রফেসর উইলসন তদীয় 'Introduction of the Rigveda Samhita' নামক পুস্তিকায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও ভারতের বস্ত্র শিল্প বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে এরিয়েন তাঁহার 'Periplus of the Erythrean Sea' নামক পত্রিকায় বঙ্গের মসলিনের কথা লিখিয়াছেন।

বয়ন ও বস্ত্র শিল্পের জন্য ঢাকা জিলা বঙ্গের শীর্ষ স্থানীয় ছিল। প্রাচীন যুগে বেবিলনিয়া ও এসিয়ার চরম সভ্যতার দিনেও ঢাকাই মসলিন জগতের আদরণীয় হইয়াছিল—এই কথা ইউরেপীয় গ্রন্থকারগণ সানন্দে স্বীকার করিয়াছেন। বাংলার শিল্প দ্রব্য নৌকা যোগে প্রাচীন প্যালেষ্টাইন বন্দরে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি করা হইত। মসলিন ব্যবসায়ের সাহায্যে আধুনিক সভ্যতার পথ প্রদর্শক রোমক নগরী শ্রী সম্পন্না হইয়াছিল। ডা. ইউরি তদীয় 'Cotton Manufacture of Great Britain' গ্রন্থে লিখিয়াছেন 'Muslin of Dacca Constituted the Seriac vests which were so highly prized by the ladies of Imperial Rome in the days of its luxury and refinement'.

যদিও অতি প্রাচীন কাল হইতেই ঢাকাতে মসলিন প্রস্তুত হইত, তথাপি মুসলমানদের সময়েই এই শিল্প উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। মসলিন সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের অত্যন্ত প্রিয় বস্তু ছিল। এই জন্য দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীর মসলিন শিল্পের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাট আওরঙ্গজেবও মসলিনের উন্নতিকল্পে যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন। এমন কি যাহাতে এই বস্ত্র বিদেশে না যাইতে পারে এই জন্য রাজাদেশ প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। আরো দেখিতে পাওয়া যায় যে মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে মসলিন বস্ত্রের বিশেষ কোনো নির্দ্দিষ্ট নাম ছিল না ; তাঁহারাই বস্ত্রের সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য্যানুসারে মসলিনকে ঝুনা রং, সরকার আলী, খাসা, শবনম, আবরোচান, আল্যবাল্ল তা'জেক, তরন্দাম, নয়নসুক, বদন খান, সেরবন্দ, সরবতি, কুমিস ডুড়িয়া খান (ছয় প্রকার নন্দন সাহী, খানার দাশ, সাকুতা, বাছাদার, কুস্তিকার) জামদানী, মলমলে খাস ও জঙ্গল খান ইত্যাদি মুসলমানী নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ঝুনা শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম। 'ইউরোপীয় গ্রন্থকারগণ ইহাকে অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন দেববালাগণের কোমল করসম্ভূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। টেইলর সাহেব তাঁহার 'Topography of Dacca গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'Those gassamer like Muslins were made which have been compared (?) to the work of fairies rather than of men.

ফার্সী 'খাসা' শব্দের অর্থ উৎকৃষ্ট। এই বস্ত্রকে আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থে 'কসাক' নাম প্রদান করিয়াছেন। সর্ব্বোৎকৃষ্ট মলমলের নামই জঙ্গল খাস। মলমলে খাস

www.pathagar.com

সাধারণতঃ দিল্লীর সম্রাটগণের ব্যবহারের জন্যই প্রস্তুত হইত। উহা এইরূপ সূক্ষ্ম ছিল যে বিশ হস্ত দৈর্ঘ্য এক গজ প্রস্থ একখানা বস্ত্র খন্ড একটি অঙ্গুরীয়কের ছিদ্রের ভিতরদিয়া একদিক হইতে অনায়াসে অপরদিকে টানিয়া লওয়া যাইত। উহার ওজন প্রায় ৮ তোলা এবং মূল্য তৎকালেই প্রায় একশত টাকা ছিল।

শবনম শব্দের অর্থ 'সান্ধ্য শিশির'। সন্ধ্যাকালে উহাকে শ্যামল ঘাসের উপর আস্তীর্ণ করিয়া রাখিলে প্রাতে শিশির নিষিক্ত দুর্ব্বাদল বলিয়া ভ্রম হইত। বোল্ট সাহেবের 'Consideration in the affairs of India' গ্রন্থে একটা গল্প আছে যে, একদিন পরীক্ষাস্থলে নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ এক খন্ড শবনম মলমল তৃণের উপর ফেলিয়া রাখিয়া ছিলেন, ঘাসভ্রমে একটি গাভী ঐ বহুমূল্য বস্ত্রখন্ড উদ্‌রসাৎ করিয়াছিল।

আবরোচান শব্দের অর্থ 'স্বচ্ছ সলিলা'। ইহা জলের সহিত এইরূপভাবে মিশিয়া যাইত যে, জল হইতে উত্তোলন না করিলে কেহ উহাকে চিনিতে পারিত না। জামদানী কাপড়ের বয়ন কার্য্যে দুইশত হইতে আড়াইশত নম্বরের সূতা ব্যবহৃত হইত। ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেব এই বস্ত্রের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। উহার মূল্য অন্যূন দুইশত পঞ্চাশ টাকা ছিল। ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে নায়েব নাজিম মহম্মদ রিজা খাঁ একখানা জামদানী বস্ত্র প্রস্তুত করাইবার জন্য চারশত পঞ্চাশ টাকা ব্যয় করিয়ছিলেন। এই বস্ত্র বিশেষভাবে মোগল সম্রাটদের জন্যই প্রস্তুত হইত। পরবর্ত্তীকালে মুরর্শিদাবাদের নবাবগণ ইহার রক্ষা-কর্ত্তা হইয়াছিলেন। এইরূপে বিভিন্ন নামের মসলিন বিভিন্ন দিক দিয়া বিশেষত্ব লাভ করিয়াছিল।

ইংলন্ডের মহাসভার হাউস-অফ কমন্স-এর আদেশ অনুসারে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Trigonometrical Survey of India' নামক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে 'ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা ও মেঘনা এই নদ নদীত্রয়ের সঙ্গমস্থলে প্রায় ১৯৬০ বর্গ মাইল পরিমিত ভূ-খন্ডের সমুদয় স্থানেই মসলিন প্রস্তুত হইত। ঢাকা, সোনারগাঁও, ডেমরা ও তিতবদ্দি নামক স্থান ভুবন বিখ্যাত মলমল প্রস্তুত হইত, এতদ্ব্যতীত নূরাপাড়া, বালিয়া পাড়া, আবদুল্লাহপুর ও কলাকোপা ইত্যাদি স্থানেও নানা প্রকার বস্ত্রের অনেক অনুষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও ঢাকাই মসলিনের প্রতিপত্তি নষ্ট হয় নাই। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ঢাকা নগরে ৪৫০০০০ টাকার, সোনার গাঁয়ে ৩৫০০০০ টাকার, ডেমরাতে ২৫০০০০ টাকার ও তিতবর্দ্দিতে ১৫০০০০ টাকার মসলিন প্রস্তুত হইয়াছিল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা শহরে ১৫০০, সোনার গাঁয়ে ৭০০, ডেমরাতে ৯০০, তিতবদ্দিতে ৩৫০ এবং মুড়াপাড়া আবদুল্লাপুর ও অন্যান্য স্থানে ৭০০ সর্ব্ব শুদ্ধ ৪১৫০ খানা তাঁত ঢাকা জিলাতে প্রতিষ্ঠিত ছিল।' ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিলাতের শিল্প প্রদর্শনীতে ঢাকাই মসলিনের সঙ্গে ইউরোপীয় মসলিনের তুলনা করা হইলে, ঢাকাই মসলিনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল। এই উপলক্ষে "The Textile Manufacture and Costumes of the people of India" নামক গ্রন্থে মিঃ এফ. ওয়াটসন লিখিয়াছেন, 'With all our machinery and wondrous appliances we have hitherto been unable to produce a fabric which for fineness and utility can eaual the 'woven air' of Dacca.'

যদিও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ ও এশিয়ার অন্যান্য স্থানে মসলিনের যথেষ্ট সমাদর ছিল তথাপি উহার প্রারম্ভকালেই ইউরোপের পথ ইহার জন্য রুদ্ধ হইয়া

www.pathagar.com

আসিতেছিল। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঢাকাতে সর্ব্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করে। সেই কুঠির উপরে বর্ত্তমান কলেজিয়েট স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে। ফরাসীগণ এই দেশে আসিয়াছিল ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু ১৭২৬ অব্দের পূর্ব্বে তাহারা ঢাকাতে বাণিজ্য আরম্ভ করিতে পারে নাই। আহসান মঞ্জিলের সন্নিকটস্থ পুস্করিণীর পারে তাহাদের কুঠি স্থাপিত ছিল। বর্ত্তমান ফরাশগঞ্জ তাহাদেরই প্রতিষ্ঠিত টেভারনিয়ারের ভ্রমণ কাহিনীতে জানা যায়, সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওলন্দাজগণ ঢাকাতে ব্যবসা আরম্ভ করে। বর্ত্তমান মিটফোর্ড হাসপাতালের উত্তর পশ্চিম কোনে তাহাদের কুঠি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ঢাকার বস্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধি, গৌরব, প্রসার ও প্রতিপত্তি ইউরোপীয় বণিককুলের ঈর্ষানল প্রদীপ্ত করিয়াছিল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে স্কটলেন্ডের অন্তর্গত পেইসলী নগরে সর্ব্বপ্রথম ঢাকাই মসলিনের অনুকরণে বস্ত্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা হয়। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে তাহাদের সেই চেষ্টা অনেকটা সফল হইয়াছিল। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের ইংলন্ডে সর্ব্বপ্রথম সূতার কল ব্যবহৃত হয়। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে ল্যাঙ্কাসায়ারে মাত্র এক চল্লিশটি সুতার কল বিদ্যমান ছিল। ঐ বৎসর ঢাকার শুল্কাগার হইতে ৫০০০০০০ টাকার (খরিদ দর) বস্ত্র বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৭৯০ হইতে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ঢাকার অধীনস্থ আরং হইতে ১৩৬,২৬০১৮.৯৬ টাকার বস্ত্র ক্রীত হইয়া পৃথিবীর নানাস্থানে প্রেরিত হইয়াছিল।

১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতেই যাহাতে ভারতীয় বস্ত্র ইংলন্ডে পৌছিতে না পারে ইংরেজগণ আইনের সাহায্যে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ঢাকাই মসলিনের উপর শতকরা পাঁচ টাকা শুল্ক ধার্য্য হইল। ইংলন্ডের কল-কারখানার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিশু শিল্প রক্ষা করিবার জন্য শুল্কের হার আরো বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সার জর্জ্জ বার্ডউড লিখিয়াছেন "১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে নটিংহাম নগরে সূতার কল প্রতিষ্ঠিত হইলে ঢাকা মসলিন শিল্পের অবনতি আরম্ভ হয়, .. ইংলন্ডের শিশু শিল্পের উন্নতিকল্পে এবং শিল্প চাতুর্য্যে ঢাকার তন্তুরায়গণের সমকক্ষতা লাভ করিবার জন্য মসলিনের উপর শতকরা পঁচাত্তর কর সংস্থাপিত হইয়াছিল। এত অধিক পরিমাণ শুল্ক দিতে হওয়ায় ঢাকার বস্ত্র ইংলন্ডে প্রস্তুত বস্ত্রাদির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িল। সুতরাং ঢাকার বস্ত্র শিল্প উত্তোরোত্তর বিলুপ্ত হইতে লাগিল।" "Imperial Gazetteer of India (Eastern Bengal and Assam)" গ্রন্থে লিখিত আছে, 'Dacca Mnslins were introduced in England about 1670, and the trade flourished till the end of the 18th century, as much as 30 or 40 lakhs being expended annually in the purchase of cloths for export to Europe. The Industry could not, however, complete with English piece-goods made by machinery, and in 1807had fallen in value to 8.5 lakhs and by 1813 to 305 lakhs while since 1817, when till commercial Residency was closed the export to Europe may be said to have ceased'. ডা. টেলর তদীয় 'Topography of Dacca'. নামক পুস্তকেও এই একই কথা বিবৃত করিয়াছেন।

এই দিকে তন্তুরায়দিগের অবস্থাও দিন দিন শোচনীয় হইতে চলিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই দেশে আসিয়া দালালের সাহায্যে বাণিজ্য আরম্ভ করিয়াছিল। তন্তুবায়গণ এক বৎসরে

যেই পরিমাণ টাকার মাল সংগ্রহ করিতে পারিবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, তাহাদিগকে উহার চেয়ে অনেক বেশী দাদন দেওয়া হইত। এইরূপ নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া তাহারা প্রতিনিয়ত ঋণগ্রস্ত হইতে লাগিল। উইলিয়ম বোল্ট শিল্পীদের জীবন কাহিনী লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন—'They have been treated also with such injuries that instances have been known of cutting off their thumbs to prevent their being fored to wind silk.'

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ হাসকিসন ভারতীয় বস্ত্র-শুল্ক হ্রাস করিয়া শতকরা দশ টাকায় পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অসাময়িক অনুগ্রহে ঢাকাই বস্ত্র আর উন্নতি লাভ করিতে পারিল না। কারণ তখন বিলাতি সূক্ষ্ম বস্ত্র এই দেশে প্রচুর পরিমাণে বিক্রীত হইতেছিল।

তখনকার বিলাতি ও দেশী সুতার মূল্য তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

কাপড়	ঢাকায় প্রস্তুত	কলে প্রস্তুত
১নং ছোট বুটদার জামদানী	২৫	৮
২নং ঐ	১৬	৫
জামদানী মেহিপস্	২৭–২৮	৬
১নং জঙ্গল খাস	৩৮–৪০	২০–২২
২নং ঐ	২৪–২৫	৯–১০
মলমল	১০–১১	৭–৮
সলিম	২৮–৩০	১০–১৫

ঢাকার বস্ত্র শিল্পকে যদি বল প্রয়োগে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন করা না হইত তাহা হইলে আজও উহা বিশ্বমানবের প্রিয়তম পরিচ্ছদ বলিয়া পরিগণিত হইত। ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা যতীন্দ্রমোহন রায় লিখিয়াছেন—'ঢাকার বস্ত্র শিল্প স্বীয় মহিমায় জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এই সুযোগে জগতের ধনরাশি শতমুখী জহ্নবীর ধারার ন্যায় ভারত সাগরে আসিয়া পতিত হইয়াছিল। ঢাকার শিল্পীকুলকে রাজ-শক্তির বলে, অনুগ্রহ সাহায্যে, আপনাদের পণ্যদ্রব্য জগতের গ্রহণীয় করিতে হয় নাই।' বাস্তবিকই ঢাকার মসলিন বঙ্গের স্বাভাবিক শিল্পরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; সুযোগের অভাবে আজ উহা বিনষ্ট হইয়াছে। এই সকল বিষয় অবলোকন করিয়া 'Topography of Dacca' প্রণেতা মহাপ্রাণ টেলর বড় দুঃখেই লিখিয়াছেন—'From this recapitulation of the more prominent facts connected with the sources of industry in this part of the country, it will be seen that the commercial history of Dacca presents but a melancholy retrospect.'

মসলিন যে শুধু ঢাকা জিলাতেই হইত এমন নহে; ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত সরাইল পরগণাতে 'তঞ্জিব' নামে এক প্রকার মসলিন প্রস্তুত হইত। ইহা ঢাকার 'শবনম' মসলিনের

www.pathagar.com

ন্যায় সুন্দর ও সূক্ষ্ম ছিল। উক্ত জিলার চারপাতা গ্রামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর লাভের একটা প্রকান্ড কারখানা ছিল। উহাতে 'বাপ্তা' নামে এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল এই দুইটি শিল্পই বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে জানা যায়, ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ ও বাজিতপুরে সুন্দর মসলিন প্রস্তুত হইত। উভয় স্থানেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কুঠিও ছিল, এক্ষণে তাহার কোন চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না।

মসলিন ব্যতীত বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই নানা প্রকার শিল্প ও অন্যবিধ বস্ত্র শিল্পের বিস্তার অনুষ্ঠান ছিল। পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদের অধিবাসীগণের প্রধান ব্যবসায় ছিল রেশম শিল্প। তাহারা গুটি পোকা ও তুঁতগাছের চাষ করিয়া স্বহস্তে সিল্কের সুতা ও বস্ত্র প্রস্তুত করিত। পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সিল্কের ব্যবসায় আরম্ভ করিলে চীন ও ফরাসী দেশ হইতে গুটিপোকার বীজ আনিয়া সিল্কের উন্নতি করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। তন্তুবায়দিগকে দাদন দেওয়া হইত ; ইহার ফলে তাহারা স্বাধীন শিল্পের পদ হইতে ক্রমে দিন মজুরের স্থান অধিকার করিয়া বসিল। অপরদিকে বিদেশী প্রতিযোগিতার চাপ ভীষণভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। ফলে রেশম শিল্পও মসলিনের ন্যায় লুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী জার্ম্মানি যুদ্ধ চলিতেছিল ; হয়ত তাহারই অপ্রত্যক্ষ পরিণামস্বরূপ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইহা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছিল। মিঃ ক্রিষ্টফনিস জাপান হইতে গুটি পোকা আনাইয়া রেশম শিল্পের পুনরুদ্ধারের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদ জিলায় ৩৩ খানা রেশমের বানক (Silk filatures) বিদ্যমান ছিল। শুধু ইংরেজদের কুঠি হইতে প্রতি বৎসর ২২৮০০০ পাউণ্ড অনুমান ১৭১০০০০ টাকার রেশমী সুতা ইউরোপে রপ্তানি করা হইত। এতদ্ব্যতীত দেশী শিল্পীগণও প্রচুর পরিমাণে রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া বিদেশে বিক্রয় করিত। উক্ত জিলায় ১৩৭টা গ্রামে অন্যূন ১৯০০ তন্তুবায় মাসিক ৫ টাকা মাহিনায় মজুরী করিয়া কোম্পানী প্রদত্ত সুতা দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিত। কিন্তু তাহাদের জীবন বড় সুখের ছিল না। মুর্শিদাবাদের কালেক্টর বাহাদুর লিখিয়াছেন—"The weavers in particulary are always in debt, and their appearance very squalid and miserable... their life is one of sedentary labour passed infilthy houses... Mirzapur was a flourishing town and its sik weavers were the most numerous class, but now an atmosthere of hopeless decay broods over the whole place.' আজ মুর্শিদাবাদের রাজ শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার শিল্প শক্তিরও অধঃপতন ঘটিয়াছে।

পাবনা জিলার অন্তর্গত মুনসিদপুর গ্রামে রেশমের কুঠি ছিল। তাহার ভগ্নাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। পাবনাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েই অনেকগুলি স্বচ্ছল অবস্থানপন্ন তন্তুবায় ছিল। দোগাছা গ্রামে প্রস্তুত এক জোড়া ধুতি পাঁচ টাকা হইতে পনের টাকা পর্য্যন্ত বিক্রীত হইত। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত জিলার কালেক্টর বাহাদুর লিখিয়াছেন 'তন্তুবায়গণ তাহাদের পৈতৃক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।' বগুড়া জিলাতেও এক সময় রেশম শিল্প উন্নতি লাভ করিয়ছিল। এই স্থানে অ[illegible]

www.pathagar.com

তন্তুবায় বাস করিত। বগুড়া শহরের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে এখনও তাহাদের অতীত জীবনের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। রংপুর জিলায় রয়না গাছের (Castor oil plant) উপর এক প্রকার গুটি পোকা জন্মিত। তদ্দ্বারা ঐ স্থানে মুসলমানগণ এন্ডি সূতা তৈরি করিয়া নিজেদের ব্যবহারের জন্য বস্ত্র প্রস্তুত করিত। রাজশাহীর কার্পাস শিল্প মুসলমান রাজত্বকালে সমগ্র বঙ্গদেশে বিখ্যাত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত প্রায় ২০০০ লোক গৃহশিল্পে লিপ্ত ছিল। বহু শতাব্দী ব্যাপী রাজশাহী জিলার সর্ব্ব প্রধান শিল্প ছিল রেশম। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি সিল্কের কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া রামপুর বোয়ালিয়াতে আরো দুইটি কুঠি সংস্থাপিত হয়। কিন্তু ক্রমে এই শিল্প লুপ্ত হইতে থাকে। পূর্ব্বে প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকার অন্যূন ৪০০০০ পাউন্ড কাঁচা রেশম প্রস্তুত হইত। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ৯৬৬৮৪ পাউন্ড ৮$\frac{১}{২}$ লক্ষ টাকার এবং ১৯০৩–৪ অব্দে ৬৭৭৯ পাউন্ডে আসিয়া পরিণত হয়।

মালদহের শিল্পের ইতিহাস আরো বিচিত্র। গৌড়ের শেষ হিন্দু রাজবংশের রাজত্বকালে মালদহের অধিবাসিগণ গুটি পোকার চাষ করিয়া স্বহস্তে রেশমী সুতা কাটিয়া বস্ত্র প্রস্তুত করিত। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শেখ ভিখ নামক জনৈক ব্যক্তি বিদেশের সহিত মালদহী বস্ত্রের ব্যবসায় করিত। কথিত আছে একবার তাহার দুইখানি নৌকা পণ্য দ্রব্য পরিপূর্ণ হইয়া রুশদেশে যাইবার পথে পারস্য উপসাগরে জলমগ্ন হইয়া যায়।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী মালদহে প্রথম কুঠি নির্ম্মাণ করে। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে একজন ফরাসী ভদ্রলোক বাঙ্গালার রেশম শিল্পের উন্নতি মানসে এই দেশে আগমন করেন। এবং তাহার কিয়ৎকাল পরেই মালদহ শহরে একটা ফরাসী কুঠি স্থাপিত হয়। স্থানীয় ইতিহাসে অবগত হওয়া যায়, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিরিশ বৎসর ব্যাপী মালদহী রেশমী শিল্পের যে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, কখনও আর সেইরূপ হয় নাই। সেই সময়ে মহানন্দা নদীর উভয় তীরস্থ অধিবাসীদের প্রায় সকলেই এই ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল। কিন্তু এই উন্নতি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই।

১৮১০ খৃষ্টাব্দে ডাঃ বুকানন হ্যামিল্টন যখন মালদহ পরিদর্শন করিতে আসেন, তখন তথাকার রেশমী শিল্প প্রায় লুপ্ত হইয়া অসিয়াছে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন চীন ও ভারতীয় বাণিজ্যের একচেটিয়া বন্দোবস্ত প্রত্যাহার করা হয়, তখন কোম্পানীও কুঠি উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কুঠি স্থাপনের দুইশত বৎসর পরে মালদহ জিলায় হয়ত ইউরোপীয় শিল্প যন্ত্রের খাদ্য যোগাইবার অভিপ্রায়েই শুধু কাজ করিবার জন্য ৭টি ইউরোপীয় অনুষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু উহাও অধিকদিন টিকিতে পারে নাই।

মালদহ জিলার কলেক্টর সাহেব রেশমী শিল্পের অবনতির যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ডব্লিউ ডব্লিউ হান্যার প্রণীত 'Statistical Account of Bengal' গ্রন্থেও উহা উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, মুসলিম বিজয়ের পর হইতেই মালদহী বস্ত্রের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ রেশমী বস্ত্র পরিধান করা মুসলমান ধর্ম্ম মতে বিধেয় নহে। কিন্তু

www.pathagar.com

কলেক্টর বাহাদুরের এই উক্তি ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস হয় না। ভারতের বস্ত্র শিল্পের জন্য মুসলমান সম্রাট ও নবাবগণ যত অর্থ ব্যয় ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, ইউরোপীয়ানদের কথা ত দূরে ভারতের প্রাচীন সভ্যতাভিমানী হিন্দুগণও সেইরূপ চেষ্টা করেন নাই। মুসলমানদের মূল ধর্ম্ম গ্রন্থে সিল্কের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। কোনো কোনো ধর্ম্মপ্রাণ মহিষী মিতব্যয়িতার খাতিরে ও যাহাতে বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের অতিরিক্ত চাকচিক্যে আন্তরিক সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতায় ব্যাঘাত না ঘটে সেই অভিপ্রায়ে কেবল প্রার্থনাকালে রেশমী বস্ত্র পরিধান করা অশুভ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। এই ইঙ্গিতের বলে একটা মহা শিল্পের ধ্বংস হইতে পারে না। বিশেষতঃ শেখ ভিখের নাম উল্লেখ করিয়া তিনি নিজের মতকে আরো দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন। মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ইত্যাদি স্থানে বয়ন শিল্পীদের উৎসাহ প্রদান করিয়া কেবল মালদহের বিরুদ্ধে তাহাদের ধর্ম্মজনিত ক্রোধবহ্নি উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যায় না। আর সকল স্থানের সকল শিল্প নষ্ট হইল বিদেশী প্রতিযোগিতার ফলে, কেবল মালদহের বস্ত্র ধ্বংস হইল মুসলমানদের প্রকোপে। মুসলিমের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের এই দুঃখ লগনে জগতের শিল্প সম্ভারের নেতা আর্থিক গরিমায় গৌরবান্বিত মহা শক্তিশালী ইংরেজ রাজ প্রসূত শান্তি সুখ স্নিগ্ধতার মাঝেও ভারতীয় শিল্পের বিলোপ হইল কেন, তাহার কারণ বাংলার অনুসন্ধিৎসু অর্থনৈয়ায়িক কি কেবল সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসা ও ভারতের প্রাচীনতা—প্রযুক্ত আর্থিক অবহেলার উপরের নিক্ষেপ করিবেন?

কাগজ

আজকাল শ্রীরামপুর কাগজের জন্য প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে বাংলাদেশের নানা স্থানে কাগজ কুটির শিল্পের মধ্যে পরিগণিত ছিল। ঢাকা জিলার অন্তর্গত আরিয়ল গ্রামে অতি প্রাচীন কাল হইতে হরিদ্রা বর্ণের এক প্রকার পুরু কাগজ প্রস্তুত হইত। এই স্থানের পাঁচশত ঘর কাগজী কেবল কাগজ প্রস্তুত করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। বর্ত্তমানে তাহার কোন চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না। রংপুর জিলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্প ছিল কাগজ। এই জিলায় কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ভাগরী, পানিয়ালা ঘাট, দূর্গাপুর, বালাকান্দী ও কোর্সী নামক স্থানসমূহে ১৩০টি কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। সেখানে পাট দ্বারা কাগজ তৈরি হইত। প্রতি চারি রিম কাগজ প্রস্তুত করিতে ৭/ আনা খরচ লাগিত। শিল্পীগণও প্রতি মাসে ৫ টাকা হইতে ৮ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারিত। পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীনস্থ কতকগুলি গ্রামে স্বদেশী প্রণালীতে পাট হইতে এক প্রকার কাগজ তৈরি হইত। মিঃ হান্টার লিখিয়াছেন, ইংরেজি কাগজের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জের কাগজ শিল্প টিকিতে পারে নাই। আজকাল বঙ্গদেশের অনেক ভৌগলিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিহার উড়িষ্যা বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে গয়া ও সাহাবাদ জিলায় কাগজের বিরাট ব্যবসায় ছিল। গয়ার অন্তর্গত আরওয়ানের মুসলমানগণ অতি উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত করিয়া ভারতের নানা স্থানে প্রেরণ করিত। হান্টার সাহেব লিখিয়াছেন—'It used to have a wide market before Serampare was ever heard of' বাংলার বাহিরে যাইয়াও আরিয়লের শিল্প বাঁচিতে পারে নাই।

www.pathagar.com

রঞ্জন শিল্প

পূর্ব্বে কুসুমফুল ও নীলের চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গদেশে রঞ্জনশিল্প বিস্তর প্রতিপত্তি লাভ করিয়ছিল। ঢাকার তন্তুবায়গণ লাল, নীল, বাসন্তী, হরিদ্রা, সবুজ ও কাল রং দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিত। অনুন্নত প্রণালীতে প্রস্তুত কুসুম ফুলের রং বিদেশের বৈজ্ঞনিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রস্তুত রং-এর সম্মুখে টিকিতে পারে নাই।

নীলের ইতিহাস অতীব হৃদয়-বিদারক। এইশিল্প অধিকাংশ স্থলেই ইউরোপিয়ানদের একচেটিয়া ছিল। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা জিলায় মিঃ জে. পি. ওয়াইজ কর্তৃক ৪টা নীলকুঠি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এই জিলায় ইউরোপীয় পর্য্যবেক্ষণের অধীনে শ্রীমদ্দি, দুলালপুর, ব্রাহ্মণচর, মাছেমপুর, ভাঙ্গার চর ও আকা নগর প্রভৃতি স্থানে ছয়টি নীলকুঠি নির্ম্মিত হয়। নীলকুঠির কর্ম্মচারিগণ সামান্য কিছু দাদন প্রদান করিয়া তন্নিকটস্থ কৃষক ও মজুরদের নিকট হইতে অত্যধিক পরিমাণে কাজ আদায় করিয়া লইত। কোন বিশেষ কারণে কর্ম্ম ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে না পারিলে, অথবা দাদনের টাকা ফেরত দিতে চাহিলে, নিঃসহায় গ্রামবাসীদিগের উপর ভীষণ অত্যাচার উৎপীড়ন করা হইত। অবশেষে চাষীদের 'সঞ্চিত ব্যথা' বিদ্রোহের ভিতর দিয়া প্রকটিত হইয়া পড়িল। কথিত আছে—কোন স্থানীয় জমিদার প্রজাদের দুঃখ কাহিনী শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন ; এবং তাঁহারই উপদেশ মতো এক রাত্রে একই সময়ে সবগুলি কুঠি লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে মালদহ জিলায় ২০টা নীলকুঠি ছিল। সেই বৎসর মালদহে প্রায় চার হাজার মন নীল উৎপন্ন হয়। বাংলার অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই জেলায় অধিকাংশ নীলের অনুষ্ঠান বিদেশী মূলধনে পরিপুষ্ট হইলেও, এইখানে কতকগুলি দেশী কারখানা ছিল যাহাতে দেশের টাকাতেই কারবার চলিত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পাবনা জিলার সর্ব্বত্রই নীলকুঠি বিদ্যমান ছিল। ঐ সকলও ইউরোপীয় মূলধনে পরিচালিত হইত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাবনার নীল শিল্প ধ্বংস মুখে পতিত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত মুর্শিদাবাদের রেভিনিউ সার্ভেয়ারের রিপোর্ট হইতে অবগত হওয়া যায় যে, এই জিলায় বারোটা বিভিন্ন অনুষ্ঠান হইতে প্রায় সাত লক্ষ টাকার নীল উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৮৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে বিপ্লব আরম্ভ হইলে মুর্শিদাবাদের নীল শিল্প বিনষ্ট হইয়া যায়। এই বিপ্লবের সময় অধিবাসীদের দুঃখের সীমা ছিল না। Revenue Surveyor লিখিয়াছেন—"Murshidabad witnessed the serious case of loss of life which took place during the troubled times, in an attack upon a factory."

পরাধীন জাতি বলিয়া বাঙ্গালী রঞ্জন শিল্পের মূল্য অনেকটা বুঝিতে পারে না। বিগত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মানী রং বন্ধ করিয়া দিলে মিত্র শক্তিকে যে কী ভীষণ বিপদে পড়িতে হইয়াছিল তাহা অনেকেই অবগত আছেন। অবাধ বাণিজ্য পন্থী গ্রেট ব্রিটেনও রঞ্জন শিল্পের উন্নতিকল্পে বিদেশী রং-এর উপর সংরক্ষণী শুল্ক সংস্থাপন করিয়াছে। বঙ্গদেশে যাহা ছিল তাহা নাই। অন্য দেশে যাহা ছিল না তাহা হইতেছে।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বাংলার বিবিধ শিল্পের সামান্য আভাস দেওয়াও অসম্ভব। পূর্ব্বে বাঙ্গালী কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী ছিল না। লৌহ, লবণ, চিনি, বাসনপত্র ইত্যাদি

www.pathagar.com

সকল বস্তুই নিজের দেশে পাইত। ঢাকাতে যখন মুসলমান রাজধানী ছিল তখন ভাওয়াল পরগণার অন্তর্গত লোহাইদ, মির্জ্জাপুর, কীর্ত্তনীয়া প্রভৃতি স্থান লৌহের কারখানা ছিল। ঐ লৌহ দ্বারা যুদ্ধের যন্ত্রাদি প্রস্তুত হইত। ঐ সমস্ত স্থানে খনন করিলে এখনও নানা প্রকার যন্ত্রাদির ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। ঐ স্থানে লৌহের খনি ছিল বলিয়া আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

সূচী কর্ম্মের জন্য বোগদাদ নগরী চির প্রসিদ্ধ। বোগদাদ হইতে মুসলমানগণ সর্ব্বপ্রথম সীবন শিল্প ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম ভারতবর্ষ হইতে ইংলন্ডে সূচী প্রচারিত হয়। এই সূচী কর্ম্ম ঢাকাতেই প্রথম আরম্ভ হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত পাগলা নদী তীরস্থ বেলিয়া নারায়ণপুরে লৌহের বাজার ছিল। ঐ স্থানে লৌহ প্রস্তুত করিবার জন্য বাষট্টি খানা উনুন (furnace) দিবারাত্রি প্রজ্জ্বলিত থাকিত।

দেশীয় প্রণালীতে লবণ প্রস্তুত করিয়া বঙ্গের অধিবাসীগণ নিজেদের অভাব পূরণ করিত। নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জিলায় পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত হইত। অনেক দিন হইল লিভার পুলের লবণ আসিয়া এই সকল বিনষ্ট করিয়াছে। চট্টগ্রামে—

১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে লিভারপুল হইতে ১২৪৩ টন

১৮৭০-৭১ খৃষ্টাব্দে লিভারপুল হইতে ৩২৫৫ টন

১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে লিভারপুল হইতে ৭৭৫২ টন

লবণ আমদানী হইয়াছিল। এই উভয় স্থানের লবণ প্রস্তুতকারীগণ এক্ষণে কৃষিকর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। পূর্ব্বে বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও বাংলার অন্যান্য স্থানে ইক্ষু ও খেজুরের চাষ হইত এবং তদ্বারা গুড়, চিনি ইত্যাদি প্রস্তুত হইত। ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ এই তিনটি জিলা বাসনের জন্য বিখ্যাত ছিল। ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, রংপুর প্রভৃতি স্থানে প্রস্তুত কাস্য দ্রব্য ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে তাহার অনেকগুলি বিনষ্ট হইয়াছে এবং দুই একটি মাত্র শিল্প স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া অর্ধমৃত অবস্থায় প্রাচীনতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

বাংলার শিল্প ইতিহাসের সঙ্গে বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে স্বভাবতই প্রশ্ন হয়, আর্থিক নিপীড়নে বঙ্গদেশ উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই যেই স্থান অধিকার করিয়াছে এই কি তার চরম অবস্থা, না কুটির ও অন্যান্য শিল্পের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা আছে? ভারতের প্রাচীন সভ্যতা শুধু ভারতবাসীর নৈতিক উন্নতি ও শাস্ত্রজ্ঞানের মধ্যেই পর্য্যবসিত হয় নাই; আর্থিক জীবনও তাহাদের সুন্দর মধুর ছিল।

মাঝখানে একটা অনৈসর্গিক বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে মাত্র। আজকালও বঙ্গদেশে প্রচুর পরিমাণে কাঁচমাল ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে; মজুরেরও অভাব নাই; মূলধনও ভূগর্ভে লুক্কায়িত নহে; সমবায় ঋণদান সমিতি গৃহ শিল্পের সহায়তা করিতে সতত তৎপর, বিদেশী মূলধনও এই দেশে নিয়োজিত হইতে প্রতিনিয়ত উৎকণ্ঠিত। অভাব আছে কেবল একটা শক্তির, যাহার নাম সমবেত চেষ্টা বা organisation. এই সকল শক্তির একত্র সমাবেশে বাংলার লুপ্ত শিল্প উদ্ধার করা যাইতে পারে।

যেই দেশ শুধু কৃষির উপর নির্ভর করে সেইদেশ কখনও আর্থিক সমস্যার সুমীমাংসা হয় না সেই দেশের জাতীয় জীবনে কোনো অধিকার নাই, কারণ সেই দেশ অভিশপ্ত, লাঞ্ছিত, পদদলিত, জগতের নিকট ঘৃণ্য ও হেয়। দেশের বেকার সমস্যার সমাধান করিতে হইলে,

www.pathagar.com

পরমুখাপেক্ষী না হইয়া দেশ মাতৃকার লজ্জা নিবারণ করিতে হইলে আত্মস্বার্থ ও জাতীয়ভাবে প্রমুগ্ধ ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্য দ্রব্যে পরিতৃপ্ত না হইয়া 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথা তুলে' নিতে হইলে, আত্ম সম্মান জ্ঞান থাকিলে, বর্ত্তমান যুগের হীন, সাম্প্রদায়িকতার বাহিরে আসিয়া জাতি ভেদ নির্ব্বিশেষে সকল বাঙ্গালীকে সমভাবে দেশে কর্ম্মক্ষেত্রের সৃষ্টি করিতে হইবে।

বাংলার শিল্পাকাশ এইক্ষণে কালমেঘে আবৃত ; সেই মেঘের আড়ালে দুই একটি অনুষ্ঠান মাত্র দূরান্তের ও বাণিজ্যের বিশিষ্ট সমাবেশে দেশের ভাগ্যলক্ষ্মী ফিরাইয়া আনিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক আলোকে সকল অন্ধকার বিদূরিত করিয়া তবে সকলে মিলিয়া বঙ্গমাতার মঙ্গলাভিষেকের পূর্ণায়োজন করিতে হইবে।

www.pathagar.com

বাংলার পীর পূজা

সৈয়দ আবদুল ওয়াহেদ

বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে ইসলামের সবচেয়ে বড় দান তার তৌহীদ। বহু পরাজয় ও ব্যর্থতার মধ্যেও শুধু এই মহা সত্যের বলেই সে মানব সমাজে এত বড় গৌরবের আসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমান জগতে যাঁহারা খোদার অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই আছেন যিনি সাক্ষাতে বা পরোক্ষে এই একেশ্বরবাদের পূজারী নন। খৃষ্টান ও বৌদ্ধদের ত্রিত্ববাদের মূলেও আজ একত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হইতেছে। কোটি কোটি দেবতা পূজা ছাড়িয়া মানুষ আজ ঐ দেবতাগণের সৃষ্টি কর্ত্তাকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। মানবের চিন্তাধারার এই যে ক্রমবিকাশ তাহার মূলে রহিয়াছে ইসলামের সেই তৌহীদ। মহাপুরুষের জীবনে এই সত্য এমনই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে উত্তর কালে যাহাতে তাঁহার অনুবর্গিগণ কোনও রূপ বিপথগামী না হন বা পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ না করেন সেই জন্য মৃত্যুর প্রাক্কালে দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন 'Raise no stone on my bones for these they may, worship the bones instead of the Creator of the stone.' আমরা মুসলমান, মুখে আজ তৌহীদের বাণী বেশ পড়িতেছি, আমরা এক আল্লাহর উপাসক বলিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের কটাক্ষ করিতেও ত্রুটি করি না, কিন্তু কার্য্যতঃ মুখের কথার কতটুকু অনুসরণ করিতেছি বক্ষমান প্রবন্ধে তাহারই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

এই স্থানে আরবের প্রাথমিক ইসলামের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। আরবের যে ইসলাম তাহাতে বাহ্যাড়ম্বর নাই, আলখ্য, হিংসা, দ্বেষ, স্বেচ্ছাচারিতা ও বৈরাগ্য নাই—তাহাতে আছে কঠোর সাধনা, ঐকান্তিক জ্ঞানস্পৃহা ও কর্ম্ম-প্রিয়তা, অনাড়ম্বর জীবন, পরামতসহিষ্ণুতা, গণতন্ত্র শাসন প্রণালী। মহাপুরুষ গরীব অবস্থায় যে সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিয়াছেন শেষ জীবনে সমগ্র জজিরাতুল আরবের একমাত্র প্রভুও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও বিলাসে গা ভাসাইয়া দেন নাই, বরং পূর্ব্বের চাইতেও সংযমী দীনহীন সামান্য নাগরিকের বেশে চলিয়াছেন এ বিষয়ে সমস্ত ঐতিহাসিকই একমত। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় স্থলবর্তী খলিফা হজরত আবু বরক, ওসমান, ওমর ও আলীর জীবনে ইসলামের এই স্বরূপ শুধু অক্ষুণ্ণ ছিল না, বরং আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। হজরত আবু বকরের সত্যপ্রিয়তা ও গণতান্ত্রিকতা, ওমরের তেজস্বিতা, ওসমানের ধর্ম্ম প্রাণতা ও আলীর জ্ঞানও বীরত্ব মুসলমানদের বাস্তবিকই গৌরবের সামগী। কিন্তু হজরত আলীর মৃত্যুর পরে আমরা দেখিতে পাই মুসলিম ইতিহাসে স্বেচ্ছাচারী বিলাসী ও পাপাসক্ত এজিদের আবির্ভাব হইয়াছে। তারপর পারস্য বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তথাকার প্রভূত অর্থ ও অপরিমিত ঐশ্বর্য্য মুসলমান খলিফাগণকে নিতান্ত অলস কর্ম্মবিমুখ বিলাস ও স্বেচ্ছাচারী করিয়া তুলে। সুতরাং মুসলমান তাহার Plain living and high thinking এর আদর্শ হইতে সরিয়া ক্রমে বিলাসী ও অলস হইয়া পড়ে। ফলে সুফী আন্দোলনের সৃষ্টি

www.pathagar.com

হয়। একদল শিক্ষিত পারসী মুসলমান এই আন্দোলনের নেতা। ইসলামের মূলনীতির সহিত তাঁহাদের কোনো বিরোধ ছিল না। তাঁহারা কেবল ইসলামের সরল সাধারণ সূত্রগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন মাত্র। ইসলামের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দিক দিয়া সুফী ঋষিদিগের জ্ঞান, সাধনা ও তপস্যা এক অমূল্য সম্পদ। তাঁহাদের তপোনিষ্ঠা, ত্যাগ ভক্তি, প্রেম ও আধ্যাত্মিকতা অসামান্য ও অলৌকিক ছিল। তাঁহাদের মূল মন্ত্র ছিল প্রকৃত জ্ঞান, প্রেম ও সত্যদীপ্তি। কিন্তু সামাজিক দিক দিয়া তাঁহাদের কাহারও হজরতের আদর্শ হইতে একটু বিচ্যুতি ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। হাফেজ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান কাব্যে লিখিয়াছেন—বা, মায়সুজ্জাদা রঙ্গিন কুন গারৎ পীরে, মর্গা গুয়াদ, কে সালেক বেখবর না বুয়াদ যে রাহ রেসমে মনজিল হা।

অর্থাৎ যদি পীরে বলিয়া থাকেন তাহা হইলে তুমি তোমার জায়নামাজ সরাব দিয়া রঙ্গিন করিয়া নও–কারণ পীরই তোমার পথের খবর জানেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ইসলামের মূল নীতির সঙ্গে সুফীদের কোন বিরোধ ছিল না। কিন্তু তাঁহাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা এতগুলি সূক্ষ্ম তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে সাধারণ জ্ঞানের মানুষ তাহা ধারণা করিতে পারে না। সুতরাং এই মতবাদে মুক্তি লাভ করিতে হইলে একজন পীর বা জ্ঞানী লোকের সাহায্য অত্যাবশ্যক। এই রূপেই আমাদের পীর সম্প্রদায়ের প্রথম সৃষ্টি হয়।

এদেশে যে ইসলাম আসিয়াছিল, তাহা বিন কাসিম বা তৎপরবর্ত্তী আরব ব্যবসায়িগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হয় নাই। তারপর স্থলপথাগত পাঠান ও মোগল সম্রাটগণ কর্ত্তৃক অথবা কোন organised missionery–র সাহায্যেও এদেশে ইসলাম প্রচারিত হয় নাই। শুধু কতগুলি সাধক ও আউলিয়ার ঐকান্তিক চেষ্টা ও তাঁহাদের নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ও অসামান্য গুণাবলীর প্রভাবেই এদেশে ইসলাম এমনভাবে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বাংলাদেশে যে সব মহাপুরুষ আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে শাহজালাল, শাহজামাল ও শাহমস্তানের নামই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শাহজালালের সঙ্গে ৩৬০ জন ও তৎপরে আরও ১২ জন আউলিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা একত্রে সারা বাঙ্গালায় বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব বাংলার বহু অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।

এই সব আউলিয়াদের নিকট যাহারা ইসলামে দীক্ষালাভ করিয়াছিল, তাহাদের অধিক সংখ্যকই ছিল বৌদ্ধ সহজিয়া মতাবলম্বী। অসজিয়াদের মূলমন্ত্র ছিল তিনটি। গুরুর উপদেশ গ্রহণ করা, সেই উপদেশ মত পঞ্চকামের উপভোগ করা, ও সেই উপভোগে যে সহজানন্দলাভ তাহাতেই বোধিপ্রাপ্তি বা নির্ব্বাণ লাভ করা। এই গুরুবাদ অর্থাৎ গুরু ভিন্ন শিষ্যের কোন গত্যন্তর নাই, তখনকার সহজিয়াদের মনে বড় প্রবল ছিল, মুসলমান হইবার পরও তাহাদের মনে ঐ গুরুবাদের ছাপ থাকা মোটে আশ্চর্য্যজনক নয় বরং স্বাভাবিক। কাজেই তখনকার মুসলমান কোনো মতেই খাঁটি মুসলমান হয় নাই। সে শুধু মুখে তৌহিদের উপাসক হইলেও কার্য্যতঃ গুরু বা পীর পূজা এবম্বিধ পৌত্তলিকতায়ই মগ্ন ছিল। এই দীক্ষিত মুসলমানদে মধ্যে আবার অনেকেই অন্যান্য হিন্দু ও বৌদ্ধ সহজিয়াদিগকে ইসলামে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাহার ফলে এদেশে পীর পূজা কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছিল।

www.pathagar.com

অপরদিকে এ দেশের হিন্দু সম্প্রদায় হইতে যাহারা মুসলমান হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণবের সংখ্যাই ছিল বেশী। কারণ বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে প্রেম ও ভক্তি মন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ দেশের মুসলমান সাধকদের জীবনে সে প্রেম ও ভক্তি মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। মহাপ্রভু চৈতন্যের তিরোধানের পর বৈষ্ণবগণ উক্ত সাধকের তপোনিষ্ঠা ও নির্ম্মল চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া দলে দলে ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু বৈষ্ণবদের মনেও গুরু আতঙ্কবাদ বা পীর পূজা অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাহাদের মতে 'When God is angry, Guru will protect us but when Guru is angry there is no one to protect us' ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান করা যায় যে, এই সম্প্রদায় হইতে দীক্ষিত মুসলমান পীর পূজার দৌরাত্ম্য হইতে পরিত্রাণ লাভ করে নাই। তাহা ছাড়া সাধারণ মানুষ সব দেশে সব কালেই পৌত্তলিক। অজ্ঞতার দরুণ সে নিরাকার সত্যকে প্রাণের মধ্যে খুব আঁকড়িয়া ধরিতে পারে না, আর পারিলেও তাহা বেশী দিন স্থায়ী হয় না। এদেশে তৌহিদ জন সাধারণের মুখেই রহিয়াছে তাহাদের অন্তরের ধন হইতে পারে নাই। তাহারা পীর পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে দরগাহ পূজা, কবর পূজা, কালী পূজা, রোগের দেব-দেবী ওলাবিবি পূজা ও শীতলা দেবী পূজা, অর্থাৎ যে তিমির সেই তিমিরেই যাইয়া পড়িয়ছিল। Gait সাহেব তাঁহার ১৯১১ খৃষ্টাব্দের Census Report-এ পূর্ণিয়ার Settlement Report হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন যে "Attached to almost every house is a little shrine called khudaighar or God's house where prayers are offered indifferently to allah or kali' —বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের যখন ঐ অবস্থা যখন—সে না হিন্দু না মুসলমান, তখন ওহাবী আন্দোলনের স্রোত আসিয়া তাহাকে খাঁটি মুসলমান করিতে চেষ্টা করিল।

মহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব দেশে নেজ্‌দ্ শহরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎকালীন ইসলামে যে সমস্ত কুসংস্কার কুনীতি প্রবেশ করিয়াছিল সে সমস্ত বিদূরিত করিয়া উহাতে পূজার সরল পবিত্রতা ফিরাইয়া আনাই উক্ত আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাহার মতে প্রত্যেক মুসলমানই স্ব স্ব যুক্তি ও চিন্তাশক্তি দ্বারা কোরানকে বুঝিবার অধিকারী কাজেই চারি ইমানের বিশিষ্ট দাবী তিনি অগ্রাহ্য করিলেন, ও পীর পূজা, দরগাহ পূজা ও অন্যান্য সকল প্রকার কুসংস্কার ও অমুসলমানত্ব হইতে মুসলমানদিগকে মুক্ত হইতে আদেশ করিলেন।

ভারতবর্ষে সর্ব্ব প্রথম ওহাবী মতে দীক্ষিত হন রায় বেরিলির সুপ্রসিদ্ধ সৈয়দ আহমদ খান সাহেব। কিন্তু বাংলাদেশে খাঁটি শরিয়ত প্রচার করিয়ছিলেন উক্ত আহমদ সাহেবের শিষ্য জৌনপুর নিবাসী মৌলানা কেরামত আলী সাহেব ও ফরিদপুর নিবাসী হাজী শরিয়ত উল্লা ও তদীয় পুত্র দুদু মিঞা সাহেব। শরিয়ত উল্লা সাহেব ১৮২০ খৃষ্টাব্দে হজ করিতে যান ও তথায় ওহাবী মতে দীক্ষা লাভ করেন। দেশে আসিয়া তিনি সর্ব্ব প্রথমে মুসলমানদিগকে হিন্দুর আচার ব্যবহার অনুকরণ, তাহাদের ধর্ম্ম কর্ম্মে যোগদান, মহরম উপলক্ষে তাজিয়া নির্ম্মাণ, পীর পূজা ও পয়গম্বর পূজা করিতে নিষেধ করেন। তিনি আরও বলেন ভারতবর্ষ দারুল হারব। সুতরাং এখানে জুম্মার নামাজ পড়ার দরকার নাই। তাঁহার মতাবলম্বীগণ আজও জুম্মার নামাজ পড়েন না এবং অনেকেই শুধু মক্কা শরীফ হইতে হজ করিয়া ফিরিয়া আসেন, মদিনায় যান না। তিনি অনেক শিষ্য করিয়াছিলেন। ঢাকা ও ফরিদপুরেই তাঁহার

www.pathagar.com

শিষ্য সংখ্যা বেশী ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সুযোগ্য পুত্র দুদু মিঞা সাহেব ঢাকা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, নোয়াখালী, পাবনা প্রভৃতি জিলার কৃষক ও শিল্পী মজুরদের উপর খুব প্রভাব বিস্তার করেন। লোকদিগকে স্বীয় মতে আস্থাবান রাখিবার জন্য তিনি স্থানে স্থানে এজেন্ট বা প্রচারক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সকল মুসলমানকে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তিনি সমাজে অনেক সদনুষ্ঠানে হাত দিয়াছিলেন। কিন্তু জমিদারদের কুচক্রে গভর্ণমেন্টের বিষ নয়নে পড়াতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। ওদিকে মৌলানা কেরামত আলী সাহেব একটা মধ্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। আজ যে বাংলাদেশে পীরদের এত দৌরাত্ম্য, তাহার জন্য হয়ত তিনিই অনেকখানি দায়ী। তিনি ইমামদের দাবী একেবারে অগ্যাহ্য করিলেন না। তাঁহার মতে ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ দারুল হারব নয়। কাজেই জুম্মার নামাজ পড়া উচিৎ। হিন্দুর আচার ব্যবহার অনুকরণ ও কুসংস্কার বর্জ্জন সম্বন্ধে তিনি দুদু মিঞা সাহেবের সঙ্গে এক মতই ছিলেন। কিন্তু তিনি পীরদিগকে সম্মান করিতেন এমন কি পীরদের কবরে প্রার্থনা ও দান খয়রাত করিতেও আদেশ করিলেন, যেহেতু তাঁহার মতে পীর মুরিদের জন্য আল্লাহর নিকট মধ্যস্থতা অর্থাৎ advocacy করিতে পারেন। তিনি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রাণ ত্যাগ করেন। তদীয় পুত্র হাফিজ মহম্মদ সাহেব পিতার বাণী সমস্ত পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে প্রচার করেন। ফলে মুসলমান ছোট খাটো কুসংস্কারের হাত হইতে অনেকটা নিজেকে মুক্ত করিয়া লইলেও পীরদের নাগপাশ ছিন্ন করিতে পারিল না। যে ওহাবী আন্দোলনের বন্যা পীর পূজা ধ্বংস করিতেই আসিয়াছিল, উহা বাংলায় শুধু সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াই গেল না, অধিকন্তু পীর পূজার ভিত্তি আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলিল। পীরত্ব বাঙ্গালী মুসলমানদের জীবনে তখন এক অভিনব রূপ প্রাপ্ত হইল। সে তৌহিদকে যেমন মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, তেমনি পীর যে তাহার একমাত্র পরকালের সহায় ইহাও ততটুকু প্রাণ দিয়াই বিশ্বাস করে। এ ধারা আজ তাহার জীবনে একান্তই বদ্ধমূল যে জীবনের কোন না কোন সময় পীর না ধরিয়া পরকালে তাহার মুক্তি নাই। বৈষ্ণবদের গুরুবাদের মত 'When the guru is angry there is none to protect us' সে আরও বিশ্বাস করে, পীর ভালই হউক আর মন্দই হউক একবার ধরিলে আর ছাড়া যায় না।

বাংলার বর্ত্তমান পীর সম্প্রদায়কে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা :

১. দুদু মিঞা সাহেবর মতাবলম্বী যাহাদিগকে আহলে হাদিস মোহাম্মদী বলে।
২. মৌলানা কেরামত আলী সাহেবের মতাবলম্বী তাঁহাদিগকে 'ফারায়েজী' বলে।
৩. উক্ত দুই দলই শরিয়ত পন্থী অর্থাৎ শরিয়ত মানেন। তাছাড়া আর এক দল 'মারফতী' পীর আছেন, তাঁহারা শরিয়তের কোন ধার ধারেন না।

এতদ্ভিন্ন আরো অনেক প্রকার পীর আছেন, যাঁহারা মারফতী নন শরিয়তীও নন—এই দুই এরই সংমিশ্রণ যথা—চট্টগ্রামের মাইজ ভাণ্ডারী, ত্রিপুরার লেংটা ফকির ও ময়মনসিংহের পাগলা শক্তি। ইহাদেরর প্রত্যেকের সাধন প্রণালী, আচার পদ্ধতি বিভিন্ন। কেহ বা খৎনা করাণ না, ছাতা মাথায় দেন না ও জুতা পায় দেন না, যেমন ময়মনসিংহের পাগলা শক্তি। কেহ বা নাচ গান দুইই সমর্থন করেন, যেমন মাইজ ভাণ্ডারী। কেহ বা শুধু গান, নাচেন না—কেহ বা নাচেন কিন্তু গান না।

www.pathagar.com

মুরিদ বা শিষ্য করিবার প্রণালী—সাধারণত পুরুষ হইলে পীর সাহেবের হাতে ধরিয়াই মুরিদ হয়, মেয়েলোক হইলে পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া পীরের হাত হইতে লম্বা করিয়া টানা একখানা চাদর, বা পীরের পাগড়ীর কোণ ধরিয়া মুরিদ হয়। মুরিদ হওয়া আর কিছুই নহে, পীরের শিজ্‌রাতে বিশ্বাস করা, অর্থাৎ পীর সাহেব যদি বংশানুযায়ী পীর হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার পিতা, পিতামহ কেমন করিয়া হজরত আলী হইতে বংশপরম্পরায় পীর হইতে হইতে ঐ পর্য্যন্ত আসিয়াছেন মুরিদকে ধীরে ধীরে বলিয়া যান, আর যদি বংশানুযায়ী পীর না হন তাহা হইলে তাঁহার পীর ও পীরের পীরগণ কেমন করিয়া হজরত আলী হইতে ক্রমান্বয়ে বড় পীর দাস্তগীর হজরত আবদুল কাদির জিলানী মরহুম সাহেবের মধ্য দিয়া আসিয়াছেন, আস্তে আস্তে বলিয়া যান ; মুরিদ তোতা পাখীর মত পীরের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া যায়। সে যে কি জিনিষ বিশ্বাস করিল তাহা সে নিশ্চয়ই জানে না, কারণ উর্দ্দু তাহার বোধগম্য নহে। সে মাত্র এইটুকু বঝিল যে ঐ পীর সাহেব সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহার পরকালের একমাত্র সম্বল। কোন কোন পীরের শিজ্‌রা তাহার মুরিদের জীবনের অভেদ্য কবচ। প্রত্যহ ঐ শিজ্‌রা পাঠ করিবার এবং চুমা ও তাজিম করিবার জন্য মুরিদের উপর কড়া হুকুম থাকে। এমন কি মৃত্যুর পর ঐ শিজ্‌রা শরীফ মৃত্য মুরিদের বুকের উপর দিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে, যেহেতু এই শিজ্‌রার বরকতে নাকি পরকালের অনেক পাপ ও গোর আজাব মাপ হইয়া যাইবে।

আজকাল এই মুরিদ করিবার কালীন কোন কোন পীরের অঙ্গভঙ্গী, আহজারী ও ভণ্ডামি এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। সাধারণ লোকের মনাকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহারা যে কত প্রকার অলৌকিকত্বের ভান করেন তাহা প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা ব্যতীরেকে অন্যের ধারণাতীত। সাধারণত পীর সাহেব মেয়ে লোক মুরিদকে দেখিতে পান না, কারণ পর্দ্দার আড়ালে বসিয়াই তাহাকে মুরিদ করা হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন স্থানে মুরিদ হইবার পর মুহূর্ত্তেই পর্দ্দা সরাইয়া দেওয়া হয়, তখন পীর সাহেব চক্ষু বজিয়া থাকেন, মেয়েলোক মুরিদ তখন খুব ভাল করিয়া তাহার পীরের মুখখানা একবার দেখিয়া লয়, যেন রোজ হাসরের দিন বিপুল জনসমূহ হইতে সে তাহার পীরকে বাছিয়া লইতে পারে। এই সুযোগ যে জীবনে কেবল একবার আসে তাহা নয়। যদি শিষ্যা কতকদিন পর পীরের চেহারাখানি ভাল করিয়া স্মরণ করিতে না পারে, তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় ঐরূপ সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনেকেই মনে করিবেন, আমি এক আজগবী গল্পের অবতারণা করিয়াছি। কিন্তু এ এক নিছক সত্য। সে পীর এই ঢাকার বুকেই বেশ সম্মানের সহিত বিরাজ করিতেছেন।

ব্যবসাদার পীর

বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া এই দেশে একদল ব্যবসায়ী পীরের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইতেছে যে ইতিমধ্যেই সমস্ত বাংলাদেশে তাহাদের মুরিদ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এই সমস্ত পীর কুসীদজীবির মত নিতান্ত নির্ম্মমভাবে নানা উপায়ে মুরিদ হইতে টাকা আদায় করিতে থাকে। আজ বড় পীর সাহেবের এগারই শরিফ, কাল হজরত মঈনদ্দিন চিশতীর ওরছ, পরশু দাদা পীরের ওরছ ইত্যাদি বহু উপায়ে সরল কৃষক হইতে টাকা আদায় করিয়া নিজেদেরই উদর পূর্ত্তি করিতেছে। বাস্তবিক ব্যবসা হিসাবে এমন আয়ের অথচ বিনা পুঁজিতে ব্যবসা নিশ্চয়ই আর নাই। তাই কাহাকেও

www.pathagar.com

ডেপুটিগিরি চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া এই ব্যবসা অবলম্বন করিতে দেখা গিয়াছে। আজকাল মরহুম কেরামত আলী সাহেবের বংশধরগণও এই ব্যবসাই আরম্ভ করিয়াছে। আপনাদের অবগতির জন্য তাহার ওয়ারিশাণের নামে মুদ্রিত হজরতের জুতার নকশা বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া শুনাইতেছি :

বিছমিল্লাহের রাহমানের রাহিম
লাওলা কালামা খালাফতুল আফলাক

এই যে নকশা শরিফ দেখিতেছেন ইহা আমাদের নবি দু'জাহানের বাদশা সফিউল মুজনেবিন, রাহমাতুল্লিল আলামিন যাহার উছিলায় চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ, পৃথিবী, বেহেস্ত, দুজখ, পাহাড়, পর্ব্বত, জেন, ফেরেস্তা, দানব, মানব, বৃক্ষ, লতা, সাগর, সলিল, অনিল, সুখ, দুঃখ, ইত্যাদি দয়ালু আল্লাহতালা পয়দা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পবিত্র কদম শরিফের জুতার নকশা। উক্ত নকশা শরিফ প্রত্যেক মোসলমানের দেখা মাত্রই আসেকের সহিত তাজিম করা কর্ত্তব্য। এই নকশা শরিফকে তাজিম করিলে ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানে খোদার রহমত প্রাপ্ত ও দুনিয়াতে নানা প্রকার উপকার পাইবেন। যাঁহারা এই নকশা শরিফকে তাজিম করিবেন দরূদ শরিফের ছওয়াব প্রাপ্ত হইবেন ও ছোট, বড় গুনা আল্লাহতালা মাফ করিয়া দিবেন এবং এই নকশা শরিফকে যাঁহারা যত্নের সহিত সদা সর্ব্বদা ঘরে রাখিয়া ফজরে ও মাগরিবে চক্ষুতে ও মুখে বুছাদিয়া তাজিম করিবেন ও দয়ালু নবির কদম শরিফের জুতা বলিয়া তাহার উপর আসেক হইবেন তাঁহারা নিশ্চয়ই নবি আলাইহেচ্ছালামকে স্বপ্নে জিয়ারত পাইবেন। এবং এই নকশা শরিফ যাঁহারা ঘরে কিম্বা দোকানে লটকাইয়া রাখিবেন সেই ঘরে শয়তান প্রবেশ করিতে পারিবে না ও কলেরা বসন্ত যত রকম গজবযুক্ত রোগ আছে এবং দুনিয়ার সমস্ত বালা মুছিবত হইতে আমানে থাকিবেন ও দোকানে বেচা বিক্রি খোদার ফজলে বেশী হইবে ও রুজিতে বরকত হইবে এবং যাঁহারা কবচ করিয়া হাতে রাখিবেন জালেমের জুলুম হইতে শয়তানের ফেরেব হইতে, ভূত, পেতনী, দেও পরীর নজর হইতে ও নানা প্রকার বিষ বেদনা, বসন্ত, কলেরা রোগের নজর হইতে আল্লাহতালা বাচাইয়া রাখিবেন, এবং সন্তান প্রসবকারিণীর বেদনা উপস্থিত হইলে উক্ত নকশা শরিফ রোগীর পেটের উপর রাখিয়া ইহার উছিলায় আল্লাহতালার নিকট দোয়া চাহিলে তৎক্ষণাৎ বেদনা ক্ষান্ত হইবে ও সন্তান প্রসব হইয়া যাইবে। ইহার বহুত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। আবু হাফেজ নামক এক ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, একদা আমার ভয়ানক পেটের বেদনা হয়। তখন আমি বাংলার চেরাগ মৌলানা কেরামত আলী সাহেবের পৌত্র মৌলানা মহাম্মদ আহাম্মদ সাহেবের নিকট হইতে উক্ত নকশা প্রাপ্ত হইয়া ইহা আমার পেটের উপর রাখিয়া বলিলাম, হে খোদাওন্দ করিম হজরতের পায়ের জূতার উছিলায় আমার বিষ আরোগ্য করিয়া দেও। ইহার কিছুক্ষণ পরেই আমার বিষ দূর হইয়া গেল। সেই দিন হইতে উক্ত নকশা শরিফকে অতি যত্নের সহিত তাজিম করিতাম। ইহার কিছুদিন পরে আমার বিবির প্রসব বেদনা উপস্থিত হইয়া সন্তান প্রসবের জন্য কষ্ট পাইতেছিল। তখন উক্ত নকশা শরিফ পেটে রাখিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মে দোয়া চাওয়ায় তৎক্ষণাৎ বেদনা কমিয়া সন্তান প্রসব হইয়া গেল।

হে মোসলমান ভ্রাতাগণ, আমার নিবেদন এই পাক নকশা শরিফ যে প্রত্যেকেই সামান্য জাকাত স্বরূপ খরচদানে গ্রহণ করিয়া দীন দুনিয়ার ছোয়ার হাছিল করিবেন। যাঁহারা ইহা গ্রহণ করিবেন না–পাক শরীরে হাত লাগাইবেন না। ইতি—

www.pathagar.com

প্রকাশক
মৌলানা মহাম্মদ আহাম্মদ সাহেব
জৌনপুর নিবাসী মৌলানা কেরামত আলী সাহেবর পৌত্র।

প্রাপ্তিস্থান :
খাকছার বান্দা
হাজি মোহাম্মদ মালেক হুছেইন
মোকাম ভৈরব বাজার
জিলা : ময়মনসিংহ
গ্রা : মোঃ মথুরাপুর (পাবনা জিলা)
পোঃ আঃ চাটমোহর।

দরগাহ সম্বন্ধে সামান্য দুটি কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের শেষ করিতেছি। এদেশে দরগাহ আছে, তম্মধ্যে শ্রীহট্টে শাহজালালের, ময়মনসিংহে শাহ কামালের, বগুড়ায় অসংখ্য মস্তান, ত্রিপুরায় খরমপুর ও চট্টগ্রামে মাইজভান্ডারের বাজেবস্থান দরগাহ বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক দরগাতে একদল খাদেম আছে। তাছাড়া কতক ফকির দরবেশও দেখা যায়।

এই সব দরগাহতে তৌহিদবাদী মুসলমান দ্বারা (যার কলমায় বলে, লা–শরিকাল্লাহ আল্লার কোন শরিক নাই)। কিরূপ ঘৃণ্য পৌত্তলিকতার অভিনয় হইতেছে, তাহা যাঁহারা দেখেন নাই, তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, একবার যাইয়া দেখিয়া আসুন। কিন্তু কবর পূজা ও অন্যান্য মানত কুসংস্কারের কথা বাদ দিয়া, সেখানে আজ কাল যে নানা পাপাচার ও ব্যভিচারের তান্ডব লীলা শুরু হইয়াছে সে দৃশ্য বড়ই ভয়ানক। যাঁহারা জলধর বাবু কাশীর বৃত্তান্ত ও তারকেশ্বরে মোহান্তের ঘটনা শুনিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিয়ছিলেন, তাঁহাদের নিকট অনুরোধ তাঁহারা যেন আপন ঘরের দিকে দৃষ্টিপাত করেন।

উপসংহারে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বাঙ্গালী মুসলমান আজ পথভ্রান্ত। ইসলামের তৌহিদ যে আজ তাহারা নিজের জীবনে উপলব্ধি করিতে পারে না। এর মূলে আছে শুধু অজ্ঞতা ও তথাকথিত আলেম সমাজের ভণ্ডামি। তার সাংসারিক জীবন বড় শুষ্ক ও মরুময়। নানারূপ করভারে সে আজ প্রপীড়িত। তার উপর পীরের অত্যধিক ট্যাক্স যোগাইতে তার জীবন নিতান্তই দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। ধর্ম্মের নামে তার উপর দৌরাত্ম্য না করিয়া তার অন্ধকার হৃদয়ে জ্ঞানের দীপ শিখা জ্বালিয়া দিতে হইবে। তবেই সে আপনা হইতে পীর পূজা ও কুসংস্কার ছাড়িয়া তৌহিদের আদর্শ অনুসরণ করিবে।

www.pathagar.com

মানব মনের ক্রমবিকাশ

কাজী মোতাহার হোসেন

কবি যখন ভাবের প্রাচুর্য্যে নির্ঝরের বন্দনা করে, বসুন্ধরাকে সম্বোধন করে, এবং দুরন্ত সাগরকে তাহার গান শুনায়, যখন সে পর্ব্বতের সঙ্গে কথা বলে, কোকিলের সঙ্গে আত্মীয়তা করে এবং সমীরণের নিকট মনোবেদনা জানায়, তখন আমরা বিদ্রুপের হাসি হাসি না— সম্ভাব্যতার তর্কও করি না, আমরা প্রাণ দিয়া অনুভব করি। আমাদের হৃদয়ের কোন নিভৃত গোপন বন্দরে, কি যেন এক অনির্দ্দেশিত অথচ পরিচিত সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। কোন অতীত যুগের হারানো কাহিনী যেন অস্পষ্ট ভাবে মনে পড়ে। সে যুগ মানব ইতিহাসের শৈশব কাল ; আর সে কাহিনী বোধ হয় শিশু–চিত্তের কল্পনা রঞ্জিত স্মৃতি। সে যুগে এই সব চিন্তা মানুষের মনকে সম্পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া থাকিত। বর্ত্তমানে যাহা কবিতার অলঙ্কার মাত্র, সে যুগে তাহা জীবনের সত্য ঘটনা ছিল। তখন, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের নিবিড় আত্মীয়তার সম্বন্ধ ছিল ; বৃক্ষ–লতা প্রভৃতিও তাহাদের নিকট প্রাণযুক্ত ও বুদ্ধিসম্পন্ন ছিল।

সেই আদিম যুগে মানুষের নিকট সূর্য্য এক মহা শক্তিশালী দেবতা ছিল, যাহার হাস্যে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত এবং ক্রোধে উত্তপ্ত প্রান্তর ধূ–ধূ করিত। পৃথিবী একটা প্রকান্ড ঘুমন্ত দৈত্য ছিল, যাহা সময় সময় একটু নড়িয়া চড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইত। মানুষ জীবিতকালে ঐ দৈত্যের পিঠের উপর দিয়া চলাচল করিত, মৃত্যুর পর তাহার পেটের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিত। আগুন এক বন্য দুরন্ত প্রাণী ছিল, যাহা স্পর্শ করিলে দংশন করিত। পশু পক্ষীরা বিদেশী ছিল, যাহাদের স্বতন্ত্র ভাষা এবং আচার পদ্ধতি ছিল। বৃক্ষ লতা বাক্‌হীন প্রাণী ছিল, তাহাদের কতকগুলি মানুষের হিতকরী বন্ধু এবং কতকগুলি অনিষ্টকামী শত্রু ছিল।

এইসব বস্তু ও প্রাণীকে তাহারা ঠিক মানুষ ভাবিয়াই তাহাদের সঙ্গে ব্যবহার করিত। তাহারা কখনও একটা সুন্দর কাঁঠাল গাছ বা নারিকেল গাছকে ফুল সাজে সাজাইত : কখনও বা ফলদায়ক বৃক্ষকে পূজা উপচারে সম্মানিত করিয়া ফল প্রার্থনা করিত। তাহারা কতকগুলি প্রাণীকে বুদ্ধির জন্য সম্মান করিত, কতকগুলিকে হিংস্র বলিয়া ভয় করিত এবং কতকগুলিকে উপকারী বলিয়া কদর করিত। এই জন্য এই সব জন্তুকে বধ করা, এমন কি তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করাও ভয়ানক অন্যায় মনে করিত। পাছে হিংস্র জন্তুর সমাজ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে, এই ভয়ে তাহারা সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না ; বরং নানা উপচারে উহাদিগকে পূজা করিত। এইরূপ নিসর্গের অন্যান্য শক্তির কৃপা দৃষ্টি লাভের জন্য, তাহাদের উদ্দেশ্যে পূজা ও বলিদান করিত। কিন্তু সময় সময় দুই চারি জন অসাধারণ সাহসী পুরুষ ব্যাঘ্র ভল্লুকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নির্গত হইত। এমন কি সময় সময় মরুভূমির উত্তপ্ত বায়ুকে তরবারী দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া

www.pathagar.com

ফেলিত, স্ফীত বক্ষ নদীর স্রোতকে বল্লমের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করিত, দুর্দ্দান্ত সমুদ্রকে বেত্রাঘাতে শাসন করিত, নির্দ্দয় পৃথিবীকে শাণিত ছুরিকা দ্বারা বধ করিত। আকাশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া উন্নত সৌধ নির্ম্মাণ করিত এবং স্বর্গ জয় করিবার জন্য মেঘের গায়ে তীর ছুড়িত।
কিন্তু ক্রমে ক্রমে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি উৎকর্ষ লাভ করিল। তখন তাহারা আবিষ্কার করিল যে, দেহ হইতে পৃথক একটি জিনিষ মানুষের ভিতর আছে। সেই জিনিষটি জড় দেহকে চালনা করে। সেই মন বা আত্মা কিম্বা তদ্রূপ কোন ভৌতিক অদৃশ্য পদার্থই চিন্তা করে, সেই-ই আকাঙ্ক্ষা করে, সেই সিদ্ধান্ত করে। শরীর যখন নিদ্রায় অচেতন, তখনও ইহা জাগ্রত থাকিয়া ঘুমন্ত মানুষের অন্তঃকরণে চিন্তা কল্পনার জাল বিস্তার করে। যখন তাহারা দন্তহীন পক্ককেশ বৃদ্ধের নিকট হইতে জ্ঞানের কথা শ্রবণ করে, তাহারা বুঝিতে পারে যে শরীরের সঙ্গে আত্মা জরাগ্রস্ত হয় না—সুতরাং ইহার মৃত্যু নাই। দেহটি আত্মার বাহন মাত্র। এখন প্রশ্ন হইতেছে, দেহ ধ্বংস হইয়া গেলে তদাশ্রয়ী আত্মার কি অবস্থা হয়?

প্রিয়জনের বিচ্ছেদে তাহার চিন্তা ও স্মৃতি সর্ব্বদা মনে হইতে থাকে। তন্দ্রা-অবস্থায় তাহার প্রতিমূর্ত্তি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠে, তাহার সুমিষ্ট কোমল ধ্বনি শ্রুতি গোচর হয়, তাহার মধুর স্পর্শ অনুভূত হয়। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অন্তর্হিত হইলেও, অনেকের মনে বিশ্বাস থাকিয়া যায়, যে সত্যই প্রিয়াস্পদের আত্মার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অসভ্য জাতিদের মধ্যে প্রধানতঃ ভাব হইতেই এইরূপ ভ্রান্তি জন্মে। হয়ত তাহাদের সর্দ্দারের মৃত্যু হইয়াছে। অর্ধ জাগ্রত অবস্থায় তাহার প্রতিকৃতি আসিয়া যেন তাহাদিগকে শাস্তির ভয় দেখাইতেছে। সুতরাং তাহার সহজেই বিশ্বাস হয় যে, সর্দ্দার জীবিত আছে। এইরূপে মৃত্যুর পরপারে জীবন আছে, এই ধারণার উৎপত্তি হয়। আত্মার মোকাম বা বাসস্থান স্বরূপ এই দেহের যখন ধ্বংস হয়, তখন আত্মা অবাধে বাতাসের মধ্যে চলাচল করে। ইহা বাতাসের মতই অদৃশ্য, বাতাসের মতই ভয়াবহ নিষ্ঠুরও হইতে পারে। ইহা হইতে অসভ্য মানুষের মনে এই ধারণা হয় যে, আধি ব্যাধির যন্ত্রণা তাহার সর্দ্দারের প্রদত্ত শাস্তি ব্যতীত আর কিছু নহে। তাহার ইহাও বিশ্বাস হয় যে, যুদ্ধ বিগ্রহের সময় তাহাদের সর্দ্দারের আত্মা অদৃশ্য অস্ত্র লইয়া তাহাদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করে। এই Father spirit-এর সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার জন্য তাহার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করা হয়, তাহার সমাধির পাশে খাদ্য সম্ভার যোগানো হয়। প্রকৃত পক্ষে, তখনও তাহাকেই সর্দ্দার বলিয়াই মনে করা হয়—এবং এই সব কল্পিত সর্দ্দারকে দেবতা আখ্যায় ভূষিত করা হয়। প্রত্যেক সর্দ্দারই দেহ ত্যাগের পর দেবতার আসন ও সম্মান পাইতে থাকে। জীবিত সর্দ্দার যেন এই সব দেবতাদের পুরোহিত। ইনি দেবতাদের নিকট হইতে প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন বলিয়া সময় সময় শাস্ত্র বা আদেশের প্রবর্ত্তন করেন। সর্দ্দারদের গৌরবজনক বীরত্ব কাহিনী অবলম্বন করিয়া গীত রচিত হয়, তাহাদের জীবন বৃত্তান্ত বংশ পরম্পরায় ঘোষিত হইতে থাকে, এবং ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া পৌরাণিক কাহিনীতে পরিণত হয়।

www.pathagar.com

মানুষ স্বভাবতই নিজের মনের রং–এ জগৎকে রঙ্গিন করিয়া দেখে, 'He reasons from himself outwards' সে মনে করে, নিজের ভিতরে যেমন জড় ও চিন্ময় পদার্থ আছে সেইরূপ সামান্য তৃণ হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্রাদি পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থেরই এক জড় ভাগ আর একটি সূক্ষ্ম ভাগ আছে। দেবতার মন্দিরে বা সমাধি স্থানে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তাহার সূক্ষ্ম অংশ দেবতারা ভোগ করেন, জড় অংশ যেমনকার তেমনই থাকিয়া যায়। নদী কেবল জল মাত্র নহে যে শুকাইয়া গেলেই নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহার মধ্যে এক আত্মা বাস করে,—তাহার মৃত্যু নাই। কিন্তু মানুষ যতই সমষ্টিকে ধারণা করিতে সক্ষম হয়, ততই তাহাদের দেবতার সংখ্যা হ্রাস–প্রাপ্ত হয়। তখন তাহারা প্রত্যেক বৃক্ষের এক একটি দেবতা কল্পনা করিয়া সমগ্র বনের একটি দেবতা স্বীকার করে; প্রত্যেক নদীর স্বতন্ত্র দেবতা স্থলে একটি মাত্র জল দেবতা বিশ্বাস করে; প্রত্যেক নক্ষত্রের পৃথক পৃথক দেবতা স্থলে, সমগ্র আকাশের একটি মাত্র দেবতা ধারণা করে। এইরূপে প্রকৃতি একদল দেবতার শাসিত বলিয়া অনুমিত হয়। স্থল বিশেষে কৌলিক দেবতাদিগকে ইহাদের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া কল্পনা করা হয়, আবার কোথায়ও বা স্বতন্ত্রভাবেই ইহাদের পূজা হয়।

এই সমস্ত দেবতা আদিম মানুষের নিকট প্রভু বা সম্রাটের ন্যায়। তাহাদের চরিত্রও মানবীয় চরিত্র; কারণ প্রত্যেক জাতিই নিজেদের চরিত্রের উচ্চতম আদর্শের দ্বারা দেবতার চরিত্র কল্পনা করে, কোন কোন দেশে শুভ এবং অশুভ দুই প্রকার দেবতা আছে। অপদেবতাগুলিকে স্তুতিবাক্য এবং উপহার দ্বারা সন্তুষ্ট করা যায়, শুভ দেবতাগুলিকেও অবহেলা করিয়া ভীষণ ও ক্রুদ্ধ করিয়া তোলা যায়। যাহা হউক, যেমন অত্যাচারী রাজাদের ভাগ্যেই স্তুতি উপহার অধিক ঘটে, সেইরূপ অপ–দেবতাগণই অধিক পরিমাণ পূজা উৎসর্গ প্রভৃতি পাইয়া থাকেন।

মৃত্যুর পরে আত্মার স্থিতি সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। প্রথমে তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। সমাধির আসে পাশেই তাহাদের গতিবিধি ছিল। পরে ভূগর্ভে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করা হয়। পৃথিবীতে তামারা যেভাবে জীবন–যাপন করিত, ভৌতিক জগতেও তাহারা ঠিক সেইভাবেই বাস করে। বস্তুতঃ মৃত্যুর পর আত্মার জীবন পৃথিবীস্থ জীবনেরই পরবর্ত্তী অধ্যায় মাত্র। পরবর্ত্তী জীবন, পৃথিবীস্থ জীবনের উপনিবেশ বিশেষ, কাজেই সেখানেও ঠিক এই সমস্ত আত্মীয় স্বজন পরিবৃত হইয়াই আত্মা বাস করিবে। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, এই কারণে তাহার সমাধি পার্শ্বে বা তাহার অভ্যন্তরে, তাহার ব্যবহৃত প্রিয় খাদ্য, অস্ত্র শস্ত্র ও পরিচ্ছদাদি রক্ষিত হয়, এমনকি তাহার পত্নী ও দাস–দাসীদিগকেও সময় সময় তাহার অনুগমন করিতে হয়। তাহাদের বিশ্বাস এই যে, উৎসর্গীকৃত ব্যক্তিবর্গ, পরিচ্ছদ, খাদ্য এবং অস্ত্র শস্ত্রের আত্মা প্রেতলোকে তাহার অনুগমন করে।

নরলোক এবং প্রেতলোকে একই দেব–দেবী রাজত্ব করে। নরলোকের স্থায়িত্বকাল অল্প, প্রেতলোকের স্থায়িত্বকাল দীর্ঘ। কিন্তু উভয় লোকই অনাদিকাল হইতে অবস্থা করিতেছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিবে। মানুষ, কোনকালে পৃথিবীকে আরম্ভ হইতে দেখে নাই বলিয়াই তাহা অনাদি ; এবং সে ইহাকে বৃদ্ধ হইতে দেখে না বলিয়াই ইহা অনন্ত।

www.pathagar.com

নরলোক ও পরলোক পাশাপাশি অবস্থিত। এমন কি সীমা রেখাও খুব সুনির্দ্দিষ্ট নহে। দেবতারা বা প্রেতাত্মারা অনেক সময় রক্ত মাংসের শরীর পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করে। স্ত্রীলোককে ভুলানো, শত্রুকে উৎপীড়ন করা এবং প্রিয় বন্ধুদিগের সহিত বাক্যালাপ করা, এই সমস্ত তাঁহাদের কাজ। অপরপক্ষে মানুষের মধ্যেও এমন সব মহাশয় ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা জড় শরীরকে বিছানায় শায়িত রাখিয়া আত্মিক জগতে ভ্রমণ করিতে পারেন, এবং সেখান হইতে বিশেষ ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া মর্ত্ত্যবাসীর বিস্ময় উৎপাদন করিতে পারেন। মৃত ব্যক্তিদিগের প্রেতাত্মারা অনেক সময়, পৌত্র বা প্র-প্রৌত্রের রূপ ধরিয়া বংশে পুনঃপ্রবেশ করিয়া থাকেন। বিখ্যাত বিখ্যাত বীর পুরুষ এবং ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণকে অনেক সময় অবতার বলা হয়। অর্থাৎ তাঁহারা দেবতার ঔরসে স্ত্রীলোকের গর্ভে জন্ম লাভ করিয়াছেন। কখনও কখনও বিশ্বাস করা ময় যে, কোন দেবতা দয়া পরবশ হইয়া পৃথিবীর দুর্দ্দশা বা বিপ্লব দূর করিবার জন্য দেবদেহ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে আগমন করিয়া আপনাকে উৎসর্গীকৃত করিয়া থাকেন। কখনও কখনও অসভ্য জাতিরা বিশ্বাস করে যে তাহাদের রাজা প্রকৃতপক্ষে নর দেহধারী দেবতা। কোন কোন দেশে রাজদেহকে অবিনাশী বলিয়া মনে করা হয়। তাহাদের বিশ্বাস, রাজা আহার করেন না, নিদ্রা যান না এবং তাঁহার মৃত্যুও নাই। ঐ সমস্ত রাজ্যে পুরোহিতেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা। সাধারণ লোকে কোন দরবার লইয়া উপস্থিত হইলে রাজা পর্দ্দার আড়াল হইতে একখানি পা-বাহির করিয়া দিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে, পুরোহিতেরা গোপনে তাঁহাকে সমাধিস্থ করিয়া তৎস্থলে অন্য রাজা প্রতিষ্ঠিত করে।

Savage এক অদ্ভুত জগতে বাস করে। তাহারা প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এজন্য তাহাদের প্রত্যেক যন্ত্রণা, প্রত্যেক স্বপ্ন, প্রত্যেক সম্পদ, প্রত্যেক বিপদ এক কথায় যাহার কারণ নির্ধারণ করা একটু কঠিন, সে সমস্তই দেবতার রোষ বা অনুগ্রহের ফলে সংঘটিত হয়। প্রতিদিন, প্রতিনিয়তই দেবতা তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে। এমন কি, মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তাহারা স্বাভাবিক ঘটনা বলিয়া মনে করে না। তাহাদের বিশ্বাস কোন না কোন দিন মানুষ দুর্ব্ব্যবহার দ্বারা দেবতাদিগের রোষ উৎপাদন করে, তাহার ফলে দেবতাগণ কর্তৃক নিধনপ্রাপ্ত হয়।

তাহাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা অসাধারণ। যদি তাহাদিগকে বলা যায়, 'তোমরা যাহাদিগকে দেবতা বল, তাহারা বাস্তবিক পক্ষে নাই' তবে তাহারা কেবল অবাক অবিশ্বাসের হাসি হাসে। তাহাদের পিতামহের বর্ণিত দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস, তাহাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক। বিশ্বাস করিবার জন্য তাহাকে কিছুমাত্র চেষ্টা করিতে হয় না। সে প্রাণের সহিত অনুভব করে, তাহাকে যাহা শিখানো গিয়াছে তাহাই সত্য। তাহার বিশ্বাস, তাহার জ্ঞান বুদ্ধির সহচর ও সম-প্রকৃতিক। যতক্ষণ না তাহার বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিবর্ত্তন হয়, ততক্ষণ তাহার বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন সম্ভবপর নহে। যদি কোন দেবতা স্বপ্নে, বা তাহার পুরোহিতের মারফতে কোন প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভঙ্গ করিয়া থাকেন, তবে সে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য জ্ঞান করে না—তাহার দেবতার প্রতি বিশ্বাস বিন্দুমাত্রও কমে না। সে সহজভাবে মনে করে, দেবতা ছলনা করিয়াছেন। দেবতা তাহার নিকট এক বিরাট পুরুষ মাত্র। সুতরাং তাহার পক্ষে ছলনা করা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা দোষের বিষয় নহে। তাহার দেবতা

www.pathagar.com

স্বেচ্ছাচারী নৃপতিবিশেষ—ক্ষেতের প্রথম ফসল, গাছের প্রথম ফল, পালের প্রথম বাছুর তাহার প্রাপ্য। আবার কখনও কখনও তাহার ভোজের জন্য কুমারী নারী এবং ভোগের জন্য নর দেহ দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হয়। আর মানুষ প্রকৃত পক্ষে দেব রাজার ক্রীতদাস। সে প্রার্থনা করে—অর্থাৎ ভিক্ষাচার্য্য, ত্রস্ত পাঠ করে, অর্থাৎ স্তুতি গায়, বলি উৎসর্গ করে—অর্থাৎ কর প্রদান করে। সাধারণতঃ ভয় হইতেই এই সব করে—তবে অনেক সময় প্রতিদানে কিছু বেশী পাইবার আশাতেও করিয়া থাকে। তাহার আকাঙ্ক্ষা-বস্তু প্রধানতঃ দীর্ঘ জীবন, ঐশ্বর্য্য এবং পুত্রবতী স্ত্রী। সচরাচর দেবতা সম্বন্ধে তাহাদের মনে যে সব বিদ্রোহের কথা উদিত হয়। তাহা প্রকাশ করিতে ভয় পায়। কিন্তু সময় সময় অসহ্য হইলে তাহার অন্তর্নিহিত যাতনা কথায় প্রকাশ পায়। রোগ শয্যায় ছটফট করিতে করিতে সে দেবতাকে অভিশাপ করে আর বলে, 'আমার ভিতরটা খোলা করিয়া খাইয়া ফেলিতেছে।' আবার মানুষ যখন নিজের বুদ্ধির চেয়ে উচ্চতর কোন ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, তখনও সে দেবতাকে ঠিক চিনিতে পারে না। কারণ দীক্ষা দ্বারা ধর্ম্ম পাওয়া যায় না। একবার সোমানীল্যান্ডের এক বৃদ্ধা বলিয়াছিল, 'ও আল্লা, তোমার দাঁতে যেন আমার দাঁতের মত কনকনানী হয় ; ও আল্লা, তোমার মাড়ীতে যেন আমার মাড়ীর মত ঘা হয়।' খৃষ্টান সম্রাট 'পেপেল' এক সময়ে নিজের অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন 'গডকে দেখিতে পাইলে এই মুহূর্ত্তে তাহার প্রাণ বধ করিতাম, মানুষকে কেন সে মরণাধীন করিয়াছে?'

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেবতার সংখ্যা কেমন করিয়া হ্রাস প্রাপ্ত হয়, পূর্ব্বেই তাহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এই সংখ্যা যত কম হয়, দেবতার ক্ষমতাও তত প্রসারিত বিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত হয়। অবশেষে মানুষ যখন বিচিত্র বিশ্বে এক পরিপূর্ণ একত্বের সন্ধান পায়, তখন ক্রমে ক্রমে তাহার মনে একটি মাত্র দেবতার কল্পনা আসে। তখন লোকে বিশ্বাস করে যে সেই 'একমেবা দ্বিতীয়ম' পুরুষটিই সমগ্র বিশ্ব জগতের সৃষ্টি করিয়া তাহার উপর একচ্ছত্র রাজত্ব করিতেছেন। প্রথমত এই দেবতা যেন জগতের বহির্দ্দেশে বা উর্দ্ধদেশে নির্ব্বিকারভাবে বসিয়া রাজত্ব করেন ; এবং আগেকার দেবতাগুলি এই দেবাদিদেবের প্রতিনিধি বা ডিপুটি রূপে পৃথিবীতে কার্য্য পরিচালনা করেন। অতঃপর তাহার ফেরেস্তা কিম্বা পয়গম্বর শ্রেণীতে অবনীত হন। তখন লোকের বিশ্বাস হয় যে, সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ বিশ্বের সর্ব্বত্র অর্থাৎ 'অনলে, অনিলে, চির নভোনীলে, ভূধরে সলিলে গহনে' বিরাজিত আছেন, এবং ভাল মন্দ সমস্তই তাঁহার নিকট হইতে প্রবাহিত হয়। তবে কোন কোন পদ্ধতিতে তাঁহাকে কেবল শুভদায়ক বলিয়া কল্পনা করা হয় ; অশুভের কর্ত্তা কোন বিদ্রোহী ফেরেস্তা,—যাহাকে খোদার প্রতিদ্বন্দ্বী মহা শত্রু বলিয়া অভিহিত করা হয়।

এ পর্য্যন্ত আমরা নীতির দিক দিয়া একটি কথাও বলি নাই। পৃথিবীর সৃজন কাহিনী, দেবতা দ্বারা মানুষের শাসন, মৃত্যুর পরে তাহার অবস্থা, এ সমস্তই বৈজ্ঞানিক হিসাবে ধরিলে অনুমান বা থিওরী মাত্র। এগুলি প্রাথমিক মানুষের জিজ্ঞাসু চিত্তের কৌতূহল নিবারক যুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত। এইগুলি নানাভাবে ও কল্পনার দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া আমাদের নিকট

www.pathagar.com

revealed religion বা প্রত্যাদিষ্ট ধর্ম্ম বিশ্বাস রূপে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। এগুলি যুক্তিমূলক বলিয়া আমাদের বুদ্ধির সহিত অনেকটা মিশ খায়। এ কারণে বর্ত্তমান যুগের সভ্য মানবও উহা অনেকটা বিশ্বাস করে। কিন্তু নৈতিক হিসাবে ইহার কোন মূল্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। কারণ পৃথিবী নির্ম্মাণ করিতে ছয় দিনই লাগুক আর দশ হাজার বৎসরই লাগুক, পৃথিবীর সৃজনকারী এক খোদাই হউন বা তেত্রিশ কোটি দেবতাই হউন, তাহাতে মানুষের জীবন যাত্রার কি আসিয়া যায়? কোন অসভ্য জাতি এক লক্ষ দেবতার শাসনাধীনে আছে বলিয়াই, তাহারা নিশ্চয়ই খুব সাধু সজ্জন হইবে, তাহার কোন স্থিরতা বা guarantee নাই।

মানুষের বুদ্ধি বৃত্তির ন্যায় নৈতিক বৃত্তিও একটা স্বভাবজাত ধর্ম্ম। ক্রমে ক্রমে ইহার বিকাশ হয়। মানুষের দেবতা যখন তাহারই চরিত্রের প্রতিমূর্ত্তি, তখন মানুষের নৈতিক আদর্শের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে তাহার দেবতার নৈতিক আদর্শও উন্নত হইতে থাকিবে তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা। অসভ্য জাতির সর্দ্দার কেবল তাহার নিজের এবং নিজের পরিবার বর্গের বিরুদ্ধে অন্যায়ের শাস্তি বিধান করে। কিন্তু উহারা আর একটু সভ্য হইলে, সর্দ্দার সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মাবতারে পরিণত হয়। সেইরূপ অসভ্য জাতির দেবতা, তাহাদের নিকট হইতে মাত্র কর ও বশ্যতার দাবী করে। তাহারা Heresy–এর (ধর্ম্মদ্রোহিতার) শাস্তি দেয়। কারণ তাহা বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ ; blasplemy–এর শাস্তি দেয়, কারণ তাহা Contempt of court ; কর বা স্তুতি বন্ধ করিলে শাস্তি দেয়, কারণ তাহা রাজ–বিদ্রোহ। আবার এই সব অপরাধীকেই সভ্য জাতির দেবতাও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাস্তি প্রদান করে। কিন্তু সভ্য জাতির দেবতা আরও আদেশ করেন যে, মানুষ পরস্পরের প্রতিও ন্যায় ব্যবহার করিবে। এই দেবতা এখনও despot. কারণ তিনি মানুষকে তাঁহার স্তুতি গান ও প্রশংসা করিতে আদেশ করেন এবং করও গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল আত্মানুসন্ধী despot মাত্র নহেন। তিনি সুকৃতিশীলকে পুরস্কার দান করেন, এবং দুস্কৃতিশীলকে দন্ডিত করেন।

সময় সময় পৃথিবীতে দেখা যায়, সাধুতার পুরস্কার নাই, অথচ অসাধুতার জয় জয়কার হইতেছে। অসভ্যের মনে ইহাতে কোন খটকা বাধে না। কারণ তাহারা মনে করে, কোন পূর্ব্বপুরুষ কিম্বা আত্মীয়ের দোষে সাধু পুরুষ নির্য্যাতন ভোগ করে ; আর পূর্ব্ব পুরুষের সুকৃতির ফলে পাপীরও পাপ খন্ডন হইয়া যায়। অসভ্য জাতির জীবন–ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে সমাজ ব্যক্তি দ্বারা গঠিত হয় না, পরিবারের সমষ্টি দ্বারা গঠিত হয়। পরিবারের কোন ব্যক্তি কাহাকেও হত্যা করিলে, সেই পরিবারের কোন ব্যক্তি কাহাকেও হত্যা করিলে, সেই পরিবারের যে কোন ব্যক্তির রক্ত দ্বারা সেই হত্যার প্রতিশোধ লওয়া হয়। যদি এক পুরুষের মধ্যে সেই রক্তপাতের প্রতিশোধ না লওয়া যায়, তবে সে বিবাদ চলিতেই থাকে। কারণ ব্যক্তি বিশেষের মৃত্যু হইলেও, সমগ্র সম্প্রদায়ের আর মৃত্যু হয় না। সুতরাং অপরাধীর পুত্র পৌত্রেরাই পূর্ব্ব পুরুষের কৃত কার্য্যের শাস্তি গ্রহন করিবে এ কথা তাহাদের নিকট অত্যন্ত স্বাভাবিক ও ন্যায় সঙ্গত বলিয়াই বোধ হয়।

www.pathagar.com

সমাজের উচ্চতর অবস্থায় এই পারিবারিক ভাবের পরিবর্ত্তে ব্যক্তিত্বের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তখন মনের বিকাশ খুব দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে। এই সংসারে সকলের প্রতি ঠিক ন্যায় ব্যবহার হইতেছে না, একথা তখন ধরা পড়ে। এ জন্য বিশ্বাস করা হয় যে পরজন্মে ইহকালের বিচারের দোষ ত্রুটি সংশোধন করা হইবে। অন্য কথায় 'পরলোকে পুরস্কার ও শাস্তি হইবে' এই বিশ্বাস প্রচলিত হয়। তখন প্রেত জগত বা আত্মিক জগত দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক অংশে পাপাত্মা ও অন্য অংশে পুণ্যাত্মার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। অবাধ্য পাপাত্মারা অন্ধকার দুর্গন্ধময় স্থানে অনন্তকাল ধরিয়া অসীম যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে থাকিবে। আর ভক্ত পুণ্যাত্মারা সুন্দর বেশভূষায় ভূষিত হইয়া, সোনার মুকুট পরিয়া, অনন্তকাল ধরিয়া মহাপ্রতাপান্বিত দেবতা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য সুধা পান করিতে থাকিবে।

বলা বাহুল্য, কর্ম্মপ্রবণ ইউরোপীয় চিত্তের নিকট পরিণামের এই নিষ্ক্রিয় অবস্থা বিশেষ লোভনীয় বলিয়া মনে হয় না। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্বর্গের সৃষ্টি হইয়াছে এশিয়াতে। রাজ দরবারে সম্মানিত আমির ওমরাহের পদ অধিকার করা প্রাচ্য মনের চরম আকাঙ্ক্ষা এবং পরম ভাগ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। আমরা ক্রমবিকাশের যে স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তখনকার দিনে দেবতার প্রতি মানুষের মনোভাব, ঠিক রাজার প্রতি প্রজার মনোভাবের অনুরূপ। প্রাচ্য রাজার প্রজারা তাহার সন্তান বা সেবক। এখানে লোকে প্রাণ বধের আজ্ঞা পাইলে, সেই নিদারুণ ফরমান চুম্বন করিয়া ভক্তির সহিত নির্ব্বিবাদে শূলে চড়িতে পারে। রাজা তাহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলেও, হাত জোড় করিয়া ভক্তিভাবে বলিতে পারে, রাজাই দেনে-ওয়ালা, রাজাই লেনে-ওয়ালা, রাজার নাম ধন্য হউক'। বিদেশী প্রজা, যে কোন দিন রাজাকে দেখে নাই, কেবলই ট্যাক্স দিয়াছে, সেও যদি শুনিতে প্রায় যে রাজা বিপদে পড়িয়াছেন, তখন অমনি সে তরবারি বাহির করিয়া আপন আত্মীয় পরিজন এবং গৃহকে যেভাবে রক্ষা করিত, ঠিক সেইভাবে রাজাকে রক্ষা করিতে ছুটিয়া যায়।

এই প্রকার ভক্তি রাজার প্রতি প্রদর্শিত হইলে রাজভক্তি, দেবতা বা খোদার প্রতি প্রদর্শিত হইলে ধর্ম্ম নিষ্ঠা। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রে মনোবৃত্তি একই প্রকার। ধর্ম্মরাজ্যও এক প্রকার গভর্ণমেন্ট বিশেষ। মানুষ ঐহিক নরপতিকে যে সম্মান করিত, অদৃশ্য দেবতাকেও সেই সম্মানে ভূষিত করিয়াছে। অসভ্য সমাজে কেবল ভীতিই এই সম্মান প্রদর্শনের মূল কারণ। কিন্তু উন্নত সমাজে ভয়ের সহিত ভালবাসাও মিশ্রিত আছে। ইহাতে মনে এক অনির্ব্বচনীয় সুখকর মিশ্র ভাবের উদয় হয়। পার্থিব রাজার প্রতি পূর্ব্বেকার এই শ্রদ্ধা ও সম্মান অনেক হ্রাস পাইয়াছে, এমন কি কোন কোন দেশে এখন তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। তথাপি অদৃশ্যদের রাজার প্রতি তাহাদের মনোভাবের অতটা পরিবর্ত্তন হয় নাই। কে জানে ভবিষ্যতে দেবতার রাজ সম্মান বজায় থাকিবে কিনা?

ধর্ম্মভাব ও দেব পরিকল্পনা সম্বন্ধে ক্রমবিকাশের যে সামান্য পরিচয় দেওয়া হইল, ইহা হইতেই সহজে ও পরিষ্কার রূপে বিভিন্ন দেশের রাশীকৃত স্মৃতি, পুরাণ ও কাহিনীর বিজ্ঞান-সম্মত শ্রেণী ভাগ করা যাইতে পারে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, মানুষের ধারণা

ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এক সমাজে একই সময়ে ক্রম বিকাশের বিভিন্ন স্তর একত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই। আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাই এরোপ্লেনের দিনেও গো-গাড়ী ও এক্কা গাড়ীর অপ্রতুল নাই; ইলেকট্রিক লাইটের দিনেও শত শত ঘরে মাটির ঢেমী জ্বলিতেছে। সেইরূপ এক ঈশ্বরের ধারণা প্রবর্ত্তিত হইবার বহু পরেও আমরা প্রকৃতি পূজার শত শত নিদর্শন দেখিতে পাই। হানিবল আর ফিলিপের মধ্যে যে সন্ধি হয় তাহাতে উভয় পক্ষ বলিতেছেন Jupitor, Juno এবং Apolo-র সাক্ষাতে, কার্থেজ বাসীর দেবতা এবং Stercules ও Lolons-এর সাক্ষাতে; Mars, Triton এবং Neptune-এর সাক্ষাতে, আমাদের শিবিরে যে সমস্ত দেবতা আছেন তাঁহাদের সাক্ষাতে, সূর্য্য চন্দ্র ও পৃথিবীর সাক্ষাতে, নদী হ্রদ এবং সমুদ্রের সাক্ষাতে শপথ করিতেছি। সক্রেটিসের সময় এথেন্সের লোক সূর্য্যকে একজন মহাপুরুষ মনে করিত। আলেকজাণ্ডার বা সেকেন্দার বাদশাহ যে কেবল সমুদ্রের দেবতাদিগের উদ্দেশ্যেই বলিদান করিয়াছিলেন, তাহা নহে, (Arrian বলেন) তিনি স্বয়ং সমুদ্রকেও নানা উপহারে সম্মানিত করিয়াছিলেন। এমন কি Prophet Job-এর গ্রন্থেও তারকাগণকে জীবনধারী প্রাণী মনে করিয়া বলা হইয়াছে যে, তাহারা স্বর্গের সিংহাসনের চতুস্পার্শে সঙ্গীত করিয়া ফিরিতেছে।

আবার যে সব দেশে দুই বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করে, অর্থাৎ এক শ্রেণী প্রখর বুদ্ধি সম্পন্ন ও শিক্ষিত এবং অন্য শ্রেণী অনুন্নত ও অশিক্ষিত, সেখানে বাহ্যতঃ এক ধর্ম্ম থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে দুইটি ধর্ম্মই বিরাজ করে। প্রাচীন Sabeans দের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক নক্ষত্র বাসী দেবগণকে ভক্তি করিত, অন্য শ্রেণী নক্ষত্রগুলিকেই পূজা করিত। অগ্নি পূজকদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক অগ্নিকে উপলক্ষ মাত্র জানিত, অন্য শ্রেণী অগ্নিকেই উপাস্য মনে করিত। পুতুল বা প্রতিমার প্রচলন যে দেশে আছে সেখানে সর্ব্বত্রই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরোহিতেরা প্রতিমাকে ধ্যান ধারণার সহায়ক বলিয়া মনে করে। কিন্তু যাহারা পড়িতে জানে না, তাহাদিগকে পুস্তক কিনিয়া দিলেও ফল হয়। অসভ্য জাতি মনে করে, তাহার দেবতা ঐ প্রতিমার ভিতর আছে, কিম্বা ঐ প্রতিমাকেই দেবতা মনে করে। শিশু তাহার পুতুলটিকে যে চক্ষে দেখে, ইহারা দেব প্রতিমাকেও ঠিক সেইভাবেই দেখে। শিশু জানে যে তাহার পুতুল রং করা কাঠ দিয়া প্রস্তুত এবং তাহার ভিতরে হয়ত মটরের দানা কিম্বা করাতের গুড়া আছে তবু সে তাহাকে জীবিতের মত ভালবাসে, শাড়ী পরায়, বিছানায় শোয়াইয়া ঘুম পাড়ায়। Savage-এর ভ্রান্তিও ঠিক এইরূপ। কারণ সে কল্পনা শক্তিতে শিশুর সমতুল্য। সেও প্রতিমার সঙ্গে আদর করিয়া কথা বলে, জল দিয়া তাহার পা ধোওয়াইয়া দেয়। তাহার মাথায় ও মুখে তেল দিয়া দেয়, প্রার্থিত জিনিষ না পাইলে অনুযোগ করে।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক। দেবতার নৈতিক আচরণও দেশের লোকের নৈতিক আদর্শের অনুরূপ, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বেদুইন বা যাযাবর জাতি সচরাচর তাহাদের দল ছাড়া অন্য দলের দ্রব্য সামগ্রী অপহরণ বা লুণ্ঠন করা, অন্য কথায় কাফেরের মাল লুট করা,

www.pathagar.com

অন্যায় মনে করে না। তাহাদের দেবতাও তাহাদের মত লুণ্ঠনকারী সর্দ্দার। যখন তাহারা বেদুইন স্বভাব ত্যাগ করিয়া শস্য-শ্যামল প্রান্তরে বাস করিয়া কৃষি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এবং বাড়ীঘর ও শহর নির্ম্মাণ করিয়া শান্তিতে বাস করে, তখন তাহাদের ধারণা পরিবর্ত্তিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে দেবতাও চুরি, দস্যুবৃত্তি প্রভৃতি নিষেধ করিয়া নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু সময় সময় তাহাদের পূর্ব্বদেবতার বচন বা ক্রিয়াকলাপ লিখিত আকারে সংরক্ষিত হয় এবং ওগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত যুগের লোকেও অপৌরু"ার বলিয়া মনে করে। তখন একটা কৌতুকজনক অথচ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। স্পষ্ট কথায় বলিতে গেলে, ধর্ম্ম বিশ্বাস তখনকার লোককে উন্নতির দিকে না উঠাইয়া অবনতির দিকেই টানিয়া নামায়, কাজে কাজেই ধর্ম্ম বিশ্বাসও অনেকটা শিথিল হইয়া যায়। কারণ একই কাজ দেবতায় করিয়া গিয়াছেন বলিয়া লীলারূপে পরিগণিত হইবে, আর মানুষে করিলে তাহার জন্য ফাঁসী কাষ্ঠের ব্যবস্থা হইবে, এই অন্যায় অবিচার শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকে দীর্ঘকাল সহ্য করিতে পারে না।

সাধারণ লোকের মন অত্যন্ত অগঠিত ও অপরিপূর্ণ। এজন্য তাহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ বাঁধাবাঁধি বিশ্বাস থাকা চাই। সেই অজানিত ও অজ্ঞেয় পুরুষ বা শক্তি সম্বন্ধে একটা থিওরী থাকা উচিত, যাহাতে বিশ্বাস করিয়া তাহার জিজ্ঞাসু মনের কৌতূহল নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু এই থিওরী যে রূপেই হউক না কেন, তাহাকে লোকের বুদ্ধির সহিত সমান তালে চলিতে হইবে। সেই থিওরী এমন হওয়া চাই যে, অনুসন্ধানের ফলে তাহা বিনষ্ট না হইয়া যেন আরও তাহার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে।

কিন্তু উন্নত জ্ঞান পিপাসী মন কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিয়া সর্ব্বদা সন্দেহে আন্দোলিত থাকিবে। তাহারা যে কেবল অতিরঞ্জিত পৌরাণিক কাহিনীগুলিকেই অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিবে, তাহা নহে, জগতের উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য বুঝাইবার জন্য, জ্ঞানমূলক ও নীতিমূলক যে সমস্ত সুকৌশল যুক্ত থিওরী উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতেও সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিবে না। তাহারা দিনের পর দিন কেবলই চিন্তা করিতে থাকিবে। ক্রমেই জ্ঞানের উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিবে। কিন্তু দেখিতে পাইবে যে, চিন্তার ক্ষেত্র অনন্ত প্রসারিত। তখন সে বুঝিতে পারিবে যে, মানব বুদ্ধি সেই সূক্ষ্মচিন্তার ক্ষেত্রে কত দুর্ব্বল, কত শক্তিহীন' তথাপি মানুষের চেষ্টার বিরাম নাই—সে অনবরত সৃষ্টির গুপ্ত রহস্য উদঘাটিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এইটিই মানুষের গৌরব। ইতিমধ্যেই সে দুইটি বিরাট সত্য আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে। প্রথমটি—এই জগতের সৃষ্টি ও পরিকল্পনায় আপাতদৃষ্টিতে নানা বৈষম্য দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে সকলের মধ্যে এক চমৎকার ঐক্যবন্ধন আছে। বিশ্ব যেন এক অখণ্ড বিরাট দেহ, যাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি একে অন্যের পরিপূরক। দ্বিতীয়টি—এই যে, জগতের সমুদয় নৈসর্গিক ও নৈতিক ব্যাপারই অপরিবর্ত্তনীয় কঠোর নিয়মের অধীন। প্রকৃতপক্ষে বৃষ্টি অথবা সুবাতাসের জন্য প্রার্থনা করা আর সূর্য্যকে মধ্যাকাশে অস্ত যাইতে বলা সমান হাস্যকর। বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা যতটা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, জীবিকার জন্য বা রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করাও ঠিক ততখানি নির্বুদ্ধিতার চিহ্ন। আবার রোগ মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা যতটা অজ্ঞতার লক্ষণ, মানসিক শান্তি বা পবিত্র হৃদয় লাভের জন্য প্রার্থনা করাও তথৈবচ। পৃথিবীর যাবতীয়

www.pathagar.com

ঘটনাই নিয়ম অনুসারে ঘটে। এমন কি যে সমস্ত কাজ মানুষের খামখেয়াল বা খোশমেজাজের উপর নির্ভর করে, তাহাও সমষ্টি হিসাবে ধরিলে মানুষের ইচ্ছার অধীনে নহে। একটি মানুষের জীবন একটি পরমাণুর মতই হেঁয়ালী যুক্ত। কিন্তু সমগ্র মানব সমাজ যেন গণিতের (Problem) হিসাবের ন্যায় সুনিয়ন্ত্রিত। ব্যষ্টি হিসাবে, সে ইচ্ছা শক্তিময় মানুষ, কিন্তু সমষ্টি হিসাবে সে কলের তৈয়ারী জীব, যাহার এরূপ ছাড়া অন্যরূপ হওয়া অসম্ভব ছিল।

বিশ্বের একত্ব একটা বৈজ্ঞানিক সত্য। ইহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে একটি মাত্র মহামন বলিয়া ধরিয়া লওয়া সদৃশ-যুক্তিমূলক অনুমান। এই অনুমান হয়ত মিথ্যা হইতে পারে, কিন্তু ইহাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসহ অনুমান। তথাপি ইহা অনুমান মাত্র। আর বাস্তবিক পক্ষে, ইহাতে আমাদের সমস্যার অপনোদন হয় না, সত্যাবিষ্কার বেশী দূর অগ্রসর হয় না। পৃথিবী যেন কচ্ছপের উপর অবস্থিত হইল, কিন্তু কচ্ছপ কিসের উপর আছে? এই নূতন প্রশ্ন উপস্থিত হয়। সেই মহামন অর্থাৎ 'আল্লা' যেন জগৎ সৃষ্টি করিয়া জাগতিক নিয়ম ঠিক করিয়া দিলেন। কিন্তু 'আল্লা' কোথা হইতে আসিলেন? ধর্ম্ম কারেরা বলিলেন, খোদা 'স্বয়ম্ভূত' অর্থাৎ নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করিয়াছেন। জড়বাদীরা বলিবেন, পদার্থ আপনা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু এ সমস্তই অসার কথা। বিস্ময় বিমুগ্ধ নির্ব্বাক বৈজ্ঞানিকের নিকট এসব কথার কোনই মূল্য নাই। এই সমস্ত ব্যাপার অসীমের ধারণার ন্যায় বর্ত্তমান মনুষ্য চিন্তার বহির্ভূত। আমরা কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে, আমরা যে সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন জ্ঞানান্বেষী হিসাবে আমাদের তাহা অনুসন্ধান করা উচিত ; এবং যে সমস্ত নৈতিক নিয়মের অধীন, নাগরিক হিসাবে তাহা পালন করা কর্ত্তব্য।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, একমাত্র আল্লাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করাই বৈজ্ঞানিক হিসাবে সর্ব্বাপেক্ষা কম আপত্তিজনক। কিন্তু একথা প্রথম ঘোষিত হইয়াছিল, সুসভ্য গ্রীকদের দ্বারা নহে, অর্ধ সভ্য বেদুইন আরবদের দ্বারা। প্রথমে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার বলিয়াই বোধ হয় যে গ্রীকেরা সর্ব্ব বিষয়ে প্রাচীন আরবদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ থাকিলেও, ঈশ্বরের একত্ব বিষয়ে—যাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান ও বুদ্ধির সাপেক্ষ, কেন আরবদের নিকট ঋণী হইল? কিন্তু উভয় দেশের প্রাকৃতিক অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই একথার উত্তর পাওয়া যায়। গ্রীস দেশ, নদী, উপত্যকা, ফল, মূল, লতা, পুষ্পে বিচিত্র ; আর আরবের রিক্ত প্রকৃতি মরুভূমি মাত্রেই পর্য্যবসিত। সুতরাং গ্রীকের মনে একক দেবতার কল্পনা করা কষ্টকর ও অস্বাভাবিক, আরবদের পক্ষে তেমনি বহুতার ধারণা করাই বিষয়। আরবের মরুভূমির মধ্যে হয়ত কতক গুলি পাথর এবং আকাশের চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। আমরা জানি আরববাসী প্রথমতঃ এই গুলিকেই দেবতা বলিয়া মানিত। প্রমাণস্বরূপ বলা যায় তাহাদের প্রাচীন রাজাদের এক উপাধি ছিল 'সূর্য্য-দাস'। বর্ত্তমান যুগেও প্রাভাতিক নক্ষত্রকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু এই দেশের বুদ্ধিমান লোকে চিরকাল, (অন্ততঃ ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতেই) এক খোদায় বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। একেশ্বরবাদকে আরব্য ধর্ম্ম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আরবদের এই

www.pathagar.com

একেশ্বর ধর্ম্মই, হজরত ইব্রাহিম, ইয়াকুব, ইউসুফ, মুসা, জশুয়া, সামুয়েল, সল, দাউদ, সুলেমান প্রভৃতির জীবন ঘটনার সংস্পর্শে কিরূপ পরিবর্ত্তিত ও বিকশিত হইয়ছিল, পরে তাহা হইতে কেমন করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্ম ও ইসলাম উদ্ভূত হইয়া সমুদয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, সে সমস্ত ইতিহাস চমৎকার হইলেও এখন বলিতে গেলে আপনাদের নিশ্চয়ই ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে। এজন্য আজ আর ক্রমবিকাশের শেষাংশের ঐতিহাসিক বিবরণ দিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে কোন দিন সে বিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াই আজ বিদায় লইতেছি।

www.pathagar.com

ইংরেজী সাহিত্যে রোমান্টিক যুগ

আনোয়ারুল কাদির এম.এ., বি.টি., বি.এল., বি.ই:স.

Poper-এর সময়ে নীতিগর্ভ উপদেশপ্রদ বা বিদ্রূপাত্মক কবিতা সমস্ত কাব্যজগতকে ছেয়ে ফেলেছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সমস্ত কবিতার আদর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ক্রমে কাব্য জগতে নূতনভাবের আবির্ভাব হয়। বাস্তবিক Pope–এর জীবনের মধ্যভাগ থেকে Cowber–এর The Task প্রকাশিত হওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত যে যুগ তাকে একটি পরিবর্ত্তনের যুগ বলা যায়। পূর্ব্বেকার যুগের কবিতার প্রভাব এখনও বিদ্যমান, কিন্তু নূতন উপাদানসমূহ, নুতন ভাবরাজি ঘনীভূত হতে থাকে, এবং কবিতার আকার ও আদর্শ বদলাতে আরম্ভ করে। ক্রমে কবির দৃষ্টি, কবিতার প্রসঙ্গ, ভাষা, ভাব, আদর্শ, আচার, ভঙ্গী সবই নূতন ভাব ধারণ করল যে যুগে, তাকেই ইংরেজী সাহিত্যের রোমান্টিক যুগ বলা হয়।

পরিবর্ত্তনের যুগে Johnson–এর 'London', 'Vanity of Human, Wishes', এর নীরস কবিতা of the grave এবং এডওয়ার্ড ইয়ং এর 'Night Thoughts' এবং 'The universal passion', 'The love of Fame', 'The Pleasures of Imagination' এবং অন্যান্য বিদ্রূপাত্মক কবিতা পাঠ করলে কুইন এ্যান–এর যুগের কবিতার সুর স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু এদিকে টমাস গ্রে উইলিয়ম কলিনস প্রমুখ কবিগণ গ্রীক কবিদের ধারা এবং ভঙ্গী পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে আরম্ভ করেন। এই সমস্ত কবির ভাষায় অনেক খানি কালের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এঁদের ভাষা অনেকটা কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক, কিন্তু উপরোক্ত উভয় কবিই সৌন্দর্য্যের উপাসক। অবশ্য কলিন্‌স এবং গ্রে উভয়ের মধ্যে কলিন্স–এর কবিতাই অপেক্ষাকৃত মধুর, সরস সরল। এই কবি কলিন্স–এর 'Ode to Simplicity' নামক কবিতাপাঠে কবিতা কোন দিকে ধাবিত হতে চাচ্ছে তা স্পষ্ট জানতে পারা যায়। কলিন্‌স–এর সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিতা 'Ode to Evening' কীটস–এর কবি প্রতিভার সমকক্ষতা করতে চায়, এবং এই কবির কল্পনাপ্রিয়তার কথা স্মরণ পথে আনয়ন করে। তাঁর অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কবিতা অনেক সময় কর্কশ, এবং প্রকাশ ভঙ্গিমা অপরিস্ফুট ; কিন্তু যখন আনন্দের স্পর্শে তাঁর প্রাণ উল্লসিত বা যখন শান্তির সন্ধানে তিনি বিষাদের ক্রোড়ে অধিষ্ঠিত, তখন তাঁর কবিতা সত্যের আলোতে প্রতিভাত এবং মাধুর্য্যবিমন্ডিত। অকাল মৃত্যু তাঁর প্রতিভাকে ষোল কলায় পূর্ণ হতে দেয় নি। অনেকটা ভিন্ন প্রকৃতির। তাঁর দৃষ্টি পরিষ্কার। কলিন্স–এর কবিতায় যে একটুখানি রহস্যের মধুর আবরণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, Gray–র কবিতায় তেমন কিছু দেখা যায় না। গ্রীক কবিগণের ভক্ত গ্রে গ্রীক কবিগণের নিকট ভাষার প্রাঞ্জলতা শিক্ষা করেছিলেন। কালের গুণে তাঁর কবিতা মানব জীবনের নৈতিক সমালোচনা এবং তত্ত্ব দিয়ে ভরা। তাঁর কবিতাও কষ্টকল্পিত। কিন্তু তাঁর সুবিখ্যাত কবিতা 'Elegy'তে সমালোচক কবি যে মানব প্রীতির আভাস দিয়েছেন, তাতে তাঁর কবি প্রতিভা তখনকার দিনের সাধারণ কবি প্রতিভার সঙ্গে বেমালুম খাপ খেয়ে যায় নি। সত্যের সঙ্গে যোগ থাকায় তাঁর অলঙ্কারযুক্ত কবিতাগুলি অস্বাভাবিকও নয়, নীরসও নয়। তিনি নানা প্রকার কবিতা

www.pathagar.com

লিখেছিলেন, কিন্তু তাঁর 'Ode' গুলি বিশেষ করে 'Progress of Poesy' কবি প্রতিভার বিকাশ' কালের প্রভাব অতিক্রম করেছিল। Gray-র সুবিখ্যাত সঙ্গীত চিরকালই ইংল্যান্ডের কাছে প্রিয় থাকবে। কবিতাটির যেমন রচনা-মহাত্ম্য তেমনি এটা ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার সৌন্দর্য্যে স্নাত। কবিতাটি চিন্তাপূর্ণ এবং হয়ত উত্তাপবিহীন। তথাপি মাঝে মাঝে বেশ আবেগ ও উচ্ছ্বাসপূর্ণ কল্পনার অভাবে এবং কালের প্রভাবে Gray-র কবি প্রতিভা পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হতে পারে নি। কিন্তু এই কবি নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সেতুর উপর তাঁর সমশ্রেণীর কবিদের সঙ্গে উজ্জ্বল আলোকে সগৌরবে দন্ডায়মান। পুরাতনের সাহায্যে আহরণ করে তিনি তাঁর গানে ও ছন্দে যে নূতন দৃষ্টি ফুটিয়েছিলেন, তা তিনি তাঁর পরবর্ত্তী কবিগণকে দান করে গিয়েছিলেন।

এ দিকে এলিজাবেথীয় কবিগণের এবং আরো পূর্ব্ব পূর্ব্ব কবিগণের যেমন চসার-এর কবিতার চর্চ্চা খুব আগ্রহের সাথে চলছিল। অবশ্য পূর্ব্বেও পোপ ও ড্রাইডেন উভয়ই শেকস্‌পীয়র ও চসার-এর কবি প্রতিভায় মুগ্ধ ছিলেন। কিন্তু তখন জিনিসটি একটু প্রসার লাভ করেছিল। পোপ এর ন্যায় গ্রেও ইংরেজী কবিতা সাহিত্যের একখানি ইতিহাস লেখার মতলব করেছিলেন। 'Progress of Poesy' তারই নিদর্শন। টমাস ওয়ার্টন ইংরেজি কাব্য সহিত্যের ইতিহাস লিখেছিলেন। কাব্য রসিকেরা চসার-এর সঙ্গে বেশ পরিচিত হতে আরম্ভ করলেন। Thomas Hammer, Warburton এবং Theohald-এর শেক্‌সপীয়র এর সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্যারিক আবার শেকস্‌পীয়র-এর নাটকসমূহের খাঁটি text (মূল রচনা) পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পেতে লাগলেন কতকগুলি কাব্যরসিক স্পেনসর-এর প্রতিভা অনুকরণ করে কবিতা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা পেতে লাগলেন। টমাস ওয়ার্টন স্পেনসর-এর 'Faerie Queene' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন। উইলিয়াম শেনস্টোন-এর 'The school mistress ও টমসন এর সুখপাঠ) ' Castle of Indolence', জেমস বিট-র 'The Minstrel'-এ সব স্পেনসারীয় ধরনের কবিতা।

'The Reliques of Ancient English Poetry' প্রকাশিত হওয়ায় অতীতের রহস্য জানবার জন্য কাব্যরসিকদের ব্যগ্রতা দেখা দিল। অতীতের অদ্ভুত কাহিনী, গাথা ইত্যাদি পরবর্ত্তী যুগের বিপুল প্রাণ কবি স্যার ওয়াল্টার স্কট-এর হাতে পূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছিল। উইলিয়াম হ্যামিন্টন (অফ ব্যাঙগুর) এর 'The Braces of yarrow এবং ম্যালেট এর Margaret পূর্ব্বেই রচিত হয়েছিল। কাব্য রসিকগণ ইতিহাসের অসভ্য যুগের মানব জীবনের অমার্জ্জিত, আড়ম্বর ও কৃত্রিমতা বিবর্জ্জিত সহজ ও স্বাভাবিক ঘটনাবলীর দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলেন। লোক-লোচনের অন্তরালের নগ্ন, হিংস্র বর্ব্বরতার দৃশ্যে এবং এসবে কবির আনন্দও ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হল। গ্রে-র The Norse Legend এবং Macpherson-এর জাল কবিতামালা 'The Ossian' এবং বালক কবি চ্যাটারটন-এর জাল কবিতা 'The death of sir Charles Baldwin' এবং অন্যান্য কবিতা যথেষ্ট পরিমাণে অদ্ভুত বানান ও নূতন ঢং-এর ছন্দোবদ্ধে রচিত এই কবিতাসমূহ কাব্য জগতে একটি আন্দোলন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৭ বৎসর বয়সে অকাল মৃত্যুর করাল কবলে নিপতিত হয়ে এই বালক কবির কবিতাসমূহের আদর যোগ্যতাকে অতিক্রম করেছে। কিন্তু তার কবিতাসমূহের সাথে রোমান্টিক অতীতের স্মৃতি বিজড়িত বলেই-এর এত আদর।

www.pathagar.com

রচনা ভঙ্গী বা ভাষা : এলিজাবেথের যুগের কবিদের সরল ভাষা পরবর্ত্তী যুগে তেমন আদৃত হয় নাই। তাই পরে পেপি ও ড্রাইডেনপন্থী সমালোচক কবিগণ অনুভূতিকে বাদ দিয়ে বুদ্ধির অনুমোদিত কতকগুলি বিধি পালন করেই আর্টের সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের ভাষায় জীবনের সাড়া ও উত্তাপের অভাব এবং এগুলির অভাবে আর্ট খর্ব্ব হয়েছিল, যদিও এই সময়ের কবিগণ বেশ কুশলী। যা হোক, ক্রমে স্বভাব ও আর্টের সামঞ্জস্য আরম্ভ হয়, এবং Cowper–এর গীতসমূহ যেমন 'Lines to mary Unwin' এবং 'The castaway'তে বেদনার এমন সহজ সরল অথচ অতলস্পর্শী গভীরতার সাক্ষাৎ পাই যার ভাষা গ্রীক বিষাদ নীতির ন্যায় সহজ ও সুন্দর। এখন আর্টের সঙ্গে স্বভাবের সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে, কিন্তু ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রবার্ট বার্নস–এর কবিতাসমূহের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কাব্য সাহিত্যে অনুভূতির প্রখরতা এবং অনুরাগের গাঢ়তা সম্যক প্রবেশ লাভ করে নাই।

কবিতা প্রসঙ্গ : কবিগণ সাধারণতঃ দুইটি বিষয়ে কবিতা লেখেন—মানব ও প্রকৃতি। পোপ–এর যুগ পর্য্যন্ত মানব জীবনই কবিতার প্রধান প্রসঙ্গ ছিল। আকাশ, বাতাস, জল প্রভৃতির সঙ্গে মানবের সম্বন্ধ ক্রমে কবিতা সাহিত্যে স্থান অধিকার করে বসল। এর পরে প্রকৃতি কবিতার একটি স্বতন্ত্র বিষয় হয়ে পড়লো।

গ্রাম্য দৃশ্যাবলী বর্ণনে কবি হৃদয় বিশেষ করে গীতি কবিগণের হৃদয় নেচে উঠত ; কিন্তু শেকস্পীয়র, মারভেল, মিল্টন, ভন, হেরিক প্রমুখ কবিগণের রচনায় প্রকৃতি শুধু প্রসঙ্গক্রমে আনয়ন করা হয়েছে। পোপ এর জীবিতাবস্থায়ই টমসন–এর 'The Season' প্রকাশিত হয়। এইটিতেই প্রথম প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বর্ণনা করা হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। এই কবিতায় বসন্ত, গ্রীষ্ম, হেমন্ত ও শীত এই চারি ঋতুর বর্ণনা ও গ্রাম্য জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে। টমসন–এর কবিতা প্রকাশ হওয়ায় কাব্য রসিকগণের দৃষ্টি গ্রাম্য দৃশ্যাবলীরদিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁরা শহর থেকে গ্রামে গিয়ে তথাকার নয়ন তৃপ্তিকর দৃশ্যাবলী দেখে হৃদয়ে যে আনন্দ অনুভব করছিলেন, তাই কবিতায় ব্যক্ত করতে শুরু করলেন। ডায়ার এর 'Grongar Hill' এবং 'The Fleece' এইরূপ কবিতার নমুনা। দেশ বিদেশ ভ্রমণের ফলে প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ বর্ধিত হতে থাকে, এবং ইংল্যান্ড ভূমির বন, জঙ্গল ও বন্য স্থানসমূহ পরিদর্শনের জন্য এক অভিনব ব্যগ্রতা দেখা দিল। গ্রে–র পত্রসমূহে ইয়র্কশায়ার ও ওয়েস্টমোরল্যান্ড–এর দেশচিত্র চমৎকার সূক্ষ্মভাবে লিখিত হয়েছে। এগুলি ইংরেজী সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব সম্পদ এবং অভিনব ব্যাপার। কিন্তু প্রাকৃতিক বর্ণনা গ্রে–র কবিতার ভূষণ মাত্র, প্রাকৃতিক বর্ণনা কবিতার বিষয় নয়। মানব জীবন সম্বন্ধে নানা কথা এবং নৈতিক উপদেশ এই সব কবিতায় রয়েছে। Collins–এর 'Ode on the Passions' এবং 'Ode to Evening'ও এই ধরনের কবিতা। এখন পর্য্যন্ত প্রকৃতির প্রতি প্রকৃত অনুরাগ জন্মে নাই। Goldsmith 'The Traveller' এবং 'The Deserted Village' এ সম্বন্ধ আর একটু অগ্রসর হয়েছে। অবশ্য প্রকৃতি বর্ণনায় Collins–এর কবিতায় যে আবেগ দেখা যায় এখানে সে আবেগ নাই বটে কিন্তু Goldsmith–এ নৈতিক উপদেশ একটু কম। যে সব দৃশ্য তিনি চিত্রিত করেছেন—সেগুলি কেবলই চিত্র মাত্র—তাতে ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই। এর পর Warton নামক কবিদ্বয় আরও একটু অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের কবিতায় দেখা যায় যে, তাঁদের নিজেদের অনুভূতিগুলি বন–জঙ্গল, নদী–নালার মধ্যে তাঁরা প্রতিফলিত দেখছেন এবং এই নির্জ্জন প্রকৃতির মধ্যে আত্মজ্ঞানবিশিষ্ট আনন্দ ক্রমে কবিতার প্রধান বিষয় হয়ে পড়ল। ক্রমে

www.pathagar.com

Cowber—এর পরবর্ত্তী কবিগণের মধ্যে প্রকৃতির প্রতি নিজস্ব গাঢ় অনুরাগ দেখতে পাওয়া যায়। Games Beattiee—র 'The Ministrel'—এ এর বেশ আভাস পাওয়া যাচ্ছে। কেবল মাত্র প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রতিপালিত এক যুবক কবি কেমন করে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়েছিল, এই কবিতায় তারই একটি চিত্র আঁকা হয়েছে। ভূবন বিখ্যাত তাপস কবি Wordsworth তাঁর 'Prelude'—এ প্রকৃতির কাছে তিনি কেমন করে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তার যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেই বর্ণনার সঙ্গে এই কবিতার বর্ণনার খুব মিল।

এই সময়ে জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে মানবের কল্যাণের দিকে কবির হৃদয় আকৃষ্ট হয়। প্রথমে কবিগণ ইংল্যান্ডের বাহিরের অন্যান্য জাতির মানবের কল্যাণ সম্বন্ধে বেশ আনন্দ পেতে লাগলেন। আর একদিকে দীন দরিদ্র মানব জীবনের প্রতি গভীর সহানুভূতি কবির প্রাণে অনুভূত হতে থাকে। মক্কার তীর্থযাত্রী এবং সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসিত পুরুষের প্রতি Thomson—এর যথেষ্ট সহানুভূতি দেখতে পাওয়া যায়। Goldsmith—এর 'The Traveller' ও দেশ-বিদেশের নানারূপ কঠিন সমস্যার মীমাংসার জন্য ব্যগ্র। Goldsmith—এর 'The Deserted village', —এর 'The School Mistress' এবং Gray—র 'Elegy'তে সব দীন দুঃখীদেরই ইতিহাস। Michael Bruce তাঁর 'Lochheven'—এ গ্রাম্য জীবনের 'Secret Primrose Path'—এর কথা বর্ণনা করেছেন এবং Dr John Longhourne তাঁর 'Country Justice'—এ গরীব দুঃখীদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন এবং তাঁদেরই দুঃখময় জীবনের চিত্র আঁকতে চেষ্টা পেয়েছেন ; আর এই সঙ্গে Shenstone—এর 'Jemmy Dawson', 'Marner's Wife' এবং Goldsmith—এর 'Edwin and Angelina' এই কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করা উচিত। এই সকল কবিতায় দেখতে পাই এই সব গরীবদের সহজ, সরল এবং অনাড়ম্বর প্রেম কাহিনী। এই সমস্ত গীতি গাথা রোমান্টিক যুগের মুকুট স্বরূপ। এ সব Wordsworth—এর Lyrical Ballads—এ পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে।

এই সময়ে স্কটল্যান্ডের কয়েক জন কবিও এই ধরনের কবিতা লিখেছিলেন। পোপ Gray—র বন্ধু Allan Ramsay গ্রাম্য নায়ক 'The Gentle Shepherd'—এ গরীব দুঃখী চাষী ও রাখালগণের প্রেমের চিত্র নিপুণ হস্তে অঙ্কিত করেছেন। 'Yarrow Poems'—এ, 'Auld Robin Gray'-তে এবং 'The Lament for Elodden'—এ স্কটল্যান্ডের প্রিয় সহচর গাথা সহিত্য কিছু আধুনিক ভাব ধারণ করলেও তা যে অধিকতর মর্ম্মস্পর্শীভাবে রচিত তাতে কোন সন্দেহ নাই।

যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ও নূতন উপাদানসমূহের কথা এখানে বলা হয়েছে, সে গুলি যে সব কবির ভিতর স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, তাঁদের নাম Cowper, Crabbe এবং Burns. এই সব কবিগণের কথা আলোচনা করার পূর্ব্বে কবি-শিল্পী Blake—এর কবিতাসমূহের কথা তিনটি কারণে উল্লেখ করা উচিত। প্রথমতঃ রোমান্টিক যুগের নূতন উপাদানসমূহ এখানে পাওয়া যাচ্ছে। ১৭১৭ সালে লিখিত 'The Poetical Sketches' দ্বারা বোঝা যাচ্ছে Elizabeth—এর যুগের কবিগণের আদর এবং তাদের কবিতার চর্চ্চা কতখানি বেড়েছে। এক দিকে Blake যেমন Spenser—এর অনুকরণ করেছিলেন, আর এক দিকে তাঁর 'Edward III' নামক সংক্ষিপ্ত খন্ড নাটকে Marlowe—র প্রচন্ড উত্তেজনা ও উগ্র কল্পনার সন্ধান পাওয়া যায়। Blake—এর 'The Muses' নামক ছোট্ট কবিতাটিকে পুরাতন

www.pathagar.com

ইংরেজী কাব্য সাহিত্যের কবিগণের কবিজনোচিত গাঢ় অনুরাগ বিলুপ্ত হয়েছে এবং তার পুনরুদ্ধার হওয়া দরকার এই সম্বন্ধে একটি সকরুণ ক্রন্দন। কতকগুলি গাথা গীতিতেও Macpherson–এর 'Ossian' এবং Percy–র 'The Reliques'–এ পুরাতনের প্রতি যে গাঢ় অনুরাগের সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিচয় আমরা পাই। দ্বিতীয়তঃ শুধু মানবপ্রীতি নয়, জীব–জন্তু প্রীতি (Love of animals), শিশুর প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ এবং গৃহ সম্বন্ধে কবিতা—এখন এই সমস্ত রোমান্টিক যুগের উপাদানসমূহের মধ্যে রয়েছে। Blake–এর কবিতায় এই সবই দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণ, অনাড়ম্বর জীবনের সহজ সরল কবিতা ১৭৯৮ সালে Words-worth–এর Lyrical Ballads–এ যে উৎকর্ষ লাভ করেছিল, যথাক্রমে ১৭৮৯ ও ১৭৯৪ সালে লিখিত Blake–এর 'Songs of Innocence and Experience'–এ তার পূর্ব্বাস্বাদ পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ডেমোক্রেটিক ভাব, কুটিল যাজকতার প্রতি ঘৃণা এবং সামাজিক গলদসমূহের বিরুদ্ধে চীৎকার তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। তখন একজন সম্পূর্ণ mystic, এবং তাঁর এই Mysticism–এর মধ্যে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে এবং true theology সম্বন্ধে যে সন্ধানপরতা দেখতে পাওয়া যায়, রোমান্টিক যুগের পরবর্ত্তী যুগের কবিতার এই সন্ধানপরতাই একটি বিশেষ গুণ। তৃতীয়তঃ তাঁর গানে এলিজাবেথীয় কবিগণের ভাব, ভাষা পুনর্জীবিত হয়েছে। 'Songs of Innocence'–এর ছোট ছোট কবিতাগুলি এত সহজ, সরল ও মধুর যে সমগ্র ইংরেজী ভাষার সাহিত্যে এ সবের সমকক্ষ কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া দায়। 'Infancy', 'The first Motherhood' এবং 'The lamb' নামক কবিতাগুলি বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। যা হোক, এলিজাবেথীয় গীতিকাব্যের পুনরুদ্ধার এবং Wordsworth–এর নীতিকাব্যের আভাস উভয়ই Blake–এর মধ্যে পাওয়া যায়।

ধর্ম্মপ্রাণ Cowper–এর 'John Gilpin' নামক কবিতা বেশ একটু নূতন ধরনের। পরবর্ত্তী কবিগণ এ ধরনের কবিতা কিছু কিছু লিখেছেন, কিন্তু উল্লিখিত কবিতায় যে হাস্যরসের ভাব পরিলক্ষিত হয় তার সঙ্গে Cowper–এর রচনায় একটি সহজ সরল করুণার ভাব জড়িত। এ বিষয়ে Cowper একজন বিখ্যাত শিল্পী। তাঁর 'Lines to Mary Unwin' এবং 'Mother's Picture'–এর প্রতি কবিতা পাঠ করলে বেশ বুঝতে পারা যায় আড়ম্বর বিমুক্ত, বিশুদ্ধ স্বাভাবিক ভাব ইংরেজী গানের রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এ ছাড়া Blake ও Cowper উভয়ই জীব প্রেম এবং জীবের সঙ্গে, মানবের সঙ্গে সম্বন্ধ বিষয়ে যে নূতন ভাব কবিতা-সহিত্যে ফুটিয়েছিলেন, তার সুরে পরবর্ত্তী কবিদের বীণা বেজে উঠেছিল। Cowper–এর সর্ব্ব প্রধান রচনা 'The Task' ১৭৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। এ কবিতায় আমরা তাঁর নিজের জীবনের একটি বর্ণনা পাঠ করি। সঙ্গে সঙ্গে অনাড়ম্বর গ্রাম্য জীবনের ছবি, আশপাশের গরীব দুঃখীদের কথা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক তত্ত্বসমূহ এবং সর্ব্বশেষে ভগবানের জয়ের কথা দেখতে পাই। এখানে যে পরিবর্ত্তন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সে অতি বড় পরিবর্ত্তন। প্রকৃতির প্রতি কবির দৃষ্টি বদলে গেছে। প্রকৃতিই কবিতার একটি স্বতন্ত্র বিষয় এবং প্রকৃতির প্রতি Cowper–এর যে অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে সে অনুরাগ স্বাধীন এবং পরিবর্ত্তনও খুব বড়। সমগ্র মানবজাতিকে এক করে দেখতে কবিরা যে চেষ্টা করেছিলেন, Cowper–এর মনে সেই ভাবটা পূর্ণ পরিণতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। পরবর্ত্তী কবিগণ এই ভাবের উজ্জ্বলতা ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন

www.pathagar.com

করেছেন বটে, কিন্তু এ সম্বন্ধে সকলেরই অগ্রণী। তাঁরই ভাবরাজি পরবর্ত্তী কবিগণের বীণার তারে ঝংকৃত হয়েছে।

Cowper–এর মত George Crabbe মানব সম্বন্ধে কবিতা লিখেছিলেন। 'The Village' এবং 'The Parish Register'–এ দীন দুঃখীদের ত্যাগ স্বীকার, তাদের প্রলোভনসমূহ, প্রেম, অপরাধ, পাপ ইত্যাদির গ্রাম্য কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই সমস্ত কবিতা পাঠ করলে পাঠকের মানব প্রীতি যে বর্ধিত হবে তাতে কোন সন্দেহই নাই। গরীব চর্ম্মকার কবি Rober Bloomfield ও এই ধরনের কবিতা রচনা করেছে। Bloomfield–এর কবিতাসমূহ Crabbe–এর কবিতা অপেক্ষা অনেকখানি আনন্দদায়ক। Crabbe একটু কঠোরতাপ্রিয়, কিন্তু উভয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য–বর্ণনায় বেশ সত্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আর এক ধরনের কবিতা যা রোমান্টিক যুগের অন্যতম উপাদান Restoration এর ইংরেজী কাব্য সাহিত্যে আর দেখা যায় নি, Robert Burns কতকগুলি উত্তেজনাময় প্রেমের কবিতা লিখে এই অভাব দূর করেন। Elizabelh–এর যুগে যে সুর সমস্ত জগতকে মুগ্ধ করেছিল Robert Burns–এর কবিতায় সেই সুর ঝংকৃত হয়েছে। বরং Burns–এর সুর বেশি পরিষ্কার, সহজ, অথচ সরল এবং স্বাভাবিক। প্রেমের কবিতা দিয়েই Burns–এর কাব্য জীবন আরম্ভ হয়েছিল। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর কাব্যের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কিন্তু তিনি শুধু প্রেমের কবি নব। মানব সম্বন্ধে যে সমস্ত নূতন দৃষ্টি জগতের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছিল Burns সেই দৃষ্টি নিয়ে বহু কবিতা লিখেছেন। নিজে দরিদ্র, তাই দরিদ্রের গান তিনি গেয়েছেন। Crabbe ও Cowper ইংল্যান্ডে বসে গরীব দুঃখীদের দুঃখের চিত্র আঁকতে চেষ্টা পেয়েছিলেন। Burns ও স্কটল্যান্ডে ঐরূপ চেষ্টাই করেছিলেন। জীবে দয়াও Burns–এর কবিতার অন্যতম বিষয়। The Revolution–এই প্রসঙ্গে ফরাসী বিপ্লবের কথা একটু বলা দরকার। কয়েক শতাব্দী যাবৎ ইউরোপ মহাদেশ খন্ডে সমগ্র মানব জাতিকে এক করে দেখার জন্য মানুষের মনে যে সব ভাবের উদয় হয়েছিল কাউপার, ক্র্যাব এবং Burns লিখিত কবিতায় আমরা তার পরিচয় পাই। এই সমস্ত ভাবের মর্ম্ম এই যে, মানুষকে কৃত্রিমতা বর্জ্জিত নগ্ন, স্বাভাবিক জীবনকে পুনরায় বরণ করে নিতে হবে। শহরের অস্বাভাবিকতা–পীড়িত জীবন অপেক্ষা গ্রামের শান্ত এবং কবিতার সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষয় হয়ে পড়ল। এই প্রসঙ্গে আবার মানবের স্বাভাবিক অধিকারের কথা উত্থাপন করা হয়। সকল মানুষ সমান, ভাই ভাই এবং সকলেই স্বাধীন। সুতরাং মানবের একটি মাত্র শ্রেণী–মানব শ্রেণী, এবং একটি মাত্র জাতি—মানব জাতি। প্রত্যেক মানুষই এই সমগ্র মানব জাতির এক জন, এবং তুল্য অধিকারী। ধন সম্পত্তি, পদ–মর্য্যাদা, জাতি এবং বর্ণবিভাগ নিতান্ত গর্হিত ও অন্যায় বলে পরিত্যাজ্য। এই সব অবশ্য নূতন নয়, রেনেসাঁর যুগ হতে এ সব চলে এসেছে। কি ধর্ম্ম, কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি—সকল বিষয়েই মুক্তির জন্য রেনেসাঁয় যে ব্যগ্রতা দেখা দিয়েছিল তাই এই ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে প্রকট হয়ে উঠল। কোনো কিছু গড়ার ব্যাপারে ফ্রান্সই ইউরোপের মধ্যে অগ্রণী। ফরাসী সাহিত্যে সর্ব্বদা সব মানুষ সমান, মানুষে মানুষে প্রভেদ নাই, এবং তারা সকলেই স্বাধীন ইত্যাদি কথা লিখিত ও পঠিত হত। এখন ফলেও পরিচয় পাওয়া গেল ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে Bastile–এর ধ্বংস সাধনে এবং পরবর্ত্তী যুগের নূতন Constitution–এর ঘোষণা দ্বারা। এ সব আন্দোলনকে ইংল্যান্ডে যে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল, তাই নিয়ে রোমান্টিক যুগের কবিগণ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁদের কবি প্রতিভার

www.pathagar.com

খোরাক এখান থেকেই সংগ্রহ হয়েছিল। Wordsworth, Southey এবং Coleridge এই তিন জন কবির হৃদয় প্রথমটা এই সমস্ত আন্দালনে নেচে উঠেছিল। কিন্তু অচিরেই The Reign of Terror–এর অত্যাচার ও অনাচার, এবং নেপোলিয়ন এর সম্রাটজনোচিত প্রভূত্ব দেখে তাঁরা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন, এবং পিছে হটে যেতে বাধ্য হলেন। Scott মর্ম্মবেদনায়, বিপ্লবকারিগণ যে অতীতকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, সেই সুন্দর রহস্যময় রোমান্টিক অতীতের সম্বন্ধে লিখতে আরম্ভ করলেন। Byron বিপ্লববাদীদের সঙ্গে পুরোপুরি এক মত না হলেও সামাজিক সংস্কারের প্রচলিত রুচির বিরুদ্ধে বিপ্লববাদীদের মূল মন্ত্র কেমন করে কার্য্যকরী হয়েছিল, তা তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন। বিপ্লববাদীদের পক্ষই সমর্থন করেছেন, কিন্তু তা বিপ্লববাদীদের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল সে প্রতিক্রিয়া যখন থেমে গিয়েছিল তার পর। অবশ্য রোমান্টিক যুগের আর দুই জন কবি Rogers এবং Keats বিপ্লববাদীদের সঙ্গে কোনরূপ সম্বন্ধ রাখেন নাই। এঁদের রচনায় একটি নূতন সুর বেজে উঠেছে। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সে সুর। এ দুজন পরম দরদী কবির রচনায় যে বেদনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তাতে মানুষের মনে এক নূতন আগুন জ্বলে উঠেছিল এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য্য এক নূতন আলোতে প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল। Lowell বলেছেন, 'Keats influenced the forms of succeeding poets.'

www.pathagar.com

স্থাপত্য-চর্চ্চায় মুসলমান

আবদুল মঈদ চৌধুরী বি.এ.

আদিম যুগে মানুষ যখন শীত গ্রীষ্মের অত্যাচার হতে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবার উপায় উদ্ভাবন করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সেই কাল হতে আজ পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মের, সভ্যতার অনুযায়ী মানুষ তার আবাস গৃহ নির্ম্মাণ-কৌশল উন্নত করতে চেষ্টা করেছে। আবাস গৃহ হতে ক্রমে উপাসনা গৃহ, মিলন গৃহ, পাঠাগার ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যা প্রয়োজন হয়েছে তা স্থায়ীরূপ পেয়েছে স্থাপত্য শিল্পে। Aesthetic Sense বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তার স্থাপত্য শিল্পকে, দালান এমারতগুলিকে নানা রকম কারুকার্য্য ও নির্ম্মাণ নৈপুণ্যে মনোরম করে নিতে চেষ্টা করেছে। এই নির্ম্মাণ নৈপুণ্যে যে জাতি যতখানি দক্ষতা দেখাতে পেরেছে তারা স্থাপত্য শিল্পে ততখানি উন্নত বলে স্বীকৃত হয়ে গেছে। নির্ম্মাণ নৈপুণ্যের দিক দিয়া, ইট পাথরের মধ্যে চিক্কন অথচ জটিল কারুকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করার দিক দিয়ে মুসলমান কতখানি উন্নতি লাভ করেছিল তাহা দেখানই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

Moslem archititure বা মুসলমান স্থাপত্য বলতে কি বুঝতে হবে তা প্রথমে দেখা উচিত। Russel 'History of architecture'-এ লিখছেন, '.........' অর্থাৎ আরবের প্রকৃত সেমেটিক ছিল, তাই বলে স্থাপত্য বিদ্যায় তাদের জাতিগত কোন মৌলিকতা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানেরা যে দেশে গিয়েছে সেই দেশের তখনকার স্থাপত্যশিল্পের ধারাকে নিজের আদর্শ, ভাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্ত্তন করে তার নূতন পথে পরিচালিত করেছে। স্থাপত্য শিল্পে মুসলমানদের গৌরব সৌন্দর্য্য রচনা ও কারুকার্য্য নিজেদের নির্ম্মাণ-কৌশলের চরম উৎকর্ষতার দিক দিয়া। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দের পর মুসলমান প্রাধান্যের যুগে মরুময় আফ্রিকা হতে পারস্যের সীমারেখা পর্য্যন্ত নূতন যুগের যে শিল্প পরিপুষ্টতা লাভ করে তা আগের যুগের শিল্পই নূতন অবস্থায় পরিবর্ত্তিত হয়ে আসে। এ যুগে প্রধানতঃ বাইজেনটাইন শিল্পকে আদর্শ করা হয়েছিল। কিন্তু মুসলমানদের রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্ম্মগত ও জাতিগতবিশেষ প্রয়োজন অনুযায়ী বাইজেন্টাইন ও পারস্যের শিল্পের সংশোধন করে নেওয়া হয়েছিল। প্রথম কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত মুসলমান আধিপত্য স্থাপত্যের যে উন্নতি হয়েছিল তাতে মুসলমানেরা কারুকার্য্যে পুরাতন নমুনার (design) কোন পরিবর্ত্তন আনয়ন করে নাই। কিন্তু অন্যদিকে এই সময়ে রোমান রাজ্যে বাইজেন্টাইন শিল্পে যথেচ্ছ উন্নতির চেষ্টা হয়েছিল এবং সৌন্দর্য্য রচনায় (decorative design) এক অভিনব পরিবর্ত্তন আনয়ন করেছিল। মুসলমান স্থাপত্যের বিষয় বলতে গেলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধরনের স্থাপত্য মুসলমান কি করে নিজের আদর্শ ও প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে নিয়েছে তার ধারাবাহিক বর্ণনা দিতে হয়। কিন্তু এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য

www.pathagar.com

মুসলমান স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের ধারাবাহিক বর্ণনা দেওয়া নয়, এখানে শুধু মুসলমান স্থাপত্যের বিষয় মোটামুটি একটি ধারণা সৃষ্টি করে এই বিচারের বিশদভাবে আলোচনায় সূচনা করাই উদ্দেশ্য।

বিভিন্ন দেশের স্থাপত্য-বিদ্যায় প্রয়োজন ও আদর্শমত পরিবর্ত্তন করে মুসলমান তার নিজের একটি বিশেষ Style বা ধরনের সৃষ্টি করেছিল। এই ধরনকে সাধারণত Saracenic Style বলা হয়। Stalactite vaulting বা ইট পাথর ছাড়া ছাদ এই ধরনের প্রধান বিশিষ্ট অঙ্গ। মুসলমান স্থাপত্যের এই বিশিষ্টতা স্পেনের পশ্চিম সীমা হতে ভারতের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুসলমান স্থাপত্যকে এক বিশেষ রূপ দান করেছে। খলিফা হারুণ অল রশিদের পত্নী জুবেদার সমাধিতে ৮ম শতাব্দীর শেষ ভাগে এই বিশেষত্ব প্রথম দৃষ্ট হয়। এই বিশিষ্টতা ছাড়া Pointed arch কোণাকৃতি খিলান Horse shoe arch বা অশ্বক্ষুরাকৃতি খিলান দেওয়াল গাত্রে ও মারবেলে সাজানো কাজ মুসলমান ধরন বা Style এর বিশেষত্ব।

মুসলমানদের সাধারণ ইমারত হতে মসজিদগুলিকে এক বিশিষ্টরূপ দেওয়া হয়েছে। মিহরাব, মিম্বর, মিনার, গম্বুজ মকসুরা arch বা ও লিওয়ানের মসজিদের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে সৃষ্টি করে এ পার্থক্য করা হয়েছে। প্রথমে সামান্য কোন চিহ্ন দিয়ে কাবার দিক নির্ণয় করা হত। অনেক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে ক্রমে মিহরাবের বর্ত্তমান রূপ হয়েছে। মদিনার মসজিদে হজরত প্রথম দাঁড়িয়েই ওয়াজ করতেন, পরে তিন সিঁড়ির এক খানা কাঠের আসন তৈরি করে তার উপরে বসে ওয়াজ করতেন। নীচের দুই সিঁড়িতে আবুবকর ও ওমর বসতেন। এই আসনের অনুকরণে মিম্বর তৈরী হয়। এবং মসজিদের একটি বিশেষ অঙ্গ বলে গৃহীত হয়। মদিনার প্রথম মসজিদে কোন মিনার ছিল না। মোয়াজ্জিন 'বিলাল' একটি স্তূপের উপর হতে বিশ্বাসিদিগকে প্রার্থনার জন্য আহ্বান করতেন। মুসলমানদের রাজ্য জয়ের সঙ্গে জাঁকজমকের দিকে তাঁদের মন আকৃষ্ট হয় ও আজান দেওয়ার জন্য মিনার তৈরী হয়।

মদিনার প্রথম মসজিদের গম্বুজ ছিল না। গম্বুজ সৃষ্টির ধারণা মুসলমানরা কোথা হতে পেয়েছিলেন তা বলা কঠিন। Scracenic archiecture-এর উন্নতির যুগে মেসপটমিয়ার ইমারত হতে গম্বুজের Plan গ্রহণ করা হয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস। সিরিয়া, মেসপটমিয়া ও ইজিপট হতে arch-এর নমুনা গ্রহণ করা হয়েছিল। খৃষ্টীয় গির্জ্জাগুলি হতে 'লিওয়ানে'র ও মকসুরার প্রচলন করা হয়। মসজিদের ভেতরে বেড়া দিয়ে আলাদা করে রাখা জায়গার নাম মকসুরা। ভারতের মসজিদগুলিতে ইহার প্রচলন দেখা যায় না।

নিজ ব্যবহারের জন্য নির্ম্মিত মদিনার বর্ত্তমান মসজিদ আরব মরুর পয়গম্বরের প্রথম স্থাপত্য। উপাসনালয় হিসাবে হজরত ইব্রাহিমের উপর স্থাপিত কাবাই মুসলমানদের প্রথম ইমারত। Tuckerman লিখিয়াছেন "The kaaba has less importance as an architectural production than as the centre of the wheel of Mohammedanism." মুসলমান জগতে কাবার ধর্ম্মগত বিশেষ প্রয়োজনীয়তা থাকলেও স্থাপত্য হিসাবে কাবার কোন বিশিষ্টতা নাই। মসজিদ নির্ম্মাণ বিষয়ে কোন ধর্ম্মগত

www.pathagar.com

আদেশ না থাকাতে মুসলমানদিগকে রাজ্য জয়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রয়োজন মত বিজিত দেশের স্থাপত্য শিল্পের পরিবর্ত্তন করে নিতে হয়েছিল। কোন কোন স্থলে মুসলমানেরা অন্য জাতীয় উপাসনা গৃহের সামান্য মাত্র পরিবর্ত্তন করে তথা মিহরাব তৈরী করে ও আনুসঙ্গিক পরিবর্ত্তন সাধন করে তাহা মসজিদে পরিণত করে নিয়েছিল। হজরতের নির্ম্মিত মদিনার মসজিদে যে কোন স্থানেই অনুকরণ করা হয় নাই তাহা নহে, সাদ বিন আবু আব্বাস দ্বারা নির্ম্মিত কুফার সুবৃহৎ মসজিদে পারস্যের ধরনের অনুকরণ করা হলেও, কুফার দ্বিতীয় মসজিদে মদিনার মসজিদকেই আদর্শ করা হয়েছিল। প্রধানতঃ বাইজেনটাইন, গ্রীক ও রোমান ধরন বা Style-এর অনুকরণ করে মুসলমানেরা নিজেদের ধরনের সৃষ্টি করেছিলেন। তুর্কী, এশিয়া মাইনর ও পারস্যের মসজিদগুলির ও বাইজেনটাইন গির্জ্জাগুলির মধ্যে অনেক স্থলে সমন্বয় দেখা যায়। কনষ্টানটিনেপলের প্রায় সব মসজিদই St. Sophia-র অনুকরণে নির্ম্মিত।

প্রথম যুগের মুসলমান স্থাপত্যের প্রধানত : চারটি ভাগ করা যায়। যথা : সিরীয়, মিশরীয়, পারসিক, নর্থ আফ্রিকান, হিসপানোমুরীয়।

সিরিয়ায় মুসলমান স্থাপত্যের প্রধান কীর্ত্তি জেরুজালেমের কুব্বত উছ ছখরা (dome of the rock) নামীয় খলিকা ওমরের নির্ম্মিত মসজিদ, দামেস্কে ওলিদের মসজিদ ইত্যাদিতে রোমানো-পারসিক ধরনের পুরাপুরি অনুকরণ করা হয়েছে। এই মসজিদগুলির স্তম্ভের নমুনা রোমান ও গ্রীক উপাসনালয় হতে গ্রহণ করা হয়েছিল। খলিফা ওলিদ St. Jhon the Baptist এর গির্জ্জার উপর যে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন তাতে তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী সম্রাট জানটিয়ান প্রেরিত সাজসরঞ্জাম ব্যবহার করেন। মসজিদগুলিতে অন্য ধরনের অনুকরণ করলেও সিরীয় মুসলমানরা স্থাপত্য বিদ্যায় এতই পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন যে কারবালার মসজিদের মিনার তৈরীতে তাঁরা যে নির্ম্মাণ কৌশলের পরিচয় দিয়েছিলেন তাহা ইউরোপে একেবারেই বিরল।

মিসরীয় মসজিদগুলির পরিকল্পনায় আমরা একটি বিশষত্ব দেখতে পাই। প্রায় মসজিদেই প্রধানতঃ একটি প্রাঙ্গণ মোসাফিরদের জন্য গৃহ, গোসলখানা ও উটের আস্তাবল সংলগ্ন আছে এবং আরবী সোনালী অক্ষরে সমস্ত মসজিদগুলিই সাজান। কায়রোর মসজিদ-গুলিতে Horse shoe arch বা অশ্বক্ষুরাকৃতি খিলান-এর খুব ব্যবহার দেখা যায়। এখানে আমরুল ইবন অল আছ-এর মসজিদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রথমে Horse shoe arch এর যে সব মসজিদে ব্যবহার করা হয় তন্মধ্যে আবুতুলুনের সুসজ্জিত মসজিদ অন্যতম। Four centred arch বা একটি প্রাথমিক নমুনা কারুকার্য্যও সুচিক্কন সৌন্দর্য্য রচনার জন্য অতুলনীয় মালেক এল ছালেহর মসজিদে দেখা যায়। এখন এই মসজিদটি পারিবারিক আবাসে পরিণত করা হয়েছে। কায়রোর মুয়ায়াদের মসজিদের কারুকার্য্য ও আল বেরদুনির মসজিদের মারবেলের জোড়া এতই উন্নত ধরনের যে তাহা মিশরে মুসলমান স্থাপত্যের উন্নতির পরাকাষ্ঠার প্রমাণ দেয়। এই সময় মুসলমানরা অঙ্কনের কাজে, মার্ব্বেল পাথরের সুনিপুণ কাজেও পাথরের লেস দিয়ে রচনায় বিশেষ পারদর্শী হয়েছিলেন। কায়রোর সুপ্রসিদ্ধ আল আজহার ও আক্তার-এ নবী মসজিদের স্তম্ভের নমুনা গ্রীক এবং

www.pathagar.com

রোমান, উপাসনালয় হতে গ্রহণ করা হয়েছে। আল আজহারের স্থাপত্য হিসাবে এখন কোন বিশেষত্ব নাই।

৬৫৫ খৃষ্টাব্দ হতে ৬৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরবেরা উত্তর আফ্রিকা অধিকার করেন। উত্তর আফ্রিকার ভৌগলিক অবস্থিতি, বাইজেনটাইন পুনরাধিকার ও মরুভূমির সম্প্রদায়গণের সাথে সীমান্তের যুদ্ধবিগ্রহের জন্য খুব শীঘ্রই এখানে মুসলমানের কোন ধরন সৃষ্টি হয় নাই। ৭১০ খৃষ্টাব্দ হতে স্পেন বিজয় আরম্ভ হয় এবং ইহার পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্যে প্রকৃত মোসলেম ধরনের সৃষ্টি হয়। কর্ডোভার সুবৃহৎ মসজিদে এই ধরনের পূর্ণতা দেখা যায়। পশ্চিমে মুসলমানদের কেন্দ্র সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কর্ডোভার মসজিদ স্থাপিত হয়। এই মসজিদ যাতে স্পেনে স্থাপত্য হিসাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হতে পারে তার জন্য মুসলমানেরা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। মুরগণ এ সময়ে স্থাপত্য বিদ্যায় এক অভিনব উন্নতি আনয়ন করেন। ঘেভিলিতে আলকাজার, গ্রানডাতে আলহামরা প্রাসাদ তাঁদের শিল্পকার্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আল্‌হামরা ও জারাগাজার ভগ্ন মসজিদ ব্যতীত স্পেনে মুসলমান স্থাপত্যের আর বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। যে সকল মসজিদ এখন গির্জ্জাতে পরিণত করা হয়েছে তার এতই পরিবর্ত্তন করা হয়েছে যে, তাতে আর মুসলমানের বিশেষত্বের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। মোসলেম নির্ব্বাসনের পর এখনও সিসিলি, ইটালি ও স্পেনে মুসলিম স্থাপত্যের প্রাধান্যের নমুনা পাওয়া যায়। সিসিলির Cataldo ইত্যাদি কয়েকটি গির্জ্জাতে Saracenic style এর অনুকরণ করা হয়েছে। ইটালি ও স্পেনে Horse shoe arch এর খুব প্রচলন দেখা যায়।

৬৪২খৃষ্টাব্দে পারস্য জয় করা হয়। রোমানদের পর স্থাপত্য শিল্পে বিশিষ্টতা লাভ করেছে এমন একটি জাতি এখানেই প্রথম মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এখানে মুসলমানদের স্থানীয় স্থাপত্যের আইন–কানুন বিশেষভাবে মেনে চলতে হয়েছিল। সমরখন্দের মাদ্রাসায় সরদার নামীয় সুবৃহৎ মাদ্রাসা মসজিদে আগেকার পারস্যের স্থাপত্যের পুরোপুরি নকল করা হয়েছে। এখানেই মুসলমানেরা রং করা ও সৌন্দর্য্য রচনায় সবচেয়ে বেশী উন্নতি লাভ করেন। তবরিজের 'সবুজ মসজিদ' তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মুসলিম স্থাপত্যের যে চারটি বিভাগের বিষয় উপরে বলা হয়েছে তা ছাড়া ভারতেও মুসলমানরা হিন্দু স্থাপত্য ও মুসলিম স্থাপত্যের এক আশ্চর্য্য সমন্বয় সাধন করে নূতন ধরনের সৃষ্টি করেন। ভারতের মুসলিম স্থাপত্যের সর্ব্বসমেত তেরটি ছাফের (Style) নাম করা যায়। পাঠানগণ যখন প্রথম রাজ্য জয় করেন, তখন তাঁরা ভারতীয় কোন ধরনের অনুকরণ না করে পারস্যের ধরনেরই অনুকরণ করেন। এ দেশের তখনকার বিশৃঙ্খল অবস্থা কোন নূতন ধরন সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী ছিল না। পারস্যের ধরনের পূর্ণ বিকাশ কুতুবমিনারে যতটা হয়েছে পারস্যের কোন ইমারতেও ততটা হয় নাই। আহমদাবাদের মফিজ খানের সমাধি–মসজিদে প্রথম জৈন ও বৌদ্ধ ধরনের সঙ্গে মুসলমান আদর্শের সমন্বয় দেখা যায়। সাম্রাজ্ঞী রিজিয়া নির্ম্মিত সুলতান আলতামসের লাল পাথরের সুশোভিত সমাধি মুসলমানদের দ্বারা হিন্দু ধরণ অনুকরণের একটি প্রমাণ। কুতুবমিনারের সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি নির্ম্মিত 'আলা দরওয়াজা' সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া সমগ্র ভারতের এমন কি সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ইমারতগুলির মধ্যে স্থান পাওয়ার যোগ্য।

www.pathagar.com

সৌধরানী তাজ সৃষ্টি করেছিলেন যারা সেই মোগল যুগেই ভারতের মুসলিম স্থাপত্যের পূর্ণ বিকাশ হয়। কুতুবমিনারের কাছেই মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত হুমায়ুনের সমাধি। এই ইমারতের নীচে পাশাপাশি শয্যায় তাজ-স্রষ্টা শাজাহানের প্রিয় পুত্র দারাশিকো চির নিদ্রায় নিদ্রিত। শুধু দারোশিকোকে বক্ষে স্থান দেওয়ায় যে ইতিহাসে এই সমাধির গুরুত্ব বর্ধিত হয়েছে, তা নয়, মোগল সাম্রাজ্যে স্থাপয়িতার পুত্রের এই সমাধি হতেই শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহের অসহায় পুত্রগণকে ধরে নিয়ে গুলি করে মারা হয়েছিল। দিল্লীতে সুপ্রসিদ্ধ নেজাম উদ্দিন আউলিয়ার ও তৎপার্শ্বে কবি আমির খসরু ও পিতৃগত প্রাণা জাহানারার সমাধির স্থাপত্য হিসাবে বিশেষ কোন বিশিষ্টতা তাই। জাহানারার সমাধি মার্ব্বেল পাথরে ঘেরা হলেও তাতে ঘাস জন্মাতে পারে এমন সুবিধা করে রাখা হয়েছে। সমাধি গাত্রে জাহানারার স্বলিখিত একটি কবিতা লিখে রাখা হয়েছে। তাতে লেখা আছে—

"বে গয়র ছবজা কছেনা পুসেদ মাজার মারা
কে পুসসে্ মাজার গরিয়া হামি গিয়া বছ আছত"

'শুধু সবুজ ঘাসই যেন আমার সমাধি ঢেকে রাখে, নিরীহ ও অনাহারের ঘাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচ্ছাদন'। দিল্লীতে শেরশাহ ও হুমায়ুন নির্ম্মিত পুরানা কিল্লার মধ্যে শেরশাহের মসজিদ ও শেরমণ্ডল নামে দুটি ইমারত দেখা যায়। পাঠান হতে ক্রমে মোগল ধরনের বিকাশের নমুনা প্রথমে শেরশাহের মসজিদে পাওয়া যায়। শের মণ্ডল হুমায়ুনের লাইব্রেরী বলেই সুপরিচিত। এই লাইব্রেরীর সিঁড়ি হতে পড়ে হুমায়ুন মারা গিয়েছিলেন। শাজাহান দিল্লীর লাল কিল্লা নির্ম্মাণ করেন। লাল কিল্লার মধ্যে দেওয়ান-ই-সাম, দেওয়ান-ই-যাদু ও স্নানাগারগুলির নির্ম্মাণ ও সাজসজ্জা এতই মনোরম যে এখানে বিলাসিতার চরম নিদর্শন পাওয়া যায়। দেওয়ান-ই-খাস-এর দেয়াল গাত্রে এই প্রসিদ্ধ কবিতাটি খোদিত আছে—

'আগর ফেরদৌস বর রুয়ে জমি আস্ত
হমি আস্ত ও হমি আস্ত ও হমি আস্ত'

আগ্রার ইমারতগুলির মধ্যে শাজাহানের জামে মসজিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও আজ পর্য্যন্ত মতি মসজিদের মত এমন নিখুঁত উপাসনালয় তৈরি হয় নাই। মানুষের শক্তির পূর্ণতা এইখানে অনেকটা দেখা যায়। আকবর যে নূতন ধরণের প্রবর্ত্তন করেন জাহাঙ্গীরের মহলে তার পূর্ণ বিকাশ হয়। মার্ব্বেল পাথরে নির্ম্মিত বিশ্রামাগারে সুদৃশ্য তমন বুরজ-এর সঙ্গেই দেওয়ান-ই-খাস অবস্থিত। দেওয়ান-ই-খাসকে Miracle of beauty বলা হয়। এর সঙ্গে দেওয়ান-ই-আম ও হেরেমের মহিলাদের উপাসনালয় নগিনা মসজিদ। তাজমহল নির্ম্মাণে পারস্যের আদর্শের অনুকরণ করা হয়েছে। তাজের পরিকল্পনার দিকে চেয়ে তার সৌন্দর্য্যের দিকই দেখতে হয় বেশী করে। প্রেমের প্রতিমূর্ত্তি এই তাজই মোগল শিল্পের সেরা। সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে তাজের সমকক্ষ কোন ইমারত দুনিয়াতে আর নাই। তাজ প্রাণহীন ইট পাথরের হলেও মনে হয় যেন জীবন্ত মমতাজের রূপ পরিগ্রহ করে যমুনা পার গোলজার করে আছে। ভারতীয়

www.pathagar.com

মুসলিম স্থাপত্যের কথা বলতে গেলে আকবরের 'Romance in store' ফতেপুর সিক্রির কথা বলাই সবচেয়ে দরকার। ভারতের জাতীয়তার তীর্থক্ষেত্র এই ফতেপুর সিক্রিতে আকবর নিজের কল্পনার জীবন্ত মূর্ত্তি দিতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর তৈরী ইমারতগুলির মধ্য দিয়ে এই খানেই তিনি ইঁট পাথরের গাঁথুনিতে হিন্দু ও Saracenic style-এর সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করেছিলেন। এইখানেই আকবর হিন্দু ধর্ম্ম ও ইসলামের সমন্বয় সাধন করতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁর নূতন ধর্ম্ম 'দীন-এ-ইলাহি' প্রবর্ত্তন করে। এইখানেই আকবর বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনামূলক সমালোচনার সূত্রপাত করে "The first student of comparative relegion" উপাধি লাভ করেছিলেন। সলিম চিশ্‌তির স্মৃতি রক্ষার্থে নির্ম্মিত ফতেপুর সিক্রির জুমা মসজিদের ফটক বুলন্দ দরওয়াজা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফটক। ইহা ১৭৬ ফিট উচ্চ, ইহার চূড়া হতে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী তাজমহল পর্য্যন্ত দেখা যায়। হাস্যরসিক সুপুরুষের জন্য নির্ম্মিত প্রাসাদ ও যৌধবাইর মহল সম্পূর্ণ হিন্দু ধরনে নির্ম্মিত ; কিন্তু সেগুলির সৌন্দর্য্য রচনা পারস্যের অনুকরণে করা হয়েছে। সুলতানার মহল ফতেপুর সিক্রির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর প্রাসাদ। করবলের প্রাসাদের কাছে পাঁচমহল নামীয় পাঁচতালা রংমহল দেওয়ান-ই-খাস, দেওয়ান-ই-আম, ঐতিহাসিক আবুল ফজল ও কবি ফৈজির প্রাসাদ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কুমার সেলিমের জন্ম রহস্যের সঙ্গে বিজড়িত এই ফতেপুর সিক্রিতে নওরোজের মেলায় নূরজাহানের সঙ্গে সেলিমের প্রথম প্রেম সঞ্চার হয়। বালক সেলিম কয়েকটি পায়রা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে ফোয়ারার পার্শ্বে উপবিষ্ট বালিকা মেহের-উন্-নিসাকে দুটি পায়রা ধরতে দিয়ে অবশিষ্টগুলি নিয়ে খেলতে চলে যান। ফিরে এসে যখন দেখলেন যে বালিকা মেহের উন্-নিসার হাতে মাত্র একটি পায়রা রয়েছে তখন রাগ করে জিজ্ঞাসা করলেন 'অন্য পায়রাটি কি রকমে চলে গেল।' মেহের তখন হাতের পায়রাটি আকাশে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'এই রকম'। বালিকার এই নির্ভীক অথচ সরল রসিকতায় সেলিমের ভাব পরিবর্ত্তন হয় এবং তিনি মেহেরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

সেকেন্দ্রায় আকবরের সমাধিতে সম্পূর্ণ হিন্দু ধরনের অনুকরণ করা হয়েছে। আকবরের পর মোগলেরা আবার পারস্যের ধরনের অনুকরণ আরম্ভ করেন। শাজাহান নির্ম্মিত ইতমদ-উদ-দৌলাতে এই পরিবর্ত্তনের পূর্ণতা দেখা যায়।

এ প্রবন্ধে মুসলিম স্থাপত্য সম্বন্ধে একটি সাধারণ জ্ঞান সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে। মুসলমান প্রাধান্যের যুগে সভ্যতার প্রত্যেক স্তরে মানুষের জীবন কি রকম পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল তা আমরা আজ যেমন জানি না, ঠিক তেমনি ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি বিষয়েও আমাদের কোন পরিষ্কার ধারণা নাই। এ নিদ্রিত সমাজ জীবন সংগ্রামে আজ সব দিকে পরাজিত হচ্ছে। হয়ত তার লুপ্ত গৌরব তাকে তার ভবিষ্যতের পথ দেখিয়ে দিতে পারবে, এই ভরসাতেই এই প্রয়াস। ইউরোপ যখন স্থাপত্য বিদ্যায় উদাসীন ছিল, মুসলমানেরা তখন বাগদাদ, দামেস্ক ও অন্যান্য নগরে শিক্ষাকেন্দ্র সৃষ্টি করে ও গ্রীক লেখকদের বহির অনুবাদ করে নূতন সৃষ্টির গৌরবে জগতকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

Rivoria লিখেছেন 'The richness progress of Arabic Art at a period when architecture had sunk to the lowest ebe throught Europe is due in great measure to the establishment of the learned Academies of Damascas, Baghdad and other principal cities and to the reviral of aeademic learning by the translation of the works of Greek authors—এই সব শিক্ষাকেন্দ্র আজ আর নেই। শিক্ষার সে স্পৃহাও মুসলমানদের মধ্যে নাই। তার সেদিন আর এদিনে কত প্রভেদ।

www.pathagar.com

মোসলেম ভারতে শিক্ষা চর্চ্চা

খান মোহাম্মদ আতাউর রহমান

ভারতের মুসলমান বাদশাহদের কথা মনে পড়িলেই হয় তাঁহাদের যুদ্ধ-প্রিয়তা না হয় সুখ-প্রিয়তার দৃশ্যই চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। অন্ততঃ স্কুল কলেজের পাঠ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টাইয়া আমরা তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ শুধু যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজ্য আক্রমণ, ধ্বংসের মধ্যেই পর্য্যবসিত দেখিতে পাই। রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে সাধারণতঃ তাঁহাদের জীবনের কুৎসিত দিকটাই দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাঁহারা ভারতের হিন্দু-মুসলমানের জ্ঞান ও শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতি কল্পে কিরূপ উৎসুক ও বদ্ধপরিকর ছিলেন তাহা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়াইতে পারিবে না।

সুলতান মহম্মদ ঘোরীর ভারতের সিংহাসনে আরোহণের পর হইতেই প্রকৃত পক্ষে ভারতের মুসলমানদের শিক্ষা আরম্ভ হয়। তাঁহার পূর্ব্বে এবং তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগেও ভারতের মুসলমানদের একটা Dark period ছিল। কিন্তু মহম্মদ ঘোরী অতিশয় যত্ন ও উদ্যমের সহিত মাদ্রাসা ও বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষা-চর্চ্চার পথ সহজ ও সুগম করিতে আরম্ভ করেন। তিনি বহু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরাদি বিনষ্ট করিয়া তথায় মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম প্রচার এবং রাজ্য বিজয়ের দুন্দুভিনাদের মধ্যেও তিনি শিক্ষা বিস্তারের কথা ভুলেন নাই। তৎপর সুলতান কুতুবউদ্দীন অসংখ্য মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করিয়া শিক্ষা-চর্চ্চার প্রবল উৎসাহ দান করেন। তাঁহার সময়ে এবং পরবর্ত্তী সময়েও মাদ্রাসা ও মসজিদ এক সঙ্গে নির্ম্মাণ করা হইত। এবং তথায় ধর্ম্ম ও শিক্ষা চর্চ্চা হইত। কুতুবউদ্দিনের পর সুলতান আলতামাসের রাজত্বকালে তিনি রাজকার্য্যে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকিলেন বলিয়া শিক্ষা-দীক্ষার দিকে বিশেষ নজর দিতে পারিতেন না, এবং অবসরকালেও শিক্ষা বিস্তারের প্রতি উদাসীন ছিলেন। কিন্তু তিনি বিদ্বানের যথেষ্ট সমাদর করিতেন এবং তাঁহার দরবারে বহু সংখ্যক বিদ্বান ও কবি ছিলেন। তাঁহার যত্ন ও আগ্রহে তাঁহার কন্যা সুলতানা রাজিয়া শৈশবকাল হইতেই শিক্ষা লাভ করেন, এবং যৌবনে যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও শিক্ষাচর্চ্চার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। দিল্লীতে তিনি মুয়াইজ্জী বিদ্যালয় নামে একটি প্রকাণ্ড বিদ্যালয় স্থাপন করেন। সুলতানা নিজে কোরান ও হাদিসে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং অবসরকালে অধিকাংশ সময়ই তিনি সাহিত্য আলোচনা বা চর্চ্চায় মগ্ন থাকিতেন। সুলতান নাসিরউদ্দিন নিজে বিদ্বান ছিলেন এবং বিদ্বানদের সমাদর করিতেন। তাঁহার বিশ বৎসর রাজত্বকালে তিনি মুসলমানদের ক্রমোন্নতির জন্য স্থানে স্থানে বহু সংখ্যক মাদ্রাসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শৈশবে তিনি সাধারণ ছাত্রদের

www.pathagar.com

মত কঠোর জীবন-যাপন করিতেন এবং পরে সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরও তিনি ছাত্রদের ন্যায়ই সাধারণভাবে থাকিতেন। তাঁহার নিজের লেখনী দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেন। প্রসিদ্ধ ভূপর্য্যটক ইবনে বতুতা একশত বৎসর পরে ভারতে আসিয়া তাঁহার স্বহস্ত লিখিত একখণ্ড কোরান পাঠে তাঁহার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের রাজত্বকালে চেঙ্গিসখান ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ভীষণ উপদ্রব আরম্ভ করেন। তাঁহার ভয়ে খোরাসানের ১৫/১৬ জন শাসনকর্ত্তা দিল্লীতে আগমন করিয়া সুলতানের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। সুলতান তাঁহাদিগকে অত্যন্ত যত্ন ও সমাদরের সহিত গ্রহণ করেন। উক্ত শাসনকর্ত্তাদের পারিষদবর্গের মধ্যে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদের আগমনে দিল্লী এক সময়ে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্র হইয়া পড়ে। তাঁহার রাজত্বকালে সৈয়দ মৌলা নামক একজন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি দিল্লীতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। সুলতান বলবন বহু সংখ্যক সাহিত্য সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র সুলতান মুহম্মদ নিজে একজন কবি ছিলেন। শৈশবে প্রসিদ্ধ কবি আমির খসরু তাঁহার গৃহ শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারই প্রভাবে তিনি অতি অল্প বয়সেই কাব্য চর্চ্চা আরম্ভ করেন এবং প্রসিদ্ধ কবিদের কাব্যগ্রন্থ হইতে আনুমানিক বিশ সহস্র বয়েত সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন। পিতার ন্যায় ইনিও সাহিত্য সমিতির গঠন কার্য্যে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন এবং বহু সংখ্যক সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রসিদ্ধ নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা ও কথকগণকে এই সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করেন। এই সকল সমিতিতে নানা বিষয়ের আলোচনাকল্পে মধ্যে মধ্যে সভা আহ্বান করা হইত। এবং কবি আমির খসরু সভায় সভাপতিত্ব করিতেন। সুলতান মাহমুদ কবিদের বিশেষ সমাদার করিতেন। পারস্যের মহাকবি শেখ সাদীকে ভারতবর্ষে আনিবার জন্য তিনি দুই দুই বার দূত প্রেরণ করিয়া নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু বিশেষ কারণে শেখ সাদী সুলতানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারেন নাই। যুদ্ধে গমন কালেও সুলতান অনেক বিদ্বান ব্যক্তি এবং বহু সংখ্যক পুস্তক সঙ্গে লইতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ শেষে এক যুদ্ধে তিনি নিহত হন এবং কবি খসরু বন্দী হন।

অতপরঃ খিল্‌জি বংশের প্রথম সুলতান জালালউদ্দিন খিল্‌জির সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চর্চ্চার গতির পরিবর্ত্তন ঘটে। তিনি বিদ্বানদের অত্যন্ত সম্মান সমাদার করিতেন। আমির খসরুকে তিনি দিল্লী Imperial Library-র অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁহার জামাতা আলাউদ্দীন খিল্‌জি নিরক্ষর ছিলেন এবং রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন চেষ্টাই করেন নাই। কিন্তু শেষ বয়সে তিনি নিজের অজ্ঞানতার কথা বুঝিতে পারিয়া গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া ফার্সী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এই শিক্ষার প্রভাবে তিনি শীঘ্রই স্থানে স্থানে মাদ্রাসা বা বিদ্যালয় স্থাপনের আদেশ দেন। এবং বিভিন্ন দেশ হইতে বহু বিদ্বান ব্যক্তিকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়াদিতে অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তাঁহার সময়ে ধর্ম্ম চর্চ্চা ও চিকিৎসা শাস্ত্রের দ্রুত

www.pathagar.com

উন্নতি হইতে থাকে। তাঁহার আদেশে বহুসংখ্যক ধনাঢ্য ব্যক্তি নিজ নিজ অর্থব্যয়ে স্থানে স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এই সময়ে দিল্লীতে এমন অনেক বিদ্বান ছিলেন যাঁহারা বোখারা, বাগদাদ, কায়রো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিক্ষাস্থলের খ্যাতনামা বিদ্বানদের অপেক্ষাও অধিক জ্ঞানী ও বিদ্বান ছিলেন। তাঁহারই সময়ে কবির উদ্দীন ফতেহনামা নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুলতান আলাউদ্দীনের সময় ভারতবর্ষে কয়েকজন খ্যাতনামা জ্যোতিষীও ছিলেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার সময়ে অসংখ্য বিদ্বান ও জ্ঞানী ব্যক্তি থাকিতেও সুলতান তাঁহাদের সকলের উপযুক্ত সম্মান করেন নাই। ইহাদের জ্ঞান ও প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাইয়া তাঁহাদের উপযুক্ত সম্মান করিলে, সুলতান আলাউদ্দীনের নাম শিক্ষা জগতের ইতিহাসে পাইত।

সুলতান আলাউদ্দীনের সময় হইতে মিশ্র ভাষার প্রচলন হয়। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির Intermingling আরম্ভ হয়।

খিলজী বংশের পতনের পর বংশের প্রথম তোগলক সুলতান গিয়াসুদ্দীনের সময় শিক্ষা রাজ্যে পুনরায় যুগান্তর আরম্ভ হয়। তিনি বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গ খুব পছন্দ করিতেন এবং তাঁহাদিগকে দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। তৎকালে শেখ ও সৈয়দ এই দুই বংশই জ্ঞান বিজ্ঞানে অত্যধিক উন্নত ছিলেন। সুলতান তাহাদিগকে বার্ষিক বৃত্তি দান করিতেন এবং অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে তাঁহাদের জ্ঞান-চর্চ্চায় সহায়তা করিতেন।

তাঁহার পুত্র মাহমুদ তুগলকের সময় শিক্ষার দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। তিনি শৈশব কাল হইতেই উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত শিক্ষা-চর্চ্চা আরম্ভ করেন এবং যৌবনে কাব্য-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। ভাষার সরলতা ও ভাবের গভীরতায় তিনি তৎকালীন অনেক কবির উপরে স্থান লাভ করিয়াছিলেন। স্মরণশক্তি তাঁহার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। তর্কে তাঁহাকে পরাস্ত করা কঠিন ছিল। যে কোন বৈজ্ঞানিক বা সাহিত্যিককে তিনি যুক্তি তর্কে পরাস্ত করিতে পারিতেন। হস্তাক্ষর তাঁহার অতি সুন্দর ছিল। চিকিৎসা, জ্যোতিষ ও তর্ক শাস্ত্রে তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি উপাখ্যান বা রোমান্সে বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার নানাবিধ গুণের কথা শুনিয়া এশিয়ার খ্যাতনামা বিদ্বানগণ দিল্লীতে আগমন করেন। দিল্লী হইতে তিনি রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তরিত করিয়া দিল্লীর ধ্বংস সাধন করেন। এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানী দৌলতাবাদে তিনি অনেক বিদ্বান ব্যক্তিগণকে সঙ্গে লইয়া যান কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তথাকার জলবায়ু সহ্য করিতে না পারিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং অনেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই কারণে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষা চর্চ্চার প্রতি উদাসীন হইয়া পড়েন। কথিত আছে সুলতানের দরবারে প্রায় এক হাজার কবি এবং বারশত হাকিম ছিলেন। তাঁহার আহারের সময় দুইশত আইনজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে বসিতেন এবং নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। প্রসিদ্ধ ভূ-পর্য্যটক ইবনে বতুতা তাঁহার সময়ে ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে ভারতের আগমন করেন। সুলতান অত্যন্ত সমাদর করিয়া তাঁহাকে দরবারে নিমন্ত্রণ করেন। সুলতান মুহম্মদের স্বভাবে নিষ্ঠুরতা ও ক্রোধ না থাকিলে তিনি

www.pathagar.com

ভারতের মুসলমানদিগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে জগতের যে কোন জাতির সমকক্ষ করিয়া যাইতে পারিতেন।

পরবর্ত্তী বাদশাহ্ ফিরোজ শাহ তোগলক তাঁহার রাজধানী ফিরোজাবাদের গঠনকার্য্যে মনোনিবেশ করেন। ফিরোজ শাহ্ নিজে অত্যন্ত শিক্ষিত ছিলেন এবং নিজ জীবন-চরিত 'ফতুহাতে ফিরোজশাহী' লিখিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস অধ্যয়নে তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বার্ণি এবং সিরাজ আড়ীল তাঁহার দরবারে ছিলেন। বার্ণির মৃত্যুর পর ফিরোজ শাহ কোন ঐতিহাসিকের দ্বারা তাঁহার রাজত্বের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করাইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শ অনুযায়ী কোন ঐতিহাসিক না পাওয়ায় তাঁহার ইচ্ছা ফলবতী হয় নাই। অগত্যা তিনি তাঁহার জীবনের প্রসিদ্ধ ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া সেগুলি কুশকী শিকার ও কুশ্কী-নুজুল নামক দুটি প্রাসাদের গম্বুজের মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করিয়াছিলেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়া অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিশিষ্ট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান। তিনি জীবনে প্রচুর অর্থ শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ছত্রিশ লক্ষ টাকা বিদ্বান ব্যক্তিদের বৃত্তির জন্য দান করিয়াছেন।

ফিরোজ শাহের অসংখ্য ক্রীতদাস ছিল। তিনি তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন ক্রীতদাসকে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। কেহ কেহ কোরান পাঠ এবং মুখস্থ করিতে, কেহ কেহ শুধু ধর্ম্মালোচনা করিতে, এবং কেহ পুস্তকাদি নকল করিতে নিযুক্ত হইত। একদল ক্রীতদাসকে ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষার জন্য তিনি বণিকদের নিকট পাঠাইয়া দেন। এই প্রকারে প্রায় ১২,০০০ হাজার ক্রীতদাস ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য বিভাগে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করে। তাহাদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য পৃথক লোক নির্দ্দিষ্ট ছিল এবং ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পৃথক কোষাগার ছিল। ক্রীতদাসের শিক্ষার জন্য এতদূর যত্ন অন্য কোন সুলতান বা সম্রাট করেন নাই। তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী সুলতানদের জন্য এক আইন জারী করেন যে প্রজাবৃন্দের শিক্ষা বিস্তার ও উন্নতি সাধন সাম্রাজ্যের একটি বিশেষ কর্ম্মের মধ্যে গণ্য হইবে এবং এ বিষয়ে কেহ অবহেলা করিলে তিনি রাজধর্ম্মের অঙ্গহানি করিবেন। তাঁহার জ্যেষ্টপুত্র ফতেহ খানের মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতি চিহ্নার্থে তিনি কদম শরীফ নামক একটি মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ফিরোজাবাদে তিনি বিখ্যাত ফিরোজশাহী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠত করেন। এই মাদ্রাসার সৌন্দর্য্য তৎকালে অতুলনীয় ছিল। প্রসিদ্ধ সাধক কবি মৌলানা জালাল উদ্দীন রুমী এই মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ছাত্রদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষা দান করিতেন। ছাত্রদের জীবনে শুধু পার্থিব শিক্ষাই যথেষ্ট ছিল না, ধর্ম্ম শিক্ষাও শিক্ষার প্রধান অঙ্গ ছিল। ছাত্র ও শিক্ষকদের জন্য একই আবাস ছিল। ভিন্ন দেশ হইতে সমাগত বিদ্বানমণ্ডলীর অভ্যর্থনার জন্য মাদ্রাসায় একটি প্রকোষ্ঠ নির্দ্দিষ্ট থাকিত। দরিদ্র ও উপযুক্ত ছাত্রদিগকে বৃত্তি দানে সাহায্য করা হইত। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য মাদ্রাসাও ফিরোজশাহী মাদ্রাসার অনুকরণে পরিচালিত হইত। ফিরোজ শাহের নাগারকোট অধিকার কালে তত্রস্থ জ্বালামুখী নামক দেবীর মন্দির সংলগ্নে একটি

www.pathagar.com

লাইব্রেরী ছিল। তাহাতে প্রায় তের শত হিন্দু গ্রন্থ ছিল। ফিরোজশাহ উক্ত লাইব্রেরী ফিরোজাবাদে আনয়ন করেন এবং তন্মধ্যে অনেক গ্রন্থ অনুবাদের জন্য লোক নিযুক্ত করেন। অহিজুদ্দিন নামক এক কবিকে এক হিন্দু কাব্যগ্রন্থ ফারসী গদ্যে অনুবাদ করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হয়। অনুবাদের পর সুলতান নিজ নামানুসারে তাহার নাম দালালহী-ফিরোজ শাহী রাখেন।

ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর শিক্ষা চর্চ্চার গতি মন্দীভূত হইয়া পড়ে। সৈয়দ বংশের রাজত্বকালে শিক্ষা বিস্তারের তেমন উন্নতি সাধিত হয় নাই। খিজির খান তাঁহার নাম অনুসারে রাজধানীর নাম রাখেন খিজিরাবাদ এবং অসংখ্য কারুকার্য্যময় ইমারত দ্বারা খিজিরাবাদের শোভা বর্ধন করেন। শেষ সুলতান আলাউদ্দিন সুলতান বহলুল কর্তৃক পরাস্ত হইয়া জীবনের শেষ ভাগে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাদাউন শহরে বাস করেন। তথায় তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য অসংখ্য মাদ্রাসা, বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া কালে বাদাউন শহরকে শিক্ষা দীক্ষার জ্ঞান-গরিমায় ফিরোজাবাদ ও দিল্লীর তুল্য করিয়া তোলেন।

অতপরঃ সুলতান বাহলুল লোদী দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি নিজে অধিক শিক্ষিত ছিলেন না বটে কিন্তু শিক্ষিত ও বিদ্বানদের উপযুক্ত সমাদর করিতে পরাম্মুখ হইতেন না। তিনি বহু সংখ্যক মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আইনের পুস্তকাদি পাঠ করিতেন এবং সাম্রাজ্য পরিচালনের কার্য্যে ধর্ম্ম গ্রন্থের আদেশানুযায়ী আইন কাননু জারী করিতেন। তাঁহার পুত্র সিকান্দার লোদীকে তাঁহার রাজধানী দিল্লী হইতে আগ্রায় লইয়া আসেন এবং তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা যত্নে আগ্রা দিল্লীর মতই শিক্ষা দীক্ষার কেন্দ্র হইয়া পড়ে। সিকান্দর নিজে কবি ছিলেন এবং সাহিত্যিক ও কবিদের যথেষ্ট সমাদার করিতেন। তিনি গুলরুখ উপনাম গ্রহণ করিয়া অনেক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'দেওয়ান' গ্রন্থে প্রায় ৮/৯ হাজার বয়েত সংগৃহীত আছে। তিনি তাঁহার সৈন্যদিগকে রীতিমত লেখাপড়া শিক্ষা করিবার জন্য কঠোর আদেশ দান করেন। তিনি সুলতান ঘোরীর মত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন এবং অনেক হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়া তথায় মসজিদ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেন। ধর্ম্ম বিষয়ে তর্কালোচনা শুনিতে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এবং সময় সময় আলেম ও পণ্ডিতদের সভা আহ্বান করিয়া উভয় পক্ষের ধর্ম্ম বিষয়ে তর্ক ও আলোচনা শুনিতেন। সিকান্দার শাহের আমল হইতেই হিন্দুরা সর্ব্ব প্রথম ফার্সী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করে এবং হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের ভাব প্রকাশের জন্য উর্দ্দু ভাষার সৃষ্টি হয়। তাঁহার সময়ে অনকে গ্রন্থের অনুবাদ হয়। অরগর মহাবেদক নামক চিকিৎসা শাস্ত্র অনূদিত হইয়া "তিরী সিকান্দারী" নামে প্রকাশিত হয়। সুলতানের শিক্ষা বিস্তারের উৎসাহ দর্শনে অনেক বিদ্বান ব্যক্তি ভিন্ন দেশ হইতে আগ্রাতে আসিয়াছিলেন এবং আগ্রা নগরীকে শিক্ষার কেন্দ্রস্থল করিয়া তুলিয়াছিলেন। আরব, পারস্য, বোখারা এবং ভারত বর্ষের বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিকদের আহ্বান করিয়া আগ্রায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিতেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে রাজকার্য্যে মনোযোগ দিবার পূর্ব্বে দণ্ডায়মান অবস্থায় সতর পারা কোরান শরীফ পাঠ করিতেন ; এতদ্ব্যতীত রাত্রিকালে হাদিস, তফসীর প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন।

www.pathagar.com

এই সময়ে ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনকর্ত্তা ও নৃপতিগণ দিল্লী, আগ্রা ফিরোজাবাদ ও দৌলতাবাদের অনুকরণে নিজ নিজ রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য উৎসুক হইয়া উঠেন। তন্মধ্যে বাহমনী রাজ্য, বিজাপুর, মালোয়া, জৌনপুর প্রভৃতি রাজ্যের সুলতানগণই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হাসন গঙ্গু বাহমনীর রাজত্বকালে তথায় মুসলমান নিরক্ষর ছিল এবং হিন্দুরা শুধু বেদ ভিন্ন অন্য কোন বিষয় অধ্যয়ন করিত না। সময় সময় হয়ত চিকিৎসা-শাস্ত্র, ইতিহাস, বিজ্ঞানের আলোচনা হইত কিন্তু নিয়মিতভাবে কোন বিষয়েরই চর্চ্চা হইত না। মুজাহিদ শাহ বাহমনীর সময় হইতে শুধু ধর্ম্ম গ্রন্থ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে রীতিমত চর্চ্চা আরম্ভ হয়। তিনি নিজেও তুর্কী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী মাহমুদ শাহ বাহমনী কবি ছিলেন এবং তিনি অনেক কাব্য গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি মাতৃভাষা ছাড়া, আরবী, ফারসী ভাষায় বাক্যালাপ করিতে পারিতেন। ১৩৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি দাক্ষিণাত্যে অনাথ বালকদের জন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ কবি হাফিজ শিরাজীকে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার সভায় আনয়নার্থে দাক্ষিণাত্য হইতে অর্ম্মুজ বন্দরে একখানা জাহাজ প্রেরণ করিয়াছিলেন—কিন্তু ঝড়ের প্রকোপবশতঃ কবি হাফিজ আসিতে পারেন নাই। মামুদ শাহ গুলবার্গ, বিজয়, কান্দাহার, এলিচপুর, দৌলতাবাদ প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া শিক্ষা-চর্চ্চার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহার জ্ঞান ও সূক্ষ্মবিচার ক্ষমতার জন্য দাক্ষিণাত্যের লোক তাঁহাকে আরাঁস্তু উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল।

অতঃপর ফিরোজ শাহ বাহমনীর রাজত্বকালে শিক্ষাদীক্ষায় আশাতিরিক্ত উন্নতি সাধিত হয়। পূর্ব্ববর্ত্তী ফিরোজ তোগলকের সহিত এ বিষয়ে তাঁহার তুলনা করা যাইতে পারে। তিনি বহু ভাষাবিদ মুহম্মদ তোগলক অপেক্ষাও অধিক বিদ্বান ছিলেন। তাঁহার হেরেমে ইংরেজী, আরবী, তুর্কী, চীনা, আফগানী, রাজপুত, বাঙ্গালী, গুজরাটী, মারহাটী রমণীগণ থাকিতেন। তিনি প্রত্যেক শনিবারে বার্ত্তালাপ করিতে পারিতেন। তিনি প্রত্যেক শনিবারে উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রতি সোমবারে জ্যামিতি, বৃহস্পতিবারে তর্ক শাস্ত্র বিষয়ে বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। প্রতি চারদিন অন্তর বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে কোরান শরীফের ষোল পৃষ্ঠা নকল করিতেন। অধিকাংশ সময়ই তিনি ধার্ম্মিক, বিদ্বান, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকদের সঙ্গে কাটাইতেন। প্রতি বৎসর তিনি গোয়া বন্দর হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিদ্বান ব্যক্তিগণকে ভারতে আনিবার জন্য কয়েকখানি জাহাজ প্রেরণ করিতেন। তিনি জ্যোতিষ বিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে দৌলতাবাদের নিকট একটা মানমন্দির নির্ম্মাণের জন্য হাকিম হুসেন জীলানীকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু হাকিমের অকাল মৃত্যুতে উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই।

ফিরোজ শাহ বাহমনীর নিচেই দ্বিতীয় মুহম্মদ শাহ বাহমনীর স্থান। অঙ্ক শাস্ত্রে তৎকালে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। কাব্য চর্চ্চায়ও তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি ছিল। গদ্য সাহিত্যে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী মুহম্মদ গেওয়ান অত্যন্ত সহিত্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। বিদরে তিনি মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া তৎসংলগ্নে একটি লাইবেরী স্থাপন করেন। এই লাইব্রেরীর অন্যূন তিন হাজার পুস্তক শিক্ষক ও ছাত্রদের অধ্যয়নের জন্য ছিল। এতদ্ব্যতীত দাক্ষিণাত্যে তিনি অনেক মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

বিজাপুরের মুসলমান অধিপতিগণ সুশিক্ষিত ছিলেন এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে এখানে পুরাকালে একটি বিদ্যালয় ছিল—সেই হইতে স্থানটির নাম বিদ্যাপুর বা বিজাপুরে পরিণত হইয়াছে। আদ্দিল শাহ কাব্য ও সাহিত্য চর্চ্চায় খুব মনোযোগী ছিলেন। তাঁহার পুত্র ইসমাইল আদিল শাহ শিক্ষার বিস্তার ও উন্নতির জন্য স্থানে স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইউসুফ আদিল শাহ একজন হিন্দু রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে হিন্দী ভাষা শিক্ষা করেন। প্রসিদ্ধ তারিখী ফিরিস্তার রচয়িতা আবুল কাসেম দ্বিতীয় ইব্রাহিম শাহের সমসাময়িক ছিলেন। বিজাপুরে আজিও তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত আসিরী মহল নামক লাইব্রেরী বিদ্যমান আছে।

মালোয়ার অধিপতি সুলতান মুহম্মদ শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা যত্নে মালোয়া এক সময় সিরাজ ও সমরখন্দের ন্যায় শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া পড়ে। তিনি 'সুলতান হুসেন' বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মালোয়ায় গিয়াসুদ্দিনের রাজত্বকালে স্ত্রী-শিক্ষার দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। তজ্জন্য তিনি হেরেমে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করেন। কথিত আছে—তাঁহার হেরেমে সত্তর জন মেয়ে হাফেজ ছিলেন।

এই সময়ে জৌনপুরও শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইব্রাহিম শিরাজী অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি 'ফাতেহা-ই-ইব্রাহিম শাহী ইরশাদ' লিখিয়া যান। তাঁহার পুত্রবধূ বিবি রাজী জৌনপুরে নামাজ-গাহ নামক একটি মাদ্রাসা ও মসজিদ স্থাপন করেন।

বঙ্গদেশে প্রথমে নাসির শাহ বাংলা ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ করিবার জন্য আদেশ দেন। ১২৮২-১৩১৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রামায়ণ অনুবাদ শেষ হয়। তিনি নিজেও কবি ছিলেন এবং এক সময়ে কয়েকটি কবিতা লিখিয়া কবি হাফেজের নিকট পাঠাইয়া দেন। কবি হাফেজ তদুত্তরে অতি সুন্দর ও সম্মানসূচক কবিতা লিখিয়া পাঠান।

হুসেন শাহ ভাগবত পুরাণ বাংলায় অনুবাদ করিবার জন্য মালাধর বসুকে নিযুক্ত করেন। গৌড়ের সাগর দীঘির তীরে তিনি একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন।

হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁ ও তাঁহার পুত্র ছুটি খাঁ মহাভারত অনুবাদ আরম্ভ করেন। পরাগল খাঁ ফেনীর নিকটবর্ত্তী পরাগলপুরে তাঁহার সভাসদ বর্গ আহ্বান করিয়া কবীন্দ্র পরমেশ্বর অনূদিত মহাভারত শ্রবণ করিতেন। তাঁহার সময়ে মহাভারতের স্ত্রী পর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুবাদ শেষ হয়। তৎপর ছুটি খাঁ শ্রীকর্ণ নন্দীকে নিযুক্ত করিয়া অশ্বমেধ পর্ব্ব পর্য্যন্ত শেষ করান।

মোটের উপর মুহম্মদ ঘোরী হইতে আরম্ভ করিয়া ইব্রাহিম লোদী পর্য্যন্ত দিল্লীর সুলতান এবং ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির শাসনকর্ত্তাদের চেষ্টায় ভারতবর্ষে দিল্লী, ফিরোজাবাদ, আগ্রা, জালন্ধর, বিদর, হায়দরাবাদ ও বাদাউন প্রভৃতি স্থান সমরখন্দ, বোখারা, বোগদাদ, কায়রো, দামস্কাস প্রভৃতি মোসলেম শিক্ষাকেন্দ্রের সমতূল্য হইয়া পড়ে।

অতঃপর প্রসিদ্ধ মোগল বাদশাহদের ভারত আগমনের পর জ্ঞান ও শিক্ষার দ্রুত উন্নতি হইতে থাকে। বাবর শাহ্ আরবী, ফার্সী ও তুর্কী, ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তিনি উচ্চ দরের সমালোচক ও কবি ছিলেন। তিনি তুর্কী ভাষায় নিজের জীবনী লিখিয়া যান।

www.pathagar.com

কাব্য সাহিত্যে তিনি 'মুবাইয়ান' নামে এক নূতন ছন্দ সৃষ্টি করেন। রিসালাই ওয়ালীদিয়া নামক গদ্য গ্রন্থ তিনি কাব্যে অনুবাদ করেন। তিনি মুফাস্যিল নামক এক প্রকার নূতন ছন্দে কবিতা লিখিতেন। ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি বাবরী হস্তাক্ষর নামক এক নূতন ধরনের হস্তাক্ষর উদ্ভাবন করেন এবং সেই অক্ষরে কোরান লিখিয়া মক্কা ও মদিনায় পাঠাইয়া দেন। 'কানুনী হুমায়ূনে'র রচয়িতা প্রসিদ্ধ লেখক খুন্দামিরকে তিনি সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন এবং গুজরাটে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তিনি তাঁহার মৃতদেহ দিল্লীতে আনয়ন করাইয়া নিজামউদ্দীন আউলিয়া এবং কবি আমির খসরুর সমাধির পাশে কবরস্থ করেন। শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি দিল্লীর নিকটস্থ গ্রামসমূহে অসংখ্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। শোহরাতে আম বা P.W.D. র হাতে স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠা এবং সাপ্তাহিক গেজেট প্রকাশ করিবার ভার ন্যাস্ত করেন।

হুমায়ুনও পিতার ন্যায় বিদ্বান ছিলেন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি ছিল এবং তিনি নিজেও উক্ত শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি তাঁহার দরবারের লোকজনের গুণানুসারে তাঁহাদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। (১) সাহিত্যিক, উকিল এবং বৈজ্ঞানিকদিগকে 'আহলে সাদত', (২) তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, মন্ত্রীবর ও সেনা বিভাগের কর্ত্তাকে 'আহলে দওলত' (৩) সুন্দর গায়ক ও বাদক ব্যক্তিগণকে 'আহলে মুরাদ' আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি শিক্ষিত ব্যক্তিদের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। তিনি সপ্ত গ্রহের নামানুসারে সাতটি প্রকাণ্ড হল নির্ম্মাণ করেন, এবং Saturn ও Jupiter হলে বিদ্বানদের অভ্যর্থনা করিতেন। তাঁহার এক সামান্য ভৃত্য গওহর 'তাজকীরাতুল হুমায়ুন' নামক পুস্তক লিখিয়া যান—ইহাতে হুমায়ুনের জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ ঘটনার উল্লেখ আছে। হুমায়ুন কখনও পুস্তক ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। শেরশাহের নির্ম্মিত 'শের মণ্ডল' নামক প্রমোদাগার তিনি পাঠাগারে পরিণত করেন। কথিত আছে এই পাঠাগারের উপরে বসিয়া তিনি গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। একদা তিনি গণনা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, শুক্রগ্রহ অন্যান্য দিন অপেক্ষা কিছু পারে উদিত হইবে। তিনি উক্ত গ্রহ দেখিবার জন্য উপরে বসিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় আজানের স্বর শুনিয়া দ্রুত নীচে নামিতে যাইয়া সিঁড়ি হইতে গড়াইয়া পড়েন ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

আকবর শাহের শিক্ষা সম্বন্ধে ইতিহাসে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন তিনি নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু আবুল ফজল প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ লিখিয়াছেন যে আবদুল লতিফ, পীর মুহম্মদ খান এবং হাজী মুহম্মদ, আকবর শাহের গৃহ শিক্ষক ছিলেন। ১৫৪৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্যা শিক্ষার জন্য তাঁহাকে মাদ্রাসায় পাঠান হয়। উপকথা পড়িবার তাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা ছিল এবং রাত্রিকালে তিনি অধ্যয়নে লিপ্ত থাকিতেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আকবর শাহ নিরক্ষর ছিলেন না। তিনি অবসর কালে সুফী এবং ঐতিহাসিকদের সঙ্গে নানাবিধ আলোচনা করিতেন। প্রত্যেক শুক্র ও শনিবারে তাঁহার দরবারে সকল ধর্ম্মের লোকই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিতেন এবং নানা বিষয়ে তর্কালোচনা চলিত। বাদশাহ নিজে সভাপতি হইতেন। এবং রীতিমত যুক্তি তর্কে সকলকে পরাস্ত করিতেন। কবি ফৈজী তাঁহার সভাকবি ছিলেন। তাঁহার আদেশে ফৈজী কবি নিজামীর 'খমসায়ে নিজামী'র উত্তরে 'খমসায়ে ফৈজী' লেখেন। নিজামীর 'লায়লা ও মাজনুর' উত্তরে 'নল দময়ন্তী'র অনুবাদ করিয়া 'নল-দমন' নামে

www.pathagar.com

প্রকাশিত করেন। নিজামীর 'শিরি খসরু' উত্তরে তিনি 'সুলেমান বেলকিস' লেখেন। নিজামীর 'সিকান্দার নামার' উত্তরে 'আকবর নামা' এবং 'হস্তে কিশোয়রের' উত্তরে 'হপ্ত পেয়কর' লেখেন। ১৫৮২ সনে ফৈজী ফারসীতে মহাভারত অনুবাদ করেন—এবং তাহার নাম দেন 'রমজ নামা'। 'তারিখী বাদাউনী'র রচয়িতা আবদুল কাদের ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ করিয়া চারি বৎসরে রামায়ণের ফারসী অনুবাদ শেষ করেন। আবদুল কাদেরের 'সিংহাসন বত্তিনী' অনুবাদ করিয়া 'খিরদ আফজা নামা' প্রকাশিত করেন। হাজী ইব্রাহিম সরহন্দী অথর্ব্ববেদ'—ফৈজী লীলাবতী, এবং মুহম্মদ খান 'তাজাক' নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। সংস্কৃত পঞ্চরত্ন অণূদিত হইয়া হইয়া প্রথমে 'আহলে দানিশ', এবং পরে 'কলিলা ও দমনা' নামে প্রকাশিত হয়। আবুল ফজল বাইবেল এবং নানাবিধ জ্যোতিষ গ্রন্থ অনুবাদ করেন। আবদুর রহিম খান খানান 'তুজকী বাবরী' তুর্কী ভাষা হইতে ফারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। আবুল ফজল 'আইনী আকবরী' লেখেন।

আকবর শাহের লাইব্রেরী দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিভাগ। ফৈজীর মৃত্যুকালে শাহী পাঠাগারে ৪৬০০ গ্রন্থ মজুদ ছিল। আকবর শাহ আগ্রায়ও একটি লাইব্রেরী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার সময়ে সুলসন, টাকি, মহাক্কাক, নশখ, রায়হান, রিক ও গুবার এই সাত প্রকারের হস্তাক্ষর প্রচলিত হয়। আকবর বাদশাহের আমল হইতে ছাত্রগণ নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করেন। মাদ্রাসা ও পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষার বিষয় ছাড়াও নীতি অঙ্ক, কৃষি, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞান ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। হিন্দু ছাত্রগণ এ সকল ছাড়াও ব্যাকরণ, বেদান্ত ও পাতঞ্জলি অধ্যয়ন করিত। প্রত্যেক ছাত্রেরই জীবনের লক্ষ্য ও অবস্থানুযায়ী শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা ছিল। ফতেপুর শিকরীতে আকবর শাহ একটি বৃহৎ মাদ্রাসা স্থাপন করেন। 'তবকতী আকবরী' পাঠে জানা যায় যে তাঁহার দরবারে ৯৩ জন কবি ছিলেন। তাঁহার চেষ্টা ও উদ্যমে তাঁহার রাজধানী বিদ্বান ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের তীর্থস্থান হইয়া পড়ে। শিক্ষা বিস্তার কল্পে তিনি প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। এবং স্থানে স্থানে পাঠাগার স্থাপন করিয়া বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণ করিতেন এবং গুণানুসারে পুরস্কার প্রদানে তাহাদিগকে যথোচিত উৎসাহ দান করিতেন। তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর শাহ শৈশবে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করেন, এবং তুর্কী ভাষায় অগাধ জ্ঞান লাভ করেন। তাঁহার নিজকৃত 'তুজাকে জাহাঙ্গরী' পাঠে তাঁহার জ্ঞানের পচিয় পাওয়া যায়। সাম্রাজ্যের আয় হইতে তিনি মাদ্রাসা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বহু অর্থ দান করিতেন। এতদ্ব্যতীত নিজ কোষ হইতেও অনেক অর্থ দান করিয়াছেন। তিনি এক আইন জারি করেন যে, কোন ব্যক্তি উত্তরাধিকারী না রাখিয়া মৃত হইলে তাহার সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। এবং সেই অর্থে মাদ্রাসা ও বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। পূর্ব্ববর্ত্তীকালের অনেক পরিত্যক্ত অট্টালিকা তিনি পুনঃসংস্কার করিয়া তথায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন। শাহী পাঠাগারের উন্নতি সাধনে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি গুজরাতে গমন করিলে তথায় বিদ্বানে ব্যক্তিদিগকে 'তফসিরী হুমায়ুনী' 'তফসিরী কাশশাফ' ও 'রওজাতুল আহবাব' প্রভৃতি গ্রন্থ দান করেন এবং শিক্ষা চর্চ্চার জন্য তাঁহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দান করেন। তাঁহার দরবারে ১৭জন পণ্ডিত ও ১০জন কবি সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিতেন। তালিব আমলী নামক প্রসিদ্ধ কবি তাঁহার সভাকবি ছিলেন।

www.pathagar.com

শাহজাহান বাদশাহ পূর্ব্ববর্ত্তী মোগল বাদশাহের ন্যায় শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন না। তিনি সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অর্থ ব্যয়ে ভূবন বিখ্যাত, তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন, জুম্মা মসজিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন। ততাপি দিল্লীতে তিনি শাহী মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং 'দারুল বকা' নামক একটি মাদ্রাসাকে পুনঃসংস্কৃত করেন। রাত্রিকালে শয়নকক্ষে তাঁহার নিকট বসিয়া পুস্তকাদি পড়া হইত—সম্রাট তাহাই শুনিতে শুনিতে নিদ্রা যাইতেন। তিনি সুদক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন এবং সঙ্গীতে অত্যন্ত উৎসাহ দান করিতেন। বিদ্বান ও কবিদের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। আবু তালিম কলিম তাঁহার সভা কবি ছিলেন। বাদশাহ তাঁহাকে 'বাদশাহ নামই' নামক একটি কাব্যগ্রন্থ লিখিবার জন্য আদেশ করেন কিন্তু পুস্তক আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই কবির মৃত্যু ঘটে।

শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাশিকো অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। শৈশবে তিনি খৃষ্টান শিক্ষকের অধীনে থাকিয়া বাইবেল পাঠ করে। অতঃপর সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া বেদ পাঠ করেন। এই বেদ পুরাণই তাঁহার ধর্ম্মমত গঠনের জন্য অনেকখানি দায়ী। ইহার পর হইতেই তিনি যোগী, সন্ন্যাসীদের সংসর্গে থাকিতে চেষ্টা করিতেন এবং মাঝে মাঝে একাকী গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে দশখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

১. সিরউল-আসর উপনিষদের ফারসী অনুবাদ ;
২. ভাগবত গীতার অনুবাদ ;
৩. যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের অনুবাদ ;
৪. মোকালেমা-ই বাবা লালদাস—বাবা লাল দাসের সঙ্গে হিন্দু যোগীদের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে আলোচনার সারমর্ম্ম ;
৫. সকিনাতুল আউলিয়া—সাধু পুরুষদের জীবনী ;
৬. সকিনাতুল আউলিয়া—সাধু পুরুষদের দর্শন ;
৭. নাদের উন নুকাহ—তিনখানি সূফী ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক ;
৮. হাসানাতুল আরীফীন—তিনখানি সূফী ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক ;
৯. রিসালাহী হক নুমা—তিনখানী সূফী ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তক ;
১০. মজানাউল বহরাইন প্রভৃতি।

দারাশিকো উচ্চদরের সাধক ছিলেন। তিনি হিন্দু পণ্ডিতমণ্ডলীর সহবাস খুব পছন্দ করিতেন এবং তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন। ইহার ফলে মুসলমান ধর্ম্মের কঠোর আদেশগুলি তিনি মানিয়া চলেন নাই। এই কারণেই আওরঙ্গজীব তাঁহার প্রতি ক্রোধান্বিত হন, এমন কি বহুদিন বন্দী রাখিয়া অবশেষে মারিয়াই ফেলেন। দারা যদি আওরঙ্গজীবের কু অভিসন্ধি বুঝিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রতিকারের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন তাহা হইলে ভারতের ইতিহাস অন্যরূপ ধারণ করিত।

আওরঙ্গজীবের রাজত্বকালে হিন্দুদের শিক্ষার বিস্তার বিশেষরূপে হয় নাই। তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন এবং হিন্দুদিগকে সাধারণতঃ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, যাহা হউক আওরঙ্গজীব নিজে বিদ্বান ছিলেন এবং মুসলমানদের শিক্ষা চর্চ্চার জন্য যথেষ্ট উৎসাহ দান করিতেন। মিঃ কিন লিখিয়াছেন 'Aurangzib abolished capital punishment,

www.pathagar.com

eneouraged agriculture, founded numberless colleges, and schools.' তিনি ফিরিঙ্গী মহলকে মাদ্রাসায় পরিণত করেন এবং নিজাম ও কাশ্‌শফের অধ্যয়নকারীদের উপযুক্ত বৃত্তি দান করিতেন। আকরামউদ্দীন খান নামক একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে ১,২৪,০০০ টাকা ব্যয়ে আহমদাবাদে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করিয়া আওরঙ্গজীবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁহার সময়ে শিয়ালকোট শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। বাদশাহ্ কোরান ও হাদিস মুখস্থ করিয়াছিলেন এবং আরবী ও ফারসী ভাষা অতিশয় দক্ষতার সহিত লিখিতে পারিতেন। তিনি নীতি বিষয়ক কাব্য বা কয়েতা পছন্দ করিতেন। মাদ্রাসা ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নিকট হইতে যে শিক্ষা তিনি পাইয়াছিলেন তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। বার্ণিয়ার সাহেব আওরঙ্গজীবের মত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"Was it not incumbent upon my preceptor he (Aurangazib) said, to make me acquainted with the distinguishing features for every nation of the earth ; its resources and strength, its modes of warfare, its manner, religion-forms of Government, and where in its interests principally consist and by regular course of historical study to render me familiar with the origin of the states, their progress and decline, the events, accidents, errors owing to which such great changes and mighty revolutions have been effected?" ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আওরঙ্গজীবের জ্ঞানের পিপাসা অতৃপ্ত ছিল। শিক্ষা-চর্চ্চায় তাঁহার প্রবল অনুরাগ ছিল। তিনি নিজ হাতে কোরান লিখিতেন এবং তদবিক্রীত অর্থে নিজের খাদ্যাদি ক্রয় করিতেন। মৃত্যুকালে তাঁহার নিজ কোষে মোট ৩০৫ টাকা জমা ছিল। ইসলামী আইন কানুন তিনি অতিশয় যত্ন সহকারে পাঠ করিয়াছিলেন এবং আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের দ্বারা 'ফতোয়ায় আলমগিরী' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক সম্পাদিত করাইয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর হইতেই মোগল সাম্রাজ্য পতনোম্মুখ হয়, এবং পরবর্ত্তী বাদশাহদের আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি হয় নাই। বাহাদুর শাহ শিক্ষা বিস্তারের দিকে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। কিন্তু তিনি বিদ্বানদের যথেষ্ট সমাদর করিয়াছেন। তাঁহার সময়ে গাজীউদ্দিন খান ও ফিরোজ জঙ্গ নামক দুইজন ধনাঢ্য ব্যক্তি দিল্লীতে দুটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এতদ্ব্যতীত কাল্যকুঞ্জেও 'ফখরুল মারাবী' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহম্মদ শাহ জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং তাঁহার উৎসাহে ১৭২৪ সালে অম্বরের মহারাজা জয়সিংহ জয়পুর, উজ্জয়িনী, মথুরা ও দিল্লীতে কয়েকটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করিয়া দিল্লীর শাহী লাইব্রেরী তাঁহার সঙ্গে লইয়া যান। এত কালের প্রতিষ্ঠিত ও সযত্ন-রক্ষিত লাইব্রেরীর সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শিক্ষা-দীক্ষায় যশ-গরিমা অনেকটা ম্লান হইয়া যায়। দ্বিতীয় শাহ আলম যুদ্ধ বিগ্রহ ও ভীষণ অন্তর্দ্রোহিতার মধ্যেও শিক্ষা বিস্তারের যত্ন-প্রচেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় হাসান রেজা খান ফরোখাবাদে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। শাহ আলম শাহী পাঠাগারের অনুকরণে নূতন একটি লাইব্রেরী স্থাপনের জন্য পুনরায় পুস্তকাদি সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

www.pathagar.com

ভারতে মুসলমান বাদশাহেদের আমলে স্ত্রী শিক্ষারও যে কম উন্নতি হইয়াছে একথা বলা যায় না। সুলতান ফিরোজ শাহ বাহমনীর আমলে তিনি তাঁহার হেরেমে বহু ভিন্ন দেশের রমণীগণকে স্থান দিয়া তাঁহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন মালোয়ার রাজত্বকালে নারী শিক্ষার খুব উন্নতি হয়। তিনি হেরেমে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু শত উৎসাহের মধ্যেও পর্দ্দা প্রথা সেকালে নারীদিগের শিক্ষার প্রধান অন্তরায় ছিল। বালিকাদিগকে শৈশব হইতে কিশোর বয়স পর্য্যন্ত মাদ্রাসায় শিক্ষা দেওয়া হইত। অতঃপর তাহাদিগের লেখা পড়া বন্ধ হইত। এত কঠোর অবস্থায় থাকিয়াও সুলতানা রাজিয়া উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়াছিলেন। মাদ্রাসা শিক্ষার পরও তিনি নিজে শিক্ষা চর্চ্চা ক্ষান্ত করেন নাই এবং আজীবন পাঠ অধ্যয়নে জীবন যাপন করিয়াছেন। বাবর শাহের কন্যা গুলবদনও বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন—তিনি হুঁমায়ুন নামা' স্বহস্তে লিখিয়াছেন। গুলবদনের কন্যা সলিমা সুলতানাও বিদূষী ছিলেন—তিনি কাব্য চর্চ্চায় বিশেষ মনোযোগী ছিলেন এবং 'মাখফী' ছদ্মনামে কবিতা লিখিতেন। আকবর শাহের ধাত্রী মহল অনঙ্গ হিজরী ৯৬৯ সনে দিল্লীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তথায় স্ত্রী শিক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইত। আকবর শাহ ফতেপুর শিকরীতে তাঁহার হেরেমে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করেন। জাহাঙ্গীরের স্ত্রী নূরজাহান বেগম আরবী ও ফারসী সাহিত্যে অগাধ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। শাহজাহানের স্ত্রী মোমতাজ মহল ফারসী ভাষা জানিতেন এবং উক্ত ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। মোগল নারীদের মধ্যে আওরঙ্গজেবের বিদূষী কন্যা জিবউনন্নিসা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ছিলেন। তিনি কবি ছিলেন—আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তাঁহার প্রভাবে মোগল হেরেমে তৎকালে বহু সংখ্যক নারী শিক্ষা লাভ করেন। ক্রীতদাসীদিগকেও তিনি লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা করিতেন।

ভারতবর্ষে মুসলমান বাদশাহদের আগমনের পূর্ব্বে জ্ঞান ও শিক্ষা-চর্চ্চায় ভারতবাসী তেমন উন্নত ছিল না। হিন্দু রাজাদের রাজত্বকালে ভারতবাসী শুধু ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ করিত এবং তন্মধ্যে মুসলমান নিরক্ষর ছিল। হিন্দুগণ বেদ, পুরাণ, রামায়ন, মহাভারত, ভাগবদগীতা পাঠে পাণ্ডিত্য লাভ করিলেও অন্যান্য বিষয়ে তাহারা জ্ঞানার্জ্জন করিত না। কিন্তু মুসলমান বাদশাহগণ ভারতে পদার্পণ করিয়াই ভারতবাসীর অজ্ঞানতার পর্দ্দা সরাইয়া দিয়া ভারতবাসীকে শিক্ষা-দীক্ষায় জগতের অন্যান্য জাতির সমকক্ষতায় দাঁড় করাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। মুসলমান বাদশাহগণ শুধু আক্রমণ, ধ্বংস, জয়-পরাজয় বা ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারের জন্যই ভারতে আগমন করেন নাই। ভারতে চিরদিনের জন্য রাজ্য স্থাপন করিয়া অশিক্ষিত ভারতবাসীকে শিক্ষা-দীক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করা তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল এবং ইহার জন্য তাঁহারা প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে ভারতবর্ষ জ্ঞান-গরিমায়, শিল্পে ঐশ্বর্য্যে জগতের শ্রেষ্ঠ দেশ বলিয়া গণ্য হইত। তাঁহারা শিক্ষা-চর্চ্চাকে ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। শিক্ষা ব্যতিরেকে ধর্ম্ম করা বিড়ম্বনা মাত্র। এ কথা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই সর্ব্বাগ্রে শিক্ষা দানের সুব্যবস্থা করেন। আমরা দেখিতে পাই মুসলমানদের রাজত্বকালে

www.pathagar.com

মাদ্রাসা ও মসজিদ একই স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইত। এমন কি একই মাদ্রাসায় ধর্ম্মচর্চ্চা ও শিক্ষাচর্চ্চা চলিত। ইহা হতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহারা ধর্ম্ম চর্চ্চা ও জ্ঞান চর্চ্চা ও জ্ঞান-শিক্ষা এই দুইটি জিনিষকে পাশাপাশি রাখিতেন এবং সমভাবে উভয়ের বিস্তার ও উন্নতির জন্য চেষ্টা উদ্যমে ক্রুটি করেন নাই। তাঁহাদের আমলে দিল্লী, আগ্রা, ফিরোজাবাদ, দৌলতাবাদ, ফতেপুর, বিদর, বাদাউন, হায়দরাবাদ, শিয়ালকোট প্রভৃতি স্থান জগতের জ্ঞান পিপাসুদের তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছিল। কালচক্রে আজ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান গরিমার শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই—আছে শুধু শিল্পের মহিমা তাজমহল, আর জুমা মসজিদ।[৪]

৪. এই প্রবন্ধ লিখিতে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র লাহা কৃত Promotion of learning in the Muhammedan India, ফিরিশ্‌তা, আইন-ই-আকবরী, রিয়াজুস সালাতীন প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে মাল মসলা গৃহীত হইয়াছে।

www.pathagar.com

বৈদেশিক বাণিজ্য ও বাংলার কৃষক

এ.কে. আহমদ খাঁ এম.এ.

কৃষি বাংলার সম্পদ ও গৌরব। বৃষ্টির জল, নদীর প্রবাহ—রবির কিরণ, প্রকৃতির নানাবিধ কৃপায় বাংলাদেশে জন্মায় না এরূপ ফসল বিরল। বছর বছর ধানের সবুজতা, পাটের গাম্ভীর্য্য মরিচের লালী প্রভৃতি বৈচিত্র্যে বাংলার মাঠ ভরিয়া উঠে দেখিয়া কৃষকের চোখ জুড়ায়। জীবিকার জন্য বাঙ্গালীর শতকরা ৮০জন কৃষি, ৬জন শিল্প ও ৭জন ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে যোগী, সোনার, তাঁতি, সুতার, পাল, তেলী, বসাক, সাহা প্রভৃতি নীচু শ্রেণীর হিন্দুরা লিপ্ত। কৃষি মুসলমান ও শূদ্রের বৃত্তি। কিন্তু শূদ্রের তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশী। পরন্তু নমশূদ্র শ্রেণীর কৃষকেরা অধিকাংশই পানের চাষ করে। কাজেই বৈদেশিক বাণিজ্য কৃষি ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তনের সূচনা করিয়াছে, তাহার অনেকটাই বাংলার মুসলমানের জীবনকে অভিভূত করিয়াছে।

ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বেও বিদেশীর সাথে আমাদের কারবারের যোগ ছিল না, এমত নহে। কিন্তু উহাতে আমাদের কৃষির বিশেষ কোন স্থান ছিল না। এ দেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আগমন অবধি আমাদের কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশীর কামনার ধন হইয়া পড়িয়াছে। নীল চাষের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া এই পাট চাষের দিন পর্য্যন্ত বৈদেশিক বাণিজ্যের তালিকায় উত্তরোত্তর আমাদের কাঁচামালের রপ্তানী ও পাকামালের আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমন দিন ছিল, যখন ইউরোপে আমাদের শিল্পজাত দ্রব্যের একটা বিশেষ কদর ছিল। আমাদের ঢাকাই মসলিনের প্রতিযোগিতায় কুলাইয়া উঠিতে না পারিয়া ম্যানচেষ্টারের কলওয়ালা বিস্ময়ে বলিয়াছিল, 'It is the shadow of a commodity'. কিন্তু এরূপ উন্নত শিল্পকে নষ্ট করিবার জন্য বিদেশীর যে অনন্ত চেষ্টা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। ঢাকাই ভারতীয় বস্ত্রের বিরুদ্ধে একমাত্র বিলাতেই দুইটি আইন পাশ হইয়াছিল। এমন কি এদেশের বাজারজাত করিবার জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মারফতে প্রথম প্রথম লোকসানেই এখানে কাপড় বিক্রী করা হইত। পরে যখন অষ্টাদশ শতাব্দীতে কলকব্জা আবিষ্কৃত হইয়া নিতান্ত সস্তাদরে এ দেশে কাপড় আসিতে লাগিল, তখন এদেশের বাজার জোলা তাঁতিদের হাত ছাড়া হইয়া গেল। কলকব্জা ও বিজ্ঞানের যুগ আসায় জিনিষ পত্রের দাম কমিয়া গেল। আমাদের দেশের কারিগর তার মান্ধাতার আমলের যন্ত্রপাতি দ্বারা বিশ্ব প্রতিযোগিতায় কুলাইতে পারিল না। তাই তাঁতি তার তাঁত ছাড়িল, কর্ম্মকার হাতুড় নেহাই বেচিল, কলু তার ঘানি বন্ধ করিল, কুম্ভকার কুম্ভ ত্যাগ করিল, চর্ম্মকার আর মরা গরুর খোঁজ করিল না। সবাই অনন্যোপায় হইয়া ভূমির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল। এইরূপে বাংলার ধন জন (capital and labour) অনেকটা একমুখী হওয়ায় কৃষকের সংখ্যা অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। কাজেই আমাদের দেশে যেখানে প্রতি কৃষকের তিন একর জমি সেখানে জনবহুল ওয়েলসে প্রতি কৃষক একুশ একরের অধিক জমি ভোগ করে। পূর্ব্বে গো-মহিষাদির যে

www.pathagar.com

চারণ জমি ছিল ক্রমে উহার প্রায় সবই চাষী জমিতে পরিণত হইয়াছে। কাজেই আজকাল শতকরা আশি জন কৃষক গাই পালিয়া দুধ খাইতে পারে কিনা সন্দেহ। বৈদেশিক বাণিজ্যের কল্যাণে বাঙ্গালীর উপার্জ্জনের অন্য পথ বন্ধ হইয়াই এরূপ অবস্থার সূচনা হইয়াছে। আপনারা জানেন কৃষির উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। ইহাতে ধন জন বাড়াইয়া অনুরূপ লাভের আশা দুরূহ। কাজেই বাঙ্গালী লাভমূলক শিল্প হইতে বঞ্চিত হইয়া ক্রমেই দুর্দ্দিনের সম্মুখীন হইয়াছে। ১৯২১ সনের আদমশুমারী মতে বাংলায় চার লক্ষ লোক ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ভূমির উৎপাদিকা শক্তি হীন হইলেও উহাই বাঙ্গালীর একমাত্র অবলম্বন। এজন্য দুই আঙ্গুল পরিমাণ ভূমির নিমিত্ত এত খুনাখুনি এত মামলা মোকদ্দমা, ইহাতে রাজা মহাজন ও উকিল মোক্তারের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। ভূমির চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় জমিদার তাঁর নানারূপ পাওনার হার অত্যন্ত বাড়াইয়া দিয়াছেন এবং অভাবক্লিষ্ট মামলা পীড়িত কৃষকের মূর্খতার সুযোগ পাইয়া মহাজন তাঁর সুদ ও রেহানের শর্ত্ত চড়াইয়া দিয়াছেন। ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, ভূমির সাথে যার চির সম্বন্ধ ভূমি তার হাত ছাড়া হইয়া ক্রমে ক্রমে মহাজনের করতলগত হইতেছে। এরূপে কয়েক বৎসর চলিতে থাকিলে ইংলন্ডের Yeomen extinction এর মত আমাদের দেশের বর্ত্তমান কৃষক শ্রেণী লোপ পাইয়া কালে মহাজন কৃষকের স্থান লইবে। এবং আজ যাহারা সাধারণ কৃষক তাহারা তখন রোজ মজুর হইয়া মহাজনের খামারে গতর খাটিবে। অনেকে হয়ত মনে করিবেন ইহা আমার একটা অতিরিক্ত চিন্তা মাত্র। কিন্তু মনে রাখিবেন আজ কাল যেরূপ নানা প্রকার প্রচার দ্বারা মধ্যবিত্ত সমাজের দৃষ্টি কৃষির দিকে আকর্ষিত হইতেছে তাহাতে আর দুর্দ্দিন বড় দূরে আছে বলিয়া মনে হয় না। অধুনা বাংলার 'অভয় আশ্রম' কতকটা এই দিকে অগ্রসর হইতেছে। এমন দিন ছিল যখন কৃষি শিক্ষিত যুবকদের কাছে জঘন্য চাষার বৃত্তি ছিল। কিন্তু আজকাল দিন দিন উহার কদর বাড়িয়া চলিয়াছে। অবশ্য মুসলমান মধ্যবিত্ত ও শিক্ষিত যুবক এখনও ইহার প্রতি শ্রদ্ধাবান নহে।

বৈদেশিক বাণিজ্য এইরূপে বাঙ্গালী কৃষককে অভাব অনটনে মহাজনের হাতে তুলিয়া তাহার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত কুয়াসাময় করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু উহাতে মুসলমান কৃষক যতটা অভিভূত হইয়াছে অন্য কেহ ততটা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ সম্প্রদায় হিসাবে কদাচিৎ নিজ জমিজমা হিন্দু কৃষকের হাতছাড়া হইবার সম্ভাবনা আছে। তাহাদের সমাজে সুদ গ্রহণের রীতি আছে বলিয়া ভূমি এক জনের হাতছাড়া হইয়া হয়ত অন্য জনের হাতে যাইতে পারে। কিন্তু গোটা সম্প্রদায়ের অধিকারচ্যুত হইবার আশংকা মোটেই নাই। উপরন্তু মুসলমানের সম্পত্তিও পরিণামে তাহাদের হাতেই স্থান পায়। তারপর মুসলমান কৃষক যেমন বে-হিসাবী ও শরাফৎ তৃষ্ণায় তৃষিত তাহাতে তার ভবিষ্যৎ আরও বিপজ্জনক। এক একটা বিবাহে মুসলমান কর্জ্জ করিয়া শত শত টাকা ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কর্জ্জ করিয়া টিনের ঘর তুলিবার সখও তার কম নয়। ডাক্তার পিনানডিকার তাঁর 'Wealth and Welfare of Bangal Delta'য় লিখয়াছেন যে, ঢাকার উত্তরে কুর্ম্মিটোলা গ্রামে হাজারি খান বলিয়া এক ব্যক্তি ৩০ টাকায় ৬ বৎসর পর ১৫০ টাকা ঋণ পরিশোধের জন্য আবার অন্য মহাজনের কাছ হইতে ১২০ টাকা কর্জ্জ করে। তার ভরসা ছিল পূর্ব্বের মহাজনকে বলিয়া কহিয়া ৩০ টাকা মাপ পাইবে। কিন্তু মহাজন কিছুতেই মাপ দিলেন না, বেচারীও আর অন্য উপায়ে কিছুতেই ৩০ টাকা যোগাড় করিতে পারিল না। সে অগত্যা ১২০ টাকা দ্বারা

www.pathagar.com

ছেলের বিবাহ দিল। এইরূপে তার মোট ২৮০ টাকা কর্জ্জ চলিতে লাগিল। ইহাতে মুসলমান কৃষকের মূর্খতার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন। তারপর, গয়না নৌকায় যাঁরা চড়িয়াছেন তাঁরা জানেন নমঃশূদ্র সম্প্রদায় উহাতে কেমন দু'পয়সা উপায় করে, প্রায় দুই লক্ষ লোক উহাতে লিপ্ত আছে। কিন্তু মুসলমান গৃহস্তের কাছে শুনিয়াছি উহাতে নাকি মান থাকে না। পূর্ব্ববঙ্গে একটা প্রচলিত কথা আছে 'পাটের বাজার চড়িলে মুসলমানের জন্য ইলিশের দোকানে ঢোকা যায় না।' বাংলার গোটা মুসলমান সম্প্রদায়ে সর্ব্বত্রই এই বিকার পরিদৃষ্ট হইবে। ইহার কারণ অনেকটা বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে নগদ টাকার প্রচলন। যখন টাকা পয়সার তেমন চল ছিল না, তখন কৃষককে উৎপন্ন ফসলের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় গামছা কাপড়, দা কূড়াল সংগ্রহ করিতে হইত। এরূপ বিনিময়ের অসুবিধা যাহাই থাকুক না কেন, উহাতে অন্নের জন্য কৃষককে কাহারো উপর নির্ভর করিতে হইত না। কিন্তু আজ কাল ফসল বিক্রয়ে নগদ টাকা হাতে পাইয়া কৃষকের অমিত ব্যয়ের যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছে। আর এই বিংশ শতাব্দীতে খরচ করিবার যথেষ্ট উপায়ও আছে। বাজারে নানা প্রকার রং বেরং জিনিষের অভাব নাই। কৃষক ফসল বেচিয়া যখন বাজারে যায় তখন তার চোখে পড়ে বিদেশাগত চীনা বাসন, কাচের গ্লাস, বিচিত্র রঙ্গের রেশমি চুড়ি, কেমিকেলের অলঙ্কার, রকম রকম সিগারেট এবং আরও কত কি ! আপনারা শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন যে, এক ঢাকাতেই মাসে ৩ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকার Imperial special সিগারেট বিক্রি হয়। কৃষক তার লোভ সামলাইতে না পারিয়া পাটের সব টাকা ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইয়া বাড়ী ফিরে। বছর ভাল পড়িলে কাপড় জুতা কিনিয়া নূতন চাকর রাখিয়া Gentleman of ease বনিয়া যায়। কাজেই বাংলায় আজকাল মাঠ মজুরের বড় অভাব, গত বছর নিড়ানির মৌসুমে দৈনিক মজুরের দাম ১ টাকা হইতে ১টাকা দশ পয়সা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু এই মজুরির পয়সাও বাঙ্গালীর হাতছাড়া হইয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চিমাদের হাতে যাইতে বসিয়াছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য বাঙ্গালীকে একদিকে যেরূপ শিল্পচ্যুত করিয়া তার আয়ের পথ সঙ্কীর্ণ করিয়া দিয়াছে, সেরূপ অন্যদিকে যথেষ্ট বিলাসিতা শিক্ষা দিয়া তাহাকে একটা অনন্ত অভাবের সম্মুখীন করিয়াছে। এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, বাণিজ্যের আয়তন যতই বাড়িয়া উঠে ততই বাণিজ্য লিপ্ত জাতিসমূহ কম আয়াসেই স্বচ্ছলতার মুখ দেখিতে পায়। কিন্তু অবস্থাভেদে ইহারও ব্যতিক্রম হয়। আমাদের কাঁচামাল দিয়া বিদেশের যে শিল্প চলিতেছে, তাহা যদি আমাদের দেশে পাকা হইতে পারিত তাহা হইলে দেশের যথেষ্ট মঙ্গল হইত সন্দেহ নাই। তাহাতে কৃষির উপর এই লোক নির্ভরশীল না হইয়া শিল্প ও ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া স্বাচ্ছন্দে জীবন কাটাইতে পারিত। কিন্তু যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সে আশা দুরূহ। তাই এখন কৃষককে তার ফসল বিক্রয়ের জন্য বিদেশীর আশায় বসিয়া থাকিতে হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের কল্যাণে পাট বাংলার নিজস্ব সম্বল। বিদেশী বাঙ্গালীর কাছ হইতে পাট কিনিয়া আবার তাহারই কাছে পাট হইতে তৈয়ারি চট, থলে Imitation Silk ইত্যাদি চতুর্গুণ দরে বেচিতে আসে।

বেচা-কেনা উভয়ের নিমিত্ত বাঙ্গালীর এই নিঃসহায়তা তাহাকে ভয়ঙ্কর সমস্যার সম্মুখীন করিয়াছে। বিগত যুদ্ধকালীন বস্ত্রের মহার্ঘতা ও পাটের মূল্যহীনতা বাংলার কৃষককে যৎপরনাস্তি বিব্রত করিয়াছিল সন্দেহ নাই। যুদ্ধের প্রারম্ভে চাঁদপুরে একটা লোক এক মন পাট ১টাকা ১০ পয়সা বিক্রী করিয়া তার ছেলেকে লক্ষ্য করিয়া কপাল ঠুকিয়া বলিয়াছিল

www.pathagar.com

'যাদুরে, আর তোদের বাঁচাই কি করে!' ভাবিয়া দেখুন ইহা অপেক্ষা আর ভয়ঙ্কর অবস্থা কি হইতে পারে?

দুনিয়ার প্রায় কেন্দ্র হইতে পাটের জন্য চাহিদা আসে বটে, কিন্তু বাঙ্গালী কৃষক কি তার পাটের উচিৎ মূল্য পায়? উত্তরে বলিব—না। কারণ কৃষক পেটের দায়ে জমিদার মহাজনের উৎপীড়নে দরের জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না—তাহাকে 'যখন যা তখন তা' দামে বেচিতে হয়। নইলে তার দিন চলে না। কাজেই দাম দস্তুরে সে চিরকাল ঠকিয়াই চলিয়াছে। আর জায়াদ্দীপ্ত বৈদেশিক তার বাণিজ্য সম্ভার লইয়া সমুদ্রের বুক ছিঁড়িয়া চলিয়াছে। তার কি উল্লাস। জগতে পাট জন্মায় শুধু বাঙ্গালী, অথচ তার দাম দস্তুরে একচেটিয়া অধিকার নাই। পাটের যা লাভ তার কিছু পায় ফড়িয়া, কিছু দাদনদার, কিছু দালাল, কিছু আড়তদার, আর সকলের চেয়ে বেশী পায় মিলওয়ালা, কিন্তু যে কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া পাট জন্মায় তার ভাগ্যে কোন বছর হয়ত কিছু পড়ে, কোন বছর মোটেই না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে এক মণ পাট জন্মাইতে প্রায় ১২ টাকা খরচ পড়ে, অথচ ৮/১০ টাকা বাজার হইলে কৃষকের আনন্দ ধরে না। ইহার কারণ কৃষক নগদ ব্যয় ছাড়া আপনার ও পরিবার বর্গের খাটুনির একটা মূল্য আছে মনে করে না। ইহা তার চরম মূর্খতা। এবং এই মূর্খতার জন্যই সে বিশ্ব চাহিদার ওজন করিয়া চাষ নিয়ন্ত্রিত করিতে অপারগ।

বঙ্গদেশে স্বাভাবিক অবস্থায় ২৮ লক্ষ একর ভূমিতে পাটের চাষ হইয়া থাকে, তন্মধ্যে প্রতি একরে গড়ে ৩ গাইট, প্রতি গাইটে ৫ মন করিয়া ৮৪ লক্ষ গাইট পাট উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিশ্বের চাহিদা অনুযায়ী ৬০/৭০ লক্ষ গাইট উৎপন্ন হইলেই যথেষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের কৃষক সে খোঁজ রাখে না। কাজেই সে অনেক সময় ৬ টাকায় পাট বেচিয়া ৮ টাকায় চাউল খরিদ করে। এক বছর হয়ত কিছু দর পাইয়া কিংবা নগদ টাকার মোহে পড়িয়া ধান ও বাগান ফসল কমাইয়া কৃষক পাটের ফসল এতই বাড়াইয়া দিয়াছে যে আজকাল বৎসর ব্যাপিয়া ঘরের ভাত খায় এরূপ গৃহস্থ বিরল। এদিকে পাটের তুলনায় মন করা চাউলের দাম দিন দিন অত্যন্ত বাড়িয়া যাইতেছে। যথা :

সন	কলিকাতা টাউন	বাখেরগঞ্জ
১৯০৫	৪.৭০৬ টাকা	৩.১৯২ টাকা
১৯০৮	৬.৩০৯ টাকা	৫.১৭৫ টাকা
১৯২০	৮.৬০২ টাকা	৭.৮২৮ টাকা
১৯২৭	১০ টাকা	·

চাউলের এরূপ দাম বাড়িয়া আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর লাগিয়াছে। কিন্তু কৃষক তার ভ্রান্তি আদৌ বুঝে না। পাট জন্মাইতে যে খরচ ও খাটুনির দরকার ধানের জন্য উহার অর্ধেকও লাগে কি না সন্দেহ। ভোরে কাক পাখী যখন ডাকিতে আরম্ভ করে তখন হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত, মেঘে রৌদ্রে এমন খাটুনি জগতে কোন কৃষক খাটিতে পারে কি না জানি না। এই অতি খাটুনি কৃষকের জীবনী শক্তিকে এইরূপ পঙ্গু করিয়াছে যে, বাংলায় এখন ফি-বছর ম্যালেরিয়া, ওলাওঠা ও বসন্তে হাজার হাজার লোক মারা যায়। অনেকে আমাদের কৃষককে কুটির শিল্পে ঔদাসীন্যের জন্য অভিযুক্ত করেন। কিন্তু তাঁহারা

www.pathagar.com

ভাবিয়া দেখেন না এই ক্লান্ত কলেবর রুগ্ন দেহ মানুষগুলি কেমন করিয়া ছ'মাস হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর আবার চরকা, চটকল বা ইত্যাকার শিল্পে মনোনিবেশ করিবে। অবশ্য কৃষকদের স্ত্রী কন্যার জন্য কুটির শিল্পের যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। আগেকার দিনে ইহারা তাঁতির জন্য সুতা কাটিয়া দু পয়সা উপার্জ্জন করিত। আর আজকাল দিন কাটে না বলিয়া শাশুড়ী ননদের সাথে কোঁদাল বাধাইয়া পল্লীর আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলে। বৈদেশিক বাণিজ্য গৌণভাবে ইহার জনক বলিলে ত্রুটি হইবে না। কারণ যেমন কথায় আছে 'আরে বিবি সুতা কাটেগি ইয়া নেহী? আরে ক্যায়া কাটো মেরে ভাঁইয়া, তাঁতিয়া ত নেহী।' তবে আজকাল চাটাই, পাখা ও মোজা বুনিবার প্রণালী কি। বা কাপড় কাটা ও সেলাই শিখাইয়া আমাদের দেশের এই কর্ম্মবিমুখ স্ত্রী শক্তিকে নানাবিধ অর্থোপার্জ্জনে নিয়োজিত করা দরকার। তবেই দেশের অবস্থা ফিরিবে। জাপানের মেয়েরা ঘরে বসিয়া নানা প্রকার খেলনা ম্যাচ বাতি তৈয়ার করিয়া এদেশের টাকায় দিন দিন স্বচ্ছল হইয়া উঠিতেছে। আর আমাদের দেশের মেয়েরা আলস্যে স্বাস্থ্য ও লাবণ্য হারাইয়া স্বামীর উপর ভূতের মত চাপিয়া বসিয়া আছে।

বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে এমন লোক আছেন যাঁরা কৃষকের প্রকৃত জীবনটাকে না জানিয়া দেশে নানা প্রকার বৈদেশিক আমদানী দেখিয়া মনে করেন বিশ্বের সাথে যোগাযোগ হইয়া কৃষকের অবস্থা অনেকটা উন্নত হইয়াছে। তাঁহারা মনে করেন, বাংলাদেশে যখন নুনের আমদানী বাড়িয়া যাইতেছে, তখন নিশ্চয়ই কৃষকের আহারে অনেকটা বিলাসিতা জন্মিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না, মাছ-দুধের অভাব হেতু কৃষককে প্রতিদিন কিরূপে প্রচুর পান্তা ভাত খাইতে হয়। তাঁহারা এই ভুল ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া নানা প্রকার খাজনা ও ট্যাক্সের সমর্থন করিতেও পরান্মুখ নহেন। কাজেই অধ্যাপক আবুল হুসেন সাহেবের কথায়, 'The Bangal peasant rises in the morning and puts on his gamcha taxed 5% strikes a match box taxed 10%, takes a cheelum taxed 25%, lights a tin lamp taxed 10% with kerosine oil taxed 15%, draws a plough taxed 10%, goes to the field whence he is dragged by a black Chowkidar or a red Barkendaz following him through the day and through life until killed by taxation and illegal exaction, he is lowered in the grave with a piece of cloth taxed 10%' এইরূপে বাঙ্গালী কৃষক একদিকে যেমন কেনাবেচার বাজারে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে তেমনি অন্য দিকে নানা প্রকার অন্যায় ও অতি করের তাড়নায় একান্ত বিব্রত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ইহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন ইহার প্রতিকারের একটু আভাস দিতে চেষ্টা করিব। আমার মনে হয় আমরা যদি কৃষকের অন্তরে তার ব্যথা বুঝিবার ক্ষমতা জাগাইতে পারি তাহা হইলেই সব প্রতিকারের চূড়ান্ত হইবে। আমরা অন্য যত চেষ্টাই করি না কেন যে পর্য্যন্ত কৃষক নিজে active না হইয়া Passive ভাবে বসিয়া থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইবে। আমরা Co-operative Agriculture-এর কথা বলিতে পারি, কিন্তু যদি কৃষক অন্তরে অন্তরে উহার আবশ্যকতা অনুভব না করে, তবে উহাতে কোন ফল হইবে বলিয়া মনে হয় না। পটের ছবি দ্বারা তামাসার কাজ চলে বটে, দূতের কাজ চলে না। কাজেই শিক্ষার প্রচার দ্বারা কৃষকের অজ্ঞানতা দূর করিয়া দিতে হইবে। তবেই কৃষক আপনার সাথে জগতের তুলনা করিয়া জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে। যদি শিক্ষা দ্বারা প্রাণে জাগে

www.pathagar.com

কি তাহাদের দাবী, কোথায় তাহাদের অভাব, তবেই তাহারা উহা চাহিতে শিখিবে, দূর করিতে চেষ্টা করিবে। যেদিন বাংলার কৃষক কাউন্সিল ইত্যাদিতে লোক পাঠাইয়া আপনার কথা বলিতে শিখিবে সেদিন রাজা মহাজন বা জমিদারের অত্যাচার চিরতরে লুপ্ত হইবে। কাউন্সিল গৃহে শতকরা ৮০ জনের কণ্ঠে একই সুর বাজিবে সেদিন বদলাইয়া যাইবে প্রজাস্বত্ব আইনের বিকট চেহারা, লোপ পাইবে নানারূপ ট্যাক্সের অত্যাচার। শুধু তাই নয়, শিক্ষিত কৃষকের হাতেই পাইবে সমবায় সমিতি তার প্রাণ। রিপোর্টের মারফতে আমরা চিরকাল সমবায় আন্দোলনে প্রজাদের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইতে শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেছি। কিন্তু বাস্তবিক কি তা-ই? আমি বলিব-না। কারণ গ্রামের অর্ধ শিক্ষিত লোকেরাই প্রায় চেষ্টা উদ্যোগ করিয়া সমিতি স্থাপন করে এবং পরে নানা ছলে নিরক্ষর কৃষকদিগকে ঠকাইয়া সমিতির অধিকাংশ টাকাই নিজেরা আত্মসাৎ করে এবং অনেক সময় কাগজে কলমে কৃষকদিগকেই ধরাইয়া দেয়। এইরূপে সমবায় সমিতি কৃষকদিগের পক্ষে অনেকটা পোষণ-কলেই পরিণত হইয়াছে। আমার মনে হয় বঙ্গীয় Agriculture ও Co-operative department দ্বয়ের পিছে যে টাকা খরচ হয় তাহা দ্বারা বাঙ্গালী কৃষককে এক বিরাট শিক্ষিত ও কর্ম্মনিপুণ সমাজে পরিণত করা যাইতে পারে।

www.pathagar.com

নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ

মিস ফজিলতন নেসা এম.এ.

সুন্দর ক'রে একটি প্রবন্ধ সৃষ্টি করবার জন্য যা কিছুর প্রয়োজন সে চিন্তাশীলতা বা জ্ঞানের গভীরতা আমার নেই। তাই আপনাদের নিকটে আমার অনুরোধ এই যে, এ'কে প্রবন্ধ হিসাবে বিচার না করে শুধু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত সামান্য দুই একটি কথা বলেই গ্রহণ করবেন।

নারী জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদের রূপটি ফুটিয়ে তোলার ভার আপনারা একটি নারীকেই দিয়েছেন, কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত কি বাস্তবিকই কিছু আছে যা বিশ্বজনীন অনুভূতিরই ফল? একই জিনিষকে মানুষ তার প্রবৃত্তি ও প্রবণতা অনুসারে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখে থাকে, এবং তার থেকে যেটুকু রস গ্রহণ করে থাকে তারও স্বাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমিও তাই একান্তভাবে আমারই অনুভূতিলব্ধ কয়েকটি কথা বলব।

আধুনিক শিক্ষা হতে যা কিছু আমি আমার জীবনে পেয়েছি তাতে হয়ত ভুল পাওয়ার পরিমাণই বেশী। বুদ্ধির ত্রুটিতে অনেক জায়গাই আমি বঞ্চিত, এই কথাটি মনে রেখে আজ আপনারা আমার সব কথা গ্রহণ করবেন।

নারী-জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ সম্বন্ধে বলতে হ'লে আমি বুঝি যে, আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে নারী-জীবন কিছু নূতন উপলব্ধি, নূতন চেতনালাভ করেছে কিনা, এবং যদি লাভ করে থাকে, তবে সেই নারীত্বটুকু তার জীবনে কোন রস জাগিয়ে তুলেছে—তারই আলোচনা আরো ব্যাপকভাবে নিলে এ কথাও বলা যায় যে, এই শিক্ষার সাহায্যে আপনাকে জানবার ও বুঝবার জন্য মানব হৃদয়ে যে অনন্ত কামনা তাকে নারী এতটুকুও চরিতার্থ করতে পেরেছে কিনা তাই এ আলোচনার উদ্দেশ্য।

প্রথমেই আমরা দেখতে পাই যে, আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতে ভুল ত্রুটি যতই থাক না কেন, তবু নারী জীবনে তা মধুরতার স্বাদই এনে দিয়েছে। তার পরিচয় আমরা নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে নবোদ্বুদ্ধ চেতনাতেই পেয়ে থাকি। যদি আমরা অতীত নারী জীবনের সঙ্গে বর্ত্তমান নারী জীবনের তুলনা করে দেখি তবেই মধুরতা এই নূতন আত্মোপলব্ধির চেষ্টার রূপটি পূর্ণ হয়ে আপনি এসে আমাদের চোখে ধরা দেবে। এই আলোচনায় আমরা শুধু এই টুকুই দেখব যে, আধুনিক শিক্ষার প্রচলনের পূর্ব্বে নারী এই সুখ-দুঃখ প্রভৃতি নানারসে ভরা জীবনকে কিভাবে পেয়েছিল এবং এই শিক্ষা আলোকে উদ্ভাসিত নবীন চেতনার সাহায্যেই বা তারা তাদের জীবনকে কিভাবে পাচ্ছে। এখানেই মতান্তরের সৃষ্টি। কিন্তু বিভিন্ন মতবাদকে দূরে রেখে কিছুক্ষণের জন্য আমরা ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখব।

স্রষ্টা আদমকে সৃষ্টি করলেন, কিন্তু বেহেস্তে আদম নানা সুখে থাকলেও কিসের এক অজানিত অভাবে তিনি ম্রিয়মাণ হয়ে থাকতেন। তখন সেই অভাব পূরণ করা হল যাকে

www.pathagar.com

দিয়ে তিনি হলেন আনন্দরূপিনী নারী। এক্ষেত্রে নর–নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসাবে যদি আমি বলি যে 'নারী ও পুরুষ পরস্পরের Complement একে অন্যের Substitute নয়' তাহলে বোধ হয় আপনারা অস্বীকার করিবেন না।

তারপরই আমাদের যে সবচেয়ে পুরান ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে দেখি যে নরনারী জীবন–যাত্রার পথে সৃষ্টির এই মূল উদ্দেশ্যটি ভুলে যায় নি। গৃহের অভ্যন্তরে ও বাহিরে সর্ব্বত্রই নর–নারী পরস্পরের সঙ্গী। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের জ্ঞান, চিন্তা ও সৃষ্টির স্রোত পাশাপাশি বয়ে চলেছে। কর্ম্মের ক্ষেত্রেও তাই। প্রয়োজন অনুসারে হয়ত কোন কোন ক্ষেত্রে কারো দায়িত্ব বেশী রয়েছে, কিন্তু কোথাও একের জীবন অন্যের জীবনের বিকাশে পরিপন্থী হয়ে উঠছে না। কি এক অপূর্ব্ব চেতনা তাদের জীবনকে রসে, গন্ধে, গানে ভরে দিয়ে পূর্ণ করে সুন্দর করে তুলেছে। কিন্তু এই বিশিষ্ট চেতনার জ্যোতি চিরদিন এমনি উজ্জ্বল রইল না। নানা ঘাত প্রতিঘাতে যে শিক্ষা পদ্ধতি তাদের উপলব্ধি এনে দিয়েছিল, সে পদ্ধতি ধীরে ধীরে আবিল হয়ে এল, তাতে আর প্রাণ রইল না—রইল শুধু আচার বিচারের বাহ্যিক আবরণ। তাই ধীরে ধীরে সে চেতনাও ম্লান হতে হতে একেবারেই নিভে গেল। যে শিক্ষার প্রভাবে একটি অপরূপ চেতনা নর–নারীর জীবনকে সুখময় করে তুলেছিল, সে শিক্ষা ও সে চেতনা একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেল।

কিন্তু এই হারিয়ে ফেলার মাঝেও পুরুষ আপনাকে কিছু বাঁচিয়ে রাখল। একান্তভাবেই আপনাকে হারাল নারী। সে যে মানুষ—জীবনের বৈচিত্র্য থেকে রস গ্রহণ করবার অধিকার যে তারও আছে, এই জ্ঞান তার নিঃশেষেই লোপ পেল, এবং সেই সঙ্গেই তার বেঁচে মরে থাকা শুরু হল। তার জ্ঞান লাভের পথ, প্রতিভার স্ফূর্ত্তির পথ সব নষ্ট হয়ে গেল। কর্ত্তব্যজ্ঞান, আত্মসম্মান জ্ঞান বিলুপ্ত হল। পুরুষের ইচ্ছার কাছে নিজেকে নত করে, আচারের দাসত্বে আপনাকে একান্তভাবে বিকিয়ে দিল। নারীর জীবনে বাকী রইল শুধু ব্যর্থতা আর বেদনার হাহাকার।

আজ সে যুগের অবসান হয়েছে ; আজ নবীন ভাবের নব নব বন্যা জগতের মানব হৃদয়ে প্রবাহিত। এই স্রোতের বেগ কোন দেহ একেবারে রুদ্ধ করতে পারে নি। তাই এর আলোড়ন আমাদের এই নিশ্চেষ্ট অসাড় নারী জীবনেও অনুভূত হচ্ছে। এই ভাবের প্রধান বাহন হয়েছে আধুনিক শিক্ষা। এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে এই আলোড়নের ফলে নারী কি পেয়েছে?

সে কথাটাই আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে সকল মতবাদ আলোচনা করে বলতে চাই। আমি বলতে চাই যে, এই শিক্ষা নারীকে পূর্ণতা দিতে না পারলেও, মুক্তি দিতে না পারলেও, পুনর্জ্জন্ম দিয়েছে। সে আপনার প্রাণের অস্তিত্ব ভুলে গিয়েছিল, তাকে সেই বেঁচে থাকবার অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছে। এই তার সার্থকতা। নারী–জীবনে আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ তাই মধুর হয়েছে। অবশ্য একথা বলবার মত স্পর্ধা আমার নেই যে, আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ লাভে নারী জীবন বর্ত্তমানে সবরকমেই মধুর ও সুষমামণ্ডিত হয়েছে। আমি জানি যে এ শিক্ষার মধ্যে ত্রুটি অনেক আছে, এবং এ শিক্ষার সংস্পর্শে এসে অনেক জীবনই বিপরীত পথে চালিত হয়েছে। আমি শুধু এটুকু বলতে চাই যে, এ শিক্ষা সর্ব্বজনীনভাবে নারীকে তার মনুষ্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন করেছে। তাকেই এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের রস গ্রহণ করতে শিখিয়েছে, তাই এর আস্বাদ আমাদের কাছে বড় মধুর।

www.pathagar.com

তবে এই শিক্ষার ফলে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ বা জীবনের সার্থকতা সম্বন্ধে নারীর ধারণা যে অভ্রান্ত একথা বলতে চাই না, এবং একথাও বলব না যে, তাঁরা আজ যে পথে চলছে তাই ঠিক। আধুনিক শিক্ষার আস্বাদ নারী জীবনে যে জাগরণের সাড়া এনে দিয়েছে সে জন্যই আমি তাকে বরণীয় বলে, কাম্য বলে আহ্বান করি। দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে হয়ত আমার বক্তব্য একটু পরিষ্কার হবে।

আত্মনির্ভরশীলতা শিখিয়ে এ শিক্ষা বিধবার ব্যর্থ জীবনে সার্থকতা এনে দিয়েছে। লাঞ্ছনা সহ্য করে, পরের দেওয়া ঘৃণার উচ্ছিষ্টের মায়া ত্যাগ করে আজ সে নিজের উপার্জ্জনে জীবন-যাপনের পথ পেয়েছে। তার কাছে জীবন আজ শুধু শুষ্ক মরুভূমি হয়ে থাকে নি।

জীবনের আদর্শকে বুঝবার একটি চেষ্টা আজ নারীর মধ্যে জেগে উঠেছে। সে প্রয়াস যতই ভুল পথে চালিত হোক না কেন, একথা বোধ হয় সবাই স্বীকার করবেন যে, বুদ্ধিকে বাঁধা পথে চালিয়ে, জড় করে রেখে, ধ্বংসে থেকে রক্ষা করবার চেয়ে, তাকে মুক্তির ভিতর দিয়ে বিধ্বস্ত হতে দেওয়াও শ্রেয়স্কর। জড়তার চেয়ে প্রাণের স্পন্দন সব সময়েই বেশী কাম্য। নারীর জড়তা ঘুচিয়ে আধুনিক শিক্ষা তার মাঝে এ প্রাণের স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে, তাই আজ তার আস্বাদ পাবার জন্য আমাদের এত আগ্রহ। এ যে আমাদের ভাবতে শিখিয়েছে—সংস্কারের বাঁধন ছিন্ন করে আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে শিখিয়েছে। এর সংস্পর্শে এসে, আমরাও যে বেঁচে থাকতে অধিকারী, এ পরম সত্যটির সাক্ষাৎ পেয়েছি। তাই এর প্রভাবকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে, এ শিক্ষা নারীকে অন্তর্মুখী হতে না শিখিয়ে বহির্মুখী করে তুলেছে—নারীর একমাত্র কর্ম্মক্ষেত্র গৃহাভ্যন্তর হতে তাকে বাইরে নিয়ে এসেছে। এতে নারী জীবনের আসল উদ্দেশ্য সফল হতে পারছে না। কিন্তু আমার মনে হয় এ তর্ক এখানে না তুললেও চলে। মানুষকে মনুষ্য পদবাচ্য করতে সাহায্য করাই শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য। একথা আমাদের মনে রাখিতে হবে যে, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর কোন রকম সম্পূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি আজ পর্য্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয় নি। এবং হয়ত ভবিষ্যতেও পাওয়া সহজ হবে না। কাজেই যে শিক্ষা আংশিক রূপেও সে উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয়েছে, সেটা কি নারী কি পুরুষ, সবার জীবনেই সার্থক। তাই যে শিক্ষা নারীকে এত বড় অনুভূতি এনে দিয়েছে তাকে নারী জীবনে নিরর্থক বলে অবহেলা করব কোন সাহসে? হয়ত সে শিক্ষা ঠিক পথ খুঁজে নিতে সাহায্য করে নাই। কিন্তু তবুও সে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে দিয়েছে। প্রাণে যখন সাড়া এসেছে, তখন আজ হোক, দুদিন পরে হোক ঠিক পথ তারা খুঁজে নেবেই। এত বড় দানকে কি অগ্রাহ্য করা যায়?

যত বড় ভুল পথেই অগ্রসর হোক না কেন, নারী ত আজ এই শিক্ষার বলেই জীবনের একটা উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছে। 'আমরা জীবনকে জানব' এই দাবী ত তাঁরা বিশ্ব সম্মুখে আনতে পেরেছে। কিভাবে জানবে, কোন পথে জীবন সম্বন্ধে তাদের সত্য উপলব্ধিটি সহজ হবে তাই নিয়ে মতভেদ করে লাভ কি? কি যে হওয়া উচিত সে বিষয়ে যথার্থ কজন ভাবতে পারে? এক্ষেত্রে নর বা নারীর প্রকৃতি তাকে যে পথে যাত্রা করতে উদ্বুদ্ধ করে, সেই পথেই তাকে যেতে দেওয়া বোধ হয় শ্রেয়। আগেই বলেছি যে নর-নারী সকল ক্ষেত্রেই পরস্পরের

www.pathagar.com

Complement। কাজেই তাদের কর্ম্ম ক্ষেত্র বিশিষ্টরূপে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া যায় না। নারী যদি তার জীবনের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে বহির্মুখীতাকেও প্রয়োজনীয় মনে করে, তাহলে তো তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা চলে না। আর যে শিক্ষা তাকে এই প্রয়োজনটুকুর কথা ভাবতে শিখিয়েছে তাকেও নিরর্থক বলা চলে না। বরং একথা স্বীকার করতেই হয় যে, ভাবতে শিখিয়ে মনুষ্য পদবাচ্য করে তুলেছে বলেই এ শিক্ষার আস্বাদ বর্ত্তমান নারী জীবনে কাম্য হয়েছে।

আজ নারীর মুখে লুপ্ত হাসি ফুটে উঠেছে। বহু বৎসর পর্য্যন্ত অজ্ঞানতার অতল স্পর্শ গর্ভে থেকে আজ তার উত্থান হয়েছে। বহু বৎসর অন্যায় অত্যাচার স'য়ে নারীর ধৈর্য্যচ্যুতি হয়েছে। আজ তাদের লুপ্ত অধিকার ফিরিয়ে নেবার দিন এসেছে।

যে সমাজ নারীকে এতখানি হীন করে রেখেছিল, আজ নব্য শিক্ষার গুণে নারীই আবার জয় গৌরবের চরম শিখরে আরোহন করে বিজয়ী বীরের মতন সেই সমাজের নিকট হ'তে জয়মাল্য আদায় করে নিচ্ছে। শিক্ষার স্বাদ পেয়ে আজ নারী পুরুষের কাছে নিজের অধিকার দাবী করার সাহস ও শক্তি পেয়েছে।

পূর্ব্বে স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিনী মাত্র ছিল, এখন সহকর্ম্মিনী। শিক্ষিতা নারী স্বামীর উপর ধর্ম্ম ও কর্ম্মের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে জীবন ভার বাড়িয়ে তোলে না, স্ত্রীই তাকে সকল বিষয়ে সাহায্য করে তার পরিশ্রমের কষ্ট লাঘব করে দেয়।

ক'এক শতাব্দী পূর্ব্বে পুরুষ যে নারীকে পদদলিত ক'রে চলে গেলে যন্ত্রণায় তার বুক বিদীর্ণ হলেও তার মুখে ভাষা ফুটত না, আজ সেই মূক নারীর মুখে ভাষা ফুটেছে। নব্য শিক্ষা নারীকে তার নারীত্বের গৌরব, নারীত্বের মর্য্যাদা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে।

যেখানে স্নেহ নাই, মমতা নাই, সম্মান নাই, আছে কেবল পরাধীনতা, অন্যায় অবিচার, আধুনিক শিক্ষা সেখানে স্বাধীনতা ও পূর্ণ অধিকার জোর ক'রে আদায় করবার সাহস দিয়েছে। নারীকে আজ প্রাণ খুলে বলতে শিখিয়েছে 'স্বাধীনতা চাই, আত্মার মুক্তি চাই' নারীকে আজ বলতে শিখিয়েছে 'আমরা অজ্ঞতার কালো আবরণে আর ঢাকা থাকব না, আমরা অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী পুরুষের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ করব। আমরা জ্ঞানের আলোকে দীপ্ত হয়ে সেই আলোকে বিশ্ব জগৎ উদ্ভাসিত করব, প্রতি গৃহে মঙ্গল দীপ জ্বালিয়ে জগতের মহৎ কল্যাণ সাধন করব। আমরা স্নেহে মমতায়, দয়ায় সেবায় ঘরে ঘরে শান্তিবারি সিঞ্চন করব। আমরা কুসংস্কার পদদলিত করে জগতের মঙ্গলার্থে অগ্রসর হব।'

নব্য শিক্ষা ভারতের ঘরে ঘরে প্রত্যেক নারীকে জাগাবার ও সমস্বরে স্বাধীনতা চাইবার দীক্ষায় দীক্ষিত করুক এই আমার আন্তরিক কামনা।

আমার বক্তব্য আর বিশেষ কিছু নেই, তবু যেটুকু বলতে চাই, তাকেই পরিষ্কার করে বলতে যেয়ে একই কথা অনেকবার বলে আপনার ধৈর্য্য ও সময় নষ্ট করেছি। আশা, আকাঙ্খা, দুঃখের বিচিত্রতায় জীবন যে পূর্ণ, এই চেতনা নারী হৃদয়ে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে যে শিক্ষা নারীকে জীবনের পূর্ণ পাত্রের রস আস্বাদনে সাহায্য করেছে, সে শিক্ষাকে আমার জীবনে আমি বড় করে পেয়েছি একথা বলেই আজ আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ

খান বাহাদুর মৌঃ মুহম্মদ মুসা সাহেব	৫,
মি. মাহমুদ হাসান, এম.এ. (অক্সফোর্ড)	১০,
মি. এ. হাকীম, এম.এ.	৩,
মিস্ ফজিলতুন্নেসা, এম.এ.	৩,
মি. আবদুল খালিক, বি.এ.	৩,
মি. বি. রহমান, এম. ঈডি.	৩,
মি. কাজী আবদুর রশীদ, বি.এ.	৩,
মি. ফিদা আলী খান, এম.এ.	৩,
মি. এফ. আহমদ, এম.এ.	৩,
মি. মোমতাজ উদ্দীন আহম্মদ, এম.এ.	৩,
মি. আবদুস সোবহান, এম.এ.	৩,
মি. কাজী মোতাহার হোসেন, এম.এ.	৫,
মি. মাহতাব উদ্দীন আহমদ, বি.এ.	৩,
মি. গোলাম রহমান, এম.এ.	৩,
মি. ডব্লিউ. এইচ. এ. সাদানী, এম.এ.	৩,
মি. ওয়াজির আলি, বি.এ.	৩,
মি. আলতাফুর রহমান, এম.এ.	৩,
মি. আবদুর রব চৌধুরী, এম.এ., বি.এল.	৩,
মি. নাজমুল হোসেন, এম.এ.	৩,
মি. সিরাজুল হক, বি.এ.	৩,
মি. মির্জ্জা আবু জাফর, এম.এ.	৩,
মি. দলিলুদ্দীন আহমদ	৩,
ডা. জালাল উদ্দীন আহমদ, এম.এ.এস.	৩,
মি. সৈয়দ নুরুল হক, বি.এ.	৩,
মি. আবদুর রশীদ, বি.টি.	৩,
মৌলভী এ.এফ. মোহাম্মদ	৩,
মি. আরিফউদ্দীন আহমদ, বি.এ.	৩,
খান বাহাদুর মৌলভী কমরুদ্দীন আহমদ, বি.এ.	৩,
খান সাহেব মৌলভী আবুল হাসনাত আবদুল হাই, বি.এ.	৩,
মি. সালেহ আহমদ, বি.এ.	৫,
মি. আবদুল লতীফ, এম.এ.	২,
মি. আবদুল আজিজ তালুকদার, এম.এ.	৩,

www.pathagar.com

মি. কাজী আবদুল ওদুদ, এম.এ.	৫৲
মি. এম.আই. বোরাহ, এম.এ., বি.এল.	৩৲
মি. মুহম্মদ ইয়াহিয়া, এম.এ.	৩৲
মি. আবুল হুসেন, এম.এ., বি.এল	৩৲

দান

খান সাহেব আবদুর রহমান খাঁ	২২৲

ডেলিগেট

নর্থ বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র সমিতির পক্ষ হইতে মি. শুকুর আহমদ	২৲
মুন্সীগঞ্জ ছাত্র সমিতির পক্ষ হইতে মি. আবদুল হাকিম বিক্রমপুরী	২৲

জমা খরচের হিসাব

জমা		খরচ	
অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা আদায়	১২০৲	সভাপতির অভিভাষণ ছাপান ইত্যাদি	২২৲
দান	২২৲	চিঠি ও বিজ্ঞাপন ছাপান	১২৷৷০
ডেলিগেট ফি	৪৲	গাড়ী ভাড়া	৭৸৵
	১৪৬৲	ডাক খরচ	২৴০
সৈয়দ ইমদাদ আলি সাহেবের দান	৫৲	অন্যান্য খরচ	৬৷০
		কুলি	৪৲
		অভ্যর্থনা	৯৩৷০
			১৪৮৴০
		তহবিল	২৸৶০
	১৫১৲		১৫১৲

www.pathagar.com

‘মুসলিম সাহিত্য সমাজে’র মুখপত্র
(বার্ষিকী)

শিখা

তৃতীয় বর্ষ, ১৯২৯

www.pathagar.com

www.pathagar.com

‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব’

শিখা

সম্পাদক

অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এম. এ.

www.pathagar.com

তৃতীয় বর্ষ ১৯২৯

শিখা

সম্পাদক
অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এম. এ.
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের এ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার

প্রকাশক
সৈয়দ ইমামুল হোসেন
মডার্ন লাইব্রেরী
৭৪নং নবাবপুর, ঢাকা।

সর্ব্বস্বত্ব—মুসলিম সাহিত্য সমাজের জন্য সংরক্ষিত

মূল্য : ১ এক টাকা

Printed by — J. C. Das
At the Islamiah Printing Works
2, Kumartooly, Dacca.

www.pathagar.com

সূচীপত্র

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ২৭৪
সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ : আবুল মুজফফর আহমদ বি.সি.এল., বার য়্যাট-ল ২৭৯
তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী ২৯০
আব্বাসীয় যুগ : অধ্যাপক কাজী আকরাম হোসেন ২৯৫
মুসলিম সাহিত্য সমাজ : অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার ৩০২
দারার ধর্ম্মমত : অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগো ৩০৮
ইউরোপীয় সভ্যতায় মুসলিম স্মৃতি : মৌলভী মোহাম্মদ আবদুর রশীদ ৩১১
ইউরোপে শিক্ষার আদর্শের ক্রমবিকাশ : খান সাহেব আবদুর রহমান খাঁ এম.এ, বি.টি ৩২১
কোরানে মানবের স্থান ও অর্থনীতি : খান বাহাদুর কমরুদ্দীন আহমদ ৩৩৭
ফিকাহ্‌র উদ্ভব ও পরিণতি : মৌলভী মোখতার আহমদ সিদ্দিকী ৩৪৪
চলার কথা : মৌলভী আকবর উদ্দীন ৩৫৩
আরবী ভাষা ও কাব্য : মি. ফসীহ্ ৩৬১
দার্শনিক ইব্‌নে রোশদ : অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ ৩৬৭
ইসলাম ও শরীর-চর্চ্চা : মৌলভী বিলায়েত আলি খাঁ ৩৭৪
মানব প্রগতি ও মুক্তবুদ্ধি : মৌলভী নাজিরুল ইসলাম ৩৭৯
কুসংস্কারের একটা দিক : মৌলভী শামসুল হুদা ৩৮৮
ময়মনসিংহের গীত : মৌলভী মোসলেমউদ্দীন খাঁ ৩৯৩
আরবী কাব্য : মৌলভী মোহাম্মদ কাসেম ৪০৩
ধর্ম্ম ও সমাজ : অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন ৪১২
বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা : অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ ৪১৯
স্যার সৈয়দ আহমদ : মৌলভী আবুল হুসেন ৪২৮
তরুণ আন্দোলনের গতি : মৌলভী আবুল ফজল ৪৪০
Muslim Literary Conference ৪৪৮
পরিশিষ্ট ৪৫০

www.pathagar.com

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

সমবেত সাহিত্য-সেবী ভ্রাতৃবৃন্দ ও ভদ্রমণ্ডলী,

উপযুক্ত রূপে আপনাদের অভ্যর্থনা করি—এমন কিছু সম্বল আমাদের নেই। তাই শুধু 'সুনৃতা বাক্' দিয়ে আপনাদের অভিনন্দন কর্‌ছি। স্বাগত মাতৃভাষার সাধকগণ। স্বাগত মাতৃভাষার সেবক ও ভক্তগণ ! 'আহ্‌লান্ ওয়া সহ্‌লান্' ! 'খোশ আমদেদ্'।

আজ দেশের মধ্যে মুক্তির ডাক এসেছে। কিন্তু সে ডাক অতি ক্ষীণ। দূরের বাঁশীর সুরের মত কখন সে কানে এসে লাগে, কি না লাগে। অলস ভীরু কাপুরুষ আমরা, তার উপর তন্দ্রা ঘোরে ভোর। চাই আমাদের জন্য তুরি ভেরীর তীক্‌খিন বিকট নিখাদ নাদ। তা না হ'লে জীবনের রাঙ্গা পতাকার নীচে দলে দলে মুক্তি ফৌজ এসে জমবে না ; তা না হ'লে মুক্তির লড়াই আমাদের চলবে না ; তা না হ'লে মুক্তি আমাদের মিলবে না।

তাই চাই আমাদের বীর্য্যবন্ত সাহিত্য। মাত্র একখানি পুস্তক আরবের বহু যুগের কাল-ঘুম ভেঙ্গে দিয়ে সমস্ত দুনিয়া তোলপাড় ক'রে এক নূতন প্রাণ গড়ে তুলেছে। মাত্র একটি গীত প্রাচীন ফরাসীর শিরায় শিরায় আগুনের শিখা জ্বালিয়ে যত পুরানকে ছাই করে এক নূতন ভাব জগতে জাগিয়ে দিয়েছে। কালাম ও কলমের, বাণী ও লেখনীর এমনই অপূর্ব্ব ক্ষমতা। তাই কুর্‌আন তার দৈবী ভাষায় ঘোষণা করছে 'নূন্ ওয়াল্ ক্বলম্, ওয়া মা য়স্‌তুরূন' '(লক্ষ্য কর) দোয়াত, কলম এবং যা তারা লেখে' (সূরহ্ ক্বলম)।

সাহিত্য যদি সত্যিকার সাহিত্য হয় সে মুক্তি দিবেই—দেহের মুক্তি, মনের মুক্তি, আত্মার মুক্তি। এই তিনটি নিয়েই মানুষ। একটি ছেড়ে অন্যের মুক্তিতে মুক্তি নেই। সাহিত্যের সকল উদ্দেশ্যই ঘুরে ফিরে এসে দাঁড়ায় এখানে, এই মুক্তিকেই মাঝের বিন্দু ক'রে সাহিত্য চারিদিকে ঘুরবে। আলঙ্কারিক মম্মট ভট্ট কাব্যের ফল সম্বন্ধে বলছেন—

> কাব্যং যশসেহর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতর ক্ষতয়ে।
> সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে কান্তাসম্মি ততয়োপদেশ যুজে॥

'কাব্য যশের জন্য, টাকা কড়ির জন্য, আচার ব্যবহার জানবার জন্য, অমঙ্গল দূর করবার জন্য, সদ্য সদ্য পরম শান্তি লাভের জন্য, প্রেয়সীর ন্যায় উপদেশ দিবার জন্য।' সে সাহিত্য বিফল, ষোল আনাই বিফল, যা মুক্তির সন্ধান দেয় না।

আজ সাহিত্যের মার্কা নিয়ে একটা জিনিষ বাজারে চলছে। শুনি তার খাঁক্‌তিও কম নয়, বিশেষ করে যুবক মহলে। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে তরুণ তরুণীদের একটা অপূর্ণ দুর্দ্দান্ত ইচ্ছাকে রক্ত মাংসময় কল্পনা দিয়ে পূর্ণ করা। রহ্‌মানে ও শয়তানে যে তফাৎ, আদুরে ও শরাবে যে তফাৎ, মুক্তি ও বন্ধনে যে তফাৎ আসল সাহিত্যে ও এই নকল সাহিত্যে সেই তফাৎ। হায় ! অবোধ পাঠক জানে না সাইরেনের বাঁশরীর এই সুরের ন্যায় অসাহিত্য তাকে ধ্বংসের দিকে পলে পলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। জাতির সমস্ত যৌব-শক্তি এই সাহিত্য জোঁকের মত নিঃসাড়ে চুষে নিচ্ছে।

www.pathagar.com

সাহিত্যের হাটে যে কেবল এই কামাগ্নিসন্দীপনী বটিকাই বিক্রি হচ্ছে তা নয়। এর চেয়েও ভয়ানক ভয়ানক জিনিষ—একেবারে সাক্ষাৎ বিষয়ে-নানা মনোহর নামে ও রূপে কাটতি হচ্ছে। পরখ করলেই অনায়াসে দেখা যাবে সেগুলির ভিতর আছে কুসংস্কার, ধর্ম্মান্ধতা, জাতীয় বিদ্বেষ প্রভৃতি। এ সমস্ত জাতির আত্মা ও মনকে বিষাক্ত করে দেশে কি অশান্তিই না ঘটাচ্ছে।

আমি রসিক নই.; আর্ট বুঝি না। কিন্তু আর্টের নামে কি গণিকার উলঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গীকেও প্রশ্রয় দিতে হবে? তারীফ কর্‌তে হবে? আমি সাহিত্যের স্বাধীনতা বুঝি। কিন্তু তাই বলে কি সাহিত্যের পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রে অমৃতের নামে বিষ কিংবা রসের নামে প্রস্রাব বিক্রিরও লাইসেন্স দিতে হবে? আমাদের এক জিহাদ ঘোষণা করতে হবে এই অপসাহিত্যের বিরুদ্ধে। তবেই জানি 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' একটা ফাঁকা আওয়াজ নয়—সে এক 'হায়দরি হাঁক' অসত্য, অশিব, অসুন্দরের বিরুদ্ধে অভিযানের। আজ সমস্ত মুস্‌লিম বঙ্গ অনিমিষে চেয়ে আছে তার খিযরের জন্য যে তাকে পরাণ ভরে এই সত্যিকার সাহিত্যের 'আবে-হায়াতের' পরিচয় করে দেবে। বোধ হয় শূন্যে খিযরের আবির্ভাব হয়েছে, নইলে এত সাকী জুটল কোথা থেকে?

> 'উম্‌রি তাঁ বাদা দরায্ আয়্ সাকীয়ানি বয্‌মে জম্।
> গর্‌চি জানি-মান শুদ্ পুর্ ময়ব ব-দওয়ানি শুমা'॥
> জম্ বাদ্‌শার সাকী ভাই সব ! আয়ু তোদের বৃদ্ধি হোক।
> যতই কেন পেয়লা মোদের তোদের' দানে শূন্য রোক। (হাফিজ)

বাহন উপযুক্ত না হলে কেউ তার অভীষ্ট স্থানে পৌঁছুতে পারে না। লক্ষ্য লাভ করতে গেলে সাহিত্যেরও বাহন উপযুক্ত হওয়া চাই। সেই বাহন মাতৃভাষা। মাতৃভাষা ছাড়া আর কোন্ ভাষা কানের ভিতর দিয়ে মরমে প'শে পরাণ আকুল করে? ডন কুইক্‌সোট একটা রোগা ঘোড়ায় চড়ে বাহাদুরি জাহির করতে বেরিয়েছিলেন। তার চেয়ে বাহাদুরি বলতে হবে তাঁদের যাঁরা বিদেশী ভাষার সাহায্যে জাতীয় সাহিত্য গড়্‌তে চান। মিল্টনের ল্যাটিন কবিতা এখন ঘুণের খোরাক হয়েছে। মধুসূদনের Captive Lady এখন ভোলা-দরিয়ার অথই জলে ডুবে গেছে। বঙ্কিমের Rajmohon's Wife-এর সন্ধান দু একটি বইয়ের পোকা ছাড়া আর কে রাখে?

এই প্রসঙ্গে উর্দ্দুর কথা উঠতে পারে। মানি উর্দ্দু শেখা দরকার। কিন্তু তার চেয়ে বেশী দরকার আবরী শেখা। যদি উর্দ্দুর সাহায্যে আব্রহম ভারতে আমরা পরস্পরকে জানতে পারি, আরবীর সাহায্যে ফিলিপাইন থেকে মরক্কো, সাইবিরিয়া থেকে জাভা পর্য্যন্ত সমস্তকে চিনতে পারি। কিন্তু আরবী বা উর্দ্দু শেখা এক কথা, আর তাকে সাহিত্যের বাহন করা আর এক কথা। বলা হয় বাংলায় মুসলিম সাহিত্য নেই। কিন্তু গোড়ায় উর্দ্দুতেই কি ছিল? ফারসীর কথা ধরা যাক্। তা'তে এক বিরাট মুসলিম সাহিত্য আছে। অল্প বিস্তর তুর্কীতে আছে; সিন্ধীতে আছে, মালয় ভাষায় আছে। শুরুতে এদের কোনটাই ত মুসলিম সাহিত্যের ভাষা ছিল না। তবে বাংলার বেলা কেনই বা দোষ হবে? একটা মস্ত কথা আমরা ভুলে যাই যে আজ নতুন করে নয় বরং প্রায় চারশ বছর ধরে মুসলমান এই বাংলা সাহিত্যের সেবা করছে। শুধু তাই নয় আমরা আরও জানি যে মুসলমান আমীর ওমরার নেক নজরেই বাংলা সাহিত্য

www.pathagar.com

গড়ে উঠেছিল। সেই য়ূসুফ শাহ, হোসেন শাহ, নসরৎ শাহ, পরাখল খান, ছুটী খানের নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সোনার হরফে লেখা থাকবে। কাজী দৌলত আরাকান রাজ খিরি খুধম্মা রাজার সময়ে (১৬২২-১৬৩৮ খৃস্টাব্দে) 'সতী ময়নাবতী ও লোর চন্দ্রানী' রচনা করেন। কিন্তু সম্পূর্ণ করবার পূর্ব্বেই মারা যান। তা পূরা করেন সৈয়দ আলাওল। সৈয়দ আলাওল মধ্য যুগের বাঙ্গালী মুসলিম সাহিত্যিকদের মাথার তাজ। তিনি আরবী, ফারসী, উর্দ্দু, সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রথম রচনা 'পদ্মাবতী' আরাকান রাজ থদো মিন্তার রাজার রাজত্ব সময়ে (১৬৪৫–১৬৫২ খৃস্টাব্দে)। খুব সেকেলে বলেই এঁদের নাম করলাম। এঁদের ছাড়াও অসংখ্য কবি, গায়ক ও লেখক বরাবরই বাংলা ভাষায়ই তাঁদের রচনা প্রকাশ করে ধন্য হয়েছেন। শ্রদ্ধেয় ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের ও বন্ধুবর মৌলভী আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদের প্রসাদে তাঁদের অনেকের খবর আমরা পেয়েছি। আজ আমরা কেমন করে বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করতে পারি? তিন শতাব্দীর পূর্ব্বের কবি কাজী দৌলতের বাংলার নমুনা দেখুন!

বিস্‌মিল্লা প্রধানেক নাম নিরঞ্জন।
যে নাম স্মরণে কার্য্য সিদ্ধি সর্ব্বক্ষণ॥
কি করিব যমদূতে বিপক্ষ বিবাদ।
সর্ব্বসিদ্ধি জয় জয় সে নাম প্রসাদ॥
রহমান নাম অর্থ করুণা সদায়।
যে নাম স্মরণে দুঃখ দারিদ্র্য খণ্ডায়॥
সুজন দুর্জ্জন আদি যত জীব জান।
ভক্ষকেরে কুশলে করান্ত ভক্ষ দান।
রহিম নামের অর্থ কি কহিমু আর।
দীন দয়াময় প্রভু মহিমা অপার॥
দয়ার সাগর প্রভু পতিত পাবন।
দুঃখী পাপী নৃপতির সহায় কারণ॥
লীলায় পাপের মূল করয় বিনাশ।
তূলা রাশি দহে যেন প্রচণ্ড হুতাশ॥

এক শ্রেণীর কাছে বাংলা ভাষা বলতে বোঝায় অনুস্বার বিসর্গ ছাড়া সংস্কৃত। বাংলার সৌভাগ্য সে শ্রেণী এখন এক রকম লোপ পেয়েছে। তেমনি অন্য দিকে আর এক শ্রেণী আছে তাদের কাছে বাংলা মানে আরবী–ফারসী–উর্দ্দু–বাংলার এক অপূর্ব্ব খিচুড়ী। দুই রকমের দুটো উদাহরণ দিচ্ছি।

১ নম্বর

চমকি বিশ্ব নব–বীর্য্য সূর্য্য–নৃপ রজনি–রাজ্য অবসন্নে,
উদিত উদয় গিরি–কনক–মরু পরি গঞ্জি মঞ্জুমণি বর্ণে।
দীপ্ত রশ্মিচর সৈন্যনিচয়সম, (বিষম যুগাগ্নি বিনিন্দে)
ভস্মিল হতকর–পতিত–রজনিকর–যোদ্ধৃনিকর উড়ুবৃন্দে।

২ নম্বর
হল্‌কুমে হানে তেগ ও কে বসে ছাতিতে?
আফতাব ছেয়ে নিল আঁঠিয়ারা রাতিতে!
আসমান ভরে গেল গোধূলিতে দুপরে,
লাল নীল খুন ঝরে কুফারের উপরে!*

এই দু দলের হাত থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষা করতে হবে। তবেই বাংলার প্রাণ বাঁচবে। তা না হলে বাংলা মরে ভূত হয়ে যাবে। একটি নয় দুটো। একটি ব্রহ্ম দৈত্যি, আর একটা মাম্‌দো। আমরা জীবন্ত বাংলাকেই চাই, তার ভূতকে নয়।

টেকচাঁদ, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষার অনেকটা সংস্কার হয়েছে। এখন কিছু বাকী ভাষার দিক দিয়ে। কিন্তু বাংলার বানান বিভীষিকা এখনও ঘোচেনি। সেখানে মস্ত বড় একটা সংস্কারের দরকার। সংস্কৃতের দুটো ব বাংলায় একাকার হয়ে বানান সংস্কারের পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। তিনটে শ, ষ, স দু'টো ণ, ন, দুটো জ, য এদেরও একাকারের দরকার আছে। বানান সংস্কারের নজীর পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশে পাওয়া যাবে। কিন্তু কারও ত সাহসে কুলায় না। ব্রহ্মশাপের ভয়ে নাকি!

খালি বানানে নয়, অক্ষরেও তার সংস্কারের দরকার আছে। যুক্তাক্ষরগুলি অনেক স্থলেই রাসায়নিক মিশ্রণের মত হয়ে আছে। এতে যে খুঁট আখুরে ছেলে মেয়ের প্রাণান্ত হয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যতে বাংলা যখন ইংরেজি ফরাসী আদি ভাষার মতন পৃথিবীর একটা গণ্যমান্য ভাষা হয়ে উঠবে, তখন হয়ত লাতিন হরফ চালাতে হবে। আপাততঃ যুক্তাক্ষরের একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বিদ্যানিধির মতটা সকলে মেনে নিলেই গোলমাল চুকে যায়। কিন্তু আমরা এমনই প্রাচীন পন্থার দাশ যে এই সংস্কারটুকুও বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নই।

আমরা অনেকবার বলেছি মুসলিম সাহিত্য কেউ হয়ত বলতে পারেন 'কি গোঁড়ামি! সাহিত্যেও আবার জাত বিচার।' তাই একটু খোলাসা করে বলা দরকার মুসলিম সাহিত্য বলতে কি বুঝি। 'আমাদের ঘর ও পর, আমাদের সুখ ও দুঃখ, আমাদের আশা ও ভরসা, আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ নিয়ে যে সাহিত্য, তাই আমাদের সাহিত্য। কেবল লেখক মুসলমান হলেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ত ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে হিন্দুর সাহিত্য রস সংগ্রহ করে হিন্দু সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য করবে মুসলিম সমাজ থেকে। এই সাহিত্যের ভিতর দিয়েই বাংলার হিন্দু মুসলমানের চেনা পরিচয় হবে। চেনা হলেই ভাব হবে। 'To know is to love.' এই সে দিন দীনেশ বাবু বলেছেন, 'যদি মুসলমানগণ তাঁহাদের সমাজের উন্নত চরিত্রগুলি সুন্দর মহিমান্বিত' বর্ণে চিত্রিত করিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যে উপস্থিত করেন, তবে হিন্দু মুসলমান এক সঙ্গে তাঁহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবেন। আমরা

---

* দুঃখের সহিত আমরা লিখতে বাধ্য হচ্ছি যে, ২ নম্বরের মধ্যে যে মাধুর্য লালিত্য ও কাব্য ঝংকারের সমন্বয় হয়েছে তা ডক্টর সাহেব আদৌ লক্ষ্য করেন নাই। আমাদের মতে এই দৃষ্টান্তটি একেবারেই অপ্রযোজ্য। ইহার একটি শব্দও বেমানান বা দুর্বোধ্য হয় নাই। বরং আরবী ফরাসী শব্দের সহিত বাংলা শব্দের মিলনে যে মাধুর্যের সৃষ্টি হয় এই ২ নম্বর তাহারই একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। —সম্পাদক

www.pathagar.com

একেই বাংলার মুসলিম সাহিত্য বলি। হিন্দু সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য হিন্দুর মন্দির ও মুসলমানের মস্‌জিদের মত এক সম্প্রদায়ের একচেটে জিনিস নয়। সুহৃদ্বয় সত্যেন্দ্র দত্ত, ভক্তিভাজন গিরিশচন্দ্র সেন, মাননীয় কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রদ্ধেয় জলধর সেন, শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি হিন্দু লেখকও অনেক মুসলমান সাহিত্য রচনা করেছেন। বাস্তবিক বাংলা সাহিত্য বাংলার হিন্দু মুসলমানের অক্ষয় মিলন-মন্দির হবে। হিন্দু সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য হবে তার দুই কুঠরী। সর্ব্বত্রই সকলের অবাধ প্রবেশ অধিকার। যে পর্য্যন্ত মুসলিম সাহিত্য না গড়ে উঠ্‌ছে সে পর্য্যন্ত মিলন মন্দির পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না।
তবে এস হিন্দু ও মুসলমান ! এস সাহিত্যিক ও সাহিত্য-ভক্ত ! এস কবি ও গায়ক ! এস ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ! আমরা এই মিলন মন্দির গড়ে তুলি। এস কিশোর-কিশোরী, এস তরুণ-তরুণী, এস জরৎ-জরতী, এই মিলন মন্দিরে এক মন প্রাণ হয়ে মুক্তি সাধনা করি।

এখন ঋষি কবির ভাষায় প্রার্থনা করে আমার অভিভাষণ শেষ করি :

চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর

আপন প্রাঙ্গণতলে দিবস শর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,

যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎস মুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্ব্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালি রাশি
বিচারের স্রোতঃ পথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি পিতঃ
আমাদের* সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

---

* মূলে আছে—'ভারতেরে'। — লেখক

www.pathagar.com

সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ

আবুল মুজফফর আহমদ বি.সি.এল., বার. এ্যাট.ল

মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,—

আপনারা এই সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত করিয়া আমাকে যে অশেষ সম্মান দিয়াছেন তজ্জন্য সর্ব্বপ্রথম আপনাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। কিন্তু আজ নিজে সভাপতি না হইয়া আপনাদের সহিত মিলিয়া আমার চেয়ে অধিকতর বিজ্ঞ ও শক্তিশালী কোন মহাত্মাকে আপনাদের ভবিষ্যৎ পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্য এই সভার সভাপতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ পাইলে আমার পক্ষে ইহাপেক্ষা ঢের বেশী সুখের বিষয় হইত।

বন্ধুবর মিঃ হুসেন যখন আমাকে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার গ্রহণ করিতে আমন্ত্রণ করেন তখন আমার মনে শঙ্কার সঞ্চার হইয়াছিল। কারণ বহুদিন হইল আমি সাহিত্য চর্চ্চা ত্যাগ করিয়া আইন চর্চ্চায় মন দিয়াছি। কাজেই, আধুনিক বিবিধ সাহিত্যিক ভাবধারার সহিত আমার কোন প্রত্যক্ষ পরিচয় নাই। অতএব আপনারা একজন প্রবীণ অভিজ্ঞ সাহিত্যিকের নিকট হইতে যাহা আশা করিত পারিতেন তাহা আমার নিকট হইতে কখনই আশা করিতে পারেন না। তিনি বিষয়টি আরও মধুর করিয়া বলিতে পারিতেন এবং সত্যকার সাহিত্যিক রুচি সৃষ্টির জন্য তিনি আপনাদের উৎসাহ ও আকাঙ্ক্ষা আরও বেশী উদ্দীপিত করিতে পারিতেন। আমার অবস্থা বরং একজন সাধারণ গুরুমহাশয়ের মতো—যিনি তাঁহার ছাত্রের প্রয়োজনের বেশী কিছু দিতে এবং তরুণ প্রাণে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে অসমর্থ। তবুও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি এবং ভরসা করি, আমার সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিলে আপনারা উদার গুণে তাহা মার্জ্জনা করিয়া লইবেন। আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করি যেন তিনি এই অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত করেন।

সর্ব্বপ্রথম আমি এই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র সভ্য সারথিগণকে বিশেষতঃ সম্পাদক ও সভাপতি সাহেবকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। গত তিন বৎসর তাঁহারা এই সমাজের উন্নতির জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গের তরুণ সমাজে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইতে, জ্ঞানের পিপাসা সৃষ্টি করিতে এবং জ্ঞানের অমৃত ধারার সন্ধান দিতে যাইয়া তাঁহারা যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অনন্যমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা অশেষ ধন্যবাদের পাত্র। এই সমাজের শৈশব অবস্থায় তাঁহাদের যে কি প্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইতেছে তাহা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি। আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট এই প্রার্থনা করি তিনি যেন তাঁহাদের মনে অধিকতর উৎসাহ, তেজ ও শক্তি দান করেন যাহাতে এই সমাজ অচিরে সমগ্র বাংলা তথা ভারতের যাবতীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান-মার্জ্জিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিচয় লাভ করিতে সমর্থ হয়।

www.pathagar.com

আসল কথা তুলিবার আগেই আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই আমাদের বর্ত্তমান অজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রতি। আপনারা জানেন, আধুনিক জগতের মুক্তবুদ্ধি ও জ্ঞান-দীপ্ত জাতিসমূহের মধ্যে বাংলার মুসলমানের স্থান সর্ব্বনিম্নে। স্বভাবতঃই আমরা অনুকরণ প্রবণ। অন্যের হাবভাব আচার ব্যবহার গতিবিধি সমস্তই হুবহু অনুকরণ করিবার একটি প্রবল ইচ্ছা আমাদের মধ্যে জাগ্রত। কিন্তু আমি সতর্ক করিতেছি কোন কিছুই বিচার-বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। কোন ভাবধারা ভাল বলা হইলেই বা প্রচারিত হইলেই যে গ্রহণ করিতে হইবে তাহা নহে, বিচার করিয়া তাহার গূঢ় সত্য সম্বন্ধে বিশেষরূপে নিঃসন্দেহ হইয়া তাহা গ্রহণ করা উচিত। কারণ কোন একটি ভাবধারা একটি বিশেষ আবহাওয়ার বা দেশে কার্য্যকরী হইতে পারে বটে, কিন্তু অন্য আবহাওয়ায় বা দেশে তাহা তদনুরূপ কার্য্যকরী নাও হইতে পারে। প্রত্যেক আন্দোলনের প্রাণ বুঝিবার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা করা দরকার। প্রত্যেক অনুষ্ঠান প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয় হইলেও তাহা যুক্তি-বিচারের কষ্ঠিপাথরে যাচাই না করিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নয়। মৌলিক চিন্তাই সাহিত্যিক আন্দোলনের প্রাণ এবং যুক্তি, বিচার, বিশ্লেষণ এই মৌলিক চিন্তার জনক ও পরিপোষক। ইহাতে ভাব বিপর্য্যয় ঘটে না বরং সাধারণ জ্ঞান প্রখর হয়। মোট কথা, মৌলিকতাই সাহিত্যের প্রসার বৃদ্ধি করে কিন্তু অনুকরণ তাহার প্রাণ সংহার করে। বাংলা সাহিত্য ইসলামের অগ্নি-রসে মার্জ্জিত হইয়া উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক এবং আধুনিক জগতের প্রয়োজন অনুসারে মুসলিম সমাজের সামাজিক, আর্থিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার আলোচনায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠুক।

সাহিত্য কি

এস্থলে জাতি বিশেষের সাহিত্যের জন্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু ইঙ্গিত করা কর্ত্তব্য। সাহিত্যের সংজ্ঞা একান্ত করিয়া কেহই আজ পর্য্যন্ত দিতে সমর্থ হন নাই। আমি এ সম্বন্ধে সামান্য একটু ইঙ্গিত করিব মাত্র। আমার মনে হয়, কি ব্যক্তি কি জাতি যখন আপনার সত্তায় উদ্বুদ্ধ ও তাহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে জাগ্রত হইয়া উঠে তখনই সাহিত্য-ধারা প্রবাহিত হইতে শুরু করে। এই ব্যক্তিত্ব বা আত্মানুভূতি আর সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্‌তায়লার উপলব্ধি একই পর্য্যায় ভুক্ত।

من عرف نفسه فقد عدف ربه

ইহার পোষকতা আমরা পারস্য কাব্যের প্রথম চরণেই দেখিতে পাই।

من امن پیل دما ن من امن شیر یلی

نام من بهر ام کنیتم بو جبله

এই কাব্যে শাহ্‌নামার প্রসিদ্ধ বীর বাহরাম গোর পারস্যের সুদূর অরণ্যে দুর্দ্দান্ত গোর খারের শিকার কালে স্বকীয় শৌর্য্য ও বীর্য্যের বর্ণনা করিতেছেন। প্রবাদ আছে, পারস্য কাব্যে প্রথম এই দুইটি চরণ উচ্চারিত হইলে জনৈক প্রবল পরাক্রান্ত পারস্য সম্রাট বন্য জন্তু শিকার কালে স্বীয় অসাধারণ শৌর্য্য ও বীর্য্য সম্বন্ধে সজাগ হইয়া উঠেন। উদ্ধৃত চরণ দুইটি বাহরাম

www.pathagar.com

গোরের আত্মানুভূতিরই প্রকাশ বৈ আর কিছু নয়। চির রহস্যময় বিশ্ব-স্রষ্টার ইঙ্গিতে গোর তাঁহার এই উপলব্ধি অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য বাক্যে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল অপর সকলই তাঁহার এই উপলব্ধিতে উদ্বুদ্ধ হউক। এই প্রকার প্রকাশের সাহায্যে তিনি অজ্ঞাতসারে সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছিলেন। বস্তুতঃ সাহিত্য স্রষ্টা বলিয়া যাঁহারা জগতে অমর হইয়াছেন—তাঁহারা যে শুধু তাঁহাদের অন্তরাত্মার উপলব্ধি করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন তাহা নহে তাঁহারা বিশ্বের অপরূপ রহস্যজ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বিশ্ববিশ্রুত সাহিত্যিকগণের দৃষ্টি কত মার্জ্জিত ও প্রসারিত, অনুভূতি কত তীব্র ও গভীর ! তাঁহাদের জীবন অসীম আনন্দে নৃত্য করিয়া চলে আর এই সুন্দর ভুবনকে নিরানন্দ বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না। তাঁহাদের অন্তশ্চক্ষুতে এমন এক অভিনব আলোক রেখার সম্পাত হয় যাহার তুলনা কি স্বর্গে কি মর্ত্তে অতীব বিরল। তাই আমরা সত্যই কবি Words worth-এর সঙ্গে গাহিতে পারি—

> '.........Add the gleam
> The light that never was on sea or land,
> The Consecretion and the poets dream'.

এই সমস্ত সাহিত্যিক পুরোহিত আমাদের দৃষ্টিপথে খুলে ধরেন সেই—

> 'Magic casements opening on the foam of perilous seas in fairy lands for larn.'

ইহাতে একদিকে যেমন বিশ্বের সৌন্দর্য্য ও মহিমা প্রকাশ পাইতেছে অন্যদিকে তেমনি সমস্ত সৃষ্টবস্তুর অন্তর্নিহিত এবং মানব-অন্তরের চিরন্তন পরমানন্দ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবি ওয়াউস্ওয়ার্থ যখন বিশ্বজনীন আনন্দের গান গাহিয়াছেন তখন এই আনন্দই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। কবি গৌরব সেখ সাদীও গাহিয়াছেন :

برك در ختان سبزدر نظر مو شيار

هرور قى د فتر يست معرفت كرل گار

ব্যক্তির পক্ষে যাহা জাতির পক্ষেও তাহাই প্রযোজ্য। কোন জাতিই সর্ব্বাগ্রে আপনার সত্তায় উদ্বুদ্ধ না হইয়া সাহিত্যের জন্ম দিতে পারে না। যে মুহূর্ত্তে এই অনুভূতি ও আত্মবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে চেতনা জাগ্রত হইয়া উঠে সেই মুহূর্ত্ত হইতে জাতির সাহিত্য-পুষ্প মুকুলিত ও প্রস্ফুটিত হইতে শুরু করে। তাহার সৌরভ-মাহাত্ম্য তখন জাতির অস্তিত্বকে মহিমামণ্ডিত করিয়া তুলে। কোন কিছুই আর তখন তাহার গতি রুদ্ধ করিতে পারে না। সাহিত্যের প্রাণশক্তি মানবজাতির সংহতি-সাধন করিবার জন্য একটি কার্য্যকরী উপকরণ। সত্যকার সাহিত্যপ্রীতি বিশ্ব-শক্তির সহিত মোকাবিলা করাইয়া বিভিন্ন প্রাণসংহারক শক্তি ও পৃথক পৃথক বিরুদ্ধস্বার্থবিশিষ্ট ক্ষুদ্র সমাজকে একই পথে চালিত করিতে সক্ষম হয়। মূলতঃ সাহিত্য প্রাণ এবং জীবন-চর্চ্চার একটি চমৎকার উপায়। কবি, ঔপন্যাসিক, ধর্ম্মযাজক সকলেই মানুষ ও তাহার প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার জন্য সাহিত্যকে সম্পদশালী করিয়াছেন।

www.pathagar.com

সাহিত্যের উদ্দেশ্য

সাহিত্যের কাজ মানব মনকে উন্মুক্ত করিয়া তাহার গতিপথের সমস্ত বাধাবিঘ্ন অপসারিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে সংস্কৃত ও মার্জ্জিত করিয়া বিশ্বরহস্য উপলব্ধি করিবার জন্য শক্তিশালী করিয়া তোলা। সাহিত্য-চর্চ্চায় মন ক্রমশঃ বিকশিত হইয়া তাহার বিচিত্র প্রবৃত্তির উপর সংযম লাভ করিয়া অভিনিবেশ, উদারতা, কার্য্য তৎপরতা, বিচার বুদ্ধি ও ভাব-প্রকাশের ক্ষমতায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। ইহাতে চরিত্রের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায় এবং অভিজ্ঞতার সীমা প্রশস্ত হইতে থাকে।

সাহিত্যের ভাষা

ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাষার প্রয়োজন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, যে ভাবসম্পদে অন্তরাত্মার চেতনা প্রকাশ পায় এবং যে ভাবের ভিতর প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে তাহা আমাদের প্রকৃতি-সুলভ ভাষায় ব্যক্ত করা প্রয়োজন। সেই সুপ্রকাশিত ভাবই প্রকৃত সাহিত্যের মূল উপাদান। যে ভাষা আমরা মাতৃস্তন্য পান করিতে করিতে শুনি ও আবৃত্তি করি সে ভাষার চেয়ে এমন কোন্ ভাষা আছে যাহাকে আমরা আমাদের প্রকৃতিগত বলিয়া মনে করিতে পারি? আমরা বাঙ্গালী। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সুতরাং আমাদের শিক্ষার বাহন এবং আমাদের সাহিত্যের ভাষা যে বাংলা ভাষা হইবে সে সম্বন্ধে আর কোন তর্কই চলিতে পারে না। আমি জানি কেহ কেহ বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষার বাহন উর্দ্দু হওয়া উচিত মনে করিয়া খুব আন্দোলন করিয়া থাকেন। কিন্তু সে আন্দোলন ব্যর্থ হইবেই হইবে। কেননা উহা আমাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। মুসলিম সাহিত্যের জন্য আমরা বাংলা ভাষাই অবলম্বন করিব। উর্দ্দু ও বাংলার মধ্যে আর কোন মধ্যপন্থা নাই। অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ইসলামের ভাব-সমৃদ্ধিতে বাংলা ভাষা ক্রমশঃ অধিকতর সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে এবং তজ্জন্য অনেক উর্দ্দু, আরবী ও ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া বাংলা ভাষার অঙ্গ পুষ্ট করিতে হইবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী হইতেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যসেবী কবি ও লেখকের মধ্যে যাঁহারা এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অমর কবি সত্যেন্দ্রনাথ বহু আরবী ছন্দে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কবিতা লিখিয়া বাংলা সাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বাবু শচীন্দ্রলাল দাস বর্ম্মণের লেখা হইতে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, কেমন সুন্দরভাবে আরবী ফারসী শব্দ বাংলা শব্দের সহিত মিল খায়। লাইন কয়টি এই—

'কানে কানে গেয়ে গান ইরানের বুল্‌বুল্‌
সারাটি পরাণ মোর করে গেছে মশ্‌গুল
কি চাহনি বান হানে আঁখি পরি সুর্ম্মা।
যুগ ভাবি নাহি যদি দেখি এক লহমা।'

www.pathagar.com

এই আরবী, ফারসী শব্দগুলি ঝঙ্কার কেমন মধুর ! আর একটি দৃষ্টান্ত দেখুন।

'আঁখিতে সুর্ম্মারেখা অধরে তাম্বুল,
হেলায় রঞ্জিত তব নখাগ্র রাতুল,
জরিতে জড়িত বেণী রুমালে তাম্বুল
বাদশার ছিলে তুমি খেলার পুতুল।'

এই বাংলা ও ফারসী শব্দের চমৎকার সংমিশ্রণে সেই অতীত মোগল বাদশাহর হেরেমের বিলাসিতা, সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা ও জাঁকজমকের চিত্র কেমন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শক্তিশালী মুসলিম সাহিত্যিকের আবির্ভাবে অচিরেই বাংলা ভাষা ইসলামের ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। আমাদের তরুণ কবি নজরুল ইসলাম সে কাজ বেশ কৃতিত্বের সহিত করিতেছেন। তাঁহারই আদর্শে আমাদের তরুণ সাহিত্যিকগণ আমার এই আশা ফলবতী করিয়া তুলিবেন সন্দেহ নাই। মুসলিম সাহিত্যিকের রচনা সম্পদে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইলে হিন্দু ও মুসলিম কালচারের একটি মনোরম সমন্বয় ঘটিবে এবং সেই সমন্বয়েই হিন্দু-মুসলিম মিলন-সমস্যার সমাধান হইবে।

এতক্ষণ সাহিত্যের সার্থকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে বলা হইতেছিল। কিন্তু আফসোস ! আমাদের সাহিত্য-চর্চ্চার ক্ষেত্র কোথায়? আমাদের সমাজের অতি অল্প লোকই সাহিত্য বুঝিবার উপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়াছে। কি দারুণ লজ্জার কথা ! আমাদের সম্মুখে বিশাল ক্ষেত্র পড়িয়া আছে কিন্তু তাহা এখনও আগাছায় পরিপূর্ণ। সকলে মিলিত হইয়া আগাছা তুলিয়া ফেলিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে ঐ ক্ষেত্র চাষ করিতে হইবে। তবেই তাহাতে ফলপ্রসূ বৃক্ষ রোপন করা সম্ভবপর হইবে। এজন্য চাই সর্ব্বাগ্রে আমাদের বালক বালিকাগণকে সমভাবে সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার সুযোগ সরবরাহ করিয়া দিয়া শিক্ষিত করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা। জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য শিক্ষাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। শিক্ষাই ইহলোক পরলোকের মঙ্গল ও কল্যাণ পথ উন্মুক্ত করে। আমাদের ধর্ম্ম গুরু হজরত মুহম্মদ শিক্ষাকেই মানবজীবনের একমাত্র ভূষণ বলিয়া উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি নর নারী উভয়ের জন্যই শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন। কোরান তাহার সাক্ষ্য দেয়।

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة

প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি শিক্ষিত নয় তাহার জন্মলাভ হইয়াছে বলা যায় না। দেখিবার, শুনিবার এবং অনুভব করিবার শক্তি তাহার একরকম নাই বলিলেই চলে। সে কেবল পশুর মত খাইতে এবং নিদ্রা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য স্পষ্ট। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার জন্য সরকার বাহাদুর একটি বিল প্রস্তাব করিয়াছেন। ইহাতে আমাদের সমাজ বেশ উপকৃত হইবে। সুতরাং এই বিলের ব্যবস্থা অনুসারে যদি কোন শিক্ষা-কর আমাদের উপর ধার্য্য হয় তাহাতে আমাদের এতটুকু আপত্তি করা উচিৎ হইবে না।

এই সম্পর্কে আমি নারী-শিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিতে চাই। নারী শিক্ষিত না হইলে নর পঙ্গু থাকিয়া যায়। আমাদেরও হইয়াছে তাহাই। আমরা পঙ্গু। আমাদের

www.pathagar.com

ধর্ম্ম গুরু যদিও নরনারীকে সমভাবে শিক্ষিত করিবার আদেশ জারী করিয়া গিয়াছেন, তবু আমাদের সঙ্কীর্ণ চিত্ত মৌলবী মৌলানা সাহেবগণ নারী শিক্ষাকে একেবারে বর্জ্জন করিয়াছেন। ফলে, আজ আমাদের নারীমাত্রই অশিক্ষিতা থাকায় আমাদের জাতীয় জীবন অবনতির অভিশাপে অভিশপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুগে যুগে দেশে দেশে যে সমস্ত মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহাদের জীবনে তাঁহাদের জননীদের প্রভাব কত সুফল প্রসব করিয়াছে তাহা আপনারা অবগত আছেন। আধুনিক জগতের বীর্য্যবান উন্নতশির জাতিসমূহ, এমনকি তুরস্ক, মিশর, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনের মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ আজ নারী-শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করিয়া স্কুল কলেজের দ্বার নারীর জন্য উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। গভীর পরিতাপের বিষয়, মুসলিম ভারতই এ বিষয়ে সাংঘাতিকরূপে পশ্চাদপদ। আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণও নারী-শিক্ষার আবশ্যকতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তাহার প্রসারের জন্য প্রাণপণ করিতেছেন।

বন্ধুগণ, আপনাদের অনুমতি হইলে, আমার প্রাচ্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে তুরস্ক, মিসর, সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইনে নারী শিক্ষার যে আন্দোলন শুরু হইয়াছে তৎসম্বন্ধে সামান্য একটু ইঙ্গিত করিতে ইচ্ছা করি। মিসরের কথাই বলি। সেখানে সম্প্রতি বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এক বৎসরের মধ্যে ১৩৭০টি বাধ্যতামূলক ফ্রি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিক্ষা মন্ত্রী এজন্য বিশেষ পরিশ্রম করিতেছেন। এই চেষ্টার তুলনায় আমাদের চেষ্টা কিছুই নয়। কতদিন ধরিয়া শিক্ষা বিলটি কাউন্সিলে পেশ আছে, কিন্তু তাহার কোন মীমাংসাই এখনও হয় নাই,—কাজ আরম্ভ করা ত দূরের কথা। দেশের লোকও শিক্ষা সংস্কারের প্রতি একেবারে উদাসীন।

মিসরে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নারী-শিক্ষা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। অচিরেই শিক্ষা ক্ষেত্রে বালিকাগণ বালকগণের সমকক্ষ হইয়া উঠিবে। উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রেও নারীর অবাধ প্রবেশ। তাহারা সেখানে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তথাকার নারী সম্প্রদায় পর্দ্দা ত্যাগ করিতেছে। অতি সম্ভ্রান্ত বনিয়াদী পরিবারেও পর্দ্দা শিথিল হইয়াছে। পর্দ্দার সঙ্গে ফেজের বিরুদ্ধেও একটি আন্দোলন শুরু হইয়াছে। উদার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মিসরে অন্ন-সমস্যা ও বেকার-সমস্যা দূর করিবার জন্য নানা প্রকার শিল্প বাণিজ্য শিক্ষার বহু অনুষ্ঠান প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি মক্তবের ধর্ম্ম-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব কল্যাণ অর্জ্জনের শক্তি সৃষ্টি করিবার জন্য আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু একটি বিষয় আমি একটু পরিতাপের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। আধুনিক মিসরীয় ছাত্রছাত্রী ধর্ম্মানুষ্ঠান পালনে উদাসীন হইয়া পড়িতেছে। তাহারা ইউরোপীয় আদব কায়দা, জীবনায়োজন, পোষাক পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়া নমাজ সম্বন্ধে কোরানের বিধিনিষেধ পালনে অবহেলা করিতেছে। বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ও অঙ্গভঙ্গি তাহাদের নিকট রুচি-বিরুদ্ধ এবং অসুবিধাজনক বোধ হইতেছে। তাহারা এই বাহ্যিক প্রক্রিয়ার উপর আদৌ জোর দিতে চাহিতেছে না। আমি একটি সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম, 'শিক্ষা হইতে ধর্ম্মকে বিচ্ছিন্ন করা উচিত নয়, কারণ ধর্ম্মের উপরই চরিত্রের প্রকৃত ভিত্ত প্রতিষ্ঠিত হয়।' তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিবার যথেষ্ট সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল। সেই সময়ে তাহারা অকপটে তাহাদের মনের কথা যে ভাবে প্রকাশ করিয়াছিল তাহাতে আমার মনে হইয়াছিল বস্তুত তাহারা ধর্ম্মপ্রবণ,

www.pathagar.com

কিন্তু বাহ্যিক আনুষ্ঠানিক আচারের চাপে তাহাদের ধর্ম্মভাব বিনষ্ট হইতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে তাহারা বলে, অবিলম্বে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলির সরলতা সম্পাদন করাই, এমন কি সম্ভব হইলে সেগুলি ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা বিচার-বিমুখ আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার অনাবশ্যক কড়াকড়িতে তাহারা মনে করে তাহাদের আত্মা মৃতপ্রায় হইয়াছে। এটা ভাবিবার কথা বটে।

এই একটি দৃষ্টান্ত হইতে আপনারা বুঝিতে পারিবেন, আধুনিক জগৎ এবং আমাদের অন্যান্য দেশের মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ কত দ্রুত শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এখন আমাদের উপায় কি?

আপনারা নারায়ণগঞ্জের ইসলামিয়া Education Trust-এর কথা শুনিয়া থাকিবেন। বালক বলিকাকে সমভাবে শিক্ষিত করিয়া তোলাই এই Trust-এর উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অনুসারে Trust পরিচালিত স্কুলগুলিতে ধর্ম্মনীতি-শিক্ষা ও শরীর-চর্চ্চা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। এই Trust-এর আর এক উদ্দেশ্য শিল্প-বাণিজ্য-শিক্ষা বিস্তার এবং ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের সমাজের আর্থিক সমস্যার সমাধান করা। এই Trust-এর কার্য্যে আপনাদের সহানুভূতি ও সাহায্য নিতান্ত প্রয়োজন। সরকারের মুখপানে দেশের শিক্ষা বিস্তারের জন্য তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের এক মুহূর্ত্ত সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই। আমাদের সমবেত চেষ্টায় দেশের শিরায় শিরায় শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। এই সমস্ত শিক্ষা কেন্দ্র হইতে যে সমস্ত শিক্ষিত ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়া আসিবে তাহারাই সাহিত্যকে জীবন্ত করিয়া তুলিবে। এই সদ্য প্রতিষ্ঠিত Trust আন্দোলনকে উপযুক্ত যুক্তি পরামর্শ ও আলোচনার সাহায্যে অন্যান্য বিরুদ্ধ পন্থী প্রতিষ্ঠানের সংঘর্ষ হইতে রক্ষা করা এবং চিন্তাশীল সাহিত্য স্রষ্টাগণকে উৎসাহিত করা একান্ত প্রয়োজন।

সামাজিক কুসংস্কার : শিক্ষার বিঘ্ন

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিবার পথে সমাজের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার পর্ব্বত প্রমাণ বাধার সৃষ্টি করিতেছে। ভারতে আমরা আচার ও প্রথার বন্ধনে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা আছি—যদিও সে সমস্ত প্রথা বহু পূর্ব্বেই অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে। আজ সেই প্রথার খোসা আছে শাঁস নাই। কিন্তু আমরা খোসাই পূজা করিতেছি। ইহার সঙ্গে আবার মোল্লাশ্রেণীর দৌরাত্ম্য আরও আমাদের কার্য্যের বিঘ্ন ঘটাইতেছে। মোল্লাগণ দুর্ভাগ্যক্রমে ইসলামের ঔদার্য্যগুণ হইতে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছেন। এই সংকীর্ণচিত্ত মোল্লাপীড়িত অর্ধশিক্ষিত বা শিক্ষিত গোঁড়া সম্প্রদায় এমন নিদারুণ ভাবে রক্ষণশীল যে, তাঁহারা বালিকাদের কথা ত দূরে থাকুক, বালকগণকেও আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে বাধা দেন। তাঁহারা মনে করেন এই সমস্ত কেন্দ্রে শিক্ষালাভ করিলে তাঁহাদের সন্তান সন্ততি ধর্ম্মহীন হইয়া খোদাতায়ালার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে। এই ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহারা হাদিস, ফিকাহ, আরবী শিখাইয়া আখেরের নেকী হাসিল করিবার লোভে মক্তব-মাদ্রাসার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা একথা কিছুতেই বুঝিতে চাহেন না যে, এই সমস্ত মক্তব-মাদ্রাসার সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া আধুনিক জগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করিবার পথ তাঁহারা সাংঘাতিকভাবে রুদ্ধ করিয়া ফেলিতেছেন। বর্ত্তমান জগতের শিক্ষা

www.pathagar.com

বিস্তারের জন্য কত মনীষী নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া অতি নির্ব্বোধকেও অতিপ্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। আর আমরা আজ আমাদের চক্ষু মুদিত করিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানের পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছি। ইহা অপেক্ষা আত্মঘাতী আর কি হইতে পারে? যে সমস্ত প্রাচীন প্রাণহীন আচার ও অন্ধ সংস্কার আমাদের শিক্ষা তথা সাহিত্য প্রসারের পথ রুদ্ধ করিতেছে তন্মধ্যে আমাদের পর্দ্দাই সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক। বলা বাহুল্য, আমাদের ধর্ম্মগুরুর জীবদ্দশায় পর্দ্দাপ্রথার এত কড়াকড়ি আদৌ ছিল না। উম্মীয় ও আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে মহিলাগণ নিঃসঙ্কোচে বাহিরে চলাফেরা করিতেন—এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইয়াও জনসাধারণের মজলিসে মুক্তকণ্ঠে বক্তৃতা দিতেন। মুসলিম বিজেতাগণ যখন পারস্য ও বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সংস্পর্শে আসিলেন তখনই তাঁহারা নারীর মর্য্যাদা ও মূল্য ক্ষুণ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। সেইদিন হইতে মুসলিম পতনের যুগ শুরু হইয়াছে। সুখের বিষয়, আধুনিক মিসর, তুরস্ক, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ দ্রুত পর্দ্দাপ্রথা ত্যাগ করিতেছেন। তুরুস্ক ত একেবারেই ত্যাগ করিয়াছে। তাহার ফলে তুর্কী নারী আজ সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দ গতিতে আপনার ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি করিতেছেন।

বন্ধুগণ, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি পর্দ্দাপ্রথা বর্জ্জন করিয়া তুরস্ক অশেষ কল্যাণের পথ মুক্ত করিয়াছে। আজ তুর্কী নারী তাই তুরস্কে যাবতীয় জাতীয় আন্দোলনে পুরুষের সমকক্ষ হইয়া তাঁহার শক্তি প্রয়োগ করিতেছেন। ব্যবসায় বাণিজ্য, অফিস, আদালত, স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটি সর্ব্বত্রই তুর্কী নারীর অবাধ গতি। অহো! খোদাতায়ালার যদি এমনি মরজি হইত যে, আমরা এক কলমের খোঁচায় পর্দ্দাপ্রথা উঠাইয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে কি কল্যাণই না হইত! তাই বলি, আপনারা যদি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন যে, পর্দ্দাপ্রথা আমাদের প্রাণশক্তি খর্ব্ব করিতেছে, তবে আপনারা সত্যকার দেশপ্রেমিক ও সমাজ হিতৈষীর মত এই সর্ব্বনাশী পর্দ্দাপ্রথা একেবারে তুলিয়া দেওয়ার জন্য প্রাণ পণ করুণ।

আমাদের অবনতির অন্যতম বিশিষ্ট কারণ সঙ্গীতচর্চ্চায় গোনাহর ভয়। সঙ্গীত নিষেধ করা হইয়াছে হজরতের দোহাই দিয়া। কিন্তু হজরতের জীবন আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি কখনও সঙ্গীত নিষেধ করেন নাই বরং নিজে সঙ্গীত শুনিতেন এবং তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী হজরত বিবি আয়েশা সিদ্দীকাকে শুনাইতেন। মানবজীবনের উপর সঙ্গীতের প্রভাব কত বড় সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা বাহুল্য। এই বলিলে বোধহয় যথেষ্ট হইবে যে, আধুনিক চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বলেন শরীরের পুষ্টি সাধনের জন্য আলোক ও বায়ুর যেমন প্রয়োজন। আত্মার মুক্তি ও স্ফূর্ত্তির জন্য সঙ্গীতের তেমনি প্রয়োজন। যে শিক্ষা-ব্যবস্থায় বালক বালিকাগণের হৃদয়-পুষ্প সৌরভময় করিয়া তুলিবার জন্য সঙ্গীত শিক্ষার স্থান নাই। সে ব্যবস্থা আমার মতে অসম্পূর্ণ ও নিষ্ফল। সঙ্গীতের সঙ্গে ললিতকলা শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা না হইলে সুকুমারমতি শিশুদের চিত্তখোরাক আদৌ বিকশিত হইতে পারে না। এস্থলেও মোল্লা সাহেবদের অন্ধবিশ্বাস ও সঙ্কীর্ণচিত্ততা আমাদের চিত্তবিকাশের পথে কণ্টক স্বরূপ হইয়া আছে। তাঁহারা হজরত মুহম্মদের দোহাই দিয়া চিত্র-চর্চ্চায় বিঘ্ন ঘটাইয়াছেন। তাঁহাদের এই নিষেধ হাস্যকর বৈ আর কিছু নয়। আপনারা আপনাদের রুচি জ্ঞানকে সাক্ষ্য করিয়া বলুন, রাফেল, ডা ভিনসি,

www.pathagar.com

মাইকেল এঞ্জেলো প্রমুখ বিশ্ব বিখ্যাত চিত্রকরের চিত্র দর্শন করিয়া আপনাদের চিত্ত কি অপরূপভাবে ভরপুর হইয়া উঠে না? ইউরোপের যে কোন অঞ্চলের অতি নগণ্য যাদুঘরেও প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়। তত্তৎঅঞ্চলের কবি, গায়ক ও চিত্রকরের অপরূপ সৃষ্টি প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ লোকের চিত্ত আনন্দসমৃদ্ধ করিতেছে। কিন্তু গভীর লজ্জার কথা যে, সঙ্কীর্ণচিত্ত মুসলিম ধর্ম্মপুরোহিতদের বাড়াবাড়ির ফলে বিগত কতিপয় শতাব্দীর মধ্যে শাস্ত্র–পীড়িত মুসলিম জগতে বিশ্বের দরবারে আসন লাভ করিতে পারে এমন নামজাদা গায়ক, চিত্রকর বা শিল্পী অতি অল্প সংখ্যকই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে, মধ্যযুগের অবসান হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত মুসলিম জগৎ বিশ্বের জ্ঞান ভাণ্ডারে তেমন কোন মৌলিক সৃষ্টি দান করিতে পারে নাই। মৌলিক সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা তাহাদের যেন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এইক্ষণ মুসলিম ভারত, তুরস্ক, মিসরের ন্যায় অকুতোভয়ে সঙ্গীত, ললিতকলা ও কাব্য–চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেই তাহার মুক্তি তথা পূর্ণকল্যাণ ও মঙ্গলের ধারা দ্রুত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। তখনই ভারতীয় মুসলমান শক্তিমান হইয়া জীবনের পূর্ণ আস্বাদ লাভ করিয়া দীপ্ত তেজে অগ্রগামী জাতির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইবে।

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ও অনুবাদ

আমি গোড়াতেই বলিয়াছি, মৌলিকতাই সাহিত্যের প্রাণ ও সঞ্জীবনী শক্তি জোগায় কিন্তু সকলেই মৌলিক সৃষ্টি করিতে সক্ষম নহে। কারণ সকলের মানসিক শক্তি একরূপ নহে। এজন্য আমি বলি, 'সাহিত্য সমাজে'র যে সমস্ত সভ্য মৌলিক সৃষ্টি করিতে অসমর্থ তাঁহাদের পক্ষে ভাল ভাল জ্ঞান সমৃদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদে হাত দেওয়া কর্ত্তব্য। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনূদিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। শুধু মুসলিম কালচারের পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার জন্য আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু ভাষায় লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলির অনুবাদ কার্য্যে আপাতত হাত দেওয়া যাইতে পারে। এই অনুবাদ সহজ সরল বাংলা ভাষায় মুদ্রিত করিয়া দরিদ্রতম ব্যক্তির কুটিরেও পৌঁছাইয়া দেওয়া চাই। তবেই বাংলাব্যাপী প্রচলিত অন্ধসংস্কার দূরীভূত হইবে। কোরানের বাংলা অনুবাদ আরো সুন্দর করিয়া করা উচিৎ। কোরান ও অন্যান্য আরবী ফারসী গ্রন্থসমূহ বাংলা ভাষায় অনূদিত হইলে আমার বিশ্বাস অচিরেই মুসলিম বাঙ্গলায় এমন এক নব যুগের সূচনা হইবে যেমন পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাইবেল ইংরাজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হওয়ার পর এক নব মুক্তির যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। এই সমস্ত অনূদিত গ্রন্থ প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম বাঙ্গলায় তথা মুসলিম ভারতে এমন এক নব সংস্কারের যুগ আসিবে যাহাতে অন্ধ সংস্কারের বন্ধন এবং নীতি ও ধর্ম্মের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং ধর্ম্মের এক নবজোশ উদার্য্য ও প্রেমের পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া মানব সমাজের সর্ব্বপ্রকার স্বাতন্ত্র্য ও ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধতা দূরীভূত করিয়া বিশ্বকল্যাণ ও সত্যকার মঙ্গলকে সার্থক করিবে। আরবী ফারসী গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের জ্ঞান বিজ্ঞান সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থ বাংলায় তর্জ্জমা করিয়া ফেলা দরকার।

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র প্রতি এই অনুবাদ কার্য্যের জন্য আমার বিশেষ অনুরোধ।

www.pathagar.com

অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। লাইব্রেরী জনসাধারণের জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত করিবার পক্ষে বিশেষ হিতকর। মুসলিম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ লাইব্রেরী বিশেষ প্রয়োজন। কারণ মুসলিম বাংলায় পুস্তক ক্রয় করিয়া জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার মত ক্ষমতা কয়জনের আছে? লাইব্রেরী সেই ক্ষমতার অভাব দূরীভূত করে। লাইব্রেরীর উপকারিতা সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু বলিতে চাই না। সে সম্বন্ধে আপনারা সকলই অবগত আছেন। তবে এইটুকু বলিতে চাই যে, লাইব্রেরী শুধু নাটক উপন্যাস ও হাল্কা কবিতার পুস্তক লইয়াই হয় না। সেখানে সর্ব্বপ্রকার চিন্তাশীল লেখকদের পুস্তক থাকা চাই। আর বড় বড় লেখকদের পুস্তক ধারাবাহিক ভাবে পাঠ করা উচিত। পাঠে সর্ব্বদাই একটি বিশিষ্ট নিয়ম অবলম্বন করা আবশ্যক, কারণ পাঠে শৃঙ্খলা না থাকিলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না।

শিল্প বাণিজ্য ও অর্থকরী শিক্ষা

আপনারা জানেন বাঙ্গালী মুসলমানের আর্থিক অবস্থা অতীব শোচনীয়। এই অবস্থা হইতে তাহাদের মুক্তি সাধনের জন্য কিছু করা দরকার। অধিকাংশ কৃষিজীবী ও শ্রমিক শ্রেণীর লোক। তাহাদের মধ্যে সাহিত্যিক রুচি সৃষ্টি করা বিশেষ কষ্টকর। মানুষ মাত্রই রুটীর জন্য ব্যগ্র। রুটী-সমস্যার সমাধান না হইলে সাহিত্য-সমস্যার সমাধান অসম্ভব। সুতরাং সর্ব্বপ্রথম অর্থকরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা নিতান্ত প্রয়োজন। অধিকাংশই রুটীর জন্য বাঁচিতে চায়। আমরা আমাদের মুনাজাতে আগে দুনিয়ার খায়ের চাহিয়া পরে আখেরাতের খায়ের চাহি। এজন্য অর্থকরী শিক্ষার বিস্তার যত দ্রুত হয় ত তই দেশের ও আমাদের দুঃস্থ সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। যে শিক্ষা আমাদের রুটী অর্জ্জনে বিশেষ হিতকর আজ আমাদের সেই শিক্ষা চাই। কিরূপে শ্রমিক কার্য্যদক্ষ হয়—কিরূপে অল্প পরিশ্রমে অধিক উৎপাদন করিতে পারা যায়—কিসে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পায় ইত্যাদি বিষয় অবলম্বনে বিস্তর পুস্তক সঙ্কলন করিয়া জনসাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে বদ্ধ পরিকর হওয়া কর্ত্তব্য। এ কার্য্যেও 'সাহিত্য সমাজে'র হাত দেওয়া উচিৎ। দেশের ও সমাজের আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পবাণিজ্য সম্পর্কিত বিবিধ সমস্যার প্রতি এই 'সাহিত্য সমাজে'র দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিৎ। ইহার কার্য্য সর্ব্বতোমুখী না হইলে ইহার উদ্দেশ্য সার্থক ও সফল হইবে না। আশা করি 'সাহিত্য সমাজ' দেশের বিভিন্ন রুচির অনুকূল বিবিধ সমস্যার সমাধান কল্পে ইহার শক্তি নিয়োজিত করিয়া সমাজের উন্নতি পূর্ণাঙ্গ করিতে চেষ্টা করিবেন।

উপসংহার

এইক্ষণ আমার এই মামুলী কথাগুলি শুনিয়া আপনারা যে ধৈর্য্য ও ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে গভীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি জানি আমার এই বক্তৃতায় কোন মৌলিকতা নাই। কেবল আমি আমাদের দেশের বিশেষতঃ মুসলিম সমাজের অত্যাবশ্যকীয় সমস্যাগুলির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। চতুর্দ্দিক নৈরাশ্যের অন্ধকার ঘণীভূত হইয়া উঠিতেছে—সমাজের অধিকাংশই উদাসীন। তবু তাহারই মাঝে 'সাহিত্য সমাজে'র সারথিগণের দুঃসাহস দেখিলে প্রাণে আশার

www.pathagar.com

সঞ্চার হয়। তাঁহারা অদম্য উৎসাহে বাংলার পতিত মুসলিম সমাজকে যুক্তির পথে আনিবার জন্য বড় কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। খোদাতায়ালা তাঁহাদের এই মহৎ কার্য্যে অধিকতর উৎসাহ ও সাহস প্রদান করুন, মনে প্রাণে এই প্রার্থনা করি। যদি এই তরুণ স্বার্থত্যাগী সারথিগণ তাঁহাদের এই কঠিন ব্রতে আরও কিছুদিন ধরিয়া টিকিয়া থাকিতে পারেন, তবে আমি নির্ভয়ে বলিতে পারি তাঁহারা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের জন্য এক অতি সুন্দর, সুখদায়ক ও উজ্জ্বল প্রভাতের আগমন অনিবার্য্য করিয়া তুলিবেন। তখন আমরা সকলে আধুনিক ভারতের গৌরব, কবি ইকবালের কণ্ঠে গাহিতে পারিব :

اقبا كا ترا نه نلك لر اهى كرويا

هو تاهى ةاده پيما پهو كا روان همارا .

www.pathagar.com

তৃতীয় বার্ষিক বিবরণী

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র বয়ঃক্রম তিন বৎসর পূর্ণ হইল। এই সময়ের মধ্যে ইহা ধীরে ধীরে আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া ক্রমশঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অধ্যাপক মৌঃ আবুল হুসেন, অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ, তরুণ কবি আব্দুল কাদের, অধ্যাপক মৌঃ আনোয়ারুল কাদির প্রভৃতি কয়েকজন উদ্যমশীল ব্যক্তি অগ্রণী হইয়া প্রথমে এই 'সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার ফলে, কয়েকজন নূতন লেখকের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তরুণদের মধ্যে উৎসাহ ও বিচারমূলক গবেষণাবৃত্তি জাগরিত হইয়াছে। এই 'সমাজে'র মুখপত্র স্বরূপ আমরা ইতিমধ্যে দুইখানা 'শিখা' বাংলাদেশের সাহিত্যিকবৃন্দের নিকট উপস্থিত করিয়াছি। খোদার কৃপায় 'শিখা' যেরূপ আদর লাভ করিয়াছে এবং অল্পদিনের মধ্যেই ইহার ভাব বৈশিষ্ট্য দ্বারা গুণী সমাজে যেরূপ পরিচিত হইতে পারিয়াছে তাহাতে আমরা প্রকৃতই খুব উৎসাহিত হইয়াছি। এই 'সমাজে'র উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই অনেক কথা বলা হইয়াছে, এখন সে সমস্তের পুনরুক্তি করা নিষ্প্রয়োজন। বৃক্ষের পরিচয় তাহার ফলেই পাওয়া যায়। এজন্য আলোচ্য বৎসরে এই 'সমাজে'র তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত কার্য্য হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে।

প্রথম অধিবেশনে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কালিকারঞ্জন কানুনগো মহাশয় 'হিন্দী সাহিত্য ও মুসলমান' শীর্ষক একটি সুললিত ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি প্রথমতঃ হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষার প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া এতদুভয়ের সাদৃশ্যটি ভালরূপে বুঝাইয়া দেন। অতঃপর আমীর খসরু, মালেক মুহম্মদ জায়েসী, মোল্লা দাউদ,গং কবি। খান খানান আবদুর রহিম, রস খান, ওসমান, নুর মহম্মদ, দীন দরবেশ প্রভৃতি বিভিন্ন যুগের কবি ও সাধকদের পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া, তাহা হইতে সুন্দর সুন্দর আবৃত্তি করিয়া ও তাহার মর্ম্ম বুঝাইয়া দিয়া সকলের মনোরঞ্জন করেন। লেখক বলেন, এই সমস্ত কাব্য শুধু প্রেমের গীতহার মাত্র নহে—এগুলি তীক্ষ্ণানুভূতি সম্পন্ন দ্রষ্টার কল্পনাকুশল বস্তু বর্ণনায় সমৃদ্ধ। বিশেষ করিয়া তিনি 'পদ্মাবৎ', 'প্রেম-বটিকা', 'ইন্দ্রাবতী' প্রভৃতি কয়েকখানি কাব্য গ্রন্থের কথা খুব প্রশংসার সহিত উল্লেখ করেন। উপরোক্ত কবিগণের মধ্যে প্রায় সকলেই পাঠান ও মোগল বাদশাহদিগের নিকট হইতে প্রচুর উৎসাহ ও সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমন কি বাদশাহ আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত হিন্দুকে ঘৃণা করিলেও হিন্দীকে ঘৃণা করেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দী ও বাংলা ভাষা মুসলমানদের পক্ষে আদৌ বিজাতীয় ভাষা নহে। পরিশেষে জ্ঞান-ভক্তি এবং সাহিত্যের দিক দিয়া সুফী সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানে মিলন স্থাপনের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করেন।

অনেকেই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন মুসলমান বাদশাহগণ ভারতবর্ষকে আপন দেশ মনে করিয়া তাহার সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। জ্ঞানের দিক দিয়া বেশ একটা উন্নত রুচি এবং অনেক খানি ঔদার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

তখনকার সাহিত্যে নিম্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতিও যথেষ্ট সহানুভূতির সুরটি স্পষ্ট অনুভূত হয়।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন, অধ্যাপক মৌঃ আবুল হুসেন সাহেব। বিষয়, 'বাঙ্গালী মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা' দ্বিতীয় প্রবন্ধ। এ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম প্রবন্ধ প্রথম বৎসরের 'শিখা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি বলেন হিন্দু মুসলমানের ভিতর শিক্ষার অসমতা দূর করা এবং রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য একই আদর্শের শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমানের জন্য পৃথক পৃথক প্রতিষ্ঠান না করিয়া একই স্থানে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। মাদ্রাসায় যে এক নূতন প্রণালীর শিক্ষাবিধি প্রচলিত হইয়াছে, তাহা অবশ্য সমাজের মঙ্গলের জন্যই কল্পিত হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহাতে কোন ফল হইতেছে না। সেই শিক্ষাই আদর্শ শিক্ষা যাহাতে প্রীতি ও ঔদার্য্য বৃদ্ধি প্রায়, জীবন ধারণের ক্ষমতা জন্মে এবং নূতন নূতন সঙ্কটময় অবস্থায় পড়িলে তদনুযায়ী জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি উৎপন্ন হয়। এইরূপ কতিপয় সাধারণ সূত্রের উল্লেখ করিয়া একটি শিক্ষা পদ্ধতির খসড়া উপস্থিত করেন। তাহাতে চারিটি ভাষা শিক্ষা করিবার আবশ্যকতা এবং তাহার উপায় প্রদর্শন করেন। তাঁহার মতে পূর্ব্বে সাধারণভাবে শিক্ষায় কতকদূর অগ্রসর হইবার পর অল্প সংখ্যক ছাত্র ইচ্ছা করিলে বিশিষ্ট মুসলিম বা হিন্দু কালচার সম্বন্ধীয় শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। পাঠ্য তালিকা বা শিক্ষণীয় বিষয়ের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি যে খসড়াটি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হিন্দু মুসলমান ও ইংরাজ শিক্ষাতত্ত্ববিদ বিশেষজ্ঞগণের দ্বারা পরীক্ষিত ও সংশোধিত হইয়া কার্য্যে পরিণত হইলে, দেশের কল্যাণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

এ সভায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। তিনি লেখকের উদারতা ও স্পষ্টবাদিতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলেন, মুসলমানকে বৈদেশিক লুণ্ঠনকারী ভাবে দেখা হিন্দুর অন্যায়। আবার হিন্দুকে কাফের ও ভারতীয় কালচারকে কাফেরী কালচার মনে করাও মুসলমানের পক্ষে অন্যায়। অধ্যাপক আবদুল ওদুদ সাহেব বলেন, আমাদের বৃহৎ চিন্তা নাই ; হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, ফিরিঙ্গী প্রভৃতি সকলকে যখন ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী মানুষ হিসাবে, ভাই ভাই রূপে দেখিতে শিখিব, যখন বেদনাশীল, প্রেমপ্রবণ, ভাবুক কর্ম্মীর সৃষ্টি হইবে, তখনই সত্যিকার কার্য্য সম্ভবপর হইবে। অধ্যাপক কানুনগো মহাশয় বলেন, মুসলমান সমস্ত নূতন ভাবধারাকেই সন্দেহ ও অপ্রীতির চক্ষে দেখে ধর্ম্ম নাশের ভয়ে,—কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার, মুসলমানও অনেক পরিবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিয়াছে, এটা ত ঐতিহাসিক ঘটনা। তিনি আরও বলেন, নূতন চিন্তার সংঘর্ষে পুরাতন পন্থীদেরও দৃষ্টিসীমা কিছু প্রসারিত হয়—সেই টুকুই নূতন আন্দোলনের স্থায়ী প্রভাব। সভাপতি খান সাহেব আবদুর রহমান খাঁ বলেন, কোন বৃহৎ চিন্তাই ব্যর্থ হয় না। কার্য্য ও চিন্তার সংঘর্ষে সমাজের মনস্তত্ত্বের পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

এই 'সমাজে'র তৃতীয় অধিবেশনে পরলোকগত জাস্টিস্ আমীর আলী মরহুমের জীবন-কথা আলোচিত হয়। অধ্যাপক মৌঃ আবুল হুসেন সাহেব তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ডঃ শহীদুল্লাহ্, মিঃ ফখরুদ্দীন আহমদ, অধ্যাপক মিঃ মোমতাজউদ্দীন আহমদ এবং আরও কয়েকজন কিছু কিছু আলোচনা করেন। তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, মানব-

www.pathagar.com

প্রীতি, স্বাধীনচিত্ততা, গভীর জ্ঞান, সাহিত্য-সেবা, আত্মপ্রত্যয়, আন্তরিকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়।

'সমাজে'র একটি অতিরিক্ত অধিবেশনে বঙ্গের কৃতি মহিলা বিদূষী মিস্ ফজিলতুন নেসা সাহেবাকে তাঁহার বিলাত গমনের প্রাক্কালে অভিনন্দিত করা হয়। আর একটি অতিরিক্ত অধিবেশনে আমাদের পুরাতন বন্ধু ইউরোপ প্রত্যাগত ডঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবকে অভ্যর্থনা করা হয়।

'সমাজে'র চতুর্থ সাধারণ অধিবেশনে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। একটি 'পর্দ্দাপ্রথা' অন্যটি 'নারী-সমস্যা' বিষয়ে। পর্দ্দা প্রথার লেখক মৌঃ আবুল গনি সাহেব বলেন, পুরুষ বহুকাল যাবৎ স্বার্থের বশে নারীকে স্তুতিবাক্যে ভুলাইয়া, তাহাকে 'দেব' সাজাইয়া 'গৃহকারা বন্দিনী' করিয়া রাখিয়াছে। এই অবরোধ প্রথা নীতি ও ধর্ম্ম দুয়েরই বিরোধী। পর্দ্দা প্রকৃত পক্ষে অবরোধ নহে—পর্দ্দা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে স্বভাবজাত ব্যবধান এবং লজ্জাশীলতা। ইহার অভাব হইলে রুচি বিকার জন্মে এবং ভব্যতার অভাব প্রকাশ পায়।

অতঃপর নাজিরুল ইসলাম বি. এ. 'নারী-সমস্যা' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, নারী পুরুষের জন্য ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করিতেছে বটে, কিন্তু প্রতিদানে পুরস্কার দূরে থাকুক, কেবলি উপেক্ষা পাইতেছে। ইহার প্রধান কারণ নারীর অর্থনৈতিক অধীনতা। দৈনন্দিন কর্ম্ম জীবনে পুরুষের সমকক্ষতা করিয়া নারী যতদিন না স্বাবলম্বিনী হইতে পারিতেছে, তাহার ভাগ্যে পুরুষের একটু কৃপামধুর হাসি এবং কতকগুলি স্তুতি-কবিতা ছাড়া আর কিছু পাইবার আশা নাই।

প্রবন্ধ দুইটি পঠিত হইবার পর অধ্যাপক ওদুদ সাহেব বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে পর্দ্দার কড়াকড়ি ছিল না। বর্ত্তমানে পর্দ্দাপ্রথা অবরোধে পরিণত হইয়াছে। এ প্রথার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। তাহা ছাড়া সাধারণ প্রচলিত বোকরা বড় অ-সুন্দর। নারী—শিক্ষার বহুল প্রচলন হইলে তাঁহাদের সমস্যা তাঁহারা নিজেরাই সৌষ্ঠবের সহিত সমাধান করিয়া লইতে পারিবেন। সঙ্গে সঙ্গে পুরুষেরও এ সম্বন্ধে আর একটু উদারতার চর্চ্চা করা উচিত। তিনি 'নারী-সমস্যা' সম্পর্কে ইউরোপের কোন মনীষীর মত উল্লেখ করিলেন ; ইনি নাকি বলেন, 'বাস্তবিক পক্ষে নারী পুরুষের অধীন থাকিয়া পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতাটুকুই ভোগ করিতে চায়।'

মৌলভী আবুল হুসেন সাহেব বলেন, পর্দ্দাপ্রথা সম্বন্ধে স্বাধীনতার সীমা নির্দ্দেশ না করিয়া স্বভাবের উপর ছাড়িয়া দেওয়া সঙ্গত। দ্বিতীয় প্রশ্ন সম্বন্ধে বলেন, নারীকে পুরুষে পরিণত করিয়া নারী-সমস্যার সমাধান করা অনৈসর্গিক (অস্বাভাবিক) ও অসম্ভব। এতদিন নারীগণ পুরুষের দ্বারা শাসিত হইতেন, এখন ক্রমশঃ তাঁহারাই শাসক হইয়া পড়িতেছেন। নৈতিক আদর্শও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে—বিবাহ প্রথাকে বর্ত্তমানে কেহ কেহ প্রয়োজন মনে করিতেছে না। এইরূপ অস্বাভাবিকতার ফলে কতকগুলি রোগের সৃষ্টি হইতেছে। বাস্তবিক পক্ষে সমাজে নারীর বিশেষ প্রকারের প্রয়োজন আছে সেই দিকে লক্ষ্য করিলেই কৃত্রিম নারী সমস্যার অবসান হইবে।

মৌলভী নাজীরউদ্দীন আহমদ বি. এ. বলেন, নারীর চরিত্র রক্ষাই যদি পর্দ্দার উদ্দেশ্য হয়, তবে নারীগণই ত আবশ্যক মত নিয়ামাদি সৃষ্টি করিতে পারেন, এ বিষয়ে পুরুষেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আইন কানুন করিতে যান কেন?

www.pathagar.com

মৌলভী আবদুর রশীদ বি. এ. বি. টি. বলেন, নারী যে একেবারেই কোন প্রতিদান পাইতেছে না একথা সত্য নয়। পর্দ্দাপ্রথা সম্বন্ধে তিনি বলেন, রেল স্টীমারের প্রয়োজন ছাড়াও, নারীদের ভোটাধিকার হইলে একটা নূতনতর এবং অধিকতর প্রয়োজনের চাপে পর্দ্দার কড়াকড়ি ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইবে।

অধ্যাপক কানুনগো মহাশয় বলেন, স্বাধীনতাকে খানিকটা সীমাবদ্ধ না করিলে চলে না। পর্দ্দাপ্রথা সম্বন্ধে লেখক আদর্শবাদীতার দিক নিয়া আলোচনা না করিয়া লোকচরিত্রের দুর্ব্বলতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কথা বলিয়াছেন, এই জন্য বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁহার প্রবন্ধের যথেষ্ট মূল্য আছে। বাস্তবিক পক্ষে, পরিচ্ছদে বিলাস-নীলা অপেক্ষা সংযম অবলম্বন করাই অধিকতর প্রশংসনীয়। এই দীর্ঘ আলোচনার পর সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় সভা ভঙ্গ হয়।

সমাজের পঞ্চম অধিবেশনে নবীন কবি আবদুল কাদির 'পল্লীগানে বৌদ্ধ প্রভাব' সম্বন্ধে একটি অতি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। লেখক অতি সুন্দরভাবে তাঁহার নিজের সংগৃহীত অনেক গান হইতে প্রমাণ করেন যে, সমাজের নিম্নস্তর পর্য্যন্ত বৌদ্ধ প্রভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছিল অতঃপর ওহাবী আন্দোলনরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে কেমন করিয়া গ্রাম্য সঙ্গীতাদি মুসলমানদের ভিতর হইতে লোপ পাইতেছে তাহাও প্রদর্শন করেন।

প্রবন্ধের বস্তু একটু টেকনিকাল থাকায় অধিকাংশ সমালোচক ইসলাম, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম, আর্য্য সভ্যতা, সেমেটিক সভ্যতা এবং বাঙ্গালী জাতির স্বাভাবিক কোমলতার বিষয়ই অধিক আলোচনা করেন। এ সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের লেখকের ক্ষমতা ও গবেষণার অজস্র প্রশংসা করেন এবং নবীনতর গবেষণা অনুসারে প্রবন্ধে কয়েকটি ত্রুটি দেখাইয়া দেন। সর্ব্বশেষে তিনি একটি গ্রাম্য সঙ্গীতের কয়েক পদ আবৃত্তি করিয়া বলেন, যে অসীমের সহিত মিলিত হইবার জন্য সেরূপ আকুল প্রার্থনা অন্য কোথায়ও তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

এ পর্য্যন্ত সমাজের জন্য নিয়মিত কোন ফান্ড বা অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা হয় নাই। এ কারণ 'শিখা' প্রকাশ করিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে এবং উহাতে অনেক ত্রুটিও রহিয়া গিয়াছে। ক্রমান্বয়ে অধিক লোকের সহানুভূতি লাভ করিতে পারিলে, এ বিষয়ে উন্নতি করা সম্ভবপর হইবে।

আমাদের প্রতিষ্ঠানটির নাম 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' হইলেও, কার্য্যত ইহা সাম্প্রদায়িক নহে। আমরা সকল সাহিত্য সেবীকেই জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মেম্বররূপ গ্রহণ করিয়া থাকি। হিন্দু ও মুসলমান ভাবধারার সংমিশ্রণে পুষ্টতর এবং পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য গঠনে সহায়তা করাও আমাদের একটি উদ্দেশ্য। এজন্য ভবিষ্যতে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে একটি অনুবাদ শাখাও স্থাপন করিবার সঙ্কল্প আছে। আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু গ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদ করিলে, মুসলমানের ভাব বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করিবে। তাহা হইলে হিন্দু মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে ভালরূপ চিনিতে পারিবে। পরস্পরের সভ্যতা, চিন্তা বৈশিষ্ট্য এবং জাতীয় আদর্শের সহিত পরিচয় হইলে স্বভাবতঃই ইহাদের মধ্যে শ্রদ্ধা ও সম্প্রীতি জমিবে। 'সাহিত্য সমাজে'র দ্বারা জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ হইলে এবং

www.pathagar.com

সত্যিকার লোক–সাহিত্যের সৃষ্টি হইলে এই 'সাহিত্য সমাজে'র অস্তিত্বের সার্থকতা হইবে। যে সমস্ত কর্ম্মী অক্লান্ত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, যাঁহারা বিভিন্ন সাময়িক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া উৎসাহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন এবং যাঁহারা উপদেশ ও সুপরামর্শ দ্বারা ইহার গতি নর্ণীত করিয়াছেন তাঁহাদিগের প্রতি সমাজের পক্ষ হইতে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আশা করি ভবিষ্যতেও ইহাদের উদ্যম সহানুভূতি ও উপদেশ লাভ করিয়া এই সমাজের কার্য্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ হইবে।

www.pathagar.com

আব্বাসীয় যুগ

কাজী আকরম হোসেন এম. এ.

আব্বাসীয় খলিফা আল্ মনসুর তাঁহার নির্ম্মিত রাজধানীর নাম দিয়াছিলেন দার-উস্-সালাম, অর্থাৎ শান্তিধাম ; তুর্কী ও ফারসী লেখকগণ উহাকে 'বিহিশ্‌ত্ আবাদ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বাগদাদ তাহার এই দুই নামই বহুল পরিমাণে সার্থক করিয়াছিল। আরব ইরান ও সিরিয়া তিনেরই সমান নিকটবর্ত্তী হওয়াতে বাগদাদ আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের স্বাভাবিক কেন্দ্র হইয়াছিল। এই জন্য প্রাচীন দামাস্কাস অপেক্ষা নবীন বাগাদাদ রাজধানী হিসাবে নিশ্চয়ই বেশী উপযুক্ত ছিল। রাজধানীর নির্ম্মাণের প্রথম হইতেই উহাকে জগতের প্রভুত্ব সম্পদ, জ্ঞান ও কলার কেন্দ্র হইবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসের তীরভূমি আদিকাল হইতেই পৃথিবীর একটি প্রধান জীবন-কেন্দ্র ছিল ; বাগদাদ প্রাচীন বেবিলন, সেলুসিয়া এবং টেসিফনেরই নবীন মূর্ত্তি। উহার নির্ম্মাণের সময় টেসিফনের ধ্বংসাবশেষ হইতে অনেক মাল মশলা লওয়া হইয়াছিল এবং সিরিয়া ও পারস্য হইতে শিল্পী আনা হইয়াছিল। অতীতের ভস্মস্তূপের উপর নবীনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা ; পূর্ব্বের সহিত পশ্চিমের মিলন ; ভারতের বাণী, ইরানের রুচি, সীরিয়ার শিল্প, মিশরের স্থাপত্য, গ্রীসের জ্ঞান, রোমের ব্যবস্থাসৌকর্য্য প্রভৃতির সহিত আরবের নবীন প্রাণের সংমিশ্রণ, ইহা অপেক্ষা বড় আর কোন্ জিনিস আমরা আব্বীয়গণের নিকট হইতে আশা করিতে পারি?

শুধু স্থল পথে জগতের সহিত বাগদাদের সম্বন্ধ ছিল মনে করিলে ভুল হইবে, বাগদাদ একটি প্রকাণ্ড পোতাশ্রয়ও ছিল, টেম্‌স্ তীরবর্ত্তী লন্ডনের সহিত তাইগ্রীস-সলিল বিধৌত বাগদাদের তুলনা হইতে পারে। লন্ডনের তবু অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, কিন্তু সে যুগে বাগদাদের মত সামুদ্রিক ও অসামুদ্রিক বাণিজ্যের কেন্দ্র জগতে আর দ্বিতীয় ছিল না। বাগদাদ এখনও একটি বড় বাণিজ্য কেন্দ্র, কিন্তু হারুন ও মামুনের সে বাগদাদ, সমৃদ্ধি শোভার আধার সৌধ-মিনার-কিরীটিনী স্বপ্নপুরী বাগদাদ আর নাই। আরব্যোপন্যাসের চিত্রে হয়ত রং অনেক বেশী পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু সে যুগের বাগদাদের আভাস আমরা একমাত্র উহা হইতেই প্রাপ্ত হইতে পারি। আরবের বাণিজ্য জাহাজ যে যুগে চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সম্পদ আহরণ করিয়া আনিত, সে যুগে আফ্রিকার নিগ্রো ও উত্তর ইউরোপের শ্বেতকায় দাস দাসী বাগদাদের রাজপথে বিচরণ করিত, সে যুগের ছবি যে একটু অতিরঞ্জিত বোধ হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বাগদাদ নগরী সত্যই যে তখন দুনিয়ার রানী ছিল।

বর্ত্তমানকালে সুলতান ইবনে সউদ এক দুঃসাধ্যসাধনে ব্রতী হইয়াছেন। তিনি চির যাযাবর বেদুইনদিগকে স্থায়ী বসবাস শিক্ষা দিতেছেন। সতত সঞ্চারমান শিবির জীবন কখনও উচ্চাঙ্গের জ্ঞান, কলা ও সভ্যতার পরিপোষক হইতে পারে না, চঞ্চল গতি মরুবাসীর নিকট প্রাণবিমোহন স্থপতি শিল্পের অথবা আকাশ পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত উন্নতমান-মন্দিরের আশা করা যায় না। ইসলামের গৌরবযুগে বহুসংখ্যক আরববাসী তাঁহাদের চিরন্তন স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া গৃহবাসী হইয়াছিলেন ; মরক্কো, মিসর, সিরিয়া সর্ব্বোপরি মেসোপটেসিয়ার

www.pathagar.com

প্রথমতঃ আরব-সৈনিকাবাস ও কালক্রমে সাধারণ আরব উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। বসরা ও কুফানগর এইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছিল । বাগদাদ নগরী এই অভিনব উদ্যমের চরম ফল। উম্মীয় খলিফাগণ সময় সময় দামাস্কাস ত্যাগ করিয়া আসিয়া মরুভূমির মধ্যে বাস করিতেন। কিন্তু আব্বাসীয়গণ ছিলেন ষোল আনা গৃহবাসী। কাজেই তাঁহাদের সকল আয়োজন ও কর্ম্মের মধ্যে স্থায়িত্বের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এই জন্য আব্বাসীয় যুগে আমরা সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের বিপুল চেষ্টা দেখিতে পাই। আব্বাসীয় যুগের পূর্ব্বে এক কোরান শরীফ ভিন্ন আর কোনও লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ ছিল না বলিলেই হয়। হাদিসের শিক্ষা চিরদিনই মুখে মুখে দেওয়া হইত এবং মুখে মুখেই ধর্ম্মোপদেশ প্রচারিত হইত। কিন্তু এই যুগে ধর্ম্মগ্রন্থ সঙ্কলনের জন্য বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি আলেমগণ কি অসাধারণ পরিশ্রমই না করিয়াছিলেন। আব্বাসীয় যুগের প্রাসাদ ও লাইব্রেরী, শাস্ত্রগ্রন্থ ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক, অনুবাদ ও মৌলিক রচনা, প্রভৃতি সকল বিষয়েই তাঁহাদের সঞ্চয় বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কৃপণের যে সঞ্চয় তাহা কোনও ফলপ্রসব করে না, কিন্তু নব সৃষ্টির প্রাক্কালে যে শক্তি সংগ্রহ তাহা কৃপণের সঞ্চয় হইতে ভিন্ন। এই যুগের আরব যেমন সঞ্চয় করিয়াছেন, তেমনিই সৃষ্টিও করিয়াছেন। এ বিষয়ে উম্মীয়গণ তাঁহাদের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা দেশ জয় করিয়াছিলেন, নানা দেশের প্রাচীন সভ্যতার সহিত পরিচিত হইয়াছিলে, বীজ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন, আব্বাসীয়রা তাহা লইয়া সোনার ফুল ফুটাইলেন।

আর এক কথা, এ যুগে আরব বলিতে শুধু আরবের অধিবাসী বা তদীয় বংশধরকেই বুঝাইত না ; পশ্চিমে মরক্কো হইতে পূর্ব্বে খোরাসান পর্য্যন্ত সকলেই আরবীর চর্চ্চা করিতেন, বাগদাদের সমৃদ্ধি ও আনন্দলীলায় সমান ভাবে যোগ দিতেন এবং আরবের জ্ঞানোৎসবে সাহিত্য ও বিজ্ঞান, ধর্ম্ম ও দর্শনের মশাল সমানভাবে জ্বালাইতেন। আব্বাসীয় যুগের পূর্ব্বে অন্য জাতীয় মুসলমান অপেক্ষা আরবদিগের প্রাধান্য সর্ব্ব বিষয়ে অত্যধিক ছিল, কিন্তু আব্বাসীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সকল মুসলমানই সমশ্রেণীস্থ বলিয়া পরিগণিত হইল এবং আরব ও পারসীকে বা আরব ও সিরিয়ের মধ্যে ভেদরেখা বিলুপ্ত হইল। উম্মীয় সাম্রাজ্য আরব সাম্রাজ্য, কিন্তু আব্বাসীয় সাম্রাজ্য মুসলমানের সাম্রাজ্য। এ যুগের যত কীর্ত্তি তাহা শুধু আরবের কীতি নয়, সর্ব্বদেশের মুসলমানের তাহাতে সমান অংশ ছিল। প্রাচীন অবসাদগ্রস্ত জাতির দেহে আরব ধমনীর নবীন রক্তের সংমিশ্রণে যে নবজীবনের সৃষ্টি হইয়াছিল স্পেন হইতে পূর্ব্বে মধ্য এশিয়া পর্য্যন্ত রূপে ও রঙে তাহা সমানভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল।

সুবিস্তীর্ণ মুসলিম সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ও মস্তিস্ক ছিল বাগদাদ। স্পেন আব্বাসীয় সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু সৃষ্টি ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে তাহার দৃষ্টি সব সময়েই আরবের দিকে থাকিত। কর্ডোভার কীর্ত্তি বাগদাদের কীর্ত্তি হইতে ভিন্ন হইলেও ভিন্ন জাতীয় নহে। মুসলমানের এই গৌরব-যুগের অসাধারণ কর্ম্ম অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ তালিকা প্রদান করা আমাদের সাধ্যাতীত, উহার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস প্রদান করিতে পারিলেই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

বাগদাদের বাণিজ্য সম্পদের কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। বাষ্প ও তড়িত যুগের বহু শত বৎসর পূর্ব্বে বাগদাদ নগরে সুদূর চীন দেশে প্রস্তুত জিনিস পত্রের জন্য যে একটি পৃথক বাজার ছিল ইহা স্মরণ করিলে তৎকালীন মুসলমানদিগের অধ্যবসায় ও কার্য্যকুশলতায়

www.pathagar.com

চমৎকৃত না হইয়া থাকা যায় না। ইউরোপ হইতে কাঁচা মাল আনিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাতের বস্ত্র, অলঙ্কার, ধাতুর দর্পণ প্রভৃতি তৈরী জিনিষ পাঠান হইত। ইহাতে প্রমাণ হয় যে, মুসলমান জগৎ অন্যান্য বিষয়ের মত শিল্প ক্ষেত্রেও ইউরোপ অপেক্ষা উন্নত ছিল। ব্যবসায় বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া ইসলাম যে কিরূপ সুফল প্রসব করিয়াছিল তাহা চাকুরি সর্ব্বস্ব বাঙ্গালী মুসলমান কল্পনাও করিতে পারেন না। কথিত আছে যে, ইমাম আবু হানিফাকে চাকুরি দিতে চেষ্টা করিয়া স্বয়ং খলিফা মনসুরও কৃতকার্য্য হন নাই। তিনি রাজপদ অপেক্ষা সামান্য ব্যবসায়কেই শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। শিল্পক্ষেত্রে আব্বাসীয় যুগের মুসলমানের সৎসাহস এমন কি দুঃসাহস তাঁহাদের জাগ্রত মনের পরিচয় প্রদান করে। চীন দেশে কাগজ প্রস্তুত হয় শুনিয়া তাঁহারা দেশে নূতন ধরনের কাগজ তৈরির চেষ্টা আরম্ভ করেন এবং অবশেষে বিবিধ রূপের বিবিধ রঙের ও বিবিধ মূল্যের সুন্দর সুন্দর কাগজ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হন। এইরূপ তাঁহারা যেখানে যে ভাল জিনিষটি পাইতেন তাহাই স্বদেশে উৎপাদনের চেষ্টা করিতেন এবং অসাধারণ কৃতকার্য্যতাও লাভ করিয়াছিলেন। রসায়ন বিদ্যার সাহায্যে তাঁহারা সুগন্ধিদ্রব্য প্রস্তুত বিষয়ে চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন এবং কৃষি ও শিল্পকর্ম্মের সুবিধার জন্য বহু নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলেন। শস্য ও ফলের চাষ রীতিমত বৈজ্ঞানিক ধরনেই হইত।

ব্যবসা বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প সকল জাতিরই জীবনের ভিত্তি। এ ভিত্তি যে জাতির দৃঢ় নয় তাহার নিকট হইতে জ্ঞানবিজ্ঞান ও ললিতকলায় সুমহান সৌধ আশা করা যায় না। আব্বাসীয় যুগের মুসলমানের জাতীয় জীবনের ভিত্তি সুদৃঢ় ছিল ইহা আমরা দেখিয়াছি, ঐ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান সৌধটিও তেমনই বিরাট ও শোভন হইয়াছিল।

আজকাল আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলন ব্যবস্থা সম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে। মুসলিম সাম্রাজ্যে আইন করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার প্রয়োজন ছিল না। ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে সকল বালক বালিকাই ছয় বৎসর বয়স হইতে শিক্ষালাভ করিত। প্রথম প্রথম জ্ঞান বিস্তারের জন্য কোনও রূপ প্রতিষ্ঠান ছিল না, মসজিদই মুসলমানের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। মসজিদে যে কেবল ধর্ম্মজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা নহে, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত ইত্যাদিও শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। যে কোনও মুসলমান বিনা বেতনে সেখানে শিক্ষালাভ করিতে পারিত। শিক্ষকেরা কাহারও নিকটহইতে নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইতেন না, সাধারণতঃ তাঁহাদের ব্যবসায়, শিল্প বা অন্য কোন অবলম্বন থাকিত। শিক্ষক উপযুক্ত না হইলে শিক্ষার্থী জুটিত না, ডিগ্রীর জোরে শিক্ষক হওয়া তখনকার দিনে সম্ভবপর ছিল না। শিক্ষার জন্য ভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও বেতন ভোগী শিক্ষকের ব্যবস্থা পরবর্ত্তী যুগের কথা।

জ্ঞান চর্চ্চা শুধু পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না ; মেয়েরাও সমানভাবে সাহিত্য বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন ; তাঁহাদের মধ্যে অনেকে চিকিৎসা বিদ্যা এবং ফিকাহ্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, কেহ কেহ সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ ইত্যাদি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। মেয়েরা কবিত্ব ও সঙ্গীতের সাধনাও করিতেন এবং টেনিস প্রভৃতি ক্রীড়ায় যোগ দিতেন। আব্বাসীয় যুগের প্রথম অংশে সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েরা নৃত্য কলারও চর্চ্চা করিতেন।

আদি মুসলিম যুগের আরবগণ যে অবস্থায় বাস করিতেন, এখন তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। মরুভূমির পরিবর্ত্তে তাহারা একটি সুন্দর শোভাময় জগতের সহিত পরিচিত

www.pathagar.com

হইয়াছিলেন। সিরীয় ও পারসীক রীতি-নীতির প্রভাব হইতে উম্মীয় ও আব্বাসীয় যুগের মুসলমানগণ মুক্ত থাকিতে পারেন নাই। থাকিলে তাহা অস্বাভাবিক হইত, এবং ইসলামের গণ্ডী তাহা হইলে আরব দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া যাইত। পারিপার্শ্বিকতার সহিত খাপ খাইতে গিয়া সুফল ও কুফল দুই হইয়াছিল। মুসলমানরা যদি আরবের বাহিরের প্রস্তাব বর্জ্জন করিয়া চলিতেন তাহা হইলে তাঁহারা অত্যন্ত সরল ও নিরাড়ম্বর অথচ উদ্ধত ও উগ্র থাকিয়া যাইতেন। বাহিরের সংস্পর্শে আসাতে তাঁহারা উদার ও শান্ত অথচ বিলাস ও আরামপ্রিয় হইয়া গেলেন। বিলাসিতার দুই রূপ—পুষ্পরাশি যেমন সুন্দরী যুবতীর অঙ্গভূষণ আবার মৃত দেহেরও আচ্ছাদন, সেইরূপ বিলাসিতা কখনও বা জীবনের স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের বিকাশ, কখনও বা দুর্ব্বলতা ও নিঃস্বতা ঢাকিবার ও ভুলিবার কুৎসিত প্রয়াস। আব্বাসীয় যুগের প্রথম ও শেষ ভাগের বিলাসিতার এই পার্থক্য।

আব্বাসীয় যুগের মুসলমান যে শুধু কবিতা ও সঙ্গীতের চর্চ্চাতেই মশ্‌গুল হইয়াছিলেন তাহা নহে, চিত্রবিদ্যা ও তাঁহারা বাদ দেন নাই। লিপিবিদ্যায় তাঁহারা কিরূপ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার উল্লেখ নিষ্প্রোয়জন। যে কালে মুদ্রাযন্ত্রের নামগন্ধ ছিল না সেকালে যে কিরূপে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ লিখিত ও প্রচারিত হইত তাহা আমাদের ধারণার অগোচর। এইখানে বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক বালক বালিকাকে যেমন কোরান শিক্ষা দেওয়া হইত তেমনই উচ্চাঙ্গের লিপি বিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হইত। গ্রন্থমধ্যে যে কেবল লতাপাতাই আঁকা হইত তাহা নহে, জীবজন্তুর ছবিও থাকিত অর্থাৎ অঙ্কনবিদ্যায় কোনও অঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিত না। সিরিয়ার আবিষ্কৃত একটি প্রাসাদ হইতে জানা যায় যে, উম্মীয় যুগের মুসলমানরাও গৃহ প্রাচীরে মানুষের প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করিতেন। ইসলাম চারুশিল্পের জীবন-নাড়ী কাটিয়া দিয়াছে, সাধারণের এই বিশ্বাস ভিত্তিহীন। মতওয়াক্কিলের মত গোঁড়া খলিফার মুদ্রাতেও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছেন। প্রতিমূর্ত্তির বিরুদ্ধে যাহা কিছু সংস্কার ছিল, পারসীক প্রভাবে তাহাও বিদূরিত হইয়াছিল।

বাণিজ্য, শিল্প এবং ললিতকলায় আমরা গৌরবযুগের মুসলমানের যে সাহসের পরিচয় পাইয়াছি জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহা আরও সুপরিস্ফুট। বর্ত্তমান যুগের জার্ম্মান ফরাসী ও ইংরেজের মত তাঁহারাও কোনও বিদ্যা ও কোনও শাস্ত্রকে দুরধিগম্য বলিয়া ছাড়িয়া দেন নাই। বিরাট বা ভূমার ভয় কোনও দিন তাঁহাদের কার্য্যক্ষেত্রকে সঙ্কীণ করিতে বা তাঁহাদের শক্তিকে পঙ্গু করিতে পারে নাই। 'আরবজাতির দার্শনিক' আলকিন্দী একাই দর্শন, গণিত জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, সঙ্গীত ইত্যাদি সর্ব্ব বিষয়ে প্রায় দুই শত গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং গ্রীক, পারসীক ও হিন্দুদিগের বিজ্ঞান ও দর্শন আয়ত্ব করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ আল্‌ফারাবী ভাষাতত্ত্ব, তর্কশাস্ত্র, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় সম্বলিত একখানি বিশ্বকোষ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ; অধিকন্তু তিনি সঙ্গীত-তত্ত্ব ও বাদ্যযন্ত্র নির্ম্মাণ প্রণালী সম্বন্ধেও পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ইব্‌নে সীনা ছোট বড় প্রায় এক শত পুস্তক লিখিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ঐতিহাসিক তাবারী চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত দিন চল্লিশ পৃষ্ঠা করিয়া পুস্তক লিখিয়াছিলেন। ভ্রমণকারী আল্‌বেরুণী তাঁহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় সুবিখ্যাত গ্রন্থছাড়া জ্যোতিষ, গণিত, ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস, রসায়ন প্রভৃতি বিষয়ক পুস্তক লিখিয়াছিলেন এবং অনেক সংস্কৃত পুস্তক আরবীতে ও গ্রীক পুস্তক সংস্কৃতে অনুবাদ

www.pathagar.com

করিয়াছিলেন। আব্বাসীয় যুগের মুসলমানগণ দিকে দিকে ভ্রমণ করিয়া অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে জগতের সকল জ্ঞান আহরণ করিয়াছিলেন এবং তাহা দিয়া নিজেদের বিশেষত্ব মন্ডিত নূতন জ্ঞানসৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই বিশ্বগ্রাসী জ্ঞান-ক্ষুধার ফলে আরব তীক্ষ্ণতা ও সজীবতার সহিত আর্য্য সূক্ষ্মতা ও গভীরতার আশ্চর্য্য সংযোগ সাধিত হইয়াছিল এবং তাহার ফলে সমগ্র মুসলিম জগৎ নব নব ভাব ও চিন্তার আলোড়ন অনুভব করিতেছিল।

ফন্ ক্রেমার এর মতে উম্মীয়দিগের সময়ে দামাস্কাস নগরে খৃস্টানদিগের সহিত সংশ্রবের ফলে ইসলামের ভিতর মুর্‌জি মতের সৃষ্টি হইয়াছিল। মুর্‌জিগণ অমুসলমানদিগের প্রতি বেশ উদার ছিলেন এবং মুসলমানের জীবন এবং ভবিষ্যৎকেও কিছু উজ্জ্বলভাবে ও আশার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন। আল্লাহ্ ও রসুলে যাহার বিশ্বাস আছে সেই মুসলমান ; সেই কোনও না কোনও সময়ে বেহেশ্‌তের অধিকারী হইবে যদিও গোঁড়াদিগের সহিত তাহার মতানৈক্য থাকিতে পারে—মুর্‌জিরা এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। এই আন্দোলনের বিশেষ কোনও গুরুত্ব নাই তবে একটু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ইমাম আবু হানিফা এই মুর্‌জি দলভুক্ত ছিলেন।

বস্‌রা নগরে মু'তাজেলা মতের উদ্ভব হইয়াছিল। ইসলামের ইতিহাসে এই মতের গুরুত্ব অত্যধিক। মুসলিম জগতের উপর মু'তাজেলা দলের প্রতিপত্তি কয়েক শত বৎসর পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ছিল এবং বড় বড় পণ্ডিত, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকগণ এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মু'তাজেলাগণ গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং অন্ধ বিশ্বাস ও গতানুগতিকার বিপক্ষে বুদ্ধি, বিচার ও তর্কের শাণিত অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অদৃষ্টবাদ মানিতেন না, আল্লাহ্‌কে নিরাকার বলিয়া জানিতেন ও শরীফ অনাদি নহে এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। মুতাজেলা মত দ্রুত গতিতে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। খলিফা মনসুর ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তীগণ এই মতের পোষকতা করিতেন, কিন্তু প্রকাশ্যে উহা গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে মামুন, মু'তাসীম ও ওয়াসেক প্রকাশ্যে মু'তাজেলা বাদ গ্রহণ করেন এবং রাজ্য মধ্যে উহা প্রচার করেন।

স্টাইনার এর মতে, মু'তাজেলাবাদ স্বাধীন ভাবে ইসলামের মধ্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল এবং পরে গ্রীক দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। Goldziher-এর মতে মুসলিম ব্যবহার শাস্ত্র (ফিকাহ্‌র) উপর রোমান আইন ও চিন্তাধারার ছাপ খুব বেশী পরিমাণে পড়িয়াছে। মুসলমানদিগের কর্ম্মক্ষেত্র যখন খুব বাড়িয়া গেল তখন সকল ব্যাপারে ও প্রতি ঘটনায় কোরান ও হাদিসের আইন প্রয়োগ করা সম্ভবপর থাকিল না, কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহাদিগকে কেয়াস্ ও রায়ের উপর নির্ভর করিতে হইল। কোরান, হাদিস, কেয়াস্ ও রায় সম্পার্কিত আলোচনার ফলে যে চারিটি বিভিন্ন মজহবের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ইমাম আ'জম আবু হানিফা সাহেব অধিকাংশ হাদিস জাল বলিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং কোরানের উপরই বেশীর ভাগ নির্ভর করিতেন, অধিকন্তু তিনি রায় বা ব্যক্তিগত মতের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। মু'তাজেলাদের তুলনায় তিনি যথেষ্ট গোঁড়া, কিন্তু অন্যান্য মজ্‌হবের তুলনায় তাঁহার মজ্‌হব অত্যন্ত উদার। অন্যান্য ফকীহ্‌গণ অমুসলমানের জীবনকে মুসলমানের জীবন অপেক্ষা সর্ব্বাংশে হেয় বলিয়া মনে করিতেন ; আবু হানিফা প্রথমে মানুষকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করেন এবং অমুসলমানের জীবন মুসলমানের জীবনের মতই

www.pathagar.com

সমান মূল্যবান বলিয়া ঘোষণা করেন। চৌর্য্য অপরাধের শাস্তি তিনি কোনও কোনও ক্ষেত্রে কমাইয়া দেন। আবু হানিফার বিপরীত ছিলেন ইব্‌নে হাম্বল। হাম্বলের মতে নামাজ না পড়ার দণ্ড মৃত্যু, কিন্তু আবু হানিফা উহার জন্য লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সমস্ত হইতে বোঝা যায় যে, তিনি যেমন কোরানের ভক্ত ছিলেন তেমনই উদারতা, সহিষ্ণুতা ও করুণার পক্ষপাতী ছিলেন।

মামুনের সময়ে মু'তাজেলা মত যখন খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল তখন ইব্‌নে হাম্বল উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে, মানুষ আল্লাহ্‌কে চক্ষে দেখিতে পারিবে, তিনি যে, কুর্সীর উপর দেহ ধরিয়া বসিয়া থাকিবেন ইহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। মানুষের নিজ কর্ম্ম স্বাধীনতা কিছুই নাই, সে অদৃষ্টের ক্রীড়াপুত্তলি মাত্র। মজহব হিসাবে হাম্বালের দল বেশী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু সমগ্র হানাফী জগতের উপরে উহার গভীর ছাপ রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান হানাফী মত ঠিক আবু হানিফার উদার মত নহে, উহা হানাফী ও হাম্বলী মতের সংমিশ্রণ।[১]

মু'অজেলাদিগের সহিত ইমাম হাম্বলের বিরোধ বহুদিন চলিয়াছিল। মামুন জোর করিয়া মু'তাজেলাবাদ চালাইতে গিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে ইমাম হাম্বল শৃঙ্খলিত অবস্থায় বিচারার্থ নীত হইয়াছিলেন, এবং মু'তাসীম তাঁহার জন্য দোর্‌রা মারার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কারাগারেই তাঁহার এন্তেকাল হয়। খলিফাদিগের জবরদস্তির ফল কিরূপ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। জনসাধারণ ইমাম হাম্বলের পক্ষে ও মু'তাজেলা মতের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর প্রায় দেড় লক্ষ লোক তাঁহার লাশের অনুগমন করিয়াছিল। জোর করিয়া মু'তাজেলাবাদ প্রচার করিতে গিয়া মামুন প্রভৃতি খলিফাগণ হাম্বলী মতেরই সহায়তা করিয়াছেন। তাহার ফলে শুধু যে মুতাজেলা মত ধ্বংসের সহায়তা হইয়াছে তাহা নহে, মধ্যপন্থী হানাফী মতও অযথা রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে।

খলিফা হিসাবে মতওয়াক্কিল মুতাজেলাবাদের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন। তর্কের ক্ষেত্রে আশয়ারীও গাজ্জালী উহাকে পরাস্ত করেন। তদবধি গোঁড়া মতই ইসলামে জয়ী হইয়া আছে এবং গোঁড়াগণ চিন্তার স্বাধীনতামূলক প্রত্যেক আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপে ১১৫০ খৃস্টাব্দে খলিফা মুস্তানজিদের আদেশে ইব্‌নে সীনা ও ইখ্‌ওয়ান উস্‌ সাফার সমস্ত গ্রন্থাবলী ভস্মীভূত করার কথা উল্লখ করা যাইতে পারে।

আব্বাসীয় খলিফাগণের রাজত্বকালে খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষে ও নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সুফীদলের উদ্ভব হইয়াছিল। সুফীমতের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে নানা জন নানা ধারণা পোষণ করেন। কেহ বা বেদান্তের সহিত কেহ বা Neo-platonism এর সহিত উহার সম্পর্ক নির্ধ্বারণ করিয়াছেন। সুফীগণ বলেন, যে, স্বয়ং হজরত মোহাম্মদের নিকট হইতে তাঁহারা তাঁহাদের গুপ্ততত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছেন। আদি যাহাই হউক না কেন উপরি লিখিত সময় হইতে যে, তাঁহারা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ইহা সত্য এবং সহজ বোধ্য। এই সুযোগের নানারূপ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা, মু'তাজেলা ও আশ্‌য়ারীদিগের মধ্যে নিরন্তর তর্কযুদ্ধ, গোঁড়াদিগের ভাববর্জ্জিত ধর্ম্মচর্চ্চা প্রভৃতির প্রতিক্রিয়া স্বরূপ কতকগুলি লোক স্বভাবতঃই শান্তি ও বিস্মৃতির আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই জন্যই ইমাম

---

১. আমীর আলী, Spirit of Islam.

www.pathagar.com

গাজ্জালী সকল দর্শন আলোচনা করিয়া কোনও কূল না পাইয়া শেষে সুফীমতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুফীমত মু'তাজেলাবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত ; কিন্তু গোঁড়াদিগের হস্তে উভয়কেই নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে। তবে প্রাচ্য জগতের স্বভাব অনুসারে চিন্তাধর্ম্মী মু'তাজেলাদিগের নিকট বেশী প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।

মু'তাজেলাদিগকে দমন করিতে গিয়া হানাফীগণ যে নিজেদের পায়েও কুঠারাঘাত করিয়াছেন ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি—স্বাধীন চিন্তা বন্ধ করিতে গিয়া চিন্তা স্রোতই রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, দর্শনের ভয়ে বিজ্ঞান আলোচনাও স্থগিত হইয়াছে। সত্য বটে, সাধু চিন্তা এবং স্বাধীন চিন্তার মধ্যে পার্থক্য করা শক্ত এবং বিজ্ঞান হইতে দর্শন খুব বেশী ভিন্ন নয় ; মানুষের জীবনই এইরূপ সমস্যাময়, তাহার গতিপথ সত্যই বড় পিচ্ছিল, এবং কাম ধর্ম্ম এবং সংস্কার, স্বার্থ এবং পরার্থের মধ্যে নির্ভুলভাবে ভেদরেখা টানিবার শক্তি মানুষের অতি অল্পই আছে। কিন্তু পিচ্ছিল পথে পড়িয়া যাওয়ার ভয়ে নর্দ্দমায় আশ্রয় গ্রহণ করা অপেক্ষা উঠিয়া পড়িয়া চলার সাহসের মধ্যে যে একটা নির্ম্মল আনন্দ আছে তাহা অস্বীকার করিলে মানব প্রকৃতিরই অবমাননা করা হয়।

www.pathagar.com

মুস্‌লিম সাহিত্য সমাজ

মোহিতলাল মজুমদার বি. এ.

আজিকার এই বিদ্বজ্জন সমাজে কোনও নূতন কথা শুনাইবার মত পাণ্ডিত্য আমার নাই। এইরূপ অনুষ্ঠানে প্রাণে যে আনন্দ সঞ্চার হয়, সেই আনন্দের আবেগে কিছু প্রাণের কথাই নিবেদন করিব। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এই নামটির মধ্যেই এমন কিছু আছে যাহা চিরদিন আমার অন্তরের গোপন আশাকে সঞ্জীবিত করিয়া, একটি স্বপ্নকে সত্য করিয়া তোলে। ২০/২৫ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যে ঔদাসীন্য লক্ষ্য করিতাম, তাহাতে দুঃখ পাইতাম, কেন, তাহাই বলিব। মানুষ মাত্রেরই বৃহত্তর সমাজকে নিজ সমাজ করিয়া লইতে ইচ্ছা হয়। আমি যে একটা বৃহত্তর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এ কথা মনে করায় একটা আনন্দ আছে; হৃদয়ের গণ্ডী যত বাড়িয়া যায় ততই যেন মানুষের মনের শক্তি বৃদ্ধি হয়; মানুষের অহংবোধ যত ব্যাপক হয়, ততই মানুষ সুস্থ বোধ করে। আমার মাতৃভূমির এই যে অর্দ্ধেকেরও অধিক সন্তান আমার ভাই হইয়াও সর্ব্ব বিষয়ে পৃথক হইয়া রহিল এ চিন্তা বড় দুঃখকর। সত্যকার দেশহিতৈষী জাতিপ্রেমিক এমন কে আছেন, যাঁর মন ইহাতে পীড়িত হইয়া না উঠে? নানা সংস্কার ও নানা ভুল বিশ্বাসে আমরা এই আত্মীয়তাবোধ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আজিও অনেকের মধ্যে 'বাঙ্গালী' ও 'মুসলমান' এই নাম দুইটি জাতি-সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হয়, যেন ধর্ম্ম পৃথক হইলে জাতিও পৃথক হইয়া যায়! জাত পৃথক হয় বটে, এবং জাতের মূল্য যার মতে যেমনই হউক, আজ এই ইতিহাস-বিজ্ঞানের যুগেও কি জাতি অপেক্ষাও জাতের মূল্য অধিক হইবে? দিনের আলোর চেয়ে গৃহ কোণের হাতে জ্বালা বাতির শিখাই অধিকতর উজ্জ্বল বলিয়া মনে করিতে হইবে? বাতির আলোর নিজস্ব প্রয়োজন থাকে থাক, তাহাতেও আপত্তি নাই; কিন্তু তাই বলিয়া সূর্য্যের আলোকে অস্বীকার করিবে কে? হিন্দু যেমন বাঙ্গালী, মুসলমানও কি ঠিক তেমন বাঙ্গালী নয়? ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও শাস্ত্রের শাসনে উভয় সম্প্রদায়ের বেশভূষা, আচার ব্যবহারে যে বিভিন্নতা দাঁড়াইয়াছে তাহা অপেক্ষা বহুগুণ সত্যকার ঐক্য সেই বাহ্য আবরণের অন্তরালে, জড় প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়মের মতই, এ উভয়কে একই আত্মীয়তার বন্ধনে কি বাঁধিয়া রাখে নাই? যদি মানিয়াই লই যে, উভয়ের রক্ত এক নয়, মূলে ইহারা বিভিন্ন জাতি হইতে উৎপন্ন, তথাপি, এই যে এক জল মাটিতে এতদিন ধরিয়া ইহারা পুষ্ট হইয়াছে, তার জন্য উভয়ের ধাতু-প্রকৃতি এক হওয়া কি বিজ্ঞানসম্মত নয়? কিন্তু কে বলিবে যে বাংলাদেশের শতকরা নব্বই জনেরও অধিক মুসলমানের দেহে বাঙ্গালীর রক্তই প্রবাহিত হইতেছে না? যে বলে সে মিথ্যাবাদী, সে অন্ধ। বাঙ্গালী হিন্দু যেমন নিজের বাঙ্গালীত্ব অস্বীকার করিয়া একদিন নিজেদের আর্য্যত্ব প্রমাণ করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল এবং আজিও শিক্ষাদীক্ষাহীন কুসংস্কারাচ্ছন্ন সংকীর্ণমনা অনেকের মধ্যে এইরূপ Sentiment এর আত্মঘাতী আক্রোশ একেবারে লুপ্ত হয় নাই, দেখা যায়-বাঙ্গালী মুসলমানের মধ্যেও হয়ত ঠিক সেইরূপ একটা মিথ্যা আভিজাত্যের গৌরবলালসা প্রবল হইয়া রহিয়াছে। এও একটা Inferiority

www.pathagar.com

Complex — নিজের জাতি পরিচয় দিতে যাহারা লজ্জা পায়, যে নিজের প্রত্যক্ষ পিতৃ-মাতৃ পরিচয় হেয় মনে করিয়া একটা কাল্পনিক ইতিহাসের সাহায্যে মানরক্ষা করে, তাহাদের মনুষ্যত্ব যে পঙ্গু হইয়া থাকিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তাই হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের বাঙ্গালী আজিও মানুষ হইতে পারিল না। তথাপি হিন্দুর পক্ষ হইতে একটা কথা আপনাদেরও স্বীকার করিতে হইবে যে, মুসলমান ভাইদের সঙ্গে সত্যকার আত্মীয়তা স্থাপনের পথে আর যত বাধাই থাক—শিক্ষিত হিন্দুর মনে এই Race Consciousness জাগিয়াছে—এবং ইহা একটা সহজ সংস্কারে পরিণত হইতে অধিক বিলম্ব নাই। এই Race Consciousness মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে সর্ব্বপ্রধান করিয়া জাগাইতে হইবে। জাতির মুক্তি হয় যাত্রার পথে ইহাই প্রথম প্রয়োজন।

এই সম-জাতীয়তার আর সকল প্রমাণই সাধারণের পক্ষে লুপ্ত হইয়া আছে—কেবল একটা প্রমাণ এখনও প্রাণকে পুলকিত করিয়া তোলে। ধর্ম্মান্ধতা ইহাকে লোপ করিতে পারে নাই, পরস্পরকে ছুরি হানিবার সময়েও যে ভাষার পরস্পরকে সম্বোধন করি, তাহাতে প্রমাণ হয়, একই মায়ের মুখে আমরা প্রাণের বুলি শিক্ষা করিয়াছি। এ বেদবেদান্তের দোহাই দেয়, ও কোরানের সুরা আবৃত্তি করে, কিন্তু উভয়েই যখন গভীর আনন্দ বা অপরিসীম ব্যথা পায়, তখন যে ভাষায় তাহা সহজে ও সত্যরূপে উৎসারিত হয়, তাহা যে একই! জগতে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার যত বন্ধন আছে ভাষার মত আর কিছুই নয়। এই ভাষায় যখন মুসলমান ভাইদের সঙ্গে আলাপ করি, তখন শত মোল্লা শত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের রোষ কষায়িত নেত্র স্মরণ করিয়াও এ কথা ভুলিতে পারি না যে, আমরা পরমাত্মীয়।

তাই মাতৃভাষার প্রতি বাঙ্গালী মুসলমানের ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞা যখন লক্ষ্য করিতাম, যখন দেখিতাম, যে-ভাষায় সে চিরজীবন প্রাণের পিপাসা মিটাইতেছে, সেই ভাষাকেই একটা নিদারুণ মিথ্যার মোহে সে মানিতে চাহে না; যে মায়ের স্তন্যপান করিতেছে তাঁহাকে মা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত—তখন বড় বেদনা বোধ করিতাম। একি মোহ, একি মিথ্যাচার! একি হিন্দুর প্রতি আক্রোশ করিয়া সে নিজের নাক কাটিতেছে? একি চোরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া ভুঁয়ে ভাত খাওয়া? আমার কষ্ট হইত এই জন্য যে, এতগুলি ভাইয়ের সঙ্গে আমার সত্যকার সম্বন্ধ স্বীকৃত হইল না—এতগুলি বাঙ্গালীর সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্য দরিদ্র হইয়া রহিল।

কিন্তু আজ সে দুঃখ অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। যত দিন যাইতেছে—ততই আশ্বস্ত ও আশান্বিত হইতেছি—মুসলমান ভাইদের মাতৃ স্তন্য পিপাসা আবার জাগিয়াছে—সেই স্তন্যপান পুষ্ট হইয়া যখন মনের স্বাভাবিক লাবণ্য আবার ফিরিয়া আসিবে, তখন যে আত্মপরিচয় ঘটিবে তাহার ফলে হিন্দু হিন্দু, এবং মুসলমান মুসলমানই থাকিয়া একটা বৃহত্তর ও উদারতার জাতীয় চেতনায় আত্ম সমৃদ্ধ হইয়া এক অখণ্ড বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি করিবে। এই প্রসঙ্গে প্রায় ৮/৯ বৎসর পূর্ব্বে একবার যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা এখানে উদ্ধৃত করিব।—

'আমার অনেক দিন হইতে একটা ক্ষোভ ছিল যে, বাঙ্গালী হইয়াও মাতৃভাষার প্রতি উদাসীন থাকায়, মুসলমানগণ আমাদের এই সর্ব্বপেক্ষা গৌরবের ধন সাহিত্য ও ভাষাকে তাহার পূর্ণ পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছে না, এবং নিজেরাও তাঁহাদের হৃদয় নিহিত

www.pathagar.com

মনুষ্যত্বের, স্বধর্ম্ম ও স্বকীয় সাধনার অবধি স্ফূর্ত্তির অভাবে প্রাণে-মনে পঙ্গু হইয়া রহিলেন। কেননা, পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, যে শব্দ, যে বাণী মানবাত্মার হৃদয় রহস্যের একমাত্র প্রকাশ পন্থা, যাহাকে আশ্রয় করিয়া নিরঞ্জন গুহাশায়ী অন্তর দেবতা জীবন লীলায় মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই বাক্, সেই ব্যক্তিত্বাবগুণ্ঠিত ব্রহ্মের আত্মসৃষ্টি মাতৃভাষাতেই সম্ভব। সেই বাণীকে অবহেলা করিলে আপনাকেই হারাইতে হয়। আত্মবিস্মৃত মুসলমান সমাজ যেন যুগধর্ম্ম বশেই, অবশে, অজ্ঞাতে, সেই সাধনমন্ত্র প্রাণ কর্ণে শুনিয়াছেন ; তাই আজ বোধ হইতেছে, তাঁহারা আপনাকে ও জাতিকে এতদিনে চিনিয়াছেন। নহিলে, এই সাহিত্য সাধনার মধ্যেই তাঁহারা যে খাঁটি বাঙ্গালী এই প্রচ্ছন্ন সত্য আজ কেমন করিয়া এমন প্রকট হইয়া উঠিল?'

— এ আট/নয় বৎসর পূর্ব্বের কথা। আজ সে সত্য আরও স্পষ্ট, আরও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। মুস্‌লিম সাহিত্য সমাজের এই অধিবেশন দেখিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু মুসলিম সাহিত্য সমাজ এই নামটার সার্থকতা কোথায়? কি অর্থে এইরূপ একটা সাম্প্রদায়িক ভেদ নির্দ্দেশের প্রয়োজন আছে? সে সম্বন্ধে আমি দুই চারি কথা বলিব। আমার প্রথম কথা এই যে, বাঙ্গালী হিসাবে বাংলা ভাষার চর্চ্চায় হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অধিকার-গত গৌরবের দাবী যে কাহারও অধিক অথবা মুসলমান বা হিন্দু বলিয়াই কাহারও কৃতিত্বের স্বতন্ত্র মূল্য আমি মানি না। কারণ, উভয়েই যখন বাঙ্গালী, এবং বাংলা যখন উভয়েরই মাতৃভাষা, তখন তাহা চর্চ্চা না করায় বরং অগৌরব আছে, চর্চ্চা করার জন্য কাহারও কোনও বিশেষ গৌরব নাই। সাহিত্যে এই জাতিভেদ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। হিন্দু কবিগণের মধ্যে কয়জন বড় কবি ব্রাহ্মণ এবং কয়জন কায়স্থ—ইহা লইয়া যেমন নিজ নিজ জাতের গৌরব করা হাস্যকর, তেমনি কাব্য-বিচারে, একই ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে, পরস্পরের মধ্যে জাতিভেদসূত্রে ঈর্ষা বা আত্মপ্রসাদ বাড়িতে না দেওয়াই উচিত। কারণ, বর্ত্তমান সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায়, দুই সম্প্রদায়ের মিলনের পথে যে বহু অন্তরায় রহিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কেবল একটিমাত্র মিলন ভূমি আছে, তাহা সাহিত্য, সেখানেও যদি এই ভেদবুদ্ধি প্রবল হইয়া উঠে, তবে আমরা দাঁড়াইব কোথায়?

তথাপি, বাংলাভাষায় ও সাহিত্যে মুসলমানের দান কতটুকু এবং তাহার মূল্য কি, এ বিষয়ে বাঙ্গালী মুসলমানের সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে। জাতীয় প্রচেষ্টার সর্ব্ব বিভাগে বাঙ্গালী মুসলমান যদি আপনাদের অধিকার বুঝিয়া লইয়া আত্মসম্মান বোধ করেন, এবং বেশ ভাল করিয়া উপলব্ধি করেন যে, এ ভাষা ও এ সাহিত্য কেবল হিন্দুরই নয়, মুসলমানেরও—তবে তাহা অপেক্ষা জাতির পক্ষে কল্যাণকর আর কি হইতে পারে? তাঁহারা সেই অধিকার সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে আরও দৃঢ় ও প্রসারিত করুন, এই আমার আন্তরিক কামনা। তাঁহারা যে বাঙ্গালী, এ ভাষা ও সাহিত্য যে তাঁহাদেরও সম্পত্তি, এবং ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যে তাঁহাদের সহায়তা ছিল, ও থাকার প্রয়োজন আছে—ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ নয়? আত্মবিস্মৃত মুসলমান সমাজের পক্ষে অতীতের ইতিহাসে সেই প্রমাণ পাইয়া আশ্বস্ত হওয়ার প্রয়োজন আছে।

বাংলা ভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব কতখানি এবং তাহার দ্বারা বাংলা ভাষার কতখানি ইষ্ট সাধন হইয়াছে বা ভবিষ্যতে হইবে, ইহা বিচারের বিষয় নয়, প্রত্যক্ষ ফলাফলের উপর নির্ভর করে। বাঙ্গালী মুসলমানের পক্ষে বাংলা ভাষায় কি পরিমাণ আরবী ফারসী শব্দের

www.pathagar.com

ব্যবহার তাহার প্রাণ ও মনের অবাধ স্ফূর্ত্তির জন্য আবশ্যক, তাহা প্রকৃত সাহিত্য রসিক, ভাবুক ও প্রতিভাবান লেখকের শক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হইবে। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন তাহার শপক্ষে বা বিরুদ্ধে কোনও কথা বলাই যুক্তিসঙ্গত হইবে না। কেবল ভাষা লইয়াই এইরূপ ভাবনা—জোর করিয়া ভাষার উপর একটা বাহ্যিক ছাপ দিবার চেষ্টা করিলে, ভাষা জীবন্ত হইয়া উঠিবে না এবং তাহাতে সাহিত্য সৃষ্টির ব্যাঘাত হইবে। বাংলা সাহিত্যের অতীত ইতিহাসে কি হিন্দু কি মুসলমান সকল লেখকের ভাষাতেই বাংলার যে রূপটি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে সাহিত্য পদবাচ্য রচনায় যাহা এ পর্য্যন্ত কাব্যের ভাষা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহাতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, আড়াই হাজার বিদেশী শব্দ বাংলা ভাষায় স্থায়ী সম্পদ হইয়া গেলেও, যে-ভাষায় এ পর্য্যন্ত সাহিত্য রচনা হইয়াছে তাহার উপর আরবী বা ফারসীর প্রভাব খুবই কম—নাই বলিলেও হয়। ইহার কারণ যাহাই হউক, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন দেখি না। যদি হিন্দু অন্ধ অনুকরণ ইহার কারণ হয়, তবে সচেতন ও আত্মপ্রতিষ্ঠ মুসলমান সমাজ ভবিষ্যতে এ দিক দিয়া ভাষার নতুনত্ব বা পরিপুষ্টি সাধন করিতে পারিলে, তাহা সুখের বিষয় হইবে। ভাষার প্রকাশ-ক্ষমতা যত বাড়ে, যত শব্দ সম্পদ বৃদ্ধি হয় ততই মঙ্গল। কিন্তু এই ব্যাপারে সাহিত্যিক উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য প্রবল হইলে, মুসলমান ভ্রাতাগণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন, বিশুদ্ধ সাহিত্যিক প্রেরণার হানি হইবে ইহাই আমার বিশ্বাস।

এজন্য, উপস্থিত ভাষার কথা ছাড়িয়া দিয়া একটা আরও বড় কথা উত্থাপন করিব—আমার বিশ্বাস 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র মুসলিম নাম করণের সার্থকতা এইখানেই। ইংলন্ড ও আমেরিকা দুই-এর ভাষা ইংরাজী, তথাপি সকলেই জানেন—ইংরাজী সাহিত্য ও মার্কিন সাহিত্যে একটা ভাব ও ভঙ্গীগত প্রভেদ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এখানে ধর্ম্ম ও ভাষা এক—তথাপি দেশভেদে প্রকৃতিভেদে ঘটিয়াছে—এবং উভয়ের জীবন যাত্রার আদর্শ নানা কারণে ভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্য সাহিত্যে, এমন কি ভাষায় পর্য্যন্ত একটি বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালী মুসলমান ও বাঙ্গালী হিন্দু উভয়ের ভাষা এক, দেশও এক। তথাপি শিক্ষা দীক্ষা এবং আধ্যাত্মিক আদর্শে উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রহিয়াছে—এজন্য একের আদর্শ, ভাবও চিন্তা প্রণালী ঠিক অন্যের মত হইতে পারে না। অতএব সাহিত্যে উভয়ের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী থাকিবে। কিন্তু এই ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য সমাজে ও ধর্ম্ম জীবনে যেমনই প্রকটিত হউক, আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যে কোনও বিশিষ্টরূপ গ্রহণ করিতে পারে নাই। ইহার একমাত্র কারণ, বাঙ্গালী মুসলমান আজ পর্য্যন্ত সাহিত্যে স্পষ্ট করিয়া আত্মপ্রকাশ করেন নাই—এবং করেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের প্রাণের আদর্শটি তেমন জীবন্ত হইয়া উঠে নাই। এই আদর্শটিকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে মুখ্যতঃ ভাষার উপর লক্ষ্য রাখিলেই চলিবে না। সত্যকার প্রতিভা বলেই সাহিত্যে সৃষ্টি সফল হয়—তখন ভাষা যে রূপ লইবে তাহা ভাবিবার প্রয়োজনই হয় না, সে ভাষা আপনিই আপনাকে সৃষ্টি করে, যদি তাহা খাঁটি বাংলাই হয় তাহাও যথার্থ হইবে ; যদি না হয়, phrase বা বাক্যভঙ্গী স্বতন্ত্র হয়, তাহাও যথার্থ হইবে। সাহিত্যই যদি সৃষ্টি হয় তবে তাহার ভাষা লইয়া আপত্তি করিবে কে? সেই সাহিত্যই সৃষ্টি করিতে হইবে—তার জন্য চাই আত্ম-সাক্ষাৎকার, আপনাকে উত্তমরূপে চিনিয়া লওয়া, সত্য-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা। সংস্কৃতবহুল ভাষাই হউক, আর অধিক পরিমাণে আরবী, ফারসী মিশ্রিত জবানই হউক, কেবল ভাষার দ্বারা কিছুই হইবে না।

www.pathagar.com

আমি বাংলা সাহিত্যের পক্ষ হইতে মুসলমান ভাইদের নিকটে এইরূপ জীবন্ত ও প্রাণবান একটি স্বতন্ত্র সুর বঙ্গভারতীয় বীণায় ঝঙ্কৃত করার প্রত্যাশা করি—এইরূপ নূতন ও সত্যকার ভাব-সম্পদে বঙ্গ সাহিত্যকে ধনী করিতে না পারিলে, বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমানের দান সার্থক হইবে না—এ সাহিত্যের উপর তাঁহাদের সত্যকার দাবী প্রমাণিত হইবে না। সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টি, ও তথা ভাষার সমৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে মুসলিম সমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপরিচয় সাধনের প্রয়োজন। অপর কোনও সম্প্রদায়ের প্রতি বিরোধবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া তুলিলেই এই আত্ম পরিচয় ঘটিবে না—বরং বাহির হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ বিবিক্ত করিয়া ধ্যানে বসিতে হইবে, আত্মযোগ সাধন করিতে হইবে ; সেই সাত্ত্বিক তপস্যার ফলে যে আত্মপ্রসার ঘটিবে, তাহারই অনির্ব্বচনীয় আনন্দে বাংলার সাহিত্য-লক্ষীর নয়নে, ললাটে ও অধরে এক নূতন দীপ্তি ফুটিয়া উঠিবে—বাঙ্গালী মুসলমানের বাঙ্গালীত্বই ধন্য হইবে।

এইরূপ অনুপ্রেরণার শক্তি সঞ্চয়ের জন্য একটি ঐতিহাসিক সত্যের ইঙ্গিত করিব। সম্প্রতি, বাংলা ভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব সম্বন্ধে যিনি প্রকাণ্ড প্রবন্ধ লিখিয়াছেন—তাঁহার উদ্দেশ্য যাহাই হউক, শেষ পর্য্যন্ত তিনি মুসলমানের উপর বাংলা ভাষা ও হিন্দু সাধনার প্রভাবই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইহা না করিয়া তিনি আর একটা কাজ করিলে আজিকার এই আত্মবিস্মৃত মুসলমান সমাজের উপকার হইত। তিনি একটু পরিশ্রম করিলে, বাঙালী জাতির ইতিহাসের একটি পরমাশ্চর্য্য অধ্যায় উদ্ধার করিয়া দিতে পারিতেন। ত্রয়োদশ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সারা বাংলাদেশে যে একটি নবজীবন সঞ্চারের প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার মূলে মুসলমান ধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রভাব কতখানি কাজ করিয়াছে—বাঙালীর ভাব-প্রকৃতিতে কি অভিনব বেগ সঞ্চার করিয়াছে, তাহার ধর্ম্মজীবন, সামাজিক আদর্শ ও সাহিত্য সাধনার মূলে কি প্রবল প্রেরণা দান করিয়াছে তাহার যথার্থ মূল্য নিরূপণ করা প্রয়োজন। মুসলমান পূর্ব্ব যুগের বাঙালী ও পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গালীর জীবন যাত্রায় প্রাণের সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তিতে যে বিশিষ্ট ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায়, তাহার মূলে, মুখ্য ও গৌণভাবে এই নবাগত ধর্ম্ম ও সভ্যতা কি পরিমাণ শক্তি সঞ্চার করিয়াছে, বাঙ্গালী কাল্‌চারের ক্রমবিকাশের এই অঙ্কটি এ পর্য্যন্ত কেহ কষিয়া দেখেন নাই। শুধু রাষ্ট্রবিপ্লব নয়, একটা গভীর ভাব-বিপ্লব যে ঘটিয়াছিল, সে বিপ্লবে বাঙ্গালী জাতির মনের রঙ অজ্ঞাতেও কতখানি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল সেই ইতিহাস উদ্ধার করিতে হইবে, এবং তাহা হইতেই আধুনিক বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ পথনির্দ্দেশ ও পাথেয় সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

মুসলিম সাহিত্য সমাজের সাহিত্য-ব্রত কি কারণে ও কি হিসাবে একটা বিশিষ্ট সাধনা হইতে বাধ্য, তাহা আমার জ্ঞানবিশ্বাস মত আমি বলিলাম। কিন্তু অন্য দিক দিয়া ইহা যে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মিলিত সাধনার ক্ষেত্র, ইহা কখনও বিস্মৃত হইলে চলিবে না, বরং এই সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়াই সমগ্র জাতির হৃদয়ে একই স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া উঠিবে—দুই সম্প্রদায়ের দুই বিশিষ্ট ভাবধারা একত্র প্রবাহিত হইয়া একটি পুণ্য সঙ্গমের সৃষ্টি করিবে। সাহিত্যের মধ্য দিয়াই শ্রেষ্ঠ ভাবরাশির আদান প্রদান সূত্রে যে একটী আদর্শ ফুটিয়া উঠিবে তাহা দ্বারা এই জাতির পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের উপায় হইবে। তখন উভয়ে উভয়কে খাঁটি বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবে, এবং পরস্পরের গৌরবে গৌরবান্বিত হইবে। এই

www.pathagar.com

উদার আদর্শের সন্ধান যাঁহারা ইতিমধ্যেই পাইয়াছেন, যাঁহাদের ভাবনা ও সাধনা এই উৎকৃষ্ট জ্ঞান ও প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছে, সেই মুসলিম সাহিত্য সমাজের কর্ম্মিগণকে সমগ্র জাতির কল্যাণকামী, সত্যবান সাহিত্য সেবকরূপে আমি কি বলিয়া অন্তরের ধন্যবাদ জানাইব তাহা জানি না ; কিন্তু ইহা জানি যে, আজ যাহা অঙ্কুরিত হইয়াছে একদিন তাহাই বিশাল পাদপরূপে ছায়া বিস্তার করিয়া আমাদের প্রাণের শ্রান্তি দূর করিবে—অদূর ভবিষ্যতের সেই পরমা সিদ্ধি স্মরণ করিয়া আমি তাঁহাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধাসহকারে নমস্কার করি।

www.pathagar.com

দারার ধর্ম্ম মত

কালিকারঞ্জন কানুনগো এম. এ.

দারার ধর্ম্মমত কি ছিল জানিতে হইলে আকবরের ধর্ম্মের সহিত তাঁহার কিঞ্চিৎ তুলনামূলক বিচার প্রয়োজন। কেননা জাহিরী ইসলাম দু'জনকেই কাফের মনে করে। অনেকের ধারণা শাহজাদা তাঁহার প্রপিতামহের বহুরূপীর পোষাকটা পাইয়াছিলেন, তাঁহার স্বরূপ ও প্রকৃত ধর্ম্মমত ঐ বহুরূপীর পোষাকে প্রচ্ছন্ন ছিল; তাই তিনিও কাফের স্থির হইয়াছেন।

আকবরের ধর্ম্ম কি ছিল লোক বুঝিতে পারিত না; কিংবা যে ধর্ম্ম তিনি মানিতেন মানুষের অভিধানে তাহার কোন পরিভাষা নাই; অন্ততঃ স্মিথ সাহেব খুঁজিয়া হতাশ হইয়াছেন। জাহিরী ইসলাম ও সুন্নী মৌলানাদের সহিত বাদ্‌শার বিবাদের সংবাদ পাইয়া পর্ত্তুগালের পাদ্রী, পারশ্যের অগ্নি উপাসক, তিব্বতের লামা, লির্‌নার পাহাড়ের জেন-যতী ও কাশীর পণ্ডিত দরবারে হাজির হইলেন। ফতেপুর সিক্রীর ইবাদত খানার বৈঠকে প্রথমে পাদ্রীর ডাক পড়িল। বাবাজীর বক্তৃতার জোরে সকলের মুখের জল শুকাইয়া গেল—বাদশাহ বাহবা দিলেন। পাদ্রী সাহেব বুঝাইয়া দিলেন, খৃস্টধর্ম্ম যেমন একটা আনারস ফল; এ রকম মেওয়া হিন্দুস্থানে নূতন আমদানী, এটা খাইলে সব পাপ হজম হইয়া যাইবে; আঁধারে আলো দেখিতে পাইবেন; বিশেষতঃ শরাবটা হালালের এক ডিগ্রী উপরে; ওটা ছাড়া কাজই চলে না। বাদশা দেখিলেন হাজার চোখো আনারসের চেহারা জমকালো বটে, রসও বোধ হয় তেমনই মধু। ফলস্তুতি শুনিয়া শাহানশার জিভে জল আসিল। মোল্লা রাগে গা ঝাড়া দিলেন; দিল্লীর শাহী-তক্ত থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তবুও গোপনে পাদ্রীকে ডাকিয়া, বাদশা পাদ্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আনারস কেমন করিয়া খাইতে হয়? আনন্দে অধীর হইয়া পাদ্রী বলিলেন, 'উপায় অতি সোজা; আমি জর্ডনের জল ছিটাইয়া দিতেছি—আপনি চোক্ বুঝিয়া ঝুঁট খোসা ডাঁটি শুদ্ধ গিলিয়া ফেলুন, রস পেটে গেলেই মালুম হইবে।' চতুর আকবর শুধু রসটুকু চাখিতে চাহিয়াছিলেন; আস্ত আনারস গিলিতে তিনি রাজী হইলেন না। পাদ্রী বলিলেন, 'জাঁহাপনা। চোখ ঝুঁট ছাড়া কি আনারস হয়?' আকবর মনে করিলেন, পাদ্রী মহামূর্খ। পাদ্রী নিজের ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিলেন আকবর বাদশাহ মহাধূর্ত্ত, কপট, নাস্তিক ও অবিশ্বাসী। স্মিথ সাহেব ঐ ডায়েরীর সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। ইবাদত্ খানার বাজারে এ প্রকারে বাদশাকে কেহ নারিকেল, কেহ আম, কেহ কলা ভেট দিল; বাদশা কোনটা নাড়া চাড়া দিলেন ও কোনটা শুঁকিয়া দেখিলেন এবং সবটার প্রশংসাই পাঁচ মুখে করিতে লাগিলেন। কিন্তু ছোবড়া আঁটি, খোসা গিলিবার ভয়ে তিনি কোনটা গ্রহণ করিলেন না। বাদশা শেষে স্থির করিলেন আনুষ্ঠানিক মতে আঁটি শুদ্ধ গিলিতে হইলে আরবের খেজুরই বরং গিলা সুবিধা; গুণও উহার অনেক, তুর্কী ইসলামী খেজুর খাইয়াই ভিয়েনার দরওয়াজা পর্য্যন্ত ঘোড়া দোড়াইয়াছিল। আকবর জগতের উপকার্য্যের জন্য সর্ব্ব ধর্ম্মের সারতত্ত্ব এবং একত্র সংযোগ করিয়া এক mixture আবিষ্কার করিয়াছিলেন; দরবারে দীন-ই-এলাহী নামে চালাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। Essence বেশী দিন থাকে না; কালের বাতাসে উহা উড়িয়া

www.pathagar.com

গিয়াছে। ধর্ম্মে নূতন patent চালাইবার মত ইচ্ছা এবং ক্ষমতা দারার ছিল না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে দারা ও আকবরের সাদৃশ্য ছিল উদারতা, মত–সহিষ্ণুতা এবং জাতি–বর্ণ–নির্ব্বিশেষে মানবজাতির প্রতি প্রেম ইত্যাদি ভাবে ; বাহ্যিক অনুষ্ঠানে নয়। প্রপিতামহের মত তিনি তিলক কাটিতেন না, কিংবা অগ্নি ও সূর্য্যকে পরমাত্মার জ্যোতি বলিয়া ভক্তি করিতেন না। অতি উচ্চ দর্শনের মধ্যেও আকবরের materialism যে একেবারে ছিল না বলা যায় না ; তিনি রোগ মুক্তি, আয়ুবৃদ্ধি কিংবা ঐশ্বর্য্য লাভের আশায় এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া কিছু দিন সূর্য্য স্তোত্র পাঠ করিয়াছিলেন।

দারার কাম্য ছিল সুফী সাধনা দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার নিত্য রতি ও লয় (fana fillah)। সত্যের অনুসন্ধানে তিনি ইঞ্জিল তৌরীত, বেদ উপনিষদ পড়িয়া ছিলেন। তিনি পঞ্চাশ খানা উপনিষদের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার চেষ্টায় ভাগবদগীতা, যোগ–বাশিষ্ঠ এবং প্রবোধ–চন্দ্রোদয় ফারসী ভাষায় তরজমা করান। তিনিও পণ্ডিত, পাদ্রী, গুরু সকলের সঙ্গেই মিশিতেন এবং সকলের মতে সায় দিতেন।

কিন্তু তাঁহার গোপন সাধনা ছিল সুফী সাধনা ; তিনি বাতেনী ইসলামেই সর্ব্ব ধর্ম্মের একত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। দারা নিজকে কাদেরী ও হানিফী বলিয়া গিয়াছেন। ইমানের profession, verification and obedience এই তিনটির মধ্যে প্রথম দুটাই স্বীকার করিতেন। হজরত মহম্মদের পয়গম্বরী এবং খোদাতালা এক ইহা তিনি মানিতেন এবং সুফীরা মনে করেন দারা সাধনার দুই স্তর অর্থাৎ fana-fi-shaikh ও fana-i-Rasul পর্য্যন্ত উঠিয়াছিলেন। তিনি রোজা, নমাজ সব সময়ে প্রকাশ্যে করিতেন না। এজন্য লোকে তাঁহাকে নিন্দা করিত ; এই নিন্দাও Malamati-র ন্যায় তিনি সাধনার অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। ঔরঙ্গজেব দারাকে মুলহেদ বলিয়া ঠাট্টা করিতেন। দারা ঔরঙ্গজেবের নাম দিয়াছিলেন নমাজী। জাহেরী ও বাতেনী ইসলামের এই মতভেদ বহুদিন চলিয়া আসিতেছে। একজন সুফীপীর জাহেরীকে কটাক্ষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।

'মতবাদী জানে নহি তত্ত্ববাদীকা বাত।
সুরজভাগে উলুয়ালিনে আধারী রাত॥

সুফীদের মধ্যে অল্পসংখ্যক সাধক মনে করেন হাকিকত জ্ঞান হইলে শরিয়তের অনুষ্ঠানের দরকার হয় না। কিন্তু অধিকাংশের মত শরিয়তের কর্ম্ম–অনুষ্ঠান না করিলে মনের উপর অজ্ঞানের পরদা পড়িয়া যায়। দারা জ্ঞানী ও সাধক ছিলেন ; কিন্তু শরিয়তের কর্ম্ম–অনুষ্ঠান না করিলে মনের উপর অজ্ঞানের পরদা পড়িয়া যায়। দারা জ্ঞানী ও সাধক ছিলেন ; কিন্তু শরিয়তের কার্য্যে অবহেলা দরুন তিনি যুধিষ্ঠিরের মত নরকের রাস্তা হইয়া স্বর্গে যাইবেন ; ঔরঙ্গজেবের মত সরাসরি বেহেশ্‌তে উঠিতে পারিবেন না ইহাই অনেকের বিশ্বাস।

দারা একাধিক পীর হইতে দীক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মোল্লা শাহ বদক্‌সী, সরমদ্‌, শাহ্‌ দিল–রুবা এবং শেখ মহিবুল্লা এলাহাবাদী তাঁহার গুরু। ইহাদের কাছে দারা যে সমস্ত পত্র লিখিতেন তাহাতে তাঁহার pantheism বিশেষ ভাবে প্রকট হইয়াছে। তিনি খোদাতালা, ও জাহানের স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে একত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। Fana-fi-Shaikh অবস্থায় তিনি শাহদিলরুবার নিকট যে সমস্ত চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে ঈশ্বরের যে সর্ব্বব্যাপক বিশ্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অনেক সময় গীতার প্রতিধ্বনি

www.pathagar.com

বলিয়া মনে হয়। তিনি এক চিঠিতে ঈশ্বর সম্বন্ধে লিখিতেছেন 'হে আল্লা তোমার সমস্তই মুখ, সমস্তই চক্ষু, সমস্তই তোমার শ্রবণ' গীতায়ও আছে—

সর্ব্বতঃ পাণি পাদস্তৎ, সর্ব্বতোহক্ষি শিরো মুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতি মল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

আর এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন, 'তুমি একটি নাম ; তোমার একই নাম ছাড়া দ্বিতীয় নাম নাই ; কিন্তু তোমাকে লোকে যে নামে ডাকুক তুমি সাড়া দাও।'

সুফী সাধকদের মত দারাও ভগবৎ প্রেমে পাগল ছিলেন ; রাজপুত্র হইয়া তিনি ফকিরের সাধনায় রত ছিলেন। সুফীরা সাধনার এমন এক স্তরে উঠেন যাহা তাঁহারা আনুষ্ঠানিক ইসলামের, পৃথিবীর সব ধর্ম্মের উপর বলিয়া মনে করেন। সুফীরা এমন অনেক কথা বলেন যাহা আপাতঃ দৃষ্টিতে কাফেরী বলিয়া মনে হয়। সমশী তাব্রিজী মুসলমান জগতকে বলিয়া গিয়াছেন—

'হে মুসলমানগণ! উপায় কি? আমি ত নিজেকে চিনিতে পারিলাম না। আমি ইহুদী নই, অগ্নি–উপাসক নই, মুসলমানও নই, আমি না পূর্ব্ব দেশের না পশ্চিম দেশের, আমি ইরাকেরও নই, খোরাসানেরও নই। আমি আদম–হাওয়ার সন্তান নই, আমি স্বর্গ হইতে আসি নাই।'

হিন্দুস্থান ব্রাহ্মণের দেশ ; তাই কবি ও সাধক আমীর খসরু হিন্দুস্থানের মুসলমানকে শুনাইয়া গিয়াছেন, 'প্রেম আমাকে কাফের করিয়াছে ; মুসলমানীতে আমার দরকার নাই ; আমার প্রত্যেক শিরাই ব্রাহ্মণের পৈতার এক একটি তার হইয়া গিয়াছে, আমার সূতার যজ্ঞোপবীর দরকার নাই। লোকে বলে খসরু মূর্ত্তি পূজা করে। হাঁ আমি সত্যই তাহা করি ; দুনিয়ার সঙ্গে আমার ত কোন কাজ নাই।'

দারাও এমনই ভাবের আবেশে লিখিয়াছেন। 'আমার মনের উপর হইতে জাহিরী ইসলামের খোলস পড়িয়া গিয়াছে ; আমি একজন মূর্ত্তি পূজক ব্রাহ্মণ, কিম্বা ততোধিক খোদ–পরস্ত হইয়াছি। প্রকৃত কূফরী কি ভাব তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। কাফের যে জাহিরী ইসলামের উপর নারাজ তাহাতে আশ্চর্য্য কি? প্রকৃত পৌত্তলিকতা কয়জন জানিতে পারিয়াছে? প্রত্যেক মূর্ত্তিতে প্রাণ, এবং বেইমানীর আড়ালে ইমান প্রচ্ছন্ন আছে। ... ...

Agar kafir at Islam-i-majati gasht be-Zar
kera kufor-i-haqiqi shud padidar.
Darun har but-i-jan-ist pintran,
Bq-zer-i-kufr iman-ist pinhar.

www.pathagar.com

ইউরোপীয় সভ্যতায় মুসলিম স্মৃতি

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ বি. এ., বি.টি.

ভূমিকা

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপভোগ করিবার জন্য জগতে রকম রকম বিলাসের সৃষ্টি হইয়াছে। অনেকদিন পর্য্যন্ত বিলাসের অনুশীলন করিতে করিতে নাকি মানুষ ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। বিলাস সৃষ্টি ও উদ্ভাবন দ্বারা পরোক্ষভাবে কতগুলি বিশেষ শিল্পের উন্নতি হইলেও অন্যভাবে তাহা মারাত্মক। চিত্ত বা মন দ্বারা উপভোগ করিবার জন্য দিন দিন অসংখ্য রকমের সাহিত্য রসের সৃষ্টি হইতেছে। সাহিত্য বিলাসও সময় সময় মানুষকে আত্মবিস্মৃতি আনিয়া দেয়। আর এক প্রকার বিলাস হইতেছে পূর্ব্ব পুরুষের খ্যাতিচর্চ্চা উপভোগ করা। অন্য দশ প্রকার বিলাসের ন্যায় ইহাও মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে অসাড় করিয়া তুলে। তখন এই শ্রেণীর বিলাসী ভাবিয়াও উঠিতে পারে না যে, পূর্ব্বকালে দূরে থাকুক, বর্ত্তমান কালেও তাহার যে আপনার জন কঠোর কর্ম্ম সাধনা দ্বারা জগতের মধ্যে নিজের জন্য একটা শ্রেষ্ঠ স্থান জয় করিয়া লইয়াছে, সে এখন আর তাহার কেহ নয়। সে বৃথাই সেই কর্ম্মকুশল মনীষী পুরুষকে আপনার বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে চায়। আপনার জন হইলেও সে যে এখন তাহার চক্ষে পঙ্গু ও অকর্ম্মণ্য একথাই সে বুঝিতে পারে না। তাহার সফলকাম আত্মীয়ের নিকট সে এখন Lotuland এর অধিবাসী। এক হিসাবে আমার এই প্রবন্ধ সেইরূপ lotus-cater এর স্বপ্ন।

তবুও এই কথার আর এক দিক আছে। আত্ম প্রত্যয় অনেক সময় দুর্ব্বল মানুষের দ্বারাও সবল মানুষের কাজ আদায় করিয়া দিতে পারে। আমি যদি এই প্রমাণ পাই যে যাহার সঙ্গে আমার অনেক দিক দিয়া মিল আছে বলিয়া আমি অন্ততঃ মনে করি সেও একদিন আপনার বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তি চাষ করিয়া জগতে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিল, হয়তো তাহাতে আমার একটা নূতন অনুপ্রেরণা জাগিয়া বসিতে পারে। এই কথা চিন্তা করিয়া এই সন্দর্ভের অবতারণা করিলাম।

এশিয়ার কোন অংশে কিম্বা ভারতের কোন স্থানে বাবরের বংশের কেহ আর রাজত্ব করিতেছেন না। বাবরের বংশের নির্ম্মিত সৌধাবলীও হয়তো কালক্রমে ধূলায় মিশিয়া যাইবে। কিন্তু বাবরের বংশের এবং তাঁহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী বিভিন্ন মুসলমান রাজবংশের দীর্ঘ সাত শত বৎসর ভারতে রাজত্ব করার ফলে ভারতবাসীর প্রাত্যহিক জীবনে, আচার-ব্যবহারে, ধর্ম্মে ও ভাষায়, খাদ্য ও পোষাকে এবং দৃষ্টিতে (out look এ) যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ জগতের কোন vandalism নাই যাহা, তাহা চিরকালের জন্য মুছিয়া ফেলিতে পারে।

www.pathagar.com

ইউরোপ হইতে মুসলিম সভ্যতা এবং মুসলিম সভ্যতার স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার জন্য প্রতিপক্ষের শতাব্দীর পর শতাব্দী সুব্যবস্থাপিত চেষ্টা চলিয়াছে।[১] কিন্তু এ চেষ্টা যে সফল হয় নাই।

ইতিহাসই তাহার সাক্ষী

আপন কল্যাণের জন্য যাহা আবশ্যক হয়, তাহা মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রহণ করিয়া থাকে এবং আপনার মধ্যে তাহার প্রচলন স্থায়ী করিয়া রাখিয়া থাকে। কল্যাণের অনুসন্ধান মানুষের সনাতন প্রকৃতি। মানুষ চিরকালই কল্যাণ খুঁজিতে যাইয়া কৃত্রিম স্রোতে প্রতিহত ও ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছে, কিন্তু সেই জন্য মানুষের কৃত্রিমের বিরুদ্ধে অভিযান থামিয়া যায় নাই। হজরত মোহাম্মদ (দঃ) আসিয়া বলিলেন, তিনি জগতে নূতন কিছু প্রচার করিতে আসেন নাই। মানুষের যাহা সনাতন কল্যাণ তাহাই মানুষ ভুলিয়া গিয়াছে, তিনি মানুষকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তিনি জগতকে যাহা দিয়া গেলেন তাহা লইয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী বাগ বিতণ্ডা চলিয়াছে। ইসলামের যে ব্যাখ্যার মধ্যে মানুষ সত্য ও কল্যাণস্বরূপ স্বর্ণরেণু পাইয়াছে তাহাই মানুষ আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিবে।

মোটের উপর মুসলমানদের নির্ম্মিত সকল দালান কোঠা, সকল শিল্পজাত দ্রব্য ও তাঁহাদের রচিত বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস জাতীয় সমুদয় গ্রন্থাবলীর অধিকাংশ ইচ্ছাপূর্ব্বক ধ্বংস করিয়াও ইউরোপ মুসলিম সভ্যতার ছাপ আপনার অঙ্গ হইতে উঠাইয়া ফেলিতে সক্ষম হয় নাই। জন উইলিয়াম ড্রেপার লিখিয়াছেন—

> I have to depbre the systematic manner in which the literature of Europe has contrived to put out of sight our scientific obligations to the Mohammedans. Surely they can not be much longer hidden.
>
> ... ...
>
> The Arab has left his intellectual impress on Europe, as, before long, Christendom will have to confess ; he has indelibly written it on the heavens as any one may see who reads the names of the stars on a common celestial globe[২]

ইউরোপের তথা বর্ত্তমান জগতের বিজ্ঞানে, দর্শনে আচার-ব্যবহারে ভাষায় কিরূপে মুসলিম স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে, নিম্নে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

অঙ্কশাস্ত্র

ভারতীয় মনীষিগণের নিকট হইতে আরবগণ নয়টি সংখ্যা এবং একটি শূন্যের সাহায্যে অঙ্ক লিখিবার প্রথা শিক্ষা করিয়াছিলেন। আরবগণ ভারতের নিকট এই বিষয়ে তাঁহাদের ঋণের

---

১. The age of transition has left no memorials from which an intelligent idea of its progress can be obtained. S.P. Scott, History of the Moorish Empire in Europe. Voll III, P. 560.

২. John william draper, The intellectual Development of Europe, Voll II, PP. 40-41.

www.pathagar.com

স্মৃতি জাগরুক রখিবার নিমিত্ত এই সংখ্যাগুলিকে 'ভারতীয় সংখ্যা' বলিয়া চিরকাল উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপর তাঁহারা এই নয়টি সংখ্যা ও একটি শূন্য দ্বারা বিশাল অঙ্কশাস্ত্র সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের গণিত সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রকাশিত হইলে ইউরোপে প্রচলিত রোমান সংখ্যা লিখন পদ্ধতি উঠিয়া যাইতে থাকে এবং গণিত বিজ্ঞানে যুগান্তর আরম্ভ হয়। ইদানীং গণিত বিজ্ঞানে আরও বিস্তর উন্নতি সাধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু আরবগণের হস্তের ছাপ গণিত বিজ্ঞানে এমনভাবে লাগিয়া গিয়াছে যে তাহা আর চেষ্টা করিয়াও উঠাইবার উপায় নাই।

সাইফার (cipher) শব্দটিও তাহার বিভিন্ন রূপান্তর আরবী শব্দ ছিফর হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মোহাম্মদ বিন-মুসা আরবীয়গণের মধ্যে প্রথম বীজগণিতের লেখক। তিনি ত্রিকোণমিতির মধ্যে 'সাইন' ও 'কোসাইনের' (Sine and Cosine) প্রচলন করেন এবং তৎপর ইটালি হইয়া এই পদ্ধতি ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। স্পেন দেশীয় মুসলমানেরাই প্রথম বীজগণিতের সূত্র জ্যামিতিতে প্রয়োগ করেন বলিয়া অনেক ঐতিহাসিকের বিশ্বাস। স্পেনীয় খলিফাগণের গৌরবের যুগে সেভিল, কর্ডোভা, টলেডো ইত্যাদি নগরের বিদ্যালয়সমূহে স্থাপত্যে জ্যামিতি প্রয়োগ প্রণালীও তদ্সংক্রান্ত ড্রইং শিক্ষা দেওয়া হইত। আজ পর্য্যন্তও আরবদের ববহৃত আলগরিথম (Algorithm) আল-জিবরা (Algebra) ইত্যাদি শব্দ অঙ্কশাস্ত্রে প্রচলিত রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত মুসা 'বর্গীয় সমীকরণ' বা Quadratic equation সমাধান করিবার যে প্রণালী আবিস্কার করিয়াছিলেন, তাহা আজও প্রচলিত আছে।[৩]

জ্যোতিষ শাস্ত্র

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কৃত একটি করিয়া তথ্যও উল্লেখ করিবার স্থান নাই। আরবেরাই সর্ব্বপ্রথমে তারকা-মণ্ডলীর গতিবিধির তালিকা ও নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। খলিফা আল মামুন নিজে সূর্য্যের বাৎসরিক আবর্ত্তন কক্ষের তির্য্যকতা (Obliquity of the ecliptic) ২৩.৩৫৫২´ সেকেণ্ড নির্ণয় করিয়াছিলেন। এইরূপে বোগদাদের আবুল ওয়েফা (৯৮৭ খৃঃ) ২৩.৩৫ মিনিট বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদ আবু রায়হান ২৫ ফিট ব্যাসার্ধ্বযুক্ত কোয়াডর‍্যান্ট (Quadrant) বা বৃত্ত চতুর্থাংশ দ্বারা ঐ বক্রতা ২৩.৩৫ মিনিট নির্ণয় করিয়াছিলেন। স্পেন দেশের টলেডো নগরবাসী আল-জারকাল (১০৮০ খৃঃ) সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্যাদির আবর্ত্তন কক্ষ অন্ডাকার (বা elliptical) বলিয়া নির্ণয় করেন এবং প্রচলিত টলেমিক প্রণালীর ভ্রান্তি বাহির করিয়া জগতে কোপার নিকাস এবং কেপলার-এর সিদ্ধান্তের পূর্ব্বাভাস দান করেন। তিনি সূর্য্যকক্ষের সর্ব্বদূরবর্ত্তী স্থানের (apogee) সঞ্চালন সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করিবার জন্য অন্যূন ৪০২ বার বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ (obseruation) করেন। তাঁহার সিদ্ধান্তের ফল আধুনিক বৈজ্ঞনিকগণও শুদ্ধ বলিয়া প্রকাশ

---

৩. Intellectual Development of Europe, Vol. II History of the Moorish Empire in Europe Voll. III, Chaps XXIX এবং XXX।

www.pathagar.com

করিতেছেন। ইবনে–সিনার তালিকায় ১০২২ টি তারকার নাম উল্লেখ আছে। দার্শনিক ইবনে রোশদ (Averroes) বুধ গ্রহের গতিবিধি নির্ণয়কালে সূর্য্যের মধ্যে দাগ আবিস্কার করেন। বর্ত্তমান যুগের কাব্য রসপ্রিয় বাঙ্গালীর আদরের ধন ওমর খৈয়াম সেলজুক–সুলতান মালিকশাহ কর্ত্তৃক তৎকালের প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার সাধনে নিযুক্ত হন। তিনি আরও কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে লইয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। তৎকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত পঞ্জিকা সম্বন্ধে গিবন বলিতেছেন, 'সময় গণনা করিবার এই প্রণালী জুলিয়ান প্রবর্ত্তিত প্রণালী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট এবং সঠিকতায় গ্রেগরী প্রবর্ত্তিত প্রণালীর প্রায় সমকক্ষ'। যে সময় সূর্য্য রাশিচক্রের মেষে প্রবেশ করে, সেই সময় হইতে ওমর খৈয়াম বৎসরের প্রথম দিন নির্ণয় করেন।

ইতঃপূর্ব্বে সূর্য্যের মীনে প্রবেশ করা হইতে বৎসরের প্রথম দিন গণনা করা হইত।

আধুনিক 'আলমানাক' (Almanac) বা পঞ্জিকার ইংরেজী প্রতিশব্দ মূলে আরবী। ঐতিহাসিকগণ আধুনিক পঞ্জিকার আবিষ্কারক আরবগণকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কায়রো নগরের রাজকীয় লাইব্রেরীতে গণিত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ৬০০০ পুস্তক ছিল ; তথা হইতে অনেক পুস্তক স্পেন দেশেও নীত হইয়াছিল। আজকাল তাহার একখানিও বাঁচিয়া নাই। খৃস্টান শক্তি তাহাদের জয়ের দিনে সকলই ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল।[৪]

জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয় যন্ত্রপাতি

আরবগণই প্রথম স্পেনদেশের স্কুলে গ্লোব দ্বারা ভূগোল ও জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই সকল গ্লোব কাষ্ঠ ও ব্রোঞ্জ নামক ধাতুর নির্ম্মিত ছিল। সূর্য্য ও তারকারাজির উচ্চতা নির্ণয় করিবার জন্য আরবগণ astrolabe নামক যন্ত্রের অসাধারণ উন্নতিসাধন করিয়াছিল। এই যন্ত্রের দ্বারা তাহারা দিবারাত্রির সময় নির্ণয় করিতে পারিতেন। S.P. Scott লিখিয়াছেন, 'Some were provided it the bottom with eleven different projections for as many horizons. On them were represented the movement of the celastial sphere, the sign of zodiac and the position of the principal stars and constellations... Some of there armillary spheres were 25 feet in diameter...'[৫]

অর্থাৎ এই সকল যন্ত্রের মধ্যে কতগুলির তলদেশে একাদশ প্রকারের দিগন্ত বৃত্তের জন্য প্রায় ততোধিক 'প্রজেকশন' অঙ্কিত থাকিত। উহাদের মধ্যে নভোমণ্ডলের চলাচল, রাশিচক্র বিভিন্ন তারকার নির্দ্দিষ্ট স্থান এবং প্রধান প্রধান নক্ষত্র মণ্ডলী অঙ্কিত থাকিত। ... তাহার নভোমণ্ডলের গ্রহাদির কক্ষগতি প্রদর্শনার্থ নির্ম্মিত যন্ত্রের ব্যাস ২৫ ফিট পর্য্যন্ত ছিল।

---

৪. পূর্বোক্ত গ্রন্থ-১, History of the Moorish Empire in Europe Voll-III, P. 478 এবং 'Intellectual development of Europe' Vol-II.

৫. History of the Moorish Empire vol-III, P. 479

www.pathagar.com

আল মোয়াহেদীন সম্প্রদায়ের নেতা মরক্কোর সম্রাট ইয়াকুব সেভিল নগরে যে বিরাট মানমন্দির (observatory) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী খৃস্টানগণ তাহার মর্য্যাদা বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে ঘণ্টা বুরুজে পরিণত করিয়াছিলেন।

খলিফা মামুনের রাজত্বকালে আবুল হাসান 'টেলিস্‌কোপ' বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ভূগোল

এ যুগের কৃত্রিম ও অকৃত্রিম সৈয়দগণ প্রত্যেকেই আপন আপন কুল তালিকা বা কুল–ক্রমের বিশুদ্ধতার বড়াই করিতেই ব্যস্ত। কিন্তু সে যুগের হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সত্যিকার বংশধর ইদ্রিসি যে অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের সহিত ভৌগোলিক অনুসন্ধান ও ভৌগোলিক ভ্রমণ করিয়া ভূগোল রচনা করিয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। তিনি সে যুগে নাইল নদীর উৎপত্তি স্থলের হ্রদসমূহের (Victoria Nyanza, Albert Nyanza)। যে অবস্থান নিদের্শ করিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান যুগের বিখ্যাত পর্য্যটক Stanley (sir Henry Morton Stanley, ১৮৪১–১৯০৪) এবং Baker (Sir samuel White Baker, 1821'–93) এর আবিষ্কার প্রায় সমর্থন করিতেছে। তিনি নিজে রাজবংশীয় হইয়াও সিসিলির নরমান বংশীয় রাজা রোজারের রাজধানী পেলেরমো নগরে ভূগোল রচনায় দীর্ঘ ১৫ বৎসর অতিবাহিত করেন। ভূ–পৃষ্ঠের বাহ্যাকার, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জলবায়ু, পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের অবস্থানও নগর নগরী সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণী দিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ পর্য্যন্তও নির্ভুল বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। S.P. Scott বলিতেছেন—

"The Compilation of Edrisi Marks an era in the history of science. Not only its historical information most interesting and valuable but its descriptions of many parts of the earth are still authoritative'. অর্থাৎ 'ইদ্রিসির সংগ্রহ বিজ্ঞানের ইতিহাসের এক নতুন যুগ চিহ্নিত করিতেছে। ইহাতে লিপিবদ্ধ ঐতিহাসিক বিবরণ শুধু যে চিত্তাকর্ষক এবং মূল্যবান তাহা নয়, ইহাতে উল্লিখিত জগতের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা আজ পর্য্যন্তও প্রামাণিক ও গ্রহণীয়।'

ঐতিহাসিক আবুল ফিদা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অন্যূন ষাটজন আরবীয় ভৌগলিক জীবিত ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এক ডিগ্রি পরিমাণ স্থানের তাঁহাদের নির্দ্ধারিত দূরত্ব, আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে নির্দ্ধারিত দূরত্বের প্রায় সমান।

দৃষ্টি ও আলোক বিজ্ঞান

বর্ত্তমান আলোক বিজ্ঞান ও দৃষ্টি বিজ্ঞানের ভিত্তি আরবীয় বৈজ্ঞানিক হাসান–বিন–হাইসেম (যিনি ইউরোপে আল হাসান নামে খ্যাত) দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল। তিনিই প্রথম (একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে) বিজ্ঞান জগতের কতকগুলি চির প্রচলিত ভ্রম সংশোধন করিয়া

www.pathagar.com

দেন। 'আলোক রশ্মি চক্ষু হইতে দৃষ্ট বস্তুতে গমন করে', তখন পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণের এই বিশ্বাসই বদ্ধমূল ছিল। তিনি তাহা সংশোধন করেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে আলোক-রশ্মির দিক পরিবর্ত্তন নীতি (Principle of refraction) ব্যাখ্যা করেন এবং কেন শূন্যমার্গে ভাসমান বিভিন্ন গ্রহ দিগন্তবৃত্তের নিম্নে থাকিলেও পরিদৃষ্ট হয় তাহার কারণ বর্ণনা করেন। বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগে যে ইথার আছে তাহা তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বর্ণনা করেন। তিনিই সকলের পূর্ব্বে, যে আলোক-ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া চশমা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ব্যাখ্যা করেন।

তাঁহার বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পুস্তক আন্দুলেশিয়ার বিভিন্ন কলেজে পড়ান হইত। তদানীন্তন ইংরেজ Adelard of Bath, Robert of reading, Daniel Morley, William shelly আল-হাসান লিখিত বিজ্ঞান শিখিবার জন্য স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকিয়াছিলেন। ইহারা প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক ব্যক্তি।

রসায়ন

লৌহ প্রভৃতি নিকৃষ্ট ধাতু হইতে স্বর্ণ বাহির করিবার পদ্ধতি আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেই Chemistry বা রসায়ন শাস্ত্র উদ্ভুত হইয়াছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিসমূহের মধ্যে এই বিদ্যার আলোচনা অল্প বিস্তর চলিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের ভিত্তি গড়িয়াছিলেন আরবেরা। অন্ততঃ যতদিন Chemistry শব্দটির ব্যবহার প্রচলিত থাকিবে, যতদিন alcohol, alkali, juleps, elixirs, syrup প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার থাকিবে ততদিন ইউরোপীয় সভ্যতা হইতে মুসলিম স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবার উপায় নাই। বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাহাদিগকে Nitric acid, sulphuric acid, Alcohol, Muriate of Ammomia, Pottassa, Bichloride of Mercury, Nitrate of silver and Phosphorus আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তাপ দ্বারা ধাতুকে চূর্ণ করিলে, তাহার ওজন বৃদ্ধি পায়। এ রাসায়নিক সত্যও তাহাদের নিকট বিদিত ছিল। মুসলিম রসায়নবিদ আলজাব্বারুল-কুফি বা Gaber এর প্রণীত রাসায়নিক পুস্তকেই সর্ব্ব প্রথমে ধাতুকে oxidise করিবার পদ্ধতি, gas উৎপন্ন করিবার পদ্ধতি উল্লিখিত হইয়াছিল।

ঔষধ-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্র

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) নিজেও একজন সুচিকিৎসক ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্র আয়ত্ত করিতে মুসলমানগণ হিন্দু, ইহুদী, খৃস্টান সকল জাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে জ্ঞান আহরণ করিতেন। খলিফা আল মামুনের সময় যাবতীয় গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্র আরবীতে অনূদিত হয়। ইতিপূর্ব্বে হিন্দু চিকিৎসাশাস্ত্রের কোন কোন গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছিল। ইমাম রাজি প্রণীত শিশু চিকিৎসা পুস্তক চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই শাখার প্রথম পুস্তক। মূর সার্জ্জনগণ Cataract বা চক্ষুর ছানি রোগের একাদশ প্রকার অস্ত্রোপাচার বর্ণনা করিয়াছেন। অতি

www.pathagar.com

প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে হাসপাতাল বিদ্যমান ছিল। বর্ত্তমান ইউরোপীয় হাসপাতাল সংরক্ষণ প্রণালী বোগদাদ, কাইরো, মূরদের অধিকৃত স্পেন ও আরব অধিকৃত সিসিলি দ্বীপ হইতে উদ্ভূত হয়।

আধুনিক অস্ত্রোপাচার বিদ্যার ভিত্তিমূল স্থাপয়িতা আবুল কায়েসা ইবনে সৈয়দুল খাতিব চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধীয় এক সহস্র পুস্তক রচনা করেন। টোলেডো নিবাসী ইবনে ওয়াফেদ ২০ বৎসর পরিশ্রম করিয়া তাঁহার চিকিৎসা গ্রন্থ রচনা করেন। সেভিল নগরবাসী ইবনে জোহরই প্রথম আবিষ্কার করেন যে, ক্ষতের মামড়ি বা কচ্ছ (Scab) এক প্রকার ক্ষুদ্র, ক্ষত-কীট হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তিনি গন্ধক নামক পদার্থকে ইহার ঔষধ নির্ণয় করিয়া যান। মোহাম্মদ ইবনে কাশেম ৬০০ পৃষ্ঠা যুক্ত একখানি চক্ষুরোগ চিকিৎসার পুস্তক রচনা করেন। মোহাম্মদ আল তেমিনি 'হারনিয়া' (Hernia) এবং 'টিউমার' (Tumour) রোগ সম্বন্ধে চারশত পৃষ্ঠাযুক্ত একখানি পুস্তক রচনা করেন। এইরূপ প্রত্যেক প্রকারের রোগ সম্বন্ধীয় অসংখ্য পুস্তক রচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের 'সার্জ্জারী' সম্বন্ধীয় পুস্তকে তাঁহারা বিভিন্ন অস্ত্রের ছবিও দিয়াছিলেন।

মূত্রাশয়ের প্রস্তর বহিষ্করণার্থ অস্ত্রোপচার প্রথম আরবেরাই করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ব্যাণ্ডেজ করার প্রণালীও তাঁহারাই উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। 'টাইফয়েড' জাতীয় জ্বরে ঈষদুষ্ণ জলের স্বেদ দেওয়ার ব্যবস্থা আধুনিক চিকিৎসকগণও করিয়া থাকেন। আরবগণ এই প্রকার জ্বরে এই ব্যবস্থাই করিতেন। আজ হইতে নয়শত বৎসর পূর্ব্বে ইমাম রাজি এই ব্যবস্থা দিয়া গিয়াছিলেন।

দর্শন

এই সাতশত বৎসর একত্র বসবাস করার পরও আমরা মুসলমান শতকরা ৮০জন সুশিক্ষিত হিন্দুর নজরে 'বার বেরিয়ান', এই জন্য অবশ্য কতকাংশ দায়ী আমরা নিজেরাই। পথে-ঘাটে, আন্দোলন-আলোচনায় সর্ব্বদাই শুনিয়া আসিতেছি, 'মুসলমান জাতির সৃষ্ট কোন দর্শন নাই, কেননা তাহারা গভীর চিন্তা করিতে অনভ্যস্ত।' অথচ ইতিহাসে দেখি, জগতের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তত্ত্ব তাঁহাদের মস্তক হইতে বাহির হইয়াছে। তাঁহারা গ্রীক দর্শনের অনুবাদ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহার উপর তাঁহাদের নিজেদের হস্তের ছাপও যথেষ্ট দিয়াছিলেন। সুফী দর্শন ব্রহ্ম ছাড়া অন্য বস্তুর অস্তিত্ব অসার ও নশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে। মানুষের সত্যকে লাভ করিবার জন্য কেমন করিয়া ধর্ম্মগত ও জাতিগত ও পারিপার্শ্বিক সংস্কার হইতে মুক্ত হওয়া আবশ্যক তাহার কত সুন্দর আত্মোক্তিই না ইমাম গাজ্জালী দিয়া গিয়াছেন। দার্শনিক ইবনে-রোশদের মতে 'মানুষ একটি প্রধান পাত্র যাহার মধ্যে চৈতন্য' আত্মপ্রকাশ করে। সকল মানুষই 'চৈতন্যে'র আলোক গ্রহণ করিবার সমান ক্ষমতা রাখে না; ফলে মহা চৈতন্যের আলোকে প্রাপ্তিরও একটা ক্রমবিকাশ আছে। মানুষের পরম আনন্দ হইতেছে সেই পরম চৈতন্যের সহিত মিলন। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইবনে রোশদের

www.pathagar.com

দর্শন ইউরোপে বিশেষ করিয়া ইটালী দেশে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছিল। তথাকার মনীষিগণ ইবনে রোশদের দর্শন সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া 'প্যাডুয়া' (Padua) প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর' হইতেন।

সাহিত্য

বিজ্ঞান ও দর্শনের ন্যায় ইউরোপীয় সাহিত্যেও মুসলিম সাহিত্যের ছাপ পড়িয়াছে। পেট্রার্কের (১৩০৪–১৩৭৪) সনেটগুলি কসিদা ও গজলের ছাঁচে রচিত হইয়াছিল। মূর অধিকৃত স্পেন দেশে এবং আরব অধিকৃত সিসিলি দ্বীপে আমাদের দেশের কবিওয়ালাদের মত এক শ্রেণীর কবি ছিলেন। তাহারা রাজা রাজড়ার দরবারে এবং সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিগণের মজলিসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গল্প কথকের দলও থাকিতেন। প্রথমোক্ত কবিগণের অনুকরণে দক্ষিণ ইউরোপে 'ট্রুবেডুর' নামক এক শ্রেণীর কবির আবির্ভাব হয় ; তথা হইতে ক্রমে ক্রমে তাহা সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে।

এই সকল গল্পপ্রিয়তার ফলেই মুসলিম জগতে ইউরোপের বহু গল্প অনুপ্রণিত। আলেকজান্ডার ডুমা'র এর বিখ্যাত উপন্যাস 'কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টোর' মধ্যে শুধু যে আরব্যোপন্যাসের প্রভাব আছে তাহা নহে, আনুষঙ্গিক ক্ষুদ্র প্লটগুলি আরব্যোপন্যাস হইতে গৃহীত। ডান্টে নাকি তাঁহার ধ্যানে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কে Inferno তে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও আরবী কবিতার ছন্দ ও তাল অনুকরণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। 'বোকেসিও'র গল্পগুলি আরবী ছাচে রচিত। ইংলন্ডের মোর প্রণীত Canterbury Tales ও আরবী প্রভাব এড়াইতে পারে নাই।

স্থাপত্য শিল্প

জগতে মুসলিম স্থাপত্য শিল্প স্থাপত্য শিল্পের সর্ব্বপ্রসারী প্রভাবের পুনরুক্তি করাই বাহুল্য। হয়তো সর্ব্বত্র তাহাদের স্থাপত্যের মধ্যে মৌলিকতা পাওয়া যায় না। কিন্তু যাহা কিছু তাঁহাদের নিজস্ব এবং যাহা তাঁহারা অন্যান্য জাতি হইতে গ্রহণ করিয়া নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার প্রভাবও ইউরোপে চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। দালানের প্রাচীরকে আরবগণ বিভিন্ন মালমসলা যোগে যেরূপ ফুল লতা পাতায় ভূষিত করিতেন (ম্যুরাল ডেকোরেশন) তাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব। তাঁহাদের উদ্ভাসিত 'আরাবোক' (arabesque) আজও কর্ডোভার মসজিদের দেওয়ালে বাঁচিয়া রহিয়াছে। ইউরোপে এবং জগতের সর্ব্বত্র তাঁহাদের উদ্ভাবিত এই শিল্প কৌশল চিরদিনই বাঁচিয়া থাকিবে। স্টুকো (Stucco) নামীয় চূণা বালি মিশ্রিত মসলার উপর এনামেল করা মোজাইক (enamelled mosaic) কার্য্য স্থাপত্যে তাঁহাদেরই উদ্ভাবিত কলা বিখ্যাত আলহামরা প্রাসাদের যে প্রকার চুনা, বালি ও অপরাপর মাল-মসলা সহযোগে তাঁহারা লেসের ন্যায় কারুকার্য্য করিয়াছিলেন আজ পর্য্যন্ত

www.pathagar.com

তাহা স্বাভাবিক প্রস্তরের ন্যায় দৃঢ় হইয়া রহিয়াছে। মালমসলার সহিত তাঁহারা কি এক প্রকার ঔষধ মিশাইয়া দিতেন, যাহার কারণে আজ পর্য্যন্ত সে সকল দেওয়ালে কখনও মাছি ও মাকড়সা বসে না। কি কি দ্রব্যের সমাবেশে তাঁহারা তাহাদের দেওয়ালে সেই আশ্চর্য্য কারুকার্য্য সমাধান করিয়াছিলেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত জগতের বিখ্যাত স্থপতিগণ নির্ণয় করিতে পারেন নাই। কোন কোন বিজ্ঞ স্থপতি কেবল অনুমান করিয়াছেন যে, চূর্ণীকৃত মার্ব্বেল, চূণ ও জিপসাম্ নামক ধাতু কোনও এক বিশেষ অনুপাতে ডিম্বের শ্বেত অংশের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা তরল থাকিতে বিভিন্ন আকারের নির্ম্মিত ছাঁচে প্রবেশ করাইয়া দিয়া এই অসাধারণ এনামেল করা মোজাইক তৈয়ার করা হইয়াছিল। প্রকৃতির ক্ষয়কারী হস্তকে দূরে রাখিয়া আজও যে তাহা অবিকৃত অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহার কারণ নাকি এই যে, ঐ সকল পদার্থের সহিত রসুন মিশাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

মোটের উপর ইউরোপের বুরুজে বুরুজে, দরজায় দরজায়, গুম্বজে, দেওয়ালের কারুকার্য্যে সেই মুসলিম স্থপতিগণের স্মৃতি জড়িত রাহিয়াছে।

অন্যদিকে প্যালিসির (Palissy) তিনশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা 'পরসিলেন' (Porcelain) বা চীনাবাসন প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

টেরা কোটা (terra cotta) নামীয় কর্দ্দম নির্ম্মিত দোদুল্যমান লতাপাতা দ্বারা তাঁহারাই সর্ব্ব প্রথমে পূর্ব্বকথিত 'জিরালডার' (Geraldar of seville) অগ্রভাগ পরিশোভিত করিয়াছিলেন।

উদ্ভিদ বিদ্যা ও কৃষি

সেভিল নগরবাসী ইবনেল আওয়াম কৃষি সম্বন্ধে এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে কৃষি বিদার এমন কোন শাখা নাই যাহার সম্বন্ধে তিনি বিস্তারিত না লিখিয়াছেন। কেমন করিয়া শস্য রোপণ করিতে হয়, কেমন করিয়া ফসল সংগ্রহ করিতে হয়, কেমন করিয়া ফলের বাগান সংরক্ষণ করিতে হয়, কেমন করিয়া পশু–পালন করিতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে সে পুস্তকে বিস্তারিত লিখিত হইয়াছে।

মূরজাতিই ইউরোপে সর্ব্বপ্রথম স্ট্রবেরী, লেবু, খেজুর, মালরেরী বা তুঁত গাছ, বেদানা, পেস্তা, ইক্ষু, গোলমরিচ, কফি, কার্পাস ইত্যাদির চাষ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রমেই আপেলের বেষ্টন ত্রিশ ইঞ্চিতে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহাদের সময়ে প্রত্যেক নদীর তীরে তীরে ভূমধ্যসাগরের পাড়ে পাড়ে দ্রাক্ষালতা ও নাসপাতির বাগিচা পরিদৃষ্ট হইত।

পশুপালনে তাঁহারা যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহা তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত মেরিনো ভেড়া (Merino Ship) সংরক্ষণ ও তাহার পশম সংগ্রহ প্রণালী হইতে বুঝা যাইতে পারে। বৎসরে দুইবার করিয়া অসংখ্য মেরিনো ভেড়া পিরেনিজ পর্ব্বতের ঢালু ভূমিতে লইয়া যাওয়া হইত। তথায় মুক্ত প্রকৃতির আবহাওয়ায় পশুগুলি চরিয়া চরিয়া বাড়িয়া উঠিত এবং যত্নের ফলে তাহারা রেশমের ন্যায় কোমল চকচকে পশম দান করিত।

www.pathagar.com

কাগজ শিল্প

অতি প্রাচীনকাল হইতে চীন দেশে কাগজ প্রস্তুত হইত। কিন্তু ইউরোপে কাগজের প্রচলন করেন মূরগণ। স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ নির্ম্মিত এসকরিয়েল (Escorial) রাজ-প্রাসাদের লাইব্রেরীতে একখানি মূরদের প্রস্তুত কার্পাস নির্ম্মিত কাগজ পাওয়া গিয়াছে। এই কাগজখানি লিখিত। ইহাতে তাঁহাদের প্রস্তুত কাগজ কতদূর উন্নত ছিল তাহাই বুঝা যাইতেছে। স্পেন দেশের 'জেটিভা' (Xative) নগরে মূরদের কাগজের কারখানা ছিল। ইহাই ইউরোপের প্রথম কাগজের কারখানা।

বয়ন ও সূচীশিল্প

লাস-নাভাস-ডি-টলোসা নামক স্থানের যুদ্ধে মূরদের একটি প্রকাণ্ড পতাকা খ্রীস্টানদের হস্তগত হইয়াছিল। ইহা স্পেনদেশের বারগস নগরের নিকট লাস-হিউএলগাস নামক আশ্রমে রক্ষিত আছে। ইহার জমিন লাল রেশমের তৈয়ারি। ইহার উপর সবুজ ও হলদে রঙের লেখা ও ফুল লতা পাতা অঙ্কিত। ইহার অনুপম সৌন্দর্য্য গবেষণাকারিগণকে বিস্মিত করিয়া দিতেছে। মাদ্রিদের যাদুঘরে আজ পর্য্যন্তও খলিফা দ্বিতীয় হিসামের চোগা রক্ষিত হইতেছে। ইহার উপর অসাধারণ কৌশলে সূচীকার্য্যের দ্বারা ফুল, লতা, পাতা এবং খলিফার প্রতিকৃতি অঙ্কিত হইয়াছে এবং কোরাণের আয়েতও লিখিত হইয়াছে। এই চোগার রং আজ পর্য্যন্ত অবিকল রহিয়াছে।

চর্ম্মের উপর কারুকার্য্য

লাইব্রেরী সংরক্ষণের জন্য বুক-বাইন্ডিং এবং চর্ম্মের উপর নানা কার্য্যের চর্চ্চা মুসলমানদের মধ্যে খুব জোরে চলিয়াছিল। মরক্কো বাইন্ডিং এই নামটিতে তাঁহাদের সেই শিল্পের স্মৃতি রহিয়া গিয়াছে। স্পেনদেশে আজ পর্য্যন্তও তাঁহাদের ব্যবহৃত চর্ম্ম পাকা করিবার পাত্রগুলি দুই এক স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

কয়েকটি বিশেষ জিনিস ও তাহার আবিষ্কার

চুম্বক শলাকার ধর্ম্ম অতি পূর্ব্বকাল হইতেই চীন দেশে বিদিত ছিল। আরবেরা তাহাদের নিকট ইহার কার্য্যকারিতা অবগত হইয়া সমুদ্রের দিক নির্ণয়ের জন্য ইহাকে প্রথম ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ইহা আরবদের হস্তে আসিবার পূর্ব্বে সোলার উপর বসাইয়া, সোলা খণ্ডটি জলের উপর ভাসাইয়া দেওয়া হইত, তখন অবশ্য শলাকাটি আপন ধর্ম্মানুযায়ী সোলাখণ্ডসহ উত্তরমুখী হইত। আরবেরাই প্রথম এই চুম্বক শলাকাকে একটি সূক্ষ্মাগ্র কীলক বা পিভটে'র (Pivot) উপর বসাইয়া ইহার কার্য্যকে সঠিক ও কার্য্যকরী করিয়া তুলেন।

www.pathagar.com

তুলাদণ্ড

দ্রব্য ওজন করিবার জন্য তুলাদণ্ডের ব্যবহার আরবেরাই প্রথম ইউরোপে আনয়ন করেন। একটি মটরের ওজন হইতেই তাঁহারা 'ক্যারেটে'র (Carat) ওজন লইয়াছিলেন। ইংরেজী Carat শব্দটি আরবী 'কিরাত' শব্দ হইতে আসিয়াছে।

Reinand, Fave, Lee Bon, এবং Viardot প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, আরবগণই বারুদ ও কামান আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মূরগণেরা ইহা ইউরোপে ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, বারুদ চীন দেশে অবিষ্কৃত হইয়াছিল। মূরগণই জল সরবরাহ করিবার জন্য ইউরোপে প্রথম হাইড্রলিক এঞ্জিন ব্যবহার করিয়াছিল।

ফরাসী জাতির আটশত বৎসর পূর্ব্বে আরবজাতি সাইফন যন্ত্রের নীতির সহিত পরিচিত ছিলেন।

আমোদ প্রমোদ

আরবী বণিকেরা দাবা খেলা ভারত হইতে আমদানী করিয়া ইউরোপে প্রচার করিয়াছিলেন। স্পেনের মূর রাজাগণ ইহার বড়ই ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আরবেরা তাস খেলা হিজিরারও বহু পূর্ব্ব হইতে জানিতেন। স্পেনদেশে কার্ডকে আজ পর্য্যন্তও naipe বলে ; এই naipe শব্দ আরবী 'নায়েব' শব্দ হইতে আসিয়াছে। আরবেরাই প্রথম ইহা ইটালী দেশে প্রচার করেন। Back gammon এবং আরও অনেক প্রকারে গুটি খেলা নাকি তাঁহাদেরই উদ্ভাবিত ক্রীড়া।

মূরদের বিশেষ নৃত্য Morris dance ইউরোপে বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বিভিন্ন ইংরেজী কাব্যে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

আজ পর্য্যন্তও পর্তুগালের একটি প্রদেশের নাম আলগার্ভ (Algarv) রহিয়া গিয়াছে। জিব্রাল্টার নামটি আজও তারিকের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে, দক্ষিণ ইউরোপের অনেক নগরের মধ্যে মুসলিম নাম রহিয়া গিয়াছে। নগরের একটি মহল্লার নামের সহিত আরব স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে।

এইরূপে ইউরোপের বৃক্ষে বৃক্ষে, পাত্রে পাত্রে, ফুলে ফলে, শিল্প-বাণিজ্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, স্থাপত্যে, সাহিত্যে, আইনে, বিধানে, আচারে, ব্যবহারে, ধর্ম্মমতে, চিন্তাধারায় মুসলিম স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। একটা প্রবন্ধে তাহার সামান্য আভাস দেওয়াও সম্ভব নহে।

এই সকল মুসিলম সন্তানের কীর্ত্তি চর্চ্চায় হয়ত আমাদের মনে একটা মহা গৌরবের অনুভূতি আনয়ন করিয়া থাকে, কেননা আমরাও মুসলমান। কিন্তু এই গৌরব হইতে এই কথা পৃথক করা যায় না যে, আমরা বর্ত্তমানের একটা চরম হীনতাকে পুরাতন প্রসঙ্গ দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতেছি। তবুও ইহা হইতে অনেক পাঠ গ্রহণ করা যাইতে পারে। আরব জাতি হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জাতি। যে জাতির একজনের উপর কোরান অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহারা

www.pathagar.com

গ্রীক, হিন্দু, ইহুদী প্রভৃতি যে কোনও জাতির মধ্যে কোনও একটা সত্য পাইলে, কখনও এই কথা বলিয়া তাহা উড়াইয়া দেন নাই যে, উহা কোরানে উল্লিখিত নাই। আলোক বিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য কোরানে উল্লিখিত নাই বলিয়া তাহারা সেই সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ক্ষান্ত হন নাই। মৃত্যুর পর আত্মার পরিণামের কথা কোরানে উল্লিখিত থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা দার্শনিক অভিনিবেশ দ্বারা ঐ সকল সত্যের আরও নিকটবর্ত্তী হইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অজানিত সত্যের রাজ্যের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য তাঁহারা যে বিরাট অভিযান চালাইয়াছিলেন, তাহার ফলেই আজ ইউরোপীয় সভ্যতা দণ্ডায়মান হইয়াছে।

S.P. Scott সত্যই বলিয়াছেন—

'Modern Science unquestionally owes every thing to Arab genius'[৬] কিন্তু আমরা এখন কোথায়?

---

৬. History of the Moorish Empirein Europe Vol III, P. 532.

www.pathagar.com

ইউরোপে শিক্ষার আদর্শের ক্রমবিকাশ

আবদুর রহমান খাঁ এম.এ., বি.টি.

শিক্ষার আদর্শের সহিত জাতীয় জীবনের আদর্শের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সব দেশে সকল সময়ের সমানের আর্থিক, নৈতিক, রাজনৈতিক যাবতীয় অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য একমাত্র শিক্ষাকেই চরম ও পরম উপায় বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং ইতিহাসে অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে শিক্ষার আদর্শের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা ধৃষ্টতার কার্য্য।

ইউরোপের মধ্যে গ্রীস রাজ্যই সভ্যতার আদিভূমি। শিক্ষার ব্যবস্থাও সর্ব্ব প্রথম গ্রীস হইতে ইউরোপের অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হয়। সুতরাং এই প্রবন্ধের আলোচনা গ্রীস হইতেই আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। প্রাচীনকালে গ্রীস কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। উহাদের মধ্যে স্পার্টা ও এথেন্স সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল এবং ইহাদের জীবন-যাপন ও শিক্ষা প্রণালীতেও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। কিন্তু এতদুভয়ের সাধনার সংমিশ্রণেই প্রকৃত গ্রীক কালচারের সৃষ্টি হয়।

স্পার্টার অধিবাসীর সংখ্যা অল্প ছিল। তাহাদের বহু সংখ্যক বন্দী ও বিজিত জনপদ সমূহের অধিবাসীর উত্থানের ভয়ে তাহাদিগকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিতে হইত। এইহেতু তাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ভবিষ্যৎ বংশধরগণকে এক সামরিক জাতিতে পরিণতকরন। তাহাদের শিক্ষার আদর্শও তদনুযায়ী ছিল। সন্তান জন্মিবামাত্র সরকার হইতে তাহার পরীক্ষা করা হইত। যদি উহার ভবিষ্যতে বলিষ্ঠ যুবক বা যুবতী হইবার সম্ভাবনা থাকিত কেবল মাত্র তাহা হইলে উহাকে জীবিত রাখা হইত। নচেৎ উহাকে উন্মুক্ত প্রান্তরে রাখিয়া মারিয়া ফেলা হইত। Lycurgus নামক জনৈক নাগরিকের বুদ্ধিমত্তায় তাহাদের নিরতিশয় আস্থা ছিল। তিনি তাহাদের শিক্ষার জন্য কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়া দেন। সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে তাহার মাতার তত্ত্বাবধানে রাখা হইত, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ খরচ সরকার হইতে বহন করা হইত। সাত বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইবামাত্র বালকদিগকে সরকারের তত্ত্বাবধানে ছাত্রাবাসে রাখা হইত। তাহাদের সমস্ত জীবন কঠোরতার ভিতর দিয়া অতিবাহিত হইত। শিশুকালে তাহাদিগকে বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিতে দেওয়া হইত না; ছাত্রাবাসে তাহাদিগকে বড়দের শাসনাধীনে থাকিতে হইত। শারীরিক ব্যায়াম, যুদ্ধবিদ্যা, সাহসিকতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা তাহাদের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল। মানসিক ও নৈতিক শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি ছিল না বলিলেই হয়। চুরি করাও অপরাধজনক বিবেচিত হইত না, যদি তাহাতে সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যাইত। মানসিক শিক্ষার জন্য ভোজনাগারে বা রাজপথে ভ্রমণের সময়ে তাহাদিগকে বয়স্ক ব্যক্তিদের সহিত কথোপকথন করিতে হইত। এই কথোপকথন হইতেই তাহাদের নানা

www.pathagar.com

বিষয়ে জ্ঞান জন্মিত এবং তাহাদের বিচার বুদ্ধির বিকাশ হইত। বালিকাকেও বালকের ন্যায় কঠোর শাসনের অধীন থাকিতে হইত, কিন্তু তাহাকে ছাত্রাবাসে না থাকিয়া পিতৃগৃহেই বাস করিতে হইত।

স্পার্টার শিক্ষা প্রণালীতে সমাজের কল্যাণই প্রধানতঃ লক্ষ্য ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সমাজসেবার জন্য প্রস্তুত করা হইত। তাহাদের নিজের ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থাই ছিল না। যে উদ্দেশ্যে স্পার্টার শিক্ষা প্রণালীর উদ্ভব হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যে তাহাতে ভালরূপেই সাধিত হইত, কিন্তু তাহাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইত না। যে শিক্ষায় সমাজের সকলকেই এক ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হয়, তাহাতে সমাজের অবস্থা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। যদি গ্রীকগণ স্পার্টার শিক্ষা প্রণালীতেই সন্তুষ্ট থাকিত তবে, পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে তাহাদের দান অতি সামান্যই হইত। কিন্তু যখন স্পার্টা এথেন্স জয় করে এবং মানসিক ও নৈতিক বলের অভাববশতঃ এথেন্সের পরিচালনা করিতে অসমর্থ হয়, তখন তাহার শিক্ষা প্রণালী ক্রমশঃ এথেন্সের শিক্ষা প্রণালীতে পর্য্যবসিত হয়।

এথেন্স বহু শতাব্দী ধরিয়া স্পার্টারই ন্যায়ব্যষ্টিকে সমষ্টির মঙ্গলের জন্য প্রস্তুত করিতেছিল। কিন্তু তাহার এই সমষ্টির কল্যাণের ধারণা অধিকতর প্রশস্ত ছিল। তাহার নাগরিকগণকে যুদ্ধ অপেক্ষা শান্তির জন্যই অধিকতররূপে প্রস্তুত করা হইত। তাহাদিগকে শারীরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও নৈতিক শিক্ষাও দেওয়া হইত। এথেন্সের বিশ্বাস ছিল, লোক আপন ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও অভিরুচি অনুসারে জ্ঞান লাভ করিলে তাহা দ্বারাই সমাজের কল্যাণ সমধিক রূপে সাধিত হইতে পারে। এই হেতু এথেন্স সরকার শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিত। কিন্তু শিশুকে কি শিক্ষা দেওয়া হইবে, কতকাল তাহাকে বিদ্যালয়ে রাখা হইবে ইত্যাদি বিষয়ে মীমাংসার ভার তাহার পিতার উপর ন্যস্ত থাকিত। স্পার্টার ন্যায় এথেন্সে শিশুকে ছাত্রাবাসে রাখা হইত না। সে পিতৃ গৃহে থাকিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিত। অধিকাংশ বিদ্যালয়ই শিক্ষক কর্তৃক তাঁহার নিজ গৃহে পরিচালিত হইত। বালককে বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য এক ক্রীতদাসের হাওয়া না করিয়া দেওয়া হইত। তাহার নৈতিক শিক্ষা ও শাসনভার এই ক্রীতদাসের উপর অর্পিত হইত। সুতরাং এথেন্সের শিক্ষার আদর্শ যদিও স্পার্টার অপেক্ষা প্রশস্ততর ছিল, শৈশবে অভ্যাস গঠন বিষয়ে উহা স্পার্টার সমকক্ষ ছিল না। এথেন্সের শিক্ষা প্রণালীতে বালিকার কোন স্থান ছিল না। তাহাকে কেবল গৃহকার্য্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত করা হইত।

স্পার্টার শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সামরিক শিক্ষার যোগে উত্তম নাগরিকের সৃষ্টি করা ; এথেন্সের শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল মানুষের ব্যক্তিগত বিশেষত্বের বিকাশ করিয়া তাহাকে নাগরিকের কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত করা। খৃস্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী পর্য্যন্ত এতদুভয়ের মধ্যে শিক্ষার আদর্শের সম্পূর্ণ পার্থক্য সত্ত্বেও শিক্ষার উদ্দেশ্য, ব্যবস্থা ও অধীতব্য বিষয়ের মধ্যে বিশেষ বিভিন্নতা ছিল না।

কিন্তু ক্রমে যখন এথেন্স রাজ্য বিস্তার করিয়া ও উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসিল, তখন তাহার বিশ্বাস ও ক্রিয়া কলাপে

www.pathagar.com

সম্যক পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। তাহার ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন ও সাহিত্যে নতুন যুগ উপস্থিত হইল; তাহার শিক্ষার আদর্শও যথেষ্ট পরিবর্ত্তিত হইল। ব্যক্তি বিশেষ কি প্রকারে নিজের পূর্ণতা লাভ করিতে পারে তাহাই শিক্ষার লক্ষ্য হইল। তাহাতে সমাজের কোন সেবা বা লাভ হইবে কিনা তাহার কিছু মাত্র বিবেচনা রহিল না। পূর্ব্বের শিক্ষা প্রণালী অতি সংকীর্ণ ও নিরর্থক বলিয়া বিবেচিত হইল, শুদ্ধ জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান-লাভের পিপাসা বলবত্তী হইল। এইরূপে শিক্ষা ক্ষেত্রে Individualism বা ব্যক্তিত্ববাদের উদ্ভব হইল।

এই নূতন আদর্শে শিক্ষাদানের জন্য শীঘ্র কতকগুলি শিক্ষকের আবির্ভাব হইল। তাহারা Sophist বা জ্ঞানী নামে অভিহিত হইত। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশী ছিল। উহাদের মধ্যে একজন ব্যক্তিত্ববাদকে এরূপ চরমে পৌঁছাইয়াছিলেন যে তিনি বলিতেন, দৃশ্য ও অদৃশ্য যত কিছু পদার্থ আছে, মনুষ্যই তৎসমুদয়ের মানদণ্ড, মানুষ নিজের বুদ্ধি বলেই তাহাদের সম্বন্ধে ধারণাও বিচার করিবে। যে সমস্ত যুবক রাজনীতিতে যশস্বী হইবার জন্য আশান্বিত ছিল তাহাদের নিকট পূর্ব্বের শিক্ষা প্রণালী আদৌ মনঃপূতঃ হইল না ; তাহারা উহা পরিত্যাগ করিয়া সোফিস্টদের নিকট মানসিক শিক্ষা, বিশেষ করিয়া বক্তৃতা শক্তি, অর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল। ইহাতে অনেক যুবক তর্কশাস্ত্রে পণ্ডিত হইল বটে, কিন্তু শারীরিক শিক্ষার প্রতি উদাসীন থাকাতে তাহারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। ইহার প্রভাব শিক্ষার নিম্নসোপানেও বিস্তৃত হইল, তথায়ও কঠোর শারীরিক সাধনায় শিথিলতা আসিল।

এইরূপে শিক্ষার সমাজগত আদর্শ ক্রমান্বয়ে ম্লান হইয়া আসিল এবং ব্যক্তিগত আদর্শ তাহার স্থান অধিকার করিল। ইহাতে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল কিন্তু সভ্যতার উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইল।

পুরাতন পন্থী বহু লোক পূর্ব্ব আদর্শের পুনরুত্থানের জন্য সচেষ্ট হইল। কিন্তু সমাজে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল, তাহার সমূল উচ্ছেদ সম্ভবপর হইল না। সমাজে একবার বিপ্লব উপস্থিত হইলে তাহার গতি কখনো সম্পূর্ণ পশ্চান্মুখ হয় না ; তখন তাহার ধ্বংসের পথ বন্ধ করিতে হইলে উচ্চতর আদর্শে তাহার পুনর্গঠন আবশ্যক হয়। সক্রেটিস, তাঁহার শাণিত যুক্তির সাহায্যে নব্য ও পুরাতন উভয় পন্থী লোকের ভুল ধারণা প্রতিপন্ন করেন। তিনি বলেন, মানুষ নিজের বিবেক-বুদ্ধির সাহায্যে সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা করিতে অধিকারী সত্য, কিন্তু যে সে মানুষ তাহা করিতে পারে না ; তাহার জন্য কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট গুণবিশিষ্ট মানুষ বা (Standard man) হওয়া আবশ্যক। তিনি উভয় দলের অপ্রিয় হইয়া পড়েন এবং পুরাতন দলের প্রেরণার এথেন্সবাসী তাঁহাকে বিষদানে হত্যা করে। সক্রেটিস মরিলেন, কিন্তু তিনি যে সত্য প্রচার করিলেন তাহা জীবিত রহিল।

সক্রেটিসের যোগ্য শিষ্য প্লাটো তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পাদনে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি আদর্শ প্রজাতন্ত্র রাজ্য কল্পনা করিয়া তাহার বিভিন্ন বিভাগের পরিচালনের জন্য নিয়মাবলী নির্দ্ধারিত করিলেন। তাঁহার সমস্ত গবেষণা Republic নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইল।

www.pathagar.com

গবেষণা হিসাবে এই পুস্তক ভবিষ্যতে শিক্ষার আদর্শের উপরে খুবই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু সমসাময়িক সমাজের উপর উহার বিশেষ ক্রিয়া হয় নাই। কেননা উহা কাল্পনিক ছিল বাস্তব অবস্থার সহিত উহার সামঞ্জস্য ছিল না।

প্লাটোর শিষ্য এরিস্টটল মনস্তত্ব সম্বন্ধে উচ্চতর গবেষণা করেন। তিনি নৈতিক অভ্যাস গঠনকেই শিক্ষার প্রথম সোপান মনে করেন, কেননা, নৈতিক শিক্ষা না থাকিলে বুদ্ধিবৃত্তির অবাধ ক্রিয়া মঙ্গলজনক হয় না এবং উচ্চতর মনোবৃত্তি সমূহের বিকাশও সম্ভবপর হয় না। তিনি ইহাও অনুভব করেন যে, কেবল মাত্র সমাজের বন্ধনের মধ্যে থাকিলেই ব্যক্তিগত নৈতিক উন্নতি সম্ভব। এইরূপে তিনি পুরাতন সমাজবাদ ও নব্য ব্যক্তিত্ববাদের সমন্বয়সাধনে প্রয়াসী হন। তাঁহার মতাবলী ভবিষ্যৎ সমাজের উপর খুবই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু তৎকালীন গ্রীক সমাজে বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই।

প্রকৃতপক্ষে সমাজের গতি কখনো পিছনের দিকে হয় না। এথেন্সবাসী ব্যক্তিত্বের নূতন আস্বাদ পাইয়াছিল, তাহারা উহাকে আঁকড়িয়া ধরিল। সমাজের পূর্ব্বের সমস্ত বন্ধন শিথিল হইয়া আসিল, এবং উহাতে বিশৃঙ্খলা ও দুর্ব্বলতার আবির্ভাব হইল। অবশেষে এথেন্স পিলোপন্নিসাসের যুদ্ধে মাসিডনের নিকট আপন স্বাধীনতাটুকুও হারাইয়া ফেলিল। কিন্তু এথেন্সের এই পরাজয় জগতের পক্ষে কল্যাণকর হইল। গ্রীক সভ্যতা ও ব্যক্তিবাদ দেশ বিদেশে ছাইয়া পড়িল। তাহাদেরই জ্ঞান বিজ্ঞান নানা দেশে নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টির কারণ হইল। রোডস, আলেকজান্দ্রিয়া রোম প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক দর্শন, গ্রীক শিল্প ও গ্রীক সাহিত্য আলোচিত হইয়া সমস্ত জগতকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিল।

মাসিডোনের দিগ্বিজয় বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। অচিরেই গ্রীক রাজ্য রোমীয়দের করতলগত হইল। গ্রীস জয় করিবার বহু পূর্ব্বেই রোমীয়গণ এথিনিয়ানদের সংস্পর্শে আসিয়াছিল। তাহারা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে এথিনিয়ানদের রীতিনীতি ও শিক্ষাপদ্ধতি কতকটা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীস জয় করিবার পর তাহারা গ্রীকদের কালচারের নিকট পরাভূত হইল, তাহারা গ্রীক সভ্যতার দাস হইল। কিন্তু তাহাদেরও নিজস্ব একটা সভ্যতা ছিল ; তাহার কতকটা দান না করিয়া তাহারা নূতন সভ্যতা গ্রহণ করিতে পারিল না। ফলে, এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি হইল যাহাকে গ্রীক–রোমীয় সভ্যতা নামে অভিহিত করা যায়।

এস্থলে রোমীয় সভ্যতা কি ছিল এবং নূতন সভ্যতায় রোমীয় দানই বা কি হইল, তৎসম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক।

অনুমান খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীতে রোমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমতঃ পালাটিন ও তৎসংলগ্ন কতিপয় জনপদে উহা সীমাবদ্ধ ছিল। তখন উহাদের অধিবাসিগণ Patrician ও Plebeian এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। রাজ্যের শাসন সংক্রান্ত সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রথমোক্ত শ্রেণীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রায় দুইশত বৎসর এই অবস্থা বর্ত্তমান থাকে। পরে Plebeian দের ক্রমাগত দাবীর ফলে তাহাদিগকে কতকগুলি অধিকার দেওয়া হয় এবং তদনুযায়ী রাজ্যের আইনগুলি সংস্কৃত হইয়া Twelve Tables নামে লিপিবদ্ধ করা হয়।

www.pathagar.com

রোমীয়গণ তখন রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেয়। শীঘ্রই তাহারা সমগ্র ইতালিতে আধিপত্য স্থাপন করে এবং খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে মাজ্জিগেনকে পরাভূত করিয়া সমগ্র গ্রীস রাজ্য হস্তগত করে।

দেশপ্রীতি, আইনানুবর্ত্তিতা, যুদ্ধ বিদ্যায় আসক্তি রোমীয়দের জীবনের লক্ষ্য ছিল। তাহাদের শিক্ষার আদর্শও তদনুযায়ী ছিল। স্পার্টানদের সহিত তাহাদের আদর্শের পার্থক্য এই ছিল যে, স্পার্টানরা এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করিয়াছিল, আর তাহারা উহা ইচ্ছামূলক রাখিয়াছিল। রোমীয়গণ ব্যবহারিক প্রকৃতির লোক ছিল। তাহারা শারীরিক শিক্ষা লাভ করিত, কেননা উহা তাহাদের কাজে লাগিত। গ্রীকগণ সে কমনীয়তার জন্য শারীরিক শিক্ষার সমর্থন করিত, উহা তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিত না। তাহারা গ্রীকদিগকে Visionary বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিত।

গ্রীস জয়ের পূর্ব্বে রোমীয়দের কোন বিদ্যালয় ছিল না। গৃহই তাহাদের প্রধান শিক্ষাক্ষেত্র ছিল। পরিবারে পিতার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল। বালক বালিকা পিতা–মাতার নিকট শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষা লাভ করিত। লিখন, পঠন ও সাহিত্যে জ্ঞান-লাভও পরিবারের যোগেই হইত। গ্রীকদের সংস্পর্শে আসিবার পর রোমীয়গণ তাহাদের বিদ্যালয় প্রথা অবলম্বন করে। গ্রীকদের ন্যায় তাহারাও বালককে বিদ্যালয়ে গমনা–গমনের জন্য এক গ্রীক ক্রীতদাসকে তাহার সঙ্গী করিয়া ছিল। ক্রীতদাস বালকের নৈতিক চরিত্রের তত্ত্বাবধান করিত এবং মুখে মুখে গ্রীক ভাষাও শিক্ষা দিত। এই ক্রীত–দাসের নির্ব্বাচনে গ্রীকদের অপেক্ষা রোমীয়গণ অধিকতর যত্ন লইত। এইরূপে গ্রীকদিগের বিদ্যা চর্চ্চা ক্রমে ক্রমে রোমীয়দের শিক্ষা প্রণালীতে স্থান লাভ করিতে থাকে। কিন্তু খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীর পূর্ব্বে গ্রীক সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয় নাই।

গ্রীস জয়ের সঙ্গে সঙ্গে বহু গ্রীক রোমে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ তাহাদের ধর্ম্ম, দর্শন, শিল্প, বিজ্ঞান ও শিক্ষা পদ্ধতি রোমীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করে। রোমীয়গণ তাহাদের সমকক্ষতাও করিতে পারে না এবং বাধা দিতেও সমর্থ হয় না। তখন হইতে অতি দ্রুত রোমীয় সমাজের উপর গ্রীকদের আদর্শের প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল। এইরূপে রোমান সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানে এক নূতন জীবনী শক্তির সঞ্চার হইল। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে যখন অগষ্টস রোমের সম্রাট হন, তখন রোমীয় সভ্যতা পূর্ণতা লাভ করে। Virgil, Cicero, Quintition Varro প্রভৃতির প্রতিভা বলে রোমীয় সাহিত্য দর্শন, ইতিহাস উন্নতির উচ্চ শিখরে আরূঢ় হয়। গ্রীকগণ তাহাদের অসাধারণ মনোবৃত্তির বলে যে সমস্ত আদর্শ পৃথিবীর সমক্ষে স্থাপন করিয়ছিল, রোমীয়গণ তাহাদের অদ্বিতীয় ব্যবহারিক ক্ষমতাবলে তৎসমুদয় কার্য্যে পরিণত করে।

যখন এইরূপে গ্রীক ও রোমীয় সভ্যতার সমবায় সাধিত হইল, তাহার কিছুকাল পরে খৃস্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জগতে শিক্ষার এক নূতন আলোক দেখা দিল। গ্রীক ও রোমান উভয় জাতি ব্যক্তিত্ববাদের প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু তাহাদের কেহই সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে পারে নাই। খৃস্টধর্ম্ম মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিয়া এবং স্ত্রী জাতি ও শিশুদের অধিকার স্বীকার করিয়া, ব্যক্তিত্ববাদকে

www.pathagar.com

সর্ব্ববাদিসম্মত করিয়াছিল। গ্রীকদের দর্শন বা রোমীয়দের কার্য্য তৎপরতা কিছুতেই এই পাপ স্রোতের গতি রোধ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু খৃস্ট ধর্ম্ম মানুষের মধ্যে সাম্য প্রচার করিয়া, তাহাদিগকে পরস্পর ভালবাসিতে ও সাহায্য করিতে আদেশ দিয়া এবং ধনী নির্ধ্বন নির্ব্বিশেষে সকলকে স্বর্গ রাজ্যের দিকে আহ্বান করিয়া সেই পাপস্রোত প্রতিহত করিল।

আদি খৃস্টানগণ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইত। তাহারা যুক্তি তর্কের ধার ধারিত না এবং মানসিক শিক্ষার প্রয়োজনও বোধ করিত না। তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল স্বর্গ রাজ্যের জন্য প্রস্তুত হওয়া। পার্থিব শিক্ষাকে তাহারা নিষ্প্রয়োজন ও নিরর্থক মনে করিত। তাহাদের শিক্ষার আদর্শ ছিল পরকালবাদ।

কিন্তু যখন খৃস্টধর্ম্ম প্রসার লাভ করিল, তখন যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে তাহার সমর্থন করা আবশ্যক হইল এবং খৃস্টানগণ গ্রীক রোমান শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হইতে বাধ্য হইল। খৃস্ট ধর্ম্ম গ্রীক দর্শনকে তাহার শিক্ষার আদর্শের অঙ্গীভূত করিয়া লইল। এইরূপে খৃস্টধর্ম্ম ও গ্রীক রোমান চিন্তাধারার মধ্যে একটা মিলনের উৎপত্তি হইল।

কিন্তু এই মিলন বহু কাল স্থায়ী হয় নাই। ধর্ম্ম যাজকগণ দেখিল, খৃস্ট ধর্ম্মের উপর গ্রীক রোমান সভ্যতার একটা ছাপ পড়িয়াছে। লোকে তাহাদের প্রচারিত সত্যগুলি বিনা প্রমাণে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে। তাহারা বুঝিল, তাহাদের এক মাত্র লক্ষ্য বিশ্বাসের বলে লোককে সৎপথে আকৃষ্ট করা ; দর্শনের যুক্তি তর্কের প্রশ্রয় দিলে তাহা আরাম সাধ্য হইবে। সুতরাং তাহারা গ্রীক–রোমান শিক্ষা প্রণালীর প্রতি সন্দিহান হইল। তখন তাহাদের ক্ষমতা অপর্য্যাপ্ত ছিল। তাহারা আইন করিয়া সমস্ত অখৃস্টান বিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দিল। এইরূপে ষষ্ঠ শতাব্দীতে খৃস্ট ধর্ম্ম ও গ্রীক সভ্যতার মধ্যেবিচ্ছেদ সাধিত হইল। গ্রীক সভ্যতা ইউরোপ হইতে বিতাড়িত হইয়া সিরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই হইতে ইউরোপে মধ্যযুগের অবতারণা হইল।

মধ্যযুগের প্রারম্ভেই রোম হীনবল হইয়া পড়ে এবং রাজক্ষমতা জার্ম্মানদের হস্তগত হয়। জার্ম্মানগণ তখন সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত ছিল। তাহারা রোমীয় সভ্যতার প্রতি তাকাইয়া বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া গেল, রোমীয় আইন কানুন রীতি নীতি সমস্ত অলৌকিক জ্ঞানে তৎসমুদয়কেই আদর্শরূপে গ্রহণ করিল এবং কেহ উহার ব্যতিক্রম করিলে তাহার প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিল। এইরূপে গ্রীক রোমান সভ্যতার হুবহু গ্রহণ এবং স্বাধীন চিন্তার দমন এই দুইটি মধ্য যুগের বিশেষ লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়।

কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যখন রোমীয় সমাজ দুর্নীতি পরায়ণ হইয়া পড়ে, তখন কতকগুলি ধর্ম্ম প্রবণ খৃস্টান সত্যধর্ম্ম পালনের জন্য অতিশয় যত্নবান হয় এবং সংসারে লিপ্ত থাকিয়া উহা সম্ভবপর হইবে না ভাবিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে। তাহারা সংসারত্যাগী হইয়া এক একজন এক একটি আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে জীবন অতিবাহিত করে। কালক্রমে এই সন্ন্যাসিগণ সংঘবদ্ধ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করে এবং অনেক সন্ন্যাস–ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়। বশ্যতা, পবিত্রতা ও দারিদ্র্য ইহাদের জীবনের পণ ছিল। ইহারা ঐশ্বরিক আদেশ পালনে কখনও পরান্মুখ হইত না, জীবনে বিবাহ করিত না এবং

www.pathagar.com

ধন সম্পত্তির অধিকারী হইত না। ইহাদের আশ্রমগুলি ক্রমশঃ ধর্ম্ম ও বিদ্যা চর্চ্চার আবাস হইয়া দাঁড়াইল। ইহারা লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিত, তাহাদের যথাসাধ্য সেবা পরিচর্য্যা করিত, দুঃখে সহানুভূতি করিত এবং বিদ্যাদান করিয়া তাহাদের জীবন সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিত। প্রত্যেকটি আশ্রমের সহিত এক একটি বিদ্যালয় ছিল। তাহাতে ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক কলা ও কতক পরিমাণে শিক্ষা দেওয়া হইত। এই আশ্রমবাসীর প্রযত্নেই পুরাতন গ্রীক ও রোমান পুস্তকাবলী ইউরোপে সংরক্ষিত হইয়াছিল এবং বর্ব্বর জার্মান জাতির উগ্র প্রকৃতি প্রশমিত হইয়া সভ্যতার দিকে প্রধাবিত হইয়াছিল।

কিন্তু কালক্রমে এই সম্প্রদায়গুলি বিদ্যাচর্চ্চায় উদাসীন হইয়া নিরক্ষর হইয়া পড়ে। মহাবীর শালমেন এই দুর্দ্দশা দূরীকরণের জন্য নূতনভাবে বিদ্যালয় স্থাপন এবং সর্ব্ব সাধারণের অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হন। তাঁহার প্রচেষ্টায় ইউরোপ লুপ্তপ্রায় গ্রীক রোমান বিদ্যা চর্চ্চার পুনরুত্থান হয়। কিন্তু নৃপতিগণ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রকৃতির হওয়ায় তাঁহার পরবর্ত্তী তাঁহার প্রবর্ত্তিত জাগরণ বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া উন্নতির পথ আর কখনও রুদ্ধ হয় নাই।

জার্মানদেরই এক শাখা Saxons ইংলন্ডে আধিপত্য স্থাপন করে। Saxon রাজ Alfred the Great নবম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। তিনি রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া শিক্ষা বিধানে মনোযোগ দেন। তিনি মহাদেশ হইতে কতিপয় বিখ্যাত বিদ্যার্থীকে ইংলন্ডে আনয়ন করেন এবং পুরাতন বিদ্যার অনেকাংশ পুনরুদ্ধার করেন।

শার্লমেনের পর নৃপতিগণ হীনবল হইয়া পড়িলে ইউরোপে ফিউড্যালিজম–এর উৎপত্তি হয়। ছোট ছেট ভূস্বামী ও ভূসম্পত্তিহীন লোক তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিকটবর্ত্তী কোন প্রতাপশালী ভূমধ্যকারীর শরণাপন্ন হইত এবং তাহাকে উহার পরিবর্ত্তে রাজস্ব দিত ও যুদ্ধের সময় তাহার নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধ করিত। এইরূপে প্রতাপান্বিত ভূমধ্যকারিগণই দেশের প্রকৃত মালিক হইয়া পড়ে এবং প্রায় সমস্ত মধ্যযুগ ব্যাপিয়া ইউরোপে এই অবস্থা বিদ্যমান থাকে। ফিউড্যালিজম এর আমলে দেশে ভূমধ্যকারী ও কৃষক এই দুই শ্রেণীর লোকের উৎপত্তি হয়। বিদ্যা চর্চ্চা প্রধানতঃ প্রথমোক্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। প্রথমতঃ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়াই তাহাদের জীবনের লক্ষ্য থাকে কিন্তু কালক্রমে যখন সামরিক শিক্ষা স্থিতিশীলতা প্রাপ্ত হয় তখন সাহসিকতা, শিষ্টাচার, নারী জাতির প্রতি সম্মান, আর্ত্তের সহায়তা প্রভৃতি সমাজের আদর্শ হইয়া দাঁড়ায় এবং শিক্ষা প্রণালীও তদনুযায়ী নির্ধ্বারিত হয়। বালককে ৭ হইতে ১৪ বৎসর হয় পর্য্যন্ত তাহার প্রভুর নিকট ছোকরা রূপে কাজ করিতে হইত। ১৪ হইতে ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাকে যুদ্ধ ও সামরিক বিদ্যার প্রদর্শনীতে প্রভুর অনুগমন করিতে হইত। এই সময় সে শিষ্টাচার শিক্ষা করিত এবং পদ্যলেখা ও নৃত্য গীতাদিও অভ্যাস করিত। ২১ বৎসর বয়সে তাহাকে যথারীতি নাইট করা হইত। বালিকাদের শিক্ষাও কোন ভূমধ্যকারীর পত্নীর নিকট হইত। তথায় তাহারা গৃহকার্য্য, শিষ্টাচার ও নৃত্যগীতাদি ও কথাপকথনে শিক্ষা লাভ করিত।

নাইটদের জীবন পাপ–পূণ্যের একটা অদ্ভুত মিলন স্থল ছিল। তাহারা একাধারে দয়াশীল ও নিষ্ঠুর ছিল। তাহাদের আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল, কিন্তু দুর্নীতি পরায়ণতা হইতে বিরত ছিল না।

www.pathagar.com

তাহারা নারী জাতির উপাসক ছিল। তাহারা দানশীল অথচ অমিতব্যয়ী ছিল। কিন্তু মোটের উপর তাহারা লোকের দৃষ্টি সন্ন্যাসীদের পরকালবাদ হইতে অপসৃত করিয়া ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং সমাজকে অনেকটা সভ্যতার আবরণে বিভূষিত করিয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে আরব দেশে ইসলামের আবির্ভাব হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গ্রীক রোমান বিদ্যা ইউরোপ হইতে বিতাড়িত হইয়া সিরিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে। মুসলিমগণ অতি সত্বর এই সমুদয় আয়ত্ত করিয়া লয় এবং ধর্ম্ম, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে বহু গবেষণামূলক পুস্তক প্রণয়ন করে। তাহারা যখন আফ্রিকা ও স্পেন জয় করে তখন এই সমস্ত বিদ্যা ইউরোপে পুনরানীত হয়। তাহাদের সাধনার ফলে গ্রানাডা, কর্ডোভা, সেভিল, আলোকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে ইউরোপে পরকালবাদের প্রভাব কমিয়া আসিয়াছিল। উহাদের প্রভাবে খৃস্টান বিদ্যালয়গুলিতেও উদার শিক্ষার একটা সাড়া পড়িয়া গেল এবং অবশেষে যখন গোঁড়ামির ফলে ইসলাম উদার শিক্ষা হইতে দূরে সরিয়া পড়ে তখন খৃস্টানগণই উহাকে সঞ্জীবিত রাখে।

খৃস্টানগণ নূতনভাবে বিদ্যা চর্চ্চা আরম্ভ করিল। ফলে সালানো, বলগনা, প্যারিস এবং অন্যান্য স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইল। এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পোপ ও রাজন্য-বর্গের আর্থিক ও অপরাপর নানাবিধ সাহায্য নির্দ্ধারিত ছিল। এ সময়ের বিদ্যার্থীদের মধ্যে Mystic ও Scholastic এই দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। প্রথমোক্ত দলের উদ্দেশ্য হইল স্রষ্টার সহিত সৃষ্টের যোগাযোগ সম্পাদন এবং শেষোক্ত দলের লক্ষ্য হইল সাধারণ জ্ঞানের সহিত খৃস্ট ধর্ম্মের সমন্বয় সাধন। এতদুভয়ের চেষ্টায় এক মানসিক ও নৈতিক জাগরণের সৃষ্টি হইল যাহার ফলে ভবিষ্যতে রেনেসাঁ বা জ্ঞানের পুনরুত্থান সম্ভবপর হইয়াছিল।

কিন্তু এই সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবার পূর্ব্বেই ইউরোপে এক নূতন ভাবের অভ্যুদয় হইতেছিল শতাধিক বর্ষব্যাপী মুসলিম ও খৃস্টান মধ্যে ধর্ম্ম যুদ্ধের ফলে সমাজের ছোট বড়র মধ্যে বিভিন্নতা শিথিল হইয়া অসিতেছিল এবং ফিউড্যালিজম এর প্রভাব ক্ষুণ্ণ হইয়া তাহার স্থানে জাতীয় রাজতন্ত্র ও জাতীয় দেশপ্রীতির উদয় হইল। এই জাতীয়তার প্রভাবে মধ্য যুগ উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাচর্চ্চা একরূপ ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায়ই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন হইতে বহু স্থানে প্রাদেশিক ভাষার আলোচনা আরম্ভ হইল এবং উহাতে বড় বড় গ্রন্থ অনূদিত ও লিখিত হইতে লাগিল। Story of Beowuif এর উৎপত্তি এই সময়েই হয়। এইরূপে মধ্যযুগের শেষ দুই শতাব্দীতে ইউরোপে একটা নূতন কার্য্য প্রেরণা ও উন্নতির সাড়া পড়িয়া যায় এবং ফলে রেনেসাঁ বা বিদ্যা চর্চ্চার পুনরাবির্ভাব হয়। এই আন্দোলনে পরকাল অপেক্ষা পার্থিব সৌন্দর্য্য ও মানসিক বিষয়সমূহের প্রতি অধিক জোর দেওয়া হয় বলিয়া পরবর্ত্তীকালে এই আন্দোলনকে মানবিকতা বাদ (Humanism) আন্দোলন নাম দেওয়া হয়।

এই নব জাগরণ কিন্তু একদিনের চেষ্টার ফল নয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার কাল নির্দ্দেশ করা হয় কিন্তু উহার বহু পূর্ব্বেই বিভিন্ন দেশে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল।

www.pathagar.com

মানবিকতার জাগরণ ইটালিতেই প্রথম প্রকাশ পায়। বাণিজ্যের যোগে বিভিন্ন দেশের রীতিনীতি ও সভ্যতার সহিত উহার সংস্পর্শ হয়। এতদ্ব্যতীত উহার পুরাতন সভ্যতার গ্রন্থাবলীও উহাতে বিদ্যমান ছিল এবং ল্যাটিন ভাষাও প্রচলিত ভাষা ছিল। ইটালির সর্ব্বপ্রথম মানবিকতার সমর্থক ছিলেন পেট্রার্ক (১৩০৪–১৩৭৪)। তিনি পরকাল বাদের নির্থকতা প্রতিপন্ন করেন এবং পুরাকালীন রোমান ও গ্রীক কালচারের পুনরুত্থানের চেষ্টায় নিজের জীবন অতিবাহিত করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালিতে বহু গ্রীক ও ল্যাটিনে অভিজ্ঞ শিক্ষকের আবির্ভাব হয়, স্কুল ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তৎসমুদয়ে শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক ও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই মানবিকতা এক ছাঁচে পরিণত হয় এবং উহার সৌন্দর্য্যজ্ঞান সমাজ হিতৈষণা কেবল মাত্র ব্যাকরণের পদ প্রকরণে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং যদিও মানবিকতা সর্ব্ব প্রথম ইতালিতে প্রকাশ পায়, উহার পূর্ণ বিকাশের ভার অপরাপর দেশের উপর পতিত হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জার্ম্মানীতে মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পর হইতে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই মানবিকতা বাদ ফ্রান্স, টিউটনিক রাজ্যসমূহ, ইংলন্ড ও ইউরোপের অন্যান্য উত্তরাঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই সমস্ত অঞ্চলের মানবিকতাবাদ এক নূতন রূপ ধারণ করিল। তীক্ষ্মবুদ্ধি ইটালিয়ান ইহাকে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক পূর্ণ বিকাশের যোগে তাহাকে সমষ্টির কল্যাণে লাগাইতে চাহিয়াছিল। তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল বক্তিগত সুখ যশোলাভ। পক্ষান্তরে, উত্তরাঞ্চলের লোক অধিকতর ধর্ম্মপ্রবণ ছিল। তাহারা ইহাকে সমাজ ও ধর্ম্মের সংস্কারের উপায় স্বরূপ গ্রহণ করিল।

ইতালির পর ফ্রান্সে মানবিকতাবাদের প্রচলন হয়। ফরাসী রাজ প্রথম ফ্রানসিস্ (১৫১৫–৪৭) এই নূতন আন্দোলনের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আশ্রয়ে অনেক মানবিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ বিদ্যার্থীর ও কৃতবিদ্য শিক্ষকের প্রতিপালন হয়। বিউড মানসিক বিষয়ে এক তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন, এবং কর্ডেরিয়স ফ্রান্স ও সুইজারল্যান্ডে মানবিক বিষয়সমূহের প্রচার কল্পে কতিপয় পুস্তক প্রণয়ন করেন। বোর্ডোর কলেজ মানবিকতার ভিত্তির উপর নূতনভাবে সংস্কৃত হয়, এবং উহার আদর্শে ফ্রান্সে বহু বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়।

ইতিমধ্যে মানবিকতাবাদ টিউটনিক জাতিসমূহের মধ্যেও প্রসার লাভ করিয়াছিল। এমন কি যে জার্ম্মানি এত দিন এই নূতন আন্দোলনকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছিল তাহার বিশ্ববিদ্যালয় সমূহেও ইহার আলোচনা হইতে লাগিল। তথায় গ্রীস ও ল্যাটিন গ্রন্থগুলির নূতনভাবে গবেষণা ও সমালোচনা হইতে লাগিল। হাইয়ারোনিমিয়ন ভ্রাতৃ সম্প্রদায়ের চেষ্টায় বহু মানবিক বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় এবং ডেভেন্টার উহাদের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। ওয়েসেল, এগ্রিকোলা, হিজিয়স প্রভৃতি মনস্বী শিক্ষকগণ গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যপনা দ্বারা এই নুতন আন্দোলনের বিশেষ সহায়তা করেন।

কিন্তু এরাসমাসই এই দলের নেতা ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন, এবং ভেনিস, ফ্লোরেন্স, প্যাডুয়া, বলগনা প্রভৃতি

www.pathagar.com

স্থানে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জ্জন করেন। তিনি মানবিকতার যোগে লোকের ধর্ম্ম বিষয়ক অজ্ঞতা দূর করিয়া সমাজ সংস্কার ও শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধে কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁহার শিক্ষার আদর্শ ছিল বুদ্ধিমত্তা, সাধুতা ও শিষ্টাচারের সম্মিলন।

কিন্তু প্রকৃত শিক্ষক হিসাবে জার্মানদের মধ্যে স্টার্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি দীর্ঘ ৪৫ বৎসর ব্যাপিয়া স্ট্রাসবর্গে শিক্ষকতা করেন এবং আপন শিক্ষার আদর্শকে জ্ঞানসম্পন্ন চিত্তাকর্ষক সাধুতা রূপে ব্যক্ত করেন। তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা দশটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন এবং তদুপরি পাঁচ বৎসরের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য নিয়োজিত করেন। তাঁহার পাঠ্য তালিকা অতি বাঁধাবাঁধি রকমের ছিল। উহাতে ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি মানবিক বিষয়ের স্থান ছিল না ; গ্রীক ও ল্যাটিনের অধ্যাপনায় ভাষার উপর অধিক জোর দেওয়া হইত, উহার বিষয়ের প্রতি মনোযোগ সামান্যই দেওয়া হইত। মাতৃভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হইত এবং বিদ্যালয় ও বহির্জ্জগতের মধ্যে কোন সম্বন্ধ স্থাপনের নিদর্শন ছিল না। কিন্তু স্টার্ম্ম শিক্ষকতা কার্য্যে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, পরবর্ত্তী তিন শতাব্দীকাল শিক্ষার ব্যবস্থা তাঁহারই আদর্শে নিয়ন্ত্রিত হয়।

মানবিকতাবাদের হাওয়া ক্রমে ইংলন্ডে পৌঁছিল এবং তথাকার শিক্ষা প্রণালীতে গভীর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। মধ্যযুগের শেষ ভাগে ইংলন্ডে বিদা চর্চ্চা জড়তা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ডিউক অব গ্লস্টর হামফেরির প্রচেষ্টায় বিদ্যা চর্চ্চার পুনরাবির্ভাব হয়। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং উহাতে বহু গ্রীক ও ল্যাটিন পুস্তক দান করেন এবং ইতালি হইতে নূতন প্রণালীর শিক্ষক আমদানী করিয়া দেন। ফলে অক্সফোর্ডের বহু বিদ্যার্থী ইতালির শিক্ষা কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করিয়া অক্সফোর্ডে গ্রীক ল্যাটিনের অধ্যাপনা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কেম্ব্রিজে এরাসমাস সর্ব্বপ্রথম গ্রীক ভাষা শিক্ষা দেন। পরে ক্রোক, স্মিথ ও আস্কাম তাহার অনুসরণ করেন।

কিন্তু ইংলন্ডে মানবিকতাবাদ প্রচারে এই সকল বিদ্ব্যান ব্যক্তি অপেক্ষা রাজ দরবারের সম্ভ্রান্তগণই অধিকতর সহায়ক ছিলেন। স্যার টমাস মোর ও কার্ডিনাল উলসির প্রেরণায় রাজা অষ্টম হেনরি ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। মোর তাঁর Utopia এবং স্যার টমাস ইলিয়ট তাঁহার Governor পুস্তকে উদার শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

কিন্তু ইংরেজ মানবিকতাবাদী লিখিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকের মধ্যে আস্কাম এর Schoolmaster ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি এই পুস্তকে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষার জন্য 'দ্বিরনুবাদ' প্রথার সমর্থন করেন। তিনি নাকি এই প্রথায় রানী এলিজাবেথকে শিক্ষা দান করিয়া সফলতা লাভ করিয়াছিলেন।

ইংলন্ডের এই মানবিকতার আন্দোলন কেবল মাত্র বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজদরবারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। নিম্ন বিদ্যালয়েও ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। কলেট সেন্ট পল্‌স্‌-এ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং উহাতে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার শিক্ষার বিধান করেন। ক্রমে উহার আদর্শে অন্যান্য বিদ্যালয় পুনর্গঠিত হয়। কিন্তু ইংলন্ডের মানবিকতাবাদ শীঘ্রই

www.pathagar.com

অন্তঃসার বিহীন হইয়া পড়ে ; উহাতে গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু আধুনিক ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার কোন স্থান থাকে না।

এইরূপে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে মানবিকতাবাদ উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য-সমালোচনা, গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হারাইয়া ফেলে ; ভাব ছাড়িয়া শুধু ভাষার উপর জোর দেওয়া হয়, বুদ্ধি বৃত্তির সঞ্চালনা না করিয়া কেবল মাত্র স্মরণ শক্তির প্রয়োগ করা হয়। শাসন প্রণালীতেও উহার প্রভাব বিস্তৃত হয়। যুক্তির সহিত উহার কোন সম্পর্ক থাকে না। কেবল বাধ্যতাই একমাত্র লক্ষ্য হয়। এইরূপে যে নব জাগরণ মানুষের চিন্তাধারা উন্মুক্ত ও অপ্রতিহত করিবার এবং গির্জ্জা ও রাজ দরবারের দমন নীতির বিরুদ্ধে ব্যষ্টির মনোগত ভাব ব্যক্ত করিবার সুযোগ দানের প্রয়াস পাইয়াছিল, সপ্তদশ শতাব্দীতে তাহা আপন লক্ষ্যচ্যুত হইল। উহার সংশোধনের জন্য এক নূতন আন্দোলনের প্রয়োজন হয়। এই নূতন আন্দোলন রিফরমেশন বা ইউরোপের ধর্ম্ম সংস্কার।

মানসিক জগতে যেমন মধ্য যুগের স্বাধীন চিন্তার দমন নীতির বিরুদ্ধে থাকিয়া থাকিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা হইতেছিল, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও তেমনি গির্জ্জার ভিত্তিহীন আইন-কানুনের বিরুদ্ধে মধ্যে মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ হইতেছিল। কিন্তু ধর্ম্ম যাজকদের ক্ষমতা তখন অপরিসীম ছিল। তাহাদের হস্তে বিস্তর অর্থ জমিয়াছিল এবং ধন-সম্পন্ন বহু লোকও তাহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিবাদকদের অনেককে নাস্তিকরূপে অসহ্য যন্ত্রণা এমনকি মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিয়া লইতে হইয়াছে। সুতরাং, নবজাগরণে যে বুদ্ধির মুক্তি বিঘোষিত হয় তাহাতে গির্জ্জার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তৃত হয় নাই। গির্জ্জার সংস্কারে প্রায় আরো দুই শত বৎসর লাগিয়াছিল।

ধর্ম্ম সংস্কারের নেতাদের মধ্যে মার্টিন লুথারের নাম সর্ব্ব প্রথম উল্লেখযোগ্য। তিনি তরুণ বয়সেই অতি ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন, এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে গবেষণা করিতে যাইয়া পোপের ক্ষমতা ও ক্যাথলিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। গির্জ্জার কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে নাস্তিক সাব্যস্ত করিয়া আইনে অরক্ষণীয় বলিয়া ঘোষণা করেন, এবং তিনি পলাতক অবস্থায় সত্য ধর্ম্মের প্রচারকল্পে বহু পুস্তক রচনা করেন। শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁহার স্বাধীন চিন্তার ছাপ পড়িয়াছিল। লুথারের ন্যায় ক্যালভিনও ক্যাথলিক আচার পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন এবং রাজ আজ্ঞায় জন্মভূমি ফ্রান্স পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি কেবল ক্যাথলিক ধর্ম্মানুষ্ঠানের সমালোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বাইবেলের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া কতকগুলি বিধিও প্রণয়ন করেন। তিনি তাহার মতানুযায়ী ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য জেনেভাতে একটি কলেজ স্থাপন করেন। তথায় ধর্ম্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক বিষয়ক শিক্ষাও দেওয়া হইত। ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ড হইতে বহু প্রোটেস্ট্যান্ট জেনেভায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাহারাই ক্যালভিন এর প্রচারিত মত ও শিক্ষা পদ্ধতি নিজেদের দেশে আনয়ন করেন।

প্রতিবাদকগণ বাইবেলের সময়ানুযায়ী ব্যাখ্যার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহারা বলেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য ধর্ম্মজীবন যাপন ও সমাজের কল্যাণ সাধন, সুতরাং শিক্ষা সর্ব্ব সাধারণের প্রাপ্য এবং সরকার হইতে উহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত ; জীবিকা অর্জ্জন শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইবে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্রের জন্য উচ্চ শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিবে,

www.pathagar.com

শিক্ষণীয় বিষয় প্রশস্ত হইবে এবং উহাতে প্রাচীন ও আধুনিক ভাষা, ইতিহাস ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থান থাকিবে। শিক্ষাদান প্রণালীতে শুধু স্মরণ শক্তির প্রয়োগ না করিয়া বুদ্ধিবৃদ্ধির বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

ক্রমশঃ পোপের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া আসিল এবং প্রোটেস্ট্যান্টগণ স্বাধীনভাবে ধর্ম্মাচরণ ও শিক্ষা বিধান করিতে লাগিলেন। অনেক ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রটেস্ট্যান্টে পরিণত হইল, এবং নূতন প্রটেস্ট্যান্ট বিশ্ববিদ্যালয়েরও সৃষ্টি হইল। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে লিখন, পঠন, গণিত ও ধর্ম্ম বিষয়ের শিক্ষার এবং মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয় গুলিতে মানবিক বিষয়সমূহ ও ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা হইল।

কিন্তু শীঘ্রই এই সমস্ত বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষা প্রণালী এক নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে পরিণত হইল। প্রাটেস্ট্যান্টগণ পোপের আধিপত্য হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহারা নিজেরাই আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। এইরূপে যখন প্রোটেস্ট্যান্ট ক্ষমতা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইল, তখন তাঁহারা ব্যক্তিত্বের দমনে প্রবৃত্ত হইলেন, পোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার সময়ে লুথার বলিয়াছিলেন, 'বুদ্ধিই প্রধান বস্তু, উহা ঐশ্বরিক ; সুতরাং যাহা বুদ্ধির বিরুদ্ধ তাহা ঈশ্বরেরও বিরুদ্ধ।' তিনিই যখন আপন ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন, তখন বলিলেন, 'বুদ্ধি বহু-মস্তা রাক্ষস বিশেষ, উহা ঈশ্বর ও তাঁহার কার্য্যের বিরুদ্ধাচরণ করে।' স্বাধীন চিন্তাশীল লোকও প্রোটেস্ট্যান্টদের হস্তে নির্য্যাতিত এমন কি অগ্নিদগ্ধ হইতে লাগিলেন। এইরূপে যদিও প্রটেস্ট্যান্ট বিদ্যালয়সমূহে মানবিক বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা রহিল, উহা হইতে রেনেসাঁর প্রবর্ত্তিত ব্যক্তিত্ববাদ অন্তর্হিত হইল।

যখন প্রোটেস্ট্যান্টগণ রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জা হইতে বহির্গত হইয়া পড়ে তাহার পূর্ব্বেই ক্যাথলিকদের অনেকে ধর্ম্মের আচার অনুষ্ঠানগুলির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছিল। যখন প্রোটেস্ট্যান্ট মত স্থায়ী হইতে চলিল তখন Loyala নামক এক ব্যক্তি ক্যাথলিক ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে উহার দোষসমূহ দূরীকরণের জন্য এবং উহাকে পৃথিবীময় সুব্যবস্থিত করিবার জন্য এক ভ্রাতৃ সম্প্রদায় গঠন করেন। এই সম্প্রদায় জেসুইট নামে অভিহিত। শিক্ষার ইতিহাসে ইহারা এক উচ্চস্থান অধিকার করেন।

জেসুইটগণ মধ্য ও উচ্চ শিক্ষায়ই তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ সীমাবদ্ধ রাখে। তাঁহারা অবৈতনিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ধনী, নির্ধ্বন, উচ্চ নীচের ভেদের কোন স্থান রাখেন না। তাঁহারা ধর্ম্ম শিক্ষার সঙ্গে মানবিক বিষয়েরও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তাঁহাদের মানবিকতাবাদ অনেকটা স্টার্ম্ম-এর অনুরূপ ছিল। তাহাতে প্রাদেশিক ভাষা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না এবং গবেষণার প্রশ্রয় দেওয়া হইত না। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষকগণ শিক্ষাদান কার্য্যে বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহারা সর্ব্বান্তকরণে কর্ত্তব্য পালনে রত ছিলেন। আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতে উত্তম অধ্যাপনার যে সমস্ত বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হয় তাঁহাদের প্রণালীতেও তৎসমুদয়ের কতকগুলি বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তাঁহারা শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে সময়ানুযায়ী পরিবর্ত্তন সাধন করিতে অসমর্থ হন। জেসুইটগণের পরে অন্যান্য ক্যাথলিক ভ্রাতৃ সম্প্রদায়ও শিক্ষাদান কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তাঁহাদের কোনটিই শিক্ষার আদর্শে কোন মূল্যবান ধারণা দানে সমর্থ হন নাই। ব্যক্তিত্ববাদের সমর্থনও গতানুগতিক

www.pathagar.com

চিন্তাধারা হইতে মুক্তির নির্দ্দেশ এবং সত্যের অনুসন্ধানের সুযোগ প্রদানের জন্য এক নূতন আন্দোলনের প্রয়োজন হয়।

রেনেসাঁ এবং রিফরমেশন যখন মূল উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত হইয়া এক অন্তঃসারবিহীন বাঁধাবাঁধি আকার ধারণ করিল, তখন ইউরোপের জাগ্রতবুদ্ধি শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তববাদের প্রচার করিল। প্রকৃত বস্তুর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে কি পদ্ধতি অবলম্বনীয়, এই আন্দোলন তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া দিল। ইহার মূল মন্ত্র এই যে, প্রকৃত জ্ঞান কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বৃত্তির ব্যবহার হইতেই সম্ভব, স্মরণশক্তির প্রয়োগ ও গতানুগতিক ব্যাখ্যা হইতে সম্ভব না। ইহাতে ব্যক্তিত্ববাদের পুনরাবির্ভাব হয়।

ইরাসমাস, মেলাংথন, ইলিয়ট, আস্কাম এই আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন। রাবেলাস ইহার পূর্ণ বিকাশ করেন। তিনি তাঁহার শিক্ষা পদ্ধতি Gargantua নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন। উহাতে তিনি শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার পাঠ্য তালিকায় প্রাচীন ভাষাসমূহ, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, জ্যামিতি, সঙ্গীত, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, সকল বিষয়েরই স্থান ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার সময়ের বহু অগ্রে ছিলেন বলিয়া তাঁহার শিক্ষাপ্রণালী সমসাময়িক বিদ্যালয়ের উপর বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মানবিকতাবাদের এই প্রসারিত ব্যাখ্যা দিবার এবং শিক্ষা ও সমাজের ভিতর সামঞ্জস্য স্থাপন করিবার চেষ্টা বলবতী হয় এবং ফ্রান্সে Muntaigne, ও ইংলন্ডে Mulcaster, Milton ও Locke এই বিষয়ে গবেষণামূলক পুস্তক রচনা করেন।

এই বাস্তববাদ ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া বৈজ্ঞানিক শিক্ষার পথ পরিষ্কার করে। Bacon জ্ঞান লাভে প্রচলিত এ্যারিস্টটেলিয়ান পদ্ধতির প্রতিবাদ করেন এবং তাঁহার Novum Organum পুস্তকে সম্পূর্ণ জ্ঞান ও সত্যে উপনীত হইবার উপায় নির্দ্দেশ করেন। তিনিই আধুনিক ন্যায় শাস্ত্রের জন্মদাতা। জার্ম্মান পণ্ডিত রাটকে বেকনের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষার কার্য্যে প্রয়োগ করেন। Comenius তাঁহার অনুসরণ করেন।

Comenius তাঁহার শিক্ষানীতিগুলি Janua নামক পুস্তকে গ্রথিত করেন। সমসাময়িক বিদ্যালয়ের কার্য্যের উপর তাঁহার নীতিগুলি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে নাই সত্য, কিন্তু তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভবিষ্যতে Basedow, Pestolozzi, Herbert, Froebel শিক্ষা পদ্ধতিতে এক নূতন যুগের অবতারণা করেন।

বাস্তববাদের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নূতন জাগরণের আবির্ভাব হয়। ইউরোপের সর্ব্বত্রই ধর্ম্ম প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল এবং রাজন্যবর্গ স্বেচ্ছাচারিতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন প্রভৃতি ক্যাথলিক দেশে ধর্ম্ম কতকগুলি আচার অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হয়। ইংল্যান্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি প্রোটেস্ট্যান্ট দেশেও প্রোটেস্ট্যান্টবাদের নূতন তেজ নিঃশেষিত হইয়া উহা অন্তঃসারবিহীন, সম্ভ্রান্ত ও ধর্ম্ম যাজক সম্প্রদায় রাজস্ব হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল, দরিদ্র প্রজাবর্গকে উহা সম্পূর্ণরূপে বহন করিতে হইত। ইংলন্ডের রাজা পার্লামেন্টের ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই হেতু সকল দেশেই ধর্ম্ম ও রাজনীতি বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একটি সাড়া পড়িয়া যায়। এইরূপে

www.pathagar.com

Puritanism, Pietism, Rationalism প্রভৃতি আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ইহাদের কোনটিই স্থায়ী ফলপ্রসূ হয় নাই সত্য, কিন্তু প্রত্যেকটি সমাজকে ঠিক পূর্ব্বস্থানে ফিরাইয়া না লইয়া উহাকে একটু উন্নতির পথে চালিত করিয়াছে। এইরূপে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমাজে ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হয়, অতীতের সহিত উহার সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইবার পথ পরিষ্কৃত হয়। এই সময়ে রুশো'র আবির্ভাব হয় এবং ফরাসী বিপ্লবের ফলে সমাজ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু তাহারই ভগ্নাবশেষ হইতে এক নূতন ও মহিমামণ্ডিত সমাজের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিত্ববাদের জয় হইল এবং ক্ষণেকের তরে উহা সমাজকে পদদলিত ও চূর্ণীকৃত করিল। কিন্তু যখন রুদ্ধ আবেগ প্রশান্তভাব ধরিল তখন সমস্যা হইল, কি প্রকারে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যক্তিত্বের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। এই সমস্যার সমাধানই আধুনিক সংস্কারকগণের অন্যতম কর্ত্তব্য এবং ইহাতেই আধুনিক সমাজ ও শিক্ষার নেতৃবর্গ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন।

www.pathagar.com

কোরানে মানবের স্থান ও অর্থনীতি

কমরুদ্দীন আহমদ বি.এ.

পরম পবিত্র কোরান শরীফে মানুষকে সৃষ্ট জগতে অতি উচ্চ স্থান প্রদান করা হইয়াছে। কয়েকটি আয়াতই মানুষের সেই শ্রেষ্ঠত্বের মহিমা জ্ঞাপন করিতেছে। মানুষ সম্বন্ধে সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বেই আল্লাহ বলিয়াছেন, 'ইন্নি জায়েলুন ফিল আরদে খলিফা', অর্থাৎ আমি এমন একজনকে সৃষ্টি করিতে যাইতেছি যে সে আমার প্রতিনিধি স্বরূপ পৃথিবীতে রাজত্ব করিবে (সুরাবকর ৩০ আয়েত)। তিনি আর একটি আয়েতে বলিয়াছেন 'লকদ কররম না বনী আদামা', অর্থাৎ মানব সন্তানকে আমি অতি বড় শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত করিয়াছি। সৃষ্ট জগতে মানবের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপক আরও একটি আয়াতে বলা হইয়াছে, 'সাখখারা লাকুম মা ফিসসামাওয়াতে অমা ফিল আরদে', অর্থাৎ বিশ্বজগতে যাহা সৃষ্টি করিয়াছি তাহা তোমারই অধীন (সুরা লোকমান আয়েত ২০)। আর একটি আয়াতে বলা হইয়াছে 'খালাকাল ইনসানা ফি আহ্সানে তকবিম', অর্থাৎ মানুষকে আমি অতি উৎকৃষ্ট উপকরণ দিয়া গঠন করিয়াছি (সূরা ৩, আয়াত ৪)। বস্তুতঃ মানুষ্যই যে সৃষ্ট জগতে সর্ব্বপ্রধান জীব এবং সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালা যে তাঁহারই ধ্যান ধারা দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টি করিয়া তাহারই প্রতিনিধিরূপে কার্য্য করিবার জন্য এই ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন তাহা কোরানের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয়। উপরোক্ত আয়াতগুলির অর্থ উপলব্ধি করিলে আমরা এই বুঝিতে পারি যে, মানুষ্যকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি, মনুষ্য সৃষ্ট জীবদের মধ্যে কত বড় উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত এবং তাহার কর্ত্তব্য কত বড় মহান ও গুরু। কিন্তু একবার কোরান বিশ্বাসী একেশ্বরবাদী মুসলমান ভাইগণ আমাদের সমাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন দেখি, একবার মানসচক্ষে আপনাদিগের অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে নজর দিয়া দেখুন দেখি ; দেখিবেন সেই কোরানোল্লিখিত মানুষ, আর আমরা যাহারা মানুষের চেহারা লইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছি এই দুইয়ের মধ্যে কত প্রভেদ, কত অসামঞ্জস্য, কত ব্যবধান। অনন্ত আকাশে চন্দ্র সূর্য্যের অস্তিত্বের ন্যায় কোরানের আয়াতও যদি চিরন্তন সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা যাহারা মানুষ বলিয়া দাবী করিতেছি তাহাদিগকে খোদার প্রকৃত প্রতিনিধিরূপে দেখিতে পাই না কেন? তবে কি বলিতে হইবে যে, কোরানের উক্তি মিথ্যা, আমার সত্তার যাহা ভিত্তি, যে সত্যের উপরে জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে, তাহা অসার, শুধু বাষ্প একটা হাওয়া মাত্র? কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোরান যে সত্য জগতে প্রচার করিয়াছে তাহা চির সত্য,কিন্তু আমরা সংসারের নানা প্রকার প্রলোভনের আবর্ত্তে পড়িয়া সেই সত্যের মহিমা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। বর্ত্তমানে মুসলমান সমাজে কোরানোক্ত সেই খোদার প্রতীক মানুষ কয়জন আছেন, এবং কোরানের আয়াতের প্রত্যক্ষ সত্যতা কয়জন মুসলমানের কার্য্যে ও বাক্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠে? কোরান যে সত্য প্রচার করিয়াছে তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। আমরাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি। তাই আভিধানিক হিসাবে আমরা মানুষ হইলেও আল্লাহর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কোরানের

www.pathagar.com

সেই মানুষ নই। কারণ ব্যতীত এ জগতে কোন কার্য্যই সম্ভবপর হয় না। মানুষ চেহারায় আজিও মানুষ, তবে তাহার সেই ঐশ্বরিক গুণাবলী যাহা দিয়া খোদা সৃষ্টির প্রথম দিন তাহাকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে বিভূষিত করিয়াছিলেন তাহা কোথায় অন্তর্হিত হইল? কোরান ত মিথ্যা নয় ; আমাদিগের ধর্ম্ম শিক্ষাই মিথ্যা। তাহা না হইলে আমাদের কার্য্যের দ্বারা কোরানের সত্যতা প্রমাণ করিতে পারি না কেন? তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, আমরা কোরানের উক্তির যেভাবে অর্থ করি, কোরানকে যেভাবে গ্রহণ করি, তাহা সত্য নয়। এবং আমরাই ভণ্ড, অসাধু এবং অমুসলমান। সূর্য্যের কিরণ যেরূপ কাঁচ খণ্ড ব্যতীত উপলখণ্ডে প্রতিফলিত হয় না ; সেইরূপ কোরানের উক্তির সত্য প্রচারের সার্থকতা আমাদের মত পথভ্রষ্ট ভ্রান্তবিশ্বাসী মুসলমানগণের অন্তরে কোন প্রকার সত্যের জ্যোতি রেখা আঁকিয়া দিতে পারিতেছে না। সমাজের ঠিক এমনি অবস্থাতেই মানব হৃদয়ে অবিশ্বাসের অঙ্কুর জাগিয়া উঠে। এই সময় যদি খোদার অনুগ্রহভাজন লোক শিক্ষকগণ জগতে সত্যবাণী নিষ্কামভাবে প্রচার করেন তবেই অজ্ঞান, অন্ধকার ও সন্দেহের কুয়াশা দূর হইয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমানে যে সন্দেহ দোলায় আমাদের মন দোল খাইতেছে তাহা এই : কোরান সত্য, তাহার উক্তি সত্য, আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস সত্য। ইহার সকলই যদি সত্য হয়, তবে মানুষ যে সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতিনিধি এই সত্যের উপলব্ধি আমাদের হৃদয়ে হয় না কেন? খোদার খাঁটি প্রতিনিধির মত পরম দয়ালু বিশ্ব প্রতিপালক রাব্বিল আলামীনের ন্যস্ত কাজ আমরা ঠিকভাবে সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না কেন? 'নায়েব রসুল' সাহেবেরা হয়ত বলিবেন যে, মুসলমানগণ এই নশ্বর জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আসে নাই। জীবন ধারণ করিয়া জগৎ পালকের প্রতিনিধিরূপে জগতের প্রতি যে একটা বিরাট কর্ত্তব্য রহিয়াছে এবং তাহা পালন না করিলে যে আল্লাহতালারই আদেশ অমান্য করা হয় এবং কেয়ামতের দিন জওয়াব দিহির সময় যে ঠেকিতে হয়, তাহা বোধ হয় অনেকে অনুভব করেন না। 'নায়েবে রসুল'রা ত ইহকালের কোন প্রকার মূল্যই দিতে চান না। পারত্রিক সুখের সম্মোহন মন্ত্রে তাঁহারা এমনই সম্মোহিত হইয়া আছেন যে ঐহিক সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম প্রচেষ্টাকেই তাঁহারা অতি হীন ও তুচ্ছ মনে করিয়া থাকেন। তাঁহারা ইহাই প্রচার করেন ও বিশ্বাস করেন যে, ইহজীবনে মানুষের অন্তর্নিহিত বিধিদত্ত কর্ম্মশক্তি পরিস্ফুট হউক বা নাই হউক তাঁহাদের নির্দ্দেশমত শুধুমাত্র বাহ্যিক ধর্ম্মের অনুশাসনগুলি মানিয়া চলিলেই মানুষ পরকালে অনন্ত সুখ, শান্তি, হুর পরী, চর্ব্ব্য, চুষ্য জিনিষ উপভোগ করিতে পারিবে। মৃত্যুর পরপারে তাহাদিগের জন্য হয়ত অক্ষয় স্বর্গের ব্যবস্থা হইবে, অথবা তাহারাই আল্লাহর প্রতিনিধি হইয়া কোরানের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য পুনরায় আবার ভূত হইয়া এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইবে, কিন্তু তাহাদিগের এই কথা মনে রাখা উচিত যে, 'যাহারা হেথায় নাই, তাহারা হোথায়ও নাই।' কর্ম্মের সাধনা ব্যতীত সিদ্ধি কেমনে সম্ভব ; শুধু ইহাই তাহাদিগের চিন্তার বিষয় হওয়া আবশ্যক। যে অন্ধ সে আপনিই পথ চলিতে পারে না, অন্যকে আর কি পথ দেখাইবে? অজ্ঞান অন্ধকারে, পাপ পঙ্কে যাহারা অসহায়ভাবে হাবুডুবু খাইতেছে জ্ঞানালোকে তাহাদের চিত্ত উদ্ভাসিত করিয়া কে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে ; যাহার নিজেরই শক্তি নাই সে অন্যকে শক্তি দান করিবে কি রূপে? মানব অনন্ত শক্তির উৎস, 'আহসানে তকবিমে' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট উপাদানে গঠিত, (সূরা ৩, আয়াত ৪)। সে

www.pathagar.com

আল্লাহর খলিফা, কিন্তু যেখানে সাধনা নাই সেখানে সিদ্ধিও নাই সেখানে আছে কেবল 'আসফালিসসাফিলীন' (সূরা ৩, আয়াত ৪) অর্থাৎ নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতর। কোরানে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে, 'আমি কাহারও অবস্থা পরিবর্ত্তন করি না, যে পর্য্যন্ত সে নিজে তাহার অবস্থা পরিবর্ত্তন না করে', 'লা ইউ গাইয়েরো মা বে কওমিন' (সূরা রাদ, আয়াত ১১)। আল্লাহ বিচার করেন ধর্ম্মের বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া নয়, মানুষের আন্তরিক ভাব, নিষ্ঠা বা তাকওয়া দেখিয়া (সূরা বকর, আয়াত ১৭৭)। মনে প্রাণে অনন্ত আদর্শের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য যিনি চেষ্টা করিয়াছেন, খোদাই তাহার অসীম অনন্ত শক্তি প্রয়োগে তাঁহাকে সেই আদর্শে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং, ইহকালে অন্তর্নিহিত বিধিদত্ত কর্ম্ম শক্তির পরিপুষ্টিসাধন না করিয়া অর্থাৎ ইহলোককে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া পরকালের সুখ ভোগের যাঁহারা আশা করেন বা আশ্বাস দেন তাহাদিগের জন্য কোরানে এই সাবধানের বাণী ঘোষিত হইয়াছে—'মন কানা ফি হাজিহি অমা ফহুয়া ফিল আখেরাতে অমা অ আদাশো সাবিলা', অর্থাৎ যে ইহকালে অন্ধ থাকিল সে পরকালেও অন্ধ থাকিবে এবং সে আরও বিপথে যাইবে (সূরা বনি ইসরাইল, ৭২ আয়াত)। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে তথাকথিত নায়েব রসুলদিগের প্রচারিত মতে—জগতটা তুচ্ছ কোরানের প্রচারিত প্রকৃত সত্য বাণী নয়। যদি কোরানকে চির সত্যের আকর বলিয়া জানিতে হয়, বুঝিতে হয়, এবং উপলব্ধি করিতে হয়, তবে আমাদিগকে কোরান বুঝিবার, কোরান কি তাহা জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে ; কোরানে লিখিত আয়াতের মধ্যে যে গভীর অর্থপূর্ণ সত্য নিহিত আছে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। যাহারাই এই সত্য উপলব্ধি করিয়া কোরানের নির্দ্দেশমত নীতিপথ অনুসরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জগতে ধন্য হইয়াছেন। তাঁহারাই যে আল্লাহর প্রতিনিধি তাহা তাহাদিগের কার্য্যে বাক্যে নিয়তই প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু আমাদের ন্যায় যাহারা মোনাফেক তাহারা ক্রমাগত তাহার আশীর্ব্বাদ লাভে বঞ্চিত হইয়া এই সংসারে বিচরণ করিতেছে এবং পদে পদে দোজখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তাহাদিগের অবস্থা দৃষ্টে মানবকে আর আল্লাহর প্রতিনিধি বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না এবং কোরানের চির সত্যালোকে সন্দেহের ছায়াপাত হওয়ার আশঙ্কা হইতেছে। কিন্তু কোরান অনন্ত সত্যের আকর। মানুষ যে আল্লাহর প্রতিনিধি, সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে জগদপালক যে তাহারই বাঞ্ছিত কাজ করিবার জন্য মানবকে এমন রম্য পৃথিবীর অধীশ্বর করিয়া এখানে পাঠাইয়াছেন, মানব যে শুধু সাধনার দ্বারাই এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে, শুধু কর্ম্ম দ্বারাই তাহার অন্তর্নিহিত লুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিতে পারে, তাহা কোরানেই উল্লিখিত আছে। কি উপায়ে এই সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায় তাহাও কোরানেই উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা নায়েব রসুলের মারফতে সত্যের সেই প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পাইতেছি কি? হতাশ হৃদয় কি ক্রন্দনের আর্ত্তনাদে বলিয়া উঠে না যে, নায়েব রসুলের যুক্তিতে সত্যের কোনই সন্ধান পাই নাই বা পাইতেছি না এবং তাঁহারা প্রকৃত সত্য গোপন করিয়া আমাদিগের অজ্ঞতার সুযোগ লইয়া আমাদিগকে বিপথগামী করিতেছেন? কোরানে তাঁহাদিগের জন্য কি কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে তাহা সুরা বকরের ১৭৪ ও ১৭৫ আয়াত পড়িলেই জানিতে পারিবেন। সেখানে স্পষ্ট বলা হইয়াছে 'যে সকল ব্যক্তি কোরানের কোন অংশ গোপন করে বা উহা বিক্রয় করিয়া অর্থ গ্রহণ করে তাহারা অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই ভক্ষণ করে না। কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাহাদের

www.pathagar.com

সহিত বাক্যালাপ করিবেন না, তাহাদিগকে বিশুদ্ধ করিবেন না এবং তাহাদিগের জন্য তিনি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিবেন। বস্তুতঃ এই সকল লোক সত্য ছাড়িয়া মিথ্যা ক্রয় করিতেছে, তাহারা শান্তি ফেলিয়া শাস্তিই কিনিয়া লইতেছে?' 'আদ্দুনীয়া মাজরাতুল আখেরাত', একবার মুসলমান সমাজের প্রতি দৃষ্টি করিলেই অন্তরে অনুভব করিবেন কোরানে যে নরকাগ্নির কথা উল্লিখিত হইয়াছে সেই নরকাগ্নির পরশ ইহকালেই এই সংসারে বাস করিয়াই ভ্রান্ত, বিপথগামী মুসলমানগণ দিবারাত্রি ভোগ করিতেছে। নরক আর কোথায়, এইত নরকের স্বরূপ। মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া রাব্বিল আলামীনের প্রতিনিধি স্বরূপ এই জগতে আসিয়া মানুষের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া খোদার নির্দ্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন করিলাম না, শুধু এই নিজের স্থূল দেহের বোঝাটাই কোনোরূপে বহন করিয়া ফিরিলাম, এবং পদে পদে লাঞ্ছিত পদদলিত ও নির্য্যাতিত হইলাম, ইহা কি কম পরিতাপ, কম যন্ত্রণা? অন্তরের এ জ্বালার নিকট নরকাগ্নির দাহিকাশক্তি কি বেশী যন্ত্রণাদায়ক? ভবের হাটে বিকিকিনি করিয়া শেষ খেয়ার পরপারে পার হইবার কড়ি আমাকে ইহকালের বিনিময়েই সংগ্রহ করিতে হইবে। সেই কড়ি সংগ্রহের জন্যই এই দেহের বোঝা বহন করিতে হয়। কাজেই 'নায়েবে রসুলে'র নির্দ্দেশমত ইহকালকে তুচ্ছ বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না; কারণ তাহা হইলে অপরপারের কড়ি আর সংগ্রহ হইবে না। মরণ ভেলায় জীবন জলধি পার হওয়া যাইবে না।

জগতে দেহ ধারণ করিতে হইলে, মানব সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া খোদার নির্দ্দেশমত কোরানের সত্য মহিমা প্রচার করিতে হইলে, যে সকল জিনিষের প্রয়োজন অর্থ তাহার অন্যতম। সেই জন্যই কোরানের ২৫ স্থানে অর্থকে 'ফজল', ২১ স্থানে 'খায়ের', এবং ১২ স্থানে 'হাসানা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থ না হইলে যে মানুষ খোদা দত্ত শক্তি জগৎ সেবার জন্য স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করিতে পারে না। এবং রাব্বিল আলামীনের কার্য্যও মুক্তভাবে সম্পন্ন করিয়া কেয়ামতের দিন 'লাব্বায়েক' বলিবার জন্য যে প্রস্তুত হইতে পারে না, আমার মনে হয়, ইহা সকলেই মনে প্রাণে অনুভব করিয়া থাকেন। ইহা জানা সত্ত্বেও অর্থকে এত তুচ্ছভাবে কেন আমার মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ দেখিয়া থাকেন এবং ইহার অপব্যয় করিয়া শয়তানের ভ্রাতার ন্যায় ধ্বংসের পথে যাইয়া অকৃতজ্ঞ হইয়া আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত হয়, তাহা আমার বুদ্ধির অগম্য। কোরানে বলিয়াছে, 'ইন্নাল মোয়াজ্জেরিনাকনু এখওয়ানুশ শয়তান অ কানা শয়তানা লেরব্বিহি কফুরা।' অর্থাৎ অপচয়কারী শয়তানের সঙ্গী এবং নিশ্চয় শয়তান অকৃতজ্ঞ। (সুরা বনি ইসরাইল আয়েত ২৭)। যে সকল পীর সাহেবেরা ইহকাল ও অর্থকে অতি হেয় ও তুচ্ছ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই সঙ্গে সঙ্গে বাকচাতুরীর দ্বারা সম্মোহিত করিয়া মূর্খ মুরিদগণের অর্থের বোঝা নিজস্কন্দে বহন করিতে অগ্রসর হইয়া আপনাদিগের বজরা ভাড়ার, জমিদারীর আয়তন বৃদ্ধির, প্রাসাদের উচ্চতার ও স্ত্রী সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। একবার মোহজাল ভেদ করিয়া ধর্ম্মের নামে এই অধর্ম্মের গ্লানি বুঝিবার জন্য একান্ত ভক্ত শিষ্যগণ চেষ্টা করিয়াও দেখেন না। আমরা আত্মবিশ্বাস হারাইয়া পারত্রিক সুখ সম্ভোগের আশায় এমনই মোহাচ্ছন্ন হইয়া আছি যে, এই সকল স্বার্থান্বেষী ভন্ড পীরসাহেবগণ দিনে দিনে পলে পলে জোঁকের ন্যায় যে আমাদের ইহাকালের সত্ত্বার

www.pathagar.com

সার বস্তু অর্থ শোষণ করিয়া আমাদিগকে হীন, নির্জীব এবং অপদার্থ করিয়া দিতেছে তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তাই দারিদ্র্য আমাদের নিত্য সহচর, নৈতিক উন্নতি আমাদিগের নিকট দুর্লভ বস্তু, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক শক্তি সঞ্চয়ে আমরা অপারগ। কিন্তু আমাদিগের এমন ভাবে নষ্ট হইয়া যাইবার কথা নয়। জগৎ সৃষ্টি গভীর অর্থময়। আমাদের শরীর ধারণেরও যে প্রয়োজনীয়তা আছে, এই কথা আমাদিগকে জানিতে হইবে এবং সকল প্রকার অবসাদ দূর করিয়া বীর বিক্রমে জীবনের জয় যাত্রায় অগ্রসর হইতে হইবে। বন্ধুর ভ্রম সঙ্কুল, প্রলোভনময়, পিচ্ছিল পথে চলিতে চলিতে শ্রান্ত হৃদয় যখন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে তখনও অন্ধকারে আলোর ন্যায় আশ্বাসের জ্যোতি হৃদয় ফলকে প্রতিফলিত হয়। হয়ত তখন কর্ণে ধ্বনিত হয় 'Awake, arise or forever be fallen' উঠ, জাগো, অথবা চিরতরে পদানত হইয়া থাক। ধর্ম্মের বিকৃত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিপথে চলিতে চলিতে, অবসাদ ও অবিশ্বাসে মন যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখনও কোরানের সত্যে বিশ্বাস না হারাইয়া আমাদিগকে জগৎ পাতার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদিগের কার্য্য দ্বারা, বাক্য দ্বারা, সর্ব্বভাবে কোরানের সত্যময় বাণীর অন্ত মহিমা জগতে প্রচার করিতে হইবে। তাহা না হইলে চিরতরে পদানত হইয়া থাকিতে হইবে।

অর্থনীতির প্রথম শিক্ষাই সংযম, কারণ চিত্ত সংযত না হইলে সঞ্চয় হয় না, এবং সঞ্চয় না হইলে মূলধনও হয় না, ও মূলধন ব্যতিরেকে জগতে সভ্যতা ও জ্ঞান বিস্তার সম্ভব হয় না, এবং মানুষ যে আল্লাহর খলিফা তাহাও সে উপলব্ধি করিতে পারে না। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, চিত্ত সংযমই জগতে প্রতিষ্ঠালাভের ও মানব সমাজের সভ্যতা বিস্তারে সর্ব্ব প্রথম সোপান। যদি আপনারা কোরান পাঠের পূর্ব্বে আউজুবিল্লাহ'র অর্থ একবার চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে জানিতে পারিবেন যে, কোরানের সর্ব্ব প্রথমেই অর্থনীতির এই মূলমন্ত্রটি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। তৎপর একবার সুরা ফাতেহা পাঠ করুন দেখিতে পাইবেন যে, আপনাকে কত বড় কার্য্যের জন্য কেয়ামতের দিন জওয়াবদিহি করিতে হইবে। আপনারা তাঁহার খলিফা হইয়া, বিশ্ব প্রতিপালকের জন্য, রাব্বিল আলামীনের বাঞ্ছিত কি কি কাজ করিয়াছেন, সেই চরম দিনে আপনাদিগকে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করা হইবে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে অন্ধ হইয়া পরকালের স্বপ্নে বিভোর হইয়া জগতের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান হারাইতে বসিয়াছি।

সেই হীন স্বার্থ ত্যাগ করিয়া আমাদিগের সমস্ত শক্তি জগৎ সেবায় নিয়োজিত করিতে হইবে। আমিও সৃষ্ট জীবের একজন, আমিও সমাজের একটা অঙ্গ এবং আমিও তাঁহার একজন খলিফা ; কাজেই সমাজ সেবার দ্বারা এককালে স্বকীয় ও পরকীয় মঙ্গল ও উন্নতি সাধন আমাকেই করিতে হইবে। এই পথ ভুলিলেই আমাদিগের জীবন বৃথা হইয়া যায়, এবং আমরা অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকি। সরল প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাকেই সেই সিরাতিল মোস্তাকিমে, অর্থাৎ সত্যপথে এইভাবে চলিতে হইবে।

www.pathagar.com

যদি আপনারা কোরানের লিখিত মা খালকাতুল জিন্না অল ইনসানা ইল্লালেয়াবুদুন' অর্থাৎ আমি মানবকে ও জীনকে বিশ্বের সেবা ব্যতীত আর কোনো কার্য্যের জন্য সৃষ্টি নাই, বিষয়টা একটু চিন্তা করেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, মানুষকে সেবা ব্যতীত অন্যকোন কার্য্যের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। খোদা যে আমাদের পূজা বা সেবার প্রত্যাশী নন, রোজা নামাজ ইত্যাদি অনুশাসন পালন করিয়াই আমরা খোদার তৃপ্তি সম্পাদন করিতেছি বলিয়া যে মনে করি, তাহা যে আমাদের ভুল ধারণা তাহা কোরানের সুরা ইখলাসে 'সামাদ' অর্থাৎ তাহার কিছুই আবশ্যক নাই কথার দ্বারাই আমাদিগকে বুঝায়া দেওয়া হইয়াছে। বিশ্বের সেবাই যদি আমাদিগের কর্ত্তব্য বলিয়া, কোরানের অনুশাসন ও খোদার আদেশ বলিয়া মনে করি, আমাদিগকে চিরদিন সেবা ধর্ম্মই পালন করিতে হইবে, এবং এই সেবার আদেশ ক্রমোন্নতিই মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ বলিয়া মনে করিতে হইবে। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও মুক্তি কামনার সাফল্য এই সেবা ধর্ম্মের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। তাই রসুল বলিয়াছেন 'সৈয়দুল কওম খাদমুহুম', অর্থাৎ যে জগৎ সেবক সেই জগত শ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার জন্য আমাদের প্রচুর অর্থের ও সম্পদের আবশ্যক। তাই সূরা কওছরে বলা হইয়াছে, 'ইন্না আতয়না কাল কওছর ফসল্লেলে রাব্বেকা অনহার', অর্থাৎ আমি তোমাকে প্রচুর দিয়াছি, কিন্তু তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, কোরবানী করা'। অর্থাৎ তোমার চিত্তবৃত্তিকে কোরবানী দাও। কোরবানী অর্থে তাহাই আদেশ করা হইয়াছে, কোনো প্রকার প্রাণী হত্যার কথা বলা হয় নাই। প্রবৃত্তির তাড়নায় চিত্তের যে বিক্ষোভ তাহা দমন করাই যথার্থ কোরবানী, এবং সেই কোরবানীর দ্বারাই মানবের ঐহিক সুখ, অর্থের সঞ্চয় ও মূলধনের সৃষ্টি সম্ভব হইয়া থাকে। একটা সাধারণ উদাহরণের দ্বারা এই উক্তির সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব। প্রতিদিন পান ও সিগারেটের দ্বারা আমার চিত্তের যে তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকি শুধু সেই আকাঙ্ক্ষাটুকু দমন করিলেই দেখিতে পারিবেন যে, প্রতিদিন অলক্ষ্যে যে ২/৪ আনা সঞ্চয় হয়, তাহাই কালে বিস্তৃত মূলধনের সৃষ্টি করিয়া আপনাকে ধন্য করিতে পারে কিনা। এই এক পান সিগারেটের ব্যয় কর্ত্তন করিয়া যে পয়সা সঞ্চয় হইতে পারে, তাহাই হয়ত একদিন নিজের অবস্থা বিপর্য্যয়ে নিজের দুরবস্থার অবলম্বন হইতে পারে, অথবা সমাজ সেবার শ্রেষ্ঠ উপাদান সৃষ্টি করিতে পারে।

এমনভাবে প্রতিদিন নিয়মমত সামান্য কোরবানী করিয়া কালে প্রকৃত খোদার খলিফার ন্যায় অতি বড় মহৎ কার্য্য করাও সম্ভব হয়, এবং শুদ্ধ মনে খোদার কাজ করিয়া একদিন প্রাণ ভরিয়া সরল অন্তঃকরণে 'আলহামদো' বলিতে সমর্থ হওয়া যায়, এবং ইহ জীবনেই ইসলামের পরম শান্তি উপলব্ধি করা যায়। আমি প্রত্যেক সিগারেটপায়ীকে এই অভ্যাস বন্ধ করিয়া কোরানের আদেশ অনুসারে কোরবানী করিয়া এবং হাতে একটু কাগজ পেন্সিল লইয়া একবার হিসাব করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলেই দেখিতে পাইবেন যে, প্রত্যেকের জীবনে কৃত বড় একটা সম্পদকে হেলায় নষ্ট করিয়া জীবনকে বিপথে লইয়া গিয়াছেন, এবং পরিণত বয়সে কত অশান্তি ভোগ করিয়াছেন। অতএব আমার একান্ত অনুরোধ যে, কোরানের বাণীর সত্যতা মনে প্রাণে অনুভব করিয়া, প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া যথার্থ আল্লাহর

www.pathagar.com

প্রতীক জগৎ পালকের প্রতিনিধিরূপে শান্তির সহিত জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া আপনারা মরণের পরপারে সেই সৃষ্টিকর্ত্তার সহিত আলিঙ্গন করিয়া চির শান্তি উপভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। কারণ সেই পরম শান্তির কথা উল্লেখ করিয়াই কোরানে বলিয়াছে, 'ইয়া আইয়োহাননাফছু মোত মাইনা ইয়ার জোয়ো ইলা রাব্বেকে মরদিয়াতুন বাদিয়া ফদখুলি ফি এবাদি অদ খুলি ফি জান্নাতি', অর্থাৎ হে আত্মা যে শান্তিতে আছ, তোমার সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট ফিরিয়া আইস নিজেও সন্তুষ্ট হইয়া এবং তাঁহাকেও সন্তুষ্ট করিয়া ; এইভাবে তুমি আমার প্রকৃত সেবকদিগের মধ্যে প্রবেশ লাভ কর এবং শান্তি উপভোগ কর। সুরা ফজর আয়েত ২৭, ২৮, ২৯ ও ৩০।

www.pathagar.com

ফিকাহ্‌র উদ্ভব ও পরিণতি

মোখতার আহমদ সিদ্দিকী

মোসলেম জগতে ফিকাহ বিষয়টির প্রতিপত্তির সামনে পাক আল্লাহ্ তাআলার পাক কালাম কোরান মজিদ ও হজরত রসুলোল্লাহর পবিত্রবাণী হাদিস শরীফ পর্য্যন্ত লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। মুসলমানগণ এখন আর ইহা চায় না যে, তাহাদের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে আল্লাহতায়ালা কি আদেশ উপদেশ দিয়াছেন বা আল্লাহর রসুলে করিম তাহার দৈনন্দিন কার্য্য কলাপ বা মুখনিঃসৃত মধুর হাদিসের দ্বারা কি আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। এখন তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য এই যে, প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে অমুক এমাম কি বলিয়াছেন, তাঁহার রায় কি ছিল, তিনি ইহা জায়েজ বলিয়াছেন কি, না-জায়েজ। সর্ব্ব সাধারণ অশিক্ষিত মুসলমান তো কোরান, হাদিস বা ফিকাহ এই সমস্তের পার্থক্যের জ্ঞান রাখে না, তাহাদের কথা কি বলা যায়, স্বয়ং আলেম ও ফকীহগণ পর্য্যন্ত কোরান ও হাদিসকে এখন আর আদর্শ ও দলিল বলিয়া গ্রহণ করেন না। কেবল কোরান ও হাদিস দিয়া কোন মস্‌লার সত্যতা বা অসত্যতা প্রমাণ করিলে বা ফতোয়া দিলে তাহা তাঁহাদের কাছে গৃহীত হয় না, যতক্ষণ না ফিকাহর দলিল দিয়া মসলা প্রমাণ করা হয়। তাঁহারা দেখিবেন মসলা সম্বন্ধে এমামদের কি মত আছে, আল্লাহর ও রসুলের মত দিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হন না।

মোসলেম জগতে স্থাপিত সহস্রাধিক মাদ্রাসা দিয়া যুগ যুগান্তর ধরিয়া প্রতি বৎসর লক্ষাধিক আলেম গঠন করা হয়, ঐগুলির মধ্যে শতকরা প্রায় ৯৫টিতে কোরান হাদিসের শিক্ষা মোটেই হয় না, কেবল ফিকাহর নানা রকম কেতাবের তালিম দিয়া আলেম, ফকীহ্ বা মৌলভী মওলানা গঠন করিয়া সমাজের কাণ্ডারীরূপে বাহির করা হয়। তাঁহারা কোরান হাদিসের শতাংশের একাংশ খবর পর্য্যন্ত রাখেন না। ফিকাহর মস্‌লা দিয়া তাঁহারা সমাজের শাসন রজ্জু কষিয়া সমাজ চালাইয়া থাকেন। বাকী যে সমস্ত মাদ্রাসাতে কোরানের তফসীর ও হাদিসের শিক্ষা হয়, তাহাও কোরান হাদিস দিয়া মসলা ঠিক করার উদ্দেশ্যে মোটেও নয়, বরং ফিকাহ প্রসূত মসলার উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া ও ফিকাহর মসলাকে মজবুত করার উদ্দেশ্যেই বটে। এবম্প্রকার মাদ্রাসা হইতে যে সমস্ত আলেম-ওলামা বাহির হন তাঁহারা ফিকাহ ব্যতীত অন্যকিছুকে (কোরান ও হাদিসকে) প্রমাণ বলিয়া গণনা করেন না। অতএব তফসীরের ও হাদিসের শিক্ষা তাঁহাদের পক্ষে তরকারীতে গরম মসালা দান বই কিছু নয়।

প্রকৃত বলিতে গেলে কোরানের অর্থ শিক্ষার অভাব কেরাতের মর্ম্ম ও ভাব না জানিয়া কোরানের কেবল শব্দ দিয়া নামাজ দোওয়া ইত্যাদির প্রচলন প্রভৃতি রোগের উৎস একমাত্র ফিকাহ ও তাহার ছড়াছড়ি বলিয়াই মনে হয়।

এখন এই ফিকাহ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হোক—ফিকাহ শব্দটি আরবী, ইহার অভিধানিক অর্থ 'জ্ঞান'। কিন্তু শরিয়তের ব্যবহার মতে একটি বিশেষ ধরনের জ্ঞানকেই ফিকাহ বলা

www.pathagar.com

হয় ; অর্থাৎ শরিয়ত সম্বন্ধীয় আদেশ নিষেধ ইত্যাদির জ্ঞানকেই ফিকাহ বলে এবং যাঁহারা এই জ্ঞান রাখেন তাঁহাদিগকে 'ফকীহ্' বলা হয়। কিন্তু আধুনিক ব্যবহার মতে শরিয়তের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানকে আবার 'ফিকাহ' বলা হয় না। কোরানের জ্ঞানকে, হাদিসের জ্ঞানকে 'ফিকাহ' নামে অভিহিত হয় না। কোরান, হাদিস, এজ্‌মা অর্থাৎ সর্ব্ববাদী মত এই তিনটিকে আদর্শ ধরিয়া কেয়াস করিয়া যে সমস্ত মসলা বহির করা হইয়াছে, আজকাল তাহাই কেবল ফিকাহ। মুসলমানী আইনের নামই ফিকাহ। স্থূলভাবে এই বলিলেই যথেষ্ট হয় এবং সাধারণ কথায় ইহাকে শরিয়ত বলা হয়।

এখন দেখিতে হয় যে এই ফিকাহ এর উৎপত্তি কোথায়, কখন ও কিভাবে হইয়াছিল।

পূর্ব্বোল্লেখ মতে মুসলমানী আইনকে যখন ফিকাহ বলা হয়, মোসলেম রাজত্ব গঠনের সঙ্গে সঙ্গে যে ফিকাহর প্রচলন হইয়াছিল, ইহা পরিষ্কার বুঝা যায়। এবং এই মোসলেম রাজত্বের প্রসারের ও শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই ফিকাহরও প্রসার ও উন্নতি হইতে থাকে। কিন্তু ইহার উৎপত্তি পূর্ব্বাপর এক জিনিষ ছিল না। হযরত রসূলুল্লাহ যখন ইসলামের আলো দিয়া আরব ভূমি আলোকিত করেন এবং মোসলেম রাজত্বের সূত্রপাত হয়, তাঁহার মদিনা বাসের দশ বৎসর কাল তিনিই একমাত্র রাজা ও রাজ্য শাসনার্থ তিনিই আইনজ্ঞ বা ফকীহ্ ছিলেন বলিতে হয়। মহারাজাধিরাজ আল্লাহ্ তালার রাজ্যে আল্লাহ তালার আইনই একমাত্র আইন ছিল। হজরত তাঁহার উম্তগণের ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় ও সাংসারিক দুরূহ ব্যাপারাদিতে আল্লাহতায়ালার আদেশের ও আইনের অপেক্ষা করিতেন এবং ফেরেশতা প্রবীণ হজরত জিবরাইল কর্তৃক অবতীর্ণ আদেশ লইয়াই ঐ সমস্তের মীমাংসা করিতেন। অতএব তাঁহার সময়ে কোরানের আইনই মোসলমানদের আইন বা ফিকাহ্ ছিল। সাধারণ বিষয়াদিতে হজরত তথা প্রচলিত প্রথানুযায়ী নিরপেক্ষভাবে বিচার মীমাংসা করিয়া লইতেন। সাহাবীগণ তাঁহার সময়ে তাঁহার কার্য্য-ক্রিয়াদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবলোকন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে বিশেষ তৎপর ছিলেন।

কিন্তু হজরতের পর তাঁহার সাহাবীগণের সময়ে ফিকাহর মূল উৎপত্তি অর্থাৎ মুসলমানী আইন কেবল আল্লাহর আইন বা কোরান রহিল না। কোরান ও হাদিস উভয়টি এখন ফিকাহর মূল হইয়া দাঁড়ায়। হজরতের খোলাফায়ে রাশেদিনগণ প্রত্যেক মীমাংসা উপযোগী বিষয়াদিতে প্রথমতঃ কোরানের দিকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহর আইন অনুযায়ী মীমাংসা করিতেন। এবং যে ক্ষেত্রে কোরানের মীমাংসা পরিষ্কার হইবে না বুঝিতেন, হজরতের সুন্নত অর্থাৎ আদর্শ ক্রিয়া কলাপ ও তাঁহার হাদিস মতে মীমাংসা করিয়া দিতেন, যাহা তাঁহার হাদিস মতে মীমাংসা করিয়া দিতেন, যাহা তাহারা নিজে জানিতেন বা সমসাময়িক অহরহ সঙ্গী সাহাবীগণ হইতে জানিয়া লইতে পারিতেন। এবং যে সমস্ত বিষয়াদির মীমাংসাতে কোরান ও হাদিসের ব্যাখ্যাও অসম্পূর্ণ বিবেচিত হইত, তজ্জন্য পাঁচজনের অধিক সাহাবীর পরামর্শ লইয়া মীমাংসা করার নিয়মও ছিল।

হজরতের সময়ে মোসলেম রাজ্য আরব্য ভূমির বাহিরে প্রসার পাইয়াছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় খলিফা গাজী হজরত ওমরের সময় পর্য্যন্ত হজরতের এন্তেকালের ১২ বৎসরের মধ্যে দামাস্কাস রাজ্য সম্পূর্ণ সিরিয়া দেশ ও মেসোপোটামিয়া এবং পশ্চিমে মিশর রাজ্য

www.pathagar.com

মোসলেম রাজ্যে পরিণত হয়। হজরতের সাহাবীগণের মধ্যে প্রায় লোক বিভিন্ন রাজ্যের শাসন-কর্ত্তারূপে বিরাজ করিতে থাকেন। তাঁহারা হজরতের জীবদ্দশায় হজরতের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া হজরত হইতে ফিকাহ্ শিক্ষা পাইয়াছিলেন ও সেমতে স্ব স্ব রাজ্যের শাসন নিজ জানা আইন অনুযায়ী চালাইতেন। যে ক্ষেত্রে কোরানের আদেশ অনুযায়ী কাজ হইত তাহা কোরান মতে এবং সেখানে তাঁহার জানা সুন্নত ও হাদিস মতে কাজ হইত, ঐ বিষয়াদির মীমাংসা সেমতে সমাধা করিতেন। কোরান ও হাদিসের অনুরূপ কাজ না হইলে নিজ বিবেক অনুযায়ী বিচার করিয়া দিতেন। ইহাতে সকল রাজ্যে যে সমভাবের মীমাংসা হইত না কোন সন্দেহ নাই। একজনার বিবেক মতে যে সকলের বিবেক হইবে না ইহা স্বাভাবিক। অতএব বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের আইন বা ফিকাহ চলিত বলিতে হয়। কিন্তু তাহাতে আজকালকার ন্যায় পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ ও বীতশ্রদ্ধার যুগেও কারণ হইত না। কেননা হজরতের অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী শ্রেষ্ঠ যুগেও তাঁহার আদর্শ সংসর্গ প্রভাবে মুসলমানগণের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্বভাবের স্রোত এত প্রখর ছিল যে, সহজে একের প্রতি অন্যের বিদ্বেষ ভাব স্থান পাইতে পারিত না। তাঁহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাবসমূহ জাগরিত ছিল বলিয়া বিদ্বেষের বীজ তাঁহাদের অন্তর্ভূমিতে দখল পাইত না। কাজেই প্রত্যেকে যাহা সত্য সনাতন ও ইসলামের আদর্শ বলিয়া বুঝিতেন সেমতে ব্যবহার করিতেন। দ্বিতীয়তঃ সাহাবীগণ সকলেই ইহা মনে করিতেন যে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই হজরতের শিষ্য, কেহ কাহারও উপর আধিপত্য করার ক্ষমতা রাখে নাই, যিনি যাহা করেন তাঁহার জানা ফিকাহ অনুযায়ী করিয়া থাকেন, অতএব সংঘর্ষ ও বিদ্বেষ এক্ষেত্রে স্থান পাইতে পারে না। এবং তৃতীয়তঃ এক দেশে যাহা ঘটিত ও চলিত অন্য দেশে সহজে তাহা অবগত হওয়ার সুবিধাও ছিল না। কাজেই বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ ফিকাহর প্রচলন বিনা বাধায় হইত।

ইহাও দেখা যায় যে, ফিকাহর ইত্যাকার বিভিন্ন রীতি হিজরী প্রায় দুই শতাব্দী পর্য্যন্তও ছিল। খলিফা হারুনর রশীদ যখন বাগদাদ হইতে মক্কা শরীফে হজ করিতে যান মদিনাতে ইমাম মালেকের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়। ইমাম মালেক তখন মদিনাতে তাঁহার ফিকাহ জারী করিতেছিলেন। ইমাম সাহেব খলিফাকে তাঁহার প্রণীত কেতাব 'আল মোয়াত্ত্বা' দেখান। খলিফা এই কেতাব দেখিয়া এত অধিক প্রীত হন যে, তিনি এই কেতাবকে কাবা শরীফের দরজায় লটকাইয়া দেওয়া ও সমস্ত মোসলেম রাজ্যে এই কেতাবের মতে শরিয়তের বিধান চলা উচিত মনে করেন, এবং খলিফা তাঁহার এই ইচ্ছা ইমাম সাহেবের কাছে প্রকাশ করেন। কিন্তু ইমাম সাহেব খলিফাকে তাহা করিতে নিষেধ করেন ও বলেন যে, হজরতের সাহাবীগণের নানা জন নানা দেশে ইসলাম ধর্ম্ম বিস্তার ও প্রচার করিয়া স্ব স্ব স্থানে স্ব স্ব মতে ইসলাম জারী করিয়াছেন। ঐ সমস্ত স্থানে এখন পুনরায় এক রকমের শরিয়ত করিতে গেলে নানা রূপ গোলমালের সৃষ্টি হইতে পারে। অতএব খলিফা তাঁহার কথা মানিয়া তাহা করিলেন না। এই খলিফার রাজত্বকাল হিজরী ২য় শতাব্দীর শেষ ভাগেই ছিল।

ইহাও জানা যায় যে, খলিফা হজরত ওমরের সময়কাল পর্য্যন্ত মোসলেম রাজ্যে বা মোসলেম রাজ্য সম্পর্কে মুসলমানগণের মধ্যে পরস্পর কোন বিদ্বেষভাব আসিয়া ছিল না কিন্তু তৎপর তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের সময়ে খেলাফত প্রসঙ্গ লইয়া

www.pathagar.com

মোসলমানগণের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় এবং ক্রমে হজরত মোআবিয়ার সময়ে ইহা বৃদ্ধি পাইতে থাকিয়া উম্মীয় বংশীয় খলিফাগণের শেষ পর্য্যন্ত ইসলাম রাজত্বে ধর্ম্ম-ভাবের বিশৃঙ্খলা ঘনীভূত হইতে থাকে। এই সময়টি ইসলামের জন্য একটি মহা পরীক্ষার কাল ছিল। উম্মীয় খলিফাগণ নিজকে রাজ্যের অধিপতি বলিয়া বুঝিতেন। মোসলেম রাজ্যের খলিফা হওয়ার ভাব তাঁহাদের অন্তরে ছিল না। এই সময় ফিকাহ লইয়া বেশী কিছু বাড়াবাড়ি হয় নাই কিন্তু ফিকাহর মর্য্যাদা একরূপ সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। খলিফাগণ যাহার যেরূপ ইচ্ছা শাসন পরিচালনা করেন, কোরান হাদিসের সঙ্গে সম্বন্ধ খুব কমই রাখেন। সময় ও সুযোগ বুঝিয়া তাঁহারা ইচ্ছামত হাদিস গড়িয়া বা গড়াইয়া লইতেও ত্রুটি করিতেন না। এইরূপে কত হাজার হাজার জাল ও মিথ্যা হাদিসের যে উৎপত্তি হয় তাহার সংখ্যা ছিল না। এই উম্মীয় বংশীয় খলিফাগণের মধ্যে একমাত্র খলিফা ওমর বিন আবদুল আজীজ ছাড়া সকলেই এই কলঙ্কে কলঙ্কিত ছিলেন। কথিত আছে এই সময়ে ইবনে আবিল আওজা নামে এক ব্যক্তি নিজে স্বীকার করিয়াছিল যে, সে নিজে ৪০০০ (চারি হাজার) হাদিসের প্রচার করে যাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও জাল। আব্বাসীয় খলিফাদের সময়ে হিজরী ১৫৫ সনে এই দোষের জন্য তাহার শিরচ্ছেদ হয়। এই উম্মীয় বংশীয়দের সময়ে শিয়া, মোতাজেলা ও খারেজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয় ও এক আল্লাহ্‌, এক কোরান, এক রসুল ও এক ইসলামের অনুসরণকারী মুসলমানগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বহ্নি জ্বলিয়া উঠে, ও ইসলামের সুরম্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত ঘর সাম্প্রদায়িক আগুনে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে আরম্ভ করে। ধর্ম্মহীনতার দ্বারা মোসলেম সমাজ আক্রান্ত দেখিয়া এই সময় হইতে সুফিয়া সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়। এইরূপে নানাভাবে পবিত্র ইসলামের্‌ পরীক্ষা চলিতে থাকে।

হিজরী ৪১ সন হইতে ১৩১ সন পর্য্যন্ত উম্মীয় বংশীয় খলিফাগণ রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে ফিকাহর প্রচলন যদিও রাজকীয় সরকার হইতে ছিল না বা নাম মাত্র ছিল কিন্তু যেখানে ফিকাহর নিয়মে বিচার হইত তাহা কোরান, হাদিস ও সাহাবীগণের সম্মতিসূচক নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করিয়াই হইত। আইনের জন্য বিধিবন্ধন কিছু ছিল না, আইন বইরূপে কোন বই ছিল বলিয়াও মনে হয় না। তবে কোরান ও হাদিসের উক্তিগুলি তাঁহাদের আইনের কাজ করিত। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এই সময় পূর্ণ মাত্রায় বিরাজ করিত বটে কিন্তু রাজ্য বিস্তৃতির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে নাই। রাজ্যের বিস্তৃতি, শাসনের বিশৃঙ্খলা ও সাম্প্রদায়িক বিরোধ সমস্তটি অস্বাভাবিক রূপে বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তবে ৭০ হিজরী পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃতি যেরূপ দ্রুতভাবে চলিয়াছিল, তৎপর হইতে তাহা কমিয়া আসে।

উম্মীয় বংশীয়দের পর যখন আব্বাসীয় বংশীয়গণ রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন তাঁহাদের সময়ে রাজ্য বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্খলা ও সুশাসনের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়। এবং ইসলামিক নিয়মে আইন প্রণয়ন, মুফতি নিয়োগ ইত্যাদি কার্য্যের সূচনা হয়। বর্ত্তমান সময়কার ফিকাহ এই সময়ই আরম্ভ হয়।

ইমাম আবু হানিফা যাহাকে বড় ইমাম (ইমাম আজম) বলিয়া স্মরণ করা হয়, হিজরী ৮০ সনে জন্মগ্রহন করিয়া হিজরী ১৫০ সনে ৭০ বৎসর বয়সে এন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

উম্মীয় খলিফাগণের সময় হইতে তিনি ধর্ম্মাবিদ্যালোচনাতে নিবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মপরয়ণতার ও অগাধ বিদ্যার তুলনা ইসলাম ধর্ম্ম জগতে ছিল না ও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাইয়া দুইবার তাঁহাকে রাজকীয় কোর্টের বিচার নিষ্পত্তির জন্য কাজীউন কোজ্জাতের পদে আহ্বান করা হয়। প্রথমবার উম্মীয় বংশীয় খলিফা মরিওয়ানে হেমারের নিযুক্ত কুফা রাজ্যের শাসন কর্ত্তা এজিদ বিন ওমর তাঁহাকে আহ্বান করেন, এবং দ্বিতীয়বার আব্বাসীয় খলিফা মনসুর দাওয়ানেকী কর্ত্তৃক আহূত হন। কিন্তু তিনি উভয় বারই এই দুরূহ ব্যাপার সমাধা করা অস্বীকার করিয়া রাজকীয় আদেশ অমান্যতার দোষে কঠোর শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য হন।

উম্মীয় রাজগণের সময় হইতে কৃত্রিম হাদিসের ছড়াছড়িও অনৈসলামিক ফিকাহর প্রচলন দেখিয়া ফিকাহ বিষয়টিকে যথারীতি কোরান ও সত্য হাদিসের উপর ভিত্তি করিয়া প্রণয়ন করার আবশ্যকতা তিনিই সর্ব্বপ্রথমে অনুভব করেন, ও এই উদ্দেশ্যে তাঁহার যথা শক্তি প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। কোরান, হাদিস এজমা (সর্ব্ববাদীমত) কেয়াস (মৌলিক বিষয়ের উপর নির্ভর করিয়া আর একটি বিষয় বাহির করা) ও রায় (ধীর বিবেকপ্রসূত মত) এই কয়েকটিকে মূল সূত্র ধরিয়া তিনি বর্ত্তমান ফিকাহর সূচনা করেন। ফিকাহর জন্য তাঁহার নিজ প্রণীত কোন কেতাব আছে বলিয়া দোখা যায় না। ফিকাহ আকবর নামে একটি কেতাব তাঁহার প্রণীত বলিয়া প্রকাশ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই কেতাবটি তাঁহার শিষ্য আবুমুতি তাঁহার খসড়াগুলি জমা করিয়া তাঁহার নামে প্রচার করেন। 'অছিয়ত' ও 'মকসুদ' নামে আরো দুইটি কেতাব তাঁহার বলিয়া প্রকাশ আছে মাত্র, বর্ত্তমান যুগে এগুলির প্রচলন লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। ইমাম সাহেবের শিষ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক তাঁহার ফিকাহ প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধি লাভ করে কিন্তু, তাঁহার অতুলনীয় ধর্ম্মনিষ্ঠা ধার্ম্মিকতার গুণে তিনি অত্যন্ত অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামেই ফিকার পরিচয় হয়। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ কুফার কাজী ছিলেন। তিনি রাজকীয় পদমর্য্যাদার সুযোগে হানাফী ফিকাহকে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার সুবিধা পাইয়াছিলেন, কথিত আছে ইমাম আবু হানিফা তাঁহার শিষ্যগণকে ফিকাহ শিক্ষা দিতেন, এবং তাঁহাদিগকে লইয়া সর্ব্বদা ফিকাহ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। শিষ্যগণের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মোহাম্মদ শয়বানী ও ইমাম জাফর প্রভৃতি বিশেষতর প্রসিদ্ধ। শিষ্যগণ পরস্পর ফিকাহ লইয়া তর্ক করিতেন ও তিনি তাহা মীমাংসা করিয়া দিতেন। কোন কোন সময় শিষ্যগণ তাঁহার মতের উপরও তর্ক করিতেন।

যে সময়ে ইমাম আবু হানিফা বাগদাদের মধ্যে ফিকাহ প্রচলন করেন প্রায় ঐ সময়েই বা তাহার কিছু কাল পরে মদিনা নগরীতে ইমাম মালেক ইবনে আনস কোরান হাদিস ও এজমাকে মূল সূত্র ধরিয়া তাহার ফিকাহ্ প্রচার আরম্ভ করেন। ইমাম মালেকের ফিকাহও ইমাম আবু হানিফার ফিকাহর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল। ইমাম আবু হানিফা সন্দেহজনক হাদিস হইতে 'রায়' কে (লুবিচাকে) প্রবলতা দিতেন ও 'রায়' মতে মসলার মীমাংসা করিতেন। কিন্তু ইমাম মালেক সাহেব 'রায়'কে অগ্রাহ্য করিতেন এবং হাদিস গ্রহণ করার, যদিও তাহা একজন মাত্র রাবী হইতেও পাওয়া যায়, পক্ষপাতী ছিলেন। তখন মদিনাবাসিগণ

www.pathagar.com

ইমাম মালেকের ফিকাহ মতে ও কুফীর ও বাগদাদীয়গণ হানফী মতে চলিতে থাকেন। হিজরী ১৭৯ সনে ইমাম মালেক সাহেব মদিনাতে পরলোক গমন করেন।

ইমাম হজরত আবু হানিফা ও ইমাম মালেক সাহেব যখন তাঁহাদের নিজ নিজ ফিকাহ প্রবর্ত্তনে লিপ্ত থাকেন, তখন আরো কয়েকজন এরূপ ফিকাহ প্রবর্ত্তন কাজে মনোযোগ দেন। তাঁহাদের মধ্যে আল আওজাই ও সুফিয়ান সুরী এই জনের নামই প্রসিদ্ধ। আল আওজাই ১৫৭ হিজরীতে ও সুফিয়ান সুরী ১৬১ হিজরীতে প্রাণ ত্যাগ করেন।

উপরোক্ত ইমামগণের প্রবর্ত্তিত ফিকাহ পরস্পর যথেষ্ট পৃথক হইলেও পরস্পরের মধ্যে এতদিন বেশী কিছু সংঘর্ষ হয় নাই। কিন্তু ইমাম মালেকের এন্তেকালের কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে মোসলমানের মধ্যে কিছু কিছু সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। মালেকিয়া ও আওজাইয়াগণ ইমাম আবু হানিফার ফিকাহকে বেদাতী ফিকাহ ও ইমাম আবু হানিফাকে বেদাতী বলিয়া প্রচার করার কথা শুনা যায়। কেননা তিনি নিজ মতকে (রায়কে) হাদিসের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার ফিকাহর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই কানাকানি এতদিন তত অধিক প্রবল হয় নাই, কিন্তু পরিশেষে যখন ইমাম আর আবদুল্লা আল শাফেরী প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি হানফী, মালেকী, আওজাই প্রভৃতি ফিকাহগুলির উপর সন্তুষ্ট না হইয়া ফিকাহর জন্য নিজে মাঝামাঝিভাবে এক নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন ও সে মতে তাঁহার ফিকাহ প্রতিষ্ঠা আরম্ভ করিয়া দেন। ইমাম আবু হানিফার মৃত্যুর বৎসরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪০ হিজরীতে ৫৪ বৎসর বয়সে তাঁহার এন্তেকাল হয়। ক্রমে তাঁহার ফিকাহও যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকে। তিনি ইমাম আবু হানিফার শিষ্য মোহাম্মদ হইতেও ফিকাহ শিক্ষা পাইয়াছিলেন।

মোসলেম রাজ্যে এই সময় নানা রকম ফিকাহ লইয়া ঘোর বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। কিছু দিন পরে ইমাম আহমদ বিন মোহাম্মদ বিন হাম্বল শয়বানী ফিকাহ প্রবর্ত্তকের আবির্ভাব হয়। তিনি খলিফা মাহদী ইবনে মনসুরের সময়ে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৭৭ বৎসর বয়সে হিজরী ২৪১ সনে খলিফা আল মোতা-ওয়াক্কেলের সময়ে বাগদাদেই এন্তেকাল করেন। ইমাম আহমদ হায়ন শাফেরীর নিকট ফিকাহ শিক্ষা করিয়া প্রথমাবস্থায় শাফেরী ফিকাহ মতে চলিতেন, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে শাফেয়িরা ফিকাতে সন্তুষ্ট না হইয়া নিজে ফিকাহ প্রবর্ত্তনে মনোযোগ দেন।

মোসলেম রাজ্যে এত রকমের ফিকাহ বাহির হওয়ার ও একজনার ফিকাহর উপর অন্যজন সন্তুষ্ট না হইয়া পৃথক ধরনের ফিকাহ প্রতিষ্ঠা দেওয়ার মুখ্য কারণ কৃত্রিম অকৃত্রিম হাদিসের ছড়াছড়িই বলিতে হয়। বনী উম্মীয়দের সময়ে যে হাজার হাজার কৃত্রিম হাদিস বাহির হইয়াছিল, এই সমস্ত হাদিস হইতে ঠিক ও সত্য হাদিস বাহির করিয়া মসলা নির্দ্ধারণ করিতে ইমামগণ একমত হইতে পারেন নাই যে হাদিস একজনের কাছে সত্য বলিয়া বোধ হয় অন্যজন তাহাতে সন্দেহ করেন। হাদিস লইয়া এরূপ মতভেদ হওয়াও যথেষ্ট স্বাভাবিক ছিল। কেননা প্রথমতঃ হাদিসের জন্য পুস্তকাকারে কিছু ছিল না। রসুলুল্লাহর সাহাবীগণ রসুলুল্লাহ হইতে যাহা শুনিতেন ও তাঁহাকে যাহা করিতে দেখিতেন, তাহা তাঁহারা যথারীতি লিপিবদ্ধ করিতেন না। কেবল মনে রাখিতেন বা কোন কোন বিষয় খসড়াভাবে কাগজে

www.pathagar.com

লিখিয়া রাখিতেন। আর যে সময় হাদিস জমা করার ও নির্ব্বাচন করার খেয়াল মোসলমানদের অন্তরে জাগে, তাহাও হযরত রসুলুল্লাহর দেহত্যাগের অন্যূন শতাধিক বৎসর পরে। সাহাবীগণের মধ্যে তখন খুব কম লোকই জীবিত থাকেন। তাঁহাদের সন্তান–সন্ততিগণ হইতে শুনিয়া শুনিয়া বহু সহস্র হাদিস জমা করা হয়। ইমাম মালেক সাহেবের 'আল মোওয়াত্তা' হাদিসের প্রথম কেতাব। ইহাও প্রায় দেড় শত বৎসরের পরে বলিতে হয়। প্রায় লক্ষাধিক হাদিস হইতে নির্ব্বাচন করিয়া মাত্র ৩০০০ তিন হাজার হাদিসের উপর এবং কোরানের প্রায় ৬৬০০ (ছয় হাজার) ছয়শত আয়েত হইতে মাত্র ৫০০ পাঁচ শত আয়াতের উপর ভিত্তি করিয়া ইমামগণ ফিকাহ বা মোসলমানী আইন গঠন করেন। এরূপ ক্ষেত্রে মতভেদ হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। সত্য ও জাল হাদিসের নির্ব্বাচনের নিমিত্ত কত যে পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। এস্‌নাদ ও আসমায়ে রেজাল অর্থাৎ হাদিস যাঁহারা বলিয়াছিলেন তাহাদের নাম ও তাহাদের পরম্পরায় ক্রমিক পরিচয় ইত্যাদি লইয়া কত খাটুনী যে খাটিয়াছেন তাহা আশ্চর্য্যজনক ব্যাপারই বটে। কিন্তু এসমস্ত লইয়া অধিকতর পরিশ্রম ইমামগণের ফিকাহ প্রবর্ত্তনের অনেক পরেই লইয়াছিল।

উপরোক্ত ইমাম সাহেবগণ যদিও এত কিছু করিয়া ফিকাহ গড়িয়াছিলেন তাঁহাদের ফিকাহ অনুযায়ী চলা কোন মুসলমানের পক্ষে তখন বাধ্যতামূলক ছিল না। যাহার যেরূপ ইচ্ছা কোরান হাদিসের অধীন হইয়া সেমতে চলিতেন। হিজরী ৪ঠা শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট কোন মজহাবেও সৃষ্টি হয় নাই এবং নির্দ্দিষ্ট মজহাবীয় কোন কথাও ইতিপূর্ব্বে মুসলমানের মনে আসে নাই।

হিজরী ৪ঠা শতাব্দীর পর যখন চেঙ্গিজখানী অত্যাচারে মোসলেম রাজ্য ছারখার হইয়া পড়ে, ধর্ম্ম ও শাসন ব্যাপারে যথেচ্ছরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় তখন যাহার যেমত ইচ্ছা ধর্ম্মমত প্রকাশ করিয়া চলিতে আরম্ভ করে সেই সময়ই নির্দ্দিষ্ট মজহাবের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ব্বোক্ত ইমামগণের ফিকাহগুলির মধ্যে হানাফী শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী এই চারি রকমের ফিকাহকে অধিকতর মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেবল এই চারি মজহাবকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লওয়া হয়।

প্রথম হইতেই নির্দ্দিষ্ট কোন মজহাব মতে চলা যদিও অনাবশ্যক ও অনেকে বেদাত বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু ইহার কারণে অনেক সুফল ফলিয়াছে বলিতে হয়। যদি এই চারিটি মজহাবকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া না দেওয়া হইত, আজ পর্য্যন্ত দশটি মোসলমান একমত হইয়া এক জমাতে নামাজ পড়িতেন কিনা বলা যায় না। ধর্ম্মের মধ্যে স্বাধীনতা আছে বটে কিন্তু অশিক্ষিত সাধারণের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া গেলে তাহার কুফল সুনিশ্চিত।

আমার এই প্রবন্ধ ইতিহাস নয়। ফিকাহ সম্বন্ধে আলোচনা কালে ঐতিহাসিক ধারা রাখা হইয়াছে মাত্র। প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ হয়। ভয়ে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করিতে সাহসী হইলাম না।

এখন এই ফিকাহ্‌র প্রভাব ও ধর্ম্মের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ লইয়া দুই চারিটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

www.pathagar.com

উপরোক্ত বিষয়াদি হইতে এই দেখা গেল যে, যে ফিকাহ্‌কে প্রথম অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার ও তাঁহার রসুলের নিরূপিত আইনমতে চলার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র বান্দাগণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়। পরে পরে মোসলেম রাজ্যের শাসন উদ্দেশ্যে আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের আইনগুলির উপর ভিত্তি করিয়া কেয়াস ও রায় দিয়া তাহার পুনর্গঠন করা হয় এবং প্রায় বিষয়াদিতে অর্থাৎ এবাদতে ও মোআমলাতে ফিকাহ প্রতিষ্ঠাতাগণ একমত হইতে না পারিয়া ভিন্নমত পোষণ করিতে বাধ্য হল। এমতাবস্থায় কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মত যে ধ্রুব সত্য ও অভ্রান্ত ইহা কেহ বলিতে পারে না। বিশেষতঃ স্বয়ং ইমাম সাহেবগণও বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নয়, তাঁহারা ভুল করিতে পারেন ....
দ্বিতীয়তঃ রাজার আইন রাজ্য শাসনের উদ্দেশ্যেই হইয়া থাকে। তাহা বাহ্যিক ক্রিয়া ও কথার উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তুত করা হয়। অন্তরের সঙ্গে রাজার আইনের সংস্রব থাকে না। বাহ্যিক যাহা দেখা হয় ও যাহা মুখে প্রকাশ করা হয়, তাহার উপরই দোষগুণের বিচার মীমাংসা করিয়া লওয়া রাজকীয় আইনের কর্ত্তব্য। রাজকীয় আইনের বিচার অন্তরের সঙ্গে কখনো হয় না। অন্তরের ও অন্তরের ভাব কেবল সে জানে ও তাহার অন্তর্য্যামী আল্লাহ্ তাআলা জানেন।

এহেন অবস্থায় বর্ত্তমানকালীন ফিকাহ বা মোসলমানী আইন কেবল মোআমলতে অর্থাৎ সাংসরিক ব্যাপারেই খাটে ও শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। দীনিয়াত অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে ফিকাহ হুকুম পুরাভাবে খাটিতে ও শুদ্ধ হইতে পারে না। কেননা দীনিয়াতের বিচারক স্বয়ং আল্লাহতালা ছাড়া অন্য কেহ হইতে পারে না। তিনি অন্তর্য্যামী, অন্তরের খবর তিনি রাখেন ও অন্তরের অবস্থা লইয়াই তিনি দিনীয়াতের বিচার করেন। اتى الله بقلب لم لا نفم ما لو لا بنو الامن বান্দা যাহা মুখে বলে বা কাজে করে, তাহা তাহার অন্তর হইতে বলে বা করে কিনা ইহাই আল্লাহর লক্ষ্য। কাজেই আলেমগণ আমার নামাজ দোওয়া শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ফতোয়া দিলেও আল্লাহর কাছে তাহা শুদ্ধ ও গৃহীত হইবে বলিয়া ঠিক বলা যায় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি নিজে না বুঝিয়াছি যে, আমি যাহা করিয়াছি, আমার অন্তর হইতে আল্লাহর জন্যই করিয়াছি। যদি আমি আল্লাহর জন্য নামাজ না পড়িয়া বান্দাগণকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ি, নামাজকে হাজার শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে আদায় করিলেও আল্লাহর কাছে তাহার পুরস্কার তো পাইবে না বরং তিরস্কার পাওয়ার আশঙ্কাও আছে, অথচ আলেম সাহেব আমার নামাজ দেখিয়া নামাজ শুদ্ধ ও সুন্দর হইয়াছে বলিয়া ফতোয়া দিবেন, এই ফতোয়া কি কখনো শুদ্ধ হইতে পারে? আরও দেখুন, মুসলমান রাজার দেশে বা মুসলমান সমাজে থাকিয়া নামাজ না পড়িলে রাজার বা সমাজের আইন হতে শাস্তি হইবে। যদি কেহ কেবল এই ভয়ে রাজাকে বা সমাজকে সন্তুষ্ট করার জন্য নামাজ পড়ে, আল্লাহর ওয়াস্তে যদি সে নামাজ না পড়ে, রাজার মুফ্‌তি ও সমাজের আলেম তাহার নামাজ শুদ্ধ ঠিক হইয়াছে বলিয়া তো ফতোয়া দিবেন, কিন্তু আল্লাহর কাছে কি এরূপ নামাজের কোন মূল্য আছে?

www.pathagar.com

অতএব নামাজ দোওয়া ইত্যাদি যত সমস্ত এবাদত বান্দা করিবেন তাহার প্রকৃত বিচারক আল্লাহকে জানিয়া অন্তর হইতে ঐ সমস্ত করা সঙ্গত বরং আবশ্যক। এবাদত বিষয়ে আলেমের ফতোয়ার ও হুকুমের উপর নিশ্চিন্ত থাকিবেন না, নিজে ও অন্তরের মধ্যে শুদ্ধ অশুদ্ধ বিচার করা কর্ত্তব্য। অন্যথায় নিস্তারের আশা কম। কিন্তু ইহাও দেখিতে হয় যে, ফিকাহ ছাড়া আমাদের এখন গতান্তর নাই ..... খায়রুল কুরূন অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ইসলামিক যুগ হইতে আমরা এখন এত দূরে পড়িয়া গিয়াছি সে ফিকাহ ছাড়া কেবল কোরান ও হাদিস দিয়া আমাদের লাখের মধ্যে একটি জনও যে ঠিক মোসলমানী মতে চলিতে পারিবে তাহা বিশ্বাস করা যায় না। তবে অন্ততঃপক্ষে ফিকাহর একবার পুনরালোচনা আবশ্যক যাহাতে অনৈসলামিক গোড়ামী বিষয়গুলির সংশোধন হয়।

www.pathagar.com

চলার কথা

আকবর উদ্দীন বি.এ.

কিছুদিন অবধি একটা প্রশ্ন আমার মনে উদয় হচ্ছে। প্রশ্নটা এই—মুসলিম সম্প্রদায়ের সত্যিকারের এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্য তারা রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে, সমাজে এক কথায় সভ্যতার নানাদিকে স্বতন্ত্র আসন দাবী করতে চায়?

মনে হয়, এইটাই সব চাইতে বড় সমস্যা এবং এর সমাধানের উপর ভবিষ্যতের অনেকখানি নির্ভর করছে।

এ-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে, জানি; কেহ বলেন, এ মুসলমানদের আবদার বৈ আর কিছু নয়।

কেহবা বলেন, এ আবদার নয়, এটা দরকার নিজকে গড়ে তোলবার জন্য।

আমার কিন্তু মনে হয়, গোড়ার প্রশ্নটা আমরা রঙ্গিন চমশা পরে হয়ত বা নিজেদের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতার জন্য উল্টো করে দেখছি। বর্ত্তমানে আমরা সব বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য দাবী করছি; বলছি, এ স্বাতন্ত্র্য যদি না পাই তাহলে আমাদের অস্তিত্বই থাকবে না। অর্থাৎ, এটা হচ্ছে ভয়ের দাবী। যেন আমাদের হৃদরোগ হয়েছে মরতে বসেছি, সুতরাং, কোলাহল ধুলোবালির দেশ থেকে আমরা ফাঁকায় যেতে চাই।

অথচ, বাস্তবিক ব্যাপারটা হওয়া উচিত ছিল ঠিক উল্টো। অর্থাৎ আমাদের স্বাতন্ত্র্য দাবী করবার কোন প্রয়োজন ছিল না; বরঞ্চ, আমাদের দেহমনের লম্বা-চওড়া এমনিই হওয়া উচিত ছিল যে, লাখো লোকের মাঝে দাঁড়ালেও সবাই আমাদের দিকে বিস্মিত চমকে চাইতো। এবং এই অবস্থা হলে আমরা সত্যিকারের গৌরব বলতে পারতাম।

আপনাদের দৃষ্টিটা অতীতের দিকে একটু ফিরিয়ে নিতে চাই। তেরশত বছর আগে মুসলিম যখন বিজয় অভিযান আরম্ভ করেছিল, তখন পৃথিবীর কোন স্থানে তারা স্বাতন্ত্র্য দাবী করেনি; সব আবর্ত্তন বিবর্ত্তন, কোলাহল, ঝড়-ঝঞ্ঝার ভিতর তারা মাথা দিয়েছিল, নিজেরা পৃথক হয়ে না গিয়ে, বরং সকলের মাঝে দাঁড়িয়ে এমনি উদাত্তকণ্ঠে ডাক দিয়েছিল যে, সকলকে তাদেরই কাছে আসতে হয়েছিল; কাল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে এমন একটা মহামেলার সৃষ্টি হয়েছিল যে, তা আজও পৃথিবীর ইতিহাসের আশ্চর্য্যতম মহত্তম পৃষ্ঠা হিসাবেই খ্যাত হয়ে আছে।

তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা আজ তেমন করে দাঁড়াতে অসমর্থ কেন? এ সম্বন্ধেও আমাদের ভিতর অনেক মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। কেহ বলেন, বর্ত্তমানের যে দিন শিক্ষিত সম্প্রদায় ইসলামের অনুশাসন মেনে চলেন না বলেই আমাদের এই দুর্দ্দশা।

কেহ বলেন, মৌলভী মৌলানা পীররাই আমাদের সর্ব্বনাশ করছেন, তারাই আমাদের অধঃপতনের কারণ।

www.pathagar.com

আবার কেহ বা বলেন, দুইই ভুল। গোঁড়ারা বড্ড গোড়া আর নবীনরা বড্ড উচ্ছৃঙ্খল, দুইয়ের কেহই ইসলামের অনুশাসন সত্যি সত্যি স্বীকার করে না। এই ইচ্ছে আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ।

অর্থাৎ কিনা, প্রত্যেক ইসলামকেই কেন্দ্র করে ঘুরছেন। দল যতই থাকুক আর মতবাদ যত রকমেরই হোক, আসল বিষয়ে কিন্তু সবাই একমত ; সেটা হচ্ছে ; এই যে, আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না।

মানুষ ফেরেশতাদের চাইতেও বড়—আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, শুদ্ধ সৎকর্মী ফেরেশতা সৃষ্টি করে আল্লাহ সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তার চাইতেও একটা বড় সৃষ্টি তিনি করলেন। সে হচ্ছে এই মানুষ। আমরা জানি আজাজীল আল্লাহর আদেশ অমান্য করে হল ইবলিশ, অথচ মানুষ আদম আদেশ অমান্য করে নিম্নতর কিছু হল না। আল্লাহ যখন ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করলেন এসব কি, জান? তারা বললেন আমরা জানি না, তুমি প্রভু তুমিই জানো। আল্লাহ আদমকে সব বস্তুর নাম জিজ্ঞাসা করলে আদম একে একে বললেন। এই জানা বা জ্ঞানের বিশেষত্ব মানুষের আছে বলেই সে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই কারণেই সে নিষ্ক্রিয় স্বর্গ তুচ্ছ করেছে।

বেহেশতের সৌন্দর্য্য ও নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারে নি ; তাই আল্লাহ যা বারণ করেছিলেন, সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে সে স্রষ্টারই আদেশ অমান্য করল ; তারপর তাকে কত না দুঃখ কষ্ট পেতে হয়েছে। সে ইতিহাস আমরা জানি। তবু সে কোন কালে, কোন যুগেই নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারেনি। উর্ধ্বে, নিম্নে, ডাইনে, বাঁয়ে, সম্মুখে পিছনে কত যে রত্ন লুকানো রয়েছে। তাঁর শেষ হিসাব মানুষ আজও করতে পারেনি, অথচ মানুষ নিরন্তর চেষ্টা করছে সেই শেষের মীমাংসা করবার জন্য। সেই প্রচেষ্টাতেই আজ সে অনেক অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলেছে, দূরকে নিকট করেছে ; অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে ; উপজাতি থেকে জাতি, জাত থেকে বিশ্বমানবতার স্বপ্ন সে দেখেছে, এবং একথাও সকলই স্বীকার করবেন যে মানুষ তার বিভিন্ন প্রক্রিয়া বিভিন্ন কর্ম্ম পদ্ধতির দ্বারা প্রতিদিন বৃহত্তর ও মহত্তর ও সুন্দরতর স্বপ্নের সৃষ্টি করছে এবং আজকের দেখা স্বপ্নকে কাল সে বাস্তবে পরিণত করতেও ত্রুটি করছে না।

মানুষের এই দুটো দিক স্বপ্ন দেখা ও একটা বাস্তবে পরিণত করা। এই দুদিক যে যতটা নূতনতর দান করতে পারছে, সেই ততখানি উপরে ওঠে যাচ্ছে ; তাকেই আমরা মানুষের চলা বলি। মানুষের চলাতেই পৃথিবীর চলা ; এই চলাতে যে সম্প্রদায় যতটা এগিয়ে গেল, সেই ততটা উন্নত।

সচল দুনিয়ার পা ত' কেউ ধরে রাখতে পারে না। আমরা চলি বা না চলি, অন্যে চলবেই। আমাদের পা যখন বন্ধ ছিল, তখন অন্যে চলেছে। কাজেই আজ আমরা চলতে গিয়ে চোখ মেলে দেখছি কি দুস্তর ব্যবধান হয়ে গেছে তাদের ও আমাদের মধ্যে।

সব যুগেই যে এই চলার ক্রম বা দিক বা পরিমাণ এক থাকবে তার কোনো মানে নাই ; বরঞ্চ চলার মুখে গতি বদলানোই স্বাভাবিক। পাহাড় থেকে নদী যখন নামে তখন সে ঠিক

একইভাবে, সমান পরিসরে একই দিকে চলে না। তার জলধারা উদ্দাম গতিতে যেদিক সেদিক দিয়ে পথ কেটে চলে যায়। কোন বাধাই মানে না।

যে কোন অজুহাতে মানুষের এই চলার পা যদি বন্ধ করা যায়, তা হলে মানুষ স্থবির হবেই এবং যারা সুমুখে দাঁড়িয়ে পথ রুদ্ধ করবে, তাদের যদি মানুষের তথা বিশ্বমানবতার শত্রু আখ্যা দেওয়া যায়, তাহলে অন্যায় হবে না।

আমাদের মধ্যে যত আন্দোলন হচ্ছে তার গোড়ার কথা ঐ চলা নিয়ে। চলাটা যে নিতান্ত আবশ্যক তা আমরা সকলেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করছি, অথচ এই নিয়েই আমাদের মধ্যে ভয়ানক মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়েছে। বর্ত্তমানে আমরা চোখের সামনে দু'টো প্রচণ্ড শক্তিশালী দল দেখছি–সোজা কথায় সেই দুটো দলকে আমরা বলি মোল্লাদল ও ইংরেজি নবিসী দল।

একটা কথা এইখানে নিবেদন করা ভালো—কথাটা হচ্ছে ইংরাজী নবিসীদল বা মোল্লাদল বলতে কোন ব্যক্তি বিশেষ বুঝায় না ; বরঞ্চ তাতে বুঝায় দু'রকমের মনোভাব।

এই দুটো মনোভাবের সোজা ব্যাখ্যা হবে—মোল্লাদল বলতে বুঝি তাঁদেরকে যাঁরা যুগানুযায়ী সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না, আর ইংরেজী নবিসীদল বলতে বুঝি যাঁরা যুগানুযায়ী সংস্কারের প্রয়োজনটা স্বীকার করেন। কোনটা ধর্ম্ম আর কোনটা অধর্ম্ম, বা কি যে ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত, এবং কি যে অন্যায় ও অযৌক্তিক, তা নিয়ে চুলচেরা বিচার আমি এখন করতে চাই না, কিন্তু একথাটাও তো কোন মতেই অস্বীকার করবার যো নাই যে, সত্য সনাতন ও চিরন্তন হলেও ত'ার বহিঃপ্রকাশ বা রূপ যুগে যুগে বিভিন্ন হয়। এমন কি এই কালে, একই দেশে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির তারতম্য হিসাবে সত্যের অনুভূতির তারতম্য হয়। কাল যা ছিল আজ তা নাই, আবার আজ যা আছে কাল তা থাকবে না ; কাজেই দুনিয়ায় প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবর্ত্তন হবেই।

আদি মানব আদমের আমল থেকে মহাপুরুষ হজরত মুহম্মদ পর্য্যন্ত ঐ জন্যই ত' এমন যে সত্য সনাতন ধর্ম্ম ইসলাম, তারও রূপের পরিবর্ত্তন হয়েছে।

মূল জিনিসটা সম্বন্ধে আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা নেই বলেই আমরা নিজেদের এত দুর্ব্বল বলে মনে করছি ও পদে পদে ভয় পাচ্ছি। আদি থেকে আজ পর্য্যন্ত পায়ে পায়ে যে পথের সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আজ পরিষ্কার নেই বলেই আমাদের এত আক্ষেপ এত ক্ষোভ, এত ত্রাস।

এ কথাটা ত খুবই ঠিক যে, যতক্ষণ আমরা আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে কোন একটা সুস্পষ্ট ধারণা করতে না পারছি, ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের এমনি হাতড়েই মরতে হবে ; শেষে এক সময় চোখ তুলে চেয়ে দেখবো যে, বেলা শেষ হয়ে গেছে। ঐ গলদটাই বর্ত্তমান মুসলিম জগতের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মত যেন তার নিশ্বাস রোধ করবার উপক্রম করেছে। কি নবীন কি প্রবীণ সকলেরই গলদ ঐখানে।

অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত এই তিনটে কাল বিচ্ছিন্ন নয়, একটা ধারার তিনটে অবস্থা মাত্র, পরস্পরজড়িত। সুতরাং যখনই দেখা যায় যে, কেহ কেবল অতীতের দিকেই চোখ ফিরিয়ে রোমন্থন করছে, তখন তাকে অচল স্থবির আখ্যাই দেওয়া যায়। প্রত্যেক অতীত মুহূর্ত্তের

www.pathagar.com

ভিত্তির উপর বর্ত্তমানের সৃষ্টি এবং এই বর্ত্তমানের উপরেই ভিত্তি করে ভবিষ্যতের সৃষ্টি হবে। কাজেই যারা কেবল অতীত নিয়েই থাকে, তারা বর্ত্তমানকে ত অস্বীকার করেনই, উপরন্তু ভবিষ্যৎ সৃষ্টির পথও রুদ্ধ করেন, অর্থাৎ বিরাট বিশ্বমানবতার যে একটা Continuity বা ধারাবাহিকতা আছে সেইটা অস্বীকার করেন।

এই ধারাবাহিক বিশ্বমানবতার Component part যে প্রত্যেক মানুষ তার পক্ষে নিছক আধ্যাত্মিক কিম্বা নিছক বস্তুতন্ত্রতা যে একা সম্পূর্ণ নয় তা অনেকেই হয়ত স্বীকার করবেন, অন্ততঃ ইসলামের মূল মন্ত্র যাঁরা উপলব্ধি করেছেন, তাঁরা ত স্বীকার করবেনই।

মানুষ জন্মাবেও বটে, মরবেও বটে ; রোগ, শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য, ক্ষুদ্র, মহৎ, ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মুর্খ এসবও মানুষের মধ্যে থাকবেই। এই দুনিয়ার পরপারে মৃত্যুর পর মানুষের জন্য স্বর্গ অপেক্ষা করছে, কি নরক অপেক্ষা করছে, সে ভাবনার চাইতেও বড় ভাবনা হবে, এই পৃথিবীটাকেই স্বর্গ করা যায় কি না। হীরা, মোতি, ইয়াকুত দিয়ে তৈরি বেহেশতের গৃহের চাইতেও বড় ও আবশ্যকীয় লক্ষ্য হচ্ছে এই ধূলার দুনিয়ায় তাজমহল গড়া। এই কারণেই সারা পৃথিবীর, সর্ব্বকালের, সর্ব্বদেশের মুসলমানের সম্মুখে যে আদর্শ স্থাপিত হয়েছে সেটা হচ্ছে শান্তির আদর্শ বা ইসলাম, এবং এই ইসলাম পরপারের বেহেশত আমাদের দিতে চেয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলে দিচ্ছে যে, মাটির মুলুকে বেহেশত তৈরি করতে না পারলে ওপারের বেহেশতের অধিকারী কেহই হতে পারে না। নামজাদা দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক বা কবি বা শিল্পী বা যোদ্ধারা ঐ রকম একটা কিছু হওয়ার দাবী কেবল মুসলমানদেরই নয়, যে কোন দেশের যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী তা হতে পারেন, হয়েছেন এবং হচ্ছেন। জগদীশ চন্দ্র আবিষ্কার করেছেন, উদ্ভিদ অচলপ্রাণী, কাল হয়ত কেহ আবিষ্কার করবেন, পাথরও অচল প্রাণী ; কিম্বা আজ উড়োজাহাজে চড়ে যে মানুষ আকাশপথে যাতায়াত করছে কাল হয়ত দেখবে এমন একটা কিছু আবিষ্কার হয়েছে, যার বলে সেই মানুষই অন্য কোন বস্তুর সাহায্য না নিয়েও শূন্য পথে উড়ে চলেছে। এ আবিষ্কার কোন মুসলমানও করতে পারেন বা কোন অমুসলমানও করতে পারেন। যিনিই করেন, তিনি জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র হবেন। এবং এই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করার পথ ত কেহ রোধ করেন নাই। কিন্তু অমুসলমমানরা এই দিকে যে পরিমাণ এগিয়ে গেছেন, মুসলমানরা ততটা পারেননি। তার কারণ তাঁরা অমুসলমান আর আমরা মুসলমান বলে নয় ; বরঞ্চ যে কালের ঝুঁটি চেপে ধরতে পেরেছে সেই জিতে গেছে।

কিন্তু শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, দার্শনিক তথ্য নির্দ্ধারণ, বড় শিল্পী বা কবি বা যোদ্ধা বা রাজনীতিজ্ঞ হওয়াই সব নয়। কেবল এই কারণে আমাদের বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন নাই, কিম্বা শুদ্ধ ঐ কারণে আমাদের কোন বৈশিষ্ট্যও হবে না।

আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়েও এই একই মন্তব্য প্রয়োগ হয়। কোন মুসলমান যদি বিজন গহনে বসে সাধনা করে আধ্যাত্মিক শক্তি আয়ত্ত করেন, তাহলে তাঁকে নিয়ে আমরা হয়ত গৌরব করতে পারি, কিন্তু সংসারের সঙ্গে তার যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। সেই কারণে তিনি যে বিশ্বমানবতার পরিপূর্ণ কল্যাণের পথে বিশেষ কোন সাহায্য করতে পারেন একথা আমরা পুরোপুরি স্বীকার করতে পারি না।

www.pathagar.com

বর্ত্তমান মুসলমানদে মধ্যে যে তুমুল বিরোধ–আরম্ভ হয়েছে, যার একটা রূপ দেখছি তুরস্কে ও আর একটা রূপ দেখছি আফগানিস্থানে, সেই বিরোধের গোড়ার কথা হচ্ছে কিন্তু ঐখানে। মোল্লা অভিহিত দল শুদ্ধ পরপারের বেহেশত ও দোজখ নিয়েই মারামারি করছেন। এক হাতে গ্লাস ধরে পানি খাওয়া থেকে আরম্ভ করে নামাজ না পড়া পর্য্যন্ত যতোগুলো বা যত রকমের অপরাধ হতে পারে বলে তাঁরা মনে করেন, সব ছোট বড় অপরাধের শাস্তির ব্যবস্থা দোজখ গমন, এবং এই জন্য তাদের মুখে শুনি দুনিয়ার 'মালমাত্তা' কেবলই শয়তানের ফেরেবি, আখেরাতই হচ্ছে সব। অর্থাৎ ঐ অ–দেখা পরকালের মোহে আমরা নিতান্ত কঠিন বর্ত্তমানকে ভুলে যাই।

কিন্তু ইসলামের মূলে ত' তা নয়। কোরান পড়লেই দেখা যায় বেহেশতের দাবীদার হচ্ছে সে, যে এ পৃথিবীতে পরকালের বেহেশতের অনুরূপ বেহেশত সৃষ্টি করেছে, যারা পারে নি, তাদের একালে বা পরকালে কোথাও কোন আশা নাই।

অমোল্লা দল, অর্থাৎ তরুণ সম্প্রদায় এই বর্ত্তমানটাকেই দেখছেন। বর্ত্তমানের এই দুর্দ্দশা, লাঞ্ছনা, অপমান এইটেই বড্ড বড় হয়ে তাঁদের বুকে বাজছে বলেই, তাঁরা ছটফট করে বেড়া ভেঙ্গে, আগড় চুরমার করে বেরুতে চান।

শান্তি রাজ্য বলতে একটা নিস্ক্রিয় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত অবস্থা নয়। এই শান্তি প্রতিষ্ঠা একটা Positive doctrine ; মেলার পথে আমরা সবাই চলেছি, সে পথে কোলাহল আছে, কলরব আছে, একটু ধাক্কাধাক্কিও আছে, কিন্তু কলহ নাই।

বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে পৃথিবীব্যাপী যে স্তব্ধতাকে আমরা শান্তির নিদর্শন মনে করেছিলাম, আমাদের সেই ধারণা চুরমার হয়ে গেল যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর। দিকে দিকে যে বীভৎস তান্ডবলীলা আরম্ভ হল, তাতে সারা পৃথিবীর চোখ ফুটে গেল—সে শুধু আমাদের কারণে যুদ্ধের পর যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টায় সকল দেশের সব জাতিকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় লিপ্ত দেখেছি। Fascism, Nationalism, Self determination, Socialism, Communism কত কিই না এই মহাসাগরে ফুটে উঠেছে, বিশ্বের বুকে একটা পরিপূর্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আরো দেখা গেল মানুষের কল্যাণ কামনায় যে বিজ্ঞান চর্চ্চা এতকাল হচ্ছিল, তাই শেষে সেই মানুষেরই মরণযন্ত্র রূপে নির্ব্বিবাদে ব্যবহার হতে লাগলো। বর্ত্তমান পৃথিবীর সব চাইতে বড় সমস্যা—কোন পন্থা অবলম্বন করলে এই পীড়িত ধরার বুকে শান্তি রাজ্য অর্থাৎ বেহেশ্‌ত প্রতিষ্ঠা করা যায়। শান্তি বলতে নিষ্ক্রিয় নির্ব্বাণপ্রাপ্ত অবস্থা বুঝায় না, এ হচ্ছে একটা Positive doctrine.

মুসলমানের যে একটা বিশিষ্ট Culture আছে সে কথাটা নিয়ে তর্ক না করেও তার সত্যতা স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। এখন আমাদের দেখতে হ'বে আমরা আমাদের এই স্বতন্ত্র বিশিষ্ট অনুশীলন দ্বারা জগতে বেহেশ্‌ত সৃষ্টি করতে পারি কিনা, যে বেহেশ্‌ত নইলে পরকালের বেহেশ্‌ত আমাদের বরাতে জুটবে না। এই কাজ যদি আমরা করতে পারি তবেই আমাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সার্থকতা হ'বে। কর্ম্মবীরের এই Positive sphere টাই আমাদের সামনে রয়েছে এক প্রত্যেক ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই দিকে তাঁর সমস্ত সময় ও সুযোগ নিয়োজিত করা।

কিন্তু শুদ্ধ কথার মারপ্যাঁচ বা গতানুগতিকতা দ্বারা কোন সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। এই কাজে সিদ্ধি লাভ করতে হ'লে কত যুগ ব্যাপী সাধনার হয়ত প্রয়োজন হবে।

www.pathagar.com

কত দুর্লঙ্ঘ্য বাধা হয়ত আমাদের অতিক্রম করতে হবে, কত বন্ধুর পথ বয়ে ক্ষত-বিক্ষত দেহে এগিয়ে যেতে হবে। তা হয় হ'ক, তবু বিশ্বমানবের কল্যাণের হিতে আমাদের এ-কাজ করতেই হবে। কে আছে যে এতখানি দায়িত্ব নিয়ে এই পথে অগ্রসর হবে?

কে আছে—এই প্রশ্ন করবার সঙ্গে সঙ্গেই মনে জাগে বর্ত্তমান পৃথিবীর দিকে দিকে যুব আন্দোলনের যে বিপুল সাড়া পড়ে গেছে তারই কথা। যুব আন্দোলনের কথা বলতে শুধু বয়সে যুবক এমন ব্যক্তিদের চেঁচামেচি বুঝায় না। পৃথিবীর চারিদিকে চাইলেই একটা কথা সম্পূর্ণ রূপে প্রতীয়মান হবে, সেটা হচ্ছে এই যে, গত মহাযুদ্ধের পর থেকে গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে একটা তীব্র বিরুদ্ধতা আরম্ভ হয়েছে, একটা নূতনতর জগত সৃষ্টি করবার জল্পনা কল্পনা চল্‌ছে ; সেজন্য স্থানে স্থানে Experimentও আরম্ভ হয়েছে। এই সব জল্পনা কল্পনা যাঁরা করেছেন, তাঁদের ভিতর যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ, নারী সব বয়সের সব শ্রেণীরই লোক আছেন।

যাঁরা নবসৃষ্টি করতে চান, তাঁরা যে বয়সের, সে শ্রেণীর ব্যক্তি হন না কেন, তাঁদেরই আমরা এই যুব আন্দোলনের সভ্য বলে গণ্য করে নেব। যৌবনই সৃষ্টির কাল, তাই এ-আন্দোলনের নাম যুব-আন্দোলন। নিতান্ত আশার কথা যে, এই নূতন সৃষ্টিতে কাজে যোগ দেবার জন্য মুস্‌লিম যুবকদের মনেও একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মেছে। কিন্তু আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে যে, এই কার্য্য আমাদের কোন বিশিষ্ট কৃষ্টির দ্বারা কোন রকম মীমাংসা করতে পারি কি না।

কোন জাগ্রত শক্তিশালী culture যখন কোন দুর্ব্বল মৃতকল্প culture-এর দুয়ারে হানা দেয়, তখন সাধারণতঃ দুর্ব্বল পক্ষ সবল পক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে ও তার সঙ্গে মিশে যায়। এই আত্মসমর্পণ করাই হবে সব চাইতে মারাত্মক সর্ব্বনাশ। কারণ একবার আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কাজেই, উন্নতির নাম করে বাংলার মুসলিম সম্প্রদায় যে কাজেই ব্রতী হন না কেন, তাঁদের এ কথাটা বেশ করে ভেবে দেখা উচিত যে, তাঁরা সত্যি সত্যিই নূতন কিছু সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন, বা কোন প্রবলতর শক্তিশালী culture-এর কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে আমাদের দেশে যে বৈদেশিক পাশ্চাত্য culture বন্যার জলের মত হুড় হুড় করে প্রবেশ করেছে, সেই স্রোতে তদানীন্তন অমুসলমান সম্প্রদায় একেবারেই ভেসে যাচ্ছিলেন। তার পর, তাঁদের ভিতর জনকতক শক্তিশালী পুরুষের আবির্ভাব হয়, যাঁরা এই স্রোতের মুখ ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। ফলে আমরা দেখছি, আজ বাংলায়, তথা ভারতে অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁদের নিজস্ব ও এই আগত culture-এর মধ্যে একটা প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে—আজ দু'দুটো প্রবল culture এই সম্প্রদায়কে নিজেদের কুক্ষিগত করবার প্রচেষ্টায় ব্যস্ত। এখন সত্যই আমাদের ভেবে দেখতে হবে, আমরা যে যে-পথে মরিয়া হয়ে ছুটতে যাচ্ছি, তাতে কি আমাদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা হবে, না আমরা দিন কতক পার নিজেদেরই আর চিনতে পারব না।

এ কথাটা যদি সম্যক হৃদয়ঙ্গম করতে হয়, তা হলে আগে আমাদের নিজের কি বিশিষ্ট culture আছে সেটাই দেখতে হবে। সমস্ত পর্য্যালোচনা করে যদি মনে হয়, আমাদের

www.pathagar.com

সত্যিকার কোন বিশিষ্টতা আছে, তাহলে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়ে সেইগুলো জগতকে দান করুন, এবং তখনই আমাদের স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা হবে।

বাংলায় তথা পৃথিবীতে ইসলামের অভ্যুদয় নিতান্ত অকারণে হয় নি। মানবের শতধা-বিচ্ছিন্ন জীবনযাত্রার সমন্বয় করবার জন্য এদেশের নিঃসহায় ভাগ্যবিধাতা ব্যাকুল আগ্রহে ইসলামকে আহ্বান করছিলেন। বাংলার তথা ভারতের মহাতীর্থের দিকে চোখ তুলে চাইলে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করা যায় যে, এ দেশের বুকের উপর পীড়িত মানবের দীর্ঘ নিঃশ্বাসের চাপ দিনে দিনে কী ভারই না হয়ে উঠেছিল, এবং তার পর ইসলাম এসে আহ্বান করতেই কী আকুল হয়েই না তারা এই আগন্তুককে বরণ করে নিয়েছিল। এই যে পরিবর্ত্তন, সে কি শুদ্ধ বিধির নির্ম্মম খেয়াল? না তার অন্তরালে একটা বৃহত্তর, মহত্তর ও সুন্দরতর সৃষ্টির পরিকল্পনা আছে।

বাস্তবিক ইসলামের এই অভ্যুত্থান কেবল মাত্র সাময়িক ঘটনা, কি ইহার সত্য ও স্থায়ী একটা উদ্দেশ্য আছে—এ সম্বন্ধে অন্ধভাবে আমি আপনাদের কোন সিদ্ধান্ত করে নিতে বলি না; বরঞ্চ আপনাদের এই কথাই বলি যে, আপনারা সেই বস্তুটা বিশেষ করে সতর্কভাবে পড়ুন, আলোচনা করুন; তার পর যদি মনে করেন আমাদের বিশিষ্ট কোন culture নেই, তা হলে তাকে ত্যাগ করুন।

আমাদের culture-এর বৈশিষ্ট্য কি, সে-কথা আলোচনা করা বহুসময় সাপেক্ষ, এবং আমা অপেক্ষা উপযুক্ততর ব্যক্তি সে আলোচনা করুন এই আমার আকাঙ্ক্ষা। কাজেই বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে চেষ্টা আর করলাম না, তবে শেষের দিকে দু'একটা বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমার বক্তব্য শেষ করব।

এই Positive সৃষ্টি প্রচেষ্টার সাহায্যকল্পে আমাদের দেশে মুসলিমদের জন্য যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, তা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত ও যথেষ্ট কি না—এ কথাটা ভাববার বিষয়। মুসলমানগণ আজকাল তিন রকম প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করেন। এক. সরকারী মিশ্রিত শিক্ষায়তনসমূহ, যথা সমস্ত সরকারী বেসরকারী স্কুল কলেজ; দুই—মুসলিমদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষায়তনসমূহ যথা, কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজ, ঢাকার ও চট্টগ্রামের মুসলিম হাইস্কুল; তিন—মাদ্রাসা সমূহ। এই তিন প্রকার শিক্ষায়তন সমূহের কোনটা বা তিনটাই আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যথেষ্ট কিনা ভাববার বিষয়। আমি আলোচনা করি না, কারণ সময় নাই। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, এর কোনটা বা সবগুলি আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক নয়ই, বরঞ্চ, অনেক সময় পরিপন্থী।

কাজেই সুধীবর্গ একটু চিন্তা করে দেখবেন, এমন কোন প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে কি না, যেখানে মুসলিম Culture-এর Positive construction বা সৃষ্টি আরম্ভ করতে পারা যায়। বিশ্বভারতী, বৃহত্তর ভারত সমিতি প্রবর্ত্তক সঙ্ঘ, হরিদ্বারের গুরুকুল, এমন কি রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহ যেভাবে একটা বিশিষ্ট Culture সৃষ্টি করবার বিপুল প্রচেষ্টা করছেন, আমাদেরও সেই রকম প্রতিষ্ঠানের আবশ্যকতা আছে কিনা চিন্তার বিষয়।

মুসলিমের কথা যখন ভাবি, তখন কত কথাই না মনে হয়, কত চিন্তাই না মনের কোণে কোণে দেখা দেয়। ইচ্ছা করে, ডাক ছেড়ে চীৎকার করে বলি—'ওরে মুসলিম, ওরে মুসলিম,

www.pathagar.com

এগিয়ে চল, শুধু এগিয়ে চল? আরবের মরুপ্রান্তরে হীরা পর্ব্বতের শিখরে ও গুহায় মহামানব যে সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, ও যে সাধনার উচ্চতম গ্রাম হল সে দিন যে দিন তিনি 'মেরাজ' স্বপ্ন দেখেছিলেন—সমস্ত বিশ্ব আদ্যন্ত নিজের ভিতর উপলব্ধি করেছিলেন। সেই মহাস্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করবার দায়িত্ব আজ আবার আমাদেরই উপর রয়েছে।

জানি এ কাজে বাধা অনেকই আছে—ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেকেই আমাদের পথ আগলে দাঁড়াবেন, অনেক কাদা আমাদের গায়ে ছুঁড়বেন, অনেক কাঁটায় আমাদের দেহ ক্ষতবিক্ষত হবে। কিন্তু তাই বলে ত' পেছিয়ে থাকলে চলবে না। তাইত আবার বলি 'এগিয়ে চল, ওরে তোরা শুধু এগিয়ে চল'।

www.pathagar.com

আরবী ভাষা ও কাব্য

মি. ফসীহ্

আরামী ভাষার যত শাখা প্রশাখা আছে তন্মধ্যে আরবীই জীবন্ত এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বেও এভাষা হেজাজ, নেজ্‌দ্, ইয়ামন এবং জমিরাতুল আরবের অন্যান্য অংশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উচ্চারণের তারতম্যের জন্য পরস্পরের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষিত হইত। এইরূপ উচ্চারণ-বৈষম্য আমাদের বাংলা ভাষাতেও দৃষ্ট হয়। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশের ভাষা বাংলা হইলেও, নদীয়া মুর্শিদাবাদ, পূর্ব্ববাংলা প্রভৃতি অঞ্চলের ভাষার পরস্পরের ভিতর পার্থক্য অনেক। বর্ত্তমান প্রবন্ধে হেজাজবাসীর, বিশেষ করিয়া কোরেশদিগের ভাষাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। কোরেশগণ বাণিজ্য ব্যবসায়ী ছিলেন বলিয়া পৃথিবীর অনেক সভ্য জাতির সহিত ইঁহাদের মেলামেশা এবং ভাবের আদান প্রদান হইত। এজন্য ইঁহারা আর সকলের চেয়ে অপেক্ষাকৃত ধনশালী এবং চতুর ছিলেন। কাজেই ইঁহাদের ভষাও অন্যান্য সম্প্রদায়ের চেয়ে মার্জ্জিত ও পুষ্ট ছিল। তাহা ছাড়া ইঁহারা পবিত্র কাবাগৃহের রক্ষক ছিলেন। এ সূত্রেও অন্যান্য সমুদয় সম্প্রদায়ের সহিত ইঁহাদের সম্পর্ক থাকায় কোরেশদিগের ভাষার ভাব ও শব্দ সম্পদ অপেক্ষাকৃত অধিক হইয়া পড়িয়াছে।

নূতন ও পুরাতন সমুদয় ভাষার মধ্যে এক বিষয়ে আরবী ভাষার খুব বিশিষ্টতা দেখা যায়। সে হইতেছে মনের অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্মভাব নিখুঁতভাবে প্রকাশ করিবার উপযোগিতা, শব্দ সম্পদ উপমা, অলঙ্কার, রূপক প্রভৃতির প্রাচুর্য্য ইহার কারণ। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই কথাটা আরও পরিষ্কার হইবে। দিবসের প্রত্যেক ঘণ্টার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। প্রথম ঘণ্টার নাম আজ-জরুর, তারপর যথাক্রমে, আল-বজুগ ; আজ-জোহা ; আল-গজালা, আল-হাজেরা ; আন-জাওয়াল ; আল-আসর ; আল্-আসিল ; আস্-সবুর ; আল-হাদুর ও আল-গারুব। আবার দিবসকে অন্যভাবে বিভক্ত করিয়া ইহার বিভিন্ন সময়ের নাম আল-বাকুর ; আশ্-শারুক ; আল-এশরাক ; আর-রাআদ ;আজ্-জোহা ; আল্-মাতু ; আল্-হাজেরা ; আল্-আসিল ; আল্-আস্‌র্ ; আত-তাফন ; আল্-হাদুর ; ও আল্-গারুব বলা হইয়া থাকে। এরূপ মস্তকের বিভিন্ন স্থানের কেশের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। সাধারণভাবে সমগ্র মস্তকের কেশ বুঝাইতে হইলে আল্-ফারুহ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সম্মুখের চুলের নাম আল্-গাসিয়া, পশ্চাতের চুল আজ-জওয়া বাহ্ ; রমণীর চুল আল-ফরুউ। রমণীর চুলের পশ্চাদ্ভাগ আল্-গাদিরাহ্; যে চুল সময় সময় মুখের উপর আসিয়া পড়ে, তাহা আদ্-দাবব।

উৎকৃষ্ট রচনার একটা প্রধান লক্ষণ হইতেছে, অল্প কথায় বিস্তর ভাব প্রকাশ করা। শব্দ প্রাচুর্য্যের জন্য বোধ হয় এ বিষয়ে আরবী ভাষা পৃথিবীর অন্য যে কোন ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রথমতঃ ইহাতে একই অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য বহু শব্দ প্রচলিত আছে; যেমন, বৎসরের ২৪টি, আলোর ২১টি, অন্ধকারের ৫২টি, সূর্য্যের ২৯টি, মেঘের ৫০টি, বৃষ্টির ৬৪টি, কূপের

www.pathagar.com

৮৮টি, জলের ১৭০টি, মদ্যের ১০০টি, দুগ্ধের ৩৫০টি, সর্পের ২০০টি এবং উষ্ট্রীয় ২৬৫টি প্রতিশব্দ আছে।

দ্বিতীয়তঃ ইহাতে একই শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাও এরূপ আছে বটে, কিন্তু বোধ হয় এত অধিক মাত্রায় নাই। 'আয়েন' শব্দের ৩৫টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ। এইরূপ কাফ ও অনুয শব্দেরও বহু অর্থ। আয়েন শব্দের অর্থ :—শহরের সম্মানিত ব্যক্তি, গৃহী, নিদ্রা যাওয়া ; পবিত্র ; উৎকৃষ্ট ; সম্মান ও প্রতাপ ; সূচি ছিদ্র ; দূত ; সম্প্রদায় ; উপস্থিত বিষয় ; উৎকৃষ্টতম বস্তু ; দিনার মুদ্রা ; শিক্ষা ; সর্দ্দার ; সেনাপতি ; সূর্য্য কিম্বা সূর্য্যের তাপ ; বিত্ত ; পুরাতন সামগ্রী ; নদীর মোহনা ; ঝরণা ; প্রান্ত ; দৃষ্টি ; দৃশ্য ; সম্মানিত ব্যক্তি ; সম্মুখীন ইত্যাদি। আল্-আজুজ শব্দের বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ; মদ্য ; ঘোর বিপদ ; জাহাজ ; পথ ; হাড়ী ; ধনুক ; অগ্নি ; মৃত্যু ; খর্জুর বৃক্ষ ; উষ্ট্রী ; শীতকালের কতিপয় দিবস প্রভৃতি ৬০টি অর্থ আছে।

তৃতীয়তঃ আরবী ভাষার অনেকগুলি শব্দ আছে যাহারা সময় বিশেষে বিপরীতার্থক হয়। এরূপ ব্যবহার বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন ভাষায় (শ্লেষ বা বিদ্রূপাত্মক বাক্যে ছাড়া) কদাপি দৃষ্ট হয় না। উদারহণ স্বরূপ কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করিতেছি। যথার্থ অর্থ উপবেশন করা কিম্বা দণ্ডায়মান হওয়া ; বায়ন অর্থ মিলিত হওয়া কিম্বা পৃথক হওয়ায় ; নাজাহা অর্থ তৃষার্ত্ত হইয়াছিল, কিম্বা পিপাসা নিবৃত্ত হইয়াছিল ; জাবা অর্থ গলিত হইয়াছিল, কিম্বা জমিয়া গিয়াছিল ; আফ্সাদা অর্থ বিলম্ব করিয়াছিল কিম্বা তাড়াতাড়ি করিয়াছিল ; আক্ওয়া অর্থ অন্য নিরপেক্ষ হইয়াছিল, কিম্বা মুখাপেক্ষী হইয়াছিল।

আরবী ভাষায় আপ্তবাক্য উপমা, রূপকের ও allusion সাহায্যে ভাব প্রকাশের ধারা খুব উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এজন্য সংক্ষেপে হইলেও খুব স্পষ্টরূপে ভাব ব্যক্ত করা যায়। ইহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই :— كل اتقريت (যাহার আসিবার, সে নিকটেই আছে), ان اخاك منا اخاك (বিপদে যিনি সহানুভূতি করেন, তিনিই বন্ধু), لايكوم نفسه ومن (যার আত্মসম্মান নাই, তার লোকসম্মানও নাই) ; خيرالاصورا وصاهاو (মধ্য পথই সর্ব্বোৎকৃষ্ট) لاصر صاجدع قصير انفه (কোন কারণে কাসির নিজের নাক কাটিয়াছে)। উপরোক্ত বাক্যগুলির প্রত্যেকটি কোন নির্দ্দিষ্ট ঘটনার প্রতি ইহারা করিতেছে। বাহুল্য ভয়ে আমরা সে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করিতে পারিলাম না।

সর্ব্বত্রই একটি সাধারণ নিয়ম দেখা যায় যে, কোন রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্ম্মনৈতিক বৃহৎ বিপ্লব উপস্থিত হইলেই সমসাময়িক কাজ, বিজ্ঞান দর্শন, এক কথায় যাবতীয় বিষয়ের উৎকর্ষ লক্ষিত হয়। ইউরোপে যেমন ক্রুশযুদ্ধ বা ক্রুশেডের পর মহাকবি দান্তে প্রভৃতির আবির্ভাব হয়, আরবেও তেমনি আবিসিনীয়দিগের অত্যাচার ও তৎপ্রতি-রোধের সময় আরবীদের মানসিক বৃত্তি সকল বিশেষ প্রকারে বিকশিত হইয়া উৎকৃষ্ট কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দী আরবী কাব্যের একটি স্বর্ণযুগ। এই সময় আবিসিনীয় আক্রমণ করিয়া বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হয় এবং হেজাজ ও নেজদের সর্দ্দার রাবিয়া ইয়মনবাসিদের উপর জয়যুক্ত হন। রাবিয়ার কনিষ্ঠ

www.pathagar.com

পুত্র মহল্‌হল্ এই সময়কার একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তাঁহার শেষ বয়সে, অর্থাৎ ইসলামের আবির্ভাবের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর পূর্ব্বে হেজাজ প্রদেশে ভীষণ গৃহ বিবাদ ও সাম্প্রদায়িক খণ্ড যুদ্ধ আরম্ভ হয়। তাহাতে একদিকে বিস্তর অনিষ্ট হইলেও অন্যদিকে লোকের সাহস ও উৎসাহ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাষার উৎকর্ষ এবং কবিতাদির শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

পণ্ডিতদের মধ্যে কবিতা তিন প্রকার— شعر غناءى গীতি কবিতা, شعر قصد বা কাব্য, এবং شعر تمثيلى বা ড্রামা। আরবদের মধ্যে শেষোক্ত দুই প্রকার কবিতা অত্যন্ত বিরল। তবে গীতি কবিতার প্রাচুর্য্য দ্বারা অনেকটা ক্ষতিপূরণ হইয়াছে। তাহাদের মতে কবিতার সংজ্ঞা এই—যে সালঙ্কার ছন্দোবদ্ধ ও মিল যুক্ত রচনা মনের বিচিত্র কল্পনার অবিকল প্রতিকৃতি তাহাই কবিতা। আবার কোন কোন প্রাচীনের মতে হৃদয়ে যে সমস্ত গভীর চিন্তা বা ভাবরাশি উদিত হইয়া জিহ্বাগ্রে প্রকাশ পায়, তাহাই কবিতা। যাহা হউক প্রাগৈসলামিক যুগে বিষয়-বর্ণন হিসাবে কবিতা ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল; যথা فخر গৌরব কবিতা; فخر حماسى বা শৌর্য্য কবিতা; تشبيب বা প্রেম কবিতা; سديح বা স্তুতি কবিতা, رثاء লোক কবিতা এবং هجاد বা বিদ্রূপ কবিতা। আরবেরা যাযাবর বা বেদুইন জাতি ছিল; — কি আহারে বিহারে, কি সাজ সজ্জায় কিছুতেই তাহাদের বাড়াবাড়ি ছিল না। তাহাদের চালচলনের এই সারল্যের ছাপ তাহাদের কবিতার ভিতর দিয়া বেশ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহারা যেমনটি চিন্তা করিত অকৃত্রিম ভাবে, ঠিক তেমনিটই ছন্দোবদ্ধ ভাবে কবিতায় প্রকাশ করিত। তাহাদের কবিতার ভাব ও ভাষার আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। জহির বিন আবি সালমা নামক বিখ্যাত কবির একটি রচনা অন্যান্য কবিরা সর্ব্বদা মনে রাখিতেন। কবিতাটি এই

وان اشعر بيت انك قائله
بيت يقال ازا انشد ته صدقا

অর্থাৎ সেই কবিতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট যাহা শুনিবামাত্র বলে—'হাঁ, ঠিক বটে' অর্থাৎ উহা অতিশায়োক্তি ও কৃত্রিমতা হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত হইবে। এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ প্রাগৈসলামিক কবিতার দুই একটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

১. কারীত্ বেন আনিফ নামক একজন কবি, আবেগভরে এই বলিয়া বনি মাজন সম্প্রদায়ের প্রশংসা গীতি গাইতেছেন, 'এই সম্প্রদায়টি এরূপ যে, তাহার উপর কোন প্রকার বিপদপাত হইলে অমনি দলে দলে কিম্বা একে একে সকলেই সাহায্যার্থে আগমন করে। বংশের এক ভ্রাতা আহ্বান করিলে, তাহারা বিনা জিজ্ঞাসায় তাহার বিপদ মোচনের জন্য প্রস্তুত হয়।'

২. এক আরব নারীর পুত্র বিয়োগ হইয়াছে, তাহাতে কবি বলিতেছেন, 'তোমার পরে এখন যে মরে মরুক, আমি যে একমাত্র তোমার মৃত্যুকেই ভয় করিতাম। হায়, তুমিই ছিলে আমার চোখের কৃষ্ণ তারকা তোমার অভাবে যে আমার চোখের জ্যোতি অন্ধকার। বাড়ী ঘর সমস্ত

www.pathagar.com

গহ্বর এবং কবরে পরিণত হইলে কি সুখের বিষয় হইত। তুমি যে রাজ্যে চলিয়া গিয়াছ, আমরা সকলেই সেই রাজ্যের যাত্রী।' উপরোক্ত কবিতাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়, উহারা কি পরিমাণ আন্তরিক মনোভাব প্রকাশ করিতেছে। না আছে কৃত্রিমতার গন্ধ, না আছে অতিরঞ্জনের বৃথা চটক।

আরবীয়রা কবিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিত। কারণ, কবিদের মুখে মুখেই দেশের বিবরণ বা ইতিবৃত্ত প্রচারিত হইত। বস্তুতঃ গবেষণাকারী পণ্ডিতগণ প্রাচীন আরবদের সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছেন, তাহা কবিতার ভিতর দিয়াই পাইয়াছেন। আরবীয়রা ক্ষিপ্রবুদ্ধি এবং স্মরণশক্তির জন্য বিখ্যাত। কবিতা প্রিয় আরবজাতি একবার মাত্র শুনিয়াই বৃহৎ বৃহৎ কবিতা মুখস্থ করিয়া ফেলিত এবং আজীবন তাহা মনে রাখিত। এ জন্য সাধারণতঃ কবিতা লিখিয়া রাখিবার প্রয়োজন হইত না—অধিকাংশ কবিতা শ্রুতি পরম্পরায় জীবিত থাকিত। কেবল যে কবিতাগুলি মোয়াল্লেকাত বা মোজাহেবাত নামে বিখ্যাত সেইগুলি মিশরীয় রেশমের উপর সোনালী অক্ষরে লিখিত হইয়া কাবা-গৃহের দরজায় লটকান থাকিত। এ সম্বন্ধে বোগদাদী এবং আল্লামা এব্‌নে আব্‌দ্‌রাবা নামক পণ্ডিতদ্বয়ের মত এই যে, বৎসরান্তে হজ্জের সময় যখন সমস্ত আরববাসী মক্কা নগরে একত্র হইত, তখন কোরেশদিগের সভায় কবিদের রচনার প্রতিযোগিতা হইত। উক্ত রচনা কোরেশদিগের মনঃপূত হইলে, অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উহা মুখস্থ করিয়া দেশময় প্রচার করিত এবং কবিকে অত্যন্ত সমাদর করিত। কোরেশগণ এই সমস্ত উৎকৃষ্ট কবিতার মধ্যে আবার অত্যুৎকৃষ্ট সাতটি কবিতা বাছিয়া লইয়া সেগুলিকে চিরস্থায়ী এবং সর্ব্বজনবিদিত করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বোক্তরূপে কাবা গৃহদ্বারে লটকাইয়া রাখিতেন। লট্‌কাইয়া রাখা হইত বলিয়া ইহাদের নাম মোয়াল্লেকাত, আবার সোনালী অক্ষরে লেখা হইত বলিয়া ইহাদের অপর নাম মোজাহে বাত। কবি আমরুল কায়েস ও কবি জোহিরের মোজাহেবাত খুব প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এই বেদুইন জাতি কবিতা এবং তাহার রচয়িতাকে কি চক্ষে দেখিত এবং তাহাদের উপর ইহার প্রভাব কতদূর ছিল, এ সম্বন্ধে দুই একটা ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। হজরত মোহাম্মদের সময় আশা নামক এক বিখ্যাত কবি ছিলেন, ইনিই একজন মোয়াল্লেকার লেখক। এই কবি ইসলাম গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে হজরতের নিকট যাইতেছিলেন। শুনিয়া কোরেশগণ বিশেষ চিন্তিত হইল। তাহাদের ভয় হইল, আশা ইসলাম গ্রহণ করিলে ত সমগ্র আরবই মুসলমান হইয়া যাইবে। এজন্য আবু সুফিয়ান সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া একদল কোরেশের সহিত পথিমধ্যে আশার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হে আবু বাসির আপনি কোথায় চলিয়াছেন?' তিনি বলিলেন, 'তোমাদের প্রভু মোহাম্মদের নিকট ইসলাম গ্রহণ করিবার জন্য যাইতেছি।' আবু সুফিয়ান বলিলেন, 'তিনি অনেক কাজ হারাম বলিয়া নিষেধ করিয়া দিবেন, তাহাতে তোমার মনের আরাম নষ্ট হইবে।' আশা,— 'কি কি কাজ?' আবু সুফিয়ান, 'জেনা (অর্থাৎ অবৈধ স্ত্রী সঙ্গম)' আশা,—'জেনা ত আমাকে ত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারি নাই। যাক, আর কি?' আবু, 'কোমার বাজী (বা জুয়া)'। আশা, 'তিনি কোমার বাজীর পরিবর্ত্তে ওর চেয়েও ভাল কিছু দিতে পারেন। আচ্ছা, আর কি?' আবু—'সুদ'। আশা, 'আমি কারো ধারিও না ধারাইও না। তার পর?' আবু, 'শরাব।' আশা, 'হায় দুর্ভাগ্য। অল্প একটু শরাব বোতলে অবশিষ্ট আছে।

www.pathagar.com

ওটুকু ত আগে শেষ করে নেই।' তখন আবু সুফিয়ান বলিলেন, 'আপনি এমন কিছু গ্রহণ করিতে চান, যা আপনার আশার অতিরিক্ত?' আশা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সে কি?' আবু সুফিয়ান বলিলেন, 'এখন মোহাম্মদের সঙ্গে আমাদের শত্রুতা চলিতেছে। কোন পক্ষের জয় পরাজয় হয় তাহার ঠিকানা নাই। এখন আপনাকে একশত উট দিতেছি, ইহা লইয়া গৃহে প্রস্থান করেন। যদি আমাদের জয় হয়, তবে আপনাকে পুরস্কৃত করিব আর মোহাম্মদের জয় হইলে, তখন তাঁহার নিকট গিয়া ইসলাম কবুল করিবেন।' অতঃপর আবু সুফিয়ানের আদেশ ক্রমে কোরেশগণ আশাকে একশত ঔষ্ট্র প্রদান করিলে আশা তৎসহ গৃহে প্রত্যাগমন করেন।....

এই কবি আশা হজরতের প্রশংসাসূচক একটি ক্বসিদা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এই—

আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যতক্ষণ না আমার উষ্ট্র হজরত সমীপে উপস্থিত হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমি কিছুতেই উহার গর্ভবতী অবস্থার জন্য কিম্বা দীর্ঘ পথ অতিক্রমজনিত ঘর্ষিত ক্ষুরের জন্য দয়া পরবশ হইব না। হজরত এরূপ একজন নবী যিনি অন্যের দৃষ্টির অগোচর, আমি জীবনে কসম দিয়া বলিতেছে, তাহার যশঃ দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়া চতুর্দ্দিক স্পষ্ট জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিয়াছে।'

কবি আশা সম্বন্ধে আর একটি গল্প এই যে, একদিন মোহাল্লেক নামক এক দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহাকে দাওয়াত করিয়া অত্যন্ত খাতির ও যত্নের সহিত ভোজন করাইলেন। এই ব্যক্তির কতিপয় কন্যা ছিল, কিন্তু অর্থাভাবে বিবাহ দিতে পারিতেছিল না। অবশেষে কন্যাদিগকে কবির সম্মুখে উপস্থিত করিয়া অত্যন্ত বিনয়ের সহিত নিজের কন্যাদায়ের কথা বলিয়া পরামর্শ চাহিল। কবি অতিশয় প্রীত হইলেন। তৎপর যখন আকাজের মেলায় সমস্ত আরব সম্প্রদায় সমবেত হইল, তখন কবি, এই কন্যাগণের প্রশংসাসূচক ক্বসিদা রচনা করিয়া পাঠ করিলেন। তাহার অর্থ, 'আমার চোখে নিদ্রা ছিল না, কিন্তু এই নৈশ জাগরণ কি আশ্চর্য্য ধরনের। আমার কোন প্রকার রোগাদিও ছিল না, আর আমি কাহারও প্রণয় বা প্রেমেও আবদ্ধ ছিলাম না।' বলা বাহুল্য ইহার পর খুব ভাল ভাল ঘরে উক্ত কন্যাদিগের বিবাহ হইয়াছিল।

প্রশংসা কবিতায় যেরূপ সম্মান বৃদ্ধি হইত, সেইরূপ আবার হজ্জ (বা বিদ্রূপ) কবিতা দ্বারা এক এক বংশ অত্যন্ত নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র হইয়া পড়িত। হাবতাত বংশ এইরূপ একটি দুর্ভাগ্য বংশ যাহা কোন কবির একটি মাত্র বাক্য দ্বারা আরবের সমস্ত বংশের চোখে অত্যন্ত ইতর ও ঘৃণিত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কবি বলিয়াছিলেন, 'আমি দেখিলাম গাধার সওয়ার এই হাবতাত বংশকে।' আরবদের মধ্যে এক প্রথা ছিল, কোন বংশে কবি জন্মগ্রহণ করিলে, অন্য বংশের লোকে সেই বংশকে 'মোবারক বাদ' অর্থাৎ শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিত; আর স্ত্রী, পুরুষ, যুবক, বৃদ্ধ, বালক সকলে মিলিয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য নাচ এবং ভোজনাদি করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিত। ফলতঃ যে বংশে একজন কবি জন্মগ্রহণ করিত সেই বংশের মর্য্যাদা অনেকখানি বাড়িয়া যাইত।

আরবীয়েরা কবিকে এতদূর ভক্তি করিত যে অনেক সময় তাহার কথায় হিংসা বিদ্বেষ এমন কি যুদ্ধ বিগ্রহাদি হইতেও নিবৃত্ত হইত। ইসলামের পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে আরবে যে সমস্ত যুদ্ধ

www.pathagar.com

হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৪০ বৎসর ব্যাপী বাসুসের যুদ্ধই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। মোহাল হাল্ নামক কবির চেষ্টায় এই যুদ্ধের বিরাম হয়। কবি আম্‌রুল কায়েসের পিতা হুজ্‌র যখন তরবারি বলে বনী আসাদ বংশের উপর বিজয়ী হইয়া সর্দ্দারগণকে বন্দী করিয়া লইয়া আসেন। তখন উহাদের মধ্যে আবীদ এব্‌নে আব্‌রাস, নামে একজন কবি ছিলেন। এই কবির কবিতাই সকলের প্রাণ রক্ষার হেতু হইয়াছিল। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ আছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, আরবেরা কিরূপ কবিতাপ্রিয় জাতি এবং কবিতাকে তাহারা কতদূর সম্মান ও প্রীতির চক্ষে দেখে।

www.pathagar.com

দার্শনিক ইব্‌নে রোশ্‌দ্

মোমতাজুদ্দীন আহমদ এম. এ.

মুসলমানদের গৌরবের দিনে সারা মুসলিম জগৎব্যাপী বেশ একটা Cultural homogenity ছিল। ইহার কারণ প্রধানতঃ দ্বিবিধ :—১. বগদাদ সারা মুসলিম জগতের ঐতিক এবং পারত্রিক শিক্ষার কেন্দ্র ছিল, ২. সমগ্র মুসলিম জগতে আরবী ভাষা শিক্ষার এবং শিক্ষিতদের ভাব আদান প্রদানের বাহন ছিল। এইরূপে স্পেনদেশীয় মুসলমানদের এশিয়ার মুসলমানদের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠ রকমেরই একটা Cultural unity ছিল। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে যখন এশিয়াতে দর্শন চর্চ্চা ধর্ম্মাদেশহেতু ক্ষান্ত হইয়া যায়, তখন স্পেনে দর্শন চর্চ্চা বেশ আগ্রহের সহিতই চলিতে থাকে। বলা বাহুল্য, স্পেনীয় দর্শন চর্চ্চা এশিয়ার মুসলিম দর্শন চর্চ্চারই ক্রমবিকাশ মাত্র। খলিফা দ্বিতীয় হাকিম খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে স্পেনে শিক্ষার সূত্রপাত করেন। তিনি সমস্ত মুসলিম জগত হইতে পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া তাঁহার পুস্তকাগারে সঞ্চিত করেন। কথিত আছে, তাঁহার পুস্তকাগারে চারি লক্ষ পুস্তক ছিল। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে মুসমান, খৃষ্টান, ইহুদী সকলে এখানে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক গবেষণা এবং সাহিত্য চর্চ্চা করিত। কিন্তু অল্প পরেই হাজিব আল মনসুর হাফেজের পুত্র হিশামের হাত হইতে সিংহাসন কাড়িয়া লয়েন, এবং কুসংস্কারপন্ন মুল্লা এবং অশিক্ষিত মুসলিম জনসাধারণকে শান্ত করিবার জন্য বিজ্ঞান দর্শন চর্চ্চা নিষেধ করিয়া দেন এবং বিজ্ঞান দর্শন চর্চ্চাকে গোঁড়ারা কখনই সুনজরে দেখে নাই ; একটু আভাস পাইলে যাহারা দর্শন চর্চ্চা করিত তাহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া সন্দেহ করিত এবং সুবিধা পাইলেই তাহাদিগকে নানাবিধ নির্য্যাতন করিত। কোনও শাসন কর্ত্তা বিজ্ঞান দর্শন চর্চ্চার বেশ পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। কিন্তু বিজ্ঞান দর্শনের পক্ষপাতী শাসন কর্ত্তাদেরও অনেক সময়ে জনপ্রিয়তা বজায় রাখিবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিজ্ঞান দর্শন চর্চ্চার বিরুদ্ধাচরণ করিতে বাধ্য হইতে হইত। কিন্তু স্বাধীন চিন্তার ধারা কোন বাধা বিঘ্ন রোধিতে পারে না। ইহা মানুষের জন্মগত অধিকার। মনীষী সক্রেটিস খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই স্বাধীন চিন্তার জন্য জীবন বলি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। অতএব যদিও স্পেনে বিজ্ঞান দর্শন চর্চ্চা জনপ্রিয় ছিল না এবং কোনো শাসনকর্ত্তাও সুনজরে দেখে নাই, তথাপি বিজ্ঞান চর্চ্চা বেশ জোরেই চলিতে লাগিল, কখনও ইব্‌নে রাজা এবং ইব্‌নে তোফায়েলই বিশেষ খ্যাতিসম্পন্ন। কিন্তু ইব্‌নে রোশ্‌দ্ মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন।

ইবনে রোশ্‌দ্ কর্ডোভা নগরীতে এবং সুবিখ্যাত পরিবারে ১১২৬ খৃঃ (৫২০ হিঃ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আইন, চিকিৎসা শাস্ত্র এবং দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং প্রত্যেক বিষয়েই খ্যাতনামা হইয়াছেন। তিনি শাসনকর্ত্তা আবদুল মোমেন এবং তাহার উত্তরাধিকারী ইউসুফের বেশ অনুগ্রহের পাত্র ছিলেন। ইয়াকুব আল-মনসুর বিল্লা তাঁহাকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করিতেন।

www.pathagar.com

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি হঠাৎ তাঁহার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন এবং লোসেনাতে নির্ব্বাসিত হন। আল–মনসুর কুসংস্কারাপন্ন মুল্লাদের এবং মুসলিম জনসাধারণের সন্তুষ্ট করিবার জন্য ইব্‌নে রোশ্‌দ্‌ এবং অন্যান্য বিজ্ঞান দর্শন চর্চ্চাকারীদের নির্য্যাতন এবং বিজ্ঞান দর্শন চর্চ্চার বিরুদ্ধাচরণ করেন। কিন্তু আল–মনসুর অল্পাকাল পরেই মরক্কোতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াই তাঁহার নির্ব্বাসনের আদেশ প্রত্যাহার করেন এবং বিজ্ঞান দর্শন চর্চ্চারও অনুমোদন করেন। ইব্‌নে রোশ্‌দ্‌ ১১৯৯ খৃ: (৫৯৫ হি.) মরক্কোতে রাজ কার্য্যে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করেন।

মুসলমানদের মধ্যে ইব্‌নে রোশ্‌দের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল না, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে মুসলমানদের মধ্যে দর্শন চর্চ্চারও অধঃপতন হয়। অতএব তাঁহার পুস্তকাদির আরবী পাণ্ডুলিপি অতি বিরল ছিল। তদুপরি খৃষ্টান ধর্ম্ম যাজক জামেনিস্‌ আরবী গ্রন্থাদি এমন পাশবিক ভাবে ধ্বংস করিয়াছেন যে ইব্‌নে রোশ্‌দের মৌলিক গ্রন্থাদি পাওয়া অতি দুষ্কর। সৌভাগ্যবশতঃ তাহার গ্রন্থাবলীর হিব্রু অনুবাদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এরিস্টটলের গ্রন্থাদির ভাষ্য ব্যতীত তিনি যে যে মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থাদি লিখিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য —

1. Destruction of the distinction of philosophers by Ghazzali,
2. On the Composition of celestial bodies,
3. On the union of intellect separate in individuals,
4. On the material intellect and on the possibility of union,
5. Abridgement of Logic,
6. Prolegomena to Philosophy,
7. Jreatise on eternal existence and temporary existence,
8. On the harmony between philosophy and theology.

এরিস্টটলের উপর তাঁহার অত্যন্ত আস্থা ছিল। তাই তিনি বলিয়াছেন এরিস্টটলের দর্শন দর্শনের চরম। তাঁহার দার্শনিক গ্রন্থাবলীর ব্যাখ্যা এবং তাঁহার মতাবলী হইতে মীমাংসা গ্রহণ করাই একমাত্র কাজ। তিনি এরিস্টটলের প্রায় সকল গ্রন্থাবলীই পাঠ করিয়াছিলেন এবং যদিও তিনি গ্রীক ভাষা জানিতেন না বলিয়া এরিস্টটলের মৌলিক গ্রন্থাবলী পড়িতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার অসামান্য এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে তিনি এরিস্টটলের মোটামুটি সঠিক ব্যাখ্যাই দিয়াছেন। তাঁহার ভাষ্য ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সারা ইউরোপে সর্ব্ববাদি সম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছেন।

যদিও ইব্‌নে রোশ্‌দ্‌ এরিস্টটলের ব্যাখ্যা করা ব্যতীত বেশী দাবী করেন নাই, এবং এরিস্টটলের বিশ্বস্ত ব্যাখ্যাতাই ছিলেন ; তথাপি তিনি কেবল ব্যাখ্যা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। এরিস্টটলের মতবাদ স্পষ্ট করিয়া বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করতে গিয়া বা তাঁহার মতবাদ হইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে গিয়া অনেক সময়ে তিনি এরূপ নিজ মত গঠন করিয়াছেন, যাহা এরিস্টটলের মত হইতে অনেক পৃথক।

www.pathagar.com

এই প্রবন্ধে ইব্‌নে রোশ্‌দের নিজস্ব মতবাদই সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

ইব্‌নে রোশ্‌দ্‌ ইসলামীয় দর্শনের শেষ উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি। তিনি পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলিম দার্শনিকদের মতবাদ সবই গ্রহণ করিয়া ইহাদিগকে বর্দ্ধিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। মুসলিম দার্শনিক সকলেই এরিস্টটলের অনুসরণ করেন বলিয়া প্রকাশ্যে স্বীকার করিতেন কিন্তু ইব্‌নে রোশ্‌দের পূর্ব্ববর্ত্তী মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যেই Neoplatonic ভাব অনেকটা দেখা দিয়াছিল। ইব্‌নে রোশ্‌দ্‌ একরকম Neoplationic মতবাদই গড়িয়া তুয়িলাছেন।

এরিস্টটলের মতে জড় (matter) এবং রূপ (forms)ই বিশ্বের দুই আদি কারণ (the two principles of reality)। এদিকে রূপ জড়কে যতদূর সম্ভবপর নিজের আদর্শ মত সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে। কিন্তু জড় অপূর্ণতাবশতঃ বাধা দেয়, তাই রূপ জগতে পূর্ণরূপে নিজেদের উপলব্ধি করিতে পারে না। অতএব জগতে ভাল এবং মন্দের রূপ এবং জড়ের একটা চিরন্তন সংগ্রাম চলিয়াছে। ক্রমে সংগ্রামের ভিতর দিয়া রূপ জড়কে বশীভূত করিয়া লইতেছে এবং বিশ্বব্যাপী একটি চিরন্তন ক্রমবিকাশ বা ক্রমোন্নতি চলিতেছে। কেবল ঈশ্বরই সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ এবং ক্রমোন্নতির গণ্ডীর বাহিরে, কিন্তু বিশ্বের ক্রমোন্নতির হেতু। কারণ নিজে তিনি সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ এবং সমগ্র বিশ্বকে পূর্ণতার দিকে টানিয়া লইতেছেন।

ইব্‌নে রোশ্‌দ্‌ এরিস্টটলের এই মতবাদ হইতে নিজের মতবাদ গঠন করিতে প্রয়াস পান অনেকটা Neoplatonist-দের ছাঁচে।

ইব্‌নে রোশ্‌দ্‌ এরিস্টটলের মত জড়ের নিত্যতাবাদ অবলম্বন করেন। কারণ প্রথমতঃ জড় material substratum হিসাবে রূপের সহযোগী কারণ। তদপুরি জড়ের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে জগতে মন্দের (eivil) অস্তিত্বের জন্য ঈশ্বরের পূর্ণতা বজায় রাখিয়া কারণ নির্দ্দেশকরণ যায় না। জড়ই জগতে সকল মন্দের কারণ।

এরিস্টটলের দর্শনে দ্বিবিধ দ্বিত্ববাদ দেখা যায়। প্রথমতঃ জড় এবং রূপের এবং দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর এবং জগতের, ইব্‌নে রোশ্‌দ Emanation theory (ক্রমসৃষ্টিবাদ) দ্বারা এই দ্বিত্ববাদকে একত্ববাদে monism এ পরিণত করিতে চেষ্টা করেন। ঈশ্বর সনাতন, চিরন্তন, সকল জ্ঞান এবং সৃষ্টির মূল কারণ, অতএব ঈশ্বর সকল সৃষ্টি হইতে পৃথক (different in kind)। অতএব আমাদের জ্ঞানের বাহিরে। ঈশ্বরের পরেই Logos বা Nous. ইহা ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং অন্যান্য সকল সৃষ্টির কারণ। তারপর World Soul. জড় সকল কারণের নিম্নস্তরে। সমস্ত রূপেই নূন্যাধিক পরিমাণে Logos এবং World Soul এ এবং জড়ে Oparticipate করে এবং রূপগুলির মধ্যে একটা চিরন্তন তাড়া আছে, যাহাতে ক্রমশঃ জড়ের অপূর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি লাভ করিতে প্রয়াস পায়। জগতে এরূপ ক্রমোন্নতি চলিতেছে। Logos বা Reason বিশ্বের একটা integral part এবং মানব জাতি এই Logos এরই ক্রমোপলব্ধি। এতএব মানব জাতি এবং সভ্যতা চিরস্থায়ী। অবশ্য ব্যক্তিগত মানব (individual man) ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু এই ক্ষণ-স্থায়ী ব্যক্তিগণের মধ্যে দিয়াই চিরন্তন মানব জাতি বিকাশ পায় এবং ক্রমোন্নতির দিকে চলে।

www.pathagar.com

এরিস্টটল তাঁহার De Animতে (Human Soul) মানব আত্মার যে বিবরণ দিয়াছেন ইব্‌নে রোশ্‌দ্ তাহা অনুসরণ করিয়া এই ক্ষেত্রেও নিজের মত অনেকটা Neoplatonist-দের ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছেন। Human Soul এ দুইটি element আছে—(১) Spiritual (Nous) অথবা Reason, ইহা Logos-এর অংশ এবং (২) Psyche, ইহা World Soul-এর Summun bonum বা জীবনের পরম ও চরম উদ্দেশ্য, অথবা logos এর সঙ্গে union সুফীদের মতে এই ecstasy ভক্তি–তপস্যাজাত mystic intution দ্বারা লাভ করা যাইতে পারে। কিন্তু ইব্‌নে রোশ্‌দ বলেন যে ইহা প্রকৃত জ্ঞান দ্বারাই কেবল লাভ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতবাদকে Neoplatonist এর মত Rationalistic mysticism বলা যায়। তাঁহার মতে মানুষের চরম আধ্যাত্মিক উন্নতি তখনই হয় যখন তাহার সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ বিকাশ হয় এবং nous psyche কে (অর্থাৎ) মানবের আধ্যাত্মিক আত্মা পাশবিক আত্মাকে সম্পূর্ণ বশীভূত বা আধ্যাত্মিক করিয়া লয়। এই স্তরে পৌঁছিলে মানুষ বিশ্বের রহস্য ভেদ করিতে পারে এবং ঈশ্বরকে পায়। ইহাই তাহার স্বর্গ। মানুষের পরম ও চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইব্‌নে রোশ্‌দ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেই মতবাদের আভাসও এরিস্টটলের Ethics এ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। এরিস্টটল স্পষ্টই বলেন যে, spiritual এবং contemplative জীবনই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। ইহাতেই supreme happiness, সবচেয়ে উচ্চদরের সুখ পাওয়া যায়। ঈশ্বর eternally এই সুখ ভোগ করেন। এইরূপ আদর্শ জীবন মানুষের পক্ষে দুর্লভ বলিয়াই তিনি দৈনন্দিন জীবনের জন্য Eudacism of self realisation-বাদ বলিয়া আরও এক আদর্শ নির্দ্দেশ করেন।

নৈতিক জীবন সম্বন্ধে জনমতবাদ (popular views) তিনি তাচ্ছিল্যের সহিত অস্বীকার করেন। virtue কে বেহেশ্‌তে বা দুনিয়ার সুখ ভোগ লাভের উপায় মাত্র বলিয়া মনে করিলে ইহা প্রকৃত virtue না হইয়া vice-এ পরিণত হয়। লোকে তাহা হইলে দুষ্কর্ম্ম হইতে ক্ষান্ত থাকিবে যেন পরজীবনে দুষ্কর্ম্মজাত সুখ চক্রবৃদ্ধি সুদসহ আদায় করিতে পারে। এইরূপ জনসাধারণের ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রতিকূল স্বরূপ পরকালে বেহেশ্‌ত দোজখের যে ধারণা তাহা ছদ্মবেশী virtue is its own reward. Virtue আত্মার স্বাস্থ্য বা সৌন্দর্য্য স্বরূপ এবং vice আত্মার ব্যাধি বা deformity (বিকৃতি) স্বরূপ। অতএব virtuous জীবনই সুখের জীবন।

সাধারণ জনমত (orthodox views) এই যে, খোদাতায়ালা যখন যাহা ভাল মন্দ মনে করেন তাহাই ভাল এবং মন্দ এবং revelation ছাড়া আমরা ভাল–মন্দ জানিতে পারি না। ইবনে রোশ্‌দ বলেন যে, এই সুনিয়ন্ত্রিত বিশ্বে ভাল মন্দেরও একটা নির্দ্দিষ্ট আকার আছে এবং আমরা খোদাদত্ত স্বাভাবিক বুদ্ধিতে ভালমন্দ বুঝিতে পারে। নতুবা আমাদের নৈতিক জীবন ধারণ করাই সম্ভবপর নয়। তিনি মানুষের freedom of will সম্বন্ধেও Darite, Tabarite তর্কের বেশ সুন্দর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। স্বাধীনতা ব্যতীত দায়িত্ব থাকিতে পারে না। অতএব মানুষের স্বাধীনতা আছে, নতুবা নৈতিক বা ধর্ম্মের বিধানের কোনও অর্থ থাকিত না। কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা ইচ্ছাশক্তি হিসাবে অসীম। কিন্তু কাজে সীমাবদ্ধ। কারণ external circumstances (বাহ্যিক জগতের)–এর উপর তাহার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। তিনি প্লেটোর Republic-এর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং

www.pathagar.com

এই সম্পর্কে তিনি মেয়েদের position আলোচনা করিয়াছেন, পুরুষ এবং মেয়েদের প্রাকৃতিক বৃদ্ধিগুলিতে কোনও পার্থক্য নাই বরং সঙ্গীতাদি কোনোও কোনোও বিষয়ে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমরা দাসত্ব শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়া তাহাদের উচ্চবৃত্তি-গুলি চাপিয়া মারিতেছি। ইহাতে তাহাদেরও জীবন অনুন্নত এবং জাতির অধঃপতন ঘটিতেছে।

ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার মতামত বেশ আমোদজনক। সাধারণ লোকের ধর্ম্ম-বিশ্বাস অভ্যাসগত অন্ধ আস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহারা যাহা শুনে তাহাই অনুসরণ করিতে থাকে। ধর্ম্মের বিধানগুলি যুক্তি তর্ক দ্বারা বুঝিতে সমর্থও হয় না, চেষ্টাও করে না। ধর্ম্মের অনেকগুলি বিধানই স্বাভাবিক বুদ্ধিজাত এবং সকল ধর্ম্মে সমানভাবে বিরাজমান। সেই বিধানগুলি অজ্ঞ জনসাধারণকে নৈতিক জীবনযাপনে অনেকটা সহায়তা করে। এই বিধানগুলিকে স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়মাবলীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। যাহারা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বা চিকিৎসা বিজ্ঞানে অজ্ঞ তাহাদের জন্য এইগুলি বেশ প্রয়োজনীয়ই। কারণ এইগুলি অনুসরণ করিয়া তাহারা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উপকৃত হইবে। কিন্তু যাহারা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে বা চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তাঁহারাই এই বিধানগুলির সারমর্ম্ম উদ্ধার করিতে পারেন এবং যথোচিত ব্যবহারও করিতে পারেন। ইবনে রোশ্‌দ্ দর্শন এবং ধর্ম্মের সামঞ্জস্য নামক পুস্তকে দেখাইয়া দিয়াছেন যে, জ্ঞানার্জ্জন করা কোরানে খোদার আদেশ, এবং জ্ঞানের আলোকে ধর্ম্মের বিধানগুলি বুঝিয়া লইলে বিজ্ঞান দর্শন এবং ধর্ম্মোপদেশের কোনও বিরুদ্ধ ভাব দেখা যায় না। কিন্তু যাহারা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানে এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে অজ্ঞ, এবং বুঝিতে অসমর্থ, তাহাদের সামনে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বা চিকিৎসা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া সাধারণ স্বাস্থ্যের নিয়মাবলী সম্বন্ধে তাহাদের আস্থা নষ্ট করিয়া দিলে ইহাতে হিতের চেয়ে অহিতই বেশী সাধন করা হইবে। কারণ এক দিকে তাহারা সাধারণ স্বাস্থের নিয়মাবলী স্বরূপ ধর্ম্মের dogma গুলিও ছাড়িয়া দিবে, অন্যদিকে তাহারা ধর্ম্মের সারমর্ম্ম যুক্তিতর্ক দ্বারা গ্রহণ করিতেই অসমর্থ। অতএব জনসাধারণের কাছে ধর্ম্ম বিষয়ে যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মোপদেশ প্রচারের চেষ্টা করা অত্যন্ত অসঙ্গত। প্রথমে তাহাদিগকে জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করিতে চেষ্টা করা উচিত। জ্ঞানের আলোকে তাহাদের বুদ্ধি মুক্ত হইলে তাহারা স্বতঃই ধর্ম্মের dogmaগুলির সারমর্ম্ম বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিবে। যাহাদের ধর্ম্ম যুক্তি জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা যাহা প্রকৃত ধর্ম্ম, তিনি ইহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন দার্শনিকদের বিশেষ ধর্ম্ম যাহা বাস্তব তাহারই জ্ঞানার্জ্জন ; কারণ ঈশ্বরের সবচেয়ে উচ্চ উপাসনা হইল তাহার সৃষ্টির জ্ঞান লাভ করিয়া সেই জ্ঞানের আলোতে তাঁহাকে প্রকৃতভাবে জানা। ঈশ্বরের চক্ষে ইহাই সবচেয়ে মহৎ কাজ, সর্ব্ববিধ উপাসনার চেয়ে মহত্তর, সকল ধর্ম্মের সেরা। সব চেয়ে vile নিকৃষ্ট হইল তাহা, যাহাতে এই মহৎ উপাসনার ব্যাঘাত জন্মায়, এবং ভুল ও অজ্ঞতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়।'

মধ্যযুগের ইউরোপীয় খৃষ্টানদের উপর ইব্‌নে রোশ্‌দ্ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এখানে তাহাই একটু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিব।

ইব্‌নে রোশ্‌দ্ শেষ উল্লেখযোগ্য মুসলিম দার্শনিক এবং মধ্যযুগের ইউরোপীয় খৃষ্টানদের কাছে মুসলিম দর্শনের একমাত্র প্রতিনিধি। ইহুদিরাই সবচেয়ে বেশী ইব্‌নে রোশ্‌দের

www.pathagar.com

ভক্ত ছিল, এবং তাঁহার প্রভাবেই ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় ইহুদিদের মধ্যে বেশ উচ্চ রকমের Aristotelian scholarship গড়িয়া উঠে যদিও খৃষ্টানেরাও মুসলমানদের পাশাপাশি স্পেনে বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চ্চা করিতেছিল। তথাপি অনেকটা ইহাদের সহায়তাই ইব্‌নে রোশ্‌দ্ খৃষ্টানদের কাছে প্রচারিত হন এবং প্রভাব বিস্তার করেন। Raymond ১১১০–১২৫০ খৃঃ পর্য্যন্ত টলেডোর আর্চ্চ বিশপ ছিলেন। তিনি টলেডোরে এক কলেজ স্থাপন করেন এবং সেখানে মুসলিম বিজ্ঞান দর্শন গ্রন্থাবলী ল্যাটিনে অনুবাদ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন যাহাতে মুসলিম বিজ্ঞান দর্শন খৃষ্টানদের অধ্যয়নোপযোগী হয়। ১২১৫ খৃঃ ২য় ফ্রেডারিক সিসিলির সম্রাট হন এবং ১২২৪ খৃঃ নেপল্‌সে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত করেন। এই বিদ্যালয়ে মুসলিম বিজ্ঞান দর্শন সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী ল্যাটিনে অনুবাদ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়। যাহাতে খৃষ্টানদের মধ্যে মুসলিম বিজ্ঞান দর্শন প্রচারিত হয়। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়েও মুসলিম বিজ্ঞান দর্শন খুব অধ্যয়ন এবং আলোচনা হয়। খৃষ্টান পাদ্রিরাও মুসলিম দর্শন বিশদভাবে অধ্যয়ন করেন। Fanciscan friar- রাই ইব্‌নে রোশ্‌দ্‌কে তত সুনজরে দেখেন নাই। ইব্‌নে রোশ্‌দের মতবাদের (Averroism) প্রধান কেন্দ্র ছিল বলোগনা এবং প্যাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়। এই দুই কেন্দ্র হইতে ইব্‌নে রোশ্‌দের মতবাদ উত্তর পূর্ব্ব ইতালীতে প্রভাব বিস্তার করে। এইরূপে ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইব্‌নে রোশ্‌দের মতবাদ সারা খৃষ্ট ইউরোপে বিশদভাবে অধীত ও আলোচিত হয়। ইব্‌নে রোশ্‌দ্ এরিষ্টটলের Commentator হিসাবে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইতেন, কিন্তু তাঁহার নিজস্ব দার্শনিক মতবাদ বিষয়ে তীব্র আলোচনা হয়, এবং মতভেদ হয়। দার্শনিক হিসাবে তাঁহাকে Eternity of the matter, Denial of individual immortality and Resurrection ইত্যাদি সর্ব্ববিধ damnable মতবাদের প্রচারক এবং সমর্থক বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হয় (founder of all damnable doctrines and heresies) তাঁহার মতবাদ সারা খৃষ্ট ইউরোপ ব্যাপিয়া তীব্রভাবে আলোচিত হয়। তাঁহার মতবাদের বিরুদ্ধে অনেক polemic treatises লিখা হয়। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক শিক্ষার্থী এবং অধ্যাপক ইব্‌নে রোশ্‌দের মতবাদের প্রকাশ্যভাবে পক্ষ সমর্থন করিতে থাকেন। ফলে ১২১৭ খৃঃ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের Rector-এর কাছে জানান হয়, যাহাতে ইব্‌নে রোশ্‌দের দর্শন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন বা আলোচনা না হয়। কিন্তু ইহাতেও কোনো ফলোদয় হয় নাই। পরে ক্রমে ১২৬৯ এবং ১২৭৭ খৃঃ প্যারিস আবার ইব্‌নে রোশ্‌দের অনেক মতবাদ ঘোর অধার্ম্মিক বলিয়া condemn করা হয়। এমন কি মধ্যযুগের ইতালীয় paintings-এও ইব্‌নে রোশ্‌দ্‌কে arch representative of all heresics বলিয়া অঙ্কিত করা হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে individual soul-এর immortality সম্বন্ধে এত তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হয় যে, ১৫১২ খৃঃ Lateran Council-এ এই সকল আলোচনা বাধা দিবার জন্য এক Formal Condemnation পাশ করা হয়, কিন্তু তাহাতে আপাততঃ কোনও ফলোদয় হয় নাই। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইব্‌নে রোশ্‌দের প্রতিপত্তি ক্রমে কমিয়া যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত বিশেষতঃ ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে খৃষ্ট ইউরোপে যে সকল ধর্ম্ম বিরোধভাব (heretical tendencies) বিরাজ করিতে ছিল সেইগুলি ইব্‌নে রোশ্‌দের মতবাদের সপক্ষে দাঁড়াইয়া সমর্থন

www.pathagar.com

করিতে লাগিল, এবং চলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচারিগণ অনেক সময়ে ইব্‌নে রোশ্‌দের নামে নিজেদের মতবাদ স্বাধীনভাবে নিরাপদে চালাইয়া দিতেন। ইব্‌নে রোশ্‌দ্ মধ্যযুগের খৃষ্ট ইউরোপে স্বাধীন চিন্তার এবং সমালোচনার উদ্রেক ও প্রচার করেন এবং প্রকৃত এরিষ্টটলকে পুনরুদ্ধার করেন। সর্ব্বোপরি ইব্‌নে রোশ্‌দ্ই অন্তত দক্ষিণ ইউরোপে Renaissance এর বিশেষ সহায়তা করেন। বর্ত্তমান ভারতীয় বিশেষতঃ বাঙালী মুসলমান ইউরোপীয় মধ্যযুগের খৃষ্টানদের মত মুল্লাচালিত এবং অজ্ঞতা তিমিরাচ্ছন্ন ও কুসংস্কারাপন্ন। যদি আমরা মুসলিম বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্য আধুনিক বিজ্ঞান দর্শন সাহিত্যের পাশাপাশি চর্চ্চা করিতে থাকি, তাহা হইলে আমরা আমাদের পবিত্র ধর্ম্মোপদেশগুলিও সকল আবর্জ্জনা হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে পারি, এবং স্বতঃই ধর্ম্মের একটি Reformation বা সনাতন ইসলামের পুনরুদ্ধার করিতে পারি। তখন ধর্ম্ম আমাদের অন্তরায় না হইয়া জীবন সংগ্রামে সহায়তা করিয়া জীবনকে সার্থক করিবে। আমাদের ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে।

www.pathagar.com

ইসলাম ও শরীর চর্চ্চা

বিলায়েত আলী খান বি. এ.

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে 'হায়াত, মওত, রেজেক্, দৌলত্'-এর উপর মানুষের কোন হাত নেই। তাই কালের চক্রে নিষ্পেষিত দাসানুদাস মানুষ তক্দিরের উপর নির্ভর করেই জীবনের সমস্ত জটিল সমস্যার সমাধান করে ও ভাবে—আত্মার মহা তুষ্টি এখানেই ; সাধনার সফলতার পথে 'তদ্বির বা চেষ্টা বলে' যদিও কিছু থাকে, তজ্জন্য মাথা ঘামাবার কোন দরকার নাই। কারণ 'তক্দিরে' আছে বলেই অজ্ঞ মানুষও ততটুকু তদবির করতে বাধ্য। তাই গৌণ বা মুখ্য এর কোন কারণেই 'তদবির' পর্য্যবসিত নয়। ইহাই আমাদের আজন্ম শিক্ষা। এই অন্ধ বিশ্বাস ও জড়ত্ব আমাদের সমাজকে এতদূর পেয়ে বসেছে যে শাস্ত্রের বা শাস্ত্রকারের কথা ও আদেশের বাহিরে সে সম্পূর্ণ চলচ্ছক্তিরহিত, নিজেদের হয়ত ভাববার ও বুঝবার ততটুকু জ্ঞানের সুযোগ ঘটে উঠেনি যে, ওই আক্ষরিক ব্যাকরণের আসল হেতু ও ইঙ্গিত কী? বা পূর্ব্বে যাঁরা কিছু বুঝেছেন তাঁরাই ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যত সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালের জন্য একদম শেষ করে গেছেন কিনা, ও সীমার বাইরে জ্ঞানের আর কিছু আছে কি না। এজমা, কেয়াস, বুদ্ধির পরিপক্কতা বা চিন্তার স্বাধীনতা দ্বারা পূর্ব্ব পুরুষদের ঐ কথিত আপ্তবাণীর বিরুদ্ধে উচ্চ বাচ্য করাও ধর্ম্মের বহির্ভূত। যদি কোন শুভ মুহূর্ত্তে কোন যুগে মানব এসে ঘোষণা করে যুগোপযোগী পুরাতনকে নূতন করে গড়ে আমাদের চলতে হবে, অমনি শতমুখে লাফিয়ে এসে বলে,—'Islam is in danger', হাদিস, শরিয়ত, মজহবের বিরুদ্ধে? তারপর ফিকা রাবী ত আছেই, সমাজে তার আর লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। কলেমা, রোজা, নামাজ, হজ্জ, জাকাত, ধর্ম্মের এ অবশ্য কর্ত্তব্যগুলো যেমন মুসলমানের শাশ্বত লক্ষ্য, সেরূপ হাঁটতে, চলতে, খেতে, বসতে, শয়নে সবদিক য়িেই চাই ইসলামের পূর্ব্ব অবধারিত রীতিনীতিগুলো ধর্ম্মের এক একটি অবশ্য কর্ত্তব্য অঙ্গ রূপে পালন করা। সুদূর রোজ কেয়ামত পর্য্যন্ত আমাদের যত কিছু অভাব অভিযোগ আছে ও হবে, সবেরই বিধান শাস্ত্রে আছে ও তাঁরা করে গেছেন, নূতন বলে আমাদের কিছু নেই, ক্ষুদ্র বুদ্ধি আমরা এ ব্যক্তিপূজা ও অতি মানবতা গ্রহণ করেই আজ জীবনে নীরব, নিশ্চল, নিঃস্পন্দ।

সন্তানের মৃত্যু শয্যা পার্শ্বে পিতা মাতা যেমন তাকিয়ে থাকে ঔষধের শিশির দিকে ও ডাক্তার কি বলে? আমাদের মুমূর্ষু সমাজও আজ সেরূপ বসে আছে যাই কিছু হ'ক না কেন, ইসলাম কি বলে! সব কিছু করতে হবে ইসলাম দিয়ে, নিতে হবে ইসলামের শাস্ত্র থেকে, গ্রহণ করতে হবে ইসলাম রূপে। 'ইসলাম' 'ইসলাম' করি। ইসলামের সত্য স্বরূপ হারিয়ে বসে আছি অন্ধ ইসলামের বাহ্যিক রূপ নিয়ে। স্যুট পরলে, পিছন দিয়ে চুল ছাঁটলে কিম্বা হাফ্ প্যান্ট পরে খেলাধুলা ও চলাফেরা করলে ইসলাম হতে তারা খারিজ হবে না সামিল হবে রোজ কেয়ামতের দিন নাসারা বে-দীনের সঙ্গে এই হতেছে সমস্যা ও আমাদের ধর্ম্মজ্ঞান। অর্থাৎ ধর্ম্মের জন্যই আমাদের সৃষ্টি, আমাদের জন্য ধর্ম্ম নয়। এই হচ্ছে শিক্ষা।

www.pathagar.com

মনের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন মিল নাই, মিল হতেছে দাড়ি, টুপি, আচকান, পায়জামা, পাগড়ী, ছুরাত লেবাস বাহ্যিক অনুষ্ঠানে। সেদিন একটা সভায় প্রশ্ন উঠেছিল, 'কাটা চামচ দিয়ে টেবিলে খানা খাওয়া যায় কি না?' অমনি আপত্তি এল চারদিক হ'তে ইসলাম কি বলে? এরূপ সব কাজ বিচার করতে হবে—আমাদের ইসলাম কি বলে—এই তর্ক দ্বারা; আমাদের অভাব অভিযোগ ও বুদ্ধি দ্বারা নয়।

স্থানীয় প্রধান এক খারিজী মাদ্রাসার মোদারেস সাহেবকে তথায় ছাত্রদের মধ্যে ড্রিল, ব্যায়াম, প্রভৃতি খেলাধুলার ব্যবস্থা করা যায় কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন—এসব নাসারা বেদীনের চাল; আমার খোদা রসুল আমাদের জন্য যে ব্যায়ামের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, তার চেয়ে আবার কী ভালো ব্যায়াম আছে? ওজু, রোজা, নামাজ এ কি কম ব্যায়াম? এগুলো ঠিক থাকলেই মানুষের কোন বালাই আসতে পারে না। তারপর রোগ, শোক, খোদার দান। সুখ, স্বাস্থ্য, আয়ু মানুষ বাড়াতে পারে না। তকদির খারাপ থাকলে কুস্তি, ব্যায়াম করে কি কেহ স্বাস্থ্যবান হতে পারে? ওসব ইংরাজী বিদ্যালয়ে চলুক। ইসলামী বিদ্যালয়ে ওর কোনই আবশ্যকতা নেই। খোদার অনুগ্রহ না হলে মানুষের সাধ্যে কি দেশ জয় বা রক্ষা করা যায়?

বাস্তবিক পক্ষে এ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে আমাদের বর্ত্তমান মুসলিম সমাজ ধনে, প্রাণে, মানে সুখ স্বাস্থ্যে সব পশ্চাতে। এই অন্ধ ভক্তিই সর্ব্বজনীন ইসলামকে লোকের চক্ষে পঙ্গু ও অকেজো করে তুলেছে। বাঁচবার মোহের চেয়েও অতীতের মোহ আমাদের বেশী। অতীত মানুষকে প্রেরণা দিতে পারে। কিন্তু বাঁচবার পক্ষে চাই বর্ত্তমান জাতির গুণ গরিমা ও জ্ঞানোৎকর্ষ।

যা'ক এখন দেখা যাক, এ শরীর চর্চ্চা সম্বন্ধে ইসলাম কী বলে? জায়েজ না না-জায়েজ, প্রথমে কোরান শরীফে সুরা আন্‌কালে দৃষ্ট হয়—তোমরা তোমাদের সাধ্যমতে শরীর চর্চ্চা কর এবং অশ্ব বাঁধিয়া রাখ অর্থাৎ শক্তিমান অশ্বারোহী সৈন্যরূপে বাস কর, যাহাতে তোমরা তোমাদের শত্রু এবং আল্লাহ্‌র অবাধ্য লোকদিগকে সর্ব্বদা ভীত ও ত্রস্ত রাখিতে পার।'

দ্বিতীয়তঃ সুরা বকরাহ্—জালুত ও তালুতের বৃত্তান্ত। 'তালুত কে শরীর ও বিদ্যায় শ্রেষ্ঠতা দান করিয়াছেন।'

* وزادع بسلة فى العلم والجسم *

'অ যাদাহু বাসতাতান ফিল এল্‌মে অল্‌জিসমে'

'তালুতে'র বাদশাহী লাভের একমাত্র কারণ শারীরিক শক্তিতে ও বিদ্যায় সে সে যুগে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিল। শক্তি ও বিদ্যা এ দুটার একত্র যোগেই ঐশীকৃপা লাভেরও সহায়ক। পূর্ব্ববর্ত্তী ইসলাম উক্ত আয়াতের যথার্থ সার্থকতা যতদিন পর্য্যন্ত বজায় রাখিতে পেরেছিল ততদিন পর্য্যন্ত ইসলামও সর্ব্বগুণে গরীয়ান ছিল। তার রাজ্য ছিল, সুখ ছিল স্বাস্থ্য ছিল। বর্ত্তমানের মুসলিম যারা আলেম বা শিক্ষিত তাদের হয়ত সকলেই শারীরিক দুর্ব্বল। আর যাহারা হয়ত শক্তি মাহাত্মে অপেক্ষাকৃত সুস্থকায় ও বলবান, তাহারা নিরক্ষর অজ্ঞ, দাঙ্গাবাদ criminals, চোর, ডাকাত কাজেই এ দুটোর অমিলে সমষ্টি ও ব্যক্তিভাবে কোন দিক দিয়েই কাজের ততো উপযোগী হচ্ছে না।

মোল্লা মৌলবী সাহেবগণ বলবেন—কোন রকমে হাড় দু'খানা ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে 'পুল সিরাতের' উপর পার করে দিতে পারলেই অনন্ত সুখ—হুরপরী, স্বর্গীয় কাম শিহরণ। দুনিয়া ঝুট—

www.pathagar.com

জেন্নাতই জিন্দেগী, প্রত্যহ পাঁচবার ওজু, গোসল, মেস্ওয়াক করেও টুপী, দাঁত, লেবাস সুরাতের যে কি দুর্দ্দশা তা ভাবলে মনে হয়, এ আদেশের নিগ্রহ অজু, গোসলের সার্থকতা কি? দীন দুনিয়া উভয়ের জন্য ধর্ম্ম, তারপর স্কুল কলেজে এইগুলো না থাকলে এতদিনে হয়ত আমাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ত—অন্যদিকে বিরাট মাদ্রাসা মক্তব এসলামে কৌম ঝাঁকে ঝাঁকে দিন দিনই ন্যুব্জ হয়ে চলেছে। আমাদের ইসলামী বাল্যপাঠ মক্তব শিক্ষা, নামাজ শিক্ষা ও মছালা প্রভৃতিতে আলেমদের বানী ভাল খাওয়া ভাল পরা মোবাহ পাপও নেই পুণ্যও নেই—অর্থাৎ যত কাজই কর না কেন, প্রথম দেখবে ইসলাম কী বলে? অর্থাৎ পাপ অর্থ দোজখ, পুণ্য অর্থ বেহেশত। এ দুটো ছাড়া মুসলমানদের কোন চিন্তা ও কাজই নেই। ভাল খাওয়া ভাল পরার দরকার কি? এ দ্বারা ত আর বেহেশতে যাওয়া যায় না?

হাদিস আলোচনা করলে দেখতে পাই—

১. একবার কোন বলদৃপ্ত বিধর্ম্মী পুরুষ হজরতের নিকট আসিয়া বলিল, ‘হে মহম্মদ! তুমি বলিতেছ তুমি আল্লাহ্‌র নবী—ভালো, যদি তুমি আমাকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিতে পার তবেই তোমাকে সত্য নবী বলিয়া মানি।’ হজরত তাহার বাক্যানুসারে তাহার সহিত মল্ল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং তিন তিন বার তাহাকে পরাস্ত করিলেন।

২. এক সময়ে হজরতের শিষ্যগণ দু'দলে বিভক্ত হইয়া তীর ধনুক লইয়া কৃত্রিম যুদ্ধ করিতেছিলেন। হজরত এক দলের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন। ‘আমি তোমাদের দলে’ তখন অন্যদল হজরতের প্রতি সম্ভ্রম বশতঃ তীর নিক্ষেপে নিরস্ত হইল। তাহা দেখিয়া হজরত বলিয়া উঠিলেন, ‘আমি উভয় দলেই আছি’ তখন পুনরায় কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয় চলিতে লাগিল, হজরত তাহা উপভোগ করিতে লাগিলেন।

৩. একদা হজরত উটের দৌড়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে একজন দৌড়ে জিতিল। হজরত হারিয়া গেলেন, তাহাতে অন্যান্য শিষ্যগণ সেই শিষ্যটির উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতে লাগিল। হজরত মধুর বচনে সকলকে সান্ত্বনা করিলেন।

৪. ঈদের দিন মদিনায় মসজিদ প্রাঙ্গণে হাবসীদাসগণ লাঠিখেলা করিতেছিল। হজরত অন্তঃপুর হইতে তাহা সানন্দে দেখিতেছিলেন। মুসলিম জননী হজরত আয়শা তাঁহার বাহুর উপর চিবুক স্থাপন করিয়া হাবসীদিগের খেলা দেখিতেছিলেন।

৫. একবার হজরত ও বিবি আয়শা অন্তঃপুর মধ্যে দৌড়বাজি খেলিয়াছিলেন। তাহাতে হজরতই জিতে ছিলেন, এরূপ নির্দ্দোষ খেলাধুলা, শরীর চর্চ্চা ও স্বাস্থ্যের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে হজরত যে কত উৎসাহ দেখাইয়া গিয়াছেন হাদিসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। স্বাস্থ্যের ও শরীরের সৌষ্ঠববৃদ্ধিকল্পে সে যুগে মুসলিম নর-নারী উভয় শ্রেণী শরীর চর্চ্চার প্রতি অধিকতর যত্ন নিতেন।

ইসলাম এসেছিল একটা সর্ব্বজনীন ধর্ম্ম নিয়ে সমস্ত দিক দিয়ে মানবের ও বিশ্বের কল্যাণ ও মুক্তি কল্পে। যা' ভালো তা কোনো উন্নতিরই পরিপন্থী নয়—হোক তা, নূতন বা পুরাতন বা ভিন্ন ধর্ম্ম, দেশ ও যুগের প্রচলিত। ইসলাম তা বরাবরই গ্রহণ করেছে ও করবে—এটাই ইস্‌লাম ও ইসলামের বিশেষত্ব। একটা সীমা নিয়ে ইসলাম দুনিয়াতে আসেনি যে thus for and no further-ইসলাম সব দেশের সব যুগের সব লোকের জন্য।

www.pathagar.com

ইসলামিক প্রথম যুগে খোলাফায়ে রাশেদিনের সময় আরব সৈন্যরা যুদ্ধের সময় উচ্চঃস্বরে কোরানের আয়াত আবৃত্তি করতে করতে চাক, কানাড়া, বাঁশী বাজিয়ে শত্রুর সম্মুখীন হতো। তাদের 'হুদ্' গান শুনে শত্রু বাহিনীও তালে তালে প্রাণে বিজয় মন্ত্রণা জাগিয়ে তুলত। উম্মীয়াদের সময় প্রত্যেক আরববাসী ও আরব সন্তানের প্রতি যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করা বাধ্যগত ছিল। কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ভাগে ভাগে platoon by platoon সকলকেই ক্যান্টনমেন্টে উপস্থিত হয়ে আবশ্যকীয় ট্রেনিং পেতে হতো। ৭২৪ খৃষ্টাব্দে আবদুল মালিকের পুত্র হিশাম প্রথম ঘোড় দৌড়ের প্রবর্ত্তন করেন ; এজন্য তাঁর একারই চারি শত অশ্ব ছিল। এমন কি তখনকার মুসলিম নারী ও রাজকন্যাগণও ঘোড় দৌড়ে যোগ দিতেন ও ঘোড়ার সাওয়ার হতেন।

ধনুর্ব্বিদ্যা, পোলো (চৌকান), হকী (ফুলজান) বল্লম ছোঁড়া (জিরাড) র‍্যাকেট টেনিস (লা-বুলু খুসক) নাম থেকেই বুঝা যায় পূর্ব্ব হতে কুস্তী, দৌড়, মল্লযুদ্ধ, ক্রিকেট প্রভৃতি শারীরিক চর্চ্চা ও খেলাধুলা আব্বাসীয়দের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। টেনিস ধনুর্বিদ্যায় মেয়েরাও পুরুষদের সমকক্ষ ছিল।

রাজ প্রাসাদে, আমীর ও ওমরাহের দরবারে, বিখ্যাত বিখ্যাত নগর পল্লীতে ঈদের দিন ছাড়াও মল্লবীরদের কুস্তির ও নানাবিধ দৈনিক ক্রীড়া কৌশলের প্রতিযোগিতা হত। হেরেমের মধ্যে সমবয়স্করা মিলে ও দৌড়ে প্রতিযোগিতা করত। বাদশাহ রশীদ, মামুন, মালিক সাহ, নাসির উদ্দীন, মহাম্মদ সানাদ্দিন হকি ও পোলোখেলায় এতদূর পারদর্শী ছিলেন যে, তাঁদের পোলোবল কদাচ মাটিতে পড়তে দেখা যায় নাই।

ফাতেমীর ও স্পেনীয় মূরগণ অস্ত্র চালনা ও মৃগয়ায় খুব আসক্ত ছিলেন। অশ্ব ও হস্তী পৃষ্ঠে মল্লযুদ্ধের ভীষণ প্রতিযোগিতা হতো।

বিভিন্ন খেলায় বিভিন্ন উইনিফর্ম্ম ব্যবহৃত হতো—হাফ প্যান্ট, ফুল প্যান্ট, ট্রাউজার্স সবেরই চলন ছিল। ভারতের মোগল বাদশাহগণ এ বিষয়ে আদর্শ ছিলেন। বাবর, আকবর, সাজাহান প্রত্যহ রাত্রি ৪টার সময়ে জাগিয়া ভোরবেলা অশ্বপৃষ্ঠে ৩০/৪০ মাইল ভ্রমণ করিতেন। শক্তি অনুযায়ী আমীর ওমরাহদিগকে খেলাত ও সম্মানসূচক নাম দেওয়া হতো।

আজকাল আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা পুস্তকে এবং অনেকের রিডিং রুমে লেখা মটো দেখা যায়— 'Health is Wealth.'

কর্ডোভার প্রত্যেক মসজিদ, কলেজ, ও কুস্তি আগারে বড় বড় অক্ষরে মটো ছিল—

The world is supported by fourt hings only—

(1) The learning of the wise

(2) The Justice of the great

(3) The Prayes of the good

(4) The valour of the brave.

কোন জাতিই আপনা আপনি মরে না। পশ্চিমের প্রতি বীতশ্রদ্ধাবশতঃ আমাদের দেশে যেসব খেলারই আমদানী হয়েছে বা হতেছে ভালই হউক, মন্দই হউক ইউরোপীয় বলে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করছি। ওদিকে স্বীকার করি, ইউরোপীয় বর্ত্তমান সভ্যতা মুসলিমদের হতে ধার করা। কোরান শরীফে আছে—কুল্লো নাফ্সিন জায়েকাতুল মাওৎ মৃত্যুই মানুষের

www.pathagar.com

অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সে জন্য তার অর্থ এ নয় যে, সকলের চাইতে আমাদের আয়ু হবে গড়ে ৫/৬ বছর কম। আমাদের মধ্যে যত অপমৃত্যু, শিশুমৃত্যু, রোগ শোক ও স্বাস্থ্যহীনতা অন্যান্য জাতির তুলনায় তাতে স্বীকার করতে হবে কি যে মৌতের উপর মুসলমানের হাত নেই। অজ্ঞতা, মূর্খতা ও ধর্ম্মান্ধতাবশতঃ আমরা নিজেরাই আমাদের আয়ু কমাচ্ছি। মৃত্যু আছে বলেই যে অকালে মরতে হবে শাস্ত্রের এ আদেশ নয়। স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্য, স্বাস্থ্যই জীবন, স্বাস্থ্যই আয়ুবৃদ্ধির সোপান। আজ হিন্দু মহাসভা ও সংস্থানের দেখাদেখি তানজিম্ তবলিগের সাহায্যে শরীর চর্চ্চার কতক প্রসার হতেছে দেখা যায়। কিন্তু তারও লক্ষ্য স্বাস্থ্যের দিক হতে নয়, সম্মুখীন গায়ে পড়া একটা প্রবল গতিকে প্রতিরোধ করার জন্য।

তবুও মন্দের ভালো, আজ যে দিন এসেছে, তাতে, বাঁচতে হলে, থাকতে হলে শরীর চর্চ্চা মুসলমানদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ উভয় দিক দিয়েই জান বাঁচানো ফরজ।

শেষে পুনরোক্তি করে বল্‌ছি,

তালুতের বাদশাহী হয়েছিল—যেহেতু তাঁর শক্তি ও বিদ্যা দুটোই ছিল।

www.pathagar.com

মানব প্রগতি ও মুক্ত বুদ্ধি

নাজিরুল ইসলাম বি.এ.

সামাজিক জীবনের প্রারম্ভে মানুষের অবস্থা যে কত করুণ, কত মর্ম্মন্তুদ তা আজ এই মানব প্রগতির যৌবনে দাঁড়িয়ে ঠিক বুঝবার আর সম্ভাবনা নাই। তবে ইতিহাসের পাতায় সেই সুদূর অতীতে মানব জীবনের যে ছবি আমরা দেখতে পাই তাই থেকে কতকটা বুঝতে পারি সে দিন মানুষ কত অসহায় দুর্ব্বল ছিল। প্রকৃতির কাছে চিরাবনত মস্তক নিয়ে কি করে সে ক্ষুদ্র জীবনের হিসেব করা দিন কয়টি কাটিয়ে দিত, কি করে অতীন্দ্রিয় দেবতাদের করুণা ভিক্ষা করে ফিরত, কি করে তার জীবন-বিরুদ্ধ শক্তির ঘাত প্রতিঘাতে অকালে শুকিয়ে যেত, সে সব কথা ভাবতে গেলে অনন্ত সম্পদের অধিকারী বর্ত্তমান মানুষের মন করুণায় ভরে ওঠে। চিন্তাশীল মানুষ আজ বুঝেছে, প্রকৃতির রাজ্যে ভিখারীর স্থান নাই। অতীন্দ্রিয় দেবতার কাছে আবেদন নিবেদন করে এজন্য বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। এখানে বাঁচবার অধিকার শুধু তারই যে আপন শক্তিতে সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাজিত করতে পারে। অনন্ত কোটি জীবন এই ধরার বুকে বাসা বেঁধেছে আবার অনন্ত কোটি জীব এর পৃষ্ঠ থেকে মুছে গেছে। এই সীমাবদ্ধ জগতে একের স্থান করতে অন্যকে বিদায় নিতে হয়েছে। সবল দুর্ব্বলকে পিষে মেরে আপনি বেঁচে আছে। যে বেঁচেছে, পারিপার্শ্বিক শক্তি তাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে। সে আঘাতের বদলে আঘাত ফিরিয়ে দিয়ে তাদের হীনবীর্য্য করেছে। মানুষও এই জীবন যুদ্ধের বাইরে নয়। তাকেও অনেক আঘাত সইতে হয়েছে অনেক আঘাত দিতে হয়েছে। রোগের বীজাণু, দেশের আবহাওয়া তার নিজের ভেতরের অকল্যাণকর প্রবৃত্তি, এরা সবাই মিলে চেয়েছে তাকে ধ্বংস করতে, তাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলতে ; আর সে যুগে যুগে নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করে প্রয়াস পেয়েছে এই সমস্ত বিরুদ্ধ-শক্তিকে ব্যাহত করতে। কিন্তু সজীব বিরুদ্ধ শক্তিও বাঁচবার প্রেরণায় নিজেদের নূতন করে গড়ে নূতন অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত করে, নূতন পন্থায় মানুষকে আক্রমণ করেছে। তখন মানুষের আবার প্রয়োজন হয়েছে পরিবর্ত্তনের, নিজের জীবনকে নূতন প্রণালীতে রক্ষিত করবার।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধকালে মানুষের এই যে নূতন সৃষ্টি এর মূলে আছে তার বুদ্ধি। পরিবর্ত্তনশীল পরিপার্শ্বের সঙ্গে জীবন নিয়ন্ত্রণ প্রণালীর শুভ পরিবর্ত্তন সাধ্যায়াত্ব হয় তখনি যখন মানুষের মুক্ত বুদ্ধি তাকে সৃষ্টি কার্য্যে সহায়তা করে। জড় বুদ্ধি মানুষকে নিশ্চল করে দেয়, তার সামনে চলার প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে ফেলে। যে নিত্য নূতন করে না গড়ে, জীবন যুদ্ধে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। তাই পাশ্চাত্যে আজ নূতনের এত জয় ঘোষণা—আর মুক্ত বুদ্ধি এই নূতনকে এনে দেয়, এবং যে যৌবন এই নূতনকে প্রতিষ্ঠিত করে তাদের আবাহন গীতিতে গগন পবন এত মুখরিত।

ডারুইন ও স্পেন্‌সারের অভিব্যক্তিবাদের ফল এই নূতনের সাধনাই বর্ত্তমান জগতের সাধনা। কিন্তু এই নূতনের সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে, মানবের দুঃখের

www.pathagar.com

দরদী এক একটি চিরনবীন মহাপুরুষ যে কত লাঞ্ছনা সয়েছেন, মানুষেরই রক্ষণশীল প্রবৃত্তি ও মজ্জাগত অভ্যাসের কাছে যে কত কঠিন আঘাত পেয়েছেন, তার কাহিনী বড় শোচনীয়। অসাধারণ সৃষ্টিকৌশলী কোন মানুষ , জ্ঞানে বা কর্ম্মে যখনি একটা নূতন জগতের সন্ধান দিতে চেয়েছেন, যেখানে পৌঁছলে মানুষ বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ থেকে অনেকটা নিরাপদ হতে পারত, তখনি রক্ষণশীল গড্ডালিকা প্রবাহ মহাবিপ্লব বাধিয়ে বড় করে তুলেছে তার অতীতকে—অতীতের অন্ধ অভ্যাসকে, আর এই অতীত মোহগ্রস্ত গড্ডালিকার তমসাচ্ছন্ন বিশ্বাসের চাপে পিষে গেছে সত্যকার স্রষ্টা। কিন্তু অতীত টেকেনি, অতীত তার সকল কুয়াসা সকল বিশ্বাস ও রক্ষণশীলতা নিয়ে কোন সুদূর হিম গিরির তুহিন শীতল অন্ধকার গহ্বরে আপনাকে ঢাকা দিয়েছে, তার স্থানে আজ আসন পেতেছে বর্ত্তমান শহীদ মহাপুরুষের স্বপ্ন।

আজ থেকে প্রায় দু'হাজার বছর আগে গ্রীক সভ্যতার আদিম পুরুষ সক্রেটিস তাঁর যে বাণী নিয়ে গ্রীক সমাজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সে বাণী পরবর্ত্তী দু'হাজার বছর ধরে সমগ্র জগতের কাছে শ্রদ্ধার অঞ্জলি পেলেও তৎকালীন রক্ষণশীল গ্রীক সমাজ তাকে ধর্ম্মদ্রোহী বলে ঘোষণা করল। জীবনের বিনিময়ে সক্রেটিসকে তাঁর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হল।

সক্রেটিসের অপরাধ তিনি মানুষের ভেতরে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তাকে শেখাতে চেয়েছিলেন সে কাউরি থেকে ছোট নয়—তবে অন্তরের বাণী কোন শাস্ত্রবাক্য বা আইনের চেয়ে হীন নয়। নিজের জীবন দিয়ে এই কথাই তিনি আরো ভাল করে প্রমাণ করে গেলেন। শাস্ত্রদ্রোহী বলে ঘোষিত হবার পর তাঁর মাথার পরে যখন কালবৈশাখীর তুমুল বিভীষিকা, জীবন মৃত্যুর সেই সন্ধিক্ষণে পুরুষ সিংহের মত দাঁড়িয়ে তিনি বজ্র কঠিন স্বরে তাঁর দেশবাসীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

> 'If you propose to acquit me on condition that I abandon my search for truth, I will say, I thank you, O Filtenians, but I will obey God, who as I believe, set me this task, rather than you and so long as I have breath and strength I will never cease from my occupation with philosophy.'

জ্ঞানের দুলাল সক্রেটিস চেয়েছিলেন সত্যকে। সত্যের যে রূপ তাঁর অন্তর দেখতে পেয়েছিল সেই রূপের মোহে উন্মাদ হয়ে ছুটে ছিলেন বাইরের আইন কানুন শাস্ত্র সব কিছুকে লঙ্ঘন করে। যে জাগ্রত মুক্তবুদ্ধির প্রভাবে তিনি এই রূপের সন্ধানী হয়েছিলেন, সেই মুক্তবুদ্ধি সবার হোক এই ছিল তাঁর প্রাণের বাসনা। কিন্তু এই মহাপুরুষকে সমাজ দ্রোহী বলে পীড়ন করল শেষে তারাই, যাদের দরদে তিনি ছুটেছিলেন সত্যের পথে নিজের সকল ভোগ বিলাসকে অবহেলা করে, Mill তাই দুঃখ করে বলেছেন—

> Men did not merely mistake their benefactor ; they mislook him for the exact contrary of what he was.'

মানুষের রক্ষণশীল প্রবৃত্তি তার অতি দরদী বন্ধু এই একটিকে বধ করেই ক্ষান্ত হয়নি। যুগে যুগে দেশে দেশে বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করে দিয়ে এর রাজত্ব চলেছে আর শত শত মানুষ যাঁরা জগতকে নূতন করে গড়ে তার দুঃখের লাঘব করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা এর কবলে লাঞ্ছিত

www.pathagar.com

হয়েছেন। মুসলিম জগতে মধ্যযুগে শিয়া ও খারিজিয়া মতের বিবাদ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল মুরজিয়া মতবাদ। মুরজিয়া মতই একটু পুষ্ট হয়ে কাদেরিয়া মতে পরিণত হয়। সক্রেটিসের আগে তাঁর দেশবাসীরা যেমন বিশ্বাস করত, মানুষের কোন ক্ষমতা নেই, সে অতীন্দ্রিয় দেবতাদের হাতে কলের পুতুল মাত্র, কাদেরিয়া মতের প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবনে আতার আগে মুসলমানরাও তেমনি ভাবত মানুষের সব কাজই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ্ নিয়ন্ত্রিত করছেন। মানুষের নিজের কোনই ক্ষমতা নেই। ইবনে আতা সমাজকে এই আশাহীন অদৃষ্টবাদের নিষ্কর্ম্মাজীবন থেকে মুক্ত করতে চাইলেন মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকে স্বীকার করে। স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে নিজের চিন্তার বিকাশ দিয়ে মানুষ যে তার অবস্থার উন্নতি করতে পারে এই কথাই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অদৃষ্টবাদ থেকে তিনি একেবারে মুক্ত হতে পারেন নি। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকে স্বীকার করলেও তার কর্ম্মফল তিনি অদৃষ্টের হাতে রেখে দিলেন। আন্ নাজ্জাম এইস তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে চাইলেন। তিনি মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—এ জগতে কিংবা পরজগতে আল্লাহ্ মানুষের, কি কোন প্রাণীর কোনরূপ ক্ষতি করতে পারেন না। তিনি যে দয়া করে কারুরি ক্ষতি করেন না তা নয় ক্ষতি করবার কোন ক্ষমতাই তাঁর নেই। নাজ্জাম মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করে নিলেন।

তাঁর মতবাদে এটি যাই থাক তিনি যে অদৃষ্টের ক্ষমতাকে ছোট করে মানুষকে আপন শক্তিতে বিশ্বাসবান করতে চেয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ্ থাকতে পারে না। মানুষ নিজ শক্তিতে আপনার মঙ্গল পথ গড়ে নিতে পারে এই ছিল তাঁর মূল কথা। মানব প্রগতির গোড়ার কথাও এই আত্মবিশ্বাস। কিন্তু শাস্ত্রান্ধ মুসলিম সমাজ নজ্জামের এই শুভ ইচ্ছার দিকে একবারও ফিরে চাইল না—তিনি সমাজকে কি দিতে চেয়েছিলেন সে দিকে একবারও লক্ষ্য করল না। সে দেখল শুধু তাঁর শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা। তাই তাঁকে কাদেরিয়াদের সেরা শয়তান বলে অভিহিত করল, আর প্রথম কাদেরিয়া যিনি সমাজকে অদৃষ্টবাদের হাত থেকে মুক্ত করে উন্নতির পথে তুলে দিতে চেয়েছিলেন সমাজ তাঁর প্রাণবধ করে তাঁর উপকারের শোধ দিল।

এথেন্সবাসী সক্রেটিসকে বধ করলেও গ্রীসের সমাজ-শাসন, রাজশাসন স্বাধীন চিন্তাকে ততটা বাধা দেয়নি যতটা দিয়েছে মধ্যযুগের ইউরোপ। রাজা কনষ্ট্যানটাইনের খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করবার পর থেকে গির্জ্জার পাদরীদের ক্ষমতা অত্যন্ত বেড়ে যায়। এই শাস্ত্র শকুন পাদরীর দল ভাবত, জগতের যা কিছু সত্য সে ক্ষুদ্র একখানা বাইবেলের ভেতরে নিহিত আছে। বাইবেলের বিরুদ্ধে যে কথা সে নিশ্চয়ই অসত্য এবং মানুষকে বিপথে চালিত করবার সহায়ক। এই বিশ্বাস নিয়ে ধর্ম্মধ্বজীরা অবাধে সমস্ত ধর্ম্মদ্রোহীদের লাঞ্ছিত করতে লেগে গেল। পোপ নবম গ্রেগরীর সময় ধর্ম্মদ্রোহীদের খুঁজে বের করবার জন্য একটা সংঘই গঠিত হয়ে গেল। এই সংঘ রাজ্যের যত ধর্ম্মদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করে বধ করতে লাগল। ফলে মানুষের সবল মন পঙ্গু হয়ে গেল। জগতের উৎপত্তি, গতি ও স্থিতি সম্বন্ধে শাস্ত্র যা ব্যাখ্যা দিয়েছিল তার বাইরে কিছু ভাববার কারুরি আর স্বাধীনতা রইল না। সুতরাং সমস্ত দর্শন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের উন্নতি একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। তাই মধ্য যুগের ইউরোপের ইতিহাস এক বিরাট ব্যর্থতার ইতিহাস। একজন ঐতিহাসিক ধর্ম্মধ্বজীদের এই অত্যাচার সম্বন্ধে বলেছেন—

www.pathagar.com

'No more ingenious device has been invented to subjugate a whole population to paralyse its intellect and reduce it to blind obedience.'

ইউরোপকে অন্ধ বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে জ্ঞানের আলোকের পথে তুলে দেন ইব্‌নে রোশ্‌দ্‌ বা এভেরোস, একজন স্পেনীয় মুসলমান দার্শনিক। ১২০০ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ইউরোপ যখন পরকালের মুক্তির মোহে শাস্ত্রদ্রোহীদের রক্তে ইউরোপের মাটি রক্তাক্ত করে তুলেছিল সেই সময়ে ইব্‌নে রোশ্‌দ্‌ তাঁর দর্শন দিয়ে পরকালকে একেবারে অস্বীকার করলেন। তিনি যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। আত্মা নশ্বর সুতরাং এ জগতকে অবহেলা করে শাস্ত্রানুসরণ করলেও পরকালে সুখ পাবার সম্ভাবনা নেই। জড়কে তিনি অবিনশ্বর বলে ঘোষণা করলেন। খোদা সম্বন্ধে বললেন—তিনি সর্ব্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জড় ও প্রাণীর সমষ্টিই খোদা। ইব্‌নে রোশ্‌দের দর্শন ধর্ম্মধ্বজীদের বেশ একটু চিন্তিত করে তুললো। যে পরকালের সুখ পাবার আশায় ইহকালের সকল উন্নতিকে অবহেলা করে তাঁরা কায়মনোবাক্যে শাস্ত্রানুশীলন করে চলেছিলেন সেই পরকাল যদি না থাকে, আর জড় যদি অবিনশ্বর হয়, তবে জড়ের চিন্তাকে একেবারে ত্যাগ করে পরকালের ভাবনায় বিভোর হয়ে তাঁরা ত ভাল কাজ করেন নি। এভেরোসের দার্শনিক মতবাদ কয়েকজন বুদ্ধিমান লোকের ভেতরে প্রশ্ন জাগিয়ে দিল। ইতালী ও ফ্রান্সের ভিতর দিয়ে তাঁর চিন্তা নূতন রূপ নিয়ে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল, ইউরোপ অন্ধঅনুবর্ত্তিতা ছেড়ে জিজ্ঞাসা করতে শিখল। জ্ঞানানুশীলন তার কাছে বড় হয়ে উঠল। ফলে শাস্ত্রদ্রোহী যে কোন মতকে আর সে চেপে মারতে অগ্রসর হল না।

কিন্তু ইব্‌নে রোশ্‌দের নিজ সমাজে তাঁর লাঞ্ছনার আর সীমা পরিসীমা রইল না। তাঁর নিন্দা ও কুৎসায় স্পেনের আকাশ বাতাস ভরে গেল। ইব্‌নে রোশ্‌দ্‌ তখন নিজকে বাঁচাবার জন্যে এক অদ্ভুত মত প্রচার করলেন। তিনি পরস্পর বিরোধী শাস্ত্র ও দর্শন উভয়কেই সত্য বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু এই ঘোষণাতেও কোন ফল হল না। স্পেনীয় খলিফা তাঁকে রাজসভা থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

এমনিভাবে সক্রেটিস থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত মানুষের কল্যাণকামী কত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সমাজ তত্ত্ববিৎ যে লাঞ্ছিত হয়েছে তার হিসেব করা বড় কঠিন। কিন্তু রক্ষণশীলতা মানব প্রগতিকে যুগে যুগে এমনিভাবে শত বাধায় প্রতিহত করতে চাইলেও তার জয় হয় নি। জয় হয়েছে প্রগতির, জয় হয়েছে জীবনের। জড় ও জীবনের এই অনন্ত যুদ্ধে জীবন আদিকাল থেকেই জড়ের ওপর আধিপত্য করে আসছে। মানুষের বুদ্ধি সকল বন্ধনকে অতিক্রম করে কোন ফাঁকে অসীমের পথে যাত্রা করেছে জড়ের কোন সতর্ক দৃষ্টি তার সন্ধান পায়নি।

রক্ষণশীল প্রবৃত্তির মূলে আছে শাস্ত্রে বিশ্বাস। শাস্ত্র মানুষের কর্ম্ম জীবনকে অনন্তকাল একইভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়—অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের সমস্ত জীবনকে একই নিয়মের কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধতে চায়। কিন্তু মানুষের অন্তর চায় বৈচিত্র্য, কর্ম্মে ও জ্ঞানে বৈচিত্র্য, জীবনোপভোগে বৈচিত্র্য। সমগ্র প্রকৃতি এই বৈচিত্র্যের নিয়মকেই মেনে চলেছে। এই প্রকৃতির নিয়মকে অবহেলা করে শাস্ত্র যখন মানুষের অন্তরকে চিরাচরিত নিয়মে বেঁধে ফেলতে চায় এবং এই নিয়ম পালনের অভ্যাস যখন স্থিতিশীল হয়ে ঘাড়ে চাপে, জীবন তখন

www.pathagar.com

হয়ে ওঠে এক একঘেয়ে কর্ম্ম কোলাহল—এক আনন্দহীন চলচ্চিত্র। মানুষের মুক্ত বুদ্ধি তাকে এই যন্ত্র জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে একদিকে যেমন এনে দেয় বৈচিত্র্য, অন্যদিকে আবার তেমনি যোগায় পরিবর্ত্তনশীল পরিপার্শ্বের সঙ্গে জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার সামর্থ্য। এই যুক্ত বুদ্ধিকে পীড়ন করে ধ্বংস করতে চায় যে অন্ধ বিশ্বাস সে যে কত বড় অকল্যাণকর তা ভাল করে ভেবে দেখবার বিষয়।

মুসলমান শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় দেড় হাজার বৎসর আগে। সে সময় এই শাস্ত্র প্রথম প্রচলিত হয় তখনকার দিনে জীবনের যে কর্ম্ম পদ্ধতি নির্দ্দেশিত ছিল, সেগুলোকে অভ্যাস করে মানুষ যে নিজদের জীবনকে অধিকতর উন্নত ও সম্পদশালী করতে পেরেছিল তাতে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু তখনকার মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর আজকের মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেতরে পার্থক্য এত বেশী যে, এখনও সেই প্রাচীন অভ্যাসকে স্থায়ী করে রাখলে মানুষের অকল্যাণ ছাড়া কল্যাণের কোন সম্ভাবনা নেই।

মুসলমান সমাজ ব্যবস্থার মূল কথা সাম্য। শাস্ত্র এই সমাজের সভ্যদের কার্য্যবিধিকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছিল যা পালন করলে মানুষে মানুষে ভেদ বৈষম্য ঘটতে পারত না। ভেদের একটি প্রধান কারণ আর্থিক বৈষম্য। বুদ্ধির তারতম্যের জন্যও বৈষম্য ঘটে। কিন্তু এই বুদ্ধির পার্থক্যের সঙ্গেও জড়িয়ে আছে আর্থিক সমস্যা। প্রচুর খাদ্য ও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য না পেলে মানুষের বুদ্ধি বিকশিত হয় না। খাদ্যও শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের মূল অর্থ। এই আর্থিক বৈষম্য থেকেই অন্য সব রকম বৈষম্য আসতে পারে। তাই শাস্ত্র এই আর্থিক বৈষম্য দূর করতে এমন কতকগুলো নিয়ম বিধিবদ্ধ করে গেল যা পালন করলে সাম্য আপনা থেকেই এসে পড়ে।

ইসলামিক উত্তরাধিকার আইনানুসারে পিতার সম্পত্তি পুত্রেরা সমান ভাগ ও কন্যা পুত্রের অর্দ্ধেক ভাগ পায়। এই আইনের লক্ষ্য ছিল, উদ্বৃত্ত ধনের উত্তরাধিকারী যেন সমাজের অন্য সবার চাইতে বেশী আর্থিক সুবিধে না পায়। পিতার উদ্বৃত্ত ধন এই আইনানুসারে যখন পাঁচ ছয়টি পুত্র কন্যার ভেতরে বিভুক্ত হয়ে যায়, তখন এক এক অংশীদারের ভাগ্যে এত অধিক ধন জোটে না, যা দিয়ে সে সমাজের অন্যান্য সভ্যদের চাইতে কিছু সুবিধে করে নিতে পারে। একটি গরীব শ্রমিক আজীবন পরিশ্রম করেও হয়ত ভাল করে দুমুঠো খেতে পায় না, আর একজন শুধু ধনীর গৃহে জন্ম বলেই অতুল সুখ সুবিধের অধিকারী হয়। এই অন্যায়কে বাধা দেবার জন্যই ইসলাম সৃষ্টি করেছিল উত্তরাধিকারীদের ভেতরে সমান ভাবে ধন বণ্টন ব্যবস্থা। কন্যার ভাগে পুত্রের অর্দ্ধেক অংশের ব্যবস্থা হয়েছিল কারণ কন্যা স্বামীর সম্পত্তিও ভোগ করবে। কন্যা ও তার স্বামী উভয়ের ধন মিলিত হয়ে পাছে সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে তাদের আর্থিক অবস্থার খুব বেশী ব্যবধান ঘটায় তাই কন্যার অংশ পুত্রের অর্দ্ধেক করা হল।

আর্থিক বৈষম্য ঘটাবার আর একটা প্রধান উপায় সুদ গ্রহণ। পৈতৃক উদ্বৃত্ত ধনের আধিকারী সুদ ব্যবসায়ের ভেতর দিয়ে অনায়াসেই আপনার ধন চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়িয়ে চলতে পারে। কিন্তু যার স্বোপার্জ্জিত বা উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া কোন ধনই নেই, সে শত চেষ্টা করেও তার ও সুদী ব্যবসায়ীর ভেতর আর্থিক বৈষম্য দূর করতে পারে না। তাই এই অন্যায়কে দূর করতে ইসলাম সুদকে হারাম বলে অভিহিত করল।

www.pathagar.com

এই সমস্ত সতর্কতার পরও যদি কোন মানুষের ধন এত বেড়ে যায়, যাতে তার সঙ্গে সর্ব্ব সাধারণের একটা বড় রকমের ব্যবধানের সৃষ্টি হতে পারে তবে তার জন্য ইসলাম জাকাতের ব্যবস্থা করল, তার আয়ের শতকরা একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা গরীবদের বিলিয়ে দিতে হবে। এই হল ব্যবস্থা। জাকাত দানের ফলে ধনীর আয়ের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ কমে যাবে এবং সেই ধন দরিদ্রের ভিতরে বিতরিত হওয়ায় তাদের অবস্থাকে কতকটা ভাল করে তুলবে, কালে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান অনেকটা কমে যাবে এই ছিল শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য।

৭০০ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে যখন এই নিয়মগুলো প্রবর্ত্তিত হয় তখনকার মানুষের অবস্থানুসারে এগুলো যে বিজ্ঞানসম্মত ছিল সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু তারপর আজ প্রায় দেড় হাজার বছর কেটে গেছে। এর ভেতরে মানুষের অবস্থা যে কত দিকে কত পরিবর্ত্তন হয়েছে সেইটে একবার হিসাব করে দেখা যাক।

অষ্টাদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে ইংল্যান্ডের শিল্প জগতে যুগান্তর উপস্থিত হল। সেখানে বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে অনেকগুলো যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেললেন। যেমন ওয়াটের ষ্টীম এঞ্জিন তার ভেতরে অন্যতম। ওয়াটের এই আবিষ্কারের ফলে একদিকে যেমন রেলগাড়ী ও স্টীমার সুলভ হয়ে উঠল, অন্যদিকে আবার তেমনি একঘেয়ে শ্রমিকের কাজ যন্ত্রে সম্পাদন করবার সুবিধা হল। বস্ত্র শিল্প ও অন্যান্য শিল্পেও নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার হল অনেক। যন্ত্রের তৈরী জিনিষ হাতের তৈরী জিনিষের চেয়ে অনেক সস্তা দামে বিক্রয় করা সম্ভব হয়—কারণ যন্ত্রে কোন কিছু তৈরী করতে সময়, পরিশ্রম ও খরচ অনেক কম প্রয়োজন হয়। সুতরাং যন্ত্র শিল্প এক এক করে কুটির শিল্পকে উচ্ছেদ করতে লাগল, কিন্তু একটি যন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বা কারখানা খোলায় অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অভাবকে দূর করবার জন্যে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হল। ব্যাঙ্কে সমাজের অধিকাংশ সভ্যের উদ্বৃত্ত অর্থ এসে জমা হতে লাগল এবং এই অর্থ কারখানায় খাটিয়ে অথবা কর্জ্জ দিয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে বেশী হতে থাকল। কালে অতি অল্প দিনের ভেতরেই অনেকগুলো লক্ষপতির সৃষ্টি হল। খৃষ্টান ধর্ম্মে পৈতৃক সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিন্ন অন্য কারুর পাবার অধিকার না থাকায় লক্ষপতির পুত্র লক্ষপতি হয়ে জন্মগ্রহণ করল। তার পর সে আপন শক্তিতে সেই ধন বাড়িয়ে কোটিপতি হয়ে দাঁড়াল। জ্যেষ্ঠ পুত্র ছাড়া অন্য সবার পিতৃধনে অধিকার না থাকায়, অথচ পিতৃগৃহে সে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি পেয়েছে সেই খ্যাতি বজায় রাখবার প্রেরণায় অমানুষিক কষ্ট স্বীকার করে ধনোপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হল। অর্থ যতই বেড়ে চলল ততই নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল, নূতন আবিষ্কার ও মানুষের সুখ সুবিধা বাড়তে লাগল। এক কথায় গোটা সমাজের আর্থিক উন্নতি দ্রুত অগ্রসর হল। শিল্পের এই উন্নত প্রণালী ইউরোপের খৃষ্টান জগতে অতি অল্পকাল মধ্যেই গ্রহণ করল এবং তাদের ও আর্থিক অবস্থা আগের চাইতে ঢের উন্নত হয়ে গেল।

কিন্তু মুসলিম জগৎ মানুষের এই নূতন সৃষ্টিকে গ্রহণ করতে পারল না। সে খুলে বসল জীর্ণ শাস্ত্রের পাতা, সেখানে দেখল লেখা রয়েছে সুদ হারাম, আর পৈতৃক সম্পত্তি সমানভাবে উত্তরাধিকারদের ভাগ করে দিতে হবে। সে একবারও দুনিয়ার নূতন আবহাওয়ার দিকে তাকালে না, অর্থ না হলে যে বেঁচে থাকাও সম্ভব নয় সে কথা ভাবল না। ফলে দাঁড়াল এই যে, সে সাম্য স্থাপনের জন্য শাস্ত্রীয় নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়েছিল সেই সাম্য মুসলমানদের

www.pathagar.com

ভেতরে বজায় রইল। কিন্তু মুসলমান আর পাশ্চাত্যের খৃষ্টানের ভেতরে ব্যবধান হল আকাশ পাতাল। মুসলমান ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করল না, কারণ সুদ হারাম। তার উদ্বৃত্ত ধন বাড়াল না। সুতরাং কলকারাখানা সৃষ্টি হল না। অন্য দিকে লক্ষপতি পিতার ধন চারিপুত্রে বিভক্ত হয়ে এক এক জনকে পঁচিশ হাজারীতে পরিণত করলে। পুত্র সবাই পিতার ধনের সমান অংশ পাবে মনে করে পরিশ্রম করা কেউ বড় প্রয়োজন মনে করল না। রেল, স্টীমার প্রভৃতিতে যাতায়াতের সঙ্গে সঙ্গে এক দেশে থেকে অন্য দেশে শিল্পজাত দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হতে লাগল। যন্ত্রের তৈরী সস্তা জিনিষ সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়ল। কুটীর শিল্পী মুসলমানের জিনিষ বেশী দামে আর কেউ কিনল না। ব্যবসার ক্ষেত্র তাকে ছাড়তে হল। কৃষি ক্ষেত্রেও মুসলমান বিশেষ সুবিধা করতে পারল না। কারণ বৈজ্ঞানিক উন্নত প্রণালীর কৃষি এক সঙ্গে অবিভক্ত অনেক জমি না হলেও প্রচুর অর্থ না থাকলে সম্ভবপর হয় না। ব্যাঙ্কের অভাবে মুসলমানের অর্থ সঞ্চিত হল না, আর উত্তরাধিকার আইনের ফলে তার জমি অংশীদারদের ভেতরে বিভক্ত হবে খণ্ড-বিখণ্ডিত হয়ে গেল। সুতরাং কৃষিতেও তাকে হটতে হল। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে পরিচয় না থাকায় ও অর্থাভাবে সে কালোপযোগী যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করতে পারল না। তার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে অন্য ধর্ম্মাবলম্বী তার রাজ্য অধিকার করে বসল। বিধর্ম্মীরা তাদের নিজের আইন দিয়ে রাজ্য শাসন করতে লাগল। মুসলমানের জাকাত দান বা সুদ গ্রহণে তারা বাধা দিল না। অনেক মুসলমান সুদ গ্রহণ করতে লাগল, অনেকে জাকাত দান বন্ধ করে দিল। মুসলমান সমাজে যে সাম্য ছিল তাও এবার নষ্ট হল। এমনি করে ধীরে ধীরে রক্ষণশীল প্রবৃত্তি ও শাস্ত্র সম্মত প্রাচীন অভ্যাসের অভিশাপে মুসলমান এক এক করে রাজ্য হারাল, ধন হারাল, মান হারাল এবং সব শেষে তার যে অতি প্রিয় সাম্যের আদর্শ তাও হারাল,—পরে রইল শুধু ধর্ম্মের পুঁথি আর অশিক্ষিত অনাহারক্লিষ্ট ভিক্ষুকবেশী মুসলমান।

কিন্তু এতেও তার পতনের শেষ হল না। সেই দেড়হাজার বছর আগের জীর্ণ শাস্ত্র পৃষ্ঠে বহন করে আবার সে চলতে চেষ্টা করল। সে ভাবল 'ইহকাল ত হারিয়েছি—ক্ষতি নেই, কিন্তু পরকাল আমার নেবে কি?'

মুসলমানের এই পরকাল পথ যাত্রায় হঠাৎ বাধা দিল ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপ তার যন্ত্রের আঘাত দিয়ে জাগিয়ে দিল মুসলিম জগতের যুবক মন। তুরস্কে আনোয়ার ও কামাল বুঝল পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া বদলে গেছে, এখন আর ৭০০ খৃষ্টাব্দের বিজ্ঞান দিয়ে বাঁচা চলবে না। আজ চাই নূতন বিজ্ঞান নূতন সৃষ্টি, নূতন অস্ত্র। যৌবন জল তরঙ্গ উছলে উঠল উচ্ছসিত জারির আঘাতে যত জীর্ণ সংস্কারর স্তূপ এক এক করে ভেসে গেল। থেকে গেল শুধু তাজা প্রাণ, নব্যতুর্কী। নূতনের সাধনা হল এই যুবক তুর্কীর সাধনা। তাই ধর্ম্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে সে সহজ করে দিল মুক্ত বুদ্ধির জয়যাত্রা।

ভারত তখনো অবাক হয়ে এই যৌবন সাধনা দেখছিল আর শাস্ত্রের পাতা উল্টিয়ে খুঁজছিল এই তরুণের অভিযান শাস্ত্রের কত পরিচ্ছেদের কত বিধি অনুসারে হল। কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেল, জীবন আর একবার স্থিতিশীলের উপর জয়লাভ করল।

মানুষের সুখের পথে প্রকৃতি কত যে বিঘ্ন ছড়িয়ে রেখেছে তার সীমা পরিসীমা নেই। সে চায় এক আদর্শ জগৎ সৃষ্টি করতে যেখানে মানুষে মানুষে কলহ নেই, সাম্রাজ্যবাদীর নিষ্পেষণে

www.pathagar.com

অধীন দুর্ব্বল জাতির ক্রন্দন নেই, ধনিকের স্বর্ণ রথের চক্র নিষ্পেষণে শ্রমিক আত্মার আর্ত্ত হাহাকার নেই, মৃত্যুর শীতল স্পর্শে জীবনের শুষ্কতা নেই। তাই সে তার মুক্ত বুদ্ধি প্রভাবে নূতন করে রাষ্ট্র গড়ে, সমাজ পত্তন করে, রাসায়নিক বিজ্ঞানাগারে দিনের পর দিন অবিরাম গবেষণা করে চলে—বিরাট যন্ত্রদানব কোলাহল মুখরিত যক্ষপুরী রচনা করে। কিন্তু তবু কোথা হতে তার সফল প্রয়াস সকল সাধনাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আসে অমঙ্গল, আসে মৃত্যুর কুহেলি—ঢাকা নিদ্রালসস্পর্শ। জীবন মূৰ্ছিত হয়ে পড়ে যায়, তার যত আয়োজন যত স্বপ্ন সব লুকিয়ে যায় এক ব্যর্থতার কাল পর্দ্দার অন্তরালে। এইখানে এসে মানুষ তার নিজের বুদ্ধিতে নিজের শক্তিতে বিশ্বাস হারায়। সম্মুখে চেয়ে দেখে এক বিপুল দুর্দ্ধর্ষ শক্তি, অনতিক্রমনীয় যার ক্ষমতা, আর দুর্ব্বোধ্য যার কৌশল! মানুষের উচ্চশির নুইয়ে পড়ে। বিরোধের পথ ছেড়ে এইবার সে কেঁদে উঠে বলে, 'ওগো প্রভু, ওগো অজানিত অনতিক্রমনীয় দুর্দ্ধর্ষ শক্তি, রক্ষা করো, রক্ষা করো তোমার ঐ কঠিন আঘাত থেকে!' এই দুর্ব্বলতা থেকেই পরকালের চিন্তা ইহকালের চাইতে তার কাছে বড় হয়ে ওঠে। আবার সৃষ্টি হয় শাস্ত্র। আবার আসে রক্ষণশীলতা, আবার আসে জীবন ও জড়ের যুদ্ধ, গতি ও স্থিতির শক্তি পরীক্ষা। তাই মানুষের আর জয় লাভ করা হয় না, সে কোন এক অজানিত মায়াচক্রে শুধু ঘুরেই মরে ঘুরেই মরে। মানুষের মুক্ত বুদ্ধির প্রয়োজন সবচাইতে যেখানে বেশী, সেই খানে এসে সে নুইয়ে পড়ে। তার সকল গর্ব্ব সকল অহঙ্কার চূর্ণ করে দিয়ে ভিখারীর মত প্রার্থনা করে, 'ওগো আমায় বাঁচাও'!—তার প্রার্থনা কেউ শোনে না। কিন্তু তার মুক্ত বুদ্ধির আলোকে তার অতি প্রিয় ধরণীকে সে যা নূতন সংগ্রহ দিয়ে যেতে পারতো, যা পেয়ে তার বংশধরগণ তার চাইতে অন্ততঃ অধিক সুখী হতে পারতো, তার সেই অমূল্য দানও অতিমানবীয় শক্তির কাছে প্রার্থনার ভেতরে ডুবে যায়। Russell তাই বলেছেন, মানুষের এই অবস্থায় তার উচ্চশির ও স্বাধীন চিন্তাকে বাঁচাতে হলে প্রয়োজন "a spirit of firey revolt of fierce hetred of gods."—কিন্তু দুর্ব্বল মন যে সহায় খুঁজে মরে, সে কি নিয়ে জীবনের পথে যাত্রা করবে?

ঘন কুয়াসা ঘেরা অর্থে সাগরে ভাসমান মানব জীবনের ক্ষুদ্র আশ্রয় ভেলা—চারদিকে তার বিরাট অন্ধকার। মাঝে মাঝে কোন তুষার গহ্বর থেকে ভেসে আসে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ, ছুঁয়ে যায় জীবনের দীপ, কত জীবন নিভে যায়—আর জীবিতদের বুক কেঁপে কেঁপে ওঠে! চারিদিকে সিন্ধুর অশ্রান্ত গর্জ্জন তার ক্রোধদীপ্ত কল্ কল্ উচ্ছল গতি, অথচ কেহ নেই। মানুষের এ অনন্ত বিপদে কেহ নেই যে তাকে আলো ধরে পথ দেখিতে নিয়ে যায়। একটি ক্ষুদ্র দীপ মাঝে মাঝে মিট মিট করে জ্বলে—মানুষেরই হাতে—তার জ্ঞানের দীপ শলাকার। পথ দেখা যায় যায় না—দীপ আবার নিভে যায়। আবার সেই ঘন অন্ধকার—আবার সেই বিভীষিকা—আবার সেই সিন্ধুর ভয়ানক গর্জ্জন!

মাভৈঃ—দীপ নেই—নাই থাক, আলো না জ্বলে নাই জ্বলুক, তবু আছে মন, আছে তার সৃষ্টি ক্ষমতা, আছে তার স্বচ্ছন্দ গতি। তার যতটুকু আয়ু তারি ভেতরে সে গড়বে, অন্ধকারের ভেতরেই আলোর সৃষ্টি করবে, এই অনন্ত দুঃখের ভেতরেই আনন্দের মেলা বসিয়ে দেবে, জীবনের প্রতি পরাজয় থেকে সৌন্দর্য্য আহরণ করে এক বিপুল আনন্দের মন্দির রচনা করবে, আর সেই মন্দির চূড়ায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতির আঘাতকে নিষ্ঠুর উপহাস করবে। এইখানেই মানুষের প্রকৃত জয়।

www.pathagar.com

আনন্দের এই মন্দির রচনাই মানুষের শ্রেষ্ঠ আর্ট এবং জীবনের tragedy থেকেই এর সৃষ্টি। এই সৃষ্টিতেই মানুষের মুক্তি, এতেই তার জীবনের সার্থকতা।

'Of all the arts tragedy is the proudest, the most triumphant ; for it builds its shining citadel in the very centre of the enemy's country ; within its walls the free life continues, while the legions of death and pain and despair and all the servile captains of tyrant fate, afford the burghers of that dauntless city new spectacles of beauty.'

www.pathagar.com

কুসংস্কারের একটা দিক

মুহম্মদ শামসুল হুদা

আমাদের শক্তি যেখানে কার্য্যকরী হবার সুযোগ পায় না সেখানে আমাদের স্রষ্টার শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে ব্যর্থ হয়ে যায়, আর সে ব্যর্থতার জন্য দায়ী আমরাই, মন আমাদের বন্ধনমুক্ত নয় বলে। বন্দী মন আপনার অন্তর্নিহিত শক্তির সামর্থ্য উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। সে শুধু বিধাতার উপরেই সমস্ত নির্ভর করে থাকে, আর তাতে করেই সে বিধাতার শক্তিকে হ্রাস করে দেয়। কারণ স্রষ্টার শক্তি যে যুগ যুগ ধরে সৃষ্টির ভিতরে প্রকাশ পেয়ে আসছে তা' সেখানে হয়ে ওঠে একান্ত অসম্ভব।

এজন্যই মানুষের অন্তরে থাকা চাই সৃষ্টিক্ষুধা, যার মুক্ত অভিব্যক্তি যুগ যুগ ধরে দেখে আসছি আমরা এই দুনিয়ায়। জগতের যা' কিছু পরিবর্ত্তন, আর এগিয়ে চলা—এসবই মানুষের আত্মশক্তির প্রকাশ। এমনি ধারা কাজ যাঁরা করতে পারেন তাঁদের মন সকলদিকে বন্ধনমুক্ত—তাঁরা পুরনো আচার-বিচারকে সর্ব্বতোভাবে মানতে পারেন না। সামাজিক, প্রাদেশিক কোনো কুসংস্কারই তাদের ছুঁতে পারে না কোনো কলুষস্পর্শে।

কুসংস্কার আমরা কাকে বলি? —যা' বুঝি না, যা' আমাদের বুঝবার প্রয়োজনের বাইরে অথবা যা বুঝেও তার আবশ্যকতা আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে উপলব্ধি করতে পারি না—স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনাকে উপেক্ষা করে তাকেই গ্রহণ করতে যাবার যে ব্যর্থ প্রচেষ্টা সেটিই কুসংস্কার ; আর সে কুসংস্কারের মধ্যে যে মানুষ তার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে ঢেলে দেয় তার জীবন সুন্দর সার্থক হয়ে ফুটে উঠবার অবকাশ কোনো দিন পায় না। পিছনের দিকে সব সময়ে থাকে তার নজর, নিজের দিকে চাইবার অবসর তার কোথায়? কুসংস্কারকে যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি একে এড়িয়ে চলাকেও আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি না। যা' এড়িয়ে চলা বা বাদ দিয়ে চলা দরকার, তাকে উপেক্ষা করতেই হবে—এটা পারাটাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের দুর্ব্বলতা। বর্জ্জনীয়টাকে আঁকড়ে ধরে রাখার যে মোহ তাকে সর্ব্বোতভাবে অগ্রাহ্য করতে না হলে কোনো কুসংস্কারেরই প্রয়োজন হতো না কোনো কালে। অবশ্য এই সংস্কারও কালে কালে কুসংস্কারে স্বভাব, কিন্তু সময় ও কাল ভেদে নিশ্চয়ই তার ওলট পালট ঘটে। একদিনের আচারকে অন্যদিনের বিচারের কাছে একান্ত নিরূপায়ভাবেই তার মানতে বাধ্য হয়। এতদিন হয়ে আসছেও তাই—তা'না হ'লে সমগ্র বিশ্ব জগত আমাদের কাছে ব্যর্থতার এক ম্লান ছবি নিয়েই দাঁড়াত।

কিন্তু বর্ত্তমান মুসলমান জীবনে কুসংস্কার ও গতানুগতিকতার মোহ এতখানি অস্বাভাবিক হয়, আজকের দিনের যে দুনিয়া তা একান্ত অর্থহীন বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে আমাদের কাছে। এদের সামাজিক জীবন রাষ্ট্রীয় ও নৈতিক জীবন এই কুসংস্কারের আওতায় পড়ে আদৌ স্ফূর্ত্তি লাভ করতে পারছে না। যে ধর্ম্ম মন্ত্র সমগ্র জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে আসছে ভীষণভাবে মারাত্মক সেটাই। কতকগুলো প্রাচীন আরবী প্রথার সংকীর্ণ

www.pathagar.com

গণ্ডীর ভিতরে থেকে এরা বহির্জ্জগতের দৈনন্দিন পরিবর্ত্তনের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছে না তাতে করে এদের দৃষ্টি অনেকখানি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। অমন ক্ষীণ-দৃষ্টি নিয়ে ধর্ম্মজীবন গড়ে তোলা যায় না। যুগে যুগে ধর্ম্মও পরিবর্ত্তনশীল—তাতেও অচলতা আর জড়তা এসে পড়ে।

যুগের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিবর্ত্তন মানুষের জীবনে অলক্ষ্যে এসে পড়ে তার প্রতি পরিস্কার পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করা মানুষের একটা কর্ত্তব্য ; তা' না হ'লে সে পরিবর্ত্তন সার্থক হবার সুযোগ পায় না। কোন যুগ, কোন সমাজ অথবা দেশকে যেখানে এনে দাঁড় করায় সেখান হতে এগিয়ে চলাই যুগধর্ম্ম। যুগধর্ম্মের একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যায় পরিবর্ত্তন বলে। পরিবর্ত্তনটা স্বাভাবিক। পরিবর্ত্তন যখন সত্যিকার রূপ নিয়ে এসে দাঁড়ায়, তখন সে মানুষের বহুদিনের মমতা দিয়ে গড়া যে সমস্ত আচার অভ্যাস তা সম্পূর্ণ চূর্ণ করে দিয়ে মানুষের নিত্যকালের আকাঙ্ক্ষা ও জিজ্ঞাসাকে নূতন করে জাগিয়ে তোলে। এই জেগে ওঠার দলে যাঁরা যোগ দিতে পারেন, তাঁরা আত্মোপলব্ধি করতে সমর্থ—কিছু একটা গড়ে তোলার সামর্থ্য তাদের ভিতরেই বারে বারে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। স্পষ্ট করে বলতে গেলে তাকেই বলতে হবে যুগ মানবের ধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগে বাংলার মুসলমানদের জীবনে এমনি কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। সেজন্যই তাদের প্রতিদিনের প্রকাশ সুন্দর নয়, দেহ শক্তিমান নয়, মন মুক্ত নয়, প্রাণ সরস নয়, আর আকাঙ্ক্ষা সতেজ নয়, তাদের সমগ্র জীবন সর্ব্বদিকে অবসাদগ্রস্ত।

আগেই বলেছি ধর্ম্মজীবন তাদের সমগ্র জীবনকে পরিচালিত করছে। কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি তাদের যে মনোভাব তাতে করে তাদের জীবন ব্যর্থ না হউক বহুদিক দিয়ে কলঙ্কিত যে হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সে ধর্ম্ম বা ধর্ম্মরক্ষা নিয়ে তারা উঠে পড়ে লেগেছে, তা যে শুধু পরিবর্ত্তনকে উপেক্ষা করছে তা নয়—সেটা যুগ-মানবের অন্তরের নিবিড় যোগকে অস্বীকার করে তাদিগকে এতখানি পিছনের দিকে টেনে ধরেছে যে, যুগসত্য তাদের কাছে খুবই অস্বাভাবিক আর অদ্ভুত বলেই ঠেকছে। অতীতের প্রতি তাদের টান খুবই প্রচণ্ড তাই বর্ত্তমান তাদের ব্যর্থতায় ভরপুর। যে মুসলমানদের ভিতরে একদিন ছিল দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা আর তেজোবহ্নি তা আজ কোথায় ডুবে গেছে! সাধারণ মুসলমান আজ একথা বুঝে না, বা বুঝবার শক্তিতে তাদের কুলোয় না যে, পিছনের দিকে চাইতে গেলে সব মনের জিনিষকে দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু যে দিকেই ফিরি সে দিকেই যে আমার সমুখটা দেখা দেয়। আরা আজ ফিরে আছি সমুখের দিকে, আর চেয়ে আছি পশ্চাতের পানে। মুসলমানদের জীবন আজ কতকগুলো পুরনো মামুলি ধর্ম্ম—কথার সমষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর সে কথার বোঝা টানতে টানতেই তারা এসে পড়েছে আখেরি গোরস্থানে। কথা থাকা ভালো যদি তা অতীতকে বর্ত্তমানে রূপান্তর করে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যের সমন্বয় ঘটায়। এমন সমন্বয় লাভ মুসলমানদের ভাগ্যে আছে বলে বিশ্বাস হতে চায় না।

পরিবর্ত্তনকে উপেক্ষা করে যে অতীতের প্রতি তাদের এতটা আগ্রহ সেটা কি? তা ধর্ম্ম। অতীত যুগ যুগ ধরে সাধনা সঞ্চয় করে রাখে মানুষের অগ্রগতির জন্য। কিন্তু সে সাধনা এদের জীবনে সত্যিকার কোনো রূপ যে নিতে পেরেছে তা কিছুতেই বলা যায় না। সে অতীতের প্রতি এদের যে টান তা মোহ। এই মোহকেই তারা সাধনার রূপ বলে গ্রহণ করে

নিয়েছে। তদুপরি, তাদের ভবিষ্যতের মোহ আরও মারাত্মক। বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করে অতীত দিয়ে ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলবার নিরর্থক একটা প্রয়াসই তারা করছে—যা একেবারেই অসম্ভব।

ধর্ম্ম তাদের জীবনে যে রূপ নিয়েছে তাকে ধর্ম্ম না বলে কতকগুলো চিরাচরিত বিধি নিয়মের নিষ্ঠুর অভ্যাস বলা চলে। ধর্ম্ম আর অভ্যাস এ দুটাতে মিলের চাইতে গরমিলই খুব বেশী। ধর্ম্ম চিরন্তন, আর অভ্যাস অসত্য, ভঙ্গুর। নমাজ, রোজা, হজ্জ, জাকাত আর কলেমা যে পাঁচ চিজের উপর আমাদের ইহকাল-পরকাল নির্ভর করছে, তা আমাদের প্রতিদিনের পালিত অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। অতীত বজ্রকণ্ঠে আদেশ হেনেছে take it for granted এই যে মেনে নেওয়া, এখানেই মুসলিম জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ভয় দেখিয়ে যেখানে ভক্তি আদায় করা হচ্ছে, সেখানেই কি মানুষ ভক্ত? এক বেলা নমাজ বাদ পড়লে যে হাবিয়া দোজখের ভয়াবহ বহ্নিশিখা হতে নিস্তার পাওয়া যাবে না—এ বাণী তেরো শত বৎসর পর্য্যন্ত স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির বুকে যে প্রেম ক্ষুধা তাকে চির নির্ব্বাসিত করে দিয়েছে। এতে করে ভক্তির চাইতে ভয়ই প্রবল হয়ে উঠেছে মানুষের অন্তরে। মুসলমানের বুকে আজ সে প্রেম-ক্ষুধা নেই যে তা'দিগকে মুক্তি বেহেশ্‌তের দ্বারে পৌছে দেবে।

এটা অতীতের দোষ নয়—দোষ এদেশের বর্ত্তমান যুগের মুসলমানদের বিচার বুদ্ধির। যে যুগে হয়েছিল হজরত মুহম্মদের আবির্ভাব তখনকার আরবীরা ছিল অতিমাত্রায় হিংস্র, সর্ব্বদিকে জ্ঞানপঙ্গু। তাদের জীবনে ছিল যে পাশবিকতা আর অনমনীয়তা তাকে শোধ্‌রাতে হয়তো ভয়বহ তৌহিদেরই প্রয়োজন হয়েছিল। আজকের জ্ঞান-দীপ্ত যুগেও সে আমরা সেই ভয়াবহ তৌহিদকে এতখানি মোলায়েম করে দেখতে পাচ্ছি না তাতে আমাদের দৃষ্টির দোষ দেওয়া চলে বৈকি? আজো নমাজ অভ্যাস করতে চাচ্ছি আমরা হাবিয়া দোজখের অগ্নিশিখার ভয়ে। এর মত বিড়ম্বনা আর কি হতে পারে? যাকে ভয় করে গ্রহণ করতে হয়, সেটা চিরন্তন সত্য হলেও গ্রহীতার পক্ষে সেটা কুসংস্কার। এই বিড়ম্বনা আমাদের আত্মবিশ্বাস, আত্মোপলব্ধি আর স্বাধীন চিন্তা ধারাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। আমরা নিশ্চয়ই জানি আত্মোপলব্ধি আত্মবিশ্বাস আর স্বাধীন চিন্তাই সকল ধর্ম্মের মূল ভিত্তি। কোন নবী, পয়গম্বর মানুষের self জিনিষটাকে অস্বীকার করতে কোন কালে কোন উপদেশ দিয়েছেন কিনা জানি না। যদি সত্যিই দিয়ে থাকেন তা হলে তাঁর সে আদেশ সর্ব্বতোভাবে উপেক্ষণীয়।

আমরা যে সব আদেশ নিষেধের ভিতর দিয়ে খোদাকে বুঝতে চেষ্টা করছি, তা কতো সংকীর্ণ করে নিয়েছি আমরা। যে ইসলাম তার কোনো রূপই দেয়নি—যে অপরূপ, অসীম, অবিনশ্বর আর অকুণ্ঠিত, তাকেই একান্ত সংকীর্ণ ক্ষুদ্র করে গড়ে তুলেছি আমরা। যেখানে ভয় প্রদর্শন করে তার উপলব্ধি শেখানো হচ্ছে তাতে করে তার সংকীর্ণতা আর কুণ্ঠাই কি প্রকাশ পাচ্ছে না? স্রষ্টার সঙ্গে সৃষ্টির যা সম্বন্ধ তা শিল্পী আর তর রচনার সম্বন্ধ। ছবিতে আমরা কি দেখতে পাই? আমরা দেখি শিল্পীর self জিনিষটাকে। তাই স্রষ্টার সম্বন্ধে আমাদের dualistic ভাব পোষণ করাটাই অস্বাভাবিক আর এরই জন্যই হয়ত ইসলামে 'তৌহিদই' প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বেশী করে।

www.pathagar.com

এইত গেল আমাদের ধর্ম্মজীবনের কথা। এর চাইতে অসুন্দর জীবন অন্য কোনো দেশে কারুর আছে কিনা জানি না। এমন কি আমরা যাঁদের দিকে তাকিয়ে আছি আমাদের আপনার মানুষ বলে। সে আরবীরা, তুর্কীরা আর মিশরীয়রা কেহই অমন হীনবৃত্তি পোষণ করছে না। এসব বুদ্ধিবিভ্রাট আর ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘুঝতে হলে কি করতে হবে আমাদের? যে যুগে আমরা এসেছি, সে যুগের ভাব ও চিন্তাধারাকে দিয়ে গড়ে তুলতে হবে যুগোপযোগী একটা অখণ্ড জীবন। যুগকে অস্বীকার করে পূর্ব্ব পুরুষের ভাবধারা দিয়ে জীবনের পথে চলা দুষ্কর—অজ্ঞতাও বটে। অবশ্য তাদের থেকে যে আমরা প্রেরণা কিছুই পাবনা তা' বল্‌তে পারি না। তবে শুধু তাদের দিয়ে ত কিছুই হবে না। আমাদের জন্ম যে দেশে যে যুগে যে আবহাওয়ায়, সে দেশের সে যুগের যা সুরুচি-সম্পন্ন, যা উন্নত তাকেও গ্রহণ করতেই হবে। তা' হ'তে শাস্ত্র কি অন্য কিছু আমাদের নিবৃত্ত করলে, অথবা নিজেই যদি অস্বীকার করি, তা'হলে আমাদিগকে হতে হবে বঞ্চিত, ব্যথা-নিপীড়িত। তখন আমরা উন্নত হব না, সমৃদ্ধ হব না, হব দুর্ব্বলতা আর অবসাদগ্রস্ত পঙ্গু জীব। আমাদের কিছুই হবে না দেশের, ধর্ম্মের আর সমাজের—শুধু বিশ্ব মানবের গলগ্রহ আর কলঙ্ক হয়েই থাকব আমরা। প্রতিবেশীদের ঘৃণাই বর্ষিত হবে আমাদের শেরওয়ানী, চোগার উপর বিধাতার আশীর্ব্বাদ রূপে। পারিপার্শ্বিকতাকে আমরা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। একে অপ্রয়োজনীয় করে রেখে আত্মপ্রতিষ্ঠানের ভিত্তি প্রস্তুত করা যায় না—নিজকে গৌরবান্বিত করা যায় ত দূরের কথা।

এমনি করে দিনে দিনে আমরা বাধা সৃষ্টি করছি আমাদের অগ্রগতির পথে। ভাবি যা' ইসলাম, তথা গৃহীত ইসলাম আমাদের দান করেছে তা হতে এতটুকু নড়চড় হতে পারে কিনা। আর শেষ পর্য্যন্ত ওটাকেই আকড়ে ধরে রেখেছি। বুঝি না, ঋতু-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রকৃতি আপন রূপ বদলায় তাকেই হরেক রকম করে দেখতে পেয়ে আমাদের আনন্দ আর ধরে না। যদি সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতিটা চিরকালই এক রূপ পরিগ্রহ করে থাকত, তাতে কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হত না—তবে কি বীতরাগই না জন্মাত ওর প্রতি। তাই পরিবর্ত্তনকে গ্রহণ করতে পারছি না বলেই বলছিলাম। আমাদের শক্তি যেখানে অকিঞ্চিৎকর বিধাতার শক্তি সেখানে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যর্থ। আমার বুদ্ধি জ্ঞানে আর গ্রহণশীলতায় গড়ে তুলবো যে একটা নতুন জগৎ, তাকে আমায় যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর প্রভাবান্বিত যে নয়, তা কেমন করে বলি। তাই বিধাতার শক্তি ব্যর্থ। এর কারণ আমরা প্রত্যাগতকে মেনে নিয়েছি আপনার শক্তি-প্রাচুর্য্য দিয়ে, নতুন করে গ্রহণ করতে পারিনি। এই গ্রহণশীলতারও একটা ব্যাখ্যা দিতে হবে। গ্রহণ করতে পারি তখন, যখন হাতে গ্রহণের কিছু থাকে, আর সেই গৃহীত বস্তুটাকে নিয়ে আমাদের নিজের মত করে গড়ে তুলে নিতে যদি পারি, তখনই গ্রহণটা আমাদের পুরোপুরি হবে। তার যা আছে শুধু সেটুকু নিলে কিছুই নেওয়া হবে না। এমনি করে নিতে পারিনি আমরা ইসলামকে। ইসলামের আমরা যেটুকু নিয়েছি সেটুকু কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নিরর্থক আর অপ্রয়োজনীয়। এর প্রমাণ সেকালের মতো করে একালকে গড়ে তোলার ব্যর্থ প্রয়াস। সুতরাং এটা শোধরানো আবশ্যক। এই শোধরানোর মানে ইসলামকে অস্বীকার করা নয়—একটা সত্যকেই রূপান্তর করে সৃষ্টি করা। তাতে একদিকে যেমন সত্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি অন্যদিকে স্রষ্টার পক্ষে সেটা বিশেষ উপকারী। ঠিক এমনি করে গ্রহণ করতে না পারলে তাকে ক্ষুণ্ন করা হবে নানাদিক দিয়ে।

www.pathagar.com

জীবনের নব নব উৎসবে যোগ দিতে হলে আমাদিগকে কুসংস্কারমুক্ত হতে হবে। চিন্তাকে বুদ্ধিকে করতে হবে সতেজ, স্বাধীন, সন্ধানপর, আর গ্রহণশীল, নব নব পরিবর্ত্তনের স্রোতের গা ভাসিয়ে না দিয়ে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে অনুসন্ধিৎসু করে তুলতে হবে। আমাদের সমাজ–জীবনকে জাগাতে হবে। বিশ্ববোধ আর ব্যক্তি জীবনে জাগাতে হবে আত্মবোধ ব্যক্তিবাদ আর পারিপার্শ্বিকতার প্রতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি। এক কথায় আমাদের অগ্রদূত হতে হবে নব যুগের আর নবজীবন অভিযানের। তাহলে বিধাতার শক্তিও হবে অব্যর্থ। আর আমাদের শক্তিও হবে অপরিমিত। সে শক্তি নব নব প্রয়াসের তীব্রতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে, আর আমাদের জীবনের সকল বাঁধন ঘুচিয়ে দিয়ে জয় যুক্ত করে তুলবে। সমগ্র জীবনে একটা মুক্তির আস্বাদন গ্রহণ সহজ ও আনন্দময় হয়ে উঠবে তখন, যখন নানা রকমের কুসংস্কারকে উপেক্ষা করে বর্ত্তমানকে ধন্য করবে জীবনের স্বাভাবিক প্রকাশের আনন্দ।

–

www.pathagar.com

ময়মনসিংহের গীত

মোসলেম উদ্দিন খাঁ

শতকরা নিরানব্বই জন বাঙ্গালাভাষী বাঙ্গালী মোসলমানের মাতৃভাষাই উর্দ্দু বলিয়া ফতোয়া দেওয়া শুধু প্রবঞ্চনাপূর্ণ মিথ্যা কথায় চরম ধৃষ্টতাও বটে। নেতা সেজে সমাজের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাওয়ার দিন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। মাতৃভাষার চর্চ্চা করিলে কি জানি মৃত সমাজ দেহে প্রাণ সঞ্চার হইয়া পড়ে, আর তা হলেই এ মৃত দেহটা নিয়া গৃহিনীর কাজ করা চলিবে না। তাই আজ উহাদের এত ভয়। শহরগুলি ছাড়াও যে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব আছে, তাহারাও যে বাংলা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সাধক, উর্দ্দু সেখানে এতটুকুও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, — একথাগুলি যেমন সত্য, সেই সত্য উপলব্ধি করার মত লোকও তেমনই বিরল। মুসলমান নবাব বাদশাহরা বাংলা ভাষার কতখানি উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন, বাংলা ভাষা মুসলমানদের সৃষ্টি কিনা, সে সকল কথা আর আজ আলোচনা করিব না। (কারণ তাহাতে অনেক বিপত্তি আছে)। শুধু দেখাইতে চেষ্টা করিব, বাঙ্গলা ভাষার সেবা মুসলমানেরা আজও কিভাবে করিতেছেন। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়াছিলেন Our nation lives in cottages, শতকরা নব্বই জন এই কুঁড়ে বাসীকে নিয়াই ত আমাদের নেশন। তাহাদিগকে বাদ দিয়া যে জাতি তাহা বাঙ্গালী জাতি নয়, তাহারা সকলেই বাংলা ভাষী। ধান কাটার পর সুখের দিনে তাহারা 'আইলাম বড় অরণ্যে, লক্ষ্মী দিদির চরণে গাহিয়া লক্ষ্মী ঘরে তুলিয়াছে', দুঃখের দিনে 'কপালের দোষ দিব কারে, সকলি কপালে করে' বলিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়াছে। কখনো মনকে প্রবোধ দিয়াছে—'মনরে কিসের এত ভাবনা, এ দিনত তোর রবে না।' কখনো নিরাশায় হাল ছাড়িয়া গাহিয়াছে 'মন মাঝি তোর বৈইঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না।' সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যা বেলায় আঙ্গিনায় মাদুর পাতিয়া নাতিপুতিদিগকে নিয়া কত রাজরাজড়ার গল্প, কত রাক্ষস খোক্কসের গল্প, কত অভাগিনীর দুঃখের কাহিনী বলিয়া শ্রোতাদের দরদ জাগাইয়াছে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িয়া কোরানের আদেশ পালন করিয়াছে। কিন্তু শান্তি পাইয়াছে গানে। বাংলার মাটিতে তার জন্ম, বাংলার ফলে জলে সে পালিত ; বাংলার মাটিতেই সে দেহরক্ষা করিবে, তবে বাংলা ভাষা তাহার পর হইবে কেন?

আমি ময়মনসিংহের লোক। গ্রামে অনেক রকম ছড়া, গীত, পাঁচালী শুনিয়াছি। শুনিয়া কত রজনী জাগিয়া কাটাইয়াছি। হাতের তালুতে তাল রাখিয়া যখন গায়েন গীত গাইত, তখন আমরাও হাতে তাল রাখিয়া শুনিতাম। যেই '*পাঠ*' পাঁচালী বলিতে পারিত তাহাকেই গীত ধরিতাম এবং এক চিলিমি তামাকের বিনিময়ে '*পাঠ*' শুনিয়া নিতাম। দক্ষিণারঞ্জন বাবুর 'ঠাকুর মার ঝুলি' তখনও গাড়ী বোঝাই হইয়া আমাদের দ্বারে ধুপুস করিয়া পড়ে নাই। মা এবং দিদিমার কাছে তার চেয়েও romantic গল্প শুনিতে পাইতাম। মধ্যে একবার এসব ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। আজকাল এসবের আলোচনায় পূর্ব্ব আনন্দ যেন দ্বিগুণ হইয়া ফিরিয়া

www.pathagar.com

আসিয়াছে। আমরা শহরের আওতায় পড়িয়া যে সকল গান শুনিতে পাই, সে সকলের সুর যেন বিদেশ হইতে আমদানী করা। কিন্তু পল্লীর গানগুলি খাঁটি বাংলার। বাংলার আবহাওয়ার সঙ্গে যেন খাপ খাওয়া। ভাষার সঙ্গে সুর যেন একেবারে 'গলামিলে' গিয়াছে। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Sound echoes the sense. ময়মনসিংহ জিলার এই রকম গান এবং গীত (ballads) অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। এখানে যাহা লিখিত হইল সবগুলি ময়মনসিংহ হইতে সংগৃহীত বলিয়া ময়মনসিংহের গীত নামে অভিহিত করা হইল। প্রত্যেক পল্লীগ্রামেই এই রকম গীত ইত্যাদি আছে। এইগুলি পাশ্চাত্য সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না, দেশ–কাল–পাত্রও বিবেচনা করা দরকার।
গীতগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম সাধারণ গান, দ্বিতীয় ছড়া, পাঁচালী, তৃতীয় পালা গান ও গল্প।

সাধারণ গান

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'যে চলে সেই গান গেয়ে যায় সব পেয়েছি দেশে।' এই দেশে ধন দৌলতের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও যা আছে তাতেই যেন লোকগুলি মহা সন্তুষ্ট। আর তাতে তারা পথে ঘাটে গানের ফোয়ারা ছুটাইয়া চলিতে পারে ; গানগুলি প্রায়ই প্রেমমূলক। প্রেমের মধ্যে বিরহই সব চেয়ে সুন্দর। প্রেমিক প্রেমিকার বিরহ বিদগ্ধ হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাস যখন গানের ছন্দে আত্ম প্রকাশ করে, যখন নিষ্পিষ্ট প্রেমিকার বেদনার সুর গানের সুরে করুণ ভাবে ফুটিয়া উঠে তখনই আমরা বুঝিতে পারি 'Our sweetest songs are those that telleth saddest thought'. যখন রুদ্ধ প্রেম সমাজরূপী আয়ান ঘোষের তাড়নায় দুকূল ছাপাইয়া কূলমান ভাসাইয়া ছুটিতে চায়, তখন কার বাঁশী যেন আয় আয় করে ডাকে। এই বাঁশীটি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম হইতে আরম্ভ করিয়া চুনো পুঁটি অনেক কবিরই কাব্যের মসলা জোগাইয়াছে। পল্লীকবিদের হাতে পড়ে বাঁশীর যুগ যুগান্তের সুর যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে। পল্লী বাংলার বুকের জ্বালা সেই সুরের মূর্ছনায় কিরূপ ভাবে আকুল হইয়া উঠে কবির বর্ণনায় আমরা তাহাই দেখিতে পাই।—

যমুনার কিনারে বাঁশী বাজায়ো না কালাচান
বাজায়োনা কালাচান গো বাজায়োনা সোনার চান
শুইনে কালার বাঁশীর গান, বাইরম বাইরম করে যে প্রাণ
(মনে লয় গো) হাতের বাজু বন্ধক দিয়া শুনি কালার বাঁশীর গান।

গানের সুরটি এমনই করুণ এবং বেদনাত্মক যে সুরের ভিতর দিয়া ভাবটি ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে। গানগুলির রচয়িতার নাম জানা শক্ত, কবে উহার রচনা হইয়াছিল বলাও শক্ত। যুগ যুগ ধরিয়া এই গানগুলি গীত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক যুগেই উহা নূতন আমোদ দান করিবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আর একটি গানের কতকাংশ মনে আছে,

আমি লজ্জা পাইলাম নিকুঞ্জে আসিয়া
এল না শ্যাম কি দোষ জানিয়া
নিদাগেতে দাগ লাগাইল প্রাণের বন্ধু কালিয়া
    এল না শ্যাম কি দোষ জানিয়া

মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' এইরূপ একটি লাইন মনে পড়ে—

www.pathagar.com

কোন দোষে কান্ত শুনি
দাসী শকুন্তলা দোষী ও চরণ যুগে
এ বনে সুখ-পাখী ছিল বাসা বাঁধি
কেন ব্যধি বেশে আসি বধিলে তাহারে?

'জলভরা' নামক এক রকম করুণ গান আছে। কেমন করিয়া কুলবালা জল নিতে আসিয়া কুল হারাইতে বসিয়াছে তাহাই বর্ণনার বিষয়। সাধারণতঃ নৌকা বাইচে এইরকম গীত গাওয়া হয়। বাদ্যের তালে এবং সুসজ্জিত নৌকার হিন্দোলে তালে তালে যখন 'বয়াতী' গান ধরে তখন মনে হয় নিরানন্দ বাংলার সকল আনন্দ যেন একদিনে জমাট বাঁধিয়া প্রকাশিত হইতেছে। ছন্দটি ফারসি মোতাহরিণ ছন্দের মত—

জল ভরিতে যাও কন্যা ধীরে ফালাও পাও
কলসী কাঁখে জলের ঘাটে আড় নয়নে চাও
গো জল ভরিতে।
জল ভর যুবতী কন্যা জলে দিছ ঢেউ
হাসি মুখে কও কথা সঙ্গে নাই আর কেউ
গো জল ভরিতে।

এখানে রবি বাবুর একটি কবিতা উল্লেখ করা যাইতে পারে—

ওই যে শব্দ চিনি-নূপুর-রিনিকি-ঝিনি,
কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।
যদি তরিয়া লইবে কুম্ভ এসো ওগো, এসো মোর
হৃদয় নীরে॥

এই গানগুলি রাধাকৃষ্ণ-লীলা-সম্বলিত। তাই বলিয়া মনে করিবেন না এইগুলি হিন্দু কবির রচিত। প্রায় সব গুলিই মুসলমান বয়াতিদের রচিত এবং মুসলমানগণ দ্বারাই এ গান গীত হয়। এখন প্রশ্ন হইতে পারে মুসলমানেরা তাঁদের এত সব প্রেমচিত্র থাকিতেও এই লীলার মধ্যে কি রস পাইলেন? উত্তর সোজা; মুসলমান মোল্লা সাহেবের 'যাও কাফের লোগ সব, ইস্‌মে কুচ্‌ মৌকা মিলেগা নেই' বলিয়া তাঁদের ত্রিসীমা হইতে তাহাদিগকে বহিস্কৃত করিয়া দিয়াছেন। তাহারাও ভাবিয়াছে এ সকল কেতাবী কথা নিয়া বাংলায় গান রচনা করা মহাপাপ। কিন্তু তাই বলিয়া ত মানুষের প্রাণের কাব্যরস শুকাইয়া যাইতে পারে না। যে দিক দিয়া সুযোগ পাইবে বাহির হইবেই। বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে তাদের বনিবনাও হইল, আর তারা রাধা-কৃষ্ণের লীলা লইয়া গান রচনা করিল। জগতের ইতিহাস সাক্ষী, তুমি যাহাকে উপেক্ষা করিবে অন্যে তাহাকে আশ্রয় দিয়া লাভবান হইবে। প্রেমভাব পূর্ণ গান আরও অনেক রকম আছে এবং সেগুলিও বিশিষ্টস্থান অধিকার করিতে পারে।

প্রেম জ্বালায় প্রাণ যায়—

সর্পের বিষ ঝাড়িলে নামে, প্রেমের বিষে উজান ধায়
কি করবে তোর ওঝার বাপে কাল সাপে যারে খায়।
হাঁটিয়া যাইতে পাড়ার লোকে মন্দ বলে সর্ব্বদায়

www.pathagar.com

লোকের মন্দ, পুষ্পানন্দ অলঙ্কার কইরাছি গায়
প্রেম জ্বালায় প্রাণ যায়।

বাউল গান নামে আর এক রকম গান প্রচলিত আছে। উহা কতকটা বৈষ্ণব ও সুফী মতের। গানগুলির সুর তত করুণ নয় কিন্তু ভাব বড়ই দুরূহ।

মদনপুর ছাড়ায়ে ত্রিপুণীর ঘাট পাবে
তিন দিকে তিন মাঝি ডাকে কে কে
পারে যাবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মোল্লা সাহেবদের বরকতে গান বাজনা হারাম হইয়া গিয়াছিল। তবুও কয়েকজন ফকিরের ব–দৌলতে লোকে গান বাজনা করিবার সুযোগ পাইল। তাহা অনেকটা সুফী মতেরই প্রতিধ্বনি। এই গানগুলি মুর্শিদী গান বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছে। আজকাল মুর্শিদী গান মাসিক পত্রিকায় প্রায়ই বাহির হয়। মুর্শিদী গানে মুসলমান পল্লী কবিদের অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখা যায়। গানগুলি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। রাগিনী ও উদাস এবং মধুর।

লাকুতের বিকিকিনি চিনলেনারে মন বানিয়া
নাছুতে নাম সুজে, যমদূতে মানি বুঝে
মুলকুতের ঘর কুতু হইল চিনলেনারে মন বানিয়া
জিনিয়া লইয়া আইলা দেশে, মহাজনলা বইছে কাছে
দর জান না বাও জান না ; কাঁটা দাঁড়ীর ফের বুঝ না
কেন লাগাও বেচা কেনা?
তামা কাঁসা রাং দস্তা, তাই দেখে ভুইলেছে চাকা,
কুলুর চাকে ঘুরতে আছে চোখ থাকিতে দিন কানা
নিত্যানন্দ নিক্তি ধরে, কাঁটায় কাঁটায় ওজন করে,
রতি মাসা কম হইলে নিক্তি তুলে বাট্টা কাটে
নিত্য আনন্দ বলিয়ে সবের নিকাশ হাসরে রইছে
জ্ঞান করে লইবে সবে ছৈয়দ শাহ্‌নূরে কইছে।

গানটি সৈয়দ শাহ্‌নূরের রচিত। শাহ্‌নূরের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গান আছে ; সেগুলি এখন মনে পড়িতেছে না। গানগুলি মুসলমান ছাড়া অন্যের পক্ষে সম্পূর্ণ বুঝা সুকঠিন। আর একজন সায়ের অনেকগুলি চমৎকার গান রচনা করিয়াছেন। তাঁহার ভার ও ছন্দ বড়ই মনোহর। তাঁহার নাম শীতলং ফকির, নমাজ সম্বন্ধে তাঁর একটি সুন্দর গান আছে —

স্বরূপ নমাজে দীপ্তনূর
আলেফ ছুরতে খাড়া করিয়া কেয়াম
দাল হরফে বসে থাক মিমেতে ছজুদ রে
স্বরূপ নমাজে দীপ্তনূর

... ...

শীতলং ফকিরে বলে আল্লা নিরাঞ্জন
নমাজেতে শুদ্ধমতে না মজিল মন রে
স্বরূপ নমাজে দীপ্তনূর।

www.pathagar.com

যখন নমাজ পড়িবার জন্য দাঁড়াইতে হয় তখন আলিফের মত সোজা দাঁড়াইতে হয়। আবার বসিবার সময় দাল হরফের মত বসিতে হয়। সিজ্‌দা করিবার সময় মীম হরফের মত করিতে হয়। ময়মনসিংহ অঞ্চলে লড়ক গান বলিয়া আর এক রকম গানের আসর জমে। নানাবিধ গ্রাম্য বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গান গীত হয়। দুইজন গায়েন পাল্লা দিয়া গান আরম্ভ করে। সেগুলিও বেশ উপভোগ্য।

আর এক রকম গীত স্ত্রী মহলে প্রচলিত আছে। বিবাহাদি উপলক্ষে সাধারণতঃ এইগুলি গাওয়া হয়। সকলে কোরাস করিয়া এই গান গায়। উহার সুরটি বড়ই করুণ এবং শুনিলে গান কি ক্রন্দন বুঝা সুকঠিন হইয়া পড়ে।

ছড়া পাঁচালী

ছড়া পাঁচালীতে আমাদের পল্লীগুলি প্লাবিত বলিলেও চলে। এমন বড় ঘটনাই নাই যার সম্বন্ধে পল্লী করিয়া নীরব। যখন সারা বছরের কষ্টার্জ্জিত ফসল গোলায় উঠে, তখন তাহাদের অনাবিল আনন্দ দেখে কে? ছেলের দল কত রকম কবিতা আওড়াইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। আমাদের অঞ্চলে 'বাঘাই পিঠা' বলিয়া এক রকম পিঠা তৈয়ার করা হয়। গৃহস্থের বাড়ী হইতে ভিক্ষা করিয়া চাউল আনিয়া এই পিঠা তৈয়ার করিতে হয়। একজন শরীরে চাকা দাগ দিয়া বাঘ সাজে, এবং পিঠা লইয়া দৌড়ায়, আর সকলে তাহার পিছনে দৌড়ায় ও পিঠা কাড়াকাড়ি করিয়া খায়। প্রবাসীতে উহাকে জাগগান বলা হইয়াছে। এই ছড়াটি গাহিয়া তাহারা চাউল ভিক্ষা করে।

আইলাম বর আইলাম বর
আই বড় অরণে
লক্ষ্মী দিদির চরণে
লক্ষ্মী না দিলে কড়ি
তোমারে করাম লড়িবরি
লড়ি বরি শামরে
সোনার মুকুট ভাঙরে
সোনাতে রূপার বালা
এই ঘর দেখিতে ভালা
ঘর ভালা ঘর ভালা
ঘর ভালা বাটুনী
জিত্যাইন বড় রান্ধনী
ও জিত্যাইন লড় বর
আমারে দিবে কত দর
আমি ত মাগিয়া যাই
বাঘের বয়ান গাই
বাঘাই গেছে নাগাইপুর
কিনা আনলাম চাম্পাপুর

ইত্যাদি।

www.pathagar.com

উহার সবগুলির অর্থ বোধ হয় না। উহা লক্ষ্মী ঘরে তুলিয়া লইবার একটি ছড়া বই কিছুই নহে। একটি বারমাসীতে বাংলার কোন মাসে কি খাওয়া হয়। তাহার বড় চমৎকার বর্ণনা আছে। 'চৈতে চালিতা, বৈশাখে নালিতা, জ্যৈষ্ঠে দই, আষাঢ়ে কই, শামনে শশা মিঠা, ভাদ্দরে তালের পিঠা, আশ্বিনে ওল, কাতিতে খইল্‌সা মাছের ঝুল, আগুনে মূলা পিঠা, পোষে পোড়া পিঠা, মাঘে তেল, ফাল্গুনে গাছ পাকনা বেল॥'

যখন পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে উঠে, মা তখন তাঁহার আঁচলের চাঁদকে কোলে করিয়া সোহাগ করিয়া বলেন—

আয় চান লড়্যা, কলা গাছে চড়্যা
কলা অইল বাত্তি, আমরা আবুর কপালে সোনার চাক্তি।

ছড়াটি শুনিলেই কলার বাগিচায় ঘেরা পল্লীর কথা মনে পড়ে। আবার দস্যি ছেলেকে ঘুম পাড়াইবার সকল দেশেই ঘুম পাড়ানি ছড়া আছে। কিন্তু আমাদের পল্লীজননী 'বর্গী এল দেশে' বলিয়া ছেলেরে ঘুম পাড়ান না। তিনি বলেন—

নিন্দা অলী মাগো আমরা বাড়ীত আইও।
খাট নাই পিড়া নাই আমরা আবুর চক্ষে বইও॥

কুলবধূ বাড়ীতে কত গঞ্জনা সহ্য করিতেছে। অপরিচিত আত্মীয় স্বজনবিহীন দেশে আসিয়া তাহার মন জন্মভূমির জন্য উতালা হইয়াছে। রবিবাবুর 'বধূ' কবিতায় তাহার ব্যথা বর্ণনা করা হইয়াছে। দুর্দ্দান্ত স্বামী তাহাকে মারপিট করে, পল্লীকবি তাহা করুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বধূ নদীতে জল আনিতে আসিয়া নৌকা দেখিয়া গাহিল—

কেগো যাও গাঙ্গে বইঠা বাইয়া।
আবুর মামুরে কইও গিয়া নাই'র নিত আইয়া।
উত্তর আসিল—
থাক থাক বইন গো কিল মুড়া খাইয়া
বাস্যা মাস নিয়াম আইয়া জল ঘোড়া দৌড়াইয়া

গ্রামের কতকগুলি ঘটনা লইয়া তাঁহারা যে গাঁথা রচনা করিয়াছেন তাহাও বড়ই সুন্দর। কোন পরিবারে মেয়ের স্বামী কালো ছিল। তাই শ্বশুর বাড়ীর লোকদের সহ্য হইল না, কালো জামাইকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়া ভাল জামাইয়ের কাছে বিবাহ দিবে। কিন্তু পতিগতপ্রাণা সাধ্বী মেয়ে তাহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছে—

তোমরা এমন কথা কইও না
কালাই আমার গলার মালা কালা বিনে বুঝি না।

কিন্তু তাহারা শুনিল না। জামাই শ্বশুর বাড়ীতে আসিলে পিঠা বানাইবার ধূম পড়িয়া গেল। মেয়ের অজানামতে কতকগুলি বিষের পিঠা বানাইয়া রাখিল। বধূ স্বামীকে ভাল পিঠা থালে দিয়া পাঠাইল, কিন্তু দুষ্টেরা বদলাইয়া তাহাতে বিষের পিঠা দিয়া দিল।

ভাল পিঠা লইয়া দুষ্টু হে বিষের পিঠা দিল পাতে
বিছমিল্লা না বইলা মিয়ায় পিঠা দিল মুখে।

তারপর। তারপর বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইল। কাছেই মাসীর বাড়ী ছিল। দৌড়িয়া জামাই সেই বাড়ীতে গিয়া ঠপাস করিয়া পড়িয়া গেল। চীৎকার করিয়া বলিল—

www.pathagar.com

বিষের তেজে কইলজা গেল পুড়ে
জন্মের মতন গো খালা বিদায় দেও মোরে।
বধূ চক্ষের জলে দুনিয়া ভাসাইল, তার ক্রন্দনে পাষাণ গলে।
আগেইত বলছিলাম তোমায় হে শ্বশুর বাড়ীতে যাইও না
শ্বশুর বাড়ীতে গেলে তুমি ফিরা আইবা না।

সমস্ত কবিতাটিই করুণ ছন্দে রচিত। এই সকল ছড়া এবং পালাগান যে কেবল পুরুষরাই রচনা করেন তা নয়। অনেক স্ত্রীলোকও তাহাতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদের রচনার পিছনে নিজের নাম উল্লেখ করিতেন না। কেননা তাহা বে-পর্দ্দা, তাই হয়ত কোন পুরুষ গায়ক তার পিছনে নিজের নাম যোগ করিয়া দিতেন। নিম্নলিখিত ছড়াটি একজন স্ত্রীলোকের রচিত।

রহিম নগরে মির্জ্জাপুরে লাগল কছায়ন।
গরুর গোরাট লইয়া ভারী বিড়ম্বন॥
খবরিয়ায় খবর কয় ছমির চকিদান।
তোমার দুই পুত মারা যায় ভরসা কর কার॥
শুইনা বেকরার।
শুইনা বেকরার হুঁস্ হইয়া বান্ধিল কমর।
ডাইন হাতে লইল লাঠি বাঁও হাতে ফল॥
মার মার করিয়া ছমির গোস্বায় জ্বলিল।
আল্লা-নবির নাম কিছু স্মরণ না করিল॥
জুম্মা ঘরের দক্ষিণ ধারে খালে ছিল জল
জলকাদা ভাঙ্গিয়া ছমির পাড়ি দিল খাল
মির্জ্জাপুরিয়ায় গাইল্ দিয়া কয় আয়না খালের পার
অতি তরঙ্গ নদী না বর চিরকাল॥
জানি রে ভাঙ্গে পার।

তারপর লড়াই-এর বর্ণনা ঠিক যেমনটি ভাবে যেখানে দাঙ্গা হয়, তেমন ভাবেই বর্ণনা। এই বর্ণনাটির সঙ্গে পারস্য কবিদের যুদ্ধ বর্ণনার সাদৃশ্য দেখা যায়। তাই বলিয়া তাহারা পারস্য কবিতা নকল করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাঁহারা পারসীর 'পে'ও জানেন না।

রহিম নগরিয়া হইল হাতী মির্জ্জাপুর্‌্যা লোক,
পোকের কামড়ে মরে কত শত লোক॥
কই থাকিয়া আসে লোক শূন্যেতে উড়িয়া।
পৃষ্ঠের উপর মারে কামড় না পায় খুঁজিয়া॥

অর্থাৎ মির্জ্জাপুর 'গুলাইল' নামক অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাতেই রহিম নগরের পরাজয় শুরু হইল। তাহাদিগকে মির্জ্জাপুর অনেক দূর হটাইয়া দিল। দুই গ্রামে অনেক লোক হতাহত হইল। তার পরিণাম ফল? পরিণাম অতি চমৎকার! যাহা সাধারণতঃ হইয়া থাকে—

www.pathagar.com

দারোগা সাহেব সিপাই লইয়া গেরাম ঘিরিল।
দুই গাঁয়ে দেড়শ জন আসামী ধরিল॥

তারপর পুলিশের যথা কর্ত্তব্য বিশদ ভাবে বর্ণিত আছে। কবিতাটিতে পল্লীচিত্র যেমনই ফুটিয়া উটিয়াছে তাহার পরিণামও চমৎকার করিয়া দেখান হইয়াছে।

এই সকল ছাড়া আরও অনেক রকম আমোদজনক কবিতাও আছে। ব্যঙ্গ কবিতাগুলিও বড়ই সুন্দর। আদরী নামক কোন মেয়ে স্বামীর ঘরে যাইতে চায় না। সেটি কবি ব্যঙ্গ করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আদরী যে জামাইর ঘরে যায় না কি কারণ।
শুন সবে সত্য বিবরণ॥ ইত্যাদি।

কিন্ডার গার্টেনের মত কতকগুলি কবিতা আছে তাহাও বড় হাস্যোদ্দীপক। ২/১টা উল্লেখ করার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

১। ক, খ, গ, ঘ বক মারব্যা তুলে থো।
বক হইল কুঁইয়া, মাষ্টারের নান্যে খায় চুঁইয়া॥

২। আলেফ, বে, তে, ছে, মা দুইলা ভাত দে
বাবা আইয়ে লাঠি লইয়া মা উঠিয়া দৌড় দে।

পালাগান ও গল্প

পালাগানকে আমাদের ওখানে 'লম্বাগীত' বলা হয়। এই সকল পালা গান কলিকাতা ইউনিভার্সিটির আনুকূল্যে অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। উহার আদরও যথেষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে। পালা গানগুলির অধিকাংশই মুসলমান কবিদের রচিত। আরও অনেকগুলি সংগৃহীত হইবার বাকী আছে। সে গুলিরও বর্ণনা মাধুর্য্য বড়ই চমৎকার। কতকগুলির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী। এই সকল পালা গানের বর্ণনা কৌশল রম্যা রঁলার মত লোকেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। জানিনা রম্যা রঁলার মত লোকের প্রশংসা বাংলার কয়জন লোক লাভ করিয়াছেন। কতকগুলি পালাগানে মূল ঘটনাটা সংক্ষেপে বর্ণনা করা গেল। উৎসাহ পাইলে সময় মত সবগুলি সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা আছে।

জামু খাঁর পালা

জামু খাঁর পালার বর্ণনা বড়ই মনোহর। কোথাও কোন অসম্ভব বা অলৌকিকতা নাই। তখনকার সমাজচিত্রও বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জামু খাঁ শৈশবে মাতাপিতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হন। অনাথ বালকের দুঃখের জ্বালা কবি বড়ই করুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। জামু খাঁ অগত্যা তার মামার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। সেখানে তার দুঃখ কষ্টের সীমা ছিল না। প্রায়ই তাহাকে জল ভাত খাইয়া থাকিতে হইত, কিন্তু কাজের বেলায় পান হতে চুন খসিবার উপায় ছিল না। তারপর একদিন জামু আর সহ্য করিতে পারিল না। ধান কাটিতে গিয়া কাঁচিটি কোন গাছের গোড়ায় পুঁতিয়া রাখিয়া গেল। ক্রমে রুয়াইল বাড়ীর রাজবাড়ীতে সৈন্য বিভাগে ভর্ত্তি হইয়া সেনাপতিত্ব লাভ করিল। রুয়াইল বাড়ীর যুবক রাজা প্রায়ই নদী পথে নৌকা ভ্রমণে জঙ্গলবাড়ী পর্য্যন্ত যাইতেন। জঙ্গলবাড়ীর সানবান্ধা ঘাটে সেখানকার রাজকন্যা গোছল করিতে আসিতেন। তাঁহার

www.pathagar.com

কেশরাজি নদী-স্রোতে অনেক দূর ভাসিয়া যাইত। একদিন দুই জনে চোখাচোখি হইতেই রাজকন্যা দৌড়িয়া পালাইলেন। এইরূপে তাঁহাদের প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হইত। ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু দুই রাজায় বড়ই শত্রুতা ছিল। সুতরাং বিবাহের আশা আপাতত অসম্ভব দেখিয়া রাজা রাজকন্যাকে একদিন নৌকায় করিয়া লইয়া আসিলেন এবং বিবাহ পাশে আবদ্ধ হইলেন। তারপর দুই রাজার ঘোরতর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে জামু খাঁ কোমরময় তরোয়াল ঝুলাইয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়া অশেষ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিলেন। জঙ্গলবারীর সৈন্য পরাস্ত হইল। রাজা জামু খাঁকে প্রধান উজির করিলেন, এবং এক রাজ কন্যার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দিলেন। জামু খাঁর পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল। অনেক লোক লস্কর ও হাজার হাজার 'মাটি-কাটা' কুলি সঙ্গে লইয়া সন্ধ্যার পরে মামার গ্রামে যাইয়া হাজির হইলেন। সেই গাছ তলায় তাঁর কাঁচিটি আজও মরিচা পড়িয়া রহিয়াছে। অতি যত্নে সেটিকে তুলিয়া লইলেন এবং রাতারাতি মামার বাড়ীর সম্মুখে ও পিছনে দুই প্রকাণ্ড দীঘি কাটিলেন। নিকটেই ছাউনি ফেলিয়া গহর বসইয়া দিলেন। প্রভাতে মামা ঘুমের ঘোরে সম্মুখের দীঘিতে ও মামী পিছনের দীঘিতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলেন। তারপর তাঁহারা দেখেন প্রকাণ্ড গহর। এ কোথায় তাঁহারা আসিলেন? যখন জানিলেন তাঁহাদের সেই অকর্ম্মণ্য অনাদৃত ভাগিনাটির এই কাণ্ড তখন তাঁহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

বাহাদুর খাঁ

বাহাদুর খাঁর পালা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক। বাহাদুর খাঁর অদ্ভুত বিক্রম, তাঁহার স্বাধীনতা ঘোষণা সবই অতি নিপুণতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। বারংবার তিনি বাদশাহের সৈন্যদের পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং অবশেষে তাহারা তাজপুরের কেল্লায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। তিনি কেল্লা অবরোধ করিলেন এবং নালা কাটিয়া কেল্লার ভিতর জল ঢুকাইয়া দিলেন। সৈন্যগণ তখন পিপীলিকার মত কেল্লা হইতে বাহির হইতে লাগিল।

কমলা রানীর পালা

কমলা রানী সুমঙ্গের কোন মহারাজের স্ত্রী ছিলেন। রাজা বহু টাকা ব্যয়ে এক দীঘি খনন করাইলেন, কিন্তু দীঘির 'শোত' উঠে না। রাজা মহা ভাবনায় পড়িলেন। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার সুন্দরী প্রিয়তমা ভার্য্যাকে দীঘিতে বিসর্জ্জন দিলে 'শোত' উঠিবে। প্রজার হিতের জন্য পুকুর কাটাইলেন ; তা একেবারে বরবাদ যায়। অগত্যা তিনি ভার্য্যাকে সে কথা জানাইলেন। কমলা স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিতে স্থির করিলেন। সেখানকার বর্ণনা কি করুণ। কি হৃদয় বিদারক। তাহা আজও শুনিলে চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। যখন তিনি 'কড়া' জলে নামিলেন, তখন তিনি পায়ের মল খুলিয়া রাখিলেন, যখন কোমর জলে নামিলেন তখন কোমরের অলঙ্কার খুলিলেন, যখন বুক জলে নামিলেন তখন হাতের বালা খুলিয়া ফেলিলেন, যখন গলা জলে নামিলেন, তখন গলার হার খুলিয়া রাখিলেন। তারপর মাথা পর্য্যন্ত ডুবিল, তারপর চুলগুলি জলে ভাসিয়া রহিল, তারপর সবশেষ হইল। এমন চিত্র বাংলা সাহিত্যে কয়টি আছে?

এইসব ছাড়াও 'গাজীর গীত' বলিয়া আর এক রকম গান আছে তাঁহারাও অনেক চমৎকার পালা রচনা করেন। তবে সাধারণতঃ তাঁহারা গাজীকালু ছয়ফল মুল্লুক, বদিউজ্জামান ইত্যাদি

www.pathagar.com

পুঁথির পালাই গাহিয়া থাকেন। মহরমের সময় 'জারী গান' বলিয়া এক রকম গান গাওয়া হয়। তাহার সমস্তই কারবালার সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা লইয়া গীত হয়। এই সকল পল্লী সাহিত্যের দিকে নজর দিলে দীনেশ বাবুর কথার সত্যতা উপলব্ধি হয় যে, গোটা কয়েক হিন্দু সাহিত্যিক আজ বাংলা ভাষার কর্ণধার হইয়াছেন সত্য, কিন্তু সমগ্র বাংলা সাহিত্য মুসলমানদের হাতে। অবশ্য এই সাহিত্যকে অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বলিয়া প্রচার করিবার সামর্থ্য আমার আজও হয় নাই, কিন্তু এইগুলিও বাংলা সাহিত্য। এইগুলিকে বাদ দিলে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গহানি হইবে। এইগুলি আলোচনা করিবার সময় মনে রাখা দরকার যে, পল্লী কবিরা আধুনিক বাংলা, ইংরাজি, ফরাসী, রুশীয় কাব্য সম্মুখে রাখিয়া কবিতা লেখেন নাই। স্বভাবতঃ যাহা তাঁহাদের মনে আসিয়াছে তাহাই নিয়া কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে আধুনিক শিক্ষার সংসর্গে আনিলে আমরা যে আরও কয়েকজন রবীন্দ্রনাথ পাইতাম তাহাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। অমর কবি গ্রে'র কথায় বলিতে হয়, 'Some inglorious Milton here may rest'. উহাদিগকে যতদিন আমরা বর্ত্তমান শিক্ষার সঙ্গে পরিচিত না করাইব ততদিন ভারতের ঘুমন্ত ভাগ্যলক্ষ্মী জাগিবে না। উপসংহারে শ্রদ্ধেয় দীনেশ বাবুর 'এইরূপ সাহিত্য চর্চ্চা বন্ধ হইলে তাহারা তাঁতির দোকানে ছুটিয়া যাইবে' এই কথার সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম না। আমার মনে হয় না কোন মোল্লার প্রচারের ফলে এইগুলি লোপ পাইতেছে। পাশ্চাত্য প্রভাবই এইগুলির আদর কমাইয়া দিয়াছে। যদি সুতীক্ষ্ণ বিজলী বাতি আমাদের ঘিয়ের বাতিকে ম্লান করিয়ে দেয়—তবে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

www.pathagar.com

আরবী কাব্য

মোহাম্মদ হোসেন

জগতে যত প্রকার ভাষা আছে তন্মধ্যে আরবী প্রাচীনতম ভাষাসমূহের অন্যতম। প্রাচীন আরবী ভাষার মধ্যে সম্প্রদায় ভেদে অনেক পার্থক্য থাকলেও হামেয়ার বংশীয় প্রকৃত আরবদের কথ্য ভাষার চাইতে কোরেশদের কথ্য ভাষাই বিশুদ্ধ আরবী বলে পরিচিত এবং এই ভাষাতেই ঐশীবাণী (কোরআন্) অবতীর্ণ হয়েছে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরব দেশে কাব্যই একমাত্র সাহিত্য ছিল। পৌত্তলিক আরবীয়গণের কাব্যে অসাধারণ প্রতিভা দেখলে মনে হয় তারা যেন তাদের জীবনের কোন একটি সঙ্কল্পিত ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য—তাদের কোন একটি মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য— অন্ততঃ কাব্য সৃষ্টির জন্য কবিতার পথটাকেই বিশেষ করে বেছে নিয়েছিল। বাস্তবিক, প্রাচীন আরবদের সাহিত্য-জীবন নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, কবিতা লেখাই যেন তাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রধান ধর্ম্ম ছিল, এবং নিজের অসাধারণ শক্তির ওপর একটা দৃঢ় বিশ্বাস দিয়ে তাদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ কেবল কবিতার ভেতর দিয়েই খুঁজে বেড়াত।

নির্ম্মম ক্রূর স্বভাব আরব জাতির বিশেষত্ব তাদের কবিতা। তৎকালে আরবদেশে কবিতা ও বক্তৃতার বিশেষ সমাদর ছিল। এবং আরবের আবালবৃদ্ধ সকলেই স্বভাব কবি। কোনরূপ কষ্ট-কল্পনা না করে যে কোন ব্যক্তি সুন্দর কবিতা রচনা করতে পারত, তাকে অদ্ভুত যাদুশক্তি সম্পন্ন মহাজ্ঞানী মহাবিচক্ষণ শায়ের বলে আখ্যায়িত করত। কখনো কখনো তাকে যাদুকর বলে ঠাট্টাও করত। এজন্যই বোধ হয় হজরতের মুখ দিয়ে কোরানের মধুর আয়েতগুলি যখন বেরিয়ে আসত, তখন তাকেও লোকে যাদুকর বলত। বৃহৎ সভাতে লম্বা চওড়া ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা দিতে পারলে, কিম্বা নিজ গোত্রীয়দের কোন মহৎ কার্য্যে প্রণোদিত করতে পারলে তাকে 'খতিব' উপাধিতে সম্মানিত করা হত। সর্ব্বসাধারণেও কথাবার্ত্তার মধ্যে নামজাদা কবিদের দু এক চরণ কবিতা আওড়িয়ে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করত।

আরবের অতি প্রাচীন কবিদের যে সমস্ত উল্লেখ পাই, তা বাসুখের যুদ্ধের বহু পূর্ব্বের। সে সময়ের সর্ব্ব প্রথম কবি মহালহিল বিন্ রাবিয়া। কিন্তু তাঁর কবিতা ও রচনা শক্তি সম্বন্ধে কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

এই সময়ের বিখ্যাত কবি সাইরকে প্রাচীন আরবেরা জ্ঞান-দেবতা বলত এবং ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় তাঁর যথেষ্ট হাত আছে বলে তারা বিশ্বাস করত। কারণ তাঁর কবিতায় এমন একটা মাদকতা যাদু মন্ত্রের মত এমন একটা প্রেরণা শক্তি নিহিত ছিল—যার দরুন তাঁর এ অপবাদ তাঁকে মুক্ত করতে পারেনি।

প্রকৃত কবিতা যে কি জিনিস এবং কবি যে মানুষের প্রাণের ক্ষুধা মিটিয়ে তার সুখ দুঃখের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন রেখে মানবের প্রাণে একটা দীপ্তবর্ণের রেখা টেনে দেয়, মানুষ তার কল্পনা

www.pathagar.com

ক্ষমতায় হৃদয়ের অনন্ত প্রসারতায় মুগ্ধ হয়ে যায়—এভাবটা কবি সাইরই সর্ব্বপ্রথম প্রাচীন আবরদের দেখিয়ে দিলেন। কবি সাইর-এর সময় হতেই ভাব গভীরতার দিক থেকে সম্পূর্ণরূপে কবিতার সমাদর লাভ ও পুষ্টি সাধন হয়। যদিও তাঁর পূর্ব্বে বহু কবির ও কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায় কিন্তু তাদের বর্ণনার ধারা এমন বিশৃঙ্খল, বক্তব্য বিষয়গুলি এমন জটিল যুক্তি জালে আচ্ছন্ন যে, তার ভাবগুলি হাতড়ে পাওয়া বড়ই কঠিন। কথিত আছে, কবি সাইর-এর উচ্চারণ শক্তি এতদূর স্পষ্ট ও লালিত্যপূর্ণ ছিল যে তা সুরের মত বেজে উঠত এবং তিনি যখন কোন কবিতা আবৃত্তি করতেন তখন শ্রোতৃমণ্ডলী লালিত্যে মুগ্ধ হয়ে লাফাতে আরম্ভ করত। সেই সময় আরবরা বলত—'শোক ও জিজ্ঞাসা নিবারণ করতে হলে কবি সাইর-এর নিকট যাও।' যা হোক, তখনকার কাব্য সম্বন্ধে যথাযথভাবে গুছিয়ে কিছু বলা বড়ই কঠিন। তর একটা সুনির্দ্দিষ্ট রূপ ও শৃঙ্খলিত ধারা হাতড়ে পাওয়া যায় না। কারণ তখন লিখনার্থে কোনোরূপ অক্ষর প্রচলিত না থাকায় তাঁদের রচিত অনেক অমূল্য কাব্য সাহিত্য সম্পদ ধরা পৃষ্ঠ হতে লুপ্ত হয়ে গেছে। ইসলামের বহু পূর্ব্বে ইরাক প্রদেশের মোবারক নামক ব্যক্তি প্রথম আরবী অক্ষর আবিষ্কার করেন এবং অক্ষরের সাহায্যেই কোরান শরীফ সর্ব্বপ্রথম লিখিত হয়।

আরবদের অসাধারণ স্মৃতি শক্তির কথা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। তাদের বংশ পরিচয় ও মূল্যবান কবিতা রক্ষা করবার জন্য 'নোচ্ছাব' উপাধিকারী বিবরণ-বেত্তাগণ এসব মুখস্থ করে রাখত। কোনো কোনো গোষ্ঠীর লোকেরা বেতন দিয়ে পর্য্যন্ত মুখস্থকারী লোকদের নিযুক্ত করত স্বীয় বংশের গৌরব গাথা ও কবিতা প্রচলিত রাখবার জন্য। এরূপ ভাবে লক্ষাধিক কবিতা পৌত্তলিক আরবরা মুখে মুখে রক্ষা করে আসছিল। কোন গোষ্ঠীতে যদি কোন উচ্চ কবির আবির্ভাব হত তাহলে বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের ভোজ প্রদান করে সম্মানিত করত এবং সেই ভোজে পরিবেশনাদি স্ত্রী লোকেরাই সম্পাদন করত। পৌত্তলিক আরবদের অতি প্রাচীন কবিতাগুলি উচ্ছৃংখল ছন্দে লেখা। এগুলি কেবল মদ ও স্ত্রী লোকের কাহিনীতেই সীমাবদ্ধ। পরে যখন অনেক শক্তিশালী কবির উদ্ভব হল তখন হতে 'কসিদা'র যথেষ্ট আদর হল এবং 'কসিদা' ছাড়া তারা আর কিছুই পছন্দ করত না। এই 'কসিদা' রচনা সাধারণত ২৫টি অক্ষরের কম হয় না, উর্ধ্বে শতাধিকও হয়। এর ভেতর আর কিছুর উল্লেখ থাক বা না থাক স্ত্রীলোকের বর্ণনা অবশ্যই থাকবে এবং এদিকটা বাদ দিলে 'কসিদা'র সৌন্দর্য্য অতি অল্পই অবশিষ্ট থাকে।

তামসযুগে আরব কবিদের ওপর 'কসিদা'ই অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁদের বিশ্বাস 'কসিদা' ছাড়া অন্য কোনরূপ কবিতা রচনা করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। তই কেহ কোন নূতন ছন্দ প্রচলনে সাহসী হতেন না ; পুরাতনের সহিত তুলনা করেই তাঁরা নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিতে চেষ্টা করতেন। ফলে তাঁদের কবিতার ভেতর পুরাতনত্বের এক ঘেয়ে ধারাই থেকে যেত এবং একেই তাঁরা কবিতার প্রকৃষ্ট প্রকরণ মনে করতেন। তাই এ 'কসিদা'র ভেতর ক্রমবিকাশশীল ভাব-বৈচিত্র্যের কোন নূতনত্ব দেখা যায় না। 'সপ্তসঙ্গীতের' গাথাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—এগুলির ভেতর এমন সকরুণ সুর ঝঙ্কৃত হচ্ছে যে, তাতে মানুষের মনে একটা উদাস ভাবের সঞ্চার হয়। ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীর বক্ষ হতে বহুদূরে সরে তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে ইচ্ছা হয়—

www.pathagar.com

করিতেছি উষ্ট্রোপরি গন্তব্য সন্ধান,
জানিনা কখন আমি, সেই অজানায়
কবির প্রয়াণ।
সেইদিন সেই সন্ধ্যায় ক্ষমিও প্রভু।
ক্ষমিও মোরে,—
এ জগতের যত পাপ করিয়াছি অকাতরে।

আরব জাতির জ্ঞান স্পৃহা যে কিরূপ ছিল তা ওকাজের বাৎসরিক সাহিত্য অধিবেশন দৃষ্টান্তেই বোঝা যায়, ওকাজ নামক স্থানে প্রতি বৎসর কবি সম্মিলনী বসত এবং মাসাধিক কাল পর্য্যন্ত বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা একত্র হয়ে এ অধিবেশনে যোগদান করত। জ্ঞান ও শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করবার জন্য ও পুরস্কার লাভের আশায় প্রত্যেক গোত্রের 'খতিব' ও 'শায়ের'দের মধ্যে যথেষ্ট রচনা প্রতিযোগিতা চলত। প্রকাশ্য সম্মিলন ক্ষেত্রে সমালোচনা ও তর্ক বিতর্কের ভেতর শান্তিভঙ্গ পর্য্যন্ত হয়ে যেত। যে সমস্ত কবিতাগুলি ওকাজের কবি সভায় শ্রেষ্ঠ বলে প্রতিপন্ন হত সে কবিতাগুলি বড় চামড়ার উপর লেখক দ্বারা লিখিয়ে কাবা গৃহে ঝুলিয়ে রাখত। তখন সেগুলি 'সাংয়া মোয়াল্লাকাত' অর্থাৎ 'দোদুল্যমান কবিতা সপ্তক' নামে অভিহিত হত। কাহারো মতে সেগুলি কাবা গৃহে ঝুলাবার পূর্ব্বে মিশর দেশীয় রেশম বস্ত্রের ওপর স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রাখত। তখন তার নাম ছিল 'মোজাহাবাত' বা সুবর্ণ নির্ম্মিত কবিতা। পৌত্তলিক আরবদের বিশেষত্বই তাদের অতুলনীয় রচনা শক্তি ও কবিতা। বংশ গৌরব, গোত্রাধিকার, অতীত কার্য্যের স্মৃতি, প্রতিপক্ষের কুৎসা, সমরক্ষেত্রের বীরত্ব বিষয় নিয়েই তাদের কবিতা রচিত হত।

তামসযুগের আরবীয় কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে আরব সাহিত্যাকাশের মধ্যাহ্ন ভাস্কর ও বেদুইন কবিতার জন্মদাতা মহাকবি ইমরুল কায়েসের কথা। তিনি 'মোয়াল্লাকার' কবিদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বপ্রধান। তাঁর 'মোয়াল্লাকাই' সব চাইতে প্রাচীন ও সমৃদ্ধিশালী। ইউরোপীয়রা তাঁর মোয়াল্লকাকে খুব প্রশংসা করেন। উপ্রথমতঃ তিনি প্রচলিত কাব্যের ধারা অন্ধভাবে অবলম্বন করে লব্ধ প্রতিষ্ঠ সাহিত্যরক্ষীদের অনুকরণ করেছিলেন। কারণ পিতা কর্তৃক গৃহ তাড়িত হয়ে ভবঘুরে জীবনের ভেতর অনেককাল পর্য্যন্ত তিনি নিজেকে খুঁজে পান নি। তাই প্রথম রচনা গুলিতে দেখতে পাই—তৎকালীন রুচির নিকট নিজের মৌলিকতাকে বলি দেওয়ায় এবং নিজের পূর্ণ প্রকাশকে ব্যাহত করায় তাঁর লেখা অনেক স্থলে জড়ত্বপূর্ণ ও আড়ষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কিন্তু পরে যখন নিজের মৌলিকতা ফুটে উঠতে লাগল এবং নিজেকে খুঁজে পেলেন তখন হতে তাঁর রচনার ভেতর সর্ব্বত্রই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর লেখনীতে বীররস ও ইন্দ্রিয়ানুভূত রস সমূহের বহুলতা আছে। প্রতিহিংসার জ্বালায় উন্মত্ত হয়ে ইমরুল কায়েস বলছেন :—

বিস্মৃতির অন্তরালে বার বার,
ঢেকে যায় প্রতিজ্ঞা আমার।
কি ভীষণ ! নহে, তা কভু, ভুলিবার নয়—
বণী আসাদের তপ্তরক্তে রঞ্জিত করিব
এ অসি নিশ্চয়॥

www.pathagar.com

কখনও প্রিয়ার উদ্দেশ্যে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে কায়েস বলছেন :—

একদা পর্ব্বত চূড়ায় বসি,
বলেছিল প্রিয়া মোরে,
তুমি যেন কভু আর মম কাছে
নাহি আস ফিরে।
আমি বলিলাম, হে মোর প্রিয়া,
অন্ধ আবেগ করেছ পাগল,
হয়েছি প্রেমের দাস—
অন্তর পানে চেয়ে দেখ দেবি !
ঝরেছে কত দীর্ঘ শ্বাস !
নিদ্রাবিহীন নিশীথের বুকে
মদ খেয়ে থাকি চূর—
বল বল হে রানী, তব মাঝে মোর
রোজ কেয়ামত রহিয়াছে কতদূর ?

ইম্‌রুল কায়েসের লেখার ভেতর প্রেমের অচ্ছেদ্য আকর্ষণ ও মনের উদ্দাম প্রবৃত্তি সর্ব্বত্রই উঁকি মারছে। ইন্দ্রিয় তাড়নার প্রবল বিক্ষোভে অনুতাপ করে বল্‌ছেন :—

কি আশ্চর্য্য ! বিধাতার সৃষ্টি অপরূপ !
মদ আর নারী, যত দেখি তত বাড়ে পিপাসার মুখ।

ইম্‌রুল কায়েস ধনী পিতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হয়েছেন সত্য, কিন্তু 'স্বভাব চাষাড়ে যাবে কোথা', তাই তাঁর জীবনের চিন্তাধারা প্রায়ই সমাজের নিম্নস্তরের পরিত্যক্ত অংশের আবর্জ্জনাময় অন্ধকার পথ বেছে নিয়েছিল।

প্রেম-চিত্রে সিদ্ধ হস্ত 'মোয়াল্লাকার' দ্বিতীয় কবি তারাকা বিন্ আল আবাদ্। কুৎসিত কবিতায় ইনি ইমরুল কায়েসকেও কিস্তিতে মাৎ করেছেন। অতৃপ্ত লালসার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তারাকা বল্‌ছেন :—

কিছু মাত্র নাহি খেদ তাহে—
মৃত্যু দূত দাঁড়াক দুয়ারে,
আমি চাহি শুধু উজ্জ্বল রক্তবর্ণ—
মদ্য পান করিবারে।
—আর চাহি,
শীতল স্নিগ্ধ মেঘের রাতে
তরুণী বালিকার সাথে,
কাটাতে পারি যেন রাতিটা আরামে বসে।

আবার কখনও ভাবের গভীরতায় ডুবে মদকে সম্বোধন করে বল্‌ছেন :

মদিরারে ! তব পানে চেয়ে আপনার কথা ভুলে যাই !
সৃষ্টির সব রহস্য বুঝি তোমাতে পেয়েছে ঠাঁই ! !

www.pathagar.com

কখনও যৌবনের তাড়নায় আক্ষেপ করে বল্‌ছেন :—

বিরহী বুকের মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণ
নিরাকুল রুদ্ধ হাহাকারে
উদ্দাম বাসনা বেগে, ধেয়ে আসে
ক্ষুধা তার, চাহে মিটাবারে।

তামসযুগের কবিরা তাঁদের সুখ দুঃখ, নীচতা মহত্ত্ব সকলই নিজেদের প্রাণের ব্যথায় রাঙিয়ে জগতের কাছে প্রকাশ করে এই স্বেচ্ছাচার, দুর্দ্ধর্ষ, কঠিন-প্রকৃতি আরবের পৌত্তলিকদের পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত অমর করে রেখেছেন। এজন্য এবনে খল্‌দূন বলেছেন—'খোদাতা'লা কোন একটা নির্দ্দিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য কারো একচেটিয়া করে কবিতা বা সাহিত্য মানুষের মধ্যে বিকীর্ণ করে দেন নি। তাঁর মহাদান দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের মধ্য দিয়ে নবীনত্ব লাভ করে।' এ গেল ইসলামের আগেকার কথা। এখন ইসলামের যুগের আরবী কাব্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

ইসলাম ধর্ম্মের সূতিকাগার মক্কার পূত আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে মানবতার মূর্ত্ত বিকাশ, জাগ্রত শক্তির প্রতিমূর্ত্তি হজরত মোহাম্মদ (সঃ) যেদিন পৌত্তলিক আরবদের কাছে একেশ্বরবাদ প্রচার করেছিলেন, সেদিন আরবের বিখ্যাত কবি আসা বলেছিলেন 'একা মোহাম্মদই তাঁর একেশ্বরবাদ রূপ উল্টোধারার সাহায্যে আমাদের প্রচলিত কাব্য ধারাকেও উল্টো করে দেবে।' বাস্তবিক হয়েছিলও তাই। হজরত মোহাম্মদের সময় হতেই আরবী কাব্য সাহিত্যের এক নব পর্য্যায় আরম্ভ হল। তাই আরবী কাব্যের ভেতর একদিকে যেমন স্বার্থত্যাগ ও আত্মবলিদানের মূর্ত্তবিকাশ—আবার অন্য দিকে তেমনি পৈশাচিক অত্যাচারের পূতিগন্ধময় কলুষিত দৃশ্য।

জাতির পক্ষে যখনই কোন বিশেষ ছাঁচ পুরাতনের কঠিন আবরণে শক্ত হয়ে ওঠে—তখন সে জাতি অতীতের যুগ-সঞ্চিত আবর্জ্জনা রাশিকে বুকে জড়িয়ে ধরে পুরাতনের মোহ প্রভাব সহজে ত্যাগ করতে পারে না। তাই ইসলামের যুগেও দেখতে পাই তামস যুগের কবিদের ন্যায় আরবের মুসলমান কবিরাও 'কসিদা' রচনাতেই মশ্‌গুল ছিলেন ; তখনও তাঁরা বেদুইনভাব নিয়ে প্রেয়সীর শোকাচ্ছ্বাস ও মদের কবিতার আদর ছিল, এবং এ কবিতার সাহায্যেই ইসলামের সত্য শাশ্বতবাণী পৌত্তলিক আরবদের কানে পৌঁছেছিল। এ কবিতার প্রভাবেই শত শত মুশ্‌রিক কবি ভক্তিনত শিরে ইসলামকে বরণ করে নিয়েছিল। এ কবিতাই একটা প্রবল জাতিকে আপনার বিশিষ্টতা রক্ষা করতে শিখিয়েছিল। এই কবিতার ভেতর দিয়ে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) প্রথম জীবনে নিজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। কারণ শৈশব হতে তিনি জীবনের ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নানা দুঃখ কষ্টের ভেতর বড় হয়ে উঠেছিলেন। নানা অবস্থার বিপাকে নানাধরনের লোকের সঙ্গে তাঁকে মিশতে হয়েছিল। মানুষের পক্ষে যত রকম দুঃখ কষ্ট পাওয়া সম্ভব, তার সমস্তই তাঁকে ভুগতে হয়েছিল। তাই হজরতের প্রথম জীবনে দেখতে পাই কখনও 'হেরা' পর্ব্বতের গুহায় বসে আল্লাহ্‌র চিন্তায় মগ্ন, কখনও বিত্তহীন, পরিচয়হীন, নিতান্ত অসহায় মেষ বালক, আবার কখনও বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ী, কখনও বা সমাজের যত পিষ্ট, নিপীড়িত, দুঃখ জর্জ্জরিত অসহায় মানুষের ভীড়ের মধ্যে সাধারণ মানুষ। দুঃখ-কষ্টই মানুষকে প্রথম সচেতন করে তোলে—জগতকে জানতে হবে বলে, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে বলে। তাই হজরত যখন নানা ঘটনার

www.pathagar.com

প্রতিকূলে পূর্ণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন, জগতের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন খোদাতা'লা হজরতকে কোরান দান করে তাঁর সাধনা সিদ্ধ করে দিলেন। সুতরাং আরবের প্রচলিত গাথাগুলির ভেতর দিয়ে যে তিনি প্রথম জীবনে শিক্ষা লাভ করেছিলেন একথা বলা যেতে পারে। তিনি নিজেও কবিতা ভালোবাসতেন—কবির সম্মান করতেন। ভাবে বিভোর হয়ে কবি লাবীদের রচিত কবিতার একটি চরণ মাঝে মাঝে উচ্চারণ করতেন–

আল্লামা খালাকাল্লাহে বাতিনু।

অথাৎ খোদা ভিন্ন সমস্ত জিনিসেরই একদিন ধ্বংস আছে।

হজরত শৈশবে বিদ্যালাভের কোন সুযোগ না পেলেও তাঁর প্রবল জ্ঞান স্পৃহা ও বিদ্যানুরাগ মানবের পক্ষে একটা মহান জীবন্ত আদর্শ, যার ধারণা করতে চেষ্টা করলে ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্ভ্রমে হৃদয়ের মাথা আপনি নত হয়ে আসে সেই মহামানবের উদ্দেশ্যে।

ইসলামের প্রথম যুগে আরবীয় কবিরা কোন মূল্যবান সাহিত্য জগতকে প্রদান করেন নি। কারণ অধিকাংশ পৌত্তলিক মুসলমান হবার পর বিভিন্ন মতের অনুসরণ করেছিলেন। 'মোয়াল্লাকা'র বিখ্যাত কবি ল–বীদ বিন্ রাবিয়া তাঁর মুসলমান-জীবনে কবিতা ছেড়ে দিয়ে বলেছিলেন—'খোদাতা'লা কবিতার বিনিময়ে আমায় কোরান দান করেছেন।' মহাকবি হাস্‌সান্ বিন্ সাবেত [পৌত্তলিক কবিদের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রথম মুসলমান কবি এবং হজরতের দরবারে নবুয়তের কবিদের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করেছিলেন] বললেন—'হজরত এবং ইসলামের মাহাত্ম্য বর্ণনা ভিন্ন কবিতার শ্রেষ্ঠ উপকরণ জগতে আর কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না।' যা হোক এই বিভন্ন মতবাদের ভেতর যে একদল প্রতিভাবান কবির উদ্ভব হয়েছিল তাঁরা নিজেদের মৌলিকতার দিক থেকে বহু পরিমাণে বিড়ম্বিত হয়েছিলেন। তাঁরা যৌনচর্চ্চা, মদ খাওয়া, জুয়া খেলা এবং বিবিধ জড়মূর্ত্তি পূজার দায় হতে রেহাই পেলেও—সবল, সতেজ, হৃষ্টদেহ, পরিণত বুদ্ধি মানুষের পূজায় মেতে উঠেছিলেন। পৌত্তলিক কবিরা মুসলমান হবার পর জড় প্রতিমার পূজা ছেড়ে হজরতকেই জীবন্ত প্রতিমা মনে করে তাঁদের কাব্য রচনা করতে শুরু করল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ—

"হজরতের ভূমিষ্ট হবার সময় জগতের সমস্ত পশু সেদিন মানুষের মত কথা কয়েছিল। নূতন নূতন নক্ষত্রাদি উদিত হয়েছিল। কাবা মন্দিরের ৩৬০ টি বোৎ অধোমুখে ভূলুণ্ঠিত হয়েছিল" ইত্যাদি। হজরত যে একজন মানুষ সে কথা তাঁরা ভুলে গিয়ে হজরতের গুণানুবাদ ও প্রশংসা কল্পনার রঙ্গে ফলিয়ে এমন করে আজগুবী কবিতা রচনা করতে আরম্ভ করলেন যে, তা শুনলে মূর্খ তো দূরের কথা তখনকার পণ্ডিতের কাছেও একটা প্রশ্ন জেগে উঠত, মনের কোণে একটা সন্দেহ এসে খোঁচা দিয়ে যেত যে, তিনি কি আমাদেরই মত মানুষ? তাঁরা কবিতার ভেতর হজরতকে নিয়েই নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। বড় বড় কবিতা লিখে হজরতের প্রশংসা করতে পারলেই তাঁরা তাদের কর্ত্তব্যের চরম মনে করতেন।

এ দেখেই বোধ হয় হজরত বলেছিলেন—ইন্নামিনাশ্ শায়েরে লা হেক্‌মাতান ও ইন্নামিনাল বায়ানে লা সেহ্‌হারান্।

অর্থাৎ [কবিতায় প্রতিভার অদ্ভুত ক্ষমতা ও গুণের অখণ্ডনীয় পরিচয় আছে এবং বক্তৃতায় যাদুর মত শক্তি আছে।]

www.pathagar.com

এরূপ অবস্থা দেখে ও তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কবিতা লেখার পরিবর্ত্তে হজরত তাদের দিগ্বিজয় ব্যাপারে লিপ্ত করে দিলেন। তখন হতেই আরবীয় কাব্য সাহিত্যের অধঃপতন আরম্ভ হল। অবশ্যি এর কিছুকাল পরে কতকজন নামজাদা কবির উদ্ভব হয়েছিল।

হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর খলিফাদের শাসন কালে আরবগণ সিরিয়া (৬৩৫ খৃঃ), বেবিলন (৬৩৭ খৃঃ) আমেরিকা (৬৪০ খৃঃ), মিসর (৬৪২ খৃঃ) প্রভৃতি দেশে তাদের প্রভাব বিস্তার করে এবং দর্শন বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, গণিত শাস্ত্র, শিল্পকলা, হাদিস ও কোরানের চর্চ্চা, পুরাতন তথ্যাবলীর গবেষণা প্রভৃতি বিভিন্ন চিন্তা ধারা নিয়ে পৃথিবীর নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ৮১২ হতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দের শেষ পর্য্যন্ত স্পেনে তারা যে জ্ঞান চর্চ্চা করেছিল তার কাছে জগতের সমস্ত মানব জাতি ঋণী। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের রাজত্বকালে আবুল আসাদ কর্তৃক 'ইল্‌ম্ নহো' নামক আরবী ব্যাকরণ প্রথম রচিত হয়।

ইসলামের মধ্যযুগেও তদ্রূপ গৃহে গৃহে তুমুল যুদ্ধ বাধায় কাব্য রচনার দিকে কারো খেয়াল ছিল না। কেবল রাউহ' বা আবৃত্তিকারকগণ প্রাচীন গাথাগুলো মুখে মুখেই প্রচলিত রেখেছিল। ইতিহাস দৃষ্টে এই 'রাউহ'দের সম্বন্ধে কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কারণ তাদের পরবর্ত্তী বংশধরেরা কোরান ব্যতীত আর কিছুই পছন্দ করত না। এই যুগে কয়েকজন স্ত্রী কবির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁরা শোক ও বীরত্বব্যঞ্জক কবিতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। আরব সেনার সামরিক অবসাদের সময় রণক্ষেত্রে তাঁরা উত্তেজনাপূর্ণ সঙ্গীত গেয়ে উম্মাদনার সৃষ্টি করতেন। এই সময় জ্ঞান চর্চ্চা ও বিদ্যালোচনার জন্য বসরা ও কুফা এই দুটা স্থান ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বিজিত উমাইয়া খলিফাদের রাজত্বকালে স্তুতিবাদক কবি ও গায়কদের খুবই সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তখনকার দিনে রাজ-কৃপালাভ সমর্থ হতে হলে প্রথম রাজ-কবির অনুগ্রহ দৃষ্টি লাভ করতে হত। আক্‌তাল, ফারাজদক, জারীর প্রভৃতি এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। ব্যঙ্গ কবিতার জন্য এঁরা খুব খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। এই যুগে কবিদের এত সম্মান ছিল যে, কবি কোন ধর্ম্মাবলম্বী সে দিকে কেউ বড় একটা ফিরেও দেখত না—কেবল প্রতিভার জন্যই তাঁকে সম্মান করত ও ভালবাসত। খৃষ্টান কবি আক্‌তাল খলিফা আবদুল মালেকের দরবারের কবি ছিলেন—তিনি কবিকে খুবই প্রীতির চক্ষে দেখতেন। কথিত আছে—আক্‌তাল মদ্যপান করে ও গলদেশে ক্রুশ ঝুলিয়ে খলিফার দরবারে আসতেন এবং কবিতা উচ্চারণ কালে মুখ হতে সুরার উগ্র গন্ধ ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান সভাসদগণের বিরক্তি আনয়ন করত। তাঁরা খলিফার নিকট বার বার এ বিষয় অভিযোগ করেও কোন প্রতিকার করতে পারতেন না। আক্‌তালের কবিত্বের গুণে খলিফা এত দূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, কবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য আরবের পথে ঘাটে প্রচার করিয়েছিলেন যে—'আক্‌তালই আমিরুল মোমেনিনের কবি', 'আক্‌তালই আরবের শ্রেষ্ঠ কবি'।

তারপর খলিফা হারুন অর রশিদের রাজত্বকালে আরবী কাব্য সাহিত্যের পুনঃবিকাশ দেখতে পাই। বিভিন্ন ছন্দ পদ্ধতি ও তাল প্রকরণে কবিতা সুন্দরীর অপার সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে। এর পূর্ব্বে আঁধার যুগে ও প্রথম যুগে কবিতার বহুল প্রচলন থাকলেও ছন্দের কোন বাঁধা বাঁধি নিয়ম ছিল না। যার যেমন ইচ্ছা সে সেই ভাবেই কবিতা লিখত। ৭৯১ খৃঃ খলিল বিন্ আহ্মদ

www.pathagar.com

নামক এক ব্যক্তি ছন্দ প্রকরণ নিয়মাবলী প্রথম লিপিবদ্ধ করেন। এই সময় আচার্য্য আসায়ী পৌরাণিক কবিতার বহু উন্নতি সাধন করেছিলেন এবং ১৬ সহস্র খণ্ড কবিতা মুখস্থ রেখে বহুকাল পর্য্যন্ত কাব্যরস পিপাসুদের সাহিত্য ধারা প্রচলিত রেখেছিলেন। সঙ্গীতাচার্য্য এস্‌হাক মুসালী ও দার্শনিক আলকিন্দি বলেছেন—'আরবী কাব্য আলোচনায় এরূপ অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মহা মনীষী আজ পর্য্যন্ত আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই।'

যাহোক, ইসলামের স্বর্ণযুগে যে আরবী কাব্যের উন্নতি সাধিত হয়েছিল সেই সময়ের কাব্যের প্রধান রথী আবুল আতাহিয়া, মুতান্নবী, আবু নওয়্যাছ প্রভৃতি মহাত্মাদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কাব্যের একটু পরিচয় দিয়ে আমরা এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সমাপ্ত করব।

আবুল আতাহিয়া আরবী কাব্য সাহিত্যে এক নূতন যুগ আনয়ন করেছিলেন—কখনও রণক্লান্ত মানুষের দুর্ব্বলতার উপহাসের হাসি দিয়ে বিদ্রূপ করেছেন—আবার কখনও শোকে দুঃখে ব্যথায় ভরা যে গান গেয়েছেন তা জগতে অতুল। তিনি একস্থানে বলেছেন—

'একদা ভ্রমিতে যবে পীতমের কবরের পাশ,
সালাম করিনু তারে বুকভরা ফেলি দীর্ঘশ্বাস—
মর্ম্মান্ত বেদনাঘাতে প্রাণে মোর ভরি গেল হায়,
তথাপি অতীত সখা প্রত্যুত্তর নাহি দিলা তায়।
ক্ষণেক ভাবিয়া শেষে বুঝিলাম ক্ষেদকরি ফের
জবাবের শক্তি যদি থাকিত গো ও চাঁদ মুখের,
বলিত মিনতি-সুরে 'হে সুহৃদ পরাণের মণি—
নিষ্করুণ মৃত্তিকায় নাশিয়াছে হোস্‌ন্‌ ও জোয়ানী।

আবার কোথাও প্রকৃতির ভাবে বিভোর হয়ে বল্‌ছেন—
অসীমের বুক জুড়ে কোটি কোটি তারা,
কোথা হতে এসে—পুনঃ কোথা হয়ে যায় হারা?

আবু নওয়্যাছ—ইনিও প্রেম নিয়েই বিভোর। তবে তাঁর প্রেমের কবিতাগুলো বেশ ঝর্‌ঝরে, সবটাই যেন বাছাই করা উপভোগের সামগ্রী—

লওহে পিয়ালা, অয়ি মোর বা লা, হাঃ, এ যে মিরাজী!
হৃদয় উৎপল, বরণ উজ্জ্বল, বন্দেগী মিঞাজী;
মদ্য ছাড়া দিন্ন, রত স্ফূর্ত্তিহীন, উঃ কি অভিশাপ!
চলি যদি পথে, টলিতে টলিতে, আমি ত নবাব!
প্রেয়সী আমার হয়ে আগুসার ধরহে চুম্বন,
স্ফূর্ত্তি করিলে পর্দ্দার আড়ালে নাহিক স্ফূরণ।

তিনি আবার বলেছেন :—

কর তুমি যত পাপ করিতে বাসনা,
কণামাত্র করিও না হৃদে কোন ভয়,

www.pathagar.com

ক্ষমার আধার সেই বিভুর সকাশে
শেষ দিন যেতে হবে জেন সুনিশ্চয় ;
তবে আর কি করিতে নরকের বহ্নি ?
ঝম্প তুমি দাও ত্বরা স্ফূর্ত্তি-সায়রে,
নচেৎ মরিবে শেষে আফসোস করিয়া—
নির্বুদ্ধিতা কি করেছ ধরণীর পরে।

মুতানব্বীর ন্যায় ভাষার এমন পরিপাট্য, ভাবের এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আর কোন কবির রচনায় দেখা যায় না। এজন্য ইউরোপীয়রা প্রাচ্য দেশের 'ভিক্টর হিউগো' বলে মুতানব্বীকে আখ্যায়িত করেছেন। মুতানব্বী নিজেই বলেছেন—

অণুও সতত হেরে, মোর কবিতার ফুল্লধারা,
বধিরেরও কর্ণে বাজে অবিরল দিয়ে এক সাড়া।
সর্ব্বথা ধ্বনিত হয়, এই ধরণীর কোণে কোণে,
স্মরণ পরতে গেঁথে লয় নরক যতনা যতনে।

www.pathagar.com

ধর্ম্ম ও সমাজ

কাজী মোতাহার হোসেন, এম. এ.

পৃথিবীর অগণিত প্রতিষ্ঠানের কোনটিই প্রয়োজন ব্যতিরেকে স্থাপিত হয় নাই। আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজও প্রয়োজনের তাড়নায় জন্মলাভ করিয়াছে।

সমাজের প্রয়োজনীয়তা অতি সহজেই চোখে পড়ে। আত্মরক্ষা একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ক্রমবিকাশবাদের ইহাই মূল সূত্র। যখন কোটি কোটি লোক আত্মরক্ষার জন্য ব্যগ্র হয়, তখন প্রত্যেকে অন্যের মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করিলে কি মহামারী কাণ্ড উপস্থিত হইতে পারে, সে চিত্র স্মরণ করিলেই, সমাজ বন্ধন এবং নীতির আবশ্যকতা পরিষ্কার উপলব্ধি করা যায়। বাস্তবিক জন্মাবধি অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করা অসম্ভব। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করাকে মানুষের একটা মৌলিক বৃত্তি বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। সমাজের প্রথম অবস্থায়, শারীরিক বলে শ্রেষ্ঠ হইলেই লোকে সর্ব্বোচ্চ সমমান প্রাপ্ত হইত, কারণ তখন শারীরিক বলের দ্বারাই অন্যের উপর নিজের ইচ্ছা ও প্রভুত্ব চালানো সম্ভবপর ছিল। কিন্তু অস্ত্র উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ব্বলের অসুবিধা অনেকটা দূর হইয়াছে। তখন বাধ্য হইয়া লোকে সংঘবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সুবিধার জন্য কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে স্বীকৃত হয়। এই নিয়মগুলিই সামাজিক নিয়ম। পরস্পরে বিশ্বাস, আদান প্রদান, উপকার-প্রত্যুপকার, বিবাহ বন্ধনে পবিত্রতা রক্ষণ, সত্যবাদিতা, ক্ষমা, আত্মসম্মান বোধ প্রভৃতি সদগুণ সামাজিক প্রয়োজন হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে right is Mightই আদিম নিয়ম। যখন সকলের শক্তি প্রায় সমান হইয়া উঠে, তখন বিজ্ঞেরা Right is might নীতির আদর্শ প্রচার করিতে বাধ্য হন। আজও পৃথিবীতে সমাজে সমাজে বা জাতিতে জাতিতে যে দ্বন্দ্ব ঘটিতেছে, তাহাতে সর্ব্বদাই কার্য্যতঃ চণ্ড-নীতিই অনুসৃত হইতেছে। প্রবল স্বভাবতঃ দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিলেও সর্ব্বদা তাহার মনে ভয় থাকে, দুর্ব্বলেরা সংঘবদ্ধ হইয়া কিম্বা অন্য উপায়ে অধিক প্রবল হইয়া উঠিলে তাহাকে পাল্টা নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইবে। সে যাহা হউক, এই ভয় এবং পরিণাম দর্শিতাই নীতি বা সাধু বুদ্ধির জনক। সুতরাং সামাজিক প্রয়োজন হইতে উদ্ভূত এই নীতি জ্ঞানকে ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

এমন প্রশ্ন হইতে পারে, ধর্ম্ম হইতে যদি নীতিকেই বিচ্ছিন্ন করা হয়, তবে ধর্ম্মের কি অবশিষ্ট থাকে এবং তাহার প্রয়োজনই বা কি? অবশ্য একরূপ ব্যাপকভাবে ধরিলে যাহার যে স্বভাব সেই তাহার—যেমন আগুনের ধর্ম্ম দাহন করা, মস্তিষ্কের ধর্ম্ম চিন্তা করা ইত্যাদি। এ হিসাবে বলিতে হয়, স্বভাবতঃ যাহা ঘটিয়াছে, তাহাই ধর্ম্ম অনুসারে ঘটিতেছে—ইহাতে ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যা বা তদ্রূপ কোনো প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু ধর্ম্মের প্রচলিত অর্থ ইহা নয়। অনেক সময় বলা হইয়া থাকে, একাগ্র সাধনাই ধর্ম্ম। যে কোনো বিষয় যদি মানুষের মনকে অন্য সমুদয় বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া তাহার চিন্তা ও কর্ম্মের গতি একমুখী করিতে পারে, তবে সেইটিই তাহার ধর্ম্ম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কবির সৌন্দর্য্য চর্চ্চাই

www.pathagar.com

ধর্ম্ম, ছাত্রের অধ্যয়নই ধর্ম্ম, রাজার প্রজা পালনই ধর্ম্ম ইত্যাদি। কিন্তু ধর্ম্মের প্রকৃত অর্থ ইহাও নহে। তবে ধর্ম্ম কি?

মানুষের মনে অসীম জিজ্ঞাসার উদয় হয়, আমি কে? কোথায় ছিলাম? কোথায় চলিতেছি? কেন চলিতেছি? আমার পরিণাম কি? এ জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? কোথায় তাঁর বাসস্থান? সমুদয় ধর্ম্মের মূলে এই সব জিজ্ঞাসা এবং ইহার উত্তর। এ সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা দর্শন শাস্ত্রের কাজ। এখানে ধর্ম্ম ও দর্শন একীভূত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মের ভিতরে দর্শনের অতিরিক্ত আরও কিছু আছে। ধর্ম্মের সহিত হৃদয়ের গভীর আশা এবং কোন শক্তিমান নিয়ামক পুরুষের অস্তিত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকাতেই ইহার দর্শন ভাগ শুধু মনের বিলাস মাত্রে পর্য্যবসিত না হইয়া প্রাণের স্পর্শে স্পন্দিত হইয়া উঠে। ধর্ম্মের বিশিষ্ট রঙ মিশ্রিত না থাকিলে দর্শন কোনও দিন এত অধিক সমাদৃত হইত কিনা সন্দেহ। মানুষের কোন প্রয়োজনে দর্শনের ভিতর ধর্ম্মের বীজ নিহিত থাকে। সেই কথাটিই এখন একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতে চেষ্টা করিব। মানুষ যখন বুঝিতে পারে, সে কত ক্ষুদ্র, জগতের নানা ঘটনা ও শক্তি পুঞ্জের সম্মুখে সে সামান্য তৃণের ন্যায় কাতর ও শক্তিহীন, যখন তাহার অন্তরের আকুল বাসনা মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইয়া যায়, তাহার সন্তান পরিজন ও প্রিয়াস্পদ মৃত্যু মুখে পতিত হয়—যখন সে প্রবলের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়া কাহারও নিকট কোন প্রতিকার পায় না, চারিদিকে কেবলই ছলনা, কৃতঘ্নতা ও নৈরাশ্যের ছায়া দেখিতে পায়, তখন স্বভাবতঃই এক সর্ব্বশক্তিমান, দয়াময় জগৎ কারণে বিশ্বাস এবং পরলোকে তাঁহার ন্যায়বিচার ও দণ্ড পুরস্কারে আস্থা স্থাপনই তাহার একমাত্র সম্বল হয়। এই সান্ত্বনাটুকু না থাকিলে মানুষের জীবন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িত।

মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি এই যে, সে যাহা আশা করে, কিম্বা যাহার অভাব অনুভব করে, সে জিনিসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এক প্রকার নিঃসন্দেহ হয়। সে মনে করে—তৃষ্ণা আছে বলিয়া জল আছে, শিশুর ক্ষুৎ-পিপাসা আছে বলিয়া মাতৃ স্তন্য আছে, স্নেহ-বৃত্তি আছে বলিয়া সন্তান আছে ইত্যাদি। বাস্তবিক মানুষ পৃথিবীতে অনেক আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা লাভ এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু ইচ্ছার নিবৃত্তির সম্ভাবনাও দেখিতে পায়। সুতরাং সদৃশ যুক্তি দ্বারা অন্তরের প্রেরণা এবং আকাঙ্ক্ষাকেই নিবর্ত্তক জিনিসের অস্তিত্বের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করে। বাস্তববিক এগুলি তর্কের কথা নয়—হৃদয়ের কথা, যুক্তির কথা নয়—বিশ্বাসের কথা। এ বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে। ইহা না থাকিলে মানুষের মনে কোন শান্তি থাকিত না ; অনন্তের পরিমাপ করিতে অসমর্থ বুদ্ধি বিকল হইয়া যাইত। অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও জ্ঞাতসারেই হউক, বা অজ্ঞাতসারেই হউক, পরিশেষে কোন না কোন বিশ্বাসে আসিয়া ঠেকে এবং সেখানেই আশ্রয় পায়। নতুবা মানুষের চিন্তা ও কর্ম্ম নিক্ষিপ্ত ও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধি ক্রমান্বয়েই উন্নত হইতেছে, কিন্তু ইহার একটা সীমা সর্ব্বদাই থাকিবে। মানুষের মনে আকাঙ্ক্ষাও চিরদিনই থাকিবে। সুতরাং প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ জগতে তাহার একটা শেষ নির্ভরস্থলই ধর্ম্মের গোড়ার কথা। সুতরাং কোন না কোন রূপে মানুষের এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম বৃত্তিও চির জাগরূক থাকিবে। বুদ্ধির শেষ সীমা হইতে বিশ্বাসের আরম্ভ। আবার বিশ্বাসের মূলেও বুদ্ধির একটা অস্পষ্ট সম্মতি আছে—নতুবা বিশ্বাসের রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইত। বিশ্বাস একটি বিস্তীর্ণ সম্ভাব্যতার ক্ষেত্র ; জ্ঞানের সহিত ইহার বিরোধ হইলে এই সম্ভাব্যতার ভিত্তি ভূমিসাৎ হইয়া যাওয়ায় বিশ্বাসও অন্তর্হিত হয়। মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রসারের

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসও ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে লোকের জ্ঞানের স্তর যেমন ভিন্ন ভিন্ন, বিশ্বাসও সেইরূপ পৃথক। প্রত্যেক দেশের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিশ্বাস তথাকার সাধারণ অধিবাসীদের চিন্তা ও জ্ঞানের সহিত সম পর্য্যায়ভুক্ত। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাসের সংস্কার আবশ্যক এবং অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অবশ্যম্ভাবী ও আবশ্যক ব্যাপারটি স্বীকার করিতে এবং স্বীকার করাইতে কার্য্যত বহু নির্য্যাতন বিপ্লব ও রক্তপাত উপস্থিত হয়। কারণ এই সমস্ত বিশ্বাসে বুদ্ধির একটু অস্পষ্ট সম্মতি থাকিলেও প্রধানতঃ এগুলি হৃদয়ের ব্যাপার। আবার হৃদয়ের ব্যাপার সব সময়েই অনেকখানি অন্ধ এবং রহস্যময়। কোন একটা বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গেলে তাহা উৎপাটিত করা সাধারণতঃ অত্যন্ত পীড়াজনক। নিজেদের বিশ্বাসের প্রতি এক প্রকার অন্ধ স্নেহ উৎপন্ন হয় ; এজন্য সেরূপ বিশ্বাসকে অন্ধ বিশ্বাস বলা হয়। যুগে যুগে এই অন্ধ বিশ্বাসের সহিত জ্ঞানের সংঘর্ষ চলিয়া আসিতেছে। এইখানেই ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের বিরোধ। শুধু বিজ্ঞান নয়, এখানে ধর্ম্মের সহিত যুক্তিরও বিরোধ ঘটে। মুশকিল এইখানেই যে, জ্ঞান ও বিজ্ঞান সর্ব্বদা পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের ভিতর দিয়া যাইতেছে—কিন্তু ধর্ম্ম বিশ্বাসের স্বাভাবিক অবস্থাই স্থিতিশীলতা। এইরূপ স্থিতিশীলতার একটি কারণ, সাধারণ লোকের নির্ব্বিকার অনুকরণ প্রবৃত্তি, চিন্তার নিষ্ক্রিয়তা এবং জ্ঞানের স্বল্পতা। কিন্তু ইহা ছাড়াও আর একটি প্রবলতর কারণ এই যে, ধর্ম্ম বিশ্বাসকে সচরাচর অপৌরুষের গৌরবে ভূষিত করিয়া শাস্ত্রকে অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া মনে করা হয়। মানুষ তার অতীতকে লইয়া গৌরব করিতে চায় বলিয়া মোহে পড়িয়া পুরাতনকে সনাতন বলিয়া বিশ্বাস করে। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেকবার এই অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্ম বিশ্বাসও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। পৃথিবী গোলাকার বা সমতল, আমাদের পৃথিবীটা বিশ্বের কেন্দ্র কি না, এবং সূর্য্য ইহার চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিতেছে কি না, কয়দিনে পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে, কতকাল পূর্ব্বে মনুষ্য জাতির সৃষ্টি হইয়াছে প্রভৃতি নানা বিষয়ে ধর্ম্ম বিশ্বাস বিজ্ঞানের নিকট হার মানিয়াছে। কিন্তু ইহাতে অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষকে কিরূপ তিরস্কার ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, এমন কি ইহাঁদের কয়েকজনকে মৃত্যু পর্য্যন্ত বরণ করিতে হইয়াছিল, সে ইতিহাস বড়ই হৃদয়-বিদারক। এখন বাধ্য হইয়া ধর্ম্ম যাজকেরা বলিয়া থাকেন ধর্ম্ম গ্রন্থ বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য নহে। বিজ্ঞান যখন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে পারিয়াছে, ধর্ম্ম তখন বাধ্য হইয়া নীরবতা অবলম্বন করিয়াছে। আবার, ইউনুস নবীর কেচ্ছা ; হনুমান ও সূর্য্যের বৃত্তান্ত, ঈসা নবীর সশরীরে চতুর্থ আকাশে অবস্থান, মাটির পাখীকে ফুঁ দিয়া প্রাণবন্ত করা, পশ্চিম দিক থেকে সূর্য্য ওঠা ; আদম নবীর পাঁজর হইতে হাওয়া বিবির সৃষ্টি, নূহ নবীর কিশ্‌তী, জলকে শরাবে পরিণত করা, শূকরের ভিতর শয়তানের প্রবেশ, সশরীরে বেহেশত ভ্রমণ, নবীর স্বর্গ অধিকার, মূসা নবীর নীল দরিয়া বিভক্ত করা, মোহাম্মদ নবীর চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করা, ইয়াজুজ মাজুজের কাহিনী, আসহাব কাহাফের গল্প, গঙ্গা স্নানে পাপ ক্ষয়, চাকা ঘুরাইয়া পুণ্য লাভ, বলিদানে দেবতার তুষ্টি, সীতাদেবীর জন্ম, ঈসা নবীর ক্রুশ—মৃত্যুতে ভক্তের উদ্ধার, হজরত মহম্মদের শাফায়াত—অসংখ্য ধর্ম্ম কথা ইউরোপীয় এবং অন্য দেশীয় সাধারণ চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট অবিশ্বাস্য কাহিনী মাত্র ; কিম্বা বড় জোর এগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনার রূপক বর্ণনা। বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই শেষোক্ত প্রকার ব্যাখ্যার উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা দিবার আবশ্যকতা ইহাতেই এই সমস্ত কাহিনীর আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা

www.pathagar.com

প্রমাণিত হইতেছে। পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম সংস্থাপকের ইতিহাসই প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাসের সহিত বুদ্ধি, সাধারণ জ্ঞান, মুক্ত দৃষ্টি এবং যুক্তির সংঘর্ষের ইতিহাস। লোকে যখন প্রচলিত বিশ্বাস বা সংস্কারকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, তখন সে বুঝিতে পারে না যে পূর্ব্বতন অনেক জীর্ণ সংস্কারকে দলিত করিয়া তাহার সংস্কার জন্মলাভ করিয়াছে। সংস্কার যতদিন বুদ্ধির সহিত সমান তালে চলিতে থাকে, ততদিন তাহার জীবন্ত শক্তি প্রভাবে অনেক কিছু সৃষ্টি করে। কিন্তু এই সংস্কার যখন বুদ্ধি ও বিচারকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তখনই তাহা কুসংস্কারে পরিণত হয়। সাধারণ লোকে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া এই সব বাহ্য সংস্কারকেই ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। এইগুলিই তাহাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর—কার্য্যতঃ তাহাদের পক্ষে ঐগুলিই ধর্ম্ম। ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মটি কি, এইখানেই সমস্ত গোল। এই পার্থক্য হইতেই শত সহস্র ফেরকা বা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। ইহাদের পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ হইতে অশেষ অনর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সমস্ত অনর্থের প্রধান কারণ এই যে, ধর্ম্ম বিশ্বাস মূলতঃ স্থিতিশীল এবং জাগতিক ব্যাপারাদি গতিশীল। জনসাধারণ যেন জাতীয় ধর্ম্ম ভাণ্ডারের খাজাঞ্চী, লাভ-লোকসানের অতীত এবং নির্ব্বিকার। খাজাঞ্চী একেবারে যক্ষের মত ভাণ্ডার আগ্‌লাইয়া বসিয়া আছে, মুদ্রা-ক্ষয় ত দূরের কথা, নূতন মুদ্রা দিয়া ভাণ্ডার পূর্ণ করিবারও সাহস তাহাদের নাই। ইহারা মুদ্রার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণে অসমর্থ বলিয়া মুদ্রা বিনিময় করাকেও অত্যন্ত ভয়াবহ মনে করে। কাজেই 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং' থাকাই তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ মনে করে।

প্রত্যেক জাতি এবং প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বী আপন আপন ধর্ম্ম বিশ্বাসকে শ্রেষ্ঠতম এবং একমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। বাস্তবিক পক্ষে, পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে, ধর্ম্ম মানুষের মনের একটা মূল বৃত্তি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, এই মৌলিক ধর্ম্মবৃত্তি বা প্রেরণা হইতে যে দর্শন, যে থিওরী এবং যে ধর্ম্ম কাহিনী বা mythology'র সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা মনুষ্যরচিত এবং প্রত্যেক দেশের ধর্ম্ম বিশ্বাস সেই সেই দেশের জনসাধারণের জ্ঞানের পরিধি দ্বারা সীমাবদ্ধ। মনে রাখিতে হইবে, এই সমস্ত দর্শন, থিওরী এবং কাহিনী মুখ্য বস্তু নয়—মূল ধর্ম্ম প্রেরণাকে রূপ দিবার জন্যই তাহার একটা বহিঃপ্রকাশ মাত্র। লোকে এই বহিঃপ্রকাশকেই মূল বস্তু বলিয়া ধরিয়া লইয়া অনর্থক বিবাদ করিয়া মরিতেছে। সকলেই শরবত খাইতে চাহিতেছে—সেখানে কাহারও দ্বিমত নাই। কাঁচের গেলাসে খাইবে, না রূপার গেলাসে খাইবে, এই লইয়াই যত গোলযোগ। কিম্বা গেলাসের গায়ে কি রকম নক্সা কাটা থাকিবে, এই লইয়া বৃথা আন্দোলন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ধর্ম্ম মানুষের মনের একটা আকুল আকাঙ্ক্ষার অপূর্ব্ব সান্ত্বনা। সুতরাং এই সান্ত্বনা যাহাতে অনুসন্ধান ও জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে শীঘ্র নষ্ট হইতে না পারে তাহাই করা কর্ত্তব্য। এরূপ করিতে হইলে ইহাকে বিজ্ঞান সম্মত ও যুক্তিসঙ্গত হইতে হইবে। শাস্ত্র বা ধর্ম্ম বিশ্বাসকে অপরিবর্ত্তনীয় মনে করিলে যে সান্ত্বনা লাভ ধর্ম্ম প্রবৃত্তির মূল উদ্দেশ্য, তাহাই নষ্ট হইয়া যায়। বিজ্ঞান ও যুক্তির সহিত সংঘর্ষে (অর্থাৎ জ্ঞান বিচার ও বুদ্ধির ক্রমিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে) ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক বিশ্বাসগুলির যদি একটু পরিবর্ত্তন হয়, তবে তাহা দূষণীয় নহে, বরং সেইটিই প্রয়োজন। এরূপ পরিবর্ত্তনে প্রকৃত ধর্ম্মের গায়ে আঁচড় লাগে না। কাঁচের গেলাস ভাঙ্গিয়া গেলে রূপার গেলাসে কাজ চালাইতে দোষ কি?

www.pathagar.com

শৈশব অবস্থা হইতে যৌবন অবস্থা প্রাপ্তির দিকেই মানুষের স্বাভাবিক গতি। শৈশব অবস্থায় লোকে অতিরিক্ত বিশ্বাস ও ভক্তি প্রবণ থাকে। যৌবন অবস্থায় লোকে চোখ খুলিয়া দেখিয়া শুনিয়া বুদ্ধি খাটাইয়া চলিতে চায়। মানব সভ্যতার শৈশব অবস্থা অন্য দেশে কাটিয়া গিয়াছে, আমাদের দেশেও যাইতে বসিয়াছে। যে সময় লোকে বিনা বিচারে ভক্তি গদগদ ভাবে অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করিত সে যুগ আর নাই। যে সময় লোকে আজ্ঞার বিচার না করিয়া অজ্ঞাকারীর মুখ চাহিয়াই আদেশ পালন করিত, সে যুগের অবসান হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা প্রবল হইয়াছে। বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া, অভিমত গঠন করিয়া তদনুসারে চলাই বর্ত্তমান যুগের আদর্শ। এজন্য ভাববাদী বা পয়গম্বরদিগের যুগের অবসান হইয়াছে বলিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগে যাতায়াত ও সংবাদ আদান প্রদানের সুসাধ্যতার ফল, শিক্ষা ও জ্ঞান দ্রুতগতিতে প্রসারিত হইতেছে। জ্ঞান বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলেই লোকের মনে সতর্কতা ও সন্দেহের উদয় হয়। বর্ত্তমান যুগের সাধারণ লোকেও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক বিষয়ে পূর্ব্বকালের মুনি-ঋষি, পয়গম্বর, অবতার প্রভৃতির চেয়ে অধিক উন্নত। সুতরাং পূর্ব্বকালে পয়গম্বরদিগের দ্বারা যে কাজ হইত, বর্ত্তমান যুগে তাহা হইবার আশা নাই। এখন ঈসা নবী যদি সত্য সত্যই পুনরায় অবতীর্ণ হইতেন, তবে তিনি যে বিশেষ কিছু করিতে পারিতেন, এবং তাঁহাকে যে অধিক সংখ্যক লোকে পয়গম্বর বলিয়া স্বীকার করিত, সে বিষয় ঘোরতর সন্দেহ আছে।

পৃথিবীতে যত পয়গম্বর আসিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই আপন আপন সমাজের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে শক্তি নিয়োজিত করিয়াছেন, এবং কতকগুলি সময়োপযোগী নূতন সত্য প্রচার করিয়াছেন। যতদিন মানুষের অস্তিত্ব আছে, ততদিন এ কাজেরও সার্থকতা থাকিবে। কিন্তু কোন ব্যক্তি বিশেষ সাক্ষাৎ ভাবে আল্লাহ্‌র নিকট হইতে সকলের উপকারের জন্য আদেশ বহন করিয়া আনিতেছেন, একথা বোধ হয় এযুগের লোকে আর বিশ্বাস করিবে না। খোদা সাক্ষাৎ ভাবে জগদ্ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার স্বরচিত নিয়মের বিরুদ্ধতা করিবেন, এ বিশ্বাস ক্রমান্বয়ে লোপ পাইতেছে। এজন্য পয়গম্বরদিগের ঐশ্বরিকতা কমিয়া গিয়া, তাঁহারা প্রতিভাশালী বিরাট মানুষ্যে পরিণত হইতেছেন। হজরত মোহাম্মদ এ সত্যটি স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া, নিজেকে বার বার মনুষ্য বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার পর আর কোন নবী আসিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে, নবীর কাজ করিবার জন্য যুগে যুগে বহু লোকের আবির্ভাব হইবে। লোকে তাহাদিগকে নবী না বলিয়া মোজাদ্দাদ বা সংস্কারক বলিবে। হজরত মোহাম্মদ মানুষের ক্রম-বিকাশের গতিও স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। তাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমার অনুবর্ত্তীদের মধ্যে এমন অনেক লোক জন্মিবে, যাহারা ইসরাইল বংশীয় নবীদের তুল্য, হজরত মোহাম্মদের এই সমস্ত উক্তি তাঁহার অসামান্য প্রতিভা ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

এক ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদেরও সকলের ধর্ম্ম ঠিক এক প্রকার নয়। প্রত্যেকের শারীরিক আকৃতিতে যেরূপ বিভিন্নতা আছে, মানসিক প্রকৃতিতেও তদ্রূপ। সংসারের বড় বড় ধর্ম্ম—এক একটি আদর্শ মাত্র। প্রত্যেকে আপন মনের রঙে তাহার ধর্ম্ম রঞ্জিত করিয়া লয়। প্রকৃত ধর্ম্ম সামাজিক ব্যাপার নহে, উহা ব্যক্তিগত। এজন্য একটা সাধারণ ছাপ মারা থাকিলেও বস্তুত পৃথিবীতে যত লোক তত মন, তত ধর্ম্ম। শুধু দীক্ষা দ্বারা ধর্ম্ম লাভ

www.pathagar.com

হয় না,—ধর্ম্মলাভ করিতে চিন্তা ও সাধনা চাই। কোন ধর্ম্ম, লোকের জ্ঞান ও বুদ্ধি অপেক্ষা নিম্ন হইলে যেমন তাহা উন্নতির বিরোধী হয়, আবার অধিক উন্নত হইলেও লোকে তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না। এজন্য মিশনারী প্রচেষ্টা দ্বারা সমাজে হয়ত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ধর্ম্ম হিসাবে তাহার কার্য্যকারিতা তত অধিক নয়। শিক্ষা ও জ্ঞানের উন্নতিই প্রচারের এক প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। জ্ঞান ও বুদ্ধির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে লোকে আপনা আপনি অধিক উন্নত ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে।

আমরা মানুষের মনের যে মৌলিক বৃত্তিকে ধর্ম্ম নাম দিয়াছি, যাহা শাশ্বত সনাতন, সেটি অনেকখানি ধরা ছোঁয়ার বাহিরের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাহাকে রূপ দিবার জন্য অনেক সামাজিক নীতি ও রীতির আশ্রয় লইতে হইয়াছে। এই নীতি ও রীতিগুলি সাক্ষাৎভাবে ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট না থাকিলেও, পরোক্ষভাবে আছে। এইখানেই ধর্ম্ম ও সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের কথা আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। ধর্ম্মগ্রন্থে যাহা লেখা আছে, তাহার সমস্তই যে ধর্ম্ম-কথা তাহা নহে। উহার মধ্যে কোন্‌গুলি সমাজ-কথা তাহা বাছিয়া বাহির করিতে হইবে। ধর্ম্মের অর্থ সুবিধা বুঝিয়া একটু ব্যাপক ভাবে ধরিলে হয়ত পৃথিবীর সব কিছুকেই ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু তাহাতে আমাদের মনের সান্ত্বনা মিলিবে না, অথচ কলহও বাড়িয়া যাইবে। বস্তুতঃ যে সমস্ত খুঁটিনাটি ও সামান্য ব্যাপার লইয়া হানাফী, মোহাম্মদী, আহমাদী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর রেষারেষি হইতে দেখা যায়, একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, সেগুলি মোটেই ধর্ম্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়, এমন কি অনেক স্থলে সামাজিক রীতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিভিন্ন ধর্ম্ম-দর্শনের মধ্যে যে প্রভেদ সেটি কেবল কাল্‌চারের প্রভেদ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মানুষে মানুষে সে প্রভেদ চিরকাল থাকিবেই। এক্ষেত্রে যাহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত, তাঁহারা অনুন্নতদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া যদি বল প্রকাশ বা অন্য উপায়ে তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া উন্নত করিতে চান, তবে বড়ই নিষ্ঠুরতা হইবে, বেচারাদিগকে ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ফেলিয়া নির্য্যাতন করা হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে অনুন্নত সমাজের ভিতরে ধীরে ধীরে জ্ঞানের বীজ ছড়াইয়া দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাহার ফলে উহারা যতদূর উন্নত হইবে, উহাদের জাগতিক ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপারেও সেই অনুপাতে উন্নতি হইবে।

সমাজের স্থিতি রক্ষার জন্য অন্য কতকগুলি শাসন ও শৃঙ্খলার প্রয়োজন। কিন্তু সেগুলি যে ধর্ম্মের খাতিরে নয়, সমাজের খাতিরেই পালনীয় একথা ভুলিলে চলিবে কেন? লোকের মনে ধর্ম্মের নামে একটি মোহ আছে, সেটি স্বাভাবিক। কিন্তু ধর্ম্মের পরিধি বাড়াইয়া সমাজ বিধিকে ধর্ম্মের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইয়া এই সমাজ বিধির প্রতি মোহ জন্মিয়া গেলে অনর্থক বাড়াবাড়ি ও জঞ্জাল বৃদ্ধি ভিন্ন কিছুই হয় না। তাহা ছাড়া, ধর্ম্ম গ্রন্থের যে অর্থ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিয়াছে, তাহাই যে চরম এ বিশ্বাসটিও বড় মারাত্মক।

বর্ত্তমান যুগের নূতন জ্ঞানালোকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়া আমাদিগকে তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে। এস্থলে, সমাজ ব্যক্তিত্বের বিকাশের অন্তরায় হইলে, সেটা সমাজেরই দুর্ভাগ্য। ফলতঃ মানুষের কল্যাণের জন্যই ধর্ম্ম, মানুষের জন্যই সমাজ। ধর্ম্ম এবং সমাজ যদি মানুষেরই অবাধ মুক্তির পথে কণ্টকস্বরূপ হয়, তবে তাহার চেয়ে দুভার্গ্যের কথা আর কি

www.pathagar.com

হইতে পারে? উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। এজন্য সমাজের লোককে শাস্তি দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু চিন্তা এবং ধর্ম্ম লোকের ব্যক্তিগত অধিকার। এইগুলিকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলা সমাজ জীবন বা জাতীয় জীবনে ঘোর কলঙ্কের কথা। মধ্যযুগে অনেক উচ্চ চিন্তা এবং উজ্জ্বল প্রতিভা সম্মানের পরিবর্ত্তে শোচনীয় পরিণাম লাভ করিয়াছে। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে লোকে ভুল বুঝিয়া তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে লোকে ক্রমশঃ বুঝিতে পারিতেছে চিন্তাশীল, জ্ঞানী ও প্রতিভাবান পুরুষরাই স্থিতিশীল সমাজকে প্রবল আঘাতে জাগ্রত করিয়া উন্নতির দিকে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দেন। এজন্য বর্ত্তমান যুগে এক সঙ্গে যত অধিক জ্ঞানী ব্যক্তির আবির্ভাব হইতেছে, এবং জগৎ যেরূপ দ্রুত গতিতে স্থায়ী উন্নতির উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছে, ইতিপূর্ব্বে ইহার তুলনা পাওয়া দুষ্কর। পূর্ব্বে জ্ঞান ও ক্ষমতা জাতির শ্রেষ্ঠ দুই চার জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁহারাই সমগ্র সমাজকে টানিয়া তুলিতে চাহিতেন। বর্ত্তমানে বুদ্ধি ও চিন্তার স্বাধীনতার ফলে, অবহেলিত সাধারণ লোকেরাও মোটের উপর জ্ঞানের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া একটু স্বাধীন আবহাওয়ার আস্বাদ পাইতেছে। একটি জাতি ভিতরের প্রেরণায় সমগ্রভাবে উন্নত হইলে তবেই তাহাকে প্রকৃত উন্নতি বলে। শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোকে ধর্ম্ম ও সমাজের সূত্রগুলি স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিবে, লোকের উদারতা বৃদ্ধি পাইবে এবং ব্যক্তিত্বের সম্মানও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইবে। ব্যক্তিত্বের এই পরিপুষ্টির মধ্যেই জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির বীজ নিহিত আছে।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যের চর্চ্চা

কাজী আবদুল ওদুদ এম. এ.

সাহিত্য সম্বন্ধে যাঁরা কিছু বলতে যাবেন তাঁরা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করবেন সাহিত্য-তত্ত্ব, অর্থাৎ রস কি, কাব্য কি, কবি কে, এই সব—আমাদের দেশের পাঠক-সাধারণ এ আশায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু লেখক-সাধারণ দুঃখের সহিতই জানেন, সংস্কৃত অথবা ইংরেজী বচনোদ্ধার তাঁরা যতই করুণ, কাজটি আসলে বড় শক্ত—হয়তো বা অসম্ভব, তা হোক না খুব শক্ত, এমন কি অসম্ভব-ঘেঁষা, তবু সাহিত্যিকদের এই সাহিত্য-তত্ত্বরূপী স্বর্ণ-মৃগের পশ্চাদ্ধাবন অসঙ্গত বা অশোভন নয়। কেননা স্বর্ণ-মৃগ আয়ত্তের বহির্ভূত হতে পারে কিন্তু তাকে উপলক্ষ করে যে প্রয়াস, যে দুঃখভোগ, যে অন্তর্দ্দাহ তার ভিতরে পুটপাক হয়ে কোনো অমৃত তাঁদের জন্য উচ্ছলিত হবে কিনা কে জানে।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যিকদের জন্য বিষয়টি আরো কিছু জটিল। সত্য বটে এমন কিছু চিন্তা-ভাবনা, কিছু রূপাঙ্কন বাংলা সাহিত্যে আমরা পেয়েছি, যা অমৃতমাখা, মানুষের চিত্তের জন্য এক উপাদেয় খাদ্য। কিন্তু তার পরিমাণ ও রকমারিত্ব এখনো বড় কম—এত কম যে তাই থেকে সাহিত্যতত্ত্ব সম্বন্ধে নব নব প্রেরণা লাভ অসম্ভব না হলেও দুঃসাধ্য নিঃসন্দেহ। ইংরেজী প্রভৃতি সাহিত্যে যাঁরা কাব্য জিজ্ঞাসু তাঁরা অবশ্য তাঁদের অনুসন্ধিৎসা শুধু ইংরেজী সাহিত্য ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রাখেন না, কিন্তু সেই সাহিত্যই যে তাঁদের মুখ্য প্রেরণাস্থল সে সম্বন্ধে বাক্য ব্যয় বোধ হয় অনাবশ্যক। তাছাড়া ইংরেজী ভিন্ন অন্যান্য যে সব সাহিত্য থেকে তাঁরা উপকরণ সংগ্রহ করেন, যেমন গ্রীক ও রোমক সাহিত্য, সে সবের সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সম্বন্ধ এত নিকটবর্ত্তী যে, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তেমন নিকট সম্বন্ধ কোন সাহিত্যের অথবা কোন কোন সাহিত্যের সেইটিই একটি বড় অনুসন্ধানের বিষয়।

কথাটা কারো কাছে অদ্ভুত শোনাতে পারে, কেননা বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের পরিমাণই যে বেশী শুধু তাই নয়, তবু এ কথাটা বাস্তবিকই অদ্ভুত নয়। মধুসূদনের আগেকার যে বাংলা কাব্য, যেমন ভারতচন্দ্রের অথবা বিদ্যাপতির কাব্যও কতকাংশে চণ্ডীদাসের কাব্য, বলা যেতে পারে, মুখ্যভাবেই হোক আর গৌণভাবেই হোক, সংস্কৃত কাব্য ও অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রভাব তার উপর বেশী। কিন্তু মধুসূদন থেকে বাংলার যে নব সাহিত্যের সূত্রপাত তার সম্বন্ধে এ কথা বলা যায় কি? নব সাহিত্যের, সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ তেমনই প্রচুর, হয়তো বা প্রচুরতর, সংস্কৃত শব্দালঙ্কার, সংস্কৃত দার্শনিক পরিভাষা এসবও বাংলার নব সাহিত্যের রথীদের প্রীতির সামগ্রী, কিন্তু এসব, যাকে বলা হয়, বাইরের সাজ সজ্জা, ভেতরকার আসল কবি-মানুষটি যে বদলে গেছে।

কথাটা আরো কিছু পরিস্কার করে' বলা যেতে পারে। কালিদাস, ভারবি প্রমুখ সংস্কৃত কবিদের আর্থিক অভাব-অভিযোগের তাড়না ভোগ করতে হতো কি না, সে তত্ত্ব আমাদের

www.pathagar.com

অজ্ঞাত। কিন্তু তাঁদের কাব্যের ভিতরে যে চিত্ত প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায়, সেটি বড় শান্তিপূর্ণ—উদ্বেগরহিত। অর্থাৎ, ধর্ম্ম, সমাজ, ইহকাল, পরকাল ইত্যাদি নিয়ে মানুষের চিত্ত যে সময় আন্দোলিত হয়—এ কালের মানুষ এ আন্দোলনের হাত থেকে যেন আর নিষ্কৃতিই পাচ্ছে না—এই সব সংস্কৃত কবি সে বিক্ষোভ দ্বারা যেন অস্পৃষ্ট। কিন্তু মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—আমাদের একালের সাহিত্যের দিক্‌পাল—এঁদের মনোজীবনের সে আরাম কোথায়? সত্য বটে মধুসূদনের জীবন বহু বিপর্য্যয়ে বিপর্য্যস্ত হলেও তাঁর কাব্যের মর্ম্মকোষে যে চিত্তটি বিরাজ করছে সেটি প্রসন্ন—ঠিক আনন্দ না হলেও শান্তিপূর্ণ। কিন্তু তাঁর যে নব-আবিষ্কৃত ছন্দলোক—কত অভিনব সামগ্রী সেই বিরাট হার্ম্মনি। কত বিক্ষোভ, কত দুঃখ, কত প্রেম, কত মাধুর্য্য তাঁকে এই অপরূপতা দান করেছে! মধুসূদন নিজে বলেছিলেন, গ্রীক দেবদেবীদের তিনি পরিয়ে দেবেন হিন্দু দেবদেবীর পোষাক,—কত নব নব সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে তাঁর এই উক্তির সার্থকতা লাভের ভিতরে তাই-ই ভাববার বিষয়।

আর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটিতে বাল্মীকির কবিপ্রেরণা লাভ সম্পর্কে বলা হয়েছে—

কী তাহার দুরন্ত প্রার্থনা,
অমর বিহঙ্গ শিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট নীড়? ...

বঙ্কিম-রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে এই কথাই বার বার আমাদের মনে হয়। একাধারে এঁরা কবি, দার্শনিক, সমাজসংস্কারক, রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ্, ভাষা-সংস্কারক, ধর্ম্ম-সংস্কারক। আর তাও অজ্ঞাতসারে নয়, সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে—হৃদয়রক্ত নিঃশেষিত করে।

কাব্য সম্বন্ধে সেকালের সংস্কৃত উক্তি—

কাব্যং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে,—আর একালের বাংলা উক্তি—

কত প্রাণপণ,— দগ্ধ হৃদয়,
বিনিদ্র বিভাবরী,—
জান কি বন্ধু উঠেছিল গীত
কত ব্যথা ভেদ করি?

এই দুই কাব্য-জগতের যে ব্যবধান তা শুধু বিপুল নয়, কোনো কোনো দিক দিয়ে হয়তো বা দুর্লঙ্ঘ্য।

এই জন্য শান্তি নয় সংগ্রামী-ধর্ম্মী যে ইয়োরোপীর সাহিত্য তার সঙ্গে মিলিয়ে বাংলার নব সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করতে আমাদের কোনো কোনো সমালোচক যত্ন পরায়ণ দেখতে পাওয়া যায়। এখানেও মুশকিল কম নয়। ইউরোপীয় সাহিত্য ইয়োরোপবাসীর কাছে এক জীবন্ত ব্যাপার। সেই জীবনের প্রয়োজনে সেই সাহিত্যের, অর্থাৎ কাব্য ও কাব্য জিজ্ঞাসা দুয়েরই, আকৃতি প্রকৃতির পরিবর্ত্তন সেখানে হচ্ছে। এত দূরে থেকে সেই জীবন ও পরিবর্ত্তন প্রবাহের সমঝদারী আমাদের জন্য খুবই দুরূহ সন্দেহ নাই। তাই ইয়োরোপীয় সমালোচনা শাস্ত্র নিয়ে আমাদের ভিতরে যাঁরা কিছু ব্যস্ত-সমস্ত ইউরোপের সেই অনুদিন-বর্দ্ধমান কাব্য জিজ্ঞাসার পরিবর্ত্তে অনেক সময়েই যে তাঁদের লাভ হবে বিভিন্ন ধরনের কিছু কিছু 'কোটেশন' থেকে তা অস্বাভাবিক বা অসাধারণ কিছু নয়। কিন্তু এর অসাধারণত্বও

www.pathagar.com

আছে—এই কোটেশন সমালোচনাও মাঝে মাঝে বাংলা সাহিত্যে ভীতির সঞ্চার করে এসেছে।

কিন্তু বলা যেতে পারে, ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে একালের বাংলা সাহিত্যের মিল যখন বেশী, তখন যতটা সম্ভব ইউরোপীয় কাব্য জিজ্ঞাসার মূল সূত্রগুলি আয়ত্ব করা ভিন্ন আমাদের নব সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করবার আর কি মানদণ্ড আছে? বলা বাহুল্য, আমাদের অনেক সমালোচকেরই মোট বক্তব্য এই—যদিও সত্যকার সাহিত্য রসিকদের বুঝতে একটু দেরী হয় না এই মনোভাব কত হেয়। এ হচ্ছে অনুকরণের মনোভাব,—আর অনুকরণ করে যেমন কবি হওয়া যায় না, অনুকরণ করে তেমনি কাব্যজিজ্ঞাসুও হওয়া যায় না। সত্য বটে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে সৃষ্ট আমাদের নব সাহিত্য। কিন্তু সেই প্রভাবের কথাই ত এর সবখানি কথা নয়। বরং প্রকৃত কথা এই—এক ভিন্ন পরিবেষ্টনে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে সৃষ্ট এই সাহিত্য। এই অভিনবত্বটুকু না বুঝলে একালের বাংলা সাহিত্যের কিছুই বোঝা হয় না।

যাঁরা একালের বাংলা সাহিত্যের স্রষ্টা তারা যে এই অভিনবত্বের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত ছিলেন তা নয়। মধুসূদন ত ইয়োরোপীয় কাব্যকলা বরণ করেছিলেন প্রাণের দোসর রূপে। কথিত আছে, তাঁর স্ত্রীর কণ্ঠে ফরাসী গান শুনে তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করেছিলেন। তবু তাঁর রাবণ, মেঘনাদ অথবা রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, বিভীষণ হোমরের প্রায়াম, হেক্টর অথবা আগামেমনন, নেস্‌টর, হেলেন, ইউলিসিসের অনুকৃতি হয়ে ওঠে নাই। এমন কি এরা ইয়োরোপীয়ও নয়,—সমস্ত নুতনত্ব সত্ত্বেও এরা সেই এক ধরনের বাঙালী। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ অবশ্য জাগ্রতভাবে বাংলার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁদের সাহিত্যে। কিন্তু জ্ঞাতসারে বাংলার বৈশিষ্ট্যসাধন তাঁরা যতটুকু করতে চেয়েছেন তাঁদের অজ্ঞাতসারে তার চাইতে মহত্তর বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন তাঁদের প্রতিভা থেকে লাভ করেছে। এই যে আমাদের সৌভাগ্য এর জন্য পর্য্যাপ্তি-বোধ অশোভন নিশ্চয়ই, কিন্তু এ বিষয়ে উদাসীন হয়ে পর ধন লোভে মত্ত হলে তা হয় শোচনীয়।

কিন্তু প্রশ্ন হবে—কি সেই নব বাংলা সাহিত্যের অভিনবত্ব? কি তার স্বরূপ?

এ প্রশ্নের খুবই সন্তোষজনক উত্তর কেউ যদি দিতে পারেন তবু বাংলার অন্যান্য সাহিত্যসেবীর সেজন্য অব্যাহতি মেলে না। তাই বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এমন একটা প্রশ্নের অবতারণাই আমাদের জন্য সব চাইতে বড় লাভ। হয়তো এই প্রশ্নের আঘাতেই বাংলার জীবন ও সাহিত্য সমস্যার নব নব দ্বার আমাদের জন্য উদঘাটিত হবে। এর উত্তর বাংলার সাহিত্য দরবারে, তথা বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে পেশ করতে চেষ্টা করবেন বিভিন্ন সাহিত্যিক তাঁদের শক্তি ও যোগ্যতা অনুসারে। আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি তা নিবেদন করতে চেষ্টা করব।

শোনা যায় বাংলাদেশ এক সময়ে জলমগ্ন ছিল। তখন সমুদ্রের তরঙ্গ তার বুকের উপর খেলা করত। সেই তরঙ্গ ভঙ্গের ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে বাংলা নিজেকে প্রকাশ করেছে। বাংলার লোকদের জীবনেও তেমনি বহুবার বহু ভাবে প্লাবন এসেছে। আর্য্য-দ্রাবিড়-কোল-মঙ্গল-বৌদ্ধত্ব-হিন্দুত্ব এসব ত ছিলই, তার উপর এসেছে মুসলমান-প্লাবন তার নবাবী-বাদশাহী শরিয়ত-মারেফাত এইসব নিয়ে ; তার উপর এসেছে ইয়োরোপীয়

www.pathagar.com

প্লাবন তার বাণিজ্য-রাজনীতি, ফরাসী বিপ্লবের বার্ত্তা, খৃষ্টধর্ম্ম, সাহিত্য-বিজ্ঞান ইত্যাদি নিয়ে। অবশ্য এমন বৈচিত্র্য যে বাংলারই বৈশিষ্ট্য তা নয়, প্রায় সব দেশেরই ইতিহাস যথেষ্ট বিচিত্র। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে এই সব বিচিত্র উপকরণের কেমন এক জৈব মিলন ঘটেছে—এ মিলন সব দেশে সব সময়ে ঘটে না—এ কালের বাংলা সাহিত্যে ফুটে উঠেছে বাংলার এই নব গঠিত মানসলোকের শ্রী। বাংলার নব ধর্ম্মাচার্য্যবৃন্দ নব সাহিত্য-রথিবৃন্দ এঁদের সবারই জীবনে প্রাচীর ও প্রতীচীর বিচিত্র সাধনার সমাবেশ ঘটেছিল বাংলার শিক্ষিত লোকেরা তা জানেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিকের কাছে এই সমাবেশ বিশেষভাবে তাৎপর্য্যপূর্ণ এইজন্য যে, এতে এই অগ্রণীদের জীবনই এক আশ্চর্য্য সুষমামণ্ডিত হয় নাই, বরং এঁদের ভিতর দিয়ে বিজ্ঞাপিত হয়েছে সমগ্র বাঙালী জীবনের জন্য এক নব সূচনা ; এঁরা যেন পর্ব্বত শীর্ষে—নব প্রভাতের সুপ্রসন্ন আশীর্ব্বাদে প্রথম উজ্জ্বলিত এঁদের ভালদেশ।

বলেছি, এই বৈশিষ্ট্য সাধনের জন্য খুবই চেষ্টিত আমাদের মনীষীরা যে হয়েছিলেন তা নয়। এমনকি তাঁরা আগের সময়ে কেমন করে যেন একে আচ্ছন্ন করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্ত ধরা যাক। তিনি ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিন্দুধর্ম্মের স্থান নির্দ্দেশ করেছেন সব ধর্ম্মের উপরে। কিন্তু বেদের বহু ঊর্ধ্বে তিনি যে গীতার স্থান নির্দ্দেশ করেছেন এতেই তাঁর হিন্দু ধর্ম্মের ব্যাখ্যা অনেক নিষ্ঠাবান হিন্দুর ভক্তির চাইতে সংশয় জাগায় বেশী। তেমনিভাবে তাঁর প্রফেট ষ্টেটস্‌ম্যান ও বৈজ্ঞানিক বিচারে পূর্ণাঙ্গ শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত হিন্দুর বিস্ময়ের সামগ্রী। অথচ এসব বঙ্কিমচন্দ্রের খেয়ালী সৃষ্টি নয় ; তাঁর জিজ্ঞাসায় তীব্রতা যথেষ্ট। তাঁকে যদি বলা হয় কঁৎ-স্পেন্সার-সিলি-বেন্থামের হিন্দুবেশী শিষ্য তাতেও ঠিক কথাটি বলা হয় না। কেননা এইসব পশ্চাত্য মনীষীর মতো পাণ্ডিত্য দার্শনিকতা তাঁর বড় লক্ষ্য নয়। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৌন্দর্য্যবোধ ও অনুসন্ধিৎসা, প্রবল স্বদেশ কল্যাণ-কামনা ও কিছু মোহ, সমস্ত নিয়ে বিশেষভাবে একজন Man of faith—কল্যাণ-জিজ্ঞাসু কর্ম্মী। তাই দেশের জীবনের এক সন্ধিক্ষণে তাঁর এই আলো ও অন্ধকার উদ্‌গীরণকারী অদ্ভুত প্রতিভা থেকেও কিছু নির্দ্দেশ লাভ হয়েছে—কি কল্যাণ, কি পথ, কি গ্রহণীয় কি বর্জ্জনীয়।

আর রবীন্দ্রনাথ। তাঁর প্রতিভা তাঁর সমসাময়িকদের কাছে পূর্ণাঙ্গ অনবদ্য বিবেচিত হবে এ স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কিছুরই পূর্ণাঙ্গতা লাভে প্রকৃতির বোধ হয় আপত্তি। তাই পরবর্ত্তীকালের সাহিত্য-রশিকেরা হয়ত দেখবেন, যে বিশ্বপ্রেমের জন্য এই কবির কোনো কোনো স্বদেশবাসী তাঁর প্রতি অনুরক্ত অথবা বিরক্ত হয়েছেন সেই প্রকাণ্ড বিশ্ব-প্রেমের চাইতে অপ্রকাণ্ড স্বদেশ-প্রেম বা বঙ্গপ্রেম তাঁর ভিতরে কত নিবিড় ! সেজন্য তাঁর প্রতিভা তাদের কাছে কম গৌরবের হতে পারত, কিন্তু কবির নিজের ও তাঁর স্বদেশবাসীদের সৌভাগ্য এই যে, কবির জন্মগত সত্যের আকর্ষণ, মহাজীবনের আকর্ষণ তাঁর সমস্ত আরাম ও তুচ্ছতা প্রীতির ভিতরে বার বার জয়ী হয়েছে। রবীন্দ্র সাহিত্যে এই যে সত্যের আকর্ষণের ছবি, এই যে সৌন্দর্য্যপ্রিয়, আরামপ্রিয়, স্বদেশ স্বজাতি ও স্বকালের সঙ্গে নিবিড় স্নেহের যোগে যুক্ত, কবি বার বার উন্মনা হয়ে উঠেছেন সত্যের আহ্বানে ও শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত মোহপাশ অপসারিত করে নত মস্তক হতে পেরেছেন সত্যের সামনে,—এই অপরূপ জীবন-আলেখ্য, এরই জন্য মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের

www.pathagar.com

আত্মোজ্জ্বল প্রতিভার চাইতে তার প্রতিভা তাঁর দেশ ও জাতির জন্য বেশী অর্থপূর্ণ হয়েছে।

... একটা দেশের লোক বহু কাল ধরে বাস করে আসছিল অনেকখানি জড় ধর্ম্মের ধর্ম্মী হয়ে। সময় সময়ের চিত্তোচ্ছ্বাস সত্ত্বেও একটা অপ্রবলজীবন, অপ্রচুর জীবনায়োজন এইই ছিল জগতের সামনে তাদের পরিচয়। সেই জীবনে কোথা থেকে জেগেছে নব সাধ—নব স্বপ্ন ! পাড়া গাঁয়ের ব্যাপারী যেন আলাউদ্দিনের প্রদীপের দৈত্যের সাহায্যে রাতারাতি হয়ে উঠেছে বিশ্বের বন্দরের সওদাগর ! গ্রাম্য সমাজের অন্ধ গতানুগতির পরিবর্ত্তে জগৎ সমাজের সাহিত্য, ধর্ম্ম তত্ত্ব, সৌন্দর্য্য, বিজ্ঞান সমাজনীতি, রাজনীতি তার অবলম্বন ও উপজীবিকা !...

বাংলার সাধারণ জীবনের সঙ্গে বাংলার সাহিত্যের জীবনের এই প্রভেদ। এই সাহিত্যকে বিশেষিত করা যেতে পারে idealistic বলে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে idealism-এর সুখ-স্বপ্ন এর মর্ম্মকথা নয়। এ তার চাইতে বীর্য্যবন্ত। এ বরং prophetic-বাংলা যা হবে বা তাকে যা হতে হবে তারই সূচনা এতে। সব সাহিত্যেরই দোষ ত্রুটি থাকে ; একালের বাংলা সাহিত্যেরও আছে। হয়তো বড় সাহিত্যের তুলনায় কিছু বেশী আছে। কিন্তু গণনার বিষয় এর ত্রুটি নয়, এর প্রাণশক্তি—এর অর্থ ও সম্ভাবনা। কিন্তু এ কালের বাংলা সাহিত্যের এই অর্থ ও সম্ভাবনা-জিজ্ঞাসায় বাংলার 'কাব্য রসিকরা' আশ্চর্য্য ক্ষীণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

কিন্তু তাঁদের এত নিন্দা করে লাভ নাই। সমালোচকরা মোটের উপর দেশের পাঠকদের প্রতিনিধি। তাই তাঁদের দোষ তাঁদের একলার দোষ নয়। সে দোষ হয়ত গোটা পাঠক সমাজের।

আসলে ব্যাপারটাও তাই। সত্যকার সাহিত্যিক বোধ ও রুচি বাংলার পাঠক সমাজের খুব কমই প্রসার লাভ করতে পেরেছে। এ ব্যাপারে আশ্চর্য্যভাবে সফলকাম হয়েছেন আমাদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকরা নন—আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিকরা। তাঁদের পরিচয়স্বরূপ বলা যেতে পারে, মধুসূদন বলতে তাঁরা বুঝেছেন—'পরধর্ম্মো ভয়াবহ', বঙ্কিমচন্দ্র বলতে বুঝেছেন—হিন্দুত্বের পুনরুত্থান, আর রবীন্দ্রনাথ বলতে বুঝেছেন —Idealism, Mysticism অর্থাৎ কিছু কবি কবি ভাব।

আর এই সাহিত্য-সমঝদারি নিয়ে বাংলার পাঠক সমাজ মোটের উপর আরামেই ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সে আরাম ভেঙ্গে দিতে চাচ্ছে, অথবা দিয়েছে—অতি 'আধুনিক সাহিত্য'।

এই 'অতি আধুনিক সাহিত্য' বা 'তরুণ সাহিত্য' বাঙালী জীবনে মহা চাঞ্চল্যের সূচনা করেছে। এর প্রশংসা হয়তো এর লেখকদেরই মুখে, তাঁদের গণ্ডীর বাইরে দুই চার জন প্রসন্ন পাঠকও হয়তো আছেন। কিন্তু বাদবাকি সমস্ত বাঙালী, লেখক, পাঠক নির্ব্বিশেষে এর উপর অসন্তুষ্ট। তাঁদের এই অসন্তোষের কারণ নির্ণয় কিন্তু খুব সহজ নয়। কেননা 'তরুণ সাহিত্যে'র যে সব অবিচার অনাচারের দিকে তাঁরা আঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন সহজিয়া ও কবি খেউরের বাংলা দেশে ও বাংলা সাহিত্যে তা পুরাপুরি নতুন নয়। তবে 'তরুণ সাহিত্যিক'দের বড় অপরাধ হয়ত এই যে, বাংলার ভদ্র-সাধারণ একটা শত ছিদ্রপূর্ণ অথচ ভব্যতামণ্ডিত জীবন নিয়ে কিছু নিরুদ্দেসে দিন কাটাচ্ছিলেন, এই

www.pathagar.com

তরুণরা সেই ক্ষণভঙ্গুর ভব্যতার আবরণ নিয়ে নেহাৎ অল্পমতির মতো টানা হেঁচড়া আরম্ভ করেছেন।

আমি নিজে তরুণদের সাহিত্য সম্বন্ধে ভালমন্দ কিছুই বলতে চাই না ; কেননা, মনে হয়, তা অনাবশ্যক। সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর যে বুদ্ধি–বিবেচনা, নীতি–রুচি 'তরুণ সাহিত্যিক'রা মোটের উপর তার চাইতে বেশী ভাল বা বেশী মন্দ নন। 'তরুণ'দের নব ইয়োরোপ–প্রীতি ও অতরুণদের প্রাচীনভারত–প্রীতি একই মনোভাবের এপিঠ আর ওপিঠ। কিন্তু মনে হয় বাংলার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের কাছে এই তরুণদের চেষ্টাই হবে বেশী অর্থপূর্ণ ; কেননা যে ধ্বংস বাংলার সমাজ জীবনে অবশ্যম্ভাবী—এবং সেই পথেই হয়ত কল্যাণ—এই 'তরুণ'দের প্রচেষ্টায় ফুটতে চাচ্ছে সেই ধ্বংসেরই রূপ। রচনা বিষয়েও এই 'তরুণ'দের কারো কারো ভিতরে দেখা যাচ্ছে তাঁদের অতরুণ নিন্দুকদের চাইতে কিছু বেশী শক্তি। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যেতে পারে, নজরুল ইসলামকে অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্রকে। নজরুল ইসলামকেই ধরা যাক। তাঁর রচনা বহু ত্রুটিপূর্ণ নিঃসন্দেহ। কিন্তু তবু তাতে আঁকা পড়েছে একটি তাজা মনের অভিমান—উন্মাদনার, আশা আনন্দের ছাপ। অর্থাৎ, এ কাব্যফুল তাজা গাছের ফুল—হোক না বন্যফুল। কিন্তু এর পাশে দুই চার জন অতরুণ শিক্ষিত কবির রচনা দাঁড় করালে দেখা যাবে, তাতে না আছে রং না আছে গন্ধ। রঙের আভাস যেটুকু লাগে তা প্রলেপ ; গন্ধও দুই এক ঝলক যা পাওয়া যায় তা প্রক্ষেপ ; আসলে এ কাগজের ফুল !

বাস্তবিক, বাংলা সাহিত্যে 'তরুণ'দের অবজ্ঞা ও মস্তিষ্কহীনতা আসলে সমস্যা নয়, আসল সমস্যা বরং সাধারণ বাঙালী জীবনের জড়তা ও স্বল্পতুষ্টি বা অন্ধতা তরুণদের পূর্ব্ববর্ত্তী আরামপ্রিয়, অকর্ম্মণ্য, খোয়লী কবি ও সমালোচকনিবহ যার প্রতীক—আর 'তরুণ'রা একই সঙ্গে যার ভয়াবহ পরিণতি ও ক্ষীণ প্রতিক্রিয়া। —এই সাধারণ বাঙালী জীবনের অবাঞ্ছিত চেহারা বদলে দেওয়াই একালের বাংলা সাহিত্যের এক বড় কাজ। কিন্তু এ কাজ এখনো অসম্পন্ন।

প্রাকৃতিক নিয়মে যে জলধারা পাহাড় থেকে নেমে এসে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তারই কূলে কূলে লোকের বসতি জমে, সভ্যতার বিকাশ ঘটে। বাংলার বুকে যে ভাবগঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে, তারই কূলে কূলে ফুটবে বাংলার জাতীয় জীবনের শ্রী ছাঁদ। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন আমাদের সমস্ত ঔদাসীন্য ও তুচ্ছতাপ্রীতি সর্ব্বান্তঃকরণে দূর করে দিয়ে একই ভাবনদী যে আমাদের বহু দেশ–দেশান্তরের বিচিত্র সম্পদ সম্ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করেছে, সেই মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন হওয়া। এমনিভাবে, শুধু সাহিত্য চর্চ্চা নয়, ব্যাপকভাবে জীবন চর্চ্চাতেই আমাদের নব সাহিত্যের প্রকৃত সার্থকতা। আর এইভাবেই আমাদের সমস্ত মুগ্ধতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে জীবনে ও সাহিত্যে আমাদের সমস্ত চেষ্টার real হবার, সত্যাশ্রয়ী হবার, সুযোগ ঘটবে।

Realism কথাটার সঙ্গে বাংলার তরুণরা বেশ পরিচিত। কিন্তু মনে হয় এ কথাটা তাঁরা বুঝতে চাচ্ছেন বেশ খানিকটা বিকৃত করে। মৃত্যু আমাদের পদে পদে, কিন্তু মৃত্যু real নয়, real জীবন যা মৃত্যুকে ডিঙ্গিয়ে চলে। তেমনিভাবে মোহ, দুর্ব্বলতা মানুষের পদে পদে, কিন্তু তাহাই real নয়, real তপস্যা যা মানুষকে সত্যকার মনুষ্যত্ব দান করে। আমাদের দেশের যে

www.pathagar.com

খণ্ডিত বিপর্য্যস্ত রুগ্ন জীবন একে real ধরে নিয়ে নাকি সুরের কান্না চর্চ্চায় না হয় সাহিত্য চর্চ্চা না হয় জীবন চর্চ্চা।

তাজা ঘোড়াকে জীর্ণ আস্তাবলে পোরায় যে বিপদ, বাংলার মনীষিদের নব জীবন ও নব মানবতার সাধনা বাংলার সমাজ জীবনে হয়ত সেই বিপদের সূচনা করেছে। কিন্তু সেই ঘোড়া বিদায় দিয়ে জীর্ণ আস্তাবলটি যে অটুট রাখবার চেষ্টা হবে সে সময়ও ত উত্তীর্ণ হয়ে গেছে!

কিন্তু বৃথা এই অস্বস্তিবোধ, বৃথা এই ক্ষোভ। 'এক হাতে এর কৃশাণ আছে, আর এক হাতে হার'—এই যে আমাদের একালের সাহিত্য, এ আমাদের বিভ্রান্ত করতে আসে নাই, এ প্রকৃতই আমাদের সৌভাগ্য। আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ববিধ জীবন real করবার বল ও স্বাস্থ্য সমন্বিত করবার সুন্দর করবার অমোঘ শক্তি এর আছে। তাই এ যদি এ-কালের বাংলা সাহিত্যিকদের কাছে দাবী করে অকুণ্ঠিত আত্মসমর্পণ, তবে অসম্ভব কিছু দাবী করে না নিশ্চয়ই।

সাহিত্যকে মোটামুটি দুই অংশে ভাগ করে দেখা যেতে পারে—তার সৃষ্টি-অংশ ও আলোচনা-অংশ। আমরা এতক্ষণ মুখ্যতঃ বুঝতে চেষ্টা করেছি এ কালের বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি-অংশ, আর তারই সঙ্গে এও দেখা গেছে যে এই সাহিত্যের সমঝদারী, অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-অংশের এক অংশ খুবই ত্রুটিপূর্ণ।

কিন্তু শুধু আংশিক ভাবে নয়, বরং মনোযোগ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যের আলোচনা অংশ যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ—জ্ঞান ও উন্নত রুচির এক প্রকৃষ্ট বাহন আজো হয়ে ওঠে নাই।

কিন্তু আলোচনা অংশ এমনিভাবে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকলে গৌরবান্বিত সৃষ্টি-অংশেরও যে অনেকখানি ব্যর্থতা,—যেমন বায়ুমণ্ডলের কার্য্যক্ষমতার উপর নির্ভর করে সূর্য্যোত্তাপের সাফল্য। তাই বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-অংশ কিসে দোষমুক্ত হতে পারে, সেটি বাংলা সাহিত্যিকদের জন্য বাস্তবিকই এক সাহিত্যিক সমস্যা। অর্থাৎ, এর উৎকর্ষ বিধানের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হবার সময় তাঁদের এসেছে।

ম্যাথু আর্নল্ড তাঁর একটি লেখায় ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে তুলনায় ইংরেজি সাহিত্যের দুটি ত্রুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেছেন। তাঁর নির্দ্দেশ ইংরেজি সাহিত্যে কতখানি গ্রাহ্য হয়েছে সে বিচারের ভার ইংরেজ সাহিত্যিকদের উপর ন্যস্ত ; কিন্তু আমাদের মনে হয়, বাংলার আলোচনা অংশের উৎকর্ষের জন্য তাঁর সেই দু'টি কথা থেকে প্রচুর সাহায্য পাওয়া যাবে। তাঁর সেই দু'টি কথার দিকে বাঙালী সাহিত্যসেবী মাত্রেরই মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া সঙ্গত। সে দু'টি কথার নাম তিনি দিয়েছেন Urbanity ও clear mind তার বাংলা অনুবাদ দেওয়া যেতে পারে ভব্যতা ও পরিচ্ছন্ন চিন্তা।

ভব্যতা বলতে তিনি বুঝেছেন গ্রাম্যতা ও আতিশয্য বর্জ্জন। অর্থাৎ, লেখক তাঁর কথাগুলো পেশ করেছেন এক শিক্ষিত মণ্ডলীর কাছে। কাজেই তাঁর চিন্তায় ও ভাষায় মার্জ্জিত রুচির পরিচয় থাকবে এইই সমীচীন। এই ভব্যতা যে আমাদের সাহিত্যে একান্তই বিরল তা নয়। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ এঁদের রচনায় এর সুন্দর সুন্দর দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে। তবু শুধু সাধারণ বাঙ্গালী জীবনে নয় আমাদের শ্রেষ্ঠদের কারো কারো ভিতরেও

www.pathagar.com

(যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র) এই ভব্যতার অসদ্ভাব মাঝে মাঝে সেই একভাবে ঘাড় বাঁকিয়ে উঠে, জ্ঞান ও রসের আসরে বিভ্রাট ঘটিয়েছে। এই ভব্যতা রচনায় শ্রী ও মাধুর্য্য বাড়িয়ে দিয়ে তাকে যে কত অর্থপূর্ণ করে তোলে, তা বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একে পুরোপুরি আয়ত্ব করবার ক্ষমতাও হয়ত তাঁরই আছে যিনি প্রেমিক ও জ্ঞানের পথে অকুতোভয়।

এই ভব্যতাসাধন বাংলা সাহিত্যিকদের জন্য নিশ্চয়ই খুব সহজ হবে না, কেননা বাংলার প্রচলিত জীবনধারা এর বিপরীত। বাংলার কবি যাত্রা ও একালের থিয়েটার সাংবাদিকতা এ সবের অন্য গুণ যতই থাকুক গ্রাম্যতা ও সংকীর্ণতার প্রাচুর্য্য এসবের বেশ এক বড় পরিচয় চিহ্ন। কিন্তু কষ্টসাধ্য হলেও এ থেকে পেছপাও হওয়ার সময় আমাদের আর নাই। গ্রামের লোক শহরবাসী হলে নাগরিক ভব্যতা আয়ত্ব না করে তার কল্যাণ নাই ; আমাদেরও বৃহত্তর জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় এই ভব্যতা সাধনের।

তারপর পরিচ্ছন্ন চিন্তা। শুধু সাহিত্যে নয়, জীবনের সকল ব্যাপারেই এই পরিচ্ছন্ন চিন্তার দাম যে কত বেশী এই বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকতার যুগে তা আর নূতন করে বলবার দরকার করে না। কিন্তু আমাদের পুরুষ পরম্পরাগত গ্রাম্যতার সঙ্গে সঙ্গে এই পরিচ্ছন্ন চিন্তার এক বড় অন্তরায় হচ্ছে—আমাদের অতীতের মোহ ও বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ভয়।

এই অতীতের মোহ আমাদের মনীষিদের জন্যও অপ্রবল ছিল না সত্য, কিন্তু সেই মোহ তাঁদের চিত্তকে বন্দী করে রাখতে পারে নাই। রক্তমোক্ষণশীল, স্যার ফিলিপ সিড্‌নীর মতো শেষ পর্য্যন্ত তাঁরা জয়ী হয়েছেন। আর এক হিসাবে এই মোহ ছিল তাঁদের জীবনের এক অলঙ্কার। কিন্তু অল্পশক্তি লোকদের জীবনে এই মোহ মহা অনর্থ ঘটিয়েছে। আমাদের কত ঐতিহাসিক-দার্শনিক চিন্তা যে এই মোহের কবলে পড়ে অদ্ভুত দর্শন হয়েছে, তার ইয়ত্তা নাই। বাঙালী বাস্তবিকই মুক্ত বুদ্ধির লোক হলে একালের বাঙ্গালীর বহু গবেষণা তার হাসি তামাসার প্রচুর খোরক যোগাতে পারবে।

কিন্তু এই পিছনের দিকে মুখ ফিরিয়ে সামনে চলার বিড়ম্বনা বহু ভোগ করা হয়েছে। এ পালা এখন চুকিয়ে দেওয়া ভাল। অবশ্য তার জন্য অতীতকে অস্বীকার করবার দরকার করে না, কেননা তা অজ্ঞানতা। আমরা পিতামাতার সন্তান নিশ্চয়ই। তবে সেই আমাদের একমাত্র পরিচয় নয়।

আমরা অতীত ইতিহাসের সৃষ্টি ; — বেশ। কিন্তু আমাদের পরের যে ইতিহাস তার পুরো চেহারা অতীত থেকে ত অনুমান করা যায় না। এমন কি আমাদের অতীতের সত্য পরিচয় পাবার জন্য প্রয়োজন হয় আমাদের পরের ইতিহাস বুঝবার। অর্থাৎ, আমরা বাস্তবিকই নব নব ইতিহাস সৃষ্টি করি, অথবা আমাদের ভিতর দিয়ে নব নব ইতিহাসের সৃষ্টি হয়। তাই অতীতের বন্ধন আমাদের জন্য অসত্য-মোহ।

এই অতীতের মোহের হাত থেকে উদ্ধার পেলে শুধু সাহিত্যে নয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ, সব বিষয়েই আমাদের চিত্ত যে কত সত্য ও কল্যাণ-অভিসারী হতে পারবে, ভবিষ্যৎ ভীতির স্থল না হয়ে কত মোহন স্বর্গের ধাত্রী হবে, একটু চিন্তা করলেই তা

www.pathagar.com

বুঝতে পারা যায়। অথচ এই মোহকে মোহ জেনেও আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের বহু মূল্যবান সময় এর পিছনে নষ্ট করি।

উপসংহারে গ্যেটের একটি উক্তি উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। 'The great works of art are brought into existence by men, as are the great works of Nature, in accordance with true and natural laws, arbitrage fantasy falls, to the ground ; there is Necessity, there is God.'—এ কালের বাংলা সাহিত্যে এই 'প্রয়োজন' এই বিধাতৃ-বিধান অল্প বিস্তর আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত হয়েছে। বাঙালী জীবন ও বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এইসব প্রাণপ্রদ জিজ্ঞাসা উত্তরোত্তর আপনাদের গভীরতর চিন্তা-ভাবনার বিষয় হবে, আশা করি।

www.pathagar.com

স্যার সৈয়দ আহমদ

আবুল হুসেন এম. এ. বি.এল.

যুগে যুগে মানব-সভ্যতার স্ফূর্তি-সাধনে যাঁরা দুঃখ-বেদনা-অন্তর্দ্দাহ ভোগ করে গেছেন তাঁদের মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। তাঁদের এক শ্রেণী বর্ত্তমানের দুর্দ্দশা-দৈন্য দেখে নিতান্ত পীড়া অনুভব করে তা মুছে ফেলবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করেন এবং তা কাজে লাগিয়ে তার ফল সঙ্গে সঙ্গে পেতে চান। অন্য শ্রেণী সুদূর ভবিষ্যৎকে গৌরবময় ও সর্ব্বতোমুখী কল্যাণের সুষমায় সুরঞ্জিত করে তুলবার জন্য ব্যগ্র হন, কিন্তু বর্ত্তমানের জন্য তাঁদের তত তাড়া নেই। এদের কাজ হচ্ছে চিন্তা করা—সে চিন্তা কাজে পরিণত করবার জন্য এঁদের ব্যগ্রতা তত স্পষ্ট নয়। এই দুই শ্রেণীর সাধকই মানুষের সমাজচক্রকে চির-চলন্ত রেখেছেন। যখনই সমাজ বা জাতির চলা থেমে যায়, তখনই এমনি এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যিনি সমাজকে অনেকখানি টেনে নিয়ে তার চলার বাঁকা পথের মোড় ফিরিয়ে দিয়ে যান।

ভারতের আধুনিক ইতিহাসে অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রভুত্বের যুগে ভারতীয় জাতির চলার পথে মোড় ফিরিয়েছেন এমনি দুটি লোক আমার চোখে পড়ে। একজন হচ্ছেন বাংলার রাজা রামমোহন, অন্যজন উত্তর ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁ। রামমোহনের জন্মের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে স্যার সৈয়দের জন্ম হয়। রামমোহন ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে আর স্যার সৈয়দ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ভূমিষ্ট হন। এ দুজনের কার্য্যপ্রণালী অনেকটা একচোখা ছিল, কিন্তু দু'জনকে একই শ্রেণীর লোক বলা চলে না। রাজা হচ্ছেন শেষোক্ত শ্রেণীর, আর স্যার সৈয়দ প্রথোমোক্ত শ্রেণীর। উভয়ের চিন্তাধারা ও সাধনার রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। রাজার দৃষ্টি ছিল অনেক দূরে, আর স্যার সৈয়দের দৃষ্টি ছিল তাঁর আপন আঙ্গিনায় নিবদ্ধ। রাজার স্বপ্ন ছিল অতি প্রকাণ্ড, কিন্তু আপাতত কার্য্যকরী নয়। স্যার সৈয়দের স্বপ্ন ছিল ছোট কিন্তু খুব practical. তাই স্যার সৈয়দ তাঁর স্বপ্নকে হাসিল করে গেছেন, কিন্তু তিনি যাঁদের জন্য জীবনপাত করেছিলেন তাঁর পরবর্ত্তীকালে তাঁদের চলবার জন্য কোন বড় স্বপ্ন রেখে যেতে পারেন নি, এবং সেই স্বপ্ন-অভাবে আজ পর্য্যন্ত স্যার সৈয়দের মনোভাব হতে মুসলমান মুক্তি লাভ করতে পারে নাই—কিংবা তাঁর চেয়ে বড় ত দূরের কথা, তাঁর মতও কাজের লোক একজনও সারা ভারতে তাঁর স্ব-সম্প্রদায়ের ভিতর হতে বের হতে পারে নি। তাঁর ছোট স্বপ্নটি রূপ নিয়ে আজ আলিগড় কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হয়েছে। তাঁর যুগে মুসলমানদের পক্ষে আলিগড় কলেজের মত একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা নিশ্চয়ই দুরূহ ছিল এবং স্বীকার করতেই হবে, তাঁর মত সমাজগত প্রাণ কর্ম্মীর আবির্ভাব না হলে, মুসলমানদের দুর্ভাগ্যের আর অবধি ছিল না। তবে বলতেই হবে, তাঁর স্বপ্ন এত ছোট ছিল যে, তার ফলে মুসলমান সমাজ এখনও হ্যাটকোট পরে লেফাফা দোরস্ত হয়ে বেড়িয়ে রাজার দরবারে খায়েরখাহি অর্জ্জন করে চরিতার্থ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করার চাইতে আর বেশ কিছু চোখে দেখতে পাচ্ছে না। স্যার সৈয়দ যা চেয়েছিলেন, তা বোধ হয় এর চেয়ে বেশী নয়। তাই

www.pathagar.com

দেখুন মুসলমান মাত্রই গোটা হিন্দু-মুসলিম-খৃষ্টান অধ্যুষিত ভারতের সমস্যাকে স্পষ্ট বুঝতে পারে না। স্যার সৈয়দ নিজেও যে বুঝতে পেরে তদনুসারে কোন কাজ করেছিলেন তা তাঁর জীবন-আখ্যায়িকা হতে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে তিনি এইটুকু বুঝেছিলেন, ভারতের কল্যাণ হবে হিন্দু-মুসলিমের মিলনে। কিন্তু সে মিলন হতে পারে না যদি মুসলমান পঙ্গু হয়ে থাকে। তিনি বলেছেন :—

جبك مندو مسلمان مل جل نه رهين كى اور ايك
درسوعكى مصالح كومصلحو ظنه ركهينكى تب تك نه
بزنش اند ياصين اصلى عزت حاصل نهيى كوسكتى .

তাই তিনি তাঁর জীবনের সমস্ত সম্বল কেন্দ্রীভূত করলেন মুসলমানকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে চলিষ্ণু হওয়ায় সাহায্য করতে। মুসলমান তখন এমন চেহারা নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়েছিল যে, তা দেখে তিনি স্থির থাকতে পারেন নি। তাকে ধুয়ে মুছে একটা যেমন তেমন পোষাক পরিয়ে একটু মানুষের মত করবার জন্য তাঁর যে ব্যগ্রতা, তাতেই হয়ত তাঁর স্বপ্নকে জাগাতে পারেনি। এমনি চেহারার মোকাবিলা করতে হলে রাজা রামমোহনের স্বপ্নও যে কি রূপ নিত তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা করার প্রয়োজন নেই। তবে রামমোহনের সামনে হিন্দু সমাজের যে চেহারা ছিল সেটাও খুব ভাল ছিল বলা যায় না। উভয়েরই সমস্যা প্রায় একরকমই ছিল। হিন্দুর ছিল সমুদ্র যাত্রার সমস্যা—আর মুসলমানের ছিল নাছারা-আতঙ্ক সমস্যা। এই দুই সমস্যাই ছিল জ্ঞানের পথে নিদারুণ বিঘ্ন। উভয় সম্প্রদায়ই এই কুসংস্কারে ইউরোপীয় জ্ঞান ও সভ্যতা হতে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সৌভাগ্যক্রমে এই দুই মহাপুরুষ অক্লান্ত সাধনার বলে, ভারতের হিন্দু মুসলমানকে ইউরোপমুখী করে জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করেছেন।

আধুনিক ভারতীয় সভ্যতা যে শিক্ষার ফলে ধীরে ধীরে স্ফূর্ত্তি লাভ করছে সে শিক্ষার সর্ব্বপ্রথম অগ্রদূত হিন্দুদের জন্য রাজা রামমোহন ও মুসলমানদের জন্য স্যার সৈয়দ। সে শিক্ষায় দীক্ষিত করে কুসংস্কারপীড়িত ভারতীয়কে প্রবুদ্ধ করবার জন্য উভয়ের প্রণালী প্রায় একরকমই ছিল। উভয়ই প্রাচীন শাস্ত্র মন্থন করলেন, কিছু কিছু কণ্ঠস্থও করলেন। জনসাধারণ পুরোহিত ও মোল্লার প্রভাবে বুদ্ধি বিবেচনা হীন হয়ে পড়েছিল। যুক্তি-তর্কের ধার তারা ধারত না। তাদের সামনে মোল্লা বা পুরোহিত-ব্রাহ্মণই সর্ব্বাগ্র গণ্য বলে গণ্য হত। কাজেই রামমোহন মনে করলেন লোকগুলোকে ব্রাহ্মণের মন্ত্র-মোহ হতে মুক্ত করতে হলে তাদের সামনে ব্রাহ্মণেরই অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। তাই তিনি বেদ, উপনিষদ সব ঘেঁটে তাঁর স্বপ্নের অনুকূল বচন উদ্ধার করে তাদের সামনে ধরলেন। তারা তাঁর কথা শুনল বটে, কিন্তু সে কথা অনুসারে কাজ করতে চাইল না। বরং তার ফল অন্য দিক হতে একটু মারাত্মক হয়ে দাঁড়াল। সেটি এই যে, তারা শাস্ত্রের মোহ হতে মুক্ত হল না। তারা মনে করল, তাইত রাজাও ত শাস্ত্র হতে বচন উদ্ধার করে তাঁর কথা সমর্থন করেন। তাহলে শাস্ত্র ত অভ্রান্ত অফুরন্ত ভাণ্ডার--তার বাইরে আর কি থাকতে পারে? রামমোহনের

www.pathagar.com

সে স্বপ্নের দিকে তাদের দৃষ্টি গেল না। তারা তাঁর কথা হতে তাদের শাস্ত্র–ভক্তিরই পুনঃ সমর্থন বা re-ffirmation লাভ করে যেমন তেমনি রয়ে গেল। সেই মনোভাবের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিতর দিয়ে হিন্দু সমাজ চলে এসেছে। শাস্ত্রকে বেড়ে' তাদের জ্ঞানের চর্চ্চা চলেছে। কিন্তু রামমোহনের যে অমর স্বপ্ন হিন্দু মুসলিম সমন্বয়ের ভিতর দিয়ে ভারতীয় জাতি গঠনে সাহায্য করে ভারতের মুক্তি সাধন—তার জন্য আর বড় চেষ্টা কিছু হল না। আজ হিন্দু সমাজ শাস্ত্রের দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন—ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান কিছু হাসিল করেও তাঁরা অতীতের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছেন। রামমোহন চেয়েছিলেন ঐ মুখকে অতীত হতে ফিরিয়ে ভবিষ্যতে নিবদ্ধ করতে। কিন্তু তা হল না। তার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁর শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন উদ্দেশ্যে তিনি শাস্ত্র–বচনে মুড়ে তাঁর প্রাণের সত্যকে প্রচার করেছিলেন। জনসাধারণ তাই সত্যকে উপলব্ধি না করে শাস্ত্রেরই বাহাদুরী বেশী করে দিয়েছে। ফলে তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। তবে ফল হয়েছে এইটুকু যে, ইংরেজী শিখে এখন তারা চলছে, কিন্তু তাদের মুখ রয়েছে পেছনের দিকে। এজন্যই আমি বলতে চাই, রামমোহনের উদ্দেশ্য অনেক খানি ব্যর্থ হয়েছে। তিনি তৎকালীন জনসাধারণের বিশ্বাস ও মনোভাবের প্রতি concession দিতে গিয়ে শাস্ত্রবচনের আশ্রয় নিয়েছিলেন। এই concessionই তাদের সর্ব্বনাশ করেছে। শাস্ত্র যে মানুষের সৃষ্টি, আর সে শাস্ত্রকে মানুষের মুক্তি, সে কথা রামমোহন অন্তরে অনুভব করে ছিলেন। কিন্তু দিল খুলে তা বলতে সাহস পান নাই। তাঁর শ্রোতৃবর্গকে Concession দিতে গিয়ে তার দুর্ব্বলতাকে আমল দিতে হয়েছিল। সেই দুর্ব্বলতাই তাঁর mission কে ব্যাহত করেছে। আজ তাই হিন্দু সমাজ রামমোহনের প্রদর্শিত পথ হতে অনেক দূরে সরে পড়েছে। রামমোহন চেয়েছিলেন ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞানকে পূর্ণ উদ্যম আয়ত্ত করে হিন্দু তার প্রাচীন শাস্ত্রপীড়িত মনকে গলিয়ে এক নূতন মনে পরিণত করুক। কিন্তু শাস্ত্রের বচন দিয়ে তাঁর কথার জোর বাঁধতে গিয়ে তিনি তাঁর এই স্বপ্নকে জীবন্ত করে যেতে পারেন নাই। তাই আজ হিন্দুর মন যেমন তেমনি শাস্ত্রমুখী—তাদের চলাফেরায় বিদেশী ভাবেও রং লেগেছে মাত্র। কিন্তু তাতে রামমোহনের স্বপ্নের পরিণতি হচ্ছে না। তবু বলতে হবে, এত বড় স্বপ্ন আজ পর্য্যন্ত আধুনিক ভারতে কেউ রচনা করতে পারেনি। সে স্বপ্ন হয়ত আজ ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু কাল তা বাস্তবে পরিণত হবেই হবে। নতুবা ভারতের কল্যাণ সুদূর–পরাহত। হিন্দুর মনটা আজ সে দিকে রুজু হলেই কাজটা শুরু হবে সন্দেহ নাই।

রামমোহনের স্বপ্নের যে অবস্থা (fate) হয়েছে স্যার সৈয়াদের স্বপ্নরেও সেই fate হয়েছে। তিনিও শাস্ত্রবচন দিয়েই তাঁর কথার জোর বেঁধে ছিলেন ; ফলে লোক সেই শাস্ত্র মোহেই সম্মোহিত হয়ে থাকল। ইংরেজী হাব–ভাব, পোষাক–পরিচ্ছদ, ফ্যাশন সবই আয়ত্ত করে আমরা স্বেচ্ছাচারিতার চূড়ান্ত করে ছাড়ছি, তবু শাস্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ইসলামের দোহাই দিয়ে মুসলমান বলে আস্ফালন করে বেড়াচ্ছি। মনের ঘরে আমাদের যে অন্ধকার — সেই অন্ধকারই রয়ে গেছে। হিন্দু যেমন শাস্ত্রমুখী মুসলমানও তেমনি শাস্ত্রমুখী হয়েই রইল। ফলে, রাজার সমন্বয়ের স্বপ্ন সংঘর্ষের বাস্তব রূপ লাভ করে আজ উভয় সম্প্রদায়কে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কোন্দলে লিপ্ত করেছে।

www.pathagar.com

রামমোহন যখন ১৮৩৩ অব্দে ৫৯ বৎসর বয়সে মারা গেলেন, তখন স্যার সৈয়দের বয়স ১৬ বৎসর হবে। রামমোহনের কথা তখন তাঁর কানে পৌঁছেছিল কি না জানি না—পৌঁছানরই কথা। কিন্তু উত্তরকালে স্যার সৈয়দ রামমোহনের mission এর সঙ্গে পরিচয় লাভ করেছিলেন বলে বুঝতে পারা যায় না। তাঁর mission এর প্রতি স্যার সৈয়দের কোনরূপ sympathy ছিল কিনা তাও বুঝা যায় না। কারণ রামমোহনকে দেখি ইসলামের মূলগ্রন্থ কোরান হতে আরম্ভ করে সুফী মোতাজিলা পর্য্যন্ত সমস্ত ভাবধারার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেছেন অশেষ সাধনা করে, কিন্তু স্যার সৈয়দের জীবনে হিন্দু শাস্ত্র বুঝবার জন্য কোন প্রয়াসই দেখতে না পেয়ে বিস্মিত না হয়ে পারি না। তার কারণ যাঁকে আমরা বৃটিশ ভারতে মুসলমানের ভাগ্য গুরু বলে ভক্তি করি, তাঁর জীবনে পড়শী হিন্দুর সম্বন্ধে কিছু জানবার চেষ্টা না দেখে শুধু বিস্মিত কেন দুঃখিত ও লজ্জিত হতে হয়। অথচ তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মের সহিত ইসলামের বিরোধ মিটিয়ে ফেলবার জন্য কোরান ও বাইবেলের টীকা লিখেছেন। হিন্দুর সম্বন্ধে এই ঔদাসীন্যের কারণ দুটো হতে পারে। হয়ত তিনি গোটা ভারতের ভবিষ্যৎ সমস্ত মানুষের মুক্তির মাপ কাঠিতে বিচার করে দেখে ভাবতে চেষ্টা করেন নি, কিংবা হয়ত ইসলামকে একমাত্র সত্যধর্ম্ম বলে বিশ্বাস করে পৌত্তলিক হিন্দুকে তাঁর চিন্তা ভাবনার বাইরে রেখে দিয়েছিলেন। তাই যদি হয়, তবে দুঃখের সহিত বলতে হবে, তাতে তাঁর মহত্ত্ব ও উদ্দেশ্য অনেকখানি ক্ষুণ্ন হয়েছে। এজন্যই মুসলমানের দৃষ্টি তার মযহাবের বাইরে যেতে চাচ্ছে না—কারণ স্যার সৈয়দ এই মনোভাবের বশবর্ত্তী হয়ে কাজ করেছিলেন বলে পরবর্ত্তী আলিগড় product বা আলিগড় অনুকরণকারী তাঁর প্রভাব এড়াতে পারে নাই। স্যার সৈয়দ এখনও আমাদের আদর্শ, ঠিক তাঁরই মত আমরাও হিন্দুদের সম্বন্ধে জানতে যেন কুণ্ঠিত। ভবিষ্যৎ-ভারতে মুসমানের স্থান নির্ণয় করতে গেলে স্বতঃই মনে হয় যে, যদি মুসলমান এই মনোভাব নিয়ে চলে তাহলে তাকে ভেসে যেতেই হবে। আজ এমন এক পুরুষের আবশ্যক হয়েছে, যিনি দেশের বুকের উপর পা শক্ত করে দাঁড়িয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের আশা আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা সমানভাবে বহন করে স্যার সৈয়াদকে অতিক্রম করে রামমোহনের রচিত স্বপ্নের অনুরূপ এক বর স্বপ্ন খাড়া করে হিন্দু-মুসলিম উভয়কে একই পথে চালিত করতে সক্ষম হবেন। আজ চাই স্যার সৈয়দের কর্ম্ম কুশলতা, হামদর্দ্দি, অনন্ত উৎসাহ, প্রচণ্ড আবেগ আর রামমোহনের তীক্ষ্ণ বিশাল দৃষ্টি ও মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় দীপ্ত স্বপ্ন—এই সমস্তের সংমিশ্রণে পরিপুষ্ট ব্যক্তিত্ব-সমুজ্জ্বল মহাপুরুষ—কর্ম্মী স্যার সৈয়দ ও স্বাপ্নিক রামমোহনের পরিপূর্ণ সমন্বয় চাই।

স্যার সৈয়দ ইসলাম ও মুসলমানের জন্যই জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তারই সেবায় জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত অবসর তিনি ব্যয় করেছিলেন। তারই ইজ্জত ও তরক্কীর জন্য তিনি প্রাণপণ করেছিলেন। তারই জন্য তিনি মুসলমানকে ইংরেজী শিখতে বললেন, রাজ দরবারের খায়েরখাহি লাভের প্রলোভন দেখালেন, খৃষ্টান ধর্ম্মের সাথে ইসলামের মিতালী সংস্থাপনের জন্য নানা পুস্তক ও বাইবেল ও কোরানের তফসীর লিখলেন। তিনি বলছেন, مجهکو یقین لع صد هب اسلام صحیح مع কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, صینا حق یوهون ভাল কথা কিন্তু সত্য ও ইসলাম যে coexistent পরস্পর অবিচ্ছেদ্য এ ধারণা তাঁর বদ্ধমূল ছিল। জলন্ধরের বক্তৃতায় তিনি বলেছেন 'ইসলাম

ایک لازوال نور ہے جو ہمیشہ سی روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہیگا، اسلام خودخد اکانور لے، وھجیساتھا ویسا ھی ہے اورویسا ھی رھیکا وہ پوزا ہے اورپوزا ھوکا واللّٰہُ مُتِمُّ نورہ ولو کَرِنَ الکفرون ۔

তাই এই কথাটি বুঝবার জন্য যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা চাই তার প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেছেন বলে মনে হয় না। 'এটা সত্য ওটা সত্য'—এমনি করে একজনকে জোর করে স্বীকার করাতে গেলে, সে সত্য অনেকখানি খর্ব্ব হয়ে পড়ে। ইসলাম আমার কাছে সত্য তখনই হয় এবং ততটুকু হয় যখন এবং যতটুকু আমি গ্রহণ করতে পারি। আর আমি শুধু ইসলামের মাপা সত্য নিয়েই বাঁচি না বা বাঁচতে পারি না। আজকের দুনিয়ায় বাঁচতে গেলে আমাকে নানা সত্যের উপকরণ সংগ্রহ করে নিজের আত্মাকে পরিপুষ্ট করতে হয়। সে জন্য অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের কথাও আমাকে শুনতে হবে। স্যার সৈয়দের ভিতর এই attitude স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তাঁর বহু পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেও রামমোহন এই সত্যের স্বাধীনতা কথাটি বুঝতে পেরেছিলেন। তাতেই হয়ত আজ হিন্দু সমাজে অন্যকে গ্রহণ করবার জন্য কুণ্ঠা অনেকখানি কমে গেছে যদিও প্রাচীনের প্রতি অনাবশ্যক দরদ তাদের ঘুচছে না।

বৃটিশ এদেশে আসলে মুসলমান ক্ষুব্ধ হয়ে কতকটা ক্রোধে, কতকটা অভিমানে বৃটিশের দেওয়া সবকিছুই বর্জ্জন করতে চেয়েছিল। এরই ফলে যে সিপাহী বিদ্রোহ তা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। স্যার সৈয়দ এই মনোভাবের জীবন্ত প্রতিবাদ স্বরূপ বৃটিশের সঙ্গে মুসলমানের মোকাবিলা, মিলমিশ ও বন্ধুত্ব করতে চেষ্টা করলেন। তিনি বলছেন—

البتہ میری یہ خو اھش ابھی ہے کہ مسلما ن اور عسا یئونصین صحبت پیداھو ۔

অন্য একস্থলে তিনি বলেছেন,—

اور مسا ئیون کون کہا یا جا ئی کہ دنیا صین اکر کوئی صذ ہب نسا ئی صذ ہب کانوست ھو سکتا ھی تو وہ صرف اسلام ھی ھو سکتا ھی، اور پس ظاہر ھی کیاس صطابہکی حا صل ھونی کی لیی کو ئی طر یقہ اس سی بہتر نہ تھا تو ریت اور انجیل کی تفسیر ایک صساما ن کی ما نہ سی کھی جا ئی ۔ ইত্যাদি।

www.pathagar.com

এতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তিনি বাইবেলের তফসীর লিখেছিলেন জনসাধারণ মুসলমানের মন হতে খৃষ্টানদের প্রতি তাদের অবিশ্বাস ও ঘৃণা দূর করবার জন্য। তাঁর এ চেষ্টার একটি কারণ এই হতে পারে যে, সিপাহী বিদ্রোহে যখন রাজ সরকার মুসলমানের প্রতি একটু বিরক্ত হয়ে গেলেন, তখন সেই বিরক্তিটা দূর করবার জন্য স্যার সৈয়দকে একটু অতিরিক্ত রাজভক্তি ও খৃষ্টানপ্রীতি দেখাতে হয়েছিল। সমাজের প্রতি ইংরেজদের সুনজর ফিরাবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করেছিলেন। নিজের ব্যক্তিগত loyalty জীবনের শেষ পর্য্যন্ত অটুট রেখেছিলেন। রামমোহনের মত তিনি চাকরী ত্যাগ করেন নি। চাকরীও করেছেন আর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থা করে মুসলমানকে রাজ দরবারে কদর লাভের যোগ্য করে তুলতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। যেখানেই চাকরী উপলক্ষে বদলী হয়েছেন সেখানেই তিনি স্কুল মাদ্রাসা খুলেছেন—সেজন্য চাঁদা উঠিয়েছেন। আলিগড় কলেজের জন্য নিজে পথে পথে ধনী-নির্ধ্বন নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট হতে চাঁদা তুলে বেড়িয়েছেন। এজন্যই আমি বলতে চাই, মুসলমানের দুর্দ্দশা দূর করবার উদ্দেশ্যে ইংরেজের তথা রাজ সরকারের পিঠ চাপড়ানি লাভ করতে ব্যগ্র হয়ে স্যার সৈয়দ কেবল খৃষ্টান–মুসলিম মিলনের স্বপ্ন দেখেছেন। কিন্তু খৃষ্টান মুসলিম বা হিন্দু মুসলিম বা হিন্দু মুসলিম খৃষ্টান সমন্বয়ের কোন স্বপ্নই দেখবার সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত হয়েছেন। ঠিক তেমনি করে আজ রাজার খায়ের খাহির পিছু পিছু ছুটছি বলে আমরা হিন্দুর সহিত মুসলমানের সমন্বয় সমস্যা আদৌ বুঝতে পারছি না। স্যার সৈয়দ যদি এই মিলনের জন্য হিন্দু শাস্ত্রের টীকা লিখতেন তাহলে হয়ত এই উভয় জাতির একটা চমৎকার সমন্বয়ের পথ খোলাসা করতে পারতেন। খৃষ্টান মুসলিম মিলনের জন্য যে চেষ্টা তিনি করেছিলেন তার কিয়ৎ পরিমাণ চেষ্টাও যদি হিন্দু–মুসলিম সমন্বয়ের জন্য করতেন, তাহলে আজ ভারতীয় হিন্দু মুসলমানের চেহারা অন্য রকম দাঁড়াত। তিনি হিন্দুর প্রতি উদাসীন হয়েছিলেন, সেজন্য হিন্দুও কম দায়ী নয়। আবার হিন্দু যে মুসলমানের প্রতি উদাসীন হয়েছিল, সেজন্য মুসলমানও কম দায়ী নহে। হিন্দু রামমোহনকে উপেক্ষা করেছে। সেই উপেক্ষাকে স্যার সৈয়দের একমুখী মুসলিম প্রীতি আরও স্থায়ী করেছে। স্যার সৈয়দ, হায় মুসলিম ! হায় মুসলিম ! করেছেন। তাঁর মত কওমীদরদের দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই বিরল। কিন্তু সেটা দেশের এবং মুসলমানের ভবিষ্যতের দিক দিয়ে দেখলে তিনি শুধু স্বসম্প্রদায়ের তরক্কীর জন্য নিজকে সীমাবদ্ধ করতে গিয়ে দেশের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে বেশী দৃষ্টি দিতে পেরেছিলেন বলা যায় না। মুসলিমকে তিনি ইংরেজ ভক্ত করতে গিয়ে তাকে অনেকখানি খর্ব্ব করে ফেলেছেন। ব্যক্তিত্ব-সাধনে তাঁর প্রদর্শিত পথ তাঁর স্বসম্প্রদায়ের পক্ষে খুব সংকীর্ণ করে রেখে গেছেন। আজ যে হিন্দু সমাজ মুসলমানকে চোখ রাঙ্গিয়ে দলে ভিড়িয়ে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছে, বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে ইংরেজকে জব্দ করতে চাচ্ছে, সে হিন্দু সমাজ রামমোহনের আদর্শের বাইরে, সে সমাজের বর্ত্তমান attitude-এর জন্য মুসলমান নেতা স্যার সৈয়দ ও তাঁর আন্দোলনও অনেকখানি দায়ী। এ কথাটি বড় নির্ম্মম কিন্তু বোধ হয় খুব সত্য। আজ সাহস করে আমাদের সে কথা স্বীকার করতে হবে।

হিন্দু সমাজে রামমোহনের বিরুদ্ধে re-action শুরু হয়েছিল। স্যার সৈয়দকেও এক প্রকার রামমোহনের প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে re-action এর রূপান্তর বলা যেতে পারে। মুসলমানকে রামমোহনের দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে স্যার সৈয়দ তাকে সংঘবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাতে মুসলমান রামমোহনের স্বপ্ন বা mission-এর সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে পারেনি, তাকে

www.pathagar.com

আপনার স্বপ্ন বা mission বলে গ্রহণ করতে পারেনি, তাকে আপনার স্বপ্ন বা mission বলে গ্রহণ করা ত দূরের কথা। ফলে মুসলিম এক পথে আর হিন্দু অন্য পথে চলেছে। হিন্দু সে re-action-এর ধাক্কায় রামমোহনকে ভুলে গেল। ভুলে যাওয়াতেই আজ আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের একই দুর্দ্দশা হয়েছে। এ দুর্দ্দশা হতে মুক্তিলাভ করা একান্ত দরকার। নতুবা আমরা উচ্ছৃংখলতার স্রোতে ভেসে যাব।

এতক্ষণ আধুনিক ভারতের এই দুটি যুগ মানবের সাধনা ও চিন্তার ফল পরবর্ত্তী যুগে কেমন হয়েছে তারই আলোচনা করা গেল। এখন দেখতে চাই তাঁদের সাধনার পার্থক্য কোথায়। তারপর স্যার সৈয়দের জীবনের কর্ম্ম ধারার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত দিয়ে এ প্রবন্ধের উপসংহার করব।

শৈশবে রামমোহন মোগল বাদশাহ্‌দের ফারসী শিক্ষার আওতায় শিক্ষিত হয়েছিলেন। ২২ বৎসর বয়সের সময় তিনি ইংরেজী ভাষা শিখে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন চর্চ্চা করেন। তিনি ইসলাম ধর্ম্মের সব কিছু আয়ত্ত করবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। হযরত মুহম্মদ (দঃ) তাঁর জীবনের আদর্শ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা, সাদাসিদে জীবন যাপন, স্বাধীন চিন্তা, অমিততেজ, মানব-প্রীতির দৃষ্টান্ত হতে এই কথাই প্রতিপন্ন হয় যে, হযরত মুহম্মদের জীবন তাঁর জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এদিকে হিন্দুর আচার ব্যবহার পৌত্তলিকতা, সতীদাহ প্রভৃতি অমানুষিক সংস্কার তাঁকে বিব্রত করায় তিনি হিন্দুর শাস্ত্র মন্থন করে পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্ক করেছেন। সাথে সাথে নানা প্রকার সামাজিক আন্দোলন দ্বারা হিন্দু সমাজকে বহু কুসংস্কারের বন্ধন হতে মুক্ত করবার জন্য প্রাণপণ করেছেন। হিন্দু ধর্ম্ম নিয়ে পাদ্রিদের সঙ্গে তর্ক করেছেন। বাইবেল আয়ত্ত করে খৃষ্টানদের সহিত মোকাবিলা করেছেন। দেশে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকে অকুতোভয়ে বুক পেতে বরণ করতে দেশবাসীকে অনুরোধ করেছেন, সরকারকে সমঝিয়েছেন। সংস্কৃত, আরবী প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করলে শিক্ষা যে অসম্পূর্ণ হয়, এবং তাতে ভারতবাসী পঙ্গু হয়ে থাকবে, একথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। এজন্যই Principal James বলেছেন, 'To Rammohan must be ascribed the movement for liberal education in Bengal.' বাস্তবিকই রামমোহনই ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের গোড়াপত্তন করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার কল্পে বহু যুক্তি তর্ক তাঁকে করতে হয়েছে। Lord Amherst-এর কাছে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে তিনি মুক্ত চিত্তে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য মত প্রকাশ করেছিলেন। এতেই তাঁকে একজন প্রকৃত সত্যদ্রষ্টা না বলে পারা যায় না। দেশবাসীর বিরক্তি ও অনিচ্ছায় দুর্ব্বল না হয়ে তিনি নিজের মাথার উপর সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে সোজা বললেন, 'না সংস্কৃত ও আরবী শিক্ষায় ভারতের কল্যাণ নাই।' তাঁর এই অমিত সাহস আজ সমগ্র ভারতকে জ্ঞান-শক্তিতে দৃঢ়মেরুদণ্ডবিশিষ্ট করে তুলেছে। রামমোহনের এই সতর্কতার বাণী বা উপদেশ হিন্দু সমাজকে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু তাতে কি তাঁদের সংস্কৃত-চর্চ্চা বন্ধ হয়েছে? কখনই নয় বরং ইউরোপীয় জ্ঞান মার্জ্জিত দৃষ্টিতে সেই সমস্ত সংস্কৃত-শাস্ত্র মন্থন করতে তাঁরা সক্ষম হয়েছেন। আর আমরা? রামমোহনকে হিন্দু বলে তাঁর কথা গ্রাহ্যই করলাম না। প্রাচীন শাস্ত্র নিয়ে তাতেই রাজ্য-বিচ্যুতির সান্ত্বনা খুঁজতে বসে রইলাম। ইংরেজ মাথার উপর চেপে বসল, হিন্দু তার জ্ঞান-বিজ্ঞান আয়ত্ত করে তার মোকাবিলা করতে উঠে পড়ে লাগল। তবু আমাদের ঘুম ভাঙল না।

www.pathagar.com

তার ফলে আজ আমরা সর্ব্বত্রই too late, কিন্তু হিন্দু বিশ্বের বড় বড় দরবারে সম্মান লাভ করছে।

রামমোহনের মৃত্যুর ১৬ বৎসর পূর্ব্বে এক শুভক্ষণে স্যার সৈয়দের জন্ম হয়। মুসলমানের এই নিদ্রা ভাঙবার জন্য স্যার সৈয়দই সর্ব্বপ্রথম রামমোহনের পথ অবলম্বন করে স্বসমাজকে ইউরোপীয় শিক্ষার জন্য আহ্বান করলেন। কিন্তু এই আহ্বান আর রামমোহনের আহ্বানে ঢের পার্থক্য ছিল। স্যার সৈয়দ প্রাচীন শাস্ত্রের প্রাধান্যকে পুরোপুরি বজায় রেখে ইউরোপীয় শিক্ষা চর্চ্চার প্রতি স্বসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। এতে কে তিনি শুধু প্রাচীন শিক্ষার সাথে ইউরোপীয় শিক্ষার সংযোগ করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে ইউরোপীয় পোষাক পরিচ্ছদে সুশোভিত করা। তার বেশী নয়। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামকে পরিপুষ্ট করবার প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নাই। ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর পর্য্যাপ্তিবোধই এই অনুভূতি তাঁর অন্তরে জাগ্রত হতে দেয় নাই। তৎকালীন মুসলমান হয়ত এমন পলিসি না করলে তাঁর কথা গ্রাহ্য করত না। তাতে ফল ঢের ভাল হয়েছে বটে, কিন্তু একটি মারাত্মক ফলও এই হয়েছে যে, রামমোহনের মত খোলাখুলি ভাবে না বলায়, মুসলমান ইংরেজী শিখল বটে, কিন্তু তাতে তার জ্ঞান বাড়ল না কিংবা তার সৃষ্টি পরিষ্কার হল না। যাতে সে তার প্রাচীন শাস্ত্র মন্থন করে তা হতে নূতন জ্ঞানের সন্ধান দিয়ে মুসলমান জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাসের চর্চ্চা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করতে পারে। ইংরেজিটা তারা যেন শিখল শুধু চাকরী বাকরীর ক্ষমতা অর্জ্জন করবার জন্য, তার বেশী নয়। তাই আধুনিক ভারতীয় মুসলিম সমাজে বিশ্বের বড় বড় দরবারে সম্মান লাভ করতে পারে এমন লোকের সংখ্যা খুব কমই দেখতে পাই। প্রাচীন শাস্ত্রের সহিত মোকাবিলা করবার মত শক্তি আমাদের বাড়ছে না, কারণ আমরা ত শাস্ত্র বিচার করবার জন্য ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনকে শিখিনা বা চর্চ্চা করি না। আমাদের মনটা শাস্ত্রের অভ্রান্ততা মেনে নিয়ে তারই প্রতি রুজ্জু হয়ে থাকে। ইংরেজী শিখছি দুনিয়ার কাজ চালাবার জন্য। ব্যস্! স্যার সৈয়দের প্রোগ্রামেও এর বেশী কিছু ছিল না। পক্ষান্তরে রামমোহনের প্রোগ্রাম ছিল ইউরোপীয় মনের সহিত ভারতীয়ের মনের সমন্বয় সাধন। তাতে ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র রূপান্তরিত হওয়ার risk ও তিনি নিয়েছিলেন এবং হিন্দু শাস্ত্রের আধুনিক আলোচনা হতে বেশ স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, তারই ফলে সে শাস্ত্র এখন বেশ একটা নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং হিন্দু সমাজে হিন্দু শাস্ত্র পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত করবার আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু স্যার সৈয়দ মুসলিম শাস্ত্র জ্ঞানের সহিত ইউরোপীয় জ্ঞানের সমন্বয় করবার জন্য কোনো চিন্তাও করেন নাই, এবং প্রোগ্রামও দেন নাই। তাতেই আমরা ইউরোপীয় জ্ঞান-মার্জ্জিত দৃষ্টি দিয়ে আমাদের শাস্ত্র দেখতে সাহস পাচ্ছি না। এই দুর্ব্বলতার কারণ স্যার সৈয়দের প্রোগ্রামের কমজোরি। সে প্রোগ্রামের পিছনে একটা বড় দ্রষ্টার মন নাই, আছে একজন পলিসি—পরন্ত বড় কর্ম্মীর। কাজেই এই দুইটি বিভিন্ন প্রোগ্রামের প্রভাব উভয় সমাজের উপর বিভিন্ন প্রকারের হয়েছে।

স্যার সৈয়দের শিক্ষা প্রাচীন শাস্ত্রে শাসিত আবহাওয়ার মধ্যে শুরু হয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষা করা তাঁর ভাগ্যে ছিল না। ইংরেজী তিনি শিখতে পারেন নাই, অথচ যে সমস্ত কাজ কর্ম্ম করেছেন তাতে বুঝা যায় না যে, তিনি ইংরেজী জানতেন না। এর একটি কারণ—শৈশবে তিনি যে সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞ মৌলবীদের হাতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাঁরা সব

www.pathagar.com

'জিন্দা দিল' লোক ছিলেন। তাতে তিনি শৈশব হতেই কওমী হামদর্দ্দি ও তেজ অর্জ্জন করেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক মুসলমানের দুরবস্থাই তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল। এই দুরবস্থা দূর করবার জন্য তিনি নানা স্থানে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করেছেন। নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়ে মুসলমানকে তার বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি মনোযোগী করেছেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী তারিখে জলন্ধরের বক্তৃতায় তিনি বলছেন—আমরা আজ সবার চেয়ে জলীল ও বদতর হয়ে পড়েছি। আমাদের শির প্রত্যেকের পায়ের নীচে লুণ্ঠিত আর প্রত্যেকের পা আমাদের মাথার উপর। অতএব যিনি খোদার প্রিয় হতে চান তিনি আজ মুসলমানকে এই দুরবস্থা থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করুন। তোমরা মসজিদ তৈরী করছ, কিন্তু মসজিদে নমাজী কায়েম করবার জন্য কোন চেষ্টা করছ না। খানকা বানাচ্ছ, কিন্তু এবাদতকারীর সালামতির জন্য কোন ফিকির করছ না। মাটির মসজিদ ইঁট দিয়ে তৈরীর জন্য খুব ব্যগ্র, কিন্তু খোদার মানুষের জন্য কোন পরওয়া করছ না। জান কওমী হামদর্দ্দির চেয়ে কোন এবাদতই কোন খায়রাত শ্রেষ্ঠ নয়। মুসলমানের বর্ত্তমান অবস্থা তোমরা দেখ, এর ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে। আজ যদি কোন চেষ্টা না কর, তবে ভবিষ্যৎ সমাজের অদৃষ্টে লাঞ্ছনার অবধি থাকবে না।' দুর্ভাগ্যক্রমে এখানে খোদার মানুষ অর্থে মুসলমানই তিনি মনে করেছিলেন। সমগ্র মানুষের কল্যাণের ধারণা তিনি করতে পারেন নাই, বা চান নাই। কারণ তিনি তাঁর স্বসমাজের দুর্দ্দশা দূর করার জন্যই বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন। মানব জাতির বা সমগ্র ভারতের মানুষের কল্যাণের আদর্শ তাঁর দৃষ্টিপথে ছিল না। তবে কল্যাণ জিনিষটার একটা বাস্তব ধারণা তাঁর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। আর তিনি এটুকুও বুঝেছিলেন মুসলমানকে মজলিসে নিয়ে যাওয়ার যোগ্য না করে তুললে তার সাথে অন্যের মিলন চেষ্টা করা বৃথা। এ ক্ষেত্রে তাঁর ঐকান্তিকতার আদর্শ অতি চমৎকার।

তিনি উপরোক্ত বক্তৃতা প্রসঙ্গে আর একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন। সেটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন —

قوم کی بھلانی اورتر فی اس وقت ھو سکتی ھی
جبکه زصانهکی منا سب ان کی تر قیکی اسباب جمع
کئی جاوین، اسزصا نه صین قوصحی تر قی صرفز
صانه کی حاجتون کی صو اقف تعلیم پر .

বাঙ্গালী মুসলমানের কাছে একথাটা বার বার বলা দরকার।

চিন্তার ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দের দান বেশী না হলেও কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁর দানের আদর্শ অতি বিরল বললে অত্যুক্তি করা হবে না। তাঁর অসাধারণ কর্ম্ম স্পৃহা এবং ঐকান্তিকতার একমাত্র নমুনা আজ দেখতে পাওয়া যায় স্যার পি.সি রায়ের ভিতর। কর্ম্মী স্যার সৈয়দের কর্ম্মের তালিকা দেওয়া এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি কেমন করে বেঁচেছিলেন এবং সরকারের নওফর হয়েও তিনি কওমের জন্য কত কাজ করেছেন তারই ইঙ্গিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। আরবী ফারসী হতে মুসলিম ধর্ম্ম ও ইতিহাস উর্দ্দু ভাষায় লিখে উর্দ্দু ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। তিনি 'আইন-ই-আকবারী', 'তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী' উর্দ্দুতে

www.pathagar.com

অনুবাদ করেছিলেন। তার অনূদিত 'আইন-ই-আকবারী'তে আকবরের নৌলাখা, ফিলখানা, বাগিচা, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি অনেকগুলি ঐতিহাসিক চিত্র দিল্লীর একজন বিখ্যাত চিত্রকরের সাহায্যে আঁকিয়ে গ্রন্থখানির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন। কলকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল ব্লকম্যান সাহেব ঐ চিত্রগুলি তাঁর 'আইন-ই-আকবারী'র ইংরেজী অনুবাদে ব্যবহার করেছেন।

ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতি আলিগড় কলেজে অবলম্বন করবার প্রয়োজন অনুভব করে তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল বেনারস হতে বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে ১৭ মাস ছিলেন। ইংরেজী না শিখেও তিনি এই সতর মাসের মধ্যে বিলাতের বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেছিলেন। ইংল্যান্ডে থাকা কালে তিনি হজরত মুহম্মদ সম্বন্ধে অভিমত খণ্ডনার্থে একখণ্ড ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাঁর পুত্র সৈয়দ মাহমুদকে ইউরোপীয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য সঙ্গে নিয়েছিলেন। হিন্দু সমাজের কুসংস্কারের মতই মুসলমানদেরও বিলাত যাত্রার প্রতি ঔদাসীন্য ছিল। কিন্তু স্যার সৈয়দের আদর্শ জয়যুক্ত হয়েছে। সৈয়দ মাহমুদের বিলাত যাত্রার কিছুকাল পরই বাংলা হতে সৈয়দ আমীর আলী বিলাত যাত্রা করেন। আমীর আলী সাহেবেরও মত স্যার সৈয়দের মতই ছিল। তিনিও স্যার সৈয়দের প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন। স্যার সৈয়দের জীবনীতে হালি বলছেন, স্যার সৈয়দ বিলাত গিয়েছিলেন কওমের জন্য, বিলাতে অবস্থান করেছিলেন কওমের জন্য, আবার ফিরেও এসেছিলেন কওমের জন্য। ফিরে এসেই তিনি কওমী তরক্কীর জন্য 'তহযিবুল আখলাখ' নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। এই পত্রিকার কল্যাণে ভারতের মুসলিম সমাজে যুগান্তর উপস্থিত হয়েছিল। এই পত্রিকাখানি ছয় বৎসর জীবিত ছিল। এটি প্রকাশ করে স্যার সৈয়দ স্ব-সমাজের পুরোহিতদের কাছ থেকে নেচারী, কাফের, মুরদিদ আখ্যালাভ করেছিলেন। কিন্তু তাতে তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হন নি। মুসলমানের দুর্দ্দশা, তাবায়ি ও বরবাদি দেখে তাঁর দিল বেচায়ন হয়ে পড়েছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেটি আরো বেড়েছিল। সেই দুর্দ্দশা দূর করবার জন্য তাঁর চিত্ত এত ব্যস্ত ছিল যে, তিনি অন্যের গালি গালাজের দিকে কান দেওয়ার অবসর পেতেন না। এস্থলে সরকারি খিদমত হতে আরম্ভ করে দেশের ও কওমের খিদমতের দৃষ্টান্ত স্বরূপ কয়েকটি কাজের উল্লেখ করা যেতে পারে, যাতে তাঁর চিন্তার পরিধি বুঝতে পারা যাবে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সরকারের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা অটল ছিল। তখন ইউরোপীয় ও ইউরোপীয়দের গায়ে আঁচড় লাগতে দেননি। এই ঘোর অশান্তি তাঁর চাকুরী জীবনের প্রথম ভাগেই ঘটেছিল। তদবধি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তিনি সরকারের প্রতি আসক্ত ছিলেন। এতে তিনি সরকার এবং বহু বিখ্যাত ইউরোপীয়দের নিকট হতে খায়েরখাহি পেয়েছিলেন। দেশের ও কওমের উন্নতির জন্য তিনি বুঝেছিলেন দেশে শিক্ষা বিস্তার না হলে কোন কাজই জয়যুক্ত হবে না। মোরাদাবাদে একবার একটি এতীমখানা খুলতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এজন্যই পরে তার চেষ্টা ত্যাগ করেছিলেন।

হিন্দু.মুসলিম ও খৃষ্টানদের মিলন ও সমন্বয়কারীদের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। সেজন্য তিনি সেটা হাসিল করবার জন্য Scientific Society কায়েম করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই সোসাইটির সাহায্যে জ্ঞানের চর্চ্চা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করে এই তিন কওমের cultural unity র পথ উন্মুক্ত করা। এই ভেবে তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে গাজীপুরে ইউরোপীয় অফিসারদের নিয়ে এই societyর ভিত্তি পত্তন করেন। এই সোসাইটির প্রথম উদ্দেশ্য ছিল

www.pathagar.com

ইংরেজী, আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহ উর্দ্দুতে অনুবাদ করা। এই societyর প্রতি ক্রমে বড় বড় লোকের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই society জন্য তিনি এমন কি কলকাতা পর্য্যন্ত এসে চাঁদা আদায় করেছিলেন। Aligarh Institute Gazette ছিল এই societyর মুখপত্র। উর্দ্দুর উন্নতি সাধন করা এই societyর অন্যতম উদ্দেশ্য। উত্তরকালে এই societyর কাজ আশানুরূপ হয়নি। তবে আজ হায়দ্রাবাদের চেষ্টা দেখলে মনে হয় তদ্দ্বারা স্যার সৈয়দের প্রোগ্রামের বাকী অংশটা পূর্ণ করা হচ্ছে। আমাদের বাংলাতেও এরূপ কাজ করা বিশেষ দরকার। কিন্তু আমাদের স্যার সৈয়দেরই যে অভাব।

সেবার আদর্শও স্যার সৈয়াদের জীবনে জ্বলন্ত ছিল। মোরাদাবাদের দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় তিনি নিজে মারাত্মক রোগাক্রান্ত রোগীর শিয়রে বসে ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করেছেন। তিনি নিজ হাতে রোগীকে খাওয়াতেন, ধোওয়াতেন, শোয়াতেন। দুর্ভিক্ষ পীড়িত বুভুক্ষুকে নিজে না খেয়ে খাইয়েছেন। এই মোরাদাবাদেই তিনি তারিখ–ই–ফিরোজ শাহী'র সম্পাদকীয় কাজ সম্পূর্ণ করেন।

এই সময় তাঁকে খৃষ্টান পাদ্রীদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। তাঁরা ব্রিটিশ রাজত্বের স্থায়িত্বের উদ্দেশ্যে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রচারার্থে ইসলামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন। কাজেই স্যার সৈয়দ তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। তিনি একজন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিকে মাসোহারা দিয়ে সমস্ত খৃষ্টান পাদ্রীদের পুস্তক ও বাইবেল উর্দ্দুতে অনুবাদ করে ফেললেন এবং পাদ্রীদের ভুলভ্রান্তি সংশোধন করতে গেলেন। এজন্য তাঁর পরিশ্রম অত্যন্ত বেশী হয়েছিল। এতে তিনি উভয় সম্প্রদায়ের ভিতর বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের কাউন্সিলে ঢুকে তিনি টিকা বাধ্যতামূলক করবার জন্য একটি বিল প্রস্তাব করেন এবং তা পাশ হয়ে যায়। মুসমানদের জন্য Kazi Act পাশ করেন। এ ছাড়া আর একটি বিল প্রস্তাব করেছিলেন পারিবারিক বন্দোবস্ত গুলি ওয়াক্‌ফ শ্রেণীভুক্ত করবার জন্য। কিন্তু তা পাশ হওয়ার সম্ভাবনা না দেখে প্রস্তাব তুলেছিলেন। সুখের বিষয় এই প্রস্তাবের অনুকূলে জনমত গঠন করবার জন্য শ্রদ্ধেয় আমীর আলী মরহুম সাহেব বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন, এবং মোকদ্দমার রায়েও এইরূপ বন্দোবস্ত ওয়াকফ বলে অভিমত দিয়ে দেশকে ও সরকারকে মোলায়েম করেছিলেন। ফলে ১৯১৩ ও ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের Act দিয়ে এরূপ বন্দোবস্তকে ওয়াকফ সাব্যস্থ করে মুসলমান সমাজের বড় বড় পরিবারগুলি রক্ষার পথ করা হয়েছে। এখানে স্যার সৈয়দের দৃষ্টি বেশ তীক্ষ্ণ ছিল বলতে হবে।

কাউন্সিলের জন্য তাঁর উর্দ্দু বক্তৃতা ইংরেজীতে তাঁর যোগ্যপুত্র সৈয়দ মাহমুদকে দিয়ে অনুবাদ করাতেন, এবং সেটা উর্দ্দু অক্ষরে ইংরেজী শব্দের উচ্চারণগুলি লিখে কাউন্সিলে পড়তেন। সকলই শুনত স্যার সৈয়দ ইংরেজীতে বক্তৃতা দিচ্ছেন, অথচ ইংরেজী একেবারেই তিনি জানতেন না। কি অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর ছিল এতেই বুঝতে পারা যায়। এজন্য লালা লাজপৎ রায়ের পিতা স্যার সৈয়দকে পয়গম্বর বলতেন। লালা লাজপৎ রায় তাঁর একখানি পত্রে এ কথার উল্লেখ করেছেন। স্যার সৈয়দের ইংরেজী বক্তৃতা শুনে একদিন অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন।

শিক্ষা কমিশন–এর সামনে তিনি যে সাক্ষাৎ দিয়েছিলেন তাতে তাঁর মত যে একেবারে আধুনিক কালের তা স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি উর্দ্দুকে শিক্ষার বাহন করতে চেয়েছিলেন, এবং

www.pathagar.com

শিক্ষা নিয়ন্ত্রণে দেশের লোকের সম্পূর্ণ অধিকার স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক একথা তিনি স্পষ্ট করে বলেছিলেন। কিন্তু আবার সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে গেছেন যে, দেশের লোক এখনও উপযুক্ত হয়নি সে স্বাধীনতা বা অধিকারের সদ্ব্যবহার করার জন্য।
দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে স্যার সৈয়দ মুসলমানকে যোগদান করতে নিষেধ করেছিলেন। Congress–এ যোগ দেওয়ার জন্য স্যার সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে আহ্বান করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে যোগ দেন নাই। এর বিরুদ্ধে তিনি Patriotic Association প্রতিষ্ঠা করে, মুসলমানকে Congress থেকে সরিয়ে এনেছিলেন।
তিনি বুঝেছিলেন মুসলমান একদিল না হলে কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কোন ফলই তার পক্ষে ভাল হবে না। এটা তাঁর জীবন্ত বিশ্বাস হয়েছিল, এবং সেই বিশ্বাস অনুসারেই তিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কাজ করে গেছেন। এতে বুঝা যায় স্যার সৈয়দ 'essentially was a man of faith and a man of Action'. তাই তাঁর কাছে হিন্দু মুসলমানের ভ্রাতৃত্ব ও মুসলিমের পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বলে দুইটি পৃথক জিনিষ ছিল। হিন্দু মুসলিম ভ্রাতৃত্বকে তিনি বলতেন وطنی بہای ও মুসলিমের ভ্রাতৃত্বকে ارو مانی ہا لی তিনি বিশ্বাস করতেন দেশ ভক্তি ہمر طنی ও স্বসম্প্রদায়ের ভক্তি ہم دردی দুইটিই আবশ্যক, এবং এই দুই–এর সহযোগেই দেশের কল্যাণ হবে।
এই মহাকর্ম্মী স্যার সৈয়দের জীবনী লেখা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। তাঁর কর্ম্মধারার এবং সেই কর্ম্মধারার প্রভাব কিরূপ হয়েছে, এবং হচ্ছে সেদিকে এই 'সাহিত্য সমাজে'র দৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য। স্যার সৈয়দ কত বড় লোক ছিলেন তা স্যার সুরেন্দ্র তাঁর 'Nation in making'–এর ৪৮ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন সেই কথাটা বলেই এই প্রবন্ধ শেষ করছি। তিনি লিখছেন—

'Sir Syed—One of the greatest leaders of the Muslim Community under British Rule. He did not know a word of English, but more than any other Mohamedan Leader of his generation, he realised how necessary English education was for the advancement of his community. He had the will to resolve, and the genius to organise a movement for importing it upon a scale of for reaching comprehensiveness and under conditions of permanence and utility that have immortalised his name.

...... Let us not forget the debt of gratitude that Hindus and Mohamedans alike owe to the honoured memory of Sir Syed and today the Aligarh College, now raised to the Status of a University, is the centre of that culture and enlightenment which has made Islam in aglow with that patriotic enthusiasm, which augurs well for the future solidarity of Hindus and Mohamedans'.

www.pathagar.com

তরুণ আন্দোলনের গতি

আবুল ফজল বি. এ.

মানুষের জীবনে শুধু মানুষের কেন, প্রত্যেক জিনিষের জীবনে সৃষ্টি হইতেছে বড় কাজ—বাঁচিয়া থাকিবার একমাত্র উপায়। প্রত্যেক জীবন্ত জিনিষ এই নূতন সৃষ্টির দুঃসাধ্য সাধনে মশগুল। যেখানে কারণে বা অকারণে সৃষ্টির দরজা বন্ধ হইয়া আসিয়াছে, সেখানে মৃত্যু ঘনাইয়া আসিয়াছে বলিতে হইবে। ব্যক্তির জীবনে যাহা খাঁটি, জাতির জীবনে তাহা আরও ব্যাপকভাবে খাঁটি। একদিন নব নব সৃষ্টির সাধনায় মানুষের চিন্তা রাজ্যে গ্রীকেরা প্রভুত্ব করিয়া গিয়াছে; প্রাচীন ভারতের আর্য্যসভ্যতা মানুষের মনোরাজ্যে জ্ঞান পরিবেশন করিয়া গিয়াছে, আরব ও পারস্যের সংমিশ্রণে যেই অপূর্ব্ব সারাসিন সভ্যতার জন্ম হইয়াছিল, তাহা বহু শতাব্দী ধরিয়া মানুষের চিন্তা ধারার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। কিন্তু নব নব সৃষ্টির দীপ শিখাকে কেহই নিত্যকালের জন্য সজাগ রাখিতে পারে নাই। তাই সকলের মরণ আসিয়াছিল, দেহে না হইলেও মনেতে বটে।

আজ ইউরোপ আমেরিকা বিশ্বের মনোরাজ্যের প্রভু। ইহা শুধু গায়ের জোরে নয়—নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার নব নব সৃষ্টিতে। গায়ের জোরে মানুষের দেহের প্রভু হওয়া যায়, মনের নয়। আজ দেহে মনে আমরা ইউরোপের বন্দী। জীবনের গতিপথ নির্দ্দেশের জন্য আমাদিগকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিতে হয় পশ্চিমের দিকে। নূতন সৃষ্টির জন্য যে অপরিসীম সাধনা, যে নির্ম্মম বেদনা ও কৃচ্ছ সাধনার দরকার, তাহা করিবার শক্তি যেন আমাদের নাই। আমরা দেহ মনে দুর্ব্বল—কিন্তু দেহের চাইতেও মনে ভয়ানক দুর্ব্বল। মন আমাদের বেদনা সহ্য করিতে অক্ষম—কাঁটা পথে চলিতে শক্তিহীন। আজ ইউরোপ কী দুঃসাধ্য সাধনে ব্রতী। তাহারা আজ সাগরে ডুব দিতে দ্বিধাহীন, আকাশে উড়িতে সঙ্কোচহীন, হিমালয়ের চূড়া লঙ্ঘন করিতে দৃঢ় সংকল্প। কৌতূহল, বিচার (experiment) ও সাধনা এই তিনটি জিনিষ নূতন সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য্য। এই তিনটি জিনিসের উপর ভর দিয়া আজ পশ্চিম বিশ্বজয়ী। পশ্চিমের সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি এই তিনটি জিনিসকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। শুধু কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া কত মানুষ সাগর সাঁতরাইয়া মরিতেছে, পাহাড় জঙ্গলে ঢুকিয়া হিংস্র জন্তুর আহার্য্যে পরিণত হইতেছে। আকাশে ভূ-প্রদক্ষিণ করিতেছে—এই সেদিন আটলান্টিক 'নন-ষ্টপ' উড়া দিতে যাইয়া কত মানুষ মরিল। পদব্রজে, সাইকেলে, মোটরে ট্রেনে কত প্রকারে আজ পশ্চিম পৃথিবীটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া বিচার করিয়া দেখিতেছে। ইহাতে বহু মানুষের জীবন নষ্ট হইবে, ইহা তাহাদের অবিদিত নহে। কিন্তু নব সৃষ্টির প্রসব বেদনা যাহাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে, সেকি সুবোধ বালক হইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে? শুধু Experiment করিবার জন্য পশ্চিমের

www.pathagar.com

কত লোক বিষ খাইয়া প্রাণ দিল। আমাদের দেশের লোকে আত্মহত্যা করে না, তেমন কথা বলিতেছি না। পরীক্ষায় ফেল করিয়া অনেক আফিং খায়, নিজের ইচ্ছামত বিবাহ করিতে না পারিলে অনেকে বিষ খায়, মেয়েদের কেরোসিনে পুড়িয়া মরা বাংলাদেশের একটা বৈশিষ্ট্য হইতে চলিয়াছে। আবার সে বৎসর মোহনবাগান গোল খাইয়াছে বলিয়া তাহার একজন ভক্ত নাকি বিষ খাইয়া প্রাণ দিল ! কিন্তু দুর্ব্বলতার জন্য প্রাণ দেওয়া, আর জ্ঞান ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য্য বাড়াইবার জন্য সজ্ঞানে বহাল তবিয়তে নিজেকে উৎসর্গ করা ভিন্ন কথা। একটি হত্যা অন্যটি ত্যাগ। নূতন সৃষ্টির জন্য যে উম্মাদনা, যে সাধনার দরকার তাহা আমাদের জাতীয় জীবনে এখনও অনেক দূর বলিয়া মনে হয়। নূতনের কৌতূহল আমাদের মনে জাগে নাই, বিচার (Experiment) করিবার মত মনের শক্তি আমাদের নাই, সাধনাও তথৈবচ।

আমাদের সমাজে নায়েবে রসুল যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা বর্ত্তমানে হইয়া উঠিয়াছেন এক একটা নায়েবে খোদা, তাঁহাদের মতের খেলাফ কোন কথা হইলে অমনি তাঁহাদের অমোঘ অস্ত্র ফতোয়া 'কাফের হো গেয়া।' ইহারা বুঝেন না, মানুষ কি চিরদিন অতীতের নির্দ্দেশিত পথ ধরিয়া চলিবে? মানবেতিহাসে এই চৌদ্দশত বৎসরের সাধনা কি মুসলমানের জন্য একেবারে ব্যর্থ হইবে? সমগ্র জাতি নিচয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় মানব সভ্যতার সমুন্নত মত ও পথগুলিকে শুধু আমাদের অতীতের সঙ্গে মিলে না বলিয়াই কি আমরা অস্বীকার করিয়া বসিব? যাঁহাদের মস্তিষ্ক সজীব, তাঁহারা নিত্য নূতন নূতন পথে জ্ঞানের অভিযান চালাইবেন। নূতন নূতন পথের আবিষ্কার করিবেন, ইহাতে যদি অতীতের বিরুদ্ধতা হয়, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। অতীতের বিরুদ্ধতা মুসলমানের জন্য বড় ক্ষতির কথা নয়। কিন্তু অতীতকে আঁকড়িয়া ধরিয়া তাহার জীবনে চলার পথে একটা ফুলস্টপ দেওয়াই তাহার পক্ষে মারাত্মক। অতীতকে অস্বীকার করিতে আমি বলি না। কিন্তু অতীতের দিকে ফিরিয়া যাওয়াতেই আমার আপত্তি। অতীতের কাছে যতখানি আলো পাওয়া যায় তাহা আমি হৃদয় ভরিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু পুরাতনের গৌরব দিয়া তাহার অন্ধকারকে নিতে আমি রাজী নই। ইসলামের আবির্ভাব হইতে এই চৌদ্দশত বৎসরের মধ্যে মানুষের জীবনে এবং জ্ঞানে অনেক উন্নতি হইয়াছে। কাজেই অতীতের সঙ্গে আধুনিক মানুষের জীবন যাত্রার বিরুদ্ধতা অনিবার্য্য। পিতামহেরা যে পথ ঘোড়ায় চড়িয়া দুই দিনে অতিক্রম করিতেন, আমরা যদি আজ তাহা মোটরে অর্ধদিনে বা এরোপ্লেনে এক ঘণ্টায় অতিক্রম করি, ইহাতে পিতামহের ট্র্যাডিশন ভঙ্গ করা হয় সত্য, কিন্তু অপরাধ করা হয় না, একথা সকলেই বুঝে। জীবন্ত প্রাণবাণ মানুষের মন ও মস্তিষ্ক অনুসন্ধিৎসু। কোন একটা জিনিষকে যে কোন প্রকারে পাইয়া তাহার তৃপ্তি নাই। তাহার সত্য পরিচয় অনুসন্ধানেই তাহার আনন্দ। জার্ম্মান দার্শনিক নিটশে বলিয়াছেন—'If you desire peace of soul and happiness, believe. If you want to be a disciple of truth, search.' এই অনুসন্ধিৎসাই মানুষকে সত্যের পথে টানিয়া লইয়া যায়। বিশ্বাস করিয়া মানুষের সুখ আছে জানি, কিন্তু সত্যের অনুসন্ধানে বা সত্যকে আবিষ্কার করিয়া মানুষের যে সুখ, যে আত্মপ্রসাদ—তাহার তুলনা

www.pathagar.com

নাই। সন্দেহই জ্ঞানের গোড়া—এইত বড় বড় দার্শনিকদের কথা। সন্দেহ হইতে মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগে। আজ মুসলমান ছেলের মনে জীবনের বড় কিছু সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিতে পারে না। সন্দেহ জাগিলে তাহার গলা টিপিয়া ধরা হয়। এইভাবে তাহার জ্ঞান আহরণের সদর দরজাই বন্ধ পড়িয়া গিয়াছে। একটা উদাহরণ দেই। পিতা পিতামহ বিশ্বাস করেন, খোদা এক। ধর্ম্ম শাস্ত্র বলে খোদা এক। ব্যস্, আমিও বিশ্বাস করি—খোদা এক। এইত আমাদের জ্ঞান। কিন্তু খোদা নাই বা খোদা একাধিক, এই সন্দেহ কোন মুসলমান ছেলে প্রকাশ করিলে তাহার কি আর নিস্তার আছে! অনুসন্ধানের ভিতর দিয়া তাহার সত্যে পৌঁছার পথে এই যে বাঁধার সৃষ্টি করা হইল, ইহাতে তাহার ক্ষতি ছাড়া কি কোন লাভ হইল? এই প্রশ্ন হইতে যদি মানুষের চিন্তা ক্ষেত্রে আর একটি নূতন সত্য পাওয়া যায়, তাতে গৌরব ঢের বেশী।

একটা কথা বড় বেশী শোনা যায়। বহু দিন হইতে দেশে অসংখ্য মাদ্রাসা চলিয়া আসিতেছে, এবং বছর বছর তাহা হইতে অসংখ্য ছাত্র পাশ করিয়া বাহির হইতেছে। শরিয়তের সব কিছুই তো এখানে পড়ান হয়। তথাপি জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহারা নূতন কিছু দান করিতে পারিতেছেন না কেন? শরিয়তের বিধি নিষেধগুলিরও আধুনিক জীবনের মতবাদ অনুযায়ী ইহারা কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেন না কেন? ইহার উত্তর—ইহাদের মনে জ্ঞান ও চিন্তার গোড়া সন্দেহ জাগিতে পারে নাই। ইহারা যখন পড়িতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের মনে এই শিক্ষা ও সংস্কার বদ্ধমূল হইতে দেওয়া হয় যে, এই আরবী ফারসী কেতাবে যাহা কিছু লিখিত আছে, তাহা অলঙ্ঘনীয় সত্য। ইহার কোন বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহের স্থান নহে। যাহার মনে সন্দেহ জাগে, সে গুনাহগার। এমনি করিয়া মুসলমানের জ্ঞানের উৎসকে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে।

কোরাণে ও হাদিসে শুধু সাময়িক সমস্যা সমাধানের জন্য বহু আয়েত নাজেল হইয়াছে, বহু হাদিস বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা দেশকাল পাত্র ভেদে নিত্যকালের জন্য প্রয়োজন হইবে এমন কি কথা আছে? সুদ দেওয়া নেওয়া হয়ত একদিন হারাম করা দরকার ছিল, কিন্তু আজ ত দেখা যাইতেছে, সুদ ছাড়া মুসলমান চলিতে পারে না। পৃথিবীর কোন বড় ব্যবসায় বাণিজ্য বর্ত্তমানে সুদ দেওয়া নেওয়া ছাড়া অচল। ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় আজকাল আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য চলিতেছে, অথচ ব্যাঙ্কের গোড়া হইল সুদ। কোরান কি কারণে কি পারিপার্শ্বিক ঘটনার জন্য সুদ হারাম করিয়াছিল, সে সব চিন্তা না করিয়া কোরান হারাম করিয়াছে, শুধু এই দলিলকে নিত্যকালের জন্য ধরিয়া লইয়া মুসলমানের অর্থনৈতিক উন্নতিকে প্রতিহত করিয়া দিবার কি হেতু আছে?

চিত্র শিল্পকে নাকি ইসলাম হারাম করিয়া দিয়াছে। পৃথিবীর হয়ত এমন অন্ধকার যুগ ছিল, যে সময় মানুষ যে সে চিত্রকে পূজা করিয়া বসিত। কামাল পাশার ন্যায় আমরাও কি আজ বলিতে পারি না—'পৃথিবী সে যুগ পার হইয়া আসিয়াছে।' মোগল যুগে শাস্ত্রবাণীকে উপেক্ষা করিয়া চিত্রশিল্প ও সঙ্গীত চর্চ্চা বাড়িয়া উঠিয়াছিল—তাহাতে মানুষের অমঙ্গল হয় নাই। সে যুগের মুসলমান চিত্রের পূজা করে নাই। এখনও সমাজের গোঁড়ামীকে উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা

www.pathagar.com

চিত্রশিল্পের সাধনায় যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রকে মুসলমানেরা পূজা করিতেছে, এমন কথা শোনা যায় নাই। ইসলাম মানুষের ধর্ম্ম, বিবেকের ধর্ম্ম, মানুষের বিবেচনাকে ইসলাম কখনও অস্বীকার করে নাই। মানুষের অনুভূতি ও আশা আকাঙ্ক্ষাকে চিত্রে ফুটাইয়া তোলাতে ইসলাম কি দোষ দিতে পারে?

আবার আরবীতে খোতবা পড়া হয়। সেই ধূয়া ধরিয়া আমরাও চলিয়াছি তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া। মনে করি, সুন্নত পালন করিতেছি। আর ভুলিয়া যাই আরবী আরবদের মাতৃভাষা, আরবী তাহারা বুঝে আমরা তাহা বুঝি না। অথচ পুণ্য লাভের দুরাশায় বুঝিবার ভাণ করিয়া হা হুতাশ করিয়া বুক ভাসাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা বুদ্ধিমান তাঁহারা ঘুমাইয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করেন। খোতবা প্রথাটি আমাদের জাতীয় জীবনে ইসলামের একটি মহাদান। সমস্ত সপ্তাহের ধর্ম্মনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থাৎ মানুষের সুখ-দুঃখের যে সব কথা আলোচনা করিবার আছে, তাহা আলোচনা করাই এই খোতবার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখন হয়ত কোন এক কালে কোন আরবী দাঁ মৌলভী বারমাসের জন্য তেষট্টিটা খোতবা লিখিয়া ছাপাইয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদের সব চিন্তা, সব আলোচনা এবং সব সুখ দুঃখের কথা ভাবিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। আমরা তাহা দুর্ব্বোধ্য আরবী ভাষায় পড়িয়া এবং শুনিয়া কৃতার্থ হইয়া যাই।

আমাদের সমাজের অর্দ্ধ ভাগ আজ প্রাচীরের ভিতর আবদ্ধ। তাঁহাদের জীবন চতুর্দ্দিক হইতে রুদ্ধ। জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টির জন্য তাহার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য বর্ত্তমান অবরোধ প্রথাকে দূরীভূত করিয়া তাহাকে সভ্যতানুমোদিত করিতে হইবে ; নতুবা মুসলমানের জীবনের উৎস চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। আলো বাতাস লাগিলে মেয়েদের চরিত্র অমনি হুড়মুড় করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এরূপ ভাবিবার কি আছে? গোড়ায় বিপদ একেবারে নাই বলিতেছি না। কিন্তু সেই বিপদকে এড়াইয়া চলাতে পৌরুষও নাই, জাতীয় জীবনের উন্নতিও নাই। আলো বাতাসের ধাক্কা না খাইয়া যে চরিত্র বড় হইবে, তাহা ক্ষণভঙ্গুর। চতুর্দ্দিক হইতে প্রাচীর ঘেরা তথাকথিত সতীত্বের কোন মূল্য আছে বলিয়া বিশ্বাস করি না। বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিলে বন্ধু পত্নীর পদস্খলন হইবার ভয় থাকিলে সে রকম পত্নী লইয়া ঘর করিতে যে কোন মানুষের লজ্জা হওয়া উচিত। সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের দিকে চাহিয়া এখানে কতকগুলি অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতেছি।

মেয়েদের শিক্ষা, অবরোধ প্রথার উচ্ছেদ, ইত্যাদি সম্বন্ধে বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ বহুদিন হইতে আলোচনা করিতেছে। কিন্তু আমাদের সমাজ নেতারা শুধু বাক্যের ব্যবসাদারীতেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া নিজেরা ফতুর হইতেছেন এবং সমাজকেও বিড়ম্বিত করিতেছেন। Example is better then precept–এ কথা তাঁহারা বুঝিতেছেন না, বা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভান করিয়া মনে করিতেছেন আমরা সমাজের নেতা, সংস্কার আন্দোলনের অগ্রদূত pioneer—ইয়া উয়া ! আজ এই 'ঢাকা সাহিত্য সমাজে'র সভায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁহাদের স্ব স্ব পরিবারের মহিলাদের এই সভায় যদি লইয়া আসিতেন, তাহা হইলে এই আন্দোলন আজ একদিনে অন্ততঃ আরও দশ বৎসর আগাইয়া যাইতে পারিত এবং সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের সঙ্গে তাঁহাদের নাড়ীর যোগ

www.pathagar.com

রহিয়াছে, তাহাও প্রমাণিত হইয়া যাইত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ আমরা তাহার উল্টা দেখিতেছি।

দিন তিন চার আগে 'সাহিত্য সমাজে'র কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির (যাঁহাকে আমি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে সব চাইতে বেশী শ্রদ্ধা করি) বাসায় গিয়াছিলাম। দুয়ারে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করিলাম। মাত্র হাত পাঁচেক দূরেই ভিতরে মেয়েরা আমাদের সাড়া পাইয়া জানালা দরজা বন্ধ করিয়া দিতেছেন দেখা গেল, কিন্তু কেহই মুখ খুলিয়া বলিলেন না। তিনি বাড়ী নাই। আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই দিকে খুব অগ্রসর ও radical বলিয়া দাবী করিতেছেন এবং সময় সময় কথায় এবং লেখায় অবরোধের বিরুদ্ধতা করিয়া থাকেন, এইতো তাঁহাদের অবস্থা। গত নিখিল বঙ্গীয় মুসলিম যুবক সম্মিলনের সুযোগ্য সভাপতি সাহেবের অভিভাষণের কয়েকটা লাইন এইরূপ :—'পর্দ্দা দু'রকম। এক রকম ইসলামী পর্দ্দা সে হচ্ছে মুখ হাত পা ছাড়া সর্ব্বাঙ্গ ঢাকা। আর এক অনিসলামী পর্দ্দা। সে মেয়েদের চার দেওয়ালের মধ্যে চিরদিনের জন্য কয়েদ করে রাখা। ইসলামী পর্দ্দার বাইরের খোলা হাওয়ায় বেরুনো, কি অন্যের সঙ্গে দরকারী কথাবার্ত্তা মানা নয়। অনিসলামী পর্দ্দায় এসব হবার জো'টি নেই। আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে, এই অনিসলামী পর্দ্দা ফাঁক করে দিতে। বঙ্গীয় মুসলমান যুবক সম্মিলনী শ্রদ্ধেয় সভাপতি সাহেব অনিসলামিক পর্দ্দা ফাঁক করিয়া দিবার জন্য নিজে কখনও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন কিনা জানি না। তবে এই কথা জানি, তিনি শুধু ইচ্ছা করিলেই ইসলামী পর্দ্দার সাথে মাত্র পাঁচ মিনিটের রাস্তা অতিক্রম করাইয়া তাঁহার পরিবারের মেয়েদের এই সভায় লইয়া আসিতে পারিতেন। শুধু উপদেশের খাতিরে যদি উপদেশ দেওয়া হয়, তাহার সঙ্গে যদি উপদেষ্টার জীবনের কোন সম্বন্ধ না থাকে, সে উপদেশের কি কোন মূল্য আছে? সেই অতিরিক্ত চিনি খাওয়া ছেলের চিনি ছাড়ানের গল্প না হয় নাই বলিলাম এখানে। মুসলমান মেয়েদের পর্দ্দার বাহিরে আনার বড় অসুবিধা সম্বন্ধে আমি অজ্ঞাত নহি। বর্ত্তমানে স্ত্রী শিক্ষার অভাবে মুসলমান মেয়েদের জীবন যাত্রা প্রণালী, কেশ বিন্যাস, চলাফেরা হয়ত সুরুচি সঙ্গত নয় এবং বাহিরে আমার মত তাঁহাদের মনও হয়তো তত সাহসী নয়। কাজেই তাঁহাদিগকে বাহিরে আনিয়া হাস্যস্পদ হইতে অনেকখানি রাজী হইবেন না, তাহা আমি জানি। কিন্তু আমি যাঁহাদের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছি আমি জানি, তাঁহাদের কাহারও বিবাহিত জীবন দশ বছরের নীচে নয়। এই দশ বছরের মধ্যে তাঁহারা নিজেদের স্ত্রীকে, যাঁহাদের উপর তাঁহাদের despotic monarchy, যখন কোন দিকে সংস্কার করিতে পারেন নাই, বা দশ বছরের মধ্যে একটি মেয়ের মনোভাব বাহিরে আসিবার উপযোগী করিয়া তুলিতে পারেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে এই সম্বন্ধে অন্যকে উপদেশ দিতে যাওয়া কতখানি সমীচীন তাহা ভাবিবার বিষয়। যাঁহারা কথায় এবং কাজে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিবেন না, তাঁহারা অনর্থক বাগাড়ম্বর না করিলেই পারেন। সংস্কার আন্দোলন এই রকম ভাবে চলিলে মুসলমানদের যে উপকার হইবে, তাহার সহস্রগুণ ক্ষতি হইবে একটা পবিত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করিয়া মানুষ যদি ভণ্ডামী করিয়া বেড়ায়। এই রকম তথাকথিত আন্দোলনকারীদের মেরুদণ্ড এবং মন মোটেই

শক্ত নয়। বিপক্ষের সামান্য হুমকিতেই ইঁহারা তওবা করিয়া বসিতে পারেন, এবং এই করিয়া সমস্ত আন্দোলনের স্পিরিটকে এক মুহূর্ত্তেই ধ্বংস করিয়া দিতে একটুও দ্বিধা বোধ করেন না। এই আন্দোলনে অনেক নিষ্ঠাবান নির্ভীক তরুণ আছেন, যাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে এই আন্দোলনের সাফল্য কামনা করিয়া থাকেন। এই তওবা তাঁহাদের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করিয়া না দিলেও অনেকখানি পেছনে ঠেলিয়া দিবে। এক পা অগ্রসর হইয়াই যদি তওবা করিয়া দশ পা পিছনে চলিয়া যাইতে হয়, তবে এই আন্দোলনের সাফল্য সুদূর পরাহত। পৃথিবীতে সব সময় এবং সব দেশেই সমস্ত আন্দোলন বাধা, বিপত্তি ও অত্যাচারের ভিতর দিয়াই জয়যুক্ত হইয়াছে। শুধু ফাঁকা বক্তৃতা বা প্রবন্ধের দ্বারা কখনও কোন আন্দোলন সাফল্য লাভ করে নাই।

মুসলমানের সৃষ্টি বহু দিন হইতেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। শুধু শাস্ত্রের জাবর কাটিলে সে শক্তি ফিরিয়া আসিবে না। শাস্ত্রকে উপক্ষো করিতে বলিতেছি না। বুদ্ধি, বিবেচনা ও জ্ঞান দিয়া আধুনিক জীবনের মতবাদ অনুসারে শাস্ত্রকে বিচার করিয়া লইতে হইবে। অন্ধের মত অনুসরণের কোন মূল্য নাই। ইসলাম যুগধর্ম্মকে কোন দিন উপেক্ষা করে নাই, এবং কোন জীবন্ত ধর্ম্মই উপেক্ষা করিতে পারে নাই। যুগের পরিবর্ত্তনকে মানিয়া যে লইবে না তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। হিন্দু যদি আজ সমুদ্র যাত্রাকে অধর্ম্ম ভাবিয়া ঘরে বসিয়া থাকিত, অথবা খৃষ্টান যদি আঘাতের প্রতি-আঘাতের পরিবর্ত্তে অন্য গালখানি পাতিয়া দিত, তাহা হইলে তাহাদের জায়গা স্বর্গে হইলেও হইতে পারিত, কিন্তু এই মাটির দুনিয়ায় একেবারে অসম্ভব হইত। মুসলমানকেও যদি দরকার হয় এই রকম নির্ম্মম ভাবে সামাজিক বিধি নিষেধকে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। ইসলামের মূল সূত্রকে পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেছি না এবং তাহার দরকারও নাই।*

আজ যাঁহারা নূতন সৃষ্টি করিতে চাহিবেন তাঁহাদিগকে মুক্ত অন্তঃকরণে স্বাধীন ভাবে জ্ঞানের পথে চিন্তা করিতে হইবে। কোন বিধি নিষেধ ও বাহিরের বাধা যেন মানুষের চিন্তাকে রুদ্ধ করিতে না পারে। যুগ যুগান্ত হইতে মানুষের সৃষ্টির অভিযান চলিয়াছে। এ অভিযান রুদ্ধ হইতে পারে না।

জীবনের নূতন নূতন অভিজ্ঞতায় আমাদের সাহিত্যকে ভরিয়া তুলিতে হইবে। জীবনের উপলব্ধিই সাহিত্য, সে উপলব্ধির পরিসর যতই ব্যাপক হইবে আমাদের সাহিত্যও ততই বহুধা, বিভিন্ন মুখী ও শক্তিশালী হইবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের জীবনের উপলব্ধি সীমাবদ্ধ, তার পরিসর নেহাৎ ক্ষুদ্র, তাই আমাদের পূর্ব্ব সাহিত্যও একেবারে হাল্‌কা। নারী জীবন একটা জিনিষ আমাদিগকে সম্পূর্ণ কল্পনা করিয়া গড়িতে হয়। কিন্তু কল্পনা করিয়া রূপকথা লেখা যায় কথা সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। পশ্চিমের জীবন বহুমুখী, তাহাদের

---

* লেখকের শেষোক্ত বাক্যটির তাৎপর্য্য কি বুঝিলাম না। পাছে তওবা করিতে হয় সেই ভয়ে কি এ বক্যটি লেখকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কলমের আগায় বাহির হইয়াছে? তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে এই বাক্যটি খাপ খাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

স. শি.

www.pathagar.com

জীবনের অভিজ্ঞতা ব্যাপক এবং তার সঙ্গে বহু বেদনা ও অশ্রু মিশিয়া তার সাহিত্যকে অমর করিয়া তুলিয়াছে। জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বাদ দিই, বেদনা ও অশ্রুজলের ভার বহনেও আজ আমরা অক্ষম। শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমারের লেখা হইতে পশ্চিমের একটা দৃষ্টান্ত দিই—'আমার এক ফরাসি বান্ধবী লেখিকা ও তাঁর স্বামী কবি। ... জীবন তাঁদের সুখময় ছিল। এমন সময় আমার বান্ধবীর একটি রূপসী সাথী তাঁদের মধ্যে অবতীর্ণ হলেন। বান্ধবী সখীকে প্রায়ই স্বামীর কাছে একলা ছেড়ে দিতেন। স্বামী একদিন হঠাৎ তাঁকে বললেন যে, দম্পতির মাঝে তৃতীয়ার উদয় এত ঘন ঘন হওয়াটা ঠিক নয়। বান্ধবী হেসে দিলেন। বললেন, তোমার প্রেমকে জোর করে পাওয়ার কোন দামই আমার কাছে নেই। যদি ছাড়া পেয়েও সে বাঁধা থাকে তবেই আমার কাছে তার মূল্য।' স্বামী চুপ করে রইলেন। কিন্তু ছাড়া পেয়ে প্রেম বাঁধা রইল না। বিপদ এল—যে বিপদ স্বামী ও স্ত্রী দুজনেই আশঙ্কা করেছিলেন। স্বামী তাঁর স্ত্রীর রূপবতী সখীর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। বান্ধবী অশ্রুজলের মধ্য দিয়ে তাঁকে বিবাহ বন্ধন হতে মুক্তি দিলেন। শুধু একটি নতুন পরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁর সব গেল—যা এ পরখ করতে না গেলে সম্ভবত যেত না। কিন্তু তবুও তিনি এজন্যে অক্ষেপ করেন না। এখন তিনি একান্ত বেদনার মাঝে একটি সামান্য বোর্ডিং চালিয়ে জীবিকা অর্জ্জন করেন—কিন্তু বিপদের ভয়ে স্বামীকে যে রূপসী সখীর আকর্ষণ হ'তে মুক্তি দিতে চান নি, এজন্যে গৌরব-গর্ব্ব তাঁর অসীম। সম্ভ্রমে মাথা নুয়ে পড়ে নাকি?' এত বড় মন আমাদের সমাজের মেয়েদের কথা বলি না, কয়টি পুরুষের আছে? আমাদের দেশেও যাঁহারা মেয়েদের স্বাধীনতা দিয়াছেন তাঁহাদের কাহাকেও হয়ত সময় বিশেষে এ রকম বেদনার সম্মুখীন হইতে হয়, কিন্তু মেয়েদের অবরোধ দূরীকরণে মানবজাতির যে বৃহৎ কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহার তুলনায় কোন ব্যক্তি বিশেষের ভুল ত্রুটি বা দুর্ব্বলতা কিছুই নয়—বিশেষতঃ যখন সেই একই ভুল ত্রুটি ও দুর্ব্বলতা যাঁহারা মেয়েদের বন্ধ করিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের নিজেদের জীবনে বেশী করিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে।

বাহিরের দুরন্তপনার সঙ্গে সঙ্গে এরকম ত্যাগ মহিমার অশ্রু মিশিয়া আজ ইউরোপের সাহিত্য বহুমুখী প্রতিভা লাভ করিয়াছে। এমনি করিয়া বেদনা ও অশ্রু দিয়া ইঁহারা জীবনকে অধ্যয়ন করেন, উপলব্ধি করেন।

বাংলা সাহিত্য আজ যুগ পরিবর্ত্তনের সন্ধিক্ষণে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমের যে সাহিত্য রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রে নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, সে সাহিত্য এখন তরুণদের হাতে আবার নূতন দিকে মোড় ফিরিতেছে। তাই আজ প্রবীণ দলে হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে। শৈলজা-প্রেমেন্দ্র-নজরুল, কল্লোল-কালি কলমের উদ্দেশ্যে অনর্থক গালি-গালাজ বর্ষিত হইতেছে তথাকথিত অভিজাত সাহিত্যের পক্ষ হইতে। বাংলা সাহিত্যের এ নব সাধনা হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন রাখিলে চলিবে না। আমাদিগকেও নূতনভাবে ভাবিতে হইবে, সমাজ জীবনকে নূতনভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে। আমাদের সমাজ বড় পতিত, তার জীবন বড় হীন ও তাই আমাদের সাহিত্য স্রষ্টাদিগকে নির্ম্মমভাবে কলম ধরিতে হইবে। নির্ম্মম ও কঠোরভাবে সমাজের গলদগুলিকে খুলিয়া ধরিতে হইবে। ভুল ভ্রান্তি ও গলদকে যদি বাহির করা না যায়, তবে চুনকাম করা সাহিত্যের দ্বারা

www.pathagar.com

কোন লাভ হইবে না। নিজেদের ভুল চুক, পাপকে স্বীকার করিতে হয়ত বুকভাঙ্গা বেদনা ও অশ্রুর সম্মুখীন হইতে হইবে—কিন্তু তাহাকে সহ্য করিয়া না লইলে উপায় নাই। রোগকে ঢাকিয়া আরোগ্য সুদূর পরাহত।

আমাদের এ আন্দোলনকে যদি স্থায়ী ও সাফল্যমণ্ডিত করিতে হয় তবে তাহাকে সাহিত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কারণ সাহিত্যই জাতির বাহন, সাহিত্যই চিরদিন তাহার জীবনের খোরাক জোগাইবে, তাহার জীবনে স্থায়ী অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করিবে। কোন ব্যক্তিত্বের উপর যদি এ আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয় তবে ইহার ব্যর্থতা অনিবার্য্য।

www.pathagar.com

Muslim Literary Conference

MY IMPRESSIONS

K.C. Mookherjce M. A. P. R. S., Dacca University

This is the third annual sitting of the Muslim Literary Conference held at the Assembly Hall of the Muslim Students of the Dacca University under the Chairmanship of Mr. A. M. Ahmad Bar-at-law, the District and sessions Judge of Rangpur, who sympathised with all progressive moments of the conference and led the deliberations very cautiously. The conference was, in the strict sense of the term, more than literary and death mainly with social problems. The whole house became astir when a young member very impressively claimed the present day necessity of the immediate removal of purdah and appealed to the elders to help the youth of his community to carry the torch of social radicalism in this country. The resolution was passed, but its practice will perhaps come late for the want of proper atmosphere. It may not matter much if the enthusiasm with which the cause seemed to be espoused remains and acts, as an inner realisation of the end, immanently in all their thoughts. The apprehension of Dr. Shahidullah that the sudden removal of purdah and the free movement of Muslim woman-folk in the society may be bewildering, and demand of young persons of both sexes a degree of self-control which many of them may find difficult to possess, did not seem to be much convincing to young members who do not perhaps pretend that they can be 'ice in summer seas' nor do they believe that they will then indulge in sea laxitics. A good psychological truth was very humorously hinted in one paper that mutual truth is of more importance than mutual comprehension to the growth of love, and that jealousy which springs from sex-love remains the guardian of nuptial rights and purity. Here I can not help reflecting on the minimum of clothing standard of the female dress and the modern style of dancing in the west that if a young lady swirls about, half-naked in the arms of another man but in the presence of her husband, she is then either causing pain to her husband or forces him to cultivate indifference to the situation and as such is teaching him to be indifferent to herself and training him in the simple art of seeking compensations.

Simplicity, honest and sincerity of the purpose which characterised the function of the conference were remarkable. The consciousness of the

www.pathagar.com

weakness in different spheres of life and their eagerness to remedy it as ably represented by different speakers were simple astonishing. Of the many thoughtful papers that were read and of the lively discussion that followed Mr. Abul Hussains powerful essay on 'Sir Syed' in which the writer has able attempted to co-ordinate the missions of two great men-Sir Syed and Raja Ram Mohan as an ideal of life, and Mr. Mohit Lal Majumdar's learned article on the outlook of literature appealed to me most effectively, and impressed me greatly of a delineation of the cogent force to unite the people of two communities together not by merging the distinctive differences but by contributing distinctive phases to the development of the ideal. The true meaning of korbani as the sacrifice of personal vices, the ideal of frugality for the self-realisation, the ideal of physical culture in the Koran, the conception of arts, Literature, science etc. as developed in the past ages of Islam were so beautiful represented to the audience that an all pervasive interest prevailed on the whole atmosphere. There are certain characteristic features of Islam which no doubt eventually make for its true solidarity but it will be truely expedited if the struggle for the fulfillment of the scheme as presented in the conference be progressively successful. Now it is for the youth of the Muslim community to see that the tree of free thought against the orthodoxy in social, religious and educational conceptions for the growth of which the organisers have devoted all their energy and forced all disgraces in the hands of orthodox people (the instance was not wanting even at the conference) may not quickly wither away but rather strickes its roof deep and bears fruits even for the chance-comer to pluck. The President won over the heart of the audience very warmly when he declared at last his contribution of Rs. 10,000 to the progress of the scheme of the conference.

[Reprinted from East Bengal Times]

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট

১. তৃতীয় বর্ষিক অধিবেশনের বিবরণ

(ক) নিম্নলিখিত মহোদয়গণ নিমন্ত্রণের উত্তর দিয়াছেন—

১. মৌলভী আবদুল আজিজ, কলিকাতা,

২. অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,

৩. অধ্যাপক কাজী আকরম হুসেন, করটিয়া (ইনি সভায় যোগ দিয়াছিলেন)

৪. হাফেজ মুহম্মদ ফজলুর রহমান, রণভাওয়ানী, কাওরাইদ

৫. মৌলভী জসীমউদ্‌দীন (কবি)

ইনি লিখিয়াছেন, 'আপনাদের সাহিত্য সমাজ'কে আমি সাহিত্য সমাজ হিসেবেই ধরি না। মানুষের দুর্দ্দিনের ইতিহাসের পশ্চাতে মানুষের মুক্তির দেবতা শবসাধনা করেন। আজ বঙ্গমুসলিমের সমাজ আঙ্গিনায় শ্মশানের প্রেত-যোগিনীর তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হয়েছে। কোন্ দেবতা আজ এই ঘোর অমানিশার অন্ধকারে কুহেলি কুহরে জাতির মুক্তিমন্ত্র রচনা করছেন তাকে আমরা দেখিনি। তবু মনে হয়, আপনাদের ভিতর যেন সেই দেবতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন, তাকে যেন আপনারা চিনেছেন। একদিন আপনাদের আহ্বানে সেই দেবতা এসে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হবেন। আমরা সেই দিনের অপেক্ষায় পীড়নের, দুঃখের, বেদনায় মন্দির সাজিয়ে বসে থাকি।'

৬. মৌলভী শাহাদৎ আলি খাঁ, সমযপুর, পাংশা,

৭. মৌলভী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, চট্টগ্রাম,

তিনি বলেন, 'সভার উদ্দেশ্যের সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।'

৮. মৌলভী সিরাজুল ইসলাম, মুন্সীগঞ্জ।

৯. মিসেস এ. কে. খন্দকার, গার্লস হোম, জলপাইগুড়ি,

তিনি বলেন, 'আমরা দূরে থাকিলেও আপনাদের নিকট আছি। মায়ের মাঙ্গলিক আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিবেন। এমন দিন অতিসত্বর আসিতেছে—যেদিন বাংলার মাতৃজাতিও আপনাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া দেশের দশের সমাজের ও ইসলামের সেবায় জীবনকে ধন্য করিতে সুযোগ পাইবে। মাতাপুত্রে, ভাইবোনে এবং স্বামীস্ত্রীতে একযোগে যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে না পারিব, ততদিন রাহুগ্রস্ত ইসলামের মুক্তি নাই—বাংলার মুসলমানের গৌরব দিন ফিরিবে না—চাই আলো, চাই মুক্তি।'

www.pathagar.com

১০. মৌলভী এ–লোহানী (এখন স্বর্গগত) কলিকাতা,
তিনি বলেন, 'আপনারা আজ ইসলামের শিক্ষা ও সাধনাকে মোল্লা প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ জগত সমক্ষে ধরিতে চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া সারা বাঙলার ধন্যবাদার্হ।'

১১. মৌলভী আকবরউদ্দীন, কৃষ্ণনগর
(ইনি সভায় যোগদান করিয়াছিলেন)

(খ) নিম্নলিখিত সাহেবগণ অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইয়াছিলেন। (ফি–৩)

১. মৌলভী আবদুল খালেক, বি.এ. হেডমাস্টার মুসলিম হাই স্কুল, ঢাকা।
২. মৌলভী সুলতানউদ্দীন আহমদ, এম.এ. বি.এল, উকিল।
৩. মৌলভী মমতাজউদ্দীন আহমদ বি.এল. উকিল।
৪. মৌলভী মখলেসুর রহমান বি.টি., লেকচারার ট্রেনিং কলেজ, ঢাকা।
৫. মৌলভী আবুল ফজল মহম্মদ, ইসলামিয়া লাইব্রেরী।
৬. মৌলভী সৈয়দ নূরুল হক বি.এ. লেকচারার, জগন্নাথ ইন্টার, ঢাকা।
৭. মৌলভী ডব্লিউ, এচ. ওয়াজির আলি বি.এ, ডেপুটি কলেক্টর, ঢাকা।
৮. খান বাহাদুর মৌলভী মহম্মদ মুসা, প্রিন্সিপ্যাল।
৯. মৌলভী আব্দুর রব চৌধুরী এম. এ, বি.এল, প্রফেসর, ঢাকা ইসলামিক ইন্টার।
১০. মৌলভী নজমুল হুসেন এম. এ, ঢাকা ইন্টার।
১১. মৌলভী আবদুস সোবহান এম. এ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি।
১২. মৌলভী দলিলউদ্দীন আহমদ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (অবসরপ্রাপ্ত)।
১৩. ডা: জালালুদ্দিন আহমদ, 'শূলসুধা' আফিস।
১৪. মৌলভী মহম্মদ আবদুর রশীদ বি.টি., কলেজিয়েট স্কুল।
১৫. অধ্যাপক পরিমল কুমার ঘোষ এম.এ।
১৬. অধ্যাপক এম. আই বোরাহ্ এম.এ. বি.এল।
১৭. ডা: এস. কে. দে ডি.লিট।
১৮. প্রিন্সিপ্যাল এস. এন. মৈত্রেয় এম.এ.।
১৯. খান সাহেব মৌলভী আবদুর রহমান এম.এ. বি.টি।
২০. অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ এম. এ.।
২১. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ডি.লিট্।
২২. মি: এ. এস. এম. তৈফুর।
২৩. মি: ফিদা আলি খান এম. এ।
২৪. মি: এ. এম. খন্দকার, আবকারী সাবইন্সপেক্টর।
২৫. মৌলভী আবুল হুসেন এম.এ . বি. এল.।

www.pathagar.com

দান

১.	ডা: মুইজ্জদ্দীন খাঁ	৪
২.	অধ্যাপক কালিকারঞ্জন কানুনগো এম. এ.	১০
৩.	ডা: রমেশচন্দ্র মজুমদার এম. এ., পি. এইচ.ডি.	৫
৪.	ডা: জে. সি. ঘোষ ডি. এস্‌সি.	৫
৫.	মি: এস. এন. বসু এম. এস্‌সি.	৫
৬.	মি: এফ. আহ্‌মদ এম. এ.	৪
৭.	খান বাহাদুর কমরদ্দীন আহমদ বি.এ.	৪
৮.	মৌলভী কাজী আবদুল ওদুদ এম. এ.	৫
৯.	কাজী মোতাহার হোসেন এম. এ.	৫

ডেলিগেট

১.	মি: চৌধুরী আফসার আলি, বি.এসসি.	২
২.	মি: মুহম্মদ সালেহউদ্দীন বি. এ.	২

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

সম্পাদক—মৌলভী আবদুস্ সোবাহান এম. এ.

সভাপতি—মি: এম. আহমদ বি. সি. এল. বারয়্যাটল ডিষ্ট্রিক এ্যান্ড সেসনসজজ, রংপুর।

সভাশেষে তিনি মন্তব্য করেন, আমার বুক ভরা ভাব আছে কিন্তু মুখ ভরা ভাষা নাই। আজ দুদিন যে সমস্ত প্রবন্ধ শুনলাম তাতে বড়ই অশান্বিত হয়েছি। আজ ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি করতে হলে চিন্তার স্বাধীনতা চাই। চরিত্র গঠন এবং শিক্ষা বিস্তার আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। সে জন্য একটি বড় organisation চাই। ইসলাম দীন দুনিয়া দুইয়েরই কল্যাণ চায়। আমাদের বেহেশ্‌ত মৃত্যুর পর হবে এ ভরসায় বসে থাকলে চলবে না—আমাদের এই দুনিয়াতেই বেহেশ্‌ত রচনা করতে হবে। একথা আপনারা ভুলবেন না। আপনারা পূর্ণ উদ্যমে কাজ করেন, টাকার অভাব হবে না। আমি দশ হাজার টাকার জোগাড় করতে চেষ্টা করব। আল্লাহু আকবর।'

(গ) সভার প্রস্তাব

১. এই সভা বাংলার মুসলমান নরনারীকে বিশেষ ভাবে ও হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে সমগ্র বাঙ্গালীকে কোরানের সহিত পরিচিত হইবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছে।

২. এই সভা বাংলার পল্লীর বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠাগার ও গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠায় বিশেষভাবে উদ্যোগী হইবার জন্য দেশের কর্ম্মীদের প্রতি অনুরোধ জানাইতেছে।

৩. এই সভা বাংলার বিভিন্ন মক্তব ও মাদ্রাসায় যাহাতে বাধ্যতামুলক ব্যায়াম – শিক্ষার ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ জানাইতেছে।

www.pathagar.com

৪. এই সভা বাঙালী মুসলমান সমাজের নেতৃবৃন্দকে পর্দাপ্রথা দূরীকরণার্থে আদর্শ স্থাপন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

৫. এই সভা 'সাহিত্য সমাজে'র কর্ম্মীবৃন্দকে মুসলিম ইতিহাস দর্শন ও ধর্ম্ম বিষয়ক আরবী ও ফারসী গ্রন্থসমূহ অনুবাদ করিবার জন্য একটি অনুবাদ কমিটি গঠন করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

(ঘ) অধিবেশনের খরচের হিসাব

জমা		খরচ	
অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ হইতে—৭৫৲		নিমন্ত্রণ চিঠি, বিজ্ঞাপন কাগজ ইত্যাদি—	২৵৫
দান—	৪৭৲	অভিভাষণের কাগজ—	২৬।৶৫
ডেলিগেট ফি—	৪৲	ছাপা খরচ—	
		চিঠি বিজ্ঞাপন—	৫৲
হাওলাত—		অভিভাষণ ও নিমন্ত্রণ চিঠি—	৪৪৲
মৌলভী আবুল হুসেন—	৪৭।৵	ডাক খরচ—	৪।০
(ডিফিসিট)		চা ও পান—	৭১৷৵
		হল সাজানকুলি ও বখশিশ—	১৭৵
		গাড়ী ভাড়া—	
		প্রেসিডেন্ট, কনসার্ট ইত্যাদি—	৮।০
		ফুল ও ব্যাজ	৪।০
	১৭৩।৵		১৭৩।৶

২. 'শিখা'র হিসাব
(প্রথম বর্ষ)

জমা		খরচ	
১০০০ কপি		১৭ ফর্ম্মা	
প্রেস কপি	৫	ছাপা খরচ	১৩৯৲
অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণকে		কভার ছাপা	৩৲
দেওয়া যায়	২৫	কাগজ	১২২৷।০
Presentation	২৫০	কভার কাগজ	৬।০
ঘাটতি	৫	দপ্তরী	১৭৲
		কুলি খরচ	৫৲
	২৮৫	বিজ্ঞাপন	৮৲
মজুদ	৪০০	ষ্ট্যাম্প খরচ	২৫৲
	৬৮৫		৩২৫৷৷০
		বাদ মূল্য	১৩২৷।০
বিক্রীত	৩১৫		১৯৩।০
৷।০ হিসাবে	১৫৭৷।০		(এখনও বাকী)
বাদ কমিশন	২৫৲		
	১৩২৷।০		

www.pathagar.com

(দ্বিতীয় বর্ষ)

জমা			খরচ
ছাপান হয়	৫০০	কাগজ ৮$\frac{১}{২}$ রীম	
ঘাটতি	৫	৬৸৹ দরে	৫৭।৵
প্রেস কপি	৫	কভারের কাগজ	৩৸৹
অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণকে		ছাপা খরচ	১৩৪৲
দেওয়া হয়	৩৯	দপ্তরী খরচ	৮॥৹
Presentation	৫০	কুলি খরচ	১॥৹
		ডাক খরচ	১০৲
	৯৯		
মজুদ	১২৫		২১৫৵
		ওয়াশীল মূল্য	১৪৯॥৹
বিক্রীত	২৭৬		
॥৹ আনা মূল্যে ৩০ খানা	১৫৲		৬৪॥৵
৸৹ আনা মূল্যে ২৪৬ খানা	১৮৪॥৹		(এখনও বাকী)
	১৯৯॥৹		
বাদ কমিশন	৫০৲		
	১৪৯॥৹		

www.pathagar.com

‘মুস্‌লিম সাহিত্য সমাজে’র মুখপত্র

(বার্ষিকী)

শিখা

চতুর্থ বর্ষ, ১৩৩৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

'মুস্‌লিম সাহিত্য সমাজে'র মুখপত্র

[বার্ষিকী]

শিখা

চতুর্থ বর্ষ, ১৩৩৭

সম্পাদক

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ বি.এ., বি.টি

প্রকাশক

সৈয়দ ইমামুল হোসেন

ম্যানেজার, মর্ডার্ন লাইব্রেরী,

নবাবপুর, ঢাকা

[মূল্য আট আনা]

www.pathagar.com

সূচীপত্র

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ : ডক্‌টর সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন
এম-এ., ডি-ফিল্. (অক্সফোর্ড) ৪৫৯
সভাপতির অভিভাষণ : খান বাহাদুর নাসির উদ্‌দীন আহ্‌মদ এম.এ ৪৬১
সম্পাদকের কথা ৪৭৬
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে জগৎ ও জীবন : অধ্যাপক শ্রী উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
এম.এ, বি.এল ৪৮১
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য : কামালউদ্দীন ৪৮৯
তরুণের দায়িত্ব : ফাতেমা খানম ৪৯১
ধর্ম্ম ও শিক্ষা : অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, এম.এ ৪৯৯
বর্ত্তমান বাংলার মহিলা ঔপন্যাসিক : করুণাকণা গুপ্তা ৫০৪
গ্যেটে : অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এম.এ ৫০৯
সাহিত্যে শুচিতা : প্রিন্সিপাল শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এম.এ ৫২১
বৃটিশ ভারতে মুসলমান আইন : আবুল হুসেন এম.এ., বি.এল ৫২৮
মুসলিম জাগরণ : নাজির উদ্দীন আহ্‌মদ এম.এ ৫৩১

www.pathagar.com

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন

ভদ্র মহোদয়গণ,

আমি সাহিত্যিক নহি, সাহিত্যের আসরে আমার স্থান নাই, সাহিত্য–সাধনা করিবার সময় বা সুযোগ আমার হয় নাই। সাহিত–সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অভিভাষণে কিছুটা সাহিত্যের রঙ রস ও গন্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়, অনেকের হয়ত সে ধারণা থাকিবে, কিন্তু আমি জানি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হিসাবে আমার সাহিত্যিক কর্ত্তব্য কিছুই নাই। আপনাদিগকে এ সাহিত্যের মজলিসে সাদরে গ্রহণ করার ভার আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এ কাজের আমি কতটুকু উপযোগী সে সম্বন্ধে আমার নিজেরই ঘোর সন্দেহ আছে।

আমার বিলাত যাত্রার পূর্ব্বক্ষণে 'মুসলিম সাহিত্য–সমাজে'র ভিত্তি পত্তন হয়। এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তখনই খুব আশান্বিত হইয়াছিলাম। সুদীর্ঘ কাল পরে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখি এ তরুণ সমাজ সময় ও যুগধর্ম্মের সঙ্গে তালে তালে পা ফেলিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সংসারটা যেখানে ছিল আজ আর সেখানে নাই। চলার আনন্দে সব কিছু ছুটিয়া চলিয়াছে। মানুষের চিন্তারাজ্যেরও বিপুল সচল ও তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছ। দেশ বিদেশে ঘুরিয়া যে সামান্য অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছি তাহাতে আমার মনে হয় চিন্তার দৈন্যই মানুষের অতি ভীষণ, মারাত্মক দৈন্য। যাহাদের মন সজাগ, বুদ্ধি–বৃত্তি যাহাদের তীক্ষ্ণ ও প্রখর, তাহারাই আজ সর্ব্ববিষয়ে নেতৃত্ব করিতেছে। তাহারাই বর্ত্তমান জগতে বর্দ্ধিষ্ণু, জীবন্ত উন্নতশীল ও সচল বলিয়া বিখ্যাত।

দেশ বিদেশের লোকের সঙ্গে মিশিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সাহিত্যই জাতীয় জীবনের ভিত্তি। কোন জাতির শতধাবিচ্ছুরিত জীবন–স্পন্দন একমাত্র সাহিত্যের মধ্যেই ফুটিয়া উঠে। এ নিছক সত্য কথা, কেবল কথার কথা নয়। জীবনের স্ফূর্ত্তি যেখানে যত বেশী সাহিত্যের বিকাশও সেখানে তত সুস্পষ্ট। সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটা জাতির ভাবধারা প্রবাহিত হয়। মানুষের জীবনের গণ্ডী যত প্রশস্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রও সেখানে তত বিস্তৃত'। 'Literature is the criticism of life' এ অতি প্রয়োজনীয় কথা। পরিপুষ্ট, পূর্ণাঙ্গ জীবনের জ্বলন্ত ছবি সাহিত্যের মধ্যেই আমরা খুঁজিয়া পাই। জীবন যেখানে একঘেয়ে, নীরস, বৈচিত্র্যহীন ও অচঞ্চল সাহিত্যও সেখানে আড়ষ্ট ও মরণাপন্ন।

মুসলমান সমাজ শিক্ষা ও চিন্তার ক্ষেত্রে নিতান্ত পশ্চাৎপদ। বিদেশে ঘুরিয়া মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছি, ভারতীয় মুসলমানকে বিদেশীয়েরা মোটেই চিনে না, আমি যখন বলিয়াছি যে বাংলাদেশের শতকরা ৫৫ জন মুসলমান অধিবাসী, তখন তাহারা আমাকে প্রশ্ন করিয়াছে তবে রবীন্দ্রনাথের মত লোক কয়টি? ইহার কি উত্তর আছে? অন্যান্য জাতির সাধনা, সজীবতা, চিন্তা চর্চ্চা ও সাহিত্যিক প্রচেষ্টার সঙ্গে যখন আমাদের সমাজের স্থবিরতা ও নিস্পন্দনভাব তুলনা করি তখন মনে বড় দুঃখ হয়। মনে হয় আমরা কোথায় পড়িয়া আছি।

কিন্তু পরক্ষণেই আবার দেখি আশার ক্ষীণালোক মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। দেশ বিদেশের তরুণদের মত আমাদের তরুণেরাও বসিয়া নাই। এখানে সেখানে তাহারা আজ তাহাদের চিন্তা ও কর্ম্মে আসর খুলিয়াছে। তাহাদের আদর্শ ও কর্ম্ম পদ্ধতি সম্বন্ধে হয়ত আমাদের প্রবীণেরা খুব আশান্বিত নহেন। আর এরূপ মতদ্বৈধ ও সংঘর্ষ থাকা খুবই বাঞ্ছনীয়, কারণ বৈষম্যই চিরকাল উন্নতির পরিপোষক, একথা ভুলিলে চলিবে না যে, সমাজের বাস্তব মঙ্গল সাধনই উভয় দলের চরম ও পরম লক্ষ্য। প্রবীণের অভিজ্ঞতা, সুচিন্তা ও সাবধানতা আর তরুণের উদ্দামতা কর্ম্মকোলাহল ও ব্যস্ততা যদি পাশাপাশি কাজ করিতে পারে তবেই সমাজের দৈন্য ঘুচিবে।

'সাহিত্য সমাজ' একদল শক্তিশালী সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল লেখক ইতিমধ্যেই গড়িয়া তুলিয়াছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এর কর্ম্ম ও সাধনার ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত এবং বহুধা বিভক্ত হইবে, অতীতের স্বপ্ন আমরা বহু দিন দেখিয়া আসিতেছি; আজ আমাদিগকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিতে হইবে, বর্ত্তমানকে ভিত্তি করিয়া আমাদের স্বপ্নসৌধ গড়িতে হইবে। তবেই আমাদের জয়যাত্রা সফল হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বলিবার মত আমার কিছুই নাই। আপনাদিগকে আমি আমার সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। যথোপযুক্তভাবে আপনাদিগকে অভ্যর্থিত করিবার মত আয়োজন আমাদের কিছুই নাই।

আমাদের আয়োজন অতি সামান্য, পরস্পরের চিন্তা ও ভাবের সঙ্গে সুপরিচিত হইবার জন্যই আজ আমরা এখানে সমবেত হইয়াছি। আমাদের সকলের সমবেত সহযোগিতা ও সহানুভূতি আমাদের এ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলুক, ইহাই প্রার্থনা। সাহিত্যের পূত আবহাওয়ায় আসুন সব ভুলিয়া শুদ্ধ ও বুদ্ধ হই। আমিন!

www.pathagar.com

সভাপতির অভিভাষণ

নাসিরউদ্দীন আহমদ

বন্ধুগণ,

আমার মত অযোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্ব্বাচন করে আপনারা কম দুঃসাহসের পরিচয় দেন নি। আমার পক্ষেও এরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করা কম ধৃষ্টতার পরিচায়ক নয়। তবে আমার অজুহাত এই যে আমি সুহৃদ্‌বর ওদুদ সাহেবকে অনেক অনুরোধ করেছিলাম যে, আমার মত সম্পূর্ণ অযোগ্য অক্ষম বৃদ্ধ ব্যক্তিকে আসরে নামিয়ে যেন সঙ্‌ না সাজান। কিন্তু তিনি কোন মতেই আমাকে রেহাই দিলেন না ; তাই আমাকে আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য করতে হয়েছে। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে যে কেহই যে এ কাজ আমার চেয়ে অধিকতর দক্ষতার সহিত সমাধান করতে পারতেন, তা' বলা বাহুল্য। আমার ভ্রমপ্রমাদ, ত্রুটি বিচ্যুতি অনেকই হবে, তবে আশা আছে আপনাদের উদারতা গুণে সে সব মার্জ্জনা করে নেবেন।

যদিও এ যাবৎ আমার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়নি আপনাদের সাহিত্য সমাজে যোগ দিতে, তবুও তিন বৎসরের 'শিখা' আমি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেছি ও তদ্বারা বিশেষ উপকৃত হয়েছি। মুসলমান সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে এমন সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধাবলী একেত্র কমই পাঠ করবার সুযোগ হ'য়েছে। আপনারা যে এরি মধ্যে আপনাদের মহৎ উদ্দেশ্য এতদূর সফলতা লাভ করতে পেরেছেন তা' শ্লাঘনীয়। আপনাদের 'সাহিত্য-সমাজ' স্বতঃই আমাকে মুসলমানদের গৌরবের যুগের 'দুখ্‌ওয়ানুস্‌সাফা' ভ্রাতৃ-মণ্ডলীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রার্থনা করি আপনাদের 'সাহিত্য-সমাজ' সফল হোক-সার্থক হোক।

আপনাদের mottoটি 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'—ভাল লেগেছে, এ সুন্দর আদর্শ লক্ষ্য করে চললে সমাজের অশেষ উন্নতি হবে তা'তে সন্দেহ নাই। আজ এ motto মুসলমানদের নিকট কেমন কেমন ঠেকা বিচিত্র নয়, কিন্তু এই ছিল আদি মুসলমানের motto. এই আদর্শ অনুসরণ করে চলে মুসলমানেরা এক সময় পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে শিক্ষিত উন্নত ও সভ্য জাতিতে গড়ে উঠেছিল। কোরাণে জ্ঞানের মহিমা বহুস্থানে কীর্ত্তিত হয়েছে। প্রথম Revelation সুরা 'ইকরা'য় লেখনীর প্রশংসা কীর্ত্তিত হয়েছে ; 'আল্‌লাজি আল্লামা বিল কলমে আল্লামাল ইনসানা মালাম ইয়ালাম' এ ছাড়া অসংখ্য হাদিসে জ্ঞানান্বেষণকে মুসলমানদের অবশ্য কর্ত্তব্য বলে নির্দ্দেশ করা হয়েছে, যথা :

> 'জ্ঞান চর্চ্চা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর পক্ষে ফরজ',
>
> 'জ্ঞানের অন্বেষণে আবশ্যক হলে চীনেও যাও',

www.pathagar.com

'শিশুকাল হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ কর',
'জ্ঞানের একটি বচন শত শত প্রার্থনার আবৃত্তির চেয়ে মহত্তর',
'জ্ঞানীর কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়েও পবিত্রতর',
'একটি বুদ্ধির কথা শিখা ও অন্য একজন মুসলমানকে শিখান, এক বৎসরের এবাদতের চেয়েও মূল্যবান',
'খোদা বুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্টতর আর কিছু সৃষ্টি করেনি',
'যে জ্ঞানান্বেষণের জন্য গৃহ ত্যাগ করে সে খোদারই পথে চলে',
'এক ঘণ্টা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ করা, সহস্র শহীদের জানাযায় যোগ দেওয়া বা সহস্র রজনী দাঁড়িয়ে উপাসনা করার চেয়েও বেশী পূণ্যের',
'জ্ঞানীকে যে সম্মান করে সে আমাকে সম্মান করে',
'যে শিক্ষার জন্য জীবন দান করে সে অমর'

বাস্তবিক অন্য কোন ধর্ম্মপ্রচারকই জ্ঞানকে এত উচ্চ আসন দেননি। এ ভাগ্যের এক ক্রূঢ় পরিহাস যে তাঁরই অনুবর্ত্তিগণ আজ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অশিক্ষিত মূর্খ ও নির্ব্বোধ বলে নিন্দিত।

ইস্‌লামে Reason-কে যে কত বড় স্থান দেওয়া হয়েছে তা' বলে শেষ করা যায় না। কোরাণের বহু স্থানে Reason-এর প্রতি appeal করা হয়েছে। আমার মনে হয় দুর্দ্দমনীয় জ্ঞান-স্পৃহা ও ব্যাকুল সত্যানুন্ধানই ইসলামের এক প্রকাণ্ড বিশিষ্টতা, ইব্‌নে রোশ্‌দের জীবনী-লেখক ফরাসী মনস্বী Renan লিখেছেন :

> 'There is nothing to prevent our Supposing that Ibn Roshd was a sincere believer in Islamism specially when we consider how little irrational the supernatural element in the essential dogmas of this religion is, and how closely this religion approaches puyest Deism.'

এই প্রসঙ্গে আমি ইস্‌লামের অন্যান্য দু'একটি বিশিষ্টতা সম্বন্ধে কিছু বলার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। ইসলাম অত্যন্ত সরল ধর্ম্ম। এতে প্রাণহীন আচার, অনুষ্ঠানের কোন স্থান নেই। পৌরহিত্য বা priesthood ইসলামে নেই। স্রষ্টা এবং সৃষ্টের মধ্যে কোন তৃতীয় বক্তিকে টেনে আনা হয়নি, জ্ঞান-শিক্ষা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরজ করার উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাল মন্দ স্বাধীনভাবে বিচার করতে শিখবে এবং অন্যের মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা খোদার নিকট নিবেদন করতে পারবে।

কোরাণের উদারতা বা 'catholicity' বিস্ময়কর, সত্যকে সর্ব্বত্রই সম্মান করা হ'য়েছে, কোরাণ ভিন্ন এমন উদারতাপূর্ণ পরমত-সহিষ্ণুতা অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থে দেখা যায় না। 'লা ইক্‌রা ফিদ্দিন' অর্থাৎ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনই বলপ্রয়োগ খাটিবে না। বিশেষ করে 'এমন কোন জাতি নেই যা'দের মধ্যে কোন prophet-এর আবির্ভাব হয়নি'—এই উদার ঘোষণার দ্বারা কোরাণ সমস্ত সঙ্কীর্ণতাকে চূর্ণ করে দিয়েছে। কোরাণের এই ঘোষণা বাণী মানলে স্বতঃই কি এ কথা মনে হয় না যে, ভারতের মত বিপুল মহাদেশে না জানি কত পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়েছে ! হিন্দুদের পর-ব্রহ্মের কল্পনা নিশ্চয়ই কোন পয়গম্বরের দান।

www.pathagar.com

ইসলাম সমস্ত মানবকে সমান চোখে দেখেছে। ধনী-নির্ধন, শ্বেত-পীতের ভিতর বিভিন্ন করেননি। এর ছায়া সুনিবিড় বুকে যে আশ্রয় মেগেছে তা'কে ফিরে যেতে হয়নি। ইসলামে কোন 'আশ্‌রাফ' 'আত্‌রাফ' নেই। বাস্তবিকই Islamic brotherhood মিথ্যা কাহিনী নয়। যদি কোন ধর্ম্ম সামাজিক জীবনে equality ও fraternity-র আদর্শ পৃথিবীতে প্রচার এবং শুধু প্রচার নয় কাব্যে পরিণত করে থাকে—সে ইসলাম। রাষ্ট্র-জীবনেও ইসলামের Democracy এক বিস্ময়কর বস্তু। পাদ্রী J.R. MOH ও তাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, The most perfect' form of Democracy has only been approached by Islam." 'খোলাফায়ে রাশেদিন' কি পৃথিবীর ইতিহাসের এক গৌরবময় পৃষ্ঠা নয়?

ইসলাম স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এর কোরাণিক বিধানগুলি মানুষের প্রবৃত্তি ও তা'র অবস্থার চির পরিবর্ত্তনশীলতার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রণয়ন করা হয়েছে। হজরত বলেছেন, 'আমি মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নই। যখন আমি তোমাদিগকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনো আদেশ দিই তা' গ্রহণ করবে, আর যখন সাংসারিক বিষয়ে কিছু বলি তখন মনে রাখবে আমিও মানুষ।' অন্যত্র দূর ভবিষ্যতের বিরাট আবর্ত্তন বিবর্ত্তন উপলব্ধি করেই যেন তিনি বলে গেছেন, 'তোমরা এমন যুগে এসেছ যে তোমাদিগকে এখন যা বলা হচ্ছে তার এক দশমাংশ পরিত্যাগ করলেই তোমাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত, কিন্তু এমন কালও আসবে যখন এখন যাহা বলা হচ্ছে তার এক দশমাংশ প্রতিপালন করলেই যে কেহ মোক্ষলাভ করতে পারবে।'

এই হাসিকান্না ভরা পৃথিবীতে সুখে-দুঃখে আন্দোলিত মানুষের জন্যেই ইসলাম। ইসলামের আদর্শ পূর্ণ মানুষ গড়ে তোলা। মানুষের কোন বিশিষ্ট কামনা-বাসনা দমন করে তার particular faculty-র development ইসলাম চায়নি। সমগ্র মানুষটিকে তার সহস্র কার্য্যকারিতার ভিতর দেখ্‌তে চেয়েছে ইসলাম। ইসলামে তাই তথাকথিত বৈরাগ্যের স্থান নাই।

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'—বিংশ শতাব্দীর যে সত্যান্বেষী কবি এ বাণী ঘোষণা করেছেন তিনি আমাদের মনে হয় আরবের হযরত মোহাম্মদের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

এই যে সুন্দর সুষ্ঠু ইসলাম পৃথিবীতে যে কী কল্যাণ বহন করে এনেছিল এক সময়, সে কথা ইতিহাসের বিষয় ; বিস্তারিতভাবে তার আলোচনা করবার দরকার নাই। এই বললেই চলবে যে মধ্যযুগে একমাত্র মুসলমানরাই পৃথিবীর সভ্যতা ও কালচার (culture) কে জীবিত রেখেছিল এবং তা'দেরি সাহিত্য, কলা দর্শন বিজ্ঞানের চর্চ্চা ও আবিষ্কার ইউরোপে Renaissance-এর যুগ আনয়ন করেছিল। বাস্তবিক Reason-এর আলোকসম্পাতে উজ্জ্বল করে ধরা, বুদ্ধির কুঞ্জি নিয়ে তার মর্ম্মকোষ থেকে নব নব আবিষ্কারের মণি আহরণ করাই ছিল তৎকালীন মুসলমানের আকুল স্পৃহা। Draper-এর মতে Essential characteristics of their (আরবদের) method were experiment and observation, এবং এর ফলে বিজ্ঞানের চর্চ্চায় তাঁরা কিরূপ অগ্রসর হয়েছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, এমন সব আবিষ্কারও তাঁরা করেছিলেন যা' বর্ত্তমান জগতকেও নূতন বলে সময় সময় তাক লাগিয়ে দেয়, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, তৎকালীন

www.pathagar.com

আরবীয় স্কুল কলেজ Evolution–এর doctrine পর্য্যন্ত পড়ানো হত যা এ যুগের বিস্ময়কর আবিষ্কার বলে সাধারণের ধারণা। এই Evolution–এর process আরবেরা অজৈব বা খনিজ দ্রব্যের মধ্যে পর্য্যন্ত দেখেছিলেন, বাস্তবিকই World culture–এ ইসলামের যে কী অপূর্ব্ব দান তা ভাবলে গর্ব্বানুভব না করে পারা যায় না। S.P. Scott বলেছেন, "Modern Science unquestionabily owes everything to Arab genius." এদিকে আলবেরুনীর 'ইন্ডিকা' পুস্তকের অনুবাদক Dr. Sachau বলছেন, "Were it not for Al-Ashari and Al-ghezali the Arabs would have been a nation of Galilos and Newtons.

কিন্তু বহুদিন মুসলমানেরা তাদের সভ্যতা বজায় রাখতে পারলে না যে বুদ্ধিবৃত্তি বা Reason–এর পরিচালনা ও অদম্য জ্ঞানস্পৃহা তা'দের উন্নতির কারণ হয়েছিল তা পরিত্যাগ করাই তাদের দুর্গতির কারণ হ'ল। ইল্‌ম ও ইমানের আদর্শ বিকৃত হয়ে গেল। শিয়া, সুন্নি, হাম্বল, হানাফী প্রভৃতি বহু সংখ্যক দল ও মতবাদের সৃষ্টি হয়ে ইসলাম শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। প্রত্যেক দল ভাবতে শুরু করলে যে প্রকৃত ইমান, বা ইসলাম তাদেরি ; অন্য পক্ষে মোতাজিলাবাদ তথা Rationalism বিলুপ্ত হয়ে গোঁড়ামি দেখা দিল. যে ইল্‌মকে কেবল 'ইল্‌মের' জন্যই আমল করা নারী–পুরুষের ফরজ করা হয়েছিল, সেই ইল্‌মের অর্থ সঙ্কীর্ণ করে শুধু 'দিনীয়াত' আলোচনায় সীমাবদ্ধ করা হল, ফলে স্বাধীন চিন্তা হারিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দর্শন–বিজ্ঞান, শিল্প–কলার দিকে কিছু contribute করতে না পারায় মুসলমানেরা সমস্ত বিষয়ে অন্যান্য জাতি হতে নীচে পড়ে গেল। জীবন্ত ইসলামের পরিবর্ত্তে এই আজ দেখতে পাই আচার–পদ্ধতির ইসলামের কঙ্কাল, আর প্রাণবন্ত মুসলমানের স্থানে তাই আজ দৃষ্ট হয় সংস্কারাচ্ছন্ন parrot মুসলমান বা মোল্লা, যার চিন্তার উৎস rituals বা dogmaর পাথর চাপে নিরুদ্ধ হয়ে গেছে। একটু চিন্তা করলে দেখা যাবে এই যে পরবর্ত্তী যুগের ritualistic ইসলাম, এ মানবের কোন কল্যাণে আসেনি। পরন্তু মুসলমান জাতিগুলির মধ্যে এক অভিসম্পাতের মত কাজ করেছে।

কিন্তু যে জাতির ভিতর জীবনের ধারা একেবারে শুষ্ক হয়ে যায়নি তার মৃত্যু নেই। যে ধর্ম্মের ভিতর শাশ্বত সত্যের অচঞ্চল আলো ঘুমিয়ে আছে, তা আবার কোন শুভ মুহূর্ত্তে প্রদীপ্ত হয়ে জ্বলে উঠবে। সাড়া পাওয়া যায় মুসলমানদের প্রাণ স্পন্দন যেন stethoscope–এ ধরা পড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যতার সংস্পর্শে এসে মুসলমানদের লুপ্ত চিন্তাশক্তি যেন ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠছে। আবার 'দেশ দেশ নন্দিত করে' ইসলামের ভেরী যেন তাই মন্ত্রিত হয়ে উঠছে। ইসলামের এই নবজাগরণ ইউরোপের protestantism–এর সঙ্গে তুলিত হওয়ার যোগ্য।

বর্ত্তমান যুগ হয়েছে বুদ্ধির যুগ। এই Rationalistic World culture ই ইউরোপীয় জাতিগুলির intense nationalism–এর আদর্শের সংস্পর্শে এসে তুরস্ক, আরব, আফগানিস্থান, ইজিপ্ট প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলির মধ্যে নব জাগরণের বান এসেছে। তুরস্কে পৌরোহিত্য প্রথা বর্জ্জন ইসলামের প্রকৃত আদর্শানুযায়ী–ই হয়েছে। খেলাফত খোলাফায়ে রাশেদিনের সঙ্গ সঙ্গেই শেষ হয়েছিল। পরে স্বার্থান্বেষী লোকেরা পরবর্ত্তী যুগের এই

www.pathagar.com

অন্তঃসারশূন্য খেলাফতকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এই bogus খেলাফত থাকায় মুসলমান জগতের ক্ষতিই হয়েছে উপকার হয়নি। Pan-Islamism–এর idea ও মুসলমান জগতের সত্যিকার কোন উপকার করতে পারেনি, তুরস্ক এসব খেয়ালিপনার স্বপ্ন ত্যাগ করে খেলাফত, Pan-Islamism প্রভৃতি বর্জ্জন করে ভালই করেছে। ভারতীয় অনেক মুসলমান 'তুরস্কে ইসলাম আর State-religion নয়' এই ঘোষণার জন্য মুস্তফা কামালের প্রতি দোষারূপ করে থাকেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এটা ভালই হয়েছে। যে State–এর অধীনে বহু ধর্ম্মাবলম্বী লোকের বাস তার কোন বিশেষ ধর্ম্মমতকে favour করা সঙ্গত নয়। বিশ্বমানবতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তুরস্ক এই পরিবর্ত্তন করতে সমর্থ হয়েছে এবং মনে হয় ভবিষ্যতে সমস্ত State এই তুরস্কের এই উদাহরণ অনুসৃত হবে। যদি British Government ঘোষণা করেন যে আজ হতে Christianity (Church of England) আর State religion নয় তা হলে হিন্দু মুসলমান উভয়েই কি সন্তুষ্ট হয় না? এ খুবই আশার বিষয় যে সমস্ত মুসলিম দেশগুলি Time spirit–কে অনুসরণ করে চলবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও Rationalism–এর প্রসার লক্ষিত হয়। ভারতে আন্দোলন খুব ধীরে চলছে তথাপি মনে হয় এর উন্নতি অনিবার্য্য। স্বাধীন চিন্তার হাওয়া বাংলাদেশেও যে এসেছে তার পরিচয় এই ঢাকা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' হতেই পাওয়া যায়।

এখন বাঙ্গালী মুসলমানদের অবস্থা কিছু আলোচনা করে দেখা যাক। প্রথমেই চোখে পড়ে শারীরিক মানসিক, আর্থিক, সামাজিক, এককথায় এদের সর্ব্বাঙ্গীন দুর্দ্দশার ছবি। অথচ এদের দুর্দ্দশা বোঝবার মত শক্তিও যেন এরা হারিয়ে ফেলেছে। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের অবস্থা ভাল না হলেও এদের চেয়ে ভাল। বাঙ্গালী মুসলমানেরা একরূপ চাষী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে। শিক্ষিতের সংখ্যা এত কম যে তা বলতেও লজ্জা হয়। এই শিক্ষাহীনতার জন্য মোল্লা, মোক্তার, উকিল, জমিদার, তালুকদার, মহাজন প্রভৃতি এদের অহরহ শোষণ করতে পারছে এবং এই সমস্ত লোকের এক স্বার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে এদের মূর্খ রাখা। এই সব শোষকদের মধ্যে মোল্লারাই হয়েছে সবচেয়ে ভীষণ। এরা টাকাত নিচ্ছেই অধিকন্তু ভ্রান্ত আদেশ নির্দ্দেশের বেড়াজাল এদের ভবিষ্যত উন্নতির পথও বন্ধ করে দিচ্ছে।

তথাকথিত আলেমগণের শিক্ষার ফলে মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহরূপে এক পরকালের মোহ সৃষ্টি হয়েছে। এদের ধারণা হয়েছে এ পৃথিবী তাদের নয়; যারা যত ইমানদার খোদাতালা পৃথিবীতে তা'দের তত রোগ শোক কষ্ট দিয়ে পরীক্ষা করেন, এবং যারা এখানে যত কষ্ট ভোগ করেন পর জগতের তারা তত বেশী সুখ ভোগ করবেন। এই পরকালের মোহ, বাস্তবের প্রতি সেই নিদারুণ উদাসীনতারই ফল (lamentable lack of appreciation of stern realities of life) যা' বর্ত্তমানে মুসলিম জগতকে ছেয়ে ফেলেছে। এরূপ শিক্ষা প্রকৃত ইস্‌লামের পরিপন্থী। এ পৃথিবীকে মুসলমানদের ভাল করে চিনতে হবে। যে সব সুন্দর জিনিষ পৃথিবীর দেবার আছে তা খোদার দান বলে কৃতজ্ঞ মনে গ্রহণ করতে হবে এবং ইনছানের উপকারার্থে সেগুলি লাগাতে হবে। এই জগতই আমাদের একমাত্র ও প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র একথা ভুললে চলবে না।

www.pathagar.com

এদিকে অতীতের মোহ মুসলমান সমাজকে এক অভিশাপের মত পেয়ে বসেছে। এ পৃথিবীতে আমরা আছি এটা যেমন সত্য, বর্ত্তমানে আমাদের কাজ করতে হবে এটাও তেমনি সত্য। অথচ আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের গৌরব-কাহিনী কীর্ত্তন করেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছি। অতীতের গাথা আমাদের বুকে যেন কেবলমাত্র আশার গীতি জাগিয়ে তোলে, বর্ত্তমানের পথে চলার যেন প্রেরণা যোগায়। Let us live in the present with an eye to the future. এই সম্পর্কে মুসলমানদের যে চেহারাটা মনে জাগে সেটা এই যে তারা যেন 'না ঘাটকা, না ঘরকা', শত শত বৎসর তারা এদেশে আছে অথচ তাদের দৃষ্টি যেন আরবের খেজুর বন ও পারস্যের দ্রাক্ষা কুঞ্জে নিবদ্ধ। ফলে ভারতীয় বলে নিজেদের ভাবতে পারছে না অথচ আরবী ফারসী হতে পারছে না। মাতৃভূমিকে স্বর্গাদপী গরিয়সী বলে তারা এখনও ভাবতে শিখেনি। রাস্তা দিয়ে হিন্দু মুসলমান যুবকরা যখন চলে আমি অনেক সময় লক্ষ্য করেছি, হিন্দুদের চলাফেরা দেখে মনে হয় তারা যেন নিজের দেশের মাটির উপর দিয়ে চলেছে—দেশ যেন তাদেরই। আর মুসলমানেরা এমনভাবে চলে যেন তারা এখানকার মুসাফির। এ হতভাগ্য 'কওম' কি এখনও ভাববে না যে বাংলা যদি তার দেশ নয়—আরব পারস্য আফগানিস্তান যদি তার দেশ নয় [সে সব দেশ যে তার নয় তা'কি সেবারকার হিজরতের পরেও বুঝবে না?] তবে কি সে শূন্যে বাসা নির্ম্মাণ করবে?

দেশকে পর করে দিয়ে দেশের ভাষা মাতৃভাষাকেও মুসলমানেরা ঘৃণার চক্ষে দেখেছে। যদি মাতৃভাষার সঙ্গে বাঙ্গালী মুসলমানদের নিবিড়ভাবে পরিচয় থাকত, দেশপ্রেম বোধহয় অন্তরে তার জাগরিত হত। কিন্তু বাংলাকে সে এতদিন উপেক্ষা করেছে ; তাই তার চিন্তাশক্তি প্রসার লাভ করতে পারেনি। হিন্দুস্থানের মুসলমানেরা যতটুকু উন্নতি করতে পেরেছে আমার মনে হয় তা' তাদের মাতৃভাষা উর্দ্দু-চর্চ্চার ফলে। তাদের ভিতর বহু চিন্তাশীল লেখক, কবি, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ জন্মগ্রহণ করেছেন কিন্তু বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে এরূপ কোন লোক জন্মেনি বলা অন্যায় হবে না। বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষাকে অবহেলা করার দুর্ব্বুদ্ধি কেন হল? অথচ পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের মুসলমানেরা বাংলা সাহিত্যের উন্নতি কল্পে কি করেছেন তা' বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণের জানা আছে। দিগ্বিজয়ী মুসলমানেরা যখন পারস্য জয় করেন—তাঁরা পারস্য ভাষাকে আরবী অক্ষরে গ্রহণ করেন। ভারতে এসে তাঁরা হিন্দিকে গ্রহণ করে আরবী অক্ষরে লিখতে আরম্ভ করেন। এই ভাষাই উর্দ্দু নামে পরিচিত। বঙ্গদেশে এসে তাঁরা বাংলাকেও আরবী অক্ষরে লিখতে আরম্ভ করেন। এই চেষ্টা বিশেষ-ভাবে চট্টগ্রামে শুরু হয়েছিল। অবশ্য এ চেষ্টা সফল হয়নি। রাজভাষা উর্দ্দু ফারসীর প্রচলন ক্রমে অধিকতর হয়ে উঠলো, মুসলমানদের ভাষা সাহিত্যের সফলতার পরাকাষ্ঠা দেখা যায় পারস্য ভাষার ব্যবহারে। ফারসী ভাষার উন্নতি ভাষা সাহিত্যে অতুলনীয়। উর্দ্দুরও উত্তরোত্তর উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু বাংলার কিছু উন্নতি হয়ে উঠল না। কারণ উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানেরা বাংলা ভাষাকে বরাবরই তাচ্ছিল্যের চক্ষে দেখে আসছিলেন। কিন্তু আমাদের নিরক্ষর গ্রাম্য কবিরা যে সব সুন্দর কবিতা সঙ্গীত গাথা, রচনা করতে পেরেছিলেন তা'র লালিত্য, মাধুর্য্য, কমনীয়তা অপূর্ব্ব। ময়মনসিংহ ballads-এর মধ্যে মুসলমান কবিদের বহু রচনা আছে। সাহিত্য রসিকদের মতে পূর্ব্ব বঙ্গের এই সব গীত ও গাথা

www.pathagar.com

অমূল্য বস্তু যখন মিলামিশায় হিন্দু মুসলমান পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বন্ধনের সূত্রপাত হয়—একে অন্যের আচার পদ্ধতিগুলিকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করে—কখনও বা অনুকরণ করতে থাকে—তখনই পণ্ডিত ও মোল্লারা religion in danger বলে চীৎকার করে ওঠে, তখনই আবার Reaction আরম্ভ হয়। এই reaction-এর ফলে আমাদের গ্রাম্য কবিদের কবিতার উৎস শুষ্ক হয়ে গিয়েছে। যদি হাফেজ প্রভৃতির কবিতরা 'ময়' 'সাকি' ও 'ময়খানা' ইত্যাদি আধ্যাত্মিক অর্থে গৃহীত হতে পারে, 'রাই' 'কানু' 'ত্রিবেণী' ইত্যাদির অর্থ আধ্যাত্মিকভাবে নিলে কী যে অনর্থ সাধিত হয় বোঝা কঠিন। কত যে প্রতিভা এই reaction-এর ফলে অকালে বিনষ্ট হচ্ছে তা ভাবতেও কষ্ট হয়। যে গীত রচনা করতে পারে তাকে তা করতে দেওয়া হবে না, যে গাইতে জানে তাকে গাইতে দেওয়া হবে না. যে চিত্রাঁকতে পারে তাকে চিত্র আঁকতে দেওয়া হবে না, যে অভিনয় করতে জানে তাকে সে শক্তির বিকাশ করতে দেওয়া হবে না—পদে পদে বাধা বিপত্তি। ফল এই হয়েছে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে হাসি ও আনন্দ এক কথায় 'Joi de vivre' নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এই সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে সাহিত্য শিল্পের বিকাশ অসম্ভব, বাঙ্গালী মুসলমানের তাই সাহিত্য প্রভৃতি কিছুই নাই বললেই চলে। কলা, শিল্প. সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য স্বাধীন চিন্তা Freedom of thought and expression-এর একান্ত আবশ্যক।

এই মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য গ্রামে গ্রামে বাধ্যতামূলক বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। যে Primary education বা প্রাথমিক শিক্ষার আলোচনা চলছে তার প্রচলন যত শীঘ্র করা হয়, ততই মুসলমানদের মঙ্গল। Literacy-তে মুসলমানেরা Repressed class-এর হিন্দুদের চাইতেও নিম্নে। ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থের সঙ্গে তুলনা করা চলেই না। কেননা তাদের স্ত্রী পুরুষ ধরতে গেলে Cent percent-ই literate. Literacy-র প্রসার না হ'লে সমাজের উন্নতি হবে না—সমাজের চিন্তা করবার শক্তি আসবে না, অথচ সমাজের চিন্তা করবার শক্তি যে পর্য্যন্ত না আসে, বা বৃহৎ কল্পনা বা idea তাকে অনুপ্রাণিত না করে সে পর্য্যন্ত এর উন্নতির কোনই আশা নেই। সামাজিক বা জাতীয় জীবনে আর্থিক অভাব তত গুরুতর নয়, যত গুরুতর এই চিন্তা বা ভাবের দৈন্য। মাতৃভাষার ভিতর দিয়ে বর্ত্তমান জগতের ভাবধারার সাথে পরিচিত করে দিতে হবে আমাদের সমাজকে—তা হ'লেই আমাদের উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া সহজ হবে। জার্ম্মান কবি Goethe-র কথাটি যেন আমাদের মনে থাকে, 'It is easy to act but difficult ot think' বাস্তবিকই যে জাতি যে দিন থেকে চিন্তা করতে শিখেছে সেই দিন হতে তার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি দেখা দিয়েছে। জার্ম্মান জাতির ইতিহাস এ বিষয় খুব উপদেশাপূর্ণ।

ধর্ম্মজ্ঞান সম্বন্ধে বলা চলে যে, যে পর্য্যন্ত না আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থগুলি মাতৃভাষায় অনূদিত হয়, সে পর্য্যন্ত আশা করা বৃথা যে আমরা সত্যিকার ধার্ম্মিক হ'তে পারবে। Europe-এ eformantion এসেছিল Bible vernacular-এ তর্জ্জমা হওয়ার পরে। আজ বাংলা সাহিত্যকে হিন্দু সাহিত্য বলে আমরা আক্ষেপ করে থাকি, যদি উর্দ্দু ফারসীর মোহ ত্যাগ করে বাঙ্গালী মুসলমানেরা নিজেদের মাতৃভাষা শিখবার চেষ্টা করতে তাহলে তাদের এ আক্ষেপ করতে হতো না ; অথচ মাতৃভাষা শিক্ষা করা কী সহজ !

www.pathagar.com

শুধু কয়েকটি অক্ষর পরিচয় হলেও একটা ভাষা শিখা যায়। ব্যাকরণের কোন বালাই নেই। সামান্য অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গেই একটি সাহিত্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। আজ কাল বাংলা বইগুলিও এমন ভাষায় লেখা হচ্ছে যে, তা বুঝতে কারও কষ্ট হয় না। Law of demand and supply অনুসারে একটি বিরাট মুসলিম সাহিত্যের অচিরেই সৃষ্টি হবে। অর্থনীতি, সমবায়, কৃষি, স্বাস্থ্যনীতি, পশু চিকিৎসা প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে মুসলমানদের জানা একান্ত আবশ্যক। এসব বিষয়ে সহজ ভাষায় বই লিখতে হবে। তা'হলে আমাদের কৃষকদের জীবন সুস্থ, সরল ও সুন্দর হ'য়ে উঠবে। আমাদের এ কথা মেনে নিতে হবে যে, মাতৃভাষার মত এমন আবশ্যকীয় তথা পবিত্র ভাষা আর নেই।

আরবী ফারসী উর্দু বা মাদ্রাসা মক্তবের মোহে পড়ে মুসলমানদের যে কি অনিষ্ট সাধন হচ্ছে তা বলে শেষ করা যায় না। এই শিক্ষাতে বুদ্ধি কোনরূপ প্রসার লাভ করতে পারে না। এতে অযথবা সময়, শক্তি ও অর্থের অপব্যয় হয়। Dr. Stoddard তাই এই শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে যা বলেছেন তা প্রনিধানযোগ্য।

'The traditional education in the entireorient from Moroco to China was a mere memorising of sacred tests combined with exercises of religious devotion. The Mahomedan or Hindu student spent long years reciting to his master (a 'holy man') interminable pasages from books which being written in classic Arabie or Sanskrit, were unintelligible to him, so that he usally did not understand a word of what he was saying. No more deadening system for the intellect could possibily have been devised. Every part of the brain except the memory, at rophied and the wonder is that any intellectual or original thinking ever appeared.'

অনেক সময় আমাদের মাদ্রাসার ছাত্রদের অবস্থা, তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মনে কষ্ট হয়, দেখেছি গ্রীষ্মে শীতে বর্ষায় বড় বড় কেতাব নিয়ে এইসব ছেলেদের মাদ্রাসায় যেতে, মুখে তাদের ক্ষুধার চিহ্ন, গায়ে উপযুক্ত বস্ত্রের অভাব—জায়গীরে থেকে দশ বার বছর কষ্ট করে পড়ছে। অথচ তাদের ভবিষ্যত কি? স্মরণ আছে একবার কোন District Board-র Meeting-এ প্রস্তাব হয়েছিল যে New Scheme মাদ্রাসার experiment-এর জন্য সাহায্যবন্ধ করে নিয়ে Ded scheme মাদ্রাসায় সাহায্য দেওয়া হোক। কারণ New scheme মাদ্রাসায় পড়া যুবকরা জানাজার নামাজ পড়াতে পারে না!! এতে মনে হয় যেন সমস্ত মুসলিম বঙ্গ মৃত বা মৃতপ্রায় হয়ে আছে, কেবল আমাদের মৌলবী মৌলানা সাহেবেরা দয়া করে জানাজা পড়ে কবরস্থ করলেই হয়। আজকাল মাদ্রাসার সংখ্যা খুব বেড়ে যাচ্ছে। এক গ্রামে একটি মাদ্রাসা হলে অন্য গ্রামের লোকেরা অন্য একটি না খুলতে পারলে তাদের মানের লাঘব হয় বলে মনে করে। আমি দেখেছি গ্রামে গ্রামে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে আর District Board-এর Free Primary School ছাত্রাভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বহু কারণে আমাদিগকে ত্যাগ করতে হবে। এই গোটা system-টিই বিজ্ঞানসঙ্গত নয়। Stoddard থেকে ইতিপূর্ব্বে যে quotation দেওয়া গেছে তা থেকেই

www.pathagar.com

বেশ বোঝা যায়। যদিও New Scheme মাদ্রাসা Old scheme মাদ্রাসার তুলনায় মন্দের ভাল বলা যেতে পারে, তবুও আমার বিশ্বাস পরিণামে এও মুসলমানদের জন্য অনিষ্টকর হবে। জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের সমস্ত শক্তিই নিয়োজিত করতে হবে এই জীবন সংগ্রামের জন্য। এখানে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে অহর্নিশি জীবনমরণ সংগ্রাম চলছে। এই যুদ্ধে জয়ী হতে হলে অযথা শক্তির অপচয় করলে চলবে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের শিক্ষাদীক্ষা জীবনচালন প্রণালী গঠন করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষা এই জীবন যুদ্ধের জন্য আমাদিগকে কতটা উপযুক্ত করে গড়তে পারে তা বিবেচনার বিষয়। এতে ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি প্রভৃতি modern subjects শিক্ষা দেওয়ার সুবিধা নাই। অথচ এগুলি শিক্ষা না করলে বর্ত্তমান জগতে জীবিকা অর্জ্জনই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অন্য পক্ষে এখানে এমন কতকগুলি ভাষা ও বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় যা বাঙ্গালীর জীবিকার্জ্জনের জন্য আদৌ আবশ্যকীয় নয়। এই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি আমাদের মুসলমানদের অতিরিক্ত নজর থাকাতে শিক্ষা বিষয়ে তথা আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে প্রতিবেশী হিন্দুদের চাইতে অনেক পিছনে পড়ে যাচ্ছি। তাই আমার বক্তব্য যে, আরবী ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থা Classics রূপে স্কুল কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে হওয়াই যথেষ্ট। মাদ্রাসা শিক্ষার আবশ্যকতা কি? যদি ধর্ম্মজ্ঞান বিস্তারের জন্য এর আবশ্যক হয় সে উদ্দেশ্য তথাকথিত মাদ্রাসায় সাধিত হচ্ছে না। সে জন্য দরকার মাতৃভাষায় ধর্ম্মগ্রন্থগুলির অনুবাদ। কেননা একমাত্র তাতেই সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ধর্ম্ম-শিক্ষা সম্ভবপর হবে। যদি Classics পড়ার জন্য এর আবশ্যক হয়—সে উদ্দেশ্য সাধিত হবে এগুলি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে ইউনিভার্সিটিতে পড়ালে, বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পড়া হয় বলে আজকাল আরবী ও সংস্কৃতের চর্চ্চা জার্ম্মানি ও ফ্রান্সে যেরূপ হয় আরব বা ভারতে সেরূপ হয় না।

State দেশের দশজনের জন্য, তার অনুষ্ঠানগুলিও সাধারণের উপকারের জন্যই। সেগুলি ভাল না হলে দেশের প্রয়োজনানুসারে তাদের সংশোধন করা যেতে পারে, কিন্তু সেগুলিও boycott করে স্বতন্ত্র অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করতে যাওয়া মারাত্মক। গবর্নমেন্ট প্রবর্ত্তিত ইউনিভার্সিটি যদি মুসলমানদের সমস্ত অভাব পূরণ করতে না পারে তা হলে ইউনিভার্সিটির আবশ্যকানুযায়ী সংস্কার করে নেওয়া দরকার, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া কিছুতেই সঙ্গত নয়।

আমাদের মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাল্য-বিবাহ পর্দ্দা সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বেই অনেক আলোচনা হয়ে গেছে। নূতন করে এ বিষয়ে বলবার কিছুই নেই। তবুও অতি সংক্ষেপে দু'চারটি কথা বলতে হচ্ছে। কেননা কিছু না বললে কেউবা মনে করেন বিষয়টিকে আমি ততটা গুরুতর বলে মনে করি না। ঠিক তার উল্টো-ভারতীয় মুসলমানের জন্য পর্দ্দা ও স্ত্রী শিক্ষা সমস্যা যেরূপ গুরুতর হয়ে উঠেছে এরূপ আর দ্বিতীয়টি নেই। একথা আজ সর্ব্ববাদীসম্মত যে শিক্ষা ব্যতীত জাতির উন্নতি অসম্ভব। অন্যপক্ষে পর্দ্দা উঠিয়ে না দিলে তাদের উপযুক্ত শিক্ষার ও স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা করা অসম্ভব এটাও প্রমাণিত হয়েছে। এই সব খেয়াল করে উন্নততর মুসলিম দেশগুলি পর্দ্দা তুলে দিয়েছে, এবং মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। বাস্তবিকই মেয়েদের শিক্ষা না দিলে দেশের মঙ্গল কি করে সম্ভবপর হবে? মেয়েরা পঙ্গু হয়ে রইল তা নয়—বাকী অর্দ্ধেকও অকেজো হয়ে পড়ে। এ

www.pathagar.com

পর্য্যন্ত মেয়েদের আমাদের দেশে কেবল Child bearing machine করে রাখা হয়েছে। কিন্তু একটা machine-এর দ্বারাও ভাল কাজ পাবার জন্য তার যতটা যত্ন নেওয়া দরকার মেয়েদের প্রতি তাও আমরা নেইনি। সুন্দর স্বাস্থ্যবান সন্তান ধারণ করতে হলে মাকে স্বাস্থ্যবতী হতে হবে, কিন্তু কি আমাদের মেয়েদের স্বাস্থ্য কোথায়? অস্বাস্থ্যকর গৃহে আজীবন বদ্ধ থাকার দরুন তাদের মনও দিন দিন সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে—তাদের স্বাস্থ্যও তেমনি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। Dr. Bentley প্রভৃতির Health report দেখলে জানতে পারা যায় যে কী ভয়াবহরূপে মুসলমান মেয়েরা যক্ষ্মা রোগে মারা যাচ্ছে। এর একমাত্র কারণ খোলা হাওয়া ও আলোর অভাব-অর্থাৎ পর্দ্দা। এদিকে এই স্বাস্থ্যহীনা মেয়েরা যেসব সন্তান প্রসবন করছেন তারা স্বভাবতই হীন স্বাস্থ্য নিয়ে এসে জাতিকে দুর্ব্বল করে ফেলছে। বাস্তবিক এই পর্দ্দা যে কী ঘৃণিত অনুষ্ঠান তা ভাবতেই লজ্জা হয়। এটি নারীত্বের প্রতি এক নিদারুণ অপমান বা Standing insult স্বরূপ। এ সর্ব্বক্ষণই যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে যে Sese-life ছাড়া অন্য কোন জীবন মেয়েদের নেই। এই পর্দ্দা প্রথার ফলে আমার মনে হয় আমাদের মেয়েদের অতি অল্প বয়সেই sex consciousness এসে পড়ে। এখনও এইসব কুৎসিত প্রথা বাঁচিয়ে রাখায় ভারতীয় মোসলেম সমাজকে মধ্যযুগের যাদুঘর বা museum বলেই মনে হয়। যদি মানুষ হিসাবে মেয়েদের দাবীর কথা আলোচনা করা যায়—তা হলে বলতে হয় পুরুষের কোন অধিকারই নেই মেয়েদের এরূপ আটকে রাখার। যদি ধর্ম্মের কথা বলা হয়—তা হলে দেখতে পাই ইসলামে এমন কোন নির্দ্দেশ নেই যাদ্বারা এইরূপ অবরোধ প্রথা সমর্থন করা চলে। যদি এর ভালমন্দের আলোচনা করা হয় তা' হলে দেখতে পাই এর চাইতে অনিষ্টকর institution মানুষের কল্পনা কোথাও কোন দিন সৃষ্টি করেনি।

মেয়েদের শিক্ষার দরকার কেন? যদি মেয়েদের আর কিছুই না হতে হয়, তাদের গৃহিনী ও মাতা এ দুটি ও নিশ্চয়ই হতে হবে। শিক্ষার অভাবে তারা বর্ত্তমান জগতের প্রয়োজনানুযায়ী সুগৃহিনী হতে পারছে না। সুজননী ত নয়ই। শিক্ষা না পাওয়ায় তাদের মনের প্রশস্ততা জন্মাতে পারে না; এমনকি স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ যে জ্ঞান সকলের থাকা দরকার তাও তাদের হয় না। সে কারণে কি গৃহস্থালী কি সন্তান-পালন কোনটাই তারা সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারে না। মায়েদের অজ্ঞতার দরুণ অনেক শিশুই যে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তা বোধহয়, আমরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হতে সাক্ষ্য দিতে পারবো। এই গেল সাধারণ গৃহস্থালী কাজের জন্য শিক্ষার আবশ্যকতা। কিন্তু এ সামান্য শিক্ষাই মেয়েদের জন্য যথেষ্ট নয়। বৃহত্তর জাতীয় জীবনে যোগ দেওয়ার জন্য তাদের উচ্চ শিক্ষা পেতে হবে। স্বামীর সহধর্ম্মিনী, সহকর্ম্মিনী হবার জন্যে স্বামীর উপযুক্তা তাকে হতে হবে। পণ্ডিত স্বামীর স্ত্রী মূর্খ হলে সে সংসার সুখের হতে পারে না। মূর্খ স্ত্রী পণ্ডিতের কিরূপ ভাবে সহকর্ম্মিনী হতে পারে? বিশেষ কথা আমাদের দৃষ্টিকে বিস্তৃত করবার সময় এসেছে, ক্ষুদ্র সংসার প্রাঙ্গন ছেড়ে বৃহত্তর জাতীয় জীবন—তার সমাজ ও সভ্যতার বিষয় ভাবতে হবে। নারীর শারীরিক বীর্য্য, বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি হেলার বস্তু নয়। তার সেই ঘুমন্ত শক্তি পুরুষের শক্তির সঙ্গে মিলিত করতে হবে; তা' হলেই জাতির কল্যাণ হবে। আজ ইংরেজ, আমেরিকান, তুর্কী প্রভৃতি জাতির কথা ভাবলেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়।

www.pathagar.com

অন্য বিষয়ে আলোচনা করবার পূর্ব্বে বাল্যবিবাহ তথা শুদ্ধ আইন সম্বন্ধে দু'টি কথা বলা বোধহয় অবান্তর হবে না। বাল্যবিবাহ যে দূষণীয় এতে সন্দেহ নাই। এতে একদিকে যেমন মেয়েদের স্বাস্থ্য এবং তজ্জন্য সন্তানের স্বাস্থ্য খারাপ করে, অন্যপক্ষে মেয়েদের শিক্ষায় ভয়ানক বাধা জন্মায়। তা হলে পর্দ্দা আইন সম্বন্ধে এত আপত্তি কেন? Othtodox party বলেছেন সমাজ নিজে ধীরে ধীরে এ প্রথা ত্যাগ করবে, সে জন্য আইন করা কেন? কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে বলতে গেলে শাস্ত্র ও শরিয়ত প্রপীড়িত ভারতে আইন ছাড়া কি এ দূর করার সম্ভাবনা আদৌই আছে? আইন না হলে সতীদাহ প্রথা এতদিনে উঠে যেত কি? মুসলমানদের ত বাল্যবিবাহ সম্বন্ধে আইন হওয়ায় কোন আপত্তিই থাকতে পারে না। কারণ ইসলামের বিধি অনুযায়ীই বাল্য বিবাহ একরূপ হতে পারে না। মুসলমান সমাজের বিবাহ social contract বা Civil marriage-এর মত, তা' হলেই বোঝা যায় contracting parties নিশ্চয়ই বালেগ বালেগা হবেন—না হলে free consent দেওয়া সম্ভব কি? Muhammedan Law-তে adult marriage সম্বন্ধে যেরূপ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে এমন আর কোথাও নেই। বাপ ও দাদা ভিন্ন অন্য কেউ না বালেগো অবস্থায় কোন মেয়ের বিয়ে দিলে বালেগা হওয়া মাত্র সে মেয়ে ইচ্ছা করলে সে বিয়ে বাতিল করে দিতে পারে। মুসলমান আইনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এই যে, উপযুক্ত বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়, পিতা পিতামহের discretion-এর জন্য একটা exception clause রাখা হয়েছে মাত্র। কিন্তু এই discretion অনেক স্থলে স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয়েছে। অনেক সময় নিজ নিজ স্বার্থের বশীভূত হয়ে পিতা পিতামহ অল্প বয়সের মেয়েদের অনুপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করে তাদের সমস্ত জীবন নষ্ট করে দিচ্ছে। সময় এসেছে পবিত্র ইসলামিক আইনের মহান উদ্দেশ্যের ধারার অনুসরণ করার, যারা শুধু literal sense নিয়ে ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার প্রয়াস পান, তাঁরা ভেবে দেখেন না যে ইসলামের কতদূর অনিষ্ট করছেন।

নারী সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের সমাজের অনেক হিতৈষীরা এ পর্য্যন্ত বহু প্রবন্ধ লিখেছেন ও বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু কার্য্যকালে কেউই বিশেষ কিছু করেনি। তাঁরা বোধ হয় ভুলে যান যে an ounce of example is worth a ton of precepts. যা ন্যায় বলে মনে করা যায় তা না করার চাইতে কাপুরুষতা নেই।

মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা সবচেয়ে হৃদয় বিদারক, অর্থই জাতির শোণিত wealth is the blood of a community. যদি কোন লোকের শরীর কোন জখম হয় এবং তা হতে ক্রমাগত রক্তপাত হতে থাকে তা হলে যেমন তার মৃত্যু অনিবার্য্য মুসলমানদেরও শোণিতরূপ অর্থ ক্রমাগত বের হয়ে তারা যেরূপ নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে এবং তা নিবারণার্থে যেরূপ কোন ব্যবস্থা করাও হচ্ছে না, তাতে এ সমাজ সত্বরই ধ্বংস মুখে পতিত হবে, ধীরভাবে আমাদের সুদ সমস্যাটিকে বিচার করে দেখা কর্ত্তব্য। অর্থাভাব হেতু আমাদিগকে ক্রমাগত মহাজনের নিকট হতে ঋণ করে সুদ দিতে হচ্ছে। কিন্তু হারাম বলে ঋণ দিয়ে সুদ নেবার বিধি আমাদের নেই। কি spirit-এ রেবা নিষিদ্ধ হয়েছিল এবং কোন সুদ রেবা, তা বিবেচনা করে না দেখে আমরা শনৈঃ শনৈঃ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছি! যাতে লোকের উপর জুলুম করা হয় এরূপ সুদ গ্রহণ করা পাপ। কোরানের মধ্যে usury condemn করা হয়েছে।

www.pathagar.com

'ইয়া আইও হাল্‌ লাজিনা আ' মানুলা তা' কুলুরেবা আ'দ্‌–আ–ফাম মুদা–আ–ফাতান্‌। 'Do not devour usury making addition again and again or doubling and redoubling.'

Banking system–এর সুদে ব্যক্তিবিশেষের উপর জুলুম হয় না, কাজেই আমাদের এটাকে বেরা বলে হারাম করা সঙ্গত হবে না। অন্যপক্ষে বাজার দর সুদ market rate of interest নিয়ে কর্জ্জ দেওয়াও অসঙ্গত বোধ হয় না। আমার কোন বন্ধুর কথা জানি, যিনি provident Fund–এর সুদ হারাম মনে করে বছরে হাজার টাকা করে গবর্নমেন্টকে ছেড়ে দিচ্ছেন। এখন মনে করুন এই টাকাগুলি মুসলমান শিক্ষার জন্য কিংবা এই দুর্ভিক্ষের দিনে Relief work–এ ব্যয়িত হ'লে কি দেশের উপকার হত না? বালুর ঘাটের দুর্ভিক্ষের সময় সে বন্ধুকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম যে তুমি এ টাকা নিয়ে নিজে ব্যবহার না করে এই দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িতদের অন্ন বস্ত্রের সংস্থানের জন্য ব্যয় কর। কিন্তু বন্ধুবর কিছুতেই সম্মত হলেন না। এরূপ কত লক্ষ লক্ষ টাকা যে মুসলমানেরা নিজেদের নিবুর্দ্ধিতার জন্য হারাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ এই সমাজের লোকই অন্নাভাবে মরছে, অর্থাভাবে পীড়িতদের চিকিৎসা হচ্ছে না এবং সহস্র সহস্র মেধাবী ছেলে মেয়েদের শিক্ষার সংস্থান হচ্ছে না। মুসলমানদের রেবার বিকৃত অর্থ করে যে–কোন সুদকে নিষিদ্ধ মনে করায় গোটা সামাজিক জীবনে লাভ ও ক্ষতি যার উপরে ভিত্তি করে সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য চলে সেই লাভ ও ক্ষতির ধারণাটি তাদের ভিতর লোপ পেয়ে গিয়েছে। ফলে মুসলমানেরা বেহিসেবী হয়ে পড়েছে। তাই তাদের ভিতরে দেখা যায় অমিতব্যয়, অপব্যয়, সঞ্চয়ের প্রতি উদাসীনতা।

বাঙ্গালী মুসলমানের অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে তার প্রতিবেশী হিন্দুর সম্বন্ধে দু একটি কথা না বললে এ প্রসঙ্গ একেবারেই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

হিন্দু আজ শিক্ষা–দীক্ষা সর্ব্ব বিষয়ে মুসলমান হতে প্রায় পঞ্চাশ বছর এগিয়ে গেছে। তারা বিশ্ব সভ্যতায় ইতিমধ্যেই অনেক কিছু দান করেছে। জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী আজ তাই জগদ্বিখ্যাত। ব্যবসাা বাণিজ্য, আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রেও হিন্দু আজ দিন দিন খুবই সফলকাম হচ্ছে। তুলনামূলক সমালোচনা করলে তাই দেখা যায় হিন্দু আজ জমিদার, মুসলমান তার প্রজা, হিন্দু আজ চিকিৎসক, মুসলমান চিকিৎসিত রোগী, হিন্দু প্রফেসর, মুসলমান ছাত্র, হিন্দু উকিল, মুসলমান মক্কেল, হিন্দু সওদাগর, মুসলমান তার খরিদ্দার, হিন্দু উত্তমর্ণ বা মহাজন, মুসলমান অধমর্ণ বা দায়িক্‌–এক কথায় জাতীয় জীবনে সমস্ত দিকে হিন্দুর প্রভাব অনুভূত হয়। মুক্তি কিসে হিন্দু সে কথা বুঝতে পেরেছে। মুসলমান এখনও যেন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। হিন্দুর কর্ম্মধারা আজ সহস্র মুখে উৎসারিত হচ্ছে––আর মুসলমান এখনও যেন নেশাখোরের মত ঝিমোচ্ছে। হিন্দু যুবকেরা আজ কি প্রাণোন্মদনায়ই না মত্ত ; তারা বন্যা দুর্ভিক্ষের সময় যে অদম্য উৎসাহের সহিত পীড়িতদের শুশ্রূষা করে, তা অতীব প্রশংসার বিষয়। হিন্দুর সেবা শ্রম, নাইট স্কুলরূপ বহু সদনুষ্ঠান দেশে প্রভূত কল্যাণ সাধন করছে।

অবশ্য সমাজ হিসাবে হিন্দুদের মধ্যে এখনও বহু কু–প্রথা আছে—সে সবের সংস্কার হওয়া একান্ত দরকার। তাদের অস্পৃশতা, বনবিভাগ প্রভৃতি সমস্যাগুলির এখনও সুমীমাংসা হয়নি। তাদের বিধবাদের দশা এখনও আগের মতোই মর্ম্মবিদারক ; পণপ্রথা

www.pathagar.com

এখনও বহু পরিবারের সর্ব্বনাশ সাধন করছে ; কিন্তু এদিকেও হিন্দুরা চুপ করে বসে নাই। এই বাংলাতেই গত একশত বছরের মধ্যে কত না মহাপ্রাণ সংস্কারক এলেন তাদের সমাজের সংস্কারের জন্য। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, কেশব প্রভৃতির নাম প্রাতঃস্মরণীয়। কিন্তু বাংলার বাইরের দু'এক জনের কথা ছেড়ে দিলে গোটা ভারতীয় মোসলেম সমাজে এমন একজন সমাজ-সংস্কারকও জন্ম নেননি, যার কথা মনে করে এতটুকু গর্ব্বও অনুভব করা যায়। বাস্তবিকই আজ দেড়শত দু'শত বছর ধরে বাঙ্গালীর, তথা ভারতীয় মুসলমানদের ভিতর কী মৃত্যুসম অবসাদ, কী ভীষণ চিন্তার দারিদ্র্য—ভাবের দৈন্য, ভাবুকের অভাবই না দৃষ্ট হয়। ফলে মুসলমানদের ভিতর এখনও সেই ঘৃণিত পর্দ্দা প্রথা তেমনি অপ্রতিহতভাবে বিরাজ করছে। মৌলানা মৌলবী সাহেবদের দাওয়াৎ খাওয়ার ঘটা, কথায় কথায় কাফেরী ফৎওয়া দেওয়া তেমনি জোরে-শোরেই চলছে। আজ মুসলমানদের একতার আদর্শ নিয়ে হিন্দুরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সমন্বয়ের চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছে। ব্রাহ্ম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, জৈন, শিখ প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিকে যারা ইতঃপূর্ব্বে অহিন্দু বলে পরিচিত ছিল, আজ হিন্দু সমাজে ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে—আর তারা হিন্দু বলে পরিচিত হচ্ছে—কিন্তু মুসলমানেরা আজ নিজেদিগকে শত ভাগে বিভক্ত করে দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে। শিয়া, সুন্নি, হানাফী, হাম্বলী প্রভৃতি দল ত আগে হতে ছিল, এখন বাংলাদেশে এক হানাফী বিভাগই না কত খণ্ডে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন মৌলানা সাহেবদের নেতৃত্বে পরস্পরকে গালাগালি ও কাফেরী ফৎওয়া দিয়ে, ও বিবাহ-সাদী, খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি সামাজিক কার্য্যকলাপে পরস্পরকে এক ঘরে করে কি ভয়াবহভাবেই না ইসলামকে বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত ও শক্তিহীন করে তুলছে। এক কথায় বলতে গেলে, বর্ত্তমানে হিন্দুরা পরকে আপন করে নিচ্ছে।

ইতঃপূর্ব্বে মুসলমানেরা স্বাস্থ্য ও শারীরিক বীর্য্য হিসাবে দেশের গৌরব ছিল। কিন্তু আজকাল তারাই দুর্ব্বল ও ভীরু বলে কলংকিত হচ্ছে। হিন্দুরা শারীরিক স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আজ খেলাধূলায় দেশ বিদেশ হতে তারা জয়মাল্য নিয়ে আসছে। শারীরিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক শৌর্য্যও তাদের ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। বিমান পোত চালনা প্রভৃতি সাহসিক কার্য্যে তারাই আজ অগ্রগণ্য। মুসলমান এসব কি করে করবে? তাদের মৌলানা সাহেবরা যে বলেছেন এসব হারাম ! হায় হতভাগ্য সমাজ !

মুসলমানদের কর্ত্তব্য তুরস্ক, ইজিপ্ট, পারস্য প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলির বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা। হালিদা এদিব, সেখ মুহম্মদ আব্দুহ্ প্রভৃতি বিদেশীয় লেখক লেখিকাদের লেখা পড়লে তাদের ভিতর উন্নত হবার স্পৃহা জাগরিত হবে। তাদের চোখের সামনে ভবিষ্যত উন্নতির পথ খুলে যাবে। বিশেষ করে তাদের প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী কুসংস্কারও অবসাদের শৃঙ্খল থেকে বীর সামসনের মত কি অদম্য determination-এর বলে মুক্ত হচ্ছে, এবং শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হচ্ছে তা তাদের অনুধাবন করা দরকার।

এই সম্পর্কে গত কয়েক বৎসর হিন্দু-মোসলেম বিরোধের কথা স্মরণ হয়ে মনে বড়ই দুঃখের উদ্রেক হচ্ছে। এ নিতান্তই লজ্জার বিষয় যে একই দেশে যাদের জন্ম—একই দেশের আলো-বাতাস যাদের প্রাণে আনন্দ 'গান বহন করে আনে, একই দেশের মাটি যাদের শেষ শয্যা—

www.pathagar.com

তাদের মধ্যে কলহ, তাদের মধ্যে বিরোধ। এর কারণ আমার এই মনে হয় যে, হিন্দু মুসলমান এখনও পরস্পরের সহিত ভালরূপে পরিচিত হতে পারেনি—বিশেষ আজও তারা বৃহত্তর জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হয়নি, বা ভাবতে শিখেনি।

হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য পরস্পরকে পরস্পরের সভ্যতা ভাল করে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। এ জন্য পরস্পরের দর্শন, সাহিত্য, শিল্প নিবিড়ভাবে মানতে হবে তাদের ক্রমে ক্রমে এই মনোভাব আনয়ন করতে হবে যে হিন্দু মুসলমান এক জাতি, ভারতীয়। তাদের মনে করতে হবে যে শুধু ধর্ম্ম বিষয়ে তারা হিন্দু, তারা মুসলমান—সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য সমস্ত বিষয়ে তারা ভারতীয়, এ কথা স্মরণ থাকলে যে পরমত অসহিষ্ণু inititant Islam ও militant Hinduism দেখা দিয়েছে তা অচিরেই দূরীভূত হবে। এই দুই জাতির ভ্রাতৃত্ব ও মিলনের কথা সহজ করণার্থে পরিবারের পরিবারে এদের সামাজিকভাবে মেলা-মেশার ব্যবস্থা করার দরকার হয়েছে। বিশেষ করে এমন উদার সাহিত্য প্রচলনের ব্যবস্থা করা দরকার মনে হয়, যাতে জাতিবিদ্বেষ আদৌ স্থান পাবে না। সাহিত্যের ভিতর দিয়ে মিলন হওয়া খুব সোজা—কেননা সাহিত্য চিন্তার বাহন হওয়ায় যেরূপ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন আর কিছুতেই নয়। এই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি আনয়ন ও মিলন স্থাপন আপনাদের সাহিত্য সমাজের এক মহান প্রয়াস হোক।

আশা হয় ইসলামের প্রাণশক্তি এখনও নিভে যায়নি। মনীষী H. G. Wells বলছেন—'Islam is an open air religion, it knows not how to die,' এ কথায় সত্যতা কি আজ প্রমাণিত হচ্ছে না? আরবে, তুরস্কে, পারস্যে ইসলামের কি নব অভিযান শুরু হয়নি? আমার মনে হয় এবং বহু ইউরোপীয় মনস্বীরাও বলছেন যে ইসলামে এমন একটি vitality আছে যে, তার গভীর নিরাশার সময় এমন এক একটি মহাপুরুষের সে জন্ম দেয়, যিনি এই ঘন নিরাশার কালিমাকে আশার আলোকে রূপান্তরিত করে তোলেন। মুস্তাফা কামাল, রেজাশাহ, ইব্‌নে সউদ, আমানুল্লা, নাদির খাঁ প্রভৃতি এ কথার সত্যতা প্রমাণ করেছেন। মুসলমানদের ভিতর এমন একটা stamina আছে যে, যদি তার মুক্তি কিসে এ একবার বুঝতে পারে, তবে তাদের কোন প্রতিবন্ধকই আটকিয়ে রাখতে পারবে না।

Stoddard পঞ্চাদশ শতাব্দীর খৃষ্টানদের সঙ্গে বর্ত্তমান মুসলমানদের তুলনা করে বলছেন :

'ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে Reformation এর প্রারম্ভে, খৃষ্টীয় জগতের যে অবস্থা ছিল, মোসলেম জগতের আজ ঠিক সেই অবস্থা, Reason-এর উপরdogma-র একই রকম প্রাধান্য ও একই রকমের অন্ধ গতানুগতিকতা, এবং স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রতি একই রকমের সন্দেহ ও বিরুদ্ধভাব। সন্দেহ নাই, মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থাদি বিশেষতঃ শরিয়ত পড়লে এবং তাদের গত সহস্র বৎসরের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করলে মনে হয় যে, ইসলাম বর্ত্তমান উন্নতির এবং সভ্যতার পরিপন্থী। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃষ্টীয় জগতের কি হুবহু এই অবস্থা ছিল না? শরিয়তকে খৃষ্টান Canon Law-র সঙ্গে তুলনা কর, দুটিরই উদ্দেশ্য এক। উদাহরণস্বরূপ সুদ নেওয়ার নিষেধ বিধির উল্লেখ করা যেতে পারে, যা মানলে আধুনিক জগতের শিল্প বাণিজ্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইস্‌লাম যে

www.pathagar.com

বর্ত্তমান সভ্যতার সম্পূর্ণ অনুপযোগী তার প্রমাণ স্বরূপ এই সুদ নিষেধ বিধিকেই দেখান হয়। খৃষ্টান Canon Law ঠিক এই ভাবেই সুদ নিষেধ করে ছিল। এত কড়াকড়িভাবে এই নিষেধ বিধি চালিয়েছিল যে, কয়েক শতাব্দী ব্যেপে ইউরোপের সমস্ত কারবার ইহুদীদের একচেটিয়া ছিল। যে সব খৃষ্টান সর্ব্বপ্রথম সুদে টাকা খাটাতে সাহস করেছিল, (The Lombards) তারা প্রায় ধর্ম্মদ্রোহী বলে বিবেচিত হত, এবং সকলেই তাদের ঘৃণা করত এবং অনেক সময় তারা অত্যাচারিত হত।

স্বাধীন চিন্তা এবং বিজ্ঞান চর্চ্চার সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধের কথা ধরা যাক। ন্যূনাধিক তিনশত বছর পূর্ব্বে Papal Inquisition মহাত্মা গ্যালিলিওকে 'পৃথিবী সূর্য্যের চারদিকে ঘুরছে' এই সর্ব্বনেশে ধর্ম্মদ্রোহী (?) মত অস্বীকার করতে ভীষণ শারীরিক অত্যাচারের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করেছিল। ইসলামের ইতিহাসে এর চেয়ে জঘন্যতর কিছু আছে কি?

Christianity যদি এসব কুসংস্কার, অজ্ঞানতা প্রভৃতির আবর্জ্জনা হতে মুক্ত হতে পেরেছে তবে ইসলাম কেন পারবে না?

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথা

মুসলিম সাহিত্য সমাজের বয়ঃক্রম চারি বৎসর পূর্ণ হইল। খুব সংক্ষেপে এই চারি বৎসরের নিকাশ দিতে হইলে বলিতে হইবে এ পর্য্যন্ত সমাজের বার্ষিক অধিবেশসমূহে মোট ২৭টি প্রবন্ধ পঠিত ও সমাজের মুখপত্র 'শিখা'য় প্রকাশিত হইয়াছে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায়ই সকল প্রবন্ধের প্রায়শঃ অনুকূল সমালোচনা হইয়াছে। অনেকেই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন যে, প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই দেশের চিন্তাশীল লোকগণের যথেষ্ট চিন্তার খোরাক যোগান হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত বৎসরের মধ্যে অন্যূন ৩০টি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে এবং সওগাত, ভারতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। সমিতি এই চারি বৎসরে প্রায় নয় শত টাকা খরচ করিয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির মেম্বর ফি স্বেচ্ছায় দান ও সামান্য ডেলিগেট-ফি এই ত্রিবিধই ছিল এই সমাজের আয়ের পথ। ইহার মধ্যে সমাজ আজ পর্য্যন্তও কিছু ঋণভার বহন করিতেছে।

বর্ত্তমান বৎসরে বিভিন্ন অধিবেশনে ছয়টি প্রবন্ধ পাঠ করা হইয়াছে। প্রথম অধিবেশনে দুইটি প্রবন্ধ ও একটি অভিভাষণ পাঠ করা হয়। প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করেন কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব। তাঁহার বিষয় ছিল সাহিত্যিকের সাধনা। সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় প্রিন্সিপাল মিত্র মহাশয়। দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠ করেন মোহাম্মদ কাসেম সাহেব। কাসেম সাহেবের প্রবন্ধ ছিল 'স্বভাব কবি ইমরুল কায়েস', এই সভা বেশ জমিয়েছিল। বেশীরভাগ আলোচনাই এই কথাটিকে কেন্দ্র করিয়া করা হইয়াছিল যে, 'মুসলিম সাহিত্যের বিশিষ্ট্যটুকু শুধু ভাষা দিয়ে রক্ষা করতে হবে না। মুসলিম জীবনের সার্থকতা ও সৌরভ দিয়ে রক্ষা করতে হবে।' কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব রায় দিয়াছিলেন, 'জীবনের সমৃদ্ধি দিয়ে সাহিত্য গড়তে হবে, ভাষা দিয়ে বিশিষ্ট্য রক্ষা করা যায় না।'

দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়াছিল ১২ই জানুয়ারী। সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়। এই সভায় আনোয়ার হোসেন সাহেব 'ঢাকার বাহিরে কয়েক দিন' শীর্ষক রচনা পাঠ করেন। লেখক সাহেব তাঁহার Economic Tour-এ 'ফ্যাক্টরী জীবন' যে কতকটা হৃদয়হীন যন্ত্রের আবহাওয়ায় কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকে তাহারই একটা সুন্দর আভাস প্রদান করেন।

তৎপর মৌলবী মোসলেমউদ্দীন খান সাহেব তাঁহার একাংক নাটিকা 'একেই কি বলে ইসলাম' পাঠ করেন। লক্ষ্য করা গিয়েছে অনেকেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়াছিল। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনাও বেশ জমিয়াছিল।

এই সমিতি সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচ্য বৎসরের প্রধান ঘটনা পণ্ডিতপ্রবর আবুল হুসেন সাহেবের সম্পাদকত্ব পরিত্যাগ। তাঁহার অজুহাত ছিল যে, তিনি কোনও কারণবশতঃ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে অক্ষম—চিন্তারাজ্য অপর কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অভিমতানুযায়ী

www.pathagar.com

চলা তাঁহার পোষাইবে না ; বৰ্ত্তমান ক্ষেত্রে স্বাধীন মত প্রকাশ করায়ও অনেক বিঘ্ন আছে ; সুতরাং আপাততঃ তিনি তাঁহার চিন্তা ও কলম স্থগিত রাখাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছেন।

মোটের উপর এই লইয়া চিন্তা ও আলোচনার পর সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় বর্ষের 'শিখা'য় সাহিত্য সমাজের পলিসি সম্বন্ধে তৎকালীন সম্পাদক সাহেব একটি নাতিদীর্ঘ আভাস দিয়াছিলেন, কারণ কোনও কোনও ব্যক্তি বা পত্রিকা এই সমাজের কৰ্ম্মিগণকে কতগুলি শ্রুতিসুখকর আখ্যায় অভিহিত করিয়া আসিতেছেন, যথা 'শিখা-সম্প্রদায়' 'ঢাকার নাস্তিক্কের দল' ! ইত্যাদি। সুতরাং এই সমাজের বৈশিষ্ট্য অবলম্বিত পথ ও চিন্তাধারার অভিনবত্ব সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

মুসলমানদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা, মুসলমানের শিক্ষা অভাবের কথা দিন রাত আলোচনা হইতে শুনি ; কি উপায়ে এ দুরবস্থার প্রতিকার হতে পারে সে সম্বন্ধেও বিস্তর আলোচনা শুনি। আমাদের শারীরিক বল ও শৌর্য্য এবং আত্মরক্ষার সামর্থকে যে আজকাল আমাদের সমদেশবাসী হিন্দুগণ 'চ্যালেঞ্জ' করিয়া বসিতেছেন এজন্যও আমাদের সমাজের বিস্তর লোককে চিন্তিত দেখি। কিন্তু ইহাদের সকলের চেয়ে যাহা মারাত্মক তাহা আমাদের চক্ষে আদৌ ঠেকিতেছেন না, এবং ঠেকিতেছেন না বলিয়াই বলিতে হয় যে, আমরা শুধু যে ধ্বংসের পথে চলিয়াছি এমন নহে—আমরা এমন পথে চলিয়াছি যে, আমাদের উদ্ধারের কোনও আশা নাই।

মুসলমানের শিক্ষা, দীক্ষা, ট্রাডিশনের মধ্যে এমন কিছু নাই যাদ্দ্বারা সে উচ্চতর মার্গে বিচরণ করিতে পারে।' 'তাহাদের ট্রাডিশনই এইরূপ যে তাহারা চিরদিন নিম্নতর নৈতিক-সমতলে অবস্থান করিতে বাধ্য।' মুসলমান জাতির বিরুদ্ধে এই প্রকার প্রপাগ্যান্ডা চিরদিনই চলিয়া আসিতেছে। অধুনা ভারতের কোন প্রকার কেলেঙ্কারী প্রমাণ করিতে হইলে মুসলমানের দৃষ্টান্ত যেন অনিবাৰ্য্য হইয়া পড়ে। মিস মেয়োর কথার অসারতা প্রমাণ করিবার জন্য দোষ চাপাইতে হয় মুসলমানের ঘাড়ে ! ইহার পরিণাম ফল শেষে এই দাঁড়াইবে যে, দেশ বিশেষের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তাহার মুসলমান অধিবাসীর অস্তিত্ব গণনার মধ্যে ধরা আবশ্যক হইবে না। ভারতের পক্ষেও ক্রমশঃ তাহাই হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

মুসলমান lower moral plane-এ আছেন এ কথা যাহারা প্রমাণ করিতে চেষ্টিত, গায়ের বলে তাহাদিগকে কিছু করা যাইবে না। এই প্রকার ক্ষেত্রে গায়ের বল প্রয়োগ করিলে উল্টা তাহাদের কথাই প্রমাণ হইবে। এই ক্ষেত্রে চাই উচ্চতর চিন্তাশক্তি আর উন্নততম মনোবৃত্তি।

বুদ্ধিকে মুক্ত না করিলে কখনও উন্নত চিন্তাশক্তির চাষ সম্ভব হয় না। 'বুদ্ধির মুক্তি' এ কথাটাই অনেকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন। অথচ আমরা মনে করি, এ কথাটার মধ্যে তেমন মারাত্মক কিছুই নাই। স্যার সৈয়দ আহমদের দিনে তাঁহার মুক্তিবুদ্ধির জন্য তাঁহাকে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। আজ আলিগড় কলেজের দ্বারা মুসলমান জাতির কি কোন উপকার হয় নাই ?

www.pathagar.com

মুক্তবুদ্ধির অভাবে মানুষ কতখানি মানসিক দুর্গতি ভোগ করিতে পারে নিম্নে তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

স্পেনজাতি মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়া সে দেশগুলিকে বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন। মনীষী ডি-লেসেপের অকৃতকার্য্যতার পর যুক্তরাজ্য ডি-লেসেপের প্রণালী কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া পানামা ক্যানেল কর্ত্তন করিয়াছিলেন। সকলেই জানে এই পানামা ক্যানেল জগতে পূর্ত্ত নৈপুণ্যের একটা অসাধারণ নিদর্শন। প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকের উপর মানবের প্রচেষ্টা কতদূর জয়যুক্ত হইতে পারে এই ক্যানেল তাহাই অতি বাগ্মিতার সহিত ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু স্পেন জাতি উহা একবার কর্ত্তন করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ধর্ম্ম যাজকেরা ফতোয়া দিয়াছিলেন, "পানামা ক্যানেল কাটিয়া আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের জলকে মিলাইয়া দিবার আবশ্যক নাই। কারণ যদি তাহার প্রয়োজন হইত তবে বিধাতা পূর্ব্ব হইতেই ঐ স্থান দিয়া একটি খাল রাখিয়া দিতেন।'

ডাক্তার সিমসন (Sir. S. Simson) অস্ত্রোপচারের জন্য রোগীকে ক্লোরফরম করিবার পদ্ধতি প্রচার করিলে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ এই বলিয়া আপত্তি তুলিয়াছিলেন যে, বিধাতার যখন বিধান যে পীড়িত ব্যক্তি ব্যথা পাইবে, তখন তাহাকে অজ্ঞান করিয়া লওয়া বিধাতার বিধানের প্রতিকূলতা করার সমান!

'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র মটো হইতেছে, 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' এই সকল উক্তিকারকগণকে কোন কোন সাময়িকে ব্যঙ্গ করিয়া 'নূতন মোজাদ্দেদ' ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিতে দেখিতেছি।

যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য ও আল্লার জন্য ওকালতি করিতেছেন 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র অধিকাংশ সভ্যই তাহাদের সাধুতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ পোষণ করেন না। কিন্তু তাঁহারা যেন একটি কথা লক্ষ্য করিতেছেন না। কোরান শরীফের প্রথম বাক্যটি যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয় তাহার বোধশক্তি কি ঠিক মানুষের মত? মানুষ যখন সত্য অনুসন্ধান করিতে যাইয়া সময় সময় একটু বিফল হয়, কিম্বা ধর্ম্মের বাহ্যিক অনুষ্ঠানের শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম করিয়া বসে অমনি তাঁহার প্রভুত্বে আঘাত লাগিয়া যায়! অসীমের মালিককে মানবীয় প্রবণতার অধীন মনে করিয়া তাঁহাকে যে আরও ছোট করিয়া দেওয়া হয়।

আমাকে অনেকে বলিয়াছেন, এই সমাজ যদি ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা বর্জ্জন করিত তাহা হইলে সকল স্তরের লোকই ইহাতে যোগ দিতে পারিতেন।

ধর্ম্ম মানুষের জীবন, চিন্তার স্বাধীনতা তখনও আসে যখন সে আপনার ধর্ম্মমত সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। 'ভুল করিয়া লেখা' বা 'Learn by making mistake'-এর প্রয়োজনীতা ধর্ম্মরাজ্যেও স্বীকার করিতে হইবে। 'ইসলাম' আপনার শক্তিতে মানুষকে আকর্ষণ করিবে। যদি তাহার সে শক্তি না থাকে তবে জগতে তাহার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা দুষ্কর।

যাহারা এই সমাজকে চতুর্ম্মুখী আলোচনায় স্বাধীনতা দিতে নারাজ প্রকারান্তে তাহারা ইসলামের potency-তে সন্দিহান। এই সমাজকে যাবতীয় dogmatism-এর প্রসারক্ষেত্র করা আর ইহার spirit-কে প্রাণদণ্ড দেওয়া সমান, ভারতে ইংরেজ আমলের সঙ্গে সঙ্গে

www.pathagar.com

মুসলিম জগতের মধ্যে কতগুলি অসাধারণ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। একযুগে ভারতীয় মুসলিম ইংরেজী শিক্ষাকে 'ইনকার' করিল। তৎপর সে ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহণ করিয়াও ভারতের সহিত তাহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিল না। অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষাকেও সে সন্দেহের সহিত গ্রহণ করিল। মুসলমানকে জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশক্তির সহিত লড়াই করিয়াই বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। মুসলমান যখন কোন একটি শিক্ষা প্রণালী আবিষ্কার করে তখন এই কথা তাহার মনে থাকে না যে, জগত একটি মস্তিষ্ক শক্তির মল্লভূমি বিশেষ এবং মস্তিষ্ক শক্তির দ্বন্দ্বে যে জাতি জয়যুক্ত হয় যে জাতিই শক্তিশালী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এজন্যই মুসলমান দিন দিন দশের সমচক্ষ হইয়া জগতে বাস করিবার ক্ষমতা হারাইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহার সমাজের শিক্ষিত লোকগণ তাহাকে এই কথা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন না।

এখন এই কথাও উঠিয়াছে যে, সে ভারতের জন্য indispensble নয়। তাহাকে অবাধে অবহেলা করা যাইতে পারে। হয়ত এখনও সে তাহার পূর্ব্ব পুরুষের গরিয়া স্মরণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইবে। কিন্তু সে নিশ্চিন্ততা যে কত মারাত্মক তাহা একটি কথা স্মরণ করিলেই বুঝা যাইবে যে, বঙ্গের আড়াই কোটি মুসলিম একটি শক্তিশালী দৈনিক কাগজ চালাইবার সামর্থ রাখে না। বঙ্গের অপর আড়াই কোটি লোক অন্যূন সাতটি দৈনিক সংবাদপত্র অতি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করিতেছেন। দরিদ্রতার অজুহাত দিয়া এই গ্লানি হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। জগতে যখন আর দশজন ছিল তখন তুমিও ছিলে—কোন যুগে বাঁচিয়া থাকিতে কি উপকরণের প্রয়োজন তাহা বুঝিতে তোমার বিলম্ব হইয়াছে ইহা দ্বারাই তোমার চিন্তাশক্তির অক্ষমতা প্রমাণ হইতেছে। কিসে আমাদিগকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিল? কেনই বা আমরা দিন দিন স্থানচ্যুত, দেশচ্যুত, ধর্ম্মচ্যুত হইয়া যাইতেছি? মানবজাতির সনাতন নীতি ও নিয়মের উপর দিন রাত পদাঘাত করিয়াও ধর্ম্মের বড়াই করিয়া দিন কাটাইতেছি? কেনই বা দিনের পর দিন দেশের ভূমি ও ঐশ্বর্য্যের উপর আমাদের অধিকার চলিয়া যাইতেছি?

এই সকল আজ মন খুলিয়া চিন্তা করা দরকার। এইজন্যই মৌলিক চিন্তা এই সাহিত্য সমাজের প্রাণ। মৌলিক চিন্তা দ্বারা যদি কেহ 'গোমরাহী'তে পৌঁছে তাহাকে খরচের খাতায় লিখিবারও আবশ্যক করে না। ইয়োরোপকে আমরা ধর্ম্মহীন বলি। কিন্তু ইয়োরোপ যে এখন ধর্ম্মই অনুসন্ধান করিতেছে ইহাও আমাদের লক্ষ্য করা দরকার।

বস্তুতঃ চিন্তারাজ্যের কাপুরুষতা সমাজে যত শীঘ্র দূর হয় এই 'সাহিত্য-সমাজীগণ' তাহাই কামনা করেন। এই সমাজের সভ্যগণই ইহা লইয়া যেন গৌরব করিতে পারেন যে, সস্তায় লোকবরেণ্য হইবার আকাঙ্ক্ষা ইহাদের কাহারও নাই। এইরূপ নিরেট-ভাবে সমাজ সেবা, জাতি সেবা, দেশ সেবা—যাহার অর্থই ধর্ম্ম সেবা—যদি ইহারা করিতে পারেন সেই নির্ব্বিকার নিরেট ভিত্তির উপর আবার মুসলিম জাতির অস্তিত্ব গড়িয়া উঠিবে। তাহা হইলে জন্মভূমির জন্য তাহাদের অস্তিত্ব indispensable factor হইয়া দাঁড়াইবে।

একদিন দেখিলাম প্রায় দুই শতেরও অধিক ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র পরিহিত মুসলমানকে লুট ও দস্যুতার অপরাধে পুলিশ বাঁধিয়া আদালতে হাজির করিয়াছে। আরও দুই শতের অধিক তাহাদের আত্মীয়-স্বজন তাহাদের পেছনে পেছনে হাহাকার করিতে করিতে আসিয়াছে।

www.pathagar.com

নিকটের একটি অফিসের মুসলমান কর্ম্মচারী কোনও একখানি পুস্তকে মুসলমানের পক্ষে আপত্তিজনক একটি ছবি লইয়া আন্দোলন করিতেছিলেন—এই ছবি দ্বারা ইসলামকে যে আঘাত করা হইয়াছে তাহাই তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। তাঁহার সহিত আমিও একমত ছিলাম। কিন্তু এই সকল লুণ্ঠনকারী লোকের দ্বারা যে ইসলামের উপর আরও বৃহত্তর গ্লানি আসিতেছে তাহা তাঁহার মুখে একবারও শুনিলাম না। এমন কি ঐ অজ্ঞ মুসলমান ভাইদের দুরবস্থার বিষয় তাহাকে একবারও উল্লেখ করিতে শুনিলাম না। আমিও দুই একবার ঐ কথা তুলিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইলাম।

www.pathagar.com

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে জগৎ ও জীবন

শ্রী উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম.এ. বি.এড

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন জগৎ ও মানুষের জীবনকে কিভাবে দেখিয়াছে এবং এই সম্বন্ধে তাদের উপদেশ কি, সেই কথাই আমায় আজ পনের মিনিটের ভিতর এইখানে বলিতে হইবে। সকলেই জানেন যত সব বিদ্যা মানুষ এ যাবৎ আয়ত্ত করিয়াছে, তার ভিতরে এক গণিত শাস্ত্র বাদ দিলে বোধ হয় দর্শনের চেয়ে প্রাচীন আর কিছু নয়। যে সব বিদ্যা ও বিজ্ঞান আজ সভ্যতার আসর জমকালো করিয়া বসিয়া আছে, সে সকলের কারুরই যখন জন্ম হয় নাই—তখনই দর্শন তার ভাবের প্রবীণতায় এবং ভাষার মুখরতায় সভ্যতামুখী মানুষের জীবনকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করিয়া দিতেছিল। এশিয়ার, বিশেষতঃ ভারতের জাতিসমূহের সময় গণনা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা খুব শ্রদ্ধাবান নহেন, সুতরাং এসব দেশের কথা বাদ দিয়াও যদি কেবল ইউরোপের দর্শনের ইতিহাসের দিকেই তাকাই, তাহা হইলেও ন্যূনকল্পে দর্শন শাস্ত্রের বয়স ২৫০০ বৎসর হইবে। এই পঁচিশ শত বৎসরের চিন্তাধারায় মানুষের জীবনকে কিভাবে দেখা হইয়াছে, তাহা বলিবার জন্য আমি যে সময়টুকু পাইয়াছি, এই দীর্ঘ আয়ুর অনুপাতে তাহা কত, সে বিচারের ভার গণিতজ্ঞের উপর রহিল, তবে আমার ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য এই কথাটিকেই আমি যথেষ্ট কৈফিয়ত মনে করি।

দার্শনিকেরা সংক্ষেপ ও বিস্তার এই দুই প্রকার ক্রিয়াতেই পটু বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে ; আবশ্যই অজ্ঞলোকে তাঁদের সাধারণতঃ যে দুর্নাম করিয়া থাকে সেটি এই যে তাঁরা অনাবশ্যকরূপে বাগজাল বিস্তার করিয়া থাকেন। কিন্তু সুধীজনমাত্রেই বোধ করি ইহাও স্বীকার করিবেন যে, প্রয়োজন হইলে দার্শনিকেরা অল্প কথায়ও কাজ সারিতে পারেন। ভারতীয় সুসাহিত্যের কথা যাঁরা জানেন, তাঁরা না জানিয়া পারিবেন না যে, পাঁচ সাতটি কথার ভিতরে ৫/৭ শত পৃষ্ঠার মালমসল্লা সেখানে সহজেই পুরিয়া রাখা যাইতে পারে। আর বেদান্তের ওঙ্কারের সহিত যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন যে—

'ওমিত্যেতদক্ষরসিদং সর্ব্বং এই ওঁকারে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমস্তই রহিয়াছে এবং এক ওঁকার উচ্চারণ করিলেই সমস্তই বলা হয়। ইহার চেয়ে সংক্ষেপোক্তির দৃষ্টান্ত আর কোথায় পাওয়া যাইবে? সুতরাং আড়াই হাজার বৎসরের চিন্তা-সমষ্টিকে সংক্ষিপ্ত করিয়া পনের মিনিটের ভিতর পুরিয়া দেওয়া যায়, হয়ত।

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে সাধারণতঃ তিনটি যুগ কল্পিত হইয়া থাকে—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ। এই তিনটি যুগের প্রত্যেকেরই এক একটা বিশিষ্ট্য আছে। গোড়াতে সেই কথাটি আমাদের মনে রাখা দরকার। প্রাচীন যুগ বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা গ্রীকদের যুগ। এই যুগের দর্শন গ্রীকজাতির কৃতিত্ব ; তারা কখনও বা এশিয়ার পশ্চিম উপকূলে ও তৎসন্নিহিত দ্বীপপুঞ্জে, কখনও বা এথেন্সে, আবার, কখনও বা মিশরের উত্তরাংশে কিংবা ইতালী ও সিলিলি দ্বীপে—তাদের দার্শনিক প্রচেষ্টার কেন্দ্র করিয়া লইয়াছিল। ভূমধ্য সাগরের

www.pathagar.com

ঐ চারটি দিক ঘুরিয়া তাদের গবেষণা স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল। এই জাতির জীবনের বৈশিষ্ট্য তাঁদের দর্শনের উপর ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, একথা বলাই বাহুল্য, এঁদের জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে এঁরা খৃষ্টান ধর্ম্মের বাহিরে ছিলেন—প্রধানতঃ খৃষ্টান ধর্ম্মের উৎপত্তির পূর্ব্বে এঁদের আবির্ভাব হইয়াছিল ; আর যাঁরা খৃষ্টান ধর্ম্মের পরে আসিয়াছিলেন, তাঁরাও নিজেদিগকে যথাসম্ভব এই ধর্ম্মের প্রভাবের গণ্ডীর বাহিরে রাখিয়াছিলেন। সেই হিসাবে ইউরোপের পরবর্ত্তী দর্শন হইতে এদের দর্শনকে সহজেই পৃথক করিয়া লওয়া যায়।

গ্রীসের শিক্ষা ও শিল্প ইউরোপ এত গ্রহণ করিয়াছে—গ্রীসের কাছে ইউরোপের ঋণ এত বেশী এবং গ্রীসকে ইউরোপ এতই আপন ভাবিয়া থাকে যে, এশিয়ার সহিত গ্রীসের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে কিম্বা ছিল, এ কথাটা যেন ইউরোপ ভাবিতেই চায় না। তথাপি অকাট্য যুক্তি এবং প্রমাণ দ্বারা দেখান যাইতে পারে যে, গ্রীসের দর্শন ইউরোপের চেয়ে এশিয়ার বিশেষতঃ ভারতের দর্শনের সহিত ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত ; এমন কি, ভারতীয় দর্শনের নিকট তাহার ঋণও প্রচুর রহিয়াছে। সাধারণভাবে গ্রীক দার্শনিকেরা অনেকেই ভারতীয় চিন্তাধারার নিকট কিভাবে এবং কি পরিমাণে ঋণী ছিলেন, তাহা পাশ্চাত্য মনীষীরাও অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। জিজ্ঞাসুগণ এই সম্বন্ধে Richard Garbe-এর Philosophy ofAncient India নামক গ্রন্থে অনেক সংবাদ পাইবেন। বিশেষভাবে গ্রীক দার্শনিকদের শিরোমণি plato হিন্দু দার্শনিকদের নিকট কি পরিমাণে ঋণী ছিলেন, তাহার কতক আলোচনা আমরাও অন্যত্র করিয়াছি—এখানে আর তার পুনরুক্তি করিতে চাই না।

কিন্তু এই যে ঋণের কথা তুলিলাম, সেটা শুধু আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের ঐশ্বর্য্যের এবং ভাবসম্পদের গরিমা দেখাইবার জন্য নয়। ইহা হইতে গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনের বহুল পরিমাণ সাদৃশ্যও সহজেই অনুমিত হইতে পারিবে এবং এই সাদৃশ্য হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারিব যে, যদিও ইউরোপের পরবর্ত্তী দর্শনে এই গ্রীকদের দর্শন অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তথাপি এই দর্শন হইতে গ্রীক দর্শনের পার্থক্যও কম ছিল না।

পরবর্ত্তী ইউরোপীয় দর্শন হইতে ইহার পার্থক্য এবং ভারতীয় দর্শনের সহিত ইহার সাদৃশ্য, এই উভয়টি হইতে আমরা ইহার স্বরূপ সহজে বুঝিতে পারি, হয়ত জগৎ ও জীবন—অর্থাৎ ঐহিক জীবন সম্বন্ধে গ্রীক দার্শনিকদের মতবাদ মূলত এই উভয়বিধ দর্শন হইতেই ভিন্ন ছিল।

দর্শন শাস্ত্রে ইহজগৎ এক ঐহিক জীবন সম্বন্ধে মোটামুটি দুইটি প্রধান মত দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা মনে করেন, জগৎ মিথ্যা, মায়া—একটা বন্ধন, একটা পাপের স্থান—সুতরাং, পরিত্যজ্য। দুই একজন এই জন্য আত্মহত্যা করিয়া দেহত্যাগ করিতে এবং ঐহিক জীবনের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতেও উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু মুক্তির এই উপায় খুব অল্প লোকেরই মনঃপূত হইয়াছে। বরং দেখিতে পাই অনেক দার্শনিক, যেমন Plotinus এবং অনক শাস্ত্র, যেমন হিন্দুর স্মৃতি, অন্যান্য প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করা ধর্ম্মসঙ্গত কি না সে বিচারও করিয়াছেন, এক ইহা অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া রায় দিয়াছেন। কিন্তু তথাপি আত্মহত্যাকে যাঁরা অত্যন্ত গর্হিত মনে করিয়াছেন তাঁরাও সকলে ইহজগৎ, ইহজীবন এবং এই দেহকে একেবারেই লোভনীয় এবং বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। বরং এঁরা অনেকেই জীবন ও জগৎকে একটা বিরাট কারাবাস, একটা তুচ্ছ দুর্ভোগ, একটা প্রকাণ্ড হেয় পদার্থ মনে করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর দার্শনিকদের মতে মানবাত্মার মহত্তর জীবন

www.pathagar.com

রহিয়াছে ঐহিক মরণের ওপারে, এবং বৃহত্তর ও অধিকতর সত্য জগতে আমাদিগকে মরণের সেতু অতিক্রম করিয়াই প্রবেশ করিতে হইবে।

আর এক শ্রেণীর দার্শনিক রহিয়াছেন যাঁদের কাছে ওপারের কাহিনী ঐতিহাসিক উপন্যাসের মত সত্যে-অসত্যে মিশানো—সে দেশ 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী এবং স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' ; এখানে মানুষের কাছে যা যা ভাল ঠেকে তারই স্মৃতি এবং অপরিজ্ঞাত ভবিষ্যতের লোভনীয় স্বপ্ন—এই দুই দিয়া পারত্রিক জগতের একটা চিত্র আঁকিয়া দুর্ব্বল মানবচিত্ত আপনাকে মোহিত করিয়া রাখে—এই পর্য্যন্ত। এর বেশী তার সম্বন্ধে বলা যায় না। সুতরাং ঐহিক জীবন ও এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া যে অবহেলা করে সে ধ্রুবকে পরিত্যাগ করিয়া অধ্রুবের আলেয়াতে নিজেকে প্রসারিত করে।' এই দুই শ্রেণীর দার্শনিক ছাড়া আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, যাঁদের 'মুরারে তৃতীয় পন্থা'। দর্শন শাস্ত্রে যেখানেই কোনও একটি প্রশ্ন নিয়া পরস্পর বিরোধী দুইটি মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে, দেখা গিয়াছে সেখানেই একটি তৃতীয় পন্থা ঐ বিভিন্ন মতবাদের সমন্বয়স্বরূপ উপস্থাপিত হইয়াছে। ঐহিক ও পারত্রিক জীবনের সত্যতা সম্বন্ধেও তেমনি একটি তৃতীয় মতবাদ রহিয়াছে। বলাবাহুল্য, এই মতবাদ অনুসারে সত্য শুধু ঐহিক কিংবা পারত্রিক জীবনেই সীমাবদ্ধ নয়—এ জগৎকে শয়তানের সৃষ্ট মনে করিবারও কোন হেতু নাই। উভয়েই সত্য এক কর্ম্মানুসারে উভয়েই শিব ও সুন্দরও হইতে পারে। এপার এবং ওপারের ভিতর সেতু রহিয়াছে, এই দুইয়ের মধ্যে কোন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই-একটি আর একটির পরিপন্থী নয়। বরং এপারে ওপারে সম্বন্ধ এত নিকট যে, যে খেয়া দেয় তার যেমন নদীর এপার-ওপারের ভিতর বিশেষ কোন তফাৎ নাই, তেমনি মানবাত্মারও ঐহিক জীবন ও পারত্রিক জীবনের ভিতর পার্থক্য করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। তবে নদীর যে পারে খেয়ারির ঘরখানা থাকে সেটি তার একটু বিশেষ আপন হয় ; তেমনি মানুষের আত্মারও ঘর রহিয়াছে ওপারে—

> Like traiting clouds of glory do we come, From God who is our home.

সুতরাং ওপারের জন্য আমাদের দরদ একটু বেশী হওয়া হয়ত উচিত এই পর্য্যন্ত। তাছাড়া জীবন হিসাবে একেও একেবারে তুচ্ছ করিবার কোন যুক্তি নাই।

ইহজগৎ এবং ঐহিক জীবন সম্বন্ধে এই যে তিনটি মতবাদের কথা উপস্থিত করিলাম, বলা বাহুল্য, এদের ভিতরও আবার স্তরভেদ আছে। বিশ্বাসের গভীরতা এবং অনুভূতির প্রবলতা অনুসারে এদের প্রত্যেকটির ভিতরও আবার পৃথক পৃথক মতবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত প্রভেদের বিচার এখানে করা সম্ভব হইবে না।

ইউরোপের সমগ্র প্রাচীন যুগের দর্শন শাস্ত্রকে অর্থাৎ সমগ্র গ্রীক দর্শনকে যদি এক সঙ্গে উপযুক্ত তিন শ্রেণীর ভিতর কোনও একটির অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে তার স্থান এই তৃতীয় শ্রেণীর ভিতর হইবে, এ কথা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। গ্রীকদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের কথা যাঁরা একটু ভবিয়াছেন, তাঁরাই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, এ জাতির সৌন্দর্য্যবোধ অত্যন্ত প্রবল ছিল,—এই পৃথিবীটাকে তারা সৌন্দর্য্য এবং আনন্দে পরিপূর্ণ মনে করিত, তাদের কাব্যে এবং শিল্পে তাদের এই ভাবটি সর্ব্বত্রই মাথা উঁচু করিয়া রহিয়াছে। এমন কি, তাদের সাহিত্যে যে এত tragedy সৃষ্টি হইয়াছে সেই tragedy-র ভিতরও কোন কিছুই বেমানান থাকিবার জো নাই ; সব জিনিষই আইন-মাফিক ঘটিবে—একটি অলঙ্ঘনীয়

www.pathagar.com

নিয়তি সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতেছে; যে অসামঞ্জস্য এবং বৈষম্য কুৎসিতকে সৃষ্টি করে, সেটি তারা tragedy-তে স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়। এমন জাতি পৃথিবীর আকাশে, বাতাসে, আলোতে, জ্যোৎস্নাতে এবং রূপে ও রসে যে আনন্দ রহিয়াছে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারে না। সুতরাং এ জাতির দার্শনিকও কখনও ঐহিক জীবন ও ইহজগৎকে নিতান্ত অবহেলার সামগ্রী মনে করেন নাই। বরং দেখিতে পাই, এদের নীতিশাস্ত্র এবং আধ্যাত্মিক আলোচনায় ঐহিক সম্পদ ও ভোগের উপকরণকে যথেষ্ট মূল্যবান মনে করা হইয়াছে এদের ভিতর plato-র মত ঐহিকের অসভ্যতার কথা বোধ হয় এত জোরে আর কেহ ঘোষণা করেন নাই। কিন্তু এই plato ও স্বর্গে যে আদর্শ রহিয়াছে সত্যসন্ধিৎসু ভাবুকের অন্তর্দৃষ্টিতে যে আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে—সেই আদর্শের অনুকরণে ইহজগতে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কথা ভাবিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। অনাদি ও অনন্ত কালের তুলনায় এ জীবন অবশ্যই অতীব হ্রস্ব, এবং উজ্জ্বল, অনশ্বর অভঙ্গুর পারত্রিক সত্যের তুলনায় এ জগৎ একটা ছায়াবাজী মাত্র। কিন্তু এখানে যে আমরা কিছু দিনের জন্য আসিয়াছি, তাতে তেমন ক্ষুব্ধ হইবার কিছু কারণ নাই, কর্ম্মবশে আবারও হয়ত আসিব—হয়ত বা মানব দেহে না আসিয়া অন্য দেহ পরিগ্রহ করিয়া আসিব। এটা অবশ্যই আমাদের চিরন্তন বাসভূমি নয়—এবং হওয়া উচিতও নয়। বস্তুর চেয়ে তার ছায়া যেমন কম সত্য, তেমনই সনাতন পারত্রিক সত্যের তুলনায় ঐহিক জীবন ও জগতও অসত্য। কিন্তু উহাকে একেবারে অসত্য মনে করিয়া পরিত্যাগ করিবার প্রয়োজন নাই। ইহারই ভিতরে আদর্শ জীবন ও রাষ্ট্র গঠিত করিয়া আমরা পারত্রিক জীবনের জন্য প্রস্তুত হইতে পারি, এবং মানুষের ভিতরে থাকিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবায় নিজেদিগকে ব্যয়িত করিয়া ভবিষ্যতে আমরা দেবগণের সংসদে বাস করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি।

Plato-র উপরে ভারতীয় দর্শনের প্রভাব বেশী বলিয়াই হউক, কিংবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, ঐহিক জীবনে Plato-র আস্থা হয়ত খুব বেশী নয়, এবং তাঁর মতবাদ অনুসরণ করিয়া পরবর্ত্তী সময়ে তাঁরই নামে অভিহিত সম্প্রদায়ের দার্শনিকেরা এই অনাস্থাকে আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছিলেন। আমরা এখানে Neo-platonist-দের কথা ভাবিতেছি। এদের ভিতর Plotinus ছিলেন প্রধান। Plotinus সম্বন্ধে যে সব কিংবদন্তী আছে তাতে দেখা যায় যে, তিনি ইহজীবন ও ইহজগতের প্রতি এত অবজ্ঞা মনে পোষণ করিতেন যে, তাঁর নাম কিংবা বয়স জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন। কেননা এই সব প্রশ্ন এ দেহের সহিত তাঁর সম্পর্কের কথা মনে করাইয়া দিতে পারিত। রোগে তিনি ঔষধ খাইতেন না এবং কেহ তাঁর ছবি আঁকিতে চাহিয়াছিল বলিয়া তাকে তিনি শত্রু মনে করিতেন।

কিন্তু ঐহিক জীবনের প্রতি এই অবজ্ঞা গ্রীক দর্শনের সাধারণ সম্পত্তি নয়। Plotinus plato-র প্রায় ৬০০ শত বৎসর পরের লোক। তাঁর উপর প্রাচ্য দর্শনের এবং খৃষ্টান ধর্ম্মের ঢেউ অত্যন্ত প্রবলবেগে আঘাত করিয়াছিল।

গ্রীক দর্শনের স্বরূপ বুঝিতে হইলে আমাদিগকে plato-Aristote-এর কথাই ভবিতে হয়। Aristotle এ জগতকে plato-র চেয়ে ঢের বেশী শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। ঐহিক সম্পদ, রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা, সমাজে সম্মান—এসব ছাড়া মানুষের পক্ষে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন যাপন করা সম্ভব কিনা, সে বিষয়েও Aristotle সন্দিহান ছিলেন। মানুষের ধর্ম্ম জীবন ও নৈতিক

www.pathagar.com

জীবনে দৈব ও পুরস্কারের স্থান কতটুকু—মানুষ একমাত্র নিজের চেষ্টায়, দেবতার সাহায্য ছাড়া, নিজের নৈতিক আদর্শ গড়িয়া তুলিতে পারে কিনা—এই প্রশ্নের বিচার করিতে যাইয়া Aristotle স্পষ্টতই স্বীকার করিয়াছেন যে, মানুষ এজন্য নিজের ভাগ্যের বিধাতা নয়, তার ধর্ম্ম জীবনের কর্ম্ম-চেষ্টায় ঐহিক সম্পদের প্রয়োজন রহিয়াছে, আর এই ঐহিক সম্পদ দেবতাদের দান। সুতরাং দেবতার অনুগ্রহের প্রয়োজনও আমাদের রহিয়াছে। আর এই অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ ঐহিক সম্পদ আমাদের আদরণীয়। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ইহাই গ্রীক দর্শনের মত, মোটামুটিভাবে একথা আমরা মানিয়া লইতে পারি। একদিকে stoic-দের ত্যাগ ও ঔদাসীন্য, অপর দিকে Epicurean-দের জীবন-প্রীতি ও ভোগলিপ্সা এ দুই মেরু প্রদেশের মধ্যে গ্রীক দর্শনের যে স্বরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মোটামুটিভাবে জীবন ও জগতকে এইভাবেই দেখা হইয়াছে।

কখনও আলেকজান্দ্রিয়া, কখনও বা সিসিলিতে কখনও বা কনস্তান্তিনোপলে—ভূমধ্য সাগরের চারিদিকে এইভাবে এক হাজার বৎসর ধরিয়া যে গ্রীক দর্শন রশ্মি বিকিরণ করিয়াছিল, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে অবশেষে আততায়ীর বলপ্রয়োগে তাহারা আকস্মিক মরণ ঘটে। সম্রাট Justinian যখন ৫২৯ খৃষ্টাব্দে এথেন্সের দার্শনিক বিদ্যালয়গুলি জোর করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন হইতে গ্রীক দর্শনের শেষ প্রদীপটি নিভিয়া গেল। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যূন এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত ইউরোপের চিন্তা রাজ্যে খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্নভাবে বর্ত্তমান ছিল। এই ধর্ম্মের প্রবল আধিপত্যের আনাচে কানাচে যতটুকু দার্শনিক চিন্তা বাঁচিয়া ছিল, তার মূল্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মত দেখা যায়। অনেকে মনে করেন এই হাজার বছরের ভিতর সত্যিকার দর্শন একটুকুও ছিল না ; ধর্ম্মের ধ্বজার নীচে মানুষের স্বাধীন গবেষণা শক্তিকে একেবারে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছিল ! আবার অনেকে এমনও আছেন যাঁরা মনে করেন যে, সত্যিকার দর্শন যদি কোথাও আদৌ হইয়া থাকে তবে সেটি ইউরোপের মধ্যযুগের দার্শনিক প্রচেষ্টায় দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এ উভয় মতের কোনটিই হয় ত সত্য নয়। একটা কথা সাধারণভাবে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এই এক হাজার বৎসরের ভিতর ইউরোপ যতটুকু দার্শনিক গবেষণা করিয়াছে, তার ভিতর যুক্তিজাল দ্বারা ধর্ম্মের গৃহীত মতগুলির সমর্থনের চেষ্টাই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু ঐহিক জীবন ও ইহজগৎ সম্বন্ধে তার একটা নিজস্ব ধারণা ছিল। সেটি বুঝিতে হইলে আমাদিগকে খৃষ্টান ধর্ম্মের জন্মগত ও স্বরূপগত প্রকৃতির কথা একটু মনে করিতে হইবে। খৃষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে ঐহিক ও পারত্রিক জগতের প্রভেদের কথা অত্যন্ত পরিস্ফুট ; এবং দেহ ও আত্মার স্বার্থ যে এক নয়, সেটিও এ ধর্ম্মের একটা গূঢ় তথ্য। Flesh এবং Spirit-এর দ্বন্দ্ব সনাতন—ইহাদের একের সেবক অন্যের পরিচর্য্যা করিতে পারে না আর ইহাও সত্য যে, Flesh-এর চেয়ে Spirit-এর মূল্য বেশি। সুতরাং ঐহিক জীবনের প্রলোভন ত্যাগ না করিলে আধ্যাত্মিক কল্যাণের অধিকারী হওয়া যায় না।

এই বিশ্বাস এবং মতবাদ হইতেই খৃষ্টান ধর্ম্মের আবছায়ায় সন্যাসী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছিল। গ্রীসের ইতিহাসে আমরা সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাই না এবং গ্রীকদের সভ্যতায় গৃহহীন সন্নাসীর কোনে দান নাই। কিন্তু মধ্যযুগে খৃষ্টান ইউরোপে দলে দলে লেক গৃহস্থ ধর্ম্মে পরাম্মুখ হইয়া আধ্যাত্মিক মঙ্গলের অনুসন্ধানে ধর্ম্ম ও দর্শনের চর্চ্চায় নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া দিতে লগিল। এথেন্সের মত হর্ম্মরাশিশোভিত নগরের জনসমাকীর্ণ স্থানে কিংবা

www.pathagar.com

plato–র মত ধনী গৃহীর কার্পেটমণ্ডিত গৃহে নয়—কিন্তু লোক কোলাহলের বাইরে সন্ন্যাসীদের নিভৃত মঠে গুরু–শিষ্য সম্বাদের ভিতর দিয়া মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং এই প্রকার দার্শনিকদের মতে ঐহিক সম্পদ ধন ও মান প্রভৃতির কি মূল্য ছিল, বুঝা কঠিন নয়। এমনকি, দেহের স্বাভাবিক ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত ইহারা আদিম মানব আদমের বিধাতার আদিম আদেশ অমান্য করার পাপের ফলস্বরূপ মনে করিতেন। জগৎটাকে উহারা একেবারে স্বপ্ন কিংবা মায়া মনে করিতেন না—দৈহিক জীবনও ওদের কাছে সত্যই ছিল ; এ সকলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং এদের সভ্যতা সম্বন্ধে মায়াবাদীদের মত কিংবা plato–র মত এদের মনে কোন সন্দেহ হয় নাই। কিন্তু ইহজগৎ এক ঐহিক জীবনের মূল্য সম্বন্ধে এই যুগের দার্শনিকেরা খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন নাই। জীবনটা অসত্য মোটেই নয়, বরং এটা একটা প্রকাণ্ড অনভিপ্রেত সত্য, তাকে পাপের দুর্ভোগ ছাড়া আর কিছু মনে করা সম্ভব নয়।

১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে যখন Des Cartes তাঁর Discours de la Mithode নামক বই প্রকাশ করেন, তখন হইতেই ইউরোপীয় মধ্যযুগের অবসান হয়, এক নবীন যুগের আরম্ভ হয়। এই যুগ এখনও চলিতেছে। ইহার বিশালতা, ঐশ্বর্য্য এবং সম্পদ, এত বেশী—এই যুগে ইউরোপের দার্শনিক ভাবধারা এত গভীর এত স্বচ্ছ এবং এত বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছে যে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রাচীন যুগের সম্পদ, মধ্যযুগের কঠোরতা এবং নবীনের বৈচিত্র্য—সমস্তই এর ভিতর রহিয়াছে। কিন্তু এই যুগ আপন সম্পদে এমনই আত্মহারা যে বর্ত্তমানকেই সে সব চেয়ে বড় বলিয়া মনে করে।

George Santayana তাঁর Egolism in German philosophy নামক বইয়ে আত্মম্ভরিতা এক অহমিকাকেই জার্ম্মান দর্শনের মূল কথা বলিয়া মনে করিয়াছেন। জার্ম্মানীর বাইরে জার্ম্মান দর্শনের এরূপ বর্ণনা—বিশেষতঃ বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে অনেক পাওয়া যায়। আমরা প্রায়ই শুনি যে, জার্ম্মানদের মতে নাকি জগতে একমাত্র শ্রেষ্ঠ জাতি জার্ম্মানেরা এবং গৌরবান্বিত দেশ জার্ম্মানী। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভাবসম্পদ প্রকাশ করিবার উপযোগী একমাত্র ভাষা জার্ম্মান ভাষা, ইত্যাদি এবং প্রত্যেক জার্ম্মান দার্শনিকই মনে করিয়া গিয়াছেন যে, জগতের সমস্ত চিন্তাধারা তাঁরই দার্শনিক মতবাদে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সেখানেই তার পরিসমাপ্তি। এই প্রকার অমার্জ্জনীয় অহমিকা জার্ম্মানীর দর্শনে সত্য সত্যই আছে কিনা, সে বিচার এখানে করিতে চাই না। কিন্তু এই অভিযোগে যদি কোন সত্য থাকিয়া থাকে, তবে মনে হয়, সেটা আধুনিক ইউরোপের সমগ্র চিন্তা প্রবাহের ভিতরই কম বেশী রহিয়াছে। সেটা পৃথিবীতে ইউরোপের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের জন্যই, না, অবিসংবাদিত উৎকর্ষের জন্য সে কথাও এখানে ভাবিবার দরকার নাই—কিন্তু এ ভাব ইউরোপের সাহিত্যে ও দর্শনে যে কম বেশী রহিয়াছে তাহা বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না।

এ কথা আমরা এখানে বলিতেছি এ জন্য যে, ইহা হইতেই আধুনিক দর্শনের জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ধারণার একটা স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে। বর্ত্তমান যুগের ইউরোপীয় দর্শনে যে আধ্যাত্মিক ও আমুত্রিক সত্যের সন্ধান পাইবার চেষ্টা নাই, তাহা কেহ বলিবে না। কিন্তু ঐহিক ও পারত্রিকের ভিতর ঐহিক যে আমাদের বেশী নিকট—সুতরাং সেই পরিমাণে অন্তত বেশী সত্য—একথা ইউরোপের দর্শনে আজ একটু বেশী বলে বলিয়া মনে হয়। Empericism বলিয়া যে একটা মতবাদ প্রচলিত আছে, তাতে ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতার বাইরের

www.pathagar.com

কোন সত্যের অনুভূতি অস্বীকৃতি হয়, আর Positivism সে সত্যকে একেবারে অস্বীকার করে। Pragmatism ওপারের বালাই নিয়া মাথা ঘামাইতে প্রস্তুত নয়, তার কাছে মানুষের জীবনটা বড় সত্য এবং অন্য সব কিছুরই সত্যতা এই জীবনের সহায়ক হিসাবে পরিমিত হইবে। এই জগৎ ও জীবন স্বীকার করিয়া তারপর অন্য সত্যের তল্লাস করাই আধুনিক দার্শনিক প্রচেষ্টার ধারা। আমার দেশ, আমার জাতি, আমার ভাষা এবং পরিশেষে আমার দর্শন ও আমি সকলের সেরা—এই কথা হয়ত জার্ম্মান পণ্ডিতদের মত সকলেই বলেন না ; কিন্তু এ জগৎ মিথ্যা, আমার জীবন একটা মায়া কিংবা মতিভ্রম, এ কথাও আজ আর ইউরোপের দর্শনে কুত্রাপি নাই।

এইখানেই পাশ্চাত্য দর্শন প্রাচ্য হইতে ভিন্ন। প্রাচীতেও ঐহিক সুখ ও ঐহিক জীবনের ভূয়সী প্রশংসা হইয়াছে। মরণের পর আর কিছু নাই, ঐহিকই আমাদের সর্ব্বস্ব, লোকসিদ্ধ রাজাই একমাত্র পরমেশ্বর, অঙ্গনালিঙ্গনাদিজন্য সুখই একমাত্র পুরুষার্থী—ইত্যাদি কথা দেবভাষা সংস্কৃতেও বলা হইয়াছে। কিন্তু চার্ব্বাকের এই সব মতই ভারতীয় দর্শনের সার কথা নয়, ভারতীয় দর্শন–হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শন মূলতঃ নিঃশ্রেয়স বিদ্যা।

> 'অন্যচ্ছ্রেয়ো হন্যদূতৈব প্রেয়—
> স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
> তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
> হীয়তে হর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে ! !'

শ্রেয় ও প্রেয় আলাদা, একটিকে পাইতে হইলে আর একটিকে ত্যাগ করিতে হয়—ইউরোপের মধ্যযুগেয় খৃষ্টান দর্শনের ন্যায় ভারতীয় দর্শনও ঐ কথা বার বার বলিয়াছে। আমাদের দার্শনিকেরা সব সময়ই জগৎকে একেবারে মিথ্যা হয়ত বলেন নাই—কিন্তু ইহ জগৎকে খুব সারবানও কখনও এ দেশে বলা হয় নাই—আর ইহ জগৎকে একমাত্র সত্য মনে করা ভারতের ধাতের বিরুদ্ধে। মধ্যযুগের খৃষ্টান ধর্ম্মের ন্যায় এ দেশের দর্শনেও সন্ন্যাসীর প্রভাব অত্যন্ত বেশী হইয়াছিল। বৌদ্ধ, জৈন, হিন্দু-বিশেষতঃ হিন্দুর বেদান্ত মোটামুটি সন্ন্যাসীধর্ম্মীর দর্শন বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এ কথাও আমরা অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এখানে আর সে কথা তুলিতে চাই না। স্মৃতিতে গৃহাস্থ ধর্ম্মের এবং গৃহীর জীবনের ভূয়সী স্তুতিবাদ রহিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেখানেও ঐহিক ও পারত্রিকের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে। কর্ম্মবাদ এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াই তার প্রমাণ। এ দেশের লোকেও ব্যবসা বাণিজ্য করিয়াছে, রাজ্যবিস্তার করিয়াছে পররাষ্ট্র অপহরণ করিয়াছে, নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছে—এ দেশের লোকও ভোগৈশ্বর্য্যের মোহে, ঐহিকের মোহে, মত্ত হইয়াছে—এথেন্সের মত উজ্জয়িনী কিংবা পাটলিপুত্র এ দেশেও ছিল। কিন্তু তথাপি শিল্পে, সাহিত্যে এবং বিশেষ করিয়া দর্শনে যে এ দেশের লোকের প্রতিভা ঊর্ধ্বমুখী ছিল, তার প্রমাণের অন্ত নাই।

একটা কথা এখানে আমাদিগকে মনে করিতে হইবে যে, ভারতীয় দর্শন প্রাচীন অতীতের দর্শন—বর্ত্তমানের দর্শন উহা নহে। বর্ত্তমানে ঐহিককে বড় মনে করিবার ঝোঁক যে দর্শনের রহিয়াছে সে কথার ইঙ্গিত আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি। দেহের দাম আজ আগের চেয়ে ঢের বেশী হইয়াছে ; দৈহিক সুখকে উপেক্ষা করা এখন আর ধর্ম্ম নয়। এমন কি দেহের আবরণ পোষাকের কথাও আজ সুধীজনের ধীর বিবেচনার বিষয়। 'Latest Fashion in Gowns'

www.pathagar.com

ছবিতে আমরা প্রতি রবিবারে Statesman-এ দেখিতে পাই। ভোগের নেশা, ঐহিকের মোহ, ইহজীবনের সম্পদের চিন্তা, আজ ইউরোপকে এবং ইউরোপের প্রভাবে প্রভাবান্বিত সমস্ত জগৎকে উন্মত্তবৎ করিয়া রাখিয়াছে। এর ছায়া আজ দর্শনেও পড়িয়াছে। কিন্তু এর ভিতরে বিপদ আছে। মনে হয় আজ জগৎ জুড়িয়া যে অশান্তি ও কলহের ঢেউ চলিয়াছে সেটা ঐহিক ঐশ্বর্য্যের নেশায় উন্মত্ততারই তাণ্ডব নৃত্য। ঐহিকের দাবী উপক্ষো না করিয়াও যে পারত্রিক সত্য স্বীকার করা যায়—বর্ত্তমানকে পরিত্যাগ না করিয়াও যে ভবিষ্যতকে গ্রহণ করা যায়—লোকান্তর স্বীকার করিলে যে ইহলোককেই বৃহত্তর করা হয়—ভোগের সঙ্গে ত্যাগে সমন্বয় যে একেবারে অসম্ভব নয়—স্বার্থ ও পরার্থ যে প্রকৃতপক্ষে একেবারে পরস্পর বিরোধী নয়—দেহকে স্বীকার করিলেই যে আত্মাকে অস্বীকার করিতে হয় না জীবনের জন্যই যে ধর্ম্ম এবং প্রকৃতরূপে জীবনে বাঁচিতে হইলে যে ধর্ম্মকেই বরণ করা হয়—মনে হয়, জগতের ইতিহাসে আজ আমরা এমন একটা যুগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, যখন এই কথাটাই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া ভাবিতে হইবে। জীবনটা যে একটা দুঃসহ যাতনা কিংবা অসংযত উত্তেজনা কিংবা শুধু একটা কঠোর সাধনা নয়—কিন্তু এটা যে সাধনা ও ভোগের সমন্বয়ে একটা সহনীয় বস্তু, বোধ হয় দার্শনিকদের পক্ষে আজ জগৎকে সেই কথা বলাই বিশেষ দরকার।

www.pathagar.com

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

কামালউদ্দীন

শ্রদ্ধেয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় খৃষ্টের দীক্ষাগুরু 'জন'কে স্বস্তিকধারী বৌদ্ধ শ্রমণ বলেই অনুমান করেছেন। পরবর্ত্তী যুগের বিখ্যাত ঐতিহাসিকদের লেখায় এ বক্তব্যের যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়া গেলেও, একথা নিখুঁত সত্য যে প্রাথমিক খৃষ্ট ধর্ম্মনীতির উপর বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিপুল প্রভাব প্রতিফলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যিশুখৃষ্ট ছিলেন প্রাচ্যেরই অধিবাসী। তাঁর তিরোধানের বহুদিন পরে পর্য্যন্ত তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মমত প্রাচ্যদেশেই নিবদ্ধ ছিল। প্রতীচ্য প্রাচ্যভূমি হতেই এ ধর্ম্ম নিজের অলিতে গলিতে বহন করে নিয়েছিল এবং পরিণামে সমগ্র ইউরোপকে এক করে গড়ে তুলতে, এক লক্ষ্যে নিয়োজিত করতে, অনেকখানি সহায়তা করেছে এ খৃষ্টধর্ম্ম। কোনো একটা বিশিষ্ট ধর্ম্মমতের বিশেষ প্রয়োজন ইউরোপ আজ অনুভব না করলেও একদিন করেছিল। সেই দিন সে খৃষ্ট বনাম প্রাচ্যকে প্রাণের সাথেই গ্রহণ করেছিল। কোনো জাতির অভ্যুদয় যুগের ইতিহাস আলোচনা করলে এই সত্যটি দেখতে পাই, তারা তখন সবল হস্তে গ্রহণ করতে ও দান করতে শেখে। যুগ-যুগের সংস্কার তাদের বেঁধে রাখতে যথেষ্ট প্রয়াস পেলেও এ প্রেরণাই তাদের জয়ী হয়। দুনিয়ার কালচারকে গ্রাস করে নিতে এক দুনিয়ার সভ্যতার পর্য্যায়ে তাদের নিজস্ব কালচারের বিশিষ্ট ছাপ এঁকে দিতে তারা দিকে দিকে ছুটে যায় অদম্য উৎসাহে, অখণ্ড প্রাণে।

এর বিপরীত সত্যটিও কিন্তু মানুষের ইতিকথা অনেক দিন ধরে পুনরাবৃত্তি করে আসছে, অধঃপতনের যুগে জাতি এমনই আত্মসর্ব্বস্ব হয়ে পড়ে যে, তারা মনে করে, ভূপৃষ্ঠে মানুষ যদি থাকে তবে তারাই, কালচার যদি কিছু থাকে, তবে তাদের এককালে যা ছিল তাই। উদ্দেশ্যহীনভাবে নিজের অতীতের দিকে চেয়ে গর্ব্ব অনুভব করে বা চোখের জল মুছে তারা দিন কাটায়। এই মনোবৃত্তির বশবর্ত্তী হয়েই ইহুদীরা অ-ইহুদীদের Gentile নাম দিয়েছিল, আর্য্যগণ যখন 'ম্লেচ্ছ' শব্দের ও মুসলমানগণ 'কাফের' আখ্যার এত ছড়াছড়ি করেছিল।

খৃষ্টান সমাজের আর একটি কথা মনে পড়ে। দিগ্‌দর্শন শলাকাকে তারা এক সময় 'শয়তানের যন্ত্র' মনে করত, কোন নাবিক সে যন্ত্র ব্যবহার করে পোত চালনার সাহস বা চেষ্টা করলে তার জন্য পরকাল নরকের ব্যবস্থা হত। এর একমাত্র হাস্যাস্পদ কারণ হচ্ছে এই যে, কম্পাস্ আবিষ্কৃত হয়েছিল অ-খৃষ্টান মুসলমানের দ্বারা।

আজ ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্রের এই একই অবস্থা দেখি, ইউরোপের শাসনাধীনে পৌণে দু'শ বছর বসবাস করেও আমরা যেন সত্যিকার প্রাণ দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে পারছি না। একটা স্বজাতীয় বিজাতীয় বিদ্বেষভাব আমাদের সব সময় তার প্রকৃত স্বরূপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার যা গ্রহণ করছি বা আয়ত্ত করছি তা যেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে। বাধ্য হয়ে যে নয়, তা সত্য না হলেও বাধ্যতামূলক সব কাজই যে খুব মন্দ তার কোন মানে নেই। ধরা যাক, ইংরেজী শিক্ষার কথা। রাজভাষা বলে প্রকারান্তেরে বাধ্য হয়ে যদিও আমরা এটি শিখছি এবং এর চর্চ্চা করছি তথাপি এর ভিতর দিয়ে যে বর্ত্তমান সভ্য

www.pathagar.com

জগতের সাথে আমাদের যোগ ঘনীভূত হচ্ছে, তা অস্বীকার করারও উপায় নেই। ইংরেজী সাহিত্যকে এক কথায় সর্ব্বভুক বলা যায়। দুনিয়ায় এমন বড় কবি বা সাহিত্যিক কমই জন্মেছেন যাঁর সাধনার পরিচয় ইংরেজী দিতে পারে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান আজ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড শাসন করছে। তাকে আয়ত্ত না করে কোন জাতিই খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারছে না ; কারণ তা সুচিন্তিত অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

পশ্চিমের ভাল দিকটা আমরা আনন্দেই গ্রহণ করতে পারি। এবং এ আনন্দ দিয়ে বাধ্যতার তিক্ততাটুকু অনেকটা উপশমও হতে পারে স্বচ্ছন্দে।

তথাপি আমাদের এ ক্ষুণ্ণতার, কথান্তরে কূপমণ্ডুকতারও যে সঙ্গত কারণ আছে, সত্য বলতে তা স্বীকার করতে হবে। তার মূলে রয়েছে আমাদের প্রতি পশ্চিমের জাতীয়তাজাত তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার ভাব। তবে এ ঘৃণা আমাদের বর্ণের জন্যই সম্পূর্ণ নয়। আমাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধোগতিই এর প্রকৃষ্ট কারণ। আরও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখতে গেলে, আমাদের দাসত্বের চাইতে দাস-মনোভাবই এর জন্য অধিক দায়ী।

আবার নূতন করে আমাদের দেনা-পাওনার সম্বন্ধ খাড়া করতে হবে। কারণ এ যুগে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্বন্ধ-সুখের হোক বা দুঃখেরই হোক—অবিচ্ছেদ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কথায় আমরা পশ্চিমের দুয়ারে দাঁড়িয়েছি ভিক্ষাপাত্র হাতে। তাই পাচ্ছিও তাদের কাছে অবমাননার চাইতে বেশী কিছুই না। প্রতীচ্যের মন জয় করতে হবে আমাদের শক্তি ও প্রতিভা দিয়ে। পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে ভালটুকু সাধনা দিয়ে আয়ত্ত করে নিতে হবে আমাদের ন্যাশনাল্ চরিত্রে। পশ্চিমকে দেবার আমাদেরও আছে। দানের উপযুক্ত আমাদের আগে হতে হবে। তখন আগ্রহে তারা লালায়িত হাত বাড়িয়ে দাঁড়াবে প্রাচ্যের দরবারে। এ সাম্য-মৈত্রীর যুগেও যে kipling-এর 'East is East and West is West and never the twain shall meet' কথা বিদ্বেষদুষ্ট ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হচ্ছে না, তার কারণ এশিয়ার বিশেষ করে ভারতবর্ষের অজ্ঞতা ও স্থবিরতা। ভারতের এ কলঙ্ক কালিমা মুছাতে হবে, প্রতীচ্যের এ উদ্ধত মনোবৃত্তির অযৌক্তিকতা প্রমাণ করতে হবে একাগ্র সাধনা দিয়ে আমাদের এ বিংশ শতাব্দীর নবালোকজাগরিত তরুণ দলকে।

www.pathagar.com

তরুণের দায়িত্ব

ফাতেমা খানম

কোন্ যুগে কোন্ দেশে কি করেই যে আজিকার এই দুর্ভেদ্য পর্দ্দার প্রথম জন্ম হয়েছিল, কোন ঐতিহাসিকই বোধ হয় তার সঠিক ইতিহাস লিখে যাননি। কিন্তু তবুও মুসলমান সম্প্রদায়ের দৃঢ় বিশ্বাস, পর্দ্দার জন্মদাতা স্বয়ং আল্লাহ্ এবং প্রচারক হজরত মোহাম্মদ। এ বিশ্বাস যে কতদূর সত্যমূলক নিরপেক্ষরূপে তা ভেবে দেখার জন্যেই আজ আমি প্রসিদ্ধ উর্দ্দু গ্রন্থ 'আকসীরে হেদায়েত' থেকে দুটি ঘটনা নিম্নে উল্লেখ কর্চ্ছি।

(ক) একদিন মদিনার কোন পথে কয়েকটি স্ত্রীলোক পরস্পর কলহ করিতেছিল। ঘটনাক্রমে হজরত 'রেসালত পানাহ্' ঐ পথ দিয়া চলিয়াছিলেন। রমণীগণ তাঁহাকে দেখিয়া সসম্মানে পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কলহ করিতে নিবৃত্ত হইল না। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই বহুদূরে হজরত ওমর ফারুককে সেই পথেই আসিতে দেখা গেল। তখন রমণীগণ ভয়ে কলহ বন্ধ করিয়া যে যাহার বাড়ী চলিয়া গেল। একজন পথিক আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, 'হে আল্লাহর রসূল, উহারা আপনাকে ভয় করিল না, কিন্তু হজরত ওমরের ভয়ে পালাইয়া গেল।' তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন, 'উহারা জানে যে আমি উহাদিগকে ক্ষমা করিব, কিন্তু ওমর ক্ষমা করিবেন না।'

(খ) 'একদা কতকগুলি স্ত্রীলোক উত্তম বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া চলিয়াছিল। তাহা দেখিয়া হজরত ওমর বলিলেন—'হে আল্লার রসূল, স্ত্রী লোকদিগকে উত্তম বেশ ভূষা পরিধান করিতে দেওয়া উচিত নয়। যেহেতু উহারা উত্তম সাজে সজ্জিত হইয়া নিষ্প্রয়োজনে পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার নিমিত্ত বাড়ী বাড়ী গমনাগমন করে।'

'হুর' নামক উর্দ্দু মাসিকে দেখেছি, 'হজরত এমাম হোসেন শহীদ হইলে শত্রুগণ তাঁহার শিবির লুণ্ঠন করে। দুর্ব্বৃত্তগণ এমাম পরিবারস্থ মহিলাগণের মাথার ওড়না পর্য্যন্ত লুটিয়া লইয়াছিল। নিরূপায় উৎপীড়িতা বন্দিনী মহিলাগণ যখন নগ্ন মস্তকে দামেস্ক আসিয়া পৌছিলেন, তখন সমস্ত দেশময় হুলস্থূল পড়িয়া গেল। অনুতপ্তা এজিদ-মহিষী ও সিরিয়ার রাণী এমাম-পরিবারের জন্য ওড়না উপহার লইয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বন্দিনী মহিলাগণের নেত্রী হজরত জয়নাব সমস্ত মহিলাকে আদেশ করিলেন—'বেনী খুলিয়া দাও, খোদার দেওয়া কুন্তলাবরণে তোমাদের মুখ, বুক ও পৃষ্ঠ আবৃত কর।' তিনি নিজেও তাহাই করিলেন। সেদিন সেই বন্দিনী নারীগণের ওড়নাহীন মস্তক, সেই মুক্ত কেশাবৃত মুখের শোকদগ্ধ গম্ভীর অবিচলিত শুভ্র স্বর্গীয় শ্রী দেখিয়া এজিদের বেগম ও সিরিয়ার রাণীর মূল্যবান ওড়নাশোভিত মস্তক লজ্জায় নুইয়া পড়িয়াছিল, এবং উপহার ফেরত লইয়া আসিতে হইয়াছিল।'

এখন এ কথা ভাবা অন্যায় নয় যে, যে দুশ্ছেদ্য নিবিড় পর্দ্দার চাপে বাংলার মুসলমান নারীর নিশ্বাসের বায়ু পর্য্যন্ত রোধ করে রাখা হয়েছে এ যদি হজরত মোহাম্মদেরই প্রচলিত বিধান হত তবে তাঁরই সম্মুখে প্রকাশ্য পথের উপর নারীগণ কলহ করতে অথবা সাজসজ্জা করে বাইরে যেতে পারত না। এবং তাঁরই দৌহিত্রী হজরত জয়নাব শত্রুর দেওয়া উপহার

www.pathagar.com

নিৰ্ব্বিরোধে গ্রহণ করে আপনাদের মুক্ত রূপ সভয়ে আবৃত করে ফেলতেন। পর্দ্দা রক্ষা করার চেয়েও যে আত্মসম্মানের মর্য্যাদা অনেক বড় এ ধারণা তাঁর মনে আসতেই পারত না। অবশ্য কোন কোন লেখকের মতে পর্দ্দা প্রথা হজরত মোহাম্মদের পরবর্ত্তী খলিফাদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়েছে বলে অনুসৃত হয়। কিন্তু এ অনুমানের কোন মূল্য নেই। পর্দ্দাপ্রথা হজরত মোহাম্মদই প্রচলন করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর সেই জটিল-গ্রন্থি-বিরল উদার পর্দ্দা প্রথার সঙ্গে যুগে-যুগের স্বার্থপর সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের ব্যক্তি বিশেষের সন্দেহশঙ্কুল সতর্ক বন্ধন জড়িয়ে এঁটে একাকার হয়ে আজ একেবারে কোরানের বাণীরূপে সমাজের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে।

যদিও কোরানের বাণী বুঝবার শক্তি আমার নেই, হজরত রসূলে করিমের আদেশ অনুশাসন আলোচনা করার শক্তিও কোন দিন হয়নি, তবু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, জীবের মুক্তির জন্যই যিনি জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, প্রাচীন ইব্রাণী ধর্ম্মের অন্ধ কুসংস্কার এবং অনাবশ্যক গোঁড়ামী বন্ধন ছিন্ন করে যিনি ইসলামের উদার মুক্ত মত বিশ্বে প্রচার করেছেন এবং যিনি সাহাবীদের সম্মুখে নিজ মুখে একাধিকবার ব্যক্ত করেছেন–জগতে দুটি জিনিষকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভালবাসি, তাহার একটি ফুল, অপরিটি নারী, এই দুটি সুন্দর জিনিষের মধ্য দিয়াই স্রষ্টার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হয়—সেই হজরত মোহাম্মদ নারীকে তার স্বাধীন আত্মবোধ থেকে চিরবঞ্চিত করে, তার স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ রুদ্ধ করে, শুধু জড়পদার্থের মত পুরুষের সেবাদাসী রূপে অন্তঃপুরে আজীবন বন্দী হ'য়ে থাকার আদেশ দিতে পারেন, এ কিছুতেই বিশ্বাস হয় না। যে পর্দ্দা বর্ত্তমানে সমগ্র বঙ্গদেশ আচ্ছন্ন করে রেখেছে, এর চতুর্থাংশও হজরত মোহাম্মদের প্রবর্ত্তিত নয় বলেই মনে হয়। কিন্তু তবু কেন বিদ্রোহভীতা শান্তিপ্রিয় নারী যুগের পর যুগব্যাপী এই কঠিন বন্ধনে নিঃশব্দে বাধা পড়ে আছে, এ বন্ধনের কতটুকু যে খোদার দেওয়া এবং কত বেশী যে মানুষের দেওয়া, আজ আমি তাই বুঝাতে চেষ্টা করব।

যুগ যখন একটা পরিবর্ত্তন নিয়ে আসে, তখন অতীতে যা থাকে তারই একটা বিপরীত রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়। যেমন পাশ্চাত্য জাতির এই পূর্ণ সভ্যতার যুগ বন্ধন কেটে মুক্তি, আবরণ ছিড়ে নগ্নতা নিয়ে এসেছে। তাই এ যুগে যে পরিবার যত উন্নত ও শিক্ষিত সে পরিবারের মেয়েরাও তত বেশী মুক্ত এবং তাদের পোষাক পরিচ্ছদও তদনুপাতে নগ্নরূপ প্রকাশক। এমনি অতীতেও একটা নূতন যুগ চলছিল। কিন্তু সে ছিল ঠিক এর বিপরীত উলঙ্গের মধ্যে আবরণ টানার যুগ। সুতরাং সে যুগের মানুষ এমনি সব অদ্ভুত পোষাক তৈয়েরী করে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করত, যার বাহুল্য তাদের স্বাভাবিক গতিবিধির উপর অস্বাভাবিক রকমভাবে চেপে যেত। তাই আমরা দেখতে পাই বাদশাহ্, নবাব, আমীর, ওমরাহগণের মহলে পুরনারীগণের চলার সময় তাদের পেছনে বাঁদিরা পাজামার পা ধরে চলেছে। এযুগে যেমন হাঁটুর উপরে তোলা পোষাক উচ্চ সভ্যতার পরিচায়ক, সে যুগেও তেমনি নারীর মাথায় ওড়না থেকে পাজামা পর্য্যন্ত মাটিতে লুটিয়ে পড়া ছিল অতি বড় সভ্যতা এবং আমিরী ফ্যাশান। সে যুগের পুরুষ চাইত, পত্র এবং আবরণী দিয়ে আবৃত ফুলের তোড়ার মত নারীর মধুর রূপ নিরুদ্বেগে উপভোগ করতে। বাইরের সহস্র তৃষিত দৃষ্টির অন্তরালে, নারীকে পৃথক করে, স্বতন্ত্র করে, একান্ত আপনার করে পেতে। এইজন্যই তারা পোষাক পরিচ্ছদ থেকে আরম্ভ করে গৃহ, দ্বার সমস্তগুলিতেই পর্দ্দার

www.pathagar.com

উপর পর্দ্দা জড়িয়ে নারীকে একেবারে দুর্লভ মহার্ঘ্য করে তুলেছিল। এই যে আমিরী ফ্যাশান, এই যে প্রকৃতির স্বাধীন মুক্তরাজ্য থেকে নারীকে লুণ্ঠন করে নিয়ে একান্ত নিজস্বরূপে ভোগ করার অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা এ থেকেই বর্ত্তমানের এই দুর্ভেদ্য পর্দ্দার প্রথম জন্ম। নারী জানে এ পর্দ্দার মধ্যে হজরত মোহাম্মদের আদেশের সত্যতা যতটুকু আছে, তার চেয়ে অনেক বেশী আমিরী চাল এবং স্বার্থপর পুরুষের সদাসন্দিগ্ধ মনের অনাবশ্যক সতর্ক বন্ধনের জটিলতা এঁটে মিশে গেছে। তাই আজও সৈয়দ, শেখ ও উচ্চ বংশোদ্ভব পাঠান শ্রেণী যিনি যত বেশী বংশ মর্য্যাদার দাবী করেন, তাঁদের অন্তঃপুরে পর্দ্দার বন্ধন তত বেশী দৃঢ়তর দেখা যায়। আবার যত নিম্নদিকে অবতরণ করা যায় পর্দ্দার বন্ধন ততই শিথিল হ'তে শিথিলতর বোধ হয়। অবশেষে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে এর অস্তিত্ব একেবারে খুঁজেই পাওয়া যায় না। অথচ মুষ্টিমেয় ভদ্র সমাজ অপেক্ষা সংখ্যায় এরা অনেক বেশী। ধর্ম্মের দিক দিয়েও দৃঢ় বিশ্বাসী এরাই। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ইসলামকে সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নিয়ে, রোজা, নামাজ, প্রভৃতি ফরজ প্রতিনিয়ত পালন করেও এরা পর্দ্দা প্রথাকে কেন গ্রহণ করেনি? এতে কি প্রমাণিত হয় না যে, কৃষক সমাজ চিরদিন আমিরী সভ্যতার বাইরে জীবন যাপন করেছে বলেই পর্দ্দার বালাই তাদের নাই। এরা যা সত্যিকার শাস্ত্র বিধান তা সমগ্র হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছে। কিন্তু যা শুধু আড়ম্বর, শুধু আমিরী চাল তাকে সকলে পরিত্যাগ করেছে। তাই কৃষক নারী চিরদিনই স্বাধীন। সাংসারিক জীবনে তারা তাদের স্বামীর বিশ্বাসী ভৃত্য বা কনিষ্ঠ সহোদরের মত নিত্য সাহায্যকারী। তাদের স্বামীপুত্র যখন ক্ষেতে কাজ করে তারা তখন শয্যায় পড়ে ঘুমোয় না। মাঠে গরু বাঁধে, ঘাট থেকে পানি আনে, স্বামী পুত্রের আহার্য্য প্রস্তুত করে ক্ষেতে পৌঁছে দেয়। যারা বর্ষীয়সী বিধবা তারা হাটে বাজারেও যায়। কিন্তু তাই বলেই অধিকাংশ কৃষক নারী দুশ্চরিত্রা ত' নয়ই বরং পর্দ্দানশীল অনেক ভদ্র নারীর চেয়েও সরল, ধর্ম্মে নিষ্ঠাবতী। স্ত্রী-স্বাধীনতার নামে যে সকল পুরুষ চমকে ওঠেন তাঁদের একবার চিন্তা করে দেখা উচিত স্বাধীনতাই শুধু নারীর চরিত্র দুষ্টির একমাত্র কারণ নয়। এর অতি বড় প্রমাণ কৃষক নারী। ইউরোপের নারী সমাজের অনুকরণে আমাদের নিষ্প্রয়োজনে পুরুষের সঙ্গলাভ চেষ্টার অনুকরণে এরাও পথে, ঘাটে, যেখানে সেখানে অনর্থক পুরুষের সঙ্গলাভ চেষ্টা মোটেই করে না।* যে উদ্দেশ্যে হজরত মোহাম্মদের পর্দ্দা প্রথা প্রচলন সে উদ্দেশ্য কৃষক নারী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে। তাই প্রকৃতির মুক্ত কোলে মানুষ হয়েও এরা নারীত্বের মর্য্যাদা সম্পূর্ণ নিজের বলেই বাঁচিয়ে চলে। পক্ষান্তরে উচ্চ বর্ণের মুসলমান নারী পুরুষের শেখান আমিরী চাল ও আভিজাত্যের মোহে আত্মরক্ষার সমস্ত সামর্থ্য পুরুষের স্কন্ধে ন্যস্ত করে সাত বৎসর বয়স থেকে মরণাবধি পর্দ্দার অভ্যন্তরে বন্দিনী জীবন কাটিয়ে দেন। পুরুষের দেওয়া ছদ্ম অত্যাচারের বিধানটাকেই তাঁরা নিজেদের অতি বড় মঙ্গলদায়ক শাস্ত্রবিধি বলে এমনি আশ্চর্য্য রকম বিশ্বাস করেন যে, যদি একটি ১২/১৩ বছরের মেয়েও মাথার কাপড় ফেলে পর্দ্দার বাইরে এসে দাঁড়ায়, তবে পুরুষের চেয়েও অনেক বেশী লজ্জা এই নারীগণই অনুভব করেন। নিজেদের দেহ ও রূপকে তাঁরা

* শ্রদ্ধেয়া লেখিকা তাঁহার ইউরোপীয় ভগিনীদের প্রতি, তথা এক শ্রেণীর ভারতীয় ভগিবীর প্রতি কিছু বেশী রূঢ় হইয়াছেন মনে হয়। ইউরোপীয় নারী যে আজ 'সসীম' নয়। 'অসীম' স্বাধীনতা চাহিতেছেন., অথবা ভোগ কতিছেন, তাহা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিবার মত মনীষীর সংখ্যাও বর্ত্তমান জগতে কম নয়।

—শি.স.

www.pathagar.com

শুধু চৌর্য্য বস্তু ভিন্ন অন্য কিছু বলে ভাবতেই পারেন না। একজন ভিখারী একজন কুলিকে দেখলে তাঁরা এমন সশংক হয়ে পলায়ন করেন, আপন সন্তানদের সহপাঠী, গর্ভজাত সন্তানের মত যাঁরা তাদের দেখেও এমন করে আত্মগোপন করেন যা দেখলে শ্রদ্ধার চেয়ে দুঃখই বেশী হয়।

বাঘ দেখলে লোকে দৌড়ে পালায়, তা নেকড়ে বাঘই হোক আর ব্যাঘ্র শিশু হোক। যেহেতু ব্যাঘ্র মাংসভোজী জন্তু। তার চোখে চোখ পড়লেই সে মানুষকে আক্রমণ করবে। পুরুষ দেখলেই ভয়ে আমাদের মেয়েদের পলায়ন প্রথটাও ঠিক সেইরূপ। পুরুষ মাত্রেরই নারীমাত্রকে আক্রমণ করার যথেচ্ছ শক্তি আছে, এ পলায়ন স্পষ্ট করে তাই ব্যক্ত করে। এ যে নারীর কত বড় দৈন্য, কত বেশী দুর্ব্বলতার প্রমাণ তা বোধ হয় অনেকে বুঝেও স্বীকার করবেন না।

আমাদের 'নায়েবে নবী' যাঁরা তাঁরা উপদেশ দেন—'পর পুরুষের দিকে চাইলে, নারীর চক্ষু উত্তপ্ত সাড়াশী দিয়ে উৎপাটিত করা হবে।' মাথার কাপড় ফেলে দাঁড়ালে, মস্তিষ্কে জ্বলন্ত লৌহদণ্ড বিদ্ধ করে দেওয়া হবে।' 'মুখ খুলে দেখালে সমস্ত মুখ আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে' ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্য্য পুরুষেরও ত এমনি নারীদের সঙ্গে সম্মানিত ও সংযত ব্যবহার করার শত শত বিধান শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, তার একটিও তাঁরা দাঁতের ফাঁকে বের করেন না! তাঁদের উপর প্রযোজ্য শাস্ত্রবিধানগুলি যদি তাঁরা পালন করে যান তাহলে প্রকাশ্য হাটে বাজারে বিশ্বের সমস্ত নরনারী পাশাপাশি দাঁড়িয়েও যে পৃথিবীকে স্বর্গ করে তুলতে পারেন, একথা কেন একটি বারও স্বীকার করেন না? পর্দ্দার প্রয়োজন কেন হয়? শুধু তাঁদের অন্যায় অত্যাচারের জন্যই নয় কি?

নারী দুর্ব্বল, পুরুষ সবল, তাই পুরুষ আজ নারীর মাথায় সমস্ত শাস্ত্র, এবং শাস্তির ভার চাপিয়ে তাদের পর্দ্দার চাপে চেপে পিষে আধমরা করে রেখেছেন। আর মুক্তি এবং প্রভুত্বের গর্ব্বে নিজেরা এমনি বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছেন যেন তাঁদের জন্য শাস্ত্রও নেই, শাস্তিও নেই।

পর্দ্দার বাইরে আসা নারীর জন্য অমার্জ্জনীয় অপরাধ। কিন্তু আবার সেই পর্দ্দার ভিতরে গিয়েও তাঁরা অত্যাচার যখন করেন তখনও দুর্ব্বল নারীর স্কন্ধে সমস্ত অপরাধ চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের পৌরুষগর্ব্ব বজায় রাখতে এতটুকু লজ্জিত হন না!!

অত্যাচার যাঁরা করেন, প্রতিকারের ব্যবস্থাও তাঁদের হাত দিয়েই আসে। পুরুষ চিরদিনই বড় এবং চিরদিনই ছোট। পুরুষ চালক, নারী চালিতা ; পুরুষ শাসক নারী শাসিতা, নারীর জীবনযাত্রার পথ চিরদিন নির্দ্দেশ করে দেয় পুরুষই। অতীতের পর্দ্দার বন্ধন, বর্ত্তমানের মুক্তির নগ্নতা, এ দুটাই পুরুষের দেওয়া কিন্তু নারীর জন্য বোধ হয় এর একটিও যথেষ্ট নয়। এর একটি যেমন অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক, অপরিটি তেমনি অতি বেশী উচ্ছৃঙ্খলতার পরিপোষক। নারীর স্বাধীনতা সসীম, গতি সংযত এবং সাংসারিক জীবনের পবিত্রতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়। স্বাধীন অথচ অধীন, মুক্ত অথচ বাঁধা, চঞ্চল অথচ ধীর, এবং উচ্ছৃঙ্খল অথচ সংযত এমনি একটি ব্যবস্থা বর্ত্তমানে মুসলমান নারীদের জন্য বড় প্রয়োজন। এইরূপ একটা ব্যবস্থা জাতির ভবিষ্যৎ জনক তরুণ মুসলিম ভবিষ্যৎ তরুণ জননীদের জন্য নিরূপিত করেন। পর্দ্দা তাঁরা ততটাই রাখুন যতটা হজরত মোহাম্মদের নিরূপিত, যেটা শুধু

www.pathagar.com

আমিরী, শুধু সংকীর্ণ সন্দেহপরায়ণ মনের বন্ধন-প্রচেষ্টা সেটা তাঁরা সবলে ছিন্ন করে ফেলুন। তরুণ মুসলিমকে চিন্তা করে দেখতে হবে। তাঁরা আর আমীর নন। অতীতের বিশ্বজয়ী মুসলমান আজ বিজিত। তাদের আকাশস্পর্শী উচ্চ সম্মান ধূলায় লুণ্ঠিত। তাদের অসীম ঐশ্বর্য্য, উৎকট জ্ঞানপিপাসা, প্রবল বুদ্ধিবীর্য্য সমস্তই একটা বিরাট স্বপ্নের মত বিস্মরণের মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। পর্দ্দার অন্তরালে নারীকে শুধু ভোগের বস্তু, সেবাদাসী, সন্তানের ধাত্রী এবং বন্ধনের যন্ত্র করে রাখার সময় আর নেই। নারীর শক্তি বিকাশের এই নূতন যুগ মুসলিম নারীর রুদ্ধ দ্বারে বার বার আঘাত করছে।

ভদ্রনারীর মুক্তির দ্বার যাঁরা অসংখ্য শাস্ত্র কুলুপের জোরে এঁটে দিয়েছেন সেই 'সব নায়েব নবীরা'ই কিন্তু কৃষক নারীদের মুক্তির ব্যাপারে ফতোয়া দেন—'লাচারির মস্‌লা নেই।' এ যদি সত্য হয় তবে আজ গোটা মুসলমান সমাজই দুর্ব্বার পতন প্রবণতার বেগে এমনি সঙ্কটাপন্ন বিপদসঙ্কুল অধঃপতনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে শুধু জরা শুধু মৃত্যু ভিন্ন জীবনের সজীব স্পন্দন এতটুকু নেই। জাতির এত বড় দুর্দ্দিনে নারীর মুক্তির অত্যন্ত আবশ্যক। নারীর মত একান্ত অনুগত বিশ্বস্ত কষ্টসহিষ্ণু সহকর্মীর বড় প্রয়োজন।

কিন্তু এ প্রয়োজন নারীকে বোঝাবার শক্তি বৃদ্ধের নেই, প্রাপ্তবয়স্কদেরও নেই। আছে শুধু তরুণের। নবীন যুগের নূতন জ্ঞানালোক দিয়ে তরুণ মুসলিম তাঁদের নারী সমাজকে সঞ্জীবিত করে তুলুন। নারীর বন্ধন, নারীর অজ্ঞতা, আজ তরুণ মুসলিম দলের বলিষ্ঠ বাহুর দৃঢ় আকর্ষণে ছিন্ন হয়ে যাক। নারী বুঝুক, তারা শুধু সচল মাংসপিণ্ড নয়। দুর্গম জীবন পথে তারা পুরুষের সহকর্ম্মী। স্বামী-পুত্রের আনন্দদাত্রী, জাতির শক্তিময় কল্যাণময়ী জননী।

নারীর সাহায্য ব্যতীত জাতি বোধ হয় উন্নতি লাভ করতে পারে, কিন্তু সে উন্নতি যেমন অতি বিলম্বে সংঘটিত হয় তেমনি পূর্ণাঙ্গও লাভ করে না। এর ধ্রুব প্রমাণ নবীন তুরস্ক ও অন্যান্য মুসলমান শাসিত দেশ। আমাদের চোখের সম্মুখে খৃষ্টান জাতির দেওয়া 'Sick man' আখ্যাপ্রাপ্ত দুর্ব্বল তুরস্ক আজ এই যে নীরোগ, পুষ্ট এবং বলে বলীয়ান হয়ে উঠেছে এর মূলে পুরুষ ও নারীর সম্মিলিত শক্তি। তুরস্ককে বাদ দিয়ে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের দিকে চাইলে দেখতে পাই সহস্র বৎসর যাবৎ বিজাতীয় শক্তির অধীনে দলিত পিষ্ট হয়েও আজ তারা এত অল্প সময়ের মধ্যেই এই যে নূতন বীর্য্যবান জাতিরূপে ইতিহাসে স্থান করে নিচ্ছে এও শুধু তাদের নর এবং নারীর সম্মিলিত শক্তির অক্লান্ত প্রয়োগের ফলে। তাদের সমাজের সংস্কারক পুরুষের সঙ্গে সংস্কারিকা নারীর মঙ্গল হস্ত নিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। তাদের মধ্যেও আমিরী সভ্যতা পর্দ্দা প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর তার প্রয়োজন নেই বলেই তারা সে পর্দ্দা প্রথা ছিন্ন করে ফেলেছে। তাই তাদের মধ্যে সরোজিনী নাইডু, কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, কুমারী লীলা নাগ ও লতিকা বসু প্রভৃতির মত শত শত কর্ম্মী মহিলার আবির্ভাব হয়েছে। নব যুগের নূতন চলার পথে হিন্দু নারী আজ প্রদীপ ধরে দাঁড়িয়েছে।

পর্দ্দার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলেছি, কিন্তু তবু যদি কেউ আমাকে উচ্ছৃঙ্খলতার সমর্থক মনে করেন তবে তিনি নিশ্চয়ই ভুল করবেন। আমি তরুণ মুসলিম জননীদের জন্য মুক্তি

www.pathagar.com

কামনা করি সত্য, কিন্তু সে শুধু মুক্তিই, তার অর্থ উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। এবং কেন করছি তারই দুইটি কৈফিয়ত দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করব।

আমাদের সমাজে সুধী চিন্তাশীল ব্যক্তি নেই, এ আমি বলতে পারি না। কিন্তু এঁরা থাকা সত্ত্বেও কোন সমাজের কোন সংস্কারমূলক শুভ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না? সমগ্র বঙ্গদেশে দুই তৃতীয়াংশ অধিবাসী মুসলমান তবু শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের কথা দূরে থাক ছেলেদের সংখ্যা আজো আশানুরূপ বৃদ্ধি হচ্ছে না? 'সাহিত্য সমিতি' 'ছাত্র সম্মিলনী' 'যুবক সঙ্ঘ' কোন কিছুরই স্থায়িত্ব নেই কেন? এ সম্বন্ধে কোন সুধীজন কোনদিনও চিন্তা করেন কি? আর্থিক অস্বচ্ছলতা হয়ত এর একটি কারণ হতে পারে, কিন্তু পর্দা-পীড়িত মুসলমান নারীর শিক্ষার অভাবই সবচেয়ে বড় কারণ নয় কি? হিন্দুদের দেখাদেখি অনেক কিছুই আমরা করতে চেষ্টা করি। কিন্তু সে সমস্ত চেষ্টাই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মরে মিটে শেষ হয়ে যায়। এর একমাত্র কারণ আমাদের যুবক সমাজ পেছন থেকে অর্থাৎ নারীদের কাছ থেকে কিছুমাত্র সহানুভূতি পায় না। জীবনের প্রতি ২৪ ঘণ্টার প্রায় ২০ ঘণ্টা সময় পুরুষ যে নারীদের সংসর্গ ভোগ করে, সেই নারীর হৃদয়ের প্রদীপ্ত প্রেরণা, নারীর চোখের প্রশংসমান গৌরবদীপ্তি, নারীর প্রাণের গভীর শ্রদ্ধার নিঃশব্দ নিবেদন, পুরুষের হৃদয়ে দুর্দ্দম্য শক্তির সঞ্চার করে, অকৃতকার্য্যতার ভয়সঙ্কুল বিঘ্নবিপত্তি দূর করে দিয়ে অবশ্যম্ভাবী জয়ের আশায় পুরুষকে উন্মাদ করে তোলে। পাথেয়হীনাবস্থায় পথ চলা যেমন অসম্ভব, নারীর উৎসাহ এবং প্রেরণা ব্যতীত কর্ম্মক্ষেত্রে জয়লাভ করা পুরুষের পক্ষেও তেমনি সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের সমাজে এ জিনিষটির একান্তই অভাব। আমাদের তরুণেরা তাই ছাত্রজীবনে যে উদ্যম নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়ে সংসারে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে উদ্যম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তাদের জননী, ভগিনী, স্ত্রী সবাই অশিক্ষিত। বহির্জ্জগতের অবস্থা বিপর্য্যয়জ্ঞান থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। কত বড় আশা, কত বড় মহৎ অনুষ্ঠানের আগ্রহ যে তাদের পুরুষদের হৃদয় মাঝে মাঝে সাড়া দেয়, অজ্ঞ নারী সমাজ তার কিছুই বোঝে না। তাই তারা উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্ত্তে উপহাস করে, সহানুভূতি জ্ঞাপনের স্থলে বিদ্রূপ করে, স্বামী ভ্রাতার উক্ত কল্পনাসমূহকে অর্থহীন পাগলামী বলে উড়িয়ে দেয়। দিন কয়েক তাদের মূর্খতার বিরুদ্ধে লড়াই করে, অবশেষে ছেলেরাও একদিন সত্যি সত্যি সমস্ত অনুষ্ঠান ভেঙ্গে দিয়ে দু'বেলা দুই মুঠি অন্নের সংস্থানে কোমর বেঁধে লেগে পড়ে। তারা আশৈশব দেখে আসে, কোন প্রকারে দুবেলা খাওয়া এবং পাতলা ফিনফিনে বিলেতী কাপড় পরাই মানব জীবনের পরম এবং চরম সার্থকতা। তাই বড় হয়েও শৈশবের সেই বদ্ধমূল সংস্কার তারা কিছুতেই ছড়িয়ে যেতে পারে না। এমনি করেই আজো গোটা মুসলমান সমাজ নিবিড় অন্ধকারের মাঝখানে নিদ্রিত অবস্থায় পড়ে আছে—প্রতিবেশী হিন্দুদের সমকক্ষতা লাভ করতে এখনো তাদের একশত বৎসরের প্রয়োজন। পাঁচ বৎসর যাবৎ শিক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত থেকে শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমান ছেলেমেয়েদের অকৃতকার্য্যতার যতটুকু কারণ অনুমান করতে পেরেছি আজ তা ব্যক্ত না করে পারলুম না। হিন্দু ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে যে সাফল্য লাভ করে তার অধিকাংশ ভাগ গৃহে তাদের শিক্ষিতা মাতা-ভগ্নির সাহচর্য্যের ফল। প্রাথমিক গণিত সংজ্ঞার দুরূহতা ও বর্ণজ্ঞানের জটিলতা সমস্তই সহজ হয়ে আসে তাদের শিক্ষিতা জননী ভগিনীর অপর্য্যাপ্ত সাহায্যে।

যে কর্ম্ম যত সরল, যত সহজ বোধ হয় মানুষের উৎসাহ স্বভাবতই তাতে তত বেশী বৃদ্ধি পেতে থাকে। গৃহে লেখাপড়ার চর্চ্চার মধ্যে সর্ব্বক্ষণ অতিবাহিত এবং অপর্য্যাপ্ত সাহায্য পেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার দুর্ব্বোধ্যতা হিন্দু ছেলেমেয়েদের শৈশব থেকেই দূরীভূত হয়ে যায়। এর ফলে যতই তারা উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হতে থাকে ততই মনোযোগী, মেধাবী ও প্রতিভাশীল ছাত্র হয়ে দাঁড়ায়। পক্ষান্তরে মুসলমান ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে বাড়ী গিয়েই একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগতে এসে পড়ে, যেখানে সাহায্য পাওয়া দূরে থাক লেখাপড়ার নামগন্ধও নেই। এমনি একটা অন্ধকার অরণ্যের মধ্যে বাস করে, তাদের শিক্ষকের নির্দ্দিষ্ট পাঠ দিনের পর দিন পুস্তকের ভিতরেই চাপা পড়ে যেতে থাকে। তাদের শিশুসুলভ চঞ্চল মন নিয়ে একা কিছুতেই প্রাথমিক শিক্ষার জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে না। সুতরাং যত উপরে উঠতে থাকে ততবেশী 'কাঁচা ছেলে' বলে শিক্ষকদের তাড়না খায়, সহপাঠীর গঞ্জনা ভোগ করে, বাড়ীর অভিভাবকগণও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। অবশেষে সম্পূর্ণ ভগ্নোৎসাহ হয়ে একদিন তারা শিক্ষাক্ষেত্র থেকে চিরদিনের জন্য অবসর নিয়ে বাড়ী এসে বসে। অর্থাভাবও আনুসঙ্গিক আরো অনেক কারণের সঙ্গে খুব সম্ভব এই অতি বড় কারণের জন্যই মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে আজও অল্পই রয়ে গেছে।

যদিও বা অল্প সংখ্যক মুসলমান ছেলের বিদ্যার দৌড় হাই স্কুল ও কলেজ ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যন্ত পৌছে কিন্তু তাও ঐ পর্য্যন্তই শেষ হয়। যে বয়সে হিন্দু ছেলেরা অপ্রতিহত উদ্যমে দৃঢ় কর্ম্মক্ষেত্রে এসে দাঁড়ায়, ঠিক সেই বয়সেই মুসলমান ছেলেরা আলস্য ও জড়তায় আশি বৎসরের বৃদ্ধকেও হার মানিয়ে ছেড়ে দেয়। তাদের জীবনের সজীব চাঞ্চল্য ততটুকু সময়ই থাকে যতটুকু সময় বাল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যৌবনোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ভিতর অধ্যয়নে অবসাদ, কর্ম্মে অনাশক্তি ও পরিশ্রমে ক্লান্তি এত বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয় যে, পরবর্ত্তী জীবনে তারা শুধু কোন প্রকারে অন্নসংস্থানের চেষ্টা করা ছাড়া মানবজীবনের শ্রেষ্ঠতর কোন কর্ম্মে একপদও অগ্রসর হতে পারে না। একি চিন্তার বিষয় নয় যে, একই দেশে হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করেও যে জড়তার লেশমাত্র হিন্দুদের মধ্যে পরিদৃষ্ট হয় না, সেই জড়তা মুসলমানকে কেন এমন করে আড়ষ্ট করে রেখেছে? একি তাদের মাতৃগর্ভ শোণিতের প্রতিক্রিয়া নয়? আশৈশব মুসলমান মেয়েদের কঠিন পর্দ্দার অভ্যন্তরে নিরক্ষর মূর্খ করে রাখা হয়। সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ স্থানে সীমাবদ্ধ কাজ নিয়ে একঘেয়ে নিয়মে জীবনযাপন করে তাদের জীবনের সজীবতা যাপন করে তাদের জীবনের সজীবতা অকালে নষ্ট হয়ে যায়, সমস্ত স্নায়ু যৌবনেই শিথিল ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে যায়। এবং এরই ফলে তাদের গর্ভজাত সন্তানদের মধ্যে রক্তস্রোতের ভিতর দিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয় অবসাদগ্রস্ত মনের সমস্ত উদ্যমহীনতা পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। তরুণ মুসলিম তাই তরুণ হিন্দুদের তুলনায় আজো নিতান্ত অকর্ম্মণ্য এবং অনগ্রসর।

একজনকে পায়ের তলায় চেপে পিষে ছোট করে রাখতে গেলে আর একজনও সম্পূর্ণ সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। দেহের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে নত হয়ে পড়তে হয়। আমাদের হয়েছেও তাই। নারীকে চেপে পিষে ছোট করে রাখতে গিয়ে সমস্ত পুরুষ সমাজেরই মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গেছে। আজ তাঁরা সুস্থ নন। সমুন্নত মস্তকে অন্য জাতির সঙ্গে দাঁড়াবার সামর্থ্য তাঁদের মোটেই নেই। তাই আমি আবার বলছি, হে তরুণ মুসলিম, তোমরা

www.pathagar.com

এস, তোমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সমস্ত দৌর্ব্বল্য সমস্ত সংকীর্ণতা দূর করে দাও। নতুন যুগের নব প্রভাতে তোমাদের নবীন জীবনপথে নারী আসুক অগ্রদূতরূপে সমস্ত কল্যাণসম্ভার নিয়ে, সমস্ত হৃদয়ের পবিত্র জয়যুক্ত শুভ অভিনন্দন নিয়ে,—দেখুক, তাদের তরুণ সম্প্রদায় জীবন সংগ্রামে জয় লাভের আশায় মার্চ্চ করে চলেছে।

আমাদের মুসলমান নারীরাও যে জগতের কোন সভ্য জাতীয় নারীদের চেয়ে শক্তি সামর্থ্যে ছোট নয়, এক কালে সাম্রাজ্য শাসন করা থেকে জগতের প্রত্যেক গৌরবান্বিত কর্ম্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার শক্তি যে প্রচুর পরিমাণে তাদেরও ছিল, সে শক্তি পর্দ্দার চাপে চেপে না রাখলে তাদের মধ্যেও আজ হিন্দুদের মতই অসংখ্য কর্ম্মী মহিলার আবির্ভাব হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না। এই শাশ্বত সত্যটিকে প্রচার করার ভার তরুণ মুসলিম গ্রহণ করুন। তাঁরাই নিমজ্জমান জাতীয় তরণীর শক্তিমনি কর্ণধার, সুতরাং এ কর্ত্তব্য সম্পাদন করার শক্তি ও সাহস একমাত্র তাঁদেরই আছে।

www.pathagar.com

ধর্ম্ম ও শিক্ষা

কাজী মোতাহার হোসেন এম.এ.

ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা কারো মতে নিষ্ফল, কারো মতে নিন্দনীয়। যাঁরা নিষ্ফল বলেন, তাঁদের মধ্যে একদল মনে করেন, ও কথার যখন মীমাংসাই নাই, তখন ও নিয়ে আর সময় ক্ষেপণ করে কি হবে? আর একদল মনে করেন, ধর্ম্ম ত মানুষের খেয়াল বা মুখের স্বপ্নমাত্র, লোকে যার যার খেয়ালে বেশ মত্ত হয়ে আছে, অনর্থক আলোচনা করে তাদের সাধের সৌধ ভিত্তি টলানোর সার্থকতা কি? যাঁরা 'নিন্দনীয়' বলেন, তাঁদের ধারণা ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করলে, ঈশ্বর, তার প্রেরিত মহাপুরুষ এবং তাঁর মুখ-নিঃসৃত বাণীর প্রতি অমর্য্যাদা করা হয়, কারণ, আলোচনা করতে করতে মুখ দিয়ে এমন সব কথা বের হয়ে যেতে পারে, যা সাক্ষাৎ ঈশ্বর দ্রোহ বা কুফরী কালাম, সুতরাং সকলের পক্ষে ও বিষয় আলোচনা করা অত্যন্ত পাপের কাজ।

কিন্তু যিনি যাই বলুন, ধর্ম্ম প্রসঙ্গ নিষ্ফলও নয়, নিন্দনীয় নয়। ধর্ম্ম প্রশ্ন অত্যন্ত গভীর বা মীমাংসার অতীত বলে এড়িয়ে চলে মানুষ কখনো মনে শান্তি অনুভব করতে পারে না। আবার যার যেমন খুশী, সে সেইরকম ঐশ্বরিক কল্পনার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাক—এই মনে করে নিশ্চিন্ত উদাসীনতার আশ্রয় লওয়াও চিন্তার শৈথিল্য, আর অন্যের সঙ্গে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের আদান প্রদানে অনিচ্ছার পরিচয় দেয়। তাছাড়া প্রত্যেকেই যখন আপন বিশ্বাস ও কৃতকার্য্যের জন্য নিজেই দায়ী, তখন নিজের ধর্ম্ম ও স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার প্রত্যেকের অধিকার আছে। মনে যে সমস্ত সন্দেহ বা ইতস্ততের ভাব আসে, সেগুলি চেপে রাখতে চেষ্টা না করে সে সম্বন্ধে ধীরভাবে আলোচনা ও অনুসন্ধান করাই বরং পূণ্যকর্ম্ম। আলোচনা ও অনুসন্ধান সত্য নির্ণয়ের জন্যই করা দরকার। নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করা বা অন্যের মত খণ্ডন করবার জন্যই যে আলোচনা হয়, তা অসার্থক। ধর্ম্ম বিষয়ে আলোচনা করতে হলেও মোহ বা বিদ্বেষ থেকে বিমুক্ত হয়ে, ঐতিহাসিক ঘটনা বা সত্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে, তুলনা করে বিচার করা উচিত। তা'হলে যিনি ধর্ম্মপ্রবণ, তার প্রত্যয় দৃঢ় হবে, আর যিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধে উদাসীন তিনিও হয়ত 'ধর্ম্মবৃত্তি অনেক মহৎ কাজের প্রেরণা যুগিয়েছে' এই ঐতিহাসিক সত্যটি স্মরণ করে অন্য লোকের ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রূপ কশাঘাত করবেন না।

ধর্ম্ম বিষয়ে উদারভাবে আলোচনা করা নানা কারণে বেশ কষ্টসাধ্য। আমাদের দেশে, বিশেষতঃ মুসলমান সমাজে, ধর্ম্মের একটা গোঁড়া রূপ অনেক দিন থেকে চলে আসছে, লোকে তা' নির্ব্বিচারে মেনে চলেছে, এবং সেইটেকেই সনাতন সত্য বলে বিশ্বাস করে নিয়েছে। যদি কোন ঐতিহাসিক ঘটনা বা তুলনামূলক বিচার বুদ্ধি এসে তার বহুকালের সঞ্চিত সংস্কারে আঘাত করে, তবে সে অভ্যাসের বশে সত্য বা বিচার-বুদ্ধিকে অস্বীকার করতে চায় এবং আত্মরক্ষার জন্য পুরাতনের প্রতি অলৌকিকত্ব, অনন্ত সৌন্দর্য্য, মাহাত্ম্য প্রভৃতি আরোপ করে। তখন এইরূপ লোকের পক্ষে নূতন তথ্য ও চিন্তাকে ভয়াবহ মনে করে

www.pathagar.com

অসহিষ্ণু হওয়া এবং সাধ্যমত ওগুলি নিষ্পেষিত করতে চেষ্টা করা খুবই স্বাভাবিক। পুরাতনের সঙ্গে নতুনের এই ঘাত-প্রতিঘাতে পুরাতন সম্পূর্ণ অতীতের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পারে না। আবার নূতনও ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতে পারে না—মাঝখান থেকে ক্রমান্বয়ে বিকাশমান বর্ত্তমানের সৃষ্টি হয়।

সামনের দিকে চলতে গেলে অন্ধভাবে চললে এগুনো যাবে না—সেখানে গতিশীল বৈজ্ঞানিক উপায়ই অবলম্বন করতে হয়। অবশ্য ধর্ম্ম ব্যাপারে ভক্তিরই প্রাধান্য। কিন্তু বিচার শক্তিকে বাদ দিলে সে ভক্তি বেশী দিন টিকতে পারে না। যে ভক্তির মূলে বিচারের নির্দ্দেশ নাই, তা অত্যন্ত দুর্ব্বল ও টলটলায়মান। ধর্ম্মের ব্যক্তিগত দিক ছাড়া একটা সমাজগত দিকও আছে, সেটা আবার অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, এই শেষোক্ত দিকটার প্রতিই সমাজের খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ধর্ম্ম শিক্ষার সমুদয় কেন্দ্রেই, অন্ততঃ আমাদের দেশে, এই বিধি-বিধানগুলি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শেখানো হয়, আর সে শিক্ষা হয় বিদেশী ভাষার সাহায্যে। হিন্দুদের কাছে সংস্কৃতি দেব ভাষা, মুসলমানদের কাছে আরবী বেহেশতের ভাষা, এই সমস্ত ভাষায় যা কিছু লেখা থাকুক তাই পরম পবিত্র বলে মনে করা হয়, আর তাই শিখবার জন্য অল্প বয়সেই বালকদের উপর প্রবল চাপ দেওয়া হয়, প্রথমেই কয়েক বৎসর ধরে ব্যাকরণ মুখস্থ করানো, শ্লোক বা আয়াত মুখস্থ করানো—এই হচ্ছে সনাতন বিধি। ভাষা শিক্ষার যে সব উন্নত প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে, তা শুধু নূতনত্বের জন্যই অশ্রদ্ধেয়। সংস্কৃতে স্তোত্র-পাঠ করা আর আরবীতে নামাজ পড়াই নিয়ম। যার অর্থ বোধ হয় না, যে কথার সহিত প্রাণের যোগ নাই, সেই সব কথায় ভগবানের প্রার্থনা করায় কতটা হৃদয় মনের তৃপ্তি হয়, তা বুঝে ওঠা কঠিন। কিন্তু তাই চলে আসছে এবং তার স্বপক্ষে অনেক যুক্তির আবির্ভাব হয়েছে। বাঙ্গালী মুসলমানদের কাছে উর্দ্দু আর ফারসীও পবিত্র ভাষা। তার কারণ, এই দুই ভাষায় আরবী বর্ণমালা ব্যবহৃত হয়, এবং মুসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক পুস্তক এই ভাষায় লেখা হয়েছে। বাংলা ভাষায় মুসলমানী ধর্ম্মকথা ও কাহিনী সম্বন্ধে বই খুব সামান্যই আছে এটা বাঙ্গালী মুসলমানদের পক্ষে নিতান্ত নিন্দার কথা। মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী না হয়ে, উর্দ্দু ফারসী বোলচালের প্রতি মোহান্ধভাবে আকৃষ্ট হওয়া, এবং মনে মনে এই দুই ভাষা শ্রেষ্ঠ বলে কল্পনা করে উর্দ্দুভাষী পশ্চিমা লোককে আশ্‌রাফ বা কুলনী বলে মেনে নেওয়া বাঙ্গালী মুসলমানের পক্ষে ঘোর কলংকের কথা। বোধ হয় এইভাবে নির্ব্বিচারে নিজেদেরকে ক্ষুদ্র বলে ধরে নেওয়ার চেয়ে ভীষণ দৈন্য আর কিছুই হতে পারে না। ধর্ম্ম ও তৎসংশ্লিষ্ট সমুদয় বিষয়ের প্রতি অন্ধ অনুরাগই এই দুর্ব্বলতা ও দৈন্যের মূলীভূত কারণ। আবার অশিক্ষা ও ধর্ম্ম বিষয়ে অজ্ঞতা উর্দ্দুর প্রতি মোহকে দশগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সম্ভবত প্যান-ইসলামের স্বপ্নও এর জন্য বিশেষ-ভাবে দায়ী। বাংলায় মুসলমান প্রাধান্যের আমলে দেখা যায়, মুসলমানেরা বাংলা ভাষার চর্চ্চা করতেন এবং অন্যকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন। কিন্তু যেই তাঁদের ক্ষমতা অন্যের হাতে চলে গেল অমনি দুর্ব্বলের আশ্রয় গোঁড়ামী আর প্রাচীনতা-প্রীতি তাঁদেরকে অত্যধিকভাবে পেয়ে বসল। তখন আরবী ফারসী আর উর্দ্দু ছাড়া অন্য সব ভাষা 'কুফরী' ভাষা হয়ে পড়ল এবং সুযোগ্য মৌলানারা ইংরেজী শিক্ষাকে হারাম বলে ফতোয়া দিলেন। বাংলাকেও পৌত্তলিক ভাষা বলে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে লাগলেন। তার ফলে যা' দাঁড়িয়েছে, তা ত প্রত্যক্ষই দেখতে পাচ্ছি। ব্রাহ্ম গিরীশবাবু প্রথমে যখন

www.pathagar.com

বাংলা ভাষায় কোরান অনুবাদ করেন, তখন 'ধর্ম্ম গেল', 'ধর্ম্ম গেল' বলে রব উঠেছিল। এখন পর্য্যন্ত কোরাণের উর্দ্দু বা ফারসী অনুবাদ বাঙ্গালী মুসলমানের কাছে বাংলা অনুবাদের চেয়ে অনেক বেশী প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়। বোধ হয় যা বোঝা যায়, তার স্পষ্টতার মধ্যে কোন রহস্য থাকে না, কিন্তু যার কিছু বোঝা যায় কিছু বোঝা যায় না, তার অস্পষ্টতা বেশ খানিকটা গাঢ় রহস্যে আবৃত থাকে। আমাদের মনে রাখতে হবে অজ্ঞাত রহস্যের চেয়ে সজ্ঞান স্পষ্টতা ঢের বেশী সবল ও পুরুসোচিত। এ পর্য্যন্ত বিশেষ করে ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষার কথাই বলা হয়েছে। সে শিক্ষায় ধর্ম্মের বিশিষ্ট প্রভাব সামান্য নয়। কারণ ধর্ম্ম মানুষের ও সমাজের এমন একটি অন্তরতম জিনিষ যা মানুষের সর্ব্ব প্রচেষ্টার ভিতর লক্ষ্যে ও অলক্ষ্যে প্রভাব বিস্তার করেছে। ইংরাজী শিক্ষার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—আগেকার হারাম এখন হালালে পরিণত হয়েছে। নারী শিক্ষা ও অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে আবার নূতন করে সেই ভুলের অভিনয় চলছে। ধর্ম্ম যে সব ব্যাপারে বাধা দিচ্ছে, তা নয়; তবুও ধর্ম্মের নামেই যখন ঐ সব বাধা আসছে, তখন প্রচলিত ধর্ম্মভাবই এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। এই অবস্থার সংশোধন করতে হলে নতুন প্রয়োজনের আলোকে ধর্ম্মকে ভাল করে পরখ করে নিতে হবে। সব সময় মনে রাখত হবে, লোকহিতই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ; ধর্ম্মকে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করতে গিয়ে যদি দেখা যায় অকল্যাণ হচ্ছে, তবে বুঝতে হবে, কোথাও একটা গোলযোগ আছে। হয়, ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি হয় নাই, নয়ত ধর্ম্মের সে অংশের উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা না থাকায় বর্ত্তমান অবস্থায় তা' অপ্রযোজ্য হয়ে পড়েছে। যখন দেখা যায়, সমাজের বহু বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন লোক ধর্ম্মের নামে সমাজহিতের বিরুদ্ধতা করতে দ্বিধা বোধ করেন না। তখন বাস্তবিকই বিস্ময় লাগে। সম্ভবতঃ তাঁরা আত্মপ্রত্যয়ের চেয়ে জনমতকেই বেশী ভয় করে, মনে মনে অন্যরূপ বিশ্বাস করলেও মুখে জনতোষ মতই ব্যক্ত করেন ও কার্য্যত কপটতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হন।

উদাহরণস্বরূপ মুসলমান সমাজে সঙ্গীতানুরাগের বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। ধর্ম্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, নিষ্ঠাবান মুসলমান সমাজে যে সাধারণত সঙ্গীত নিষিদ্ধ পরিগণিত, তার আর সন্দেহ কি? কিন্তু অনেক বাড়ীতে দেখতে পাই, হারমোনিয়মের রেওয়াজ না থাকলে হয়ত গ্রামোফোনের চল আছে। আবার বাড়ীর হারমোনিয়াম টিপলে বা বাংলা গানের টান দিলে যাঁরা ধর্ম্মনষ্টের ভয়ে চণ্ডমূর্ত্তি ধারণ করেন তাঁরাই কাওয়ালী গান ও মিলাদ শরীফে উর্দ্দু ফারসী বা আরবী গজল গান শুনে আনন্দে ভাবাবিষ্ট হন। এস্থলে সঙ্গীত হালাল কি হারাম এ তর্ক মোটেই ওঠে না। যদি সঙ্গীত লোকের প্রাণ স্পর্শ করে, যদি সঙ্গীতের দ্বারা জীবন ছন্দ মধুময় হয়, যদি সঙ্গীত আনন্দ, বিষাদ, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি ভাবের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি হয়, তবে তাকে ধর্ম্মের দোহাই রূপ কৃত্রিমতার আবরণ দিয়ে চেপে রাখা কোনক্রমেই সঙ্গত নয়। সঙ্গীত সম্বন্ধে যা বলা হ'ল চিত্র, নাট্য, কারুকার্য্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি ললিত কলা সম্বন্ধেও অল্প বিস্তর ঐ কথাই খাটে। সৌন্দর্য্যের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, আর এই আকর্ষণই তাকে ক্রমে ক্রমে সুন্দর প্রেমময় পরম পুরুষের দিকে আকৃষ্ট করে ভগবৎ উপলব্ধি পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে পারে।

মানুষের সঙ্গে সমানুষের কেবল ঘটনার সম্পর্ক নয়, প্রাণের সম্পর্কও আছে। একজনের আনন্দ দেখলেই হৃদয় মেতে ওঠে, আর দুঃখ দেখলেই প্রাণ কেঁদে ওঠে। এইটেই স্বাভাবিক

www.pathagar.com

অবস্থা। কোনক্রমেই যাতে এর ব্যতিক্রম ঘটতে না পারে, সেইরূপ শিক্ষা ও অভ্যাস অর্জ্জন করতে হবে। পর্ব্ব ও উৎসবের দিন অতি পবিত্র। যে দিনে সহস্র সহস্র লোকের মনে আনন্দের লহরী খেলছে বা বিষাদের কালিমা ঘনিয়ে এসেছে, সে দিনে তাদের সঙ্গে সুর না মিলিয়ে মনের কোণে বেসুরো বিরুদ্ধভাব পোষণ করা অত্যন্ত নৃশংস বর্ব্বরতার পরিচায়ক। পর্ব্ব ও উৎসবের দিনে মানুষের মন নিজের সংকীর্ণ পরিধি থেকে ছাড়া পেয়ে, সবার সঙ্গে যুক্ত হবার মত অবস্থায় থাকে—মানুষ ভাবে মানুষের সঙ্গে মিলবার সুযোগ প্রত্যহ আসে না, কাজেই একে অবহেলা করে নষ্ট করা বড়ই দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। সৌন্দর্য্য ও রুচি-বিকাশের অবসর হিসাবেও উৎসবের দিন মূল্যবান। এজন্য বৎসরের সাধারণ দিন থেকে কয়েকটা দিন এই উদ্দেশ্যে বেছে রেখে দেওয়া মানুষের স্বাস্থ্য ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে বিশেষভাবে উপেযাগী।

ধর্ম্ম শিক্ষা যাতে মানুষকে একদেশদর্শী করে না রাখে, এজন্য ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ভূতত্ত্ব, সাহিত্য সমস্তই শেখা দরকার। ধর্ম্মই একমাত্র শিক্ষণীয় বিষয় নয়—বরং ধর্ম্মশিক্ষা অন্য সমুদয় শিক্ষার ভূমিকা স্বরূপ। আবার অন্যান্য শিক্ষা ধর্ম্মের মর্য্যাদা হানিকর নয়, বরং তারা ধর্ম্মের প্রকৃতি নির্দ্দেশের সহায়স্বরূপ। ইতিহাসের সহিত পুরাতন কথার ভূগোল ও বিজ্ঞানের সহিত পৃথিবীর ধর্ম্মোক্ত আকৃতি ও গতির, ভূতত্ত্বের সহিত পৃথিবীর বয়সের, এবং সাহিত্যের সহিত ধর্ম্মনীতির কিছু কিছু বিরোধ থাকতে পারে, এই বিরোধকে এড়িয়ে না চলে, ধীরভাবে এগুলি বিচার করে দেখাই প্রকৃষ্ট উপায়। সৎ শিক্ষার লক্ষণ এই যে, তাতে স্বাধীনভাবে সব বিষয় চিন্তা করে দেখবার ক্ষমতা জন্মে ; তাতে মানুষের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয় এবং মোটের উপর সে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট জীবন যাপন করে।

সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ধর্ম্ম ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে বলে সমাজনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিধান থেকে ধর্ম্মনৈতিক বিধানগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সকলের পক্ষে সহজসাধ্য হয় না। ফলে আমাদের শিক্ষার অনেক প্রধান স্থানে জোর না দিয়ে, বহু অপ্রধান স্থানে জোর দেওয়ায় অনেক সময় অনর্থক তুমুল কাণ্ড বেধে যায়। নৈতিক শিক্ষা মূলতঃ সামাজিক নিয়ম হলেও, ধর্ম্মের সহিত সংযোগে তার গৌরব ও কার্য্যকারিতা শত গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু নৈতিক শিক্ষার চেয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার দিকেই বর্ত্তমান ধর্ম্ম শিক্ষা অধিক মনোযোগ দিয়ে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে, এমন কি একই ধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে, নানা বিরোধ ও অনর্থের সূত্রপাত করেছে। ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য, কোন অনন্ত মহাশক্তির প্রতি বিশ্বাস করা, তার উপর সম্পদে বিপদে নির্ভর করা, সৃষ্টির কৌশল ও সৌন্দর্য্যে বিস্ময় ও পুলক অনুভব করা—এসব বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত। এই সমুদয়ের মূলীভূত ঐক্যের প্রতি অবহিত হয়ে, বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক অনৈক্যকে বড় করে না দেখাই উদার শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। এজন্য ছেলেবেলা থেকেই ধর্ম্মান্ধতা বা ধর্ম্ম-বিরোধ মনে জাগতে না পারে, তার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। তা করতে হলে পরস্পরের বিষয় ভাল রকম জানবার, অনুভব করবার, এবং সহানুভূতি সম্পন্নভাবে বিচার করবার অবসর দেওয়া আবশ্যক। পরস্পরকে সন্দিগ্ধভাবে আলাদা করে রাখা নিতান্তই ভুল। এই কারণে টেলি, মাদ্রাসা, হিন্দু কলেজ, ইসলামিক কলেজ প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান দেশের পক্ষে কল্যাণকর নয়। যেখানে সংকীর্ণতা ও অপ্রেম বিরাজ করে, পরস্পরকে বুঝবার

www.pathagar.com

কোন আগ্রহ বা অবসর নাই, সেখানে কোন বৃহৎ চিন্তা বা কর্ম্মের সূচনা হওয়া সুদূর পরাহত। ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মানুষে মানুষে যোগ স্থাপন করা, বিরোধের সৃষ্টি করা নয়। যে শিক্ষায় অন্য মানুষকে হিংসা ও ঘৃণা করতে শেখায়, তা কখনও কাম্য হতে পারে না। তাই বলে আমি ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হতে বলছি না। উদারতা ও নির্লিপ্ততার মধ্যে একটা ভয়ংকর ফাঁকি, নির্ব্বিকার অচৈতন্যের ভাব আছে। উদারপন্থীর সহনশীলতার মধ্যে আছে প্রেম ও সজাগ সহানুভূতি। সুতরাং কোন বিশেষ ধর্ম্মে সংস্থিত থেকেই অন্যের সহিত প্রেম সম্বন্ধ রাখা সম্ভব এবং তা যে শুধু উচিত তা নয়, সেইটেই শ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃত ধর্ম্মের উদ্দেশ্যই তাই।

www.pathagar.com

বর্ত্তমান বাংলার মহিলা ঔপন্যাসিক

করুণাকণা গুপ্তা

সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের প্রতি নারীচিত্তের যে একটি চিরন্তন আকর্ষণ আছে, তাহা তাহার সকল কাজে ফুটিয়া উঠে। নারীর জীবন আগাগোড়াই একটা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। তাই সুন্দরের পূজা তাহার মুখের হাসিতে, চলার ভঙ্গীতে, গৃহের সজ্জায়, রচনা কৌশলে সর্ব্বত্র বিরাজমান।

এই মাধুর্য্যের প্রতি আকর্ষণ বাংলার মহিলা ঔপন্যাসিকগণের রচনার প্রতি পদে ফুটিয়ো উঠিতেছে। আধুনিক যুগ তাঁহাদের জন্য যে বাস্তববাদের পন্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে, সে পথ তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু ইহারই মধ্যে তাঁহাদের নারীত্ব একটি কোমল মধুর সুর সেই বাস্তববাদের উপর ফেলিয়া তাহাকে প্রায় আদর্শবাদ করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহাদের উপন্যাসে বাস্তব জীবনের চিত্র ফুটিয়াছে, কিন্তু তাদের ক্লেদসিক্ত দিবাটি ফোটে নাই। আলোক যেমন অবলীলাক্রমে অন্ধকারকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়, তাঁহারা তেমনি সহজ সরল ছন্দে হাসিতে হাসিতে বাস্তবজীবনের চিত্র লইয়ারঙের উপর রঙ ফলাইয়া একটি অনুপম শিল্প সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। যে সহজ মাধুর্য্য তাঁহাদের রচনায় ফুটিয়াছে চেষ্টা করিয়া তাহা জাগাইতে হয় নাই। ফুলের মত সে আপনি ফুটিয়াছে, কমল সুরভির মত আপনি আপনাকে জগতের বুকে বিলাইয়া দিয়াছে। তাঁহাদের রচনায় যে উজ্জ্বল আলোক রেখা পড়িয়াছে, যে উন্নত মধুর সুর বাজিতেছে, তাহার ছায়ায় অন্ধকার ঢাকিয়া গিয়াছে—কদর্য্যতা তাঁহারা দেখিতে পান নাই।

জগতে দুঃখের অস্তিত্ব তাঁহারা কখনো অস্বীকার করেন নাই। কোন নূতন সুখতত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য তাঁহাদের উপন্যাস সৃষ্ট হয় নাই। সত্যকে তাঁহারা সহজে লইয়াছেন, জীবনে যতটুকু দুঃখ আছে, যত নিরাশা, যত অবসাদের সম্ভাবনা আছে, অবলীলাক্রমে সকলি গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখ-দ্বন্দ্ব তাঁহাদের নিকট অভিশাপ বলিয়া বোধ হয় নাই, আশীর্ব্বাদ হইয়া উঠিয়াছে কারণ তাহারা দেখাইয়াছেন, বিপদের মধ্যেই মানব চরিত্রের পূর্ণতম বিকাশ। তাই তাঁহাদের রচনায় ত্যাগে দুঃখে 'সুরমা' 'রেবা' মহীয়সী, তাই আজন্ম দুঃখের দহনে জ্বলিয়া 'মনোরমা' আদর্শ নারী। দুঃখের মধ্যে কত বড় মাধুর্য্যের উৎস মানবচিত্তে খুলিয়া যায় তাহা তাঁহারা জানেন। তাই 'ক্ষণিকা' ও 'উর্ম্মিলার' মনোবিকাশ চোখের জলের মধ্য দিয়াই হইয়াছে। এইখানেই আধুনিক সাহিত্যের সহিত আমাদের মহিলা সাহিত্যিকগণের প্রভেদ আমরা দেখিতে পাই। তরুণ সম্প্রদায় যেখানে মানুষ কতদূর নামিতে পারে তাহা দেখাইতে যাইয়া মানবহৃদয়ের পবিত্রতম সম্পর্কগুলির মধ্যেও পূতিগন্ধ আবর্জ্জনা খুঁজিয়া বেড়ান অনুরূপা নিরূপমা প্রমুখ আমাদের ঔপন্যাসিকগণ সেখানে মানুষ কত বড় হইতে পারে তাহার চিত্র আঁকিয়া অন্ধকারের উপরেও একটি আলোর রেখা টানিয়া দেন। এইখানেই তাঁহাদের নারীত্ব, এইখানেই তাঁহাদের বিশেষত্ব। দুঃখ তাঁহাদের পরাজিত করে নাই, দৈন্য তাঁহাদের মনে গ্লানি আনিয়া দেয় নাই। মানব জীবনে যে ব্যর্থতা দেখিয়া Thomas Hardy

www.pathagar.com

এত বড় Cynic হইয়া উঠিয়াছেন, সেই ব্যর্থতাই তাঁহাদের রচনায় নির্য্যাতিতের কণ্ঠে বিজয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছে।

নারীর জীবন যেমন একটি শিল্পসৃষ্টি তাহার রচিত উপন্যাসও তেমনি একখানি চিত্রের মত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। রেখাচিত্রের ইঙ্গিতের মত দুয়েকটি কথায়, তুলির দুয়েকটি আঁচড়ে, বাস্তব জীবন যেন আমাদের সম্মুখে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেখানে যাহার চরিত্র আঁকিয়াছেন, তাহাই প্রাণবান হইয়াছে। কেবল নায়ক নায়িকা নয়, উপন্যাসে উল্লিখিত কৃষাণ, রাখাল, বুধীগাই, সোনালী বিড়াল হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চা, কদমঝি, চন্দ্রবাবু এবং অনাদিনাথের মাতা বোর্ডিং-এর ছাত্রীগণের বালিকাসুলভ চপলতা এবং হিন্দু গৃহস্থ বাড়ীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালী—কাহারও মধ্যে এতটুক আড়ষ্টতা নাই, সকলি জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে। এ যেন শিল্পীর নিপুণ হাতের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি—কোথাও এতটুকু ত্রুটি ধরিবার উপায় নাই।

জগতে যেমন, উপন্যাসেও তেমনি, প্রাণপ্রবাহ অবারিত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। জীবনযাত্রায় গতি-চাঞ্চল্যও নিপুণ শিল্পী সাহিত্যের বুকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়াছেন। এত সাদৃশ্য, অথচ কোন চিত্রকেই জীবনের হুবহু নকল বলা চলে না। দুয়েকটি কথায় লেখিকা যেন জীবনের উপর একটি সম্পূর্ণ নূতন আলোক-লেখা আনিয়া ফেলিয়াছেন—তাই উপন্যাস জীবনের Copy হয় নাই, Commentary হইয়াছে। জীবনের মধ্য দিয়াই জীবনের তত্ত্ব ফুটিয়াছে।

স্বর্ণকুমারী, অনুরূপা, নিরূপমা, অথবা সীতা, কান্তা কেহই তাঁহাদের উপন্যাসের মধ্য দিয়া কোন গুরুতর সমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহাদের রচনা জীবনের প্রতিচ্ছবি, জীবনের সমালোচনা, অথচ জীবন লইয়া তর্ক-দ্বন্দ্ব নয়। কেবল আনন্দ পাইবার জন্য, আনন্দ বিলাইবার জন্য ইহারা জীবনের উপর তুলি বুলাইয়া শুধু যেন ছবি আঁকিয়া চলিয়াছেন। জীবনস্রোতের প্রবল ঘূর্ণীতে যেখানে জীবন-মৃত্যু লইয়া সমস্যা বাধিয়াছে, দেশের সমস্যা, দশের সমস্যা, সমাজ, সংসার জগতের সমস্যা যেখানে সহস্রের প্রাণশক্তি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে—তাহার খবর ইঁহাদের উপন্যাসে আমরা পাই না। ইহাদের নিকট জীবন যেন লঘু ক্ষিপ্রগতিতে বহিয়া চলিয়াছে। প্লটের মধ্যে সমস্যা যা কিছু আছে তাহাও ব্যক্তিগত। ভাবরাজ্যের সুখ দুঃখ লইয়াই ইহাদের কাজ। কল্পনা ও মাধুর্য্যের যে রঙ্গীন আলোক ফেলিয়া ইহারা জগৎ দেখিতেছেন, তাহাতে জীবনের গুরুতর দিকটা তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই। যে বেদনা তাঁহাদের নায়ক-নায়িকার জীবনে জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাও শরৎকালের মেঘের মত হালকা ও দ্রুতাপসারী—বিষাক্ত বাষ্পের মত তাহা কণ্ঠরোধ করে না।

ভাবরাজ্যের প্রীতি-স্নেহ, আশা, নিরাশা, কামনা ব্যর্থতার মধ্য দিয়া দুলিতে দুলিতে তাঁহাদের মনোজগৎ চলিতেছে—তাহারাই একটু দূরে শত গৃহে আগুন লাগিতেছে, শত মৃত্যুর ব্যথা আকাশ বাতাস ভরিয়া দিতেছে, তাহা তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই।

এ ধরনের উপন্যাস প্রকৃত পক্ষে ভাল কি না কে বলিবে? কেহ হয়তো ইঁহাদের অন্ধ, হৃদয়হীন বলিয়া নিন্দা করিবেন, কেহবা প্রকৃত সুখবাদী বলিয়া মানিয়া লইবেন। আমরা শুধু এইটুকু বলিতে পারি, বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাজের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরা ও তাহার মীমাংসা করাই উপন্যাসের একমাত্র কর্ত্তব্য নয়। সাহিত্যের প্রধান কর্ত্তব্য আনন্দ দান। এই

www.pathagar.com

কর্ত্তব্যের ভার আমাদের মহিলা ঔপন্যাসিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। জীবনযাত্রার অবিশ্রান্ত কলরোলে ক্লান্ত হইয়া 'সোনার খাঁচা' 'শ্যামলী', 'রজনীগন্ধা' বা 'মহানিশা' খুলিয়া বসিলে কিছুক্ষণের জন্য রসে, মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে প্রাণ ভরিয়া ওঠে।

ইহাদের রচনার আরেকটি বিশেষত্ব তাঁহাদের রচনাভঙ্গী। কবিত্বে, কোমলতায় ভরা সৌরভময় ইহাদের রচনা, পথে পথে যেন শিরীষ ফুটাইয়া, বকুল ঝরাইয়া কামিনী বিলাইয়া চলিয়াছে। মৃদুমধুর বলিবার ভঙ্গীতে জীবনের উপর একখানি মায়াজাল আপনি নামিয়া আসে। চঞ্চল নৃত্যভঙ্গীতে, সাবলীল গতিতে, মৃদুমন্দ গমনে মনোহারিতা ফুটিয়া ওঠে, জীবনে স্বপ্ন রচিত হইয়া যায়। গাম্ভীর্য্যের পবিত্রতার, আনন্দের, লীলাচাঞ্চল্যের একত্র সমাবেশে সাহিত্যে বসন্ত জাগে। Gorky, Ibsen বা Bernard Shaw-র মত ইহাদের রচনায় আগুনের ফুল ফুটিয়া ওঠে না, শিরায় শিরায় রক্তের চাঞ্চল্য বাড়িয়া যায় না। কিন্তু একটি স্নিগ্ধ স্বপ্নের অপরূপ মায়ালোকে প্রাণ মন মুগ্ধ হইয়া যায়।

ভাবপ্রবণতা আমাদের মহিলা ঔপন্যাসিকগণের রচনার মূল সুর। উপন্যাস শুধু জগতের প্রতিচ্ছবি নয়, লেখকের মনশ্ছবিও বটে। তাই মহিলা ঔপন্যাসিকগণের রচনায় ছত্রে ছত্রে এত ভাবপ্রবণতা দেখিতে পাই। মনে হয় সমস্ত জীবন যেন আবেগে বসন্তের হাওয়ায় কিশলয়ের মত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। স্বর্ণকুমারী হইতে আরম্ভ করিয়া শৈলবালা ঘোষজায়া পর্য্যন্ত এই ভাবপ্রবণতা। মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ, চরিত্রের সমালোচনা, সকল ছাপাইয়া ভাবপ্রবণতা জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহার মাধুরী মনকে মুগ্ধ করিত। কিন্তু অনুরূপা, নিরুপমার রচনায় ইহার এত ছড়াছড়ি হইয়াছে যে, উন্নত আদর্শও অনেক সময় তাহাতে হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছে, স্বর্ণকুমারীর মধ্যে যাহা সংযত ছিল, অনুরূপা, নিরূপমা ও আজকাল প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর মধ্যে তাহা একেবারে বাঁধন টুটিয়া ফাটিয়া পড়িয়াছে। ফেনাইয়া, উচ্ছ্বসে ভাসাইয়া, দুঃখের উপর দুঃখ জোর করিয়া টানিয়া আনিয়া যে আদর্শ চরিত্র তাঁহারা সৃষ্টি করিয়াছেন একটুখানির মধ্যেই তাহারা মন ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে। Thomas Hardy পৃথিবীর উপর কালিমা লিপ্ত করিয়া দিয়াছেন তাঁহার নায়ক নায়িকার স্কন্ধে রাজ্যের বোঝা টানিয়া আনিয়া। ইহারাও তেমনি 'মনোরমা', 'রেবা', 'সীতা', 'অপর্ণা'কে মুহূর্ত্তের জন্যও দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি দেন নাই। কিন্তু রচনাভঙ্গীতে একটা ঔজ্জ্বল্য আছে, আদর্শের সুর আছে বলিয়া তাঁহাদের জগৎ কালো হইয়া ওঠে নাই। বেদনার ভারে নীল হইয়া গিয়াছে। অনুরূপা, নিরূপমার রচনা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন নীল আকাশের গায়ে জ্যোৎস্না ছড়াইয়া গিয়াছে, আর সেই স্নিগ্ধ ম্লানাভ জগতে একাকী মাঠের মধ্যে দাঁড়াইয়া চারিদিকে উদাস হাওয়ার কান্না শুনিতেছি। কিন্তু এত সৌন্দর্য্য থাকা সত্ত্বেও উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ সংযমহীন বলিয়া রচনার গুণ একটু লঘু হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের রচনাবলীর মধ্যে একমাত্র 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে'ই উভয় দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করা হইয়াছে। তাই এ উপন্যাসটি সাহিত্য জগতে অনুপম, 'মহানিশা', 'মা' 'পোষ্যপুত্র' প্রভৃতিতে রচনাভঙ্গী যতই সুললিত হউক, অতিরিক্ত, ভাবপ্রবণতার দোষে যে আসন তাহারা সাহিত্যে অধিকার করিতে পারিত, তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। সীতাদেবী শান্তাদেবীর রচনায় ভাবপ্রবণতার এত ছড়াছড়ি দেখিতে পাই না। পরিপূর্ণ জীবনাস্রোতের মধ্য হইতে ইহারা চিত্র বাছিয়া লইতেছেন। সীতা-শান্তার উপন্যাস দিনের আলোয় উজ্জ্বল নির্ঝরের নৃত্যের মত, হাসির টুকরার মত

অপরূপ চাঞ্চল্যে মধুময়। অনুরূপা-নিরূপমার মত উচ্চ আদর্শ তাঁহাদের নাই, কিন্তু রচনাকৌশল, সংযত প্রকাশের ভঙ্গী ও চরিত্র চিত্রণ নৈপুণ্যের জন্য মহিলা সাহিত্যে উহারা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন। সীতা-শান্তার রচনায় একটু যেন পরিহাসের ভাব আছে, হাসি-ঠাট্টা যেন প্রতি ছত্রে জগতের সর্ব্বত্র ঝর্ণার চলার পথে উপলখণ্ডের মত ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। এই রহস্যের ভাবটি তাঁহাদের রচনার একটি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। 'উদ্যানলতা'র 'মুক্তির' মত তাঁহারাও একটু যেন ইচ্ছা করিয়াই জীবনের হালকা স্রোতের দিকে সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু তরল স্রোতের নিম্নদেশে গভীরতম প্রবাহের মত তাঁহাদের হাসি ঠাট্টার অন্তরালে যে মধুর পবিত্র গাম্ভীর্য্য বহিয়া চলিয়াছে, তাহার পরিচয় পাইতেও বিলম্ব হয় না। 'সোনার খাঁচা', 'উদ্যানলতা', 'পরভৃতিকা', 'জীবনদোলা', 'রজনীগন্ধা', 'চিরন্তনী' তাই বাংলার সাহিত্য রসিকের নিকট এত প্রিয়। 'সোনার খাঁচা'র মূল্য তো আজ বিদেশী পাঠকেরও অবিদিত নাই।

অন্যান্য দেশের মহিলা সাহিত্যিকগণের সহিত তুলনা করিতে গেলে দেখিতে পাই, George Eliot-এর চিন্তার গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব, কিম্বা Marie Corellie-র ভাষার জোর আমাদের মহিলা ঔপন্যাসিকগণের রচনায় নাই। Jane Austen-এর মত প্লটের কৌশলও তাঁহাদের নাই। কিন্তু আদর্শ ও রচনাভঙ্গীর বিশেষত্বের গুণে সাহিত্যে তাঁহারা একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় হইয়া রহিয়াছেন। প্লটের মধ্যে রহস্যময় ঘোরালো কিছু না থাকিলেও ইঁহাদের রচনায় প্লটের বিকাশ বড় চমৎকার হইয়াছে। পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন একটি শতদল আলো বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া দল মেলিতেছে। Charlotte Bronte-র ভাবপ্রবণতা ও Mrs, Browning-এর কাব্যের সুর ইহাদের রচনায় ঝংকার রাখিয়া গিয়াছে। আর ঝংকৃত হইয়া উঠিয়াছে একটি সুর—সে ভারতের চিরন্তন ত্যাগ ও দুঃখের মহিমার গীতি কথা—যাহার জন্য ইঁহাদের উপন্যাস বিশেষ করিয়া ভারতের হইয়া রহিয়াছে।

সৌন্দর্য্যের কথা অনেক বলিয়াছি, এখন দোষের কথা একটা বলিয়া শেষ করিব। এমন মধুর, এমন কোমল যাঁহাদের রচনা, শুদ্ধ মাত্র জীবনের একটি দিককে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের কল্পনার সমাপ্তি হয় কেন? অনুরূপা-নিরূপমা, সীতা-শান্তা প্রত্যেকের তিন চারিখানা উপন্যাস পড়িলেই দেখা যায় ইহাদের যে একটি নির্দ্দিষ্ট গণ্ডী আছে, তাহার বাহিরে তাঁহাদের মনের শক্তি পৌঁছায় না। 'মা'র মধ্যে যে অনাদৃতা ভাগ্যহীনা পত্নীকে দেখিয়াছিলাম 'দিদি', 'শ্যামলী', 'মহানিশা' এমন কি 'উত্তরায়ণে' ও তাহারই ছায়ায় গঠিত অন্যান্য চরিত্র দেখিয়া মনে হয়, ভাবের মাধুর্য্য ইহাদের যতই থাকুক, প্রাচুর্য্য নাই। সীতা-শান্তার সম্বন্ধেও সেই একই কথা বলা যাইতে পারে। 'উদ্যানলতা' ও 'রজনীগন্ধা'য় যে বোর্ডিং ও স্কুল জীবনের নিখুঁত চিত্র দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছিলাম, শেষের দিকে রাশি রাশি ছোট গল্পে, 'জীবন দোলা' এবং 'পরভৃতিকায়' তাহারই পুনরাবৃত্তি দেখিয়া দুঃখিত হইতে হইয়াছে। আজকাল তাঁহারা রেঙ্গুন ও প্যাগোডার মোহে আচ্ছন্ন। এদিকে তাঁহাদের নায়ক নায়িকার সঙ্গে সঙ্গে সহস্রবার রেঙ্গুন যাত্রা করিয়া পাঠক সমাজ যে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে সে কথা তাঁহাদের মনে নাই। তাহার উপর নবযুগের মহিলা সাহিত্যিকগণের মধ্যে যাঁহারা তুলি হাতে লইয়াছেন, তাঁহারাও নূতন কিছু না খুঁজিয়া একই চিত্রের উপর একটু আধটু রঙ বদলাইয়া তাহার নূতন নামকরণ করিয়া পাঠকবর্গের নিকট প্রেরণ করিতেছেন।

www.pathagar.com

অনুকরণে, ভাবোচ্ছ্বাসে অযথা প্রণয়কাহিনীতে বাংলার সাহিত্য ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের মনে রাখিতে হইবে, পবিত্রতা ও কোমলতা বজায় রাখিয়া জীবনের আরও বহু দিকের চিত্র আঁকিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে। বহুদিন পায়ে চলিয়া যে পথ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে তাহার মোহ পরিত্যাগ করিয়া সংকীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে অপরিচিত পথে একাকী চলিতে চেষ্টা করুন, নারীহৃদয়ের সহানুভূতি নারীচিত্তের পবিত্র মাধুরী আলোক রেখার মত সমস্ত জগতে বিস্তৃত হইয়া পড়ুক। নূতন নূতন ফুলের সৌরভে বাংলার সাহিত্য আকুল হইয়া উঠিবে।

www.pathagar.com

গ্যেটে

কাজী আবদুল ওদুদ এম.এ.

সুবিখ্যাত দার্শনিক ক্রোচে গ্যেটে সম্বন্ধে যে বইটি লিখেছেন তাতে গ্যেটের মনীষা ও কাব্য সম্বন্ধে নানা বিচার বিশ্লেষণের পর বলেছেন—সাহিত্যের ইতিহাসের ক্রমবর্ধনের ধারায় গ্যেটের স্থান কি তা নির্দ্দেশ করতে তিনি অক্ষম। বলা বাহুল্য, এ অক্ষমতার অন্য নাম আপত্তি। কারণ, তাঁর মতে—প্রত্যেক কবি হচ্ছেন এক একজন স্বতন্ত্র স্রষ্টা, আর তাঁর সৃষ্টির বিষয় হচ্ছে তাঁর নিজের ব্যক্তিত্ব, তাঁর জীবনের সঙ্গে যার অবসান ; পরে পরে যাঁরা আসেন তাঁরা যদি সত্যকার কবি হন তবে নূতন-কিছু সৃষ্টি করেন, আর তা না হলে অনুকরণ করেন, কিন্তু অনুকারকের স্থান কাব্যের ইতিহাসে সত্যই নেই—। তবু তিনি স্বীকার করেছেন–

> ......in Goethe's poetry, in his rich, varied, impressionable and highly intelligent mind were mirrored for the first time in conspicuous fashion many sides of the modern spirit."

অনেক সাহিত্যিকই গ্যেটের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে সব চাইতে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বোধ হয় কার্লাইলের। তিনি তাঁর 'Hero and Hero worship' গ্রন্থে 'Hero as man of letters' অধ্যায় গ্যেটের কথা দিয়ে শুরু করেছেন, এবং গ্যেটের প্রতিভা যে জগতে এক নূতন বিস্ময়ের সামগ্রী, যে-হজরত মোহাম্মদের তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করেছেন তাঁর প্রতিভার চাইতেই যে গ্যেটের প্রতিভা উচ্চতর গ্রামের ইত্যাদি কথা বলবার পর বলেছেন—গ্যেটের কথা থাকুক, কেউ আপাতত তাঁকে বুঝবে না। এই বলে তিনি রুসো বার্ণস্ প্রমুখ সাহিত্যিকদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে মনোনিবেশ করেছেন।—কিন্তু ক্রোচে যে গ্যেটের প্রতিভাকে modern spirit-এর (আধুনিকতার) এক বড় প্রতীক বলেছেন সেইটি ভাল করে বুঝতে পারলে গ্যেটের সঙ্গে আমাদের সত্যকার পরিচয় হয়ত খানিকটা হবে।

গ্যেটের ভিতরে এই যে সুবৃহৎ নূতন মন, বলা যেতে পারে, Renaissance (নবজাগরণ)-সূচিত মানসিকতার তা এক বড় পরিণতি। শিক্ষিত ব্যক্তিরা জানেন, ইয়োরোপের Renaissance কয়েক শতাব্দীব্যাপী ব্যাপার, বহু লক্ষণের তারা জটিল, আর তা শুধু সৌন্দর্য্য ও আনন্দের কাহিনীই নয়, সেই সৌন্দর্য্য ও আনন্দের সঙ্গে মিশে রয়েছে অনেকখানি কদর্য্যতাও—টলষ্টয় তাঁর শেষ বয়সের কতকগুলো রচনায় যার দিকে তাঁর বলিষ্ঠ তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করেছেন। তবু এ সত্য যে Renaissance-কাহিনী মোটের উপর মানুষের ঊষর চিত্তক্ষেত্র পল্লবিত করবার কাহিনী, মানুষের জাগতিক জীবনের সুখ-সম্ভোগের এক করুণ মধুর কাহিনী—কিন্তু এই Renaissance-পুষ্পের সৌরভে ফ্রান্স ইতালি ইংলন্ড প্রভৃতি দেশ আমোদিত হলেও তুহিনাবৃত জার্ম্মানী বহুদিন পর্য্যন্ত তা থেকে বঞ্চিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে সেখানে দেখা দিল ধর্ম্মান্দোলন Reformation,

www.pathagar.com

আপাতদৃষ্টিতে যে বহুদিক দিয়ে Renaissance-এর বিপরীত-ধর্মী। অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্ম্মনীর যে Classicism-প্রাচীন গ্রীক শিল্প ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভের চেষ্টা—তার সঙ্গেই বরং Renaissance এর আত্মীয়তা বেশী। কিন্তু জার্ম্মানীর Classicism তার পূর্ব্ববর্ত্তী Reformation-এর বিপরীতধর্মী বোধ হলেও বাস্তবিকপক্ষে এটি Renaissance ও Reformation-এর বেশ এক সমন্বয়। এই Classicism-এর প্রবর্ত্তকদের সৌন্দর্য্যানুরাগ Renaissance-এর, কিন্তু তাঁদের সত্য ও স্বদেশানুরাগ অন্য কথায়, কল্যাণানুরাগ, Reformation-এর। এই Classicism-এর এক শ্রেষ্ঠ নায়ক Lessing-এর একটি উক্তি খুব প্রণিধানযোগ্য। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বোঝানোর জন্য তিনি লিখেছিলেন Laokoon,—এক জগদ্‌বিখ্যাত বই, যদিও আকারে ক্ষুদ্র ; তিনিই বলেছেন—ঈশ্বর যদি এক হাতে পূর্ণ জ্ঞান অপর হাতে প্রয়াসের অনন্ত দুঃখ এই দুটি নিয়ে বলেন, কোন্‌টি নেবে বলো, তা হলে বল্‌ব, পিতঃ, প্রমাদহীন পূর্ণজ্ঞান তোমাতেই সাজে, আমাকে দান কর অনন্ত প্রয়াস।*

জার্ম্মানীর এই অষ্টাবিংশ শতাব্দীর Classicism-এর শ্রেষ্ঠ প্রতীক গ্যেটে। সত্য বটে তিনি নিজেকে খ্রীষ্টান বলে পরিচিত করবার জন্য ব্যগ্রতা দেখে নি, বরং বলেছেন "আমি পেগ্যান" (Pagan), প্রকৃতির পূজারি, (মুসলমানী ভাষায় "কাফের"), সেই পরমসৌন্দর্য্যপ্রেমিক গ্যেটের ভিতরেও সত্যান্বেষণের বীরব্রত কতখানি ছিল তা তাঁর এই উক্তি থেকেই বুঝা যাবে—

> "In religious scientific and political matters, I generally brought troubles upon myself because I was no Hypocrite and had the courage to express what I felt."

একটা জাতির জাগরণে প্রতিবিম্বিত যেন বসন্ত ও বর্ষার নৈসর্গিক প্রাচুর্য্য। বসন্ত ও বর্ষার নৈসর্গিক প্রাচুর্য্য। বসন্তের আগমনে দেখা দেয় গাছে গাছে নূতন পাতা, ডালে ডালে লাখো পাখীর আনন্দ-গান ; বর্ষায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে নদী নালা ভরে ওঠে উপরের নিরন্তর বর্ষণে ;—একটা জাতির জাগরণ-সময়ে তেম্‌নি একই সঙ্গে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু কর্মীর আবির্ভাব ঘটে। অষ্টাবিংশ শতাব্দীর জার্ম্মান জাগরণে দেখতে পাই চিত্রের ক্ষেত্রে oeser, Winckelmann ; সাহিত্যে Klopstock, Herder, Wieland, Goethe, Schiller ; দর্শনে Kant, Nietzsche, Schelling, Hegel, Schopenhauer ; সমালোচনায় Schlegel ; সঙ্গীতে Mozart, Beethoven...... ইত্যাদি—এ যেন দেখ্‌তে দেখ্‌তে গগন বিদীর্ণ করে দাঁড়ালো বিচিত্রশীর্ষ এক বিরাট পর্ব্বত ! বিশেষজ্ঞরা বলেন—এই শৃঙ্গমালার উচ্চতম মহত্তমটির নাম গ্যেটে।

গ্যেটের চরিতাখ্যায়ক Lewes বলেছেন—

> ......of all the failings usually attributed to literary men Goethe had the least of what could be called jealousy ; of all the qualities

---

* "If God were to hold in his right hand all truth, and in his left hand the single ever-active impulse to seek after Truth, even though with the condition that I must eternally remain in error, and say to me, "Choose", I would with humility fall before his left hand and say, "Father. Give! For pure thoughts belong to thee alone."

www.pathagar.com

> which sit gracefully on greatness he had the most of magnanimity.†

এ আদৌ অতিরঞ্জন নয় এই অসাধারণ প্রতিভা তাঁর প্রতিভার ভারে আদৌ টলটলায়মান হন নি। কত সহজভাবে তিনি বলেছেন—

> Even the greatest genius won't go far if he tried to owe everything to his own internal self. But many very good men do not comprehend that and they grope in darkness for half a life with their dream of originality......I by no means owe my work to my wisdom alone, but a thousand things and persons around me who provided me with material. There were fools and sages, minds enlightened and narrow, childhood, youth and mature age--all told me what they felt, what they thought, how they lived and worked and what experience they had gained ; and I had nothing further than to put out my hand reap what others had sown for me.

অন্যত্র তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী Winckelmann, Lessing, Herder প্রভৃতির নিকট তাঁর ঋণ তিনি বার বার স্বীকার করেছেন।—কিন্তু তবু এ সত্য যে গ্যেটে যদি অপরিসীম-কীর্ত্তিমণ্ডিত গ্যেটে না হতেন তাহলে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তীদের মাহাত্ম্য অমন পরিকীর্ত্তিত হবার সম্ভাবনা কমই ঘটত—যেমন, কোনো পরিবারকে লোকচক্ষুতে গৌরবমণ্ডিত করেন তার বহু স্বল্পকীর্ত্তি সন্তান নন, তার একজন অতুলকীর্ত্তি সন্তান। তাই গ্যেটে নিজে তাঁর মাহাত্ম্যবিশ্লেষণে উদাসীন হলেও তাঁকে যাঁরা বুঝতে চান তাঁদের পক্ষে সে-ঔদাসীন্য অসার্থক।

১৭৪৯ খৃঃ অব্দে Frankfort নগরে এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারে গ্যেটের জন্ম হয়। তাঁর আত্মচরিতে তিনি তাঁর বাল্যজীবনের ছবি নিপুণ হস্তে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর সেই বাল্য-কাহিনীতে বেশী করে চোখে পড়ে দুইটি ব্যাপার—তাঁর স্বভাবদত্ত প্রতিভা আর তাঁর পিতার শিক্ষা-ব্যবস্থা।—তিনি যখন সাত আট বৎসরের বালক তখন এক প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। তিনি তাঁর আত্মচরিতে লিখেছেন, এই ঘটনা তাঁর বালক-মনের উপরে গভীর রেখাপাত করে। সবারই মুখে যিনি দয়াল প্রেমময় ইত্যাদি নামে পরিকীর্ত্তিত তাঁরই সামনে এমন ধ্বংস কি করে সম্ভবপর, সেই চিন্তায় তাঁর চিত্ত কিছুদিন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। কিন্তু তাঁর -সৌন্দর্য্যানুরাগী মনে এ দুশ্চিন্তার ভার স্থায়ী হয় নি।—তার উপর ধর্ম্মসম্বন্ধে বহু বাদানুবাদ তিনি অনেক সময়েই শুনতেন। এই সব থেকে ইহুদি-পুরাণের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ক্রোধপরায়ণ ঈশ্বরে অপ্রত্যয় ও প্রকৃতির অধীশ্বর শান্ত সুন্দর ঈশ্বরে প্রত্যয় তাঁর বালক-মনে প্রবল হতে থাকে। কিন্তু এই ঈশ্বরকে তিনি কেমন করে তাঁর অন্তরের পূজা নিবেদন করবেন? তাঁর পিতা বহু খনিজ দ্রব্য সংগ্রহ করেছিলেন, তিনি ঠিক করলেন সেই সব খনিজদ্রব্য প্রকৃতির বৈচিত্র্যের প্রতীকরূপে একখানি সুদর্শন কাষ্ঠখণ্ডের উপরে সাজাবেন। কিন্তু কেমন করে মানুষের মনের স্তব পরিব্যক্ত হবে? শেষে

www.pathagar.com

ঠিক হলো তাঁর ছবি আঁকার Pastel পেন্সিল সেই সব ধাতুদ্রব্যের উপরে দাঁড় করিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে দেবেন, তা থেকে যে ধূম কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠবে সেই হবে মানুষের মনের স্তবের প্রতিচ্ছবি।—এক প্রভাতে তিনি এইভাবে ঈশ্বরের প্রতি স্তুতি নিবেদন করলেন—Pastel পেন্সিলে আগুন ধরালেন উদীয়মান সূর্য্যের দিকে আতস-কাচ ধরে'। কিন্তু এই স্তব নিবেদনের এক মন্দ ফল ফলেছিল—Pastel পেন্সিল পুড়ে গিয়ে সেই সুদর্শন কাষ্ঠখণ্ডে আগুন ধরেছিল, আর তাতে তার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এর উপর গ্যেটে একটি সুগভীর মন্তব্য করেছেন—

> The accident might almost be considered a hint and warning of the danger there always is in wishing to approach the Deity in such a way.

তাঁর বাল্য-জীবনের অপর একটি লক্ষ্যযোগ্য ঘটনা এই : একদিন এক স্কুলে তাঁর সহপাঠীরা এই বলে তাঁকে জব্দ করতে চেষ্টা করে যে তাঁর পিতা তাঁর পিতামহের ছেলে নন, অন্য কোনো বড় লোকের ছেলে (তাঁর পিতামহ দর্জ্জি-ব্যবসায়ী ছিলেন)। সঙ্গীদের এই নির্ম্মম কথার উত্তরে বালক গ্যেটে শান্তকণ্ঠে বলেছিলেন—এ যদি সত্য হয় তাতেই বা এমন কি ক্ষতি ; জীবন এমন এক মহা দান যে এর জন্য কার কাছে কে ঋণী সে কথা না ভেবেও পারা যায়, কেননা এতটকু তো সত্য যে ঈশ্বরের কাছে থেকেই তা' এসেছে, আর তাঁর সামনে সবাই সমান।

তাঁর পিতা উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন ; কিন্তু নিজে জীবনে বেশী কিছু করতে পারেন নি। তাঁর ব্যর্থ জীবন তাঁর পুত্রের ভিতর দিয়ে সার্থকতা লাভ করুক এই ছিল তাঁর সাধনা। পুত্রকে প্রায় সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ করবার আয়োজন তিনি করেছিলেন। কলেজে প্রবেশের পূর্ব্বে চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সে গ্যেটে মাতৃভাষা ভিন্ন লাটিন, ইতালীয়, হিব্রু, গ্রীক, ফরাসী ও ইংরেজী শিখেছিলেন, এর উপর চিত্রাঙ্কন, নৃত্যগীত, অসিচালনা, উদ্যানরচনা ইত্যাদিতেও অভ্যস্ত হয়েছিলেন। তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়ন করেন। কিন্তু প্রথমে Leipsig এ গিয়ে তিনি তা করেন নি। পরে Strasburg-এ তিনি আইন অধ্যয়ন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রাণের সামগ্রী বরবারই ছিল কাব্যচর্চ্চা ও চিত্রাঙ্কন।

গ্যেটের সাহিত্যিক গুরুদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এঁদের সাহায্যে তাঁর জ্ঞান দিন দিন গভীরতর হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর কাব্যের সত্যকার উৎস তাঁর এই গুরুদের প্রেরণা তত নয় যত তাঁর নিজের প্রণয়-ব্যাপার। সেই প্রেমের দহন তিনি সারাজীবন ভোগ করেছেন। বাস্তবিক, গ্যেটের ভিতরে একই সঙ্গে দুই অদ্ভুত ধারা যথেষ্ট লক্ষ্যযোগ্য—একটি জ্ঞানান্বেষণ, অপরটি প্রেমবিধুরতা।

গ্যেটের প্রণয়-কাহিনী তাঁর জীবন ও কাব্যের ইতিহাসে খুব বড় জায়গা দখল করে আছে। কিন্তু এখানে তাঁকে ভুল বোঝা এতই স্বাভাবিক যে তাঁর স্বদেশবাসীরাও বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁকে এ ব্যাপারে নিকৃষ্ট রঙে রঞ্জিত করে এসেছেন। আমাদের জন্য ব্যাপারটি আরো কঠিন এইজন্য যে আমাদের সংস্কার অনেক বিচ্ছিন্ন, তা যতই কেন আমরা ইয়োরোপের প্রীতি-সম্পন্ন না হই।

www.pathagar.com

দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যেতে পারে Frau Von Stein–এর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালব্যাপী সম্বন্ধ। তাঁর চরিতাখ্যায়কদের কেউ কেউ বলেছেন, গ্যেটে ও Von Stein–পত্নীর সম্বন্ধ মোটের উপর একটি প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সম্বন্ধ, তার বেশী কিছু নয় ; অপরে এ মত আদৌ গ্রাহ্য করেন নি। তেমনিভাবে জটিল বৃদ্ধবয়সে যুবতী বন্ধুপত্নী Marianne Von Willemer–সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ—যা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল হাফিজের অনুসরণে তাঁর সুবিখ্যাত West-Eastern Divan. কিন্তু এর জন্য যাঁরা তাঁকে ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র বলতে চান তাঁদের মত গ্রহণ করতে আমাদের বাধে এইজন্য যে কবির অন্তরাত্মা প্রতিবিম্বিত হয় যাতে সেই কাব্যে গ্যেটে যে প্রেমের ছবি অঙ্কিত করেছেন তাতে ফুটে রয়েছে এক আশ্চর্য্য পবিত্রতা। তাঁর Sorrows of Werther–এ werther Albert–এর বিবাহিতা Charlotte–র প্রেমে আত্মহারা ; সে এক জার্ম্মান "মজনু" ; কিন্তু সেই Werther–ই এক জায়গায় বলছেন—

> "...Is not my love for her the purest, most holy...has my soul ever been sullied by a single sensual desire?"

তাঁর "Elective affinities" গ্রন্থে নায়ক Eduard তাঁর স্ত্রীকে বিস্মৃত হয়ে Ottile–র প্রেমে পাগল হয়েছেন ; কিন্তু Ottile – তাঁর কাছে দেববিগ্রহের মতো পবিত্র, Ottile–এর একটু ইঙ্গিতে কঠোরতম সংযমে তিনি নিজেকে বাঁধছেন।—ক্রোচে বলেছেন, Faust প্রথম খণ্ডে Margaret–এর সঙ্গে Faust–এর সম্বন্ধে ইন্দ্রিপরতন্ত্রতা বেশী প্রকাশ পেয়েছে, Faust তাঁর সমস্ত জ্ঞানান্বেষণ বিস্মৃত হয়ে বৃদ্ধা দূতীর সাহায্যে Margaret–কে আয়ত্ত করেছেন। দূতীর মধ্যবর্ত্তিতাই যদি ক্রোচের কাছে প্রধান আপত্তিকর ব্যাপার হয় তবে সেই কালের দোহাই দিয়ে সহজেই তাঁকে অনেকখানি নিরুত্তর করা যেতে পারে। তাছাড়া, প্রথম কয়েক দৃশ্যের সেই বিশ্বজ্ঞানের পিপাসু সুন্দর ও সবল-চিত্ত Faust যে পরে বদ্‌লে কামুক হয়ে গেছেন তা সত্য নয়। Margaret–র প্রেমে বাস্তবিকই তিনি আত্মহারা ; Margaret–এর কক্ষে গোপনে প্রবেশ করে তিনি তাঁর নিজের ভিতরে এক রহস্যময় পরিবর্ত্তন অনুভব করছেন :—

> "......And I? What drew me here with power ?
> How deeply am I moved, this hour!
> What seek I ? Why so full my heart and sore ?
> Miserable Faust! I know thee now no more.
> Is there a magic vapour here ?
> I came with lust of instant pleasure,
> And lie dissolved in dream of love's sweet leisure..."*

---

* আর আমি ? কিসের সবল আকর্ষণ আমাকে এখানে এনেছে ?
কি প্রবল ভাবেই না আন্দোলিত হচ্ছে আমার অন্তর !
কি আমি চাই ? কেন এখন হৃদয় আমার এমন উদ্বেলিত ও ব্যথিত ?
হায় ফাউস্ট ! তোমাকে আর চেনা যায় না।
এখানে কি কোনো যাদু–বাষ্প আছে ?
আপাততৃপ্তির কামনা নিয়ে আমি এসেছিলাম ;

www.pathagar.com

তাঁর Tasso, Iphigenie, প্রভৃতি গ্রন্থ থেকেও এই ধরনের প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু এম্‌নি করে তাঁর পক্ষ সমর্থন করলেও আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের কথা ছেড়ে দিয়ে শিক্ষিত সাধারণকে নিয়েও নরনারীর এমন সম্বন্ধ কল্পনা করা খুব সহজ কি? এই সুন্দর স্বেচ্ছাচার আমাদের দেশের হিন্দু-দেবদেবীর লীলায় বেশ আছে, মুসলমানের বেহেশ্‌তের প্রচলিত ধারণায় খানিকটা আছে, কিন্তু এরই ভিতর দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে শ্রেয়ে পৌঁছানো—এ আজো আমাদের সহজ ধারণার বহির্ভূত।—কেউ কেউ বলেছেন, গ্যেটের ভিতরে 'পাপ বোধ' 'অন্যায় বোধ' এসব ছিল না, মানুষের জন্য বিশেষ কোনো দরদ তিনি অনুভব করতেন না, যেমন Amiel বলেছেন—

> "He is a Greek of the great time, to whom the inward crises of the religious consciousness are unknown......he takes no more interest than Nature herself in the disinherited, the feeble, and the oppressed......†

.......কিন্তু এ মত যে সত্য নয় তা Amiel নিজই সেই দিনের ডায়রীর শেষের দিকে ব্যক্ত করেছেন—

> "One must never be too hasty in judging these complex natures."$

প্রকৃতির সমস্ত ভাঙচুর ছাপিয়ে জাগে প্রাণের সবুজ উৎসব—আমাদের মনে হয় গ্যেটের প্রতিভা ছিল প্রকৃতিরই মতো অপরিসীম বীর্য্যবন্ত, তাই তাঁর ভিতরকার সমস্ত দুঃখ-বিপত্তি বেদনা বিক্ষোভ আত্মগোপন করেছিল এক পরম রমণীয় প্রফুল্লতার অন্তরালে। এই সম্পর্কে গ্যেটে নিজেও বলেছেন—

> Only he who has been the most sensitive can become the hardest and coldest of men, for he has to encase himself in triple steel......and often his coat of mail oppresses him.*

গ্যেটের ভিতরে একই সঙ্গে প্রেমবিধুরতা ও জ্ঞানান্বেষণ বিদ্যমান এর ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে বহু কথা বলবার আছে—গ্যেটে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুদের এটি বিশেষ অনুধাবনের বিষয়। প্রেমে তিনি যেন একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়েন আর তাঁর আর-একটি চেতনা

কিন্তু প্রেমের স্বপ্নরসে আমি এখন নিমজ্জিত।

† তবে ব্যাপারটি অন্য দিক দিয়েও ভাবা যেতে পারে। নারীর ব্যক্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না ; সেই ব্যক্তিত্ব স্বীকার করলে গ্যেটের জীবন ও প্রয়াস হয়ত মানুষের স্বাভাবিক জীবনের ব্যাপার বলেই আমরা ধারণা করতে পারব।

তিনি হচ্ছেন গৌরব-যুগের একজন গ্রীক 'ধর্মবোধের'র অন্তর বেদনা যাঁর কাছে অজ্ঞাত।...... জগতের বঞ্চিত দুর্বল ও অত্যাচারিতদের প্রতি প্রকৃতির মতোই তিনি উদাসীন।

... এই জটিল প্রকৃতির লোকদের সম্বন্ধে তাড়াতাড়ি কোনো মত প্রকাশ করা অসঙ্গত।

Amiel's Journal--p. 187

* যিনি সব চাইতে অনুভূতিপ্রবণ কেবল তিনিই হতে পারেন সব চাইতে কঠিন ও নির্বিকার ; কেননা তাঁর পক্ষে প্রয়োজন হয় নিজেকে বহুস্তর বর্মে আবৃত কর.........আর অনেক সময় এই বর্ম হয় তাঁর জন্য পীড়াদায়ক।

www.pathagar.com

যেন বসে বসে তাঁর মত্ততার কাহিনী সংগ্রহ করতে থাকে। এই আশ্চর্য্য বাস্তব–প্রীতি, এই যেন গ্যেটে–প্রতিভার সবখানি কথা। তাঁর গুরু ও বন্ধু Merk তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন—বাস্তব (সত্য) যা তুমি তাকে দাও কাব্য–রূপ you give poetic from to the real. তাঁর কাব্যের এর চাইতে সুন্দরতর পরিচয় হয়ত আর দেওয়া যায় না। অথচ তাঁর এই বাস্তব–প্রীতি কেন তথাকথিত realism–এ (বস্তুতন্ত্রতায়) পরিণত হলো না সে সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন :

প্রকৃতির সঙ্গে শিল্পীর সম্বন্ধ দ্বিবিধ ; তিনি একই সঙ্গে তার প্রভু ও দাস। দাস এই কারণে যে পার্থিব সামগ্রীর সাহায্যে তাঁকে কাজ করতে হয় নিজেকে বোঝানোর জন্য ; আর প্রভু এই কারণে যে সেইসব পার্থিব সামগ্রী তিনি উপায়স্বরূপ ব্যবহার করেন তাঁর উচ্চতর উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলতে।—সমগ্রতার সাহায্যে শিল্পী তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। এই সমগ্রতা কিন্তু প্রকৃতিতে নেই ; এটি তাঁর নিজের চিত্তের ফল, অথবা বলা যায়, ফল–সঞ্চারী ঐশ্বরিক প্রেরণা।†

গ্যেটের এই ধরনের মতামত অনুসরণ করে Dr. Rudolf Steiner একটি বই লিখেছেন, তার নাম তিনি দিয়েছেন Goethe as the founder of a new Science of Aesthetics. তার মূল কথা কতকটা এই—প্রকৃতির ভিতরে বুঝতে পারা যায় এক উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত, মানুষের জীবনে রয়েছে তারও চাইতে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত,—শিল্পীর রচনায় তারই প্রকাশ ; যেমন গ্যেটে বলেছেন...

> In that Man is placed on nature's pinnacle, he regards himself as another whole Nature, whose task is to bring forth inwardly yet another pinnacle. For this purpose he heightens his powers, imbuing himself with all perfections and virtues, calling on choice, order, harmony, and meaning, and finally rising to the production of the work of art, which takes a prominent place by the side of this other actions and works. Once it is brought forth, once it stands before the world in its ideal reality, it produces a permnent effect--it produces the highest effect--for as it develops itself all that is glorious and worthy of devotion and love, and thus breathing life into the human form uplifts man above himself, completes the

† The artist has a two fold relation to nature ; he is at once her master and her slave. He is her slave in as much as he must work with earthly things in order to be understood, but he is must work with earthly things in order to be understood, but he is her master. in as much as he subjects these earthly means to his higher intentions and renders them subservient.
The artist would speak to the world through an entirety ; however, he does not find this entirety in nature ; but it is the fruit of his own mind, or if you like it, of the aspiration of a fructifying divine breath.

www.pathagar.com

> cycle of his life and activity, defies him for the present in which the past and future are included......*

এ সম্বন্ধে গ্যেটের আরো কয়েকটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

> ......Occasional poems (are) the first and most genuine of all kinds of poetry...
>
> ......The first and last thing demanded of genius is love of truth......
>
> ......I seek in everything a point from wihch much may be developed......†

Theodore Watts-Encyclopaedia Britannica-য় Poetry শীর্ষকে লেখায় কবি-দৃষ্টিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন—Absolute Vision শুদ্ধদৃষ্টি ও Relative Vision আপেক্ষিক দৃষ্টি। সেই Absolute Vision এর দৃষ্টান্ত তিনি দেখেছেন Shakespeare এ ও Homer-এ। Absolute Vision বলতে তিনি বুঝেছেন বস্তুর নিজস্বতার বিবৃতি ; কবি নিজের রাগ-দ্বেষ একেবারে ভুলে গিয়ে কোনো বস্তুর বা কোনো ব্যক্তির মর্ম্মে প্রবেশ করে তাকে বিশ্লেষণ করছেন, রূপময় করছেন। এইভাবে সম্পূর্ণভাবে আত্মবিস্মৃত হয়ে Absulute Vision-লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর কি না, অর্থাৎ শেক্‌সপীয় ও হোমর তাঁদের Absulute Vision-এর মুহূর্তেও শেক্‌স্‌পীয়রত্ব ও হোমরত্ব বিবর্জ্জিত হয়েছিলেন কি না, সে বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক চলতে পারে। তবে এই আত্মবিলোপ কবির পক্ষে মানুষ-হিসাবে যতখানি সম্ভবপর সেদিক দিয়ে দেখলে হয়ত বোঝা যাবে, যত্যকার Absulute Vision অর্থাৎ মানুষের মনের বহু স্তরের বহু গ্রামের অবস্থা সম্বন্ধে Vision গ্যেটের চাইতে শেক্‌স্‌পীয়রে ও হোমরে বেশী নয়। কিন্তু সাহিত্যের প্রচলিত শাস্ত্র অনুসারে এ হয়ত blasphemy—"কাফেরী কালাম"—তাই বেশী কিছু না বলাই শোভন।

---

* প্রকৃতির চূড়ায় অধিষ্ঠিত মানুষ নিজেকে জ্ঞান করে আর-এক পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতি বলে, তার কাজ হচ্ছে অন্তর্লোকে আর-এক চূড়ার সৃষ্টি করা। এই উদ্দেশ্যে সে তার ক্ষমতার উৎকর্ষ সাধন করে—সমস্ত সৌষ্ঠব ও গুণপণায় সে নিজেকে করে ভূষিত, নির্বাচন শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য অর্থবোধ, এ-সবরে হয় তার বিশেষ প্রয়োজন, অবশেষে লাভ হয় তার শিল্প-সৃষ্টির যোগ্যতা যা তার অন্যান্য কর্ম ও কীর্ত্তির পাশে লাভ করে বিশেষ মর্যাদার স্থান। একবার যদি এর সৃষ্টি হয়, একবার যদি এই শিল্পসৃষ্টি জগতের সামনে দাঁড়ায় মানস-সত্য রূপে, তা হলে এর লাভ হয় যে নিজেকে বিকশিত করে তোলে এই জন্য জীবনে যা-কিছু শ্রেয় প্রেয় ও গৌরবের সে-সবই নিজের ভিতরে সঞ্চিত করে, আর এই ভাবে মনুষ্যমূর্তিতে (নূতন ভাবে) প্রাণসঞ্চার করে মানুষকে করে মহত্তর, তার জীবন ও কর্মের পরিধিকে করে পূর্ণাঙ্গ, আর অতীত-ও-ভবিষ্যৎ-সমন্বিত বর্তমানে তাকে দান করে দেবত্ব। Dr. R. Steiner তাঁর বইখানিতে শেষ মন্তব্য করেছেন এই : Beauty is not the divine in a cloak of physical reality ; no, it is physical reality in a clook that is divine.

সৌন্দর্য পার্থিব আবরণে এক দিব্য বস্তু নয় বরং দিব্য আবরণে পার্থিব সত্য। (তিনি এখানে দার্শনিক Schelling-এর সৌন্দর্য-তত্ত্বের প্রতিবাদ করেছেন)।

† সাময়িক কবিতাই আদি ও অকৃত্রিম কবিতা।

প্রতিভার সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ কর্তব্য—সত্যপ্রীতি।

প্রত্যেক বিষয়ে আমি এমন একটি স্থান খুঁজি যা থেকে প্রভূত বিকাশ সম্ভবপর।

www.pathagar.com

অল্প বয়সেই গ্যেটে বলেছিলেন—আমি প্রকৃতির মতো অকৃত্রিম হবো, ভাল হব, মন্দ হব, তোমাদের কোনো আদর্শ আমাকে বাধা দিতে পারবে না (All your ideals shall not prevent me from being genuine, and good and bad--like Nature).

এই যাঁরা সাধনা প্রচলিত কথায় যাকে বলা হয় কবিত্ব, কাব্য-সৌন্দর্য্য, তাতেই যে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন তা সম্ভবপর নয়। ঘটেছেও তাই ; গ্যেটে শুধু কবি নন, তিনি বিজ্ঞানবিদ (বিজ্ঞানে তাঁর দান স্বীকৃত হয়েছে), চিত্র-সমঝদার, শেষ বয়সে সঙ্গীত-সমঝদার, ধর্ম্ম-তত্ত্বজ্ঞ, এমন-কি মরমী-সাধনার সঙ্গেও সুপরিচিত। তাঁর চিত্তের এই বিরাটত্বের জন্যই জনৈক লেখক তাঁকে আধুনিক জগতের সমস্ত চিন্তাশীলের গুরু বলেছেন :

> ......We are all disciples of Geothe whether we know it or not, and any liberal mind has but to be brought into contract with the master to realise that inevitable discipleship......" John Macy--The Story of the World's Literature.*

গ্যেটে নিজেও বলেছেন--যিনি প্রকৃতই আমার রচনা ও চরিত্রের মর্ম্মগ্রাহী হয়েছেন তাঁকে স্বীকার করতে হবে যে তার ফলে তিনি একপ্রকার চিত্তের অবন্ধন লাভ করেছেন।†

প্রচলিত ধর্ম্মে আস্থাবান না হয়েও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি বলেছেন তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর—ভাবুকের জন্য আনন্দের অফুরন্ত প্রস্রবণ। তাঁর Faust এর সেই who dare express Him..."* ইত্যাদি সুবিখ্যাত, এভিন্ন অন্যান্য সুন্দর উক্তিও আছে, যেমন

---

* আমরা সবাই গ্যেটের শিষ্য তা আমরা জানি আর নাই জানি ; যে-কোনো উদারচিত্ত ব্যক্তি এই গুরুর সংস্পর্শে এলেই সেই অবশ্যম্ভাবী শিষ্যত্বের কথা বুঝবেন।

† "...And any one who has really learnt to understand my works and my character is bound to acknowledge that he has thereby attained to a certain freedom of the spirit."

* মার্গারেটের মনে সন্দেহ জেগেছে হয়ত ফাউস্ট ঈশ্বরে বিশ্বাসী নন ; তার প্রশ্নের উত্তরে ফাউস্ট বলেছেন :

Who dare express Him?
And who profess Him?
Saying : I believe in Him!
Who, feeling, seeing,
Deny His being,
Saying : I believe Him not!
The All-upholding,
The All-sustaining,
Folds and upholds He not
Thee, me, Himself ?
Arches there not the sky above us ?
Lies not beneath us firm the earth ?
And rise not, on us shining,
Frindly, the everlasiting stars ?

www.pathagar.com

"...what konw we of the idea of the Divinity? and what can our narrow ideas tell of the Highest Being? Should I, like a Turk, name it with a hundred names, I should still fall short and in comparison with the infinite attributes, have said nothing."*

অথবা—

Look I not, eye to eye, on thee,
And feel'st not, thronging
To head and heart, the force,
Still weaving its eternal secret
Invisible, visible, round thy life?
Vast as it is, fill with what force thy heart,
And when thou in the feeling wholly blessed art,
Call it then, what thou wilt,—
Call it Bliss! Heart! Love! God!
I have no name to give it!
Feeling is all in all :
The Name is sound and smoke,
Obscuring heaven's clear glow.

স্পর্ধা কার তাঁকে ব্যক্ত করবে?
বলবে কে—তাঁকে জানি, তাঁতে বিশ্বাস রাখি!
অনুভূতি ও দৃষ্টি অব্যাহত রেখে
অস্বীকার করবে কে তাঁকে!
বলবে কে—বিশ্বাসী তাঁকে নই!
সর্বধর—
সর্বাশ্রয়
ধারণ কি করছেন না তিনি তোমাকে, আমাকে, নিজেকে?
মাথার উপরে নেই কি আকাশের খিলান?
পায়ের নীচে শান্ত ধরণী?
সামনে জ্বলজ্বল-করা বন্ধুর-মতো-চেয়ে-থাকা চিরদিনের তারা?
চোখ কি আমার দেখছে না তোমাকে?
অনুভব কি করছ না তুমি, মনে প্রাণে,
তোমার জীবন ঘিরে চলেছে কি রহস্যময় শক্তির লীলা?
—কখনো দৃশ্য কখনো অদৃশ্য!
বিরাটের দ্বারা তোমার হৃদয় পূর্ণ কর নিঃশেষে!
আর যখন তুমি ভাগ্যবতী এই অনুভূতি-ধনে
তখন নাম দিয়ো এর
পরমা শান্তি, হৃদয়, প্রেম, ঈশ্বর—যা খুশী!
আমি অক্ষম এর নাম দিতে।
অনুভূতিই আমার সব।
নাম শুধু কোলাহল ও কুহেলী
আকাশের প্রোজ্জ্বলতা তাতে হয় আচ্ছন্ন।

* ঈশ্বরের ধারণা সম্বন্ধে আমাদের কিইবা জ্ঞান আছে। আমাদের সংকীর্ণ পরিসর ভাবনা সেই পরমপুরুষের সম্বন্ধে কতটুকুই বা ব্যক্ত করতে পারে। যদি মুসলমানের মতো শতনামে আমি তাঁকে ডাকি তবু অকথিত থাকবে বহু, আর তাঁর মহিমার কথা ভাবলে বুঝব—কিছুই বলা হয় নি।

www.pathagar.com

> "Let men continue to worship Him Who gives the ox his pasture and to man food and drink, according to his need. But I worship Him Who has filled the world with such a productive energy, that if only the millionth part became embodied in living existences the globe world so swarm with them that War, Pestilence, Flood, and Fire would be powerless to diminish them. That is my God."†

তাঁর আর একটি উক্তিও প্রণিধানযোগ্য—যাঁরা ধর্ম্মপ্রাণ সৃষ্টি শুধু তাঁদের দ্বারাই সম্ভবপর—only religious men can be creative.

গ্যেটের ভিতরে স্বজাতিপ্রেমের তীব্রতা ছিল না। এজন্য তাঁকে কম নিন্দা ভোগ করতে হয়নি। কিন্তু দার্শনিক ক্রোচে এতে মহা আনন্দিত হয়েছেন—

> "......I consider it singularly fortunate that among all the sublime poets, perennial sources of deep consolation, there should yet be one who, possessing a knowledge of human nature in all its aspects, such as no other poets ever possessed, nevertheless keeps his mind above and beyond political sympathies and the inevitable quarrels of nations."†

এ সম্বন্ধে গ্যেটে নিজে বহু কথা বলেছেন,

> 'National literature is now rather an unmeaning term ; the epoch of world literature is at hand, and each one must try to hasten its approach."*

অন্যত্র

> Altogether national hatred is something peculiar. You will always find it strongest and most violent where there is the lowest degree of culture. But there a degree where it vanishes altogether, and where one stands to a certain extent above nations and feels the

---

† অন্যেরা পূজা করুন তাঁকে যিনি ষাঁড়কে দিয়েছেন চরবার মাঠ আর মানুষকে দিয়েছেন তার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয়। কিন্তু আমি পূজারী তাঁর যিনি জগৎকে পূর্ণ করেছেন এমন প্রাণশক্তিতে যে যদি তার অযুততম অংশও সক্রিয় হয় তবে জগত তার দ্বারা এমনভাবে পূর্ণ হবে যে যুদ্ধ মড়ক বন্যা প্রভৃতির সাধ্য হবে না তার শক্তি হ্রাস করতে। এই আমার ঈশ্বর।

† মহাকবিরা হচ্ছেন আশা ও আনন্দের অফুরন্ত প্রস্রবণ, সেই মহাকবিদের মধ্যে এমন একজনও যে আছেন যিনি মানব প্রকৃতির সর্ব ক্ষেত্রের জ্ঞানে সর্বাগ্রগণ্য হয়েও রাজনৈতিক পক্ষপাত ও জাতিতে জাতিতে অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বের বহু উর্ধ্বে নিজের চিত্ত স্থাপন করতে পেরেছেন, এ এক মহা সৌভাগ্য বলে আমি জ্ঞান করি।

* জাতীয় সাহিত্য এখন বরং এক অর্থহীন কথা। যেখানে চিত্তোৎকর্ষের যত অল্পতা সেখানে এর তীব্রতা তত বেশী। কিন্তু চিত্তোৎকর্ষের এমন স্তর আছে যেখানে এর সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে, ফলে এর অনুভাবকের স্থান লাভ হয় জাতীয়তার উর্ধ্বে। পরজাতির দুঃখবিপত্তি তখন তার মনে হয় তার নিজের জাতির দুঃখ-বিপত্তির মতো। চিত্তোৎকর্ষের এই স্তরের সঙ্গে আমার প্রকৃতির সহজ যোগ ছিল, আর ষাট বৎসর বয়সের বহু পূর্বেই এতে আমার স্থিতিলাভ হয়েছিল।

www.pathagar.com

> weal or woe of a neighbouring people as if it had happened to one's own. This degree of culture was conformable to my nature, and I had become strengthened in it long before I had reached my sixticth year.†

গ্যেটে–সমুদ্রের হাওয়া মানস–স্বাস্থ্যের জন্য অমূল্য, এই একটি কথাই বলতে চেষ্টা করেছি হয়ত।

মুসলিম সাহিত্য–সমাজের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে পঠিত। চৈত্র, ১৩৩৬

† কবিগুরু গ্যেটে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড দ্রঃ।

www.pathagar.com

সাহিত্যে শুচিতা

শ্রী সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ব্রাউনিং তাঁর One word more কবিতাটির একস্থানে বলিয়াছেন যে, চিত্রকর রাফেল, 'জন্মের মধ্যে কর্ম্ম চৈত্র মাসে রাস' একবার মাত্র করিয়াছিলেন। অর্থাৎ আজীবন তুলি পেশার পর একটিবার মাত্র একটি সনেট লিখিয়াছিলেন তাঁর প্রিয়ার উদ্দেশ্যে। আমিও আমার পরমপ্রীতিভাজন ওদুদ্ সাহেবের পাল্লায় পড়িয়া এই প্রথম অনধিকার চর্চ্চায় হাতে খড়ি' নিলাম। 'পুতলো বাজি'র নাচে যে ব্যক্তি সূতা টানে, আসলে সেই নাচে এবং তার সুরেই 'ছেঁড়া' ন্যাকড়ার পুঁটুলি কথা কয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমার ত্রুটি প্রমাদের 'ওয়ারিশান' ওদুদ্ সাহেব।

যে প্রসঙ্গের অবতারণা–অবতারণামাত্র—আজ আপনাদের সম্মুখে করিতে সাহসী হইয়াছি এ বিষয়ে হাটে ঘাটে সর্ব্বত্রই একটা কাণাঘুষা চলিতেছে। সুতরাং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় অনেক কথা কানে আসে এবং কথার পাল্টা জবাব জিহ্বাগ্রে আসিতে চায়, বোঝার সোনালী গাম্ভীর্য্যের অপেক্ষা বাচালের রূপালী মধুরতা নিকৃষ্ট হইলেও, 'বিতরিত সময় বিশেষে চিন্তা পঞ্চামৃতামোদং' অবস্থা বিশেষে মানুষ পঞ্চামৃত ফেলিয়া তেঁতুলের অম্বলের বাটিতে চুমুক দেয়। আমার অদ্যকার আচরণেও হয়ত এইরূপ ধৃষ্টতা লক্ষিত হইবে।

বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং। মোটের উপর সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ একই কথা, সাহিত্যের প্রাণবস্তু রস, এখন প্রশ্ন এই, রসবস্তুটি কি? যাহার আস্বাদন মধুর তাহাই রসস্বরূপ। প্রাচীন বিশেষজ্ঞরা রসকে নববীজাত্মক বলিয়াছেন। সাহিত্যের এই নয়টির মধ্যে যেটিই বপন করা যাক না কেন, তার ফলে যদি মধুর আস্বাদনটুকু না জাগে, তাহা হইলে সে বীজ নিষ্ফল হইল বলিতে হইবে।

এই মাধুর্য্যের অনুভূতি লইয়াই মতদ্বৈধ হইবার সম্ভাবনা। কথায় বলে 'চাষা কি বুঝবে মদের তার্।' শৈবলিনীর প্রেম লইয়া মরণ পথযাত্রী প্রতাপ ব্রহ্মচারীকে বলিয়াছিলেন, 'কি বুঝিবে তুমি সন্ন্যাসী'। আজ এই অরসিক বৃদ্ধের মুখে রসতত্ত্বের অবতারণা শুনিয়া হয়ত আমার তরুণ বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ অরুণ আঁখি করিয়া বলিবেন—'কি বুঝিবে তুমি বৃদ্ধ?' প্রাচীন কবি মনের দুঃখে চতুরাণকের নিকট আরজি করিয়াছিলেন, 'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং, শিরসি মা লিখ মা লিখ।' তাহার সেই সময় পাঠান্তর করিয়া ইহাই লিখা উচিত ছিল—'অরসিকেষু রহস্য নিবেদনং; শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।' অরসিকের কাছে রসের নিবেদন অথবা তাহার নিকট হইতে রসতত্ত্বের আবেদন দুইই তুল্যমূল্য, অর্থাৎ বিড়ম্বনা। কিন্তু যে প্রার্থনাই করা যাক না কেন, সব সময় দেবতা প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন না, অষ্টকর্ণ হইলেও। সুতরাং দায়ে পড়িয়া অরসিক ব্যক্তির নিকট রসের নিবেদন করিতে হয় এবং অরসিক প্রমুখাৎ রসের অনধিকার চর্চ্চা বরদাস্ত করিতে হয়। 'লিখিতমপি ললাটে প্রোজ্ঝিতুং ক: সমর্থ:?'

www.pathagar.com

তবে একটা কথা আমার স্বপক্ষে বলিবার আছে, গানের আসরে যখন সঙ্গীতজ্ঞ গুণীর সমাবেশ হয় তখন পাড়ার 'হরে', নোরে পরাণের' দল গিয়াও জোটে, কেবল যে ঝামেলা করিবার জন্য, তাহা বলিলে বেচারীদের উপর বোধ হয় কিঞ্চিৎ অবিচার করা হয়। তাহারা নিশ্চয়ই কিছু আনন্দ পায়। সে আনন্দের মূল্য তাহাদের নিজেদের কাছে সব সময়েই আছে, এবং আজ এই ঘনায়মান বলশেভিক যুগে আপামর সাধারণ আমরা সকলেই যখন শূদ্রতান্ত্রিক শাসনের অনুকূল, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় হোক হইয়া উঠিতেছি, তখন সেই অত্যাধুনিক ডিমক্রেসির দোহাই দিয়া Man in the streets point of view অর্থাৎ পথের লোকের মতামতের প্রতি একটু নেক্ নজর আকর্ষণ করিয়া আপনাদের ধৈর্য্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

সুন্দর আমরা অনেক জিনিষকেই বলি এবং সৌন্দর্য্যের তারতম্যের আর অবধি নাই। তবু এই বিচিত্র সৌন্দর্য্যের মধ্যে কতকগুলির কপালে যেন একটা চিরন্তন সৌন্দর্য্যের ফোঁটা আছে। কুলেশীলে ইহারা সুন্দর কুলের ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে বলে 'জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণ।' আমি এই বিশিষ্ট অর্থে ব্রাহ্মণ শব্দটি এইখানে ব্যবহার করিতেছি। চিরসুন্দরই রূপব্রহ্ম। যে সৌন্দর্য্যে নিত্যমাধুরীর একটা আভাস বা ইঙ্গিতমাত্র আছে, তাহার গলায় সাহিত্যোক্ত যজ্ঞোপবীত পরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। চির সুন্দর, নিত্যমাধুরী, ব্রহ্ম প্রভৃতি বাক্যগুলি প্রয়োগ করিলাম বলিতে চেষ্টা করিব।

আমরা সকলেই জীবনের অভিজ্ঞতায় জানি, কতকগুলি ক্ষুৎপিপাসা আছে যাহা অন্ন পানের মত পূর্ণ তৃপ্তিতেই মিটিয়া যায়। তাহাদের দেনা থাকে না। জীবনে ইহাদের সহিত ঘনিষ্ট পরিচয় থাকিলেও, কাব্যে ও সাহিত্যে ইহাদের স্থান খুঁজিয়া পাই না। আমাদের সকলের ভিতরই সৌন্দর্য্যবোধ বলিয়া যে জিনিষটি আছে তাহা আমাদের প্রত্যেকের অন্তঃপ্রকৃতির অনুপাতে। এই লইয়া আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতা ও বিরোধ থাকিলেও একটি বিষয়ে বোধ করি সাদৃশ্য আছে। যাহা সুন্দর তাহার মুখে এমন কিছু আছে যাহার জোরে সে অবলীলাক্রমে প্রাণের শীর্ষস্থানটি অধিকার করিয়া বসে, আর সবাইকে পশ্চাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া, জনতার ভিতর একখানি সুন্দর মুখ অন্য মুখগুলিকে নিমেষে নিভাইয়া দেয়। যে মুখখানি আমার ভাল লাগিল সেটা আপনার ভাল না লাগিতে পারে, কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অন্তরের উচ্চাসনখানি সেই প্রিয়দর্শনের জন্য পাতিয়া দেই। এই যে preferential treatment বা তুলনামূলক পক্ষপাতিত্ব ইহা সৌন্দর্য্য রাজস্বের মতই জোর করিয়া আদায় করে এবং সেজন্য মনে Civil disobedience জাগায় না। বরং তাহাকে সমাদর করিয়া প্রণতি জানাইয়া কৃতার্থ হই।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অনুভূতির পার্থক্য থাকিলেও আমরা সকলেই অনুভব করি—'A thing of beauty is a joy for ever' যা সুন্দর তা চির নবীন, চির মধুর। Space–এ বা দেশে সিংহাসন ও time–এ বা কালে চিরন্তনত্ব লাভ করিবার শক্তি সৌন্দর্য্যের একটি বিশেষ লক্ষণ, সাহিত্য-রচনায় এই দুটি লক্ষণ আমরা খুঁজি এবং ইহাদের আমেজ যদি কোনো লেখায় জাগে তবে তাহাকে সৎ সাহিত্য বলিতে দ্বিধা হয় না। সৌন্দর্য্যের এই স্বাভাবিক আভিজাত্য বা বিশিষ্টতা আছে। বুঝি এই সৌন্দর্য্যবোধ সেই অমোঘ অন্ধানুভূতি,

www.pathagar.com

যাহা সৃষ্টি শতদলের নব নব দল যুগ যুগান্তর ধরিয়া উদ্ভিন্ন করিয়া চলিতেছে। বাঁদরকে মানুষ করিতেছে, মানুষকে superman বা অতিমানবের পদে উন্নীত করিবার জন্য অতন্দ্রিত চেষ্টা করিতেছে। তৃতীয়তঃ, আর একটি কথা বলিতে চাই। ধরুন বেলফুল। কতটুকু পরিসর তার আকাশে, কতটুকু আয়ু তার কালে? কিন্তু বাস্তবিক বেলফুলটির প্রকৃত স্বরূপ আমাদের কাছে কি কেবল দেশ–কালেই বদ্ধ? যদি তার সৌরভটি চোখে দেখিতে পাইতাম তাহা হইলে হয়ত দেখিতাম যে, ক্ষুদ্র পাপ্‌ড়ি সমষ্টির কেন্দ্রবিন্দুটি আশ্রয় করিয়া একটা সৌরভের জ্যোতির্ম্মণ্ডল তাহাকে ঘেরিয়া আছে। যতদূর সে সুগন্ধ ছড়াইয়া যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তাহার পুষ্প দেহের পরিব্যাপ্তি। কিন্তু এখানেও শেষ কথা বলা হইল না। সেই সুগন্ধের সঙ্গে মনে যে আনন্দের অনুভূতি জাগে এবং সেই আনন্দ চেতনার সঙ্গে পূর্ব্বানুভূতি সুখ স্মৃতির ঝংকার যদি বাজিয়া উঠে, তাহা হইলে দেখুন কি দৃশ্যপটই চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ যখন বলিলেন, "ফুল দেখে মনে পড়ে কারে ভালবাসি" তখন সে কবির চোখে ফুলের যে বিরাট বিশ্বরূপ ফুটিয়া উঠে সে ছবি তুলিতে আঁকিতে হইলে চিত্রপটখানি দিক্‌চক্রবাল পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া যায়, সুদূর অতীতকে আপনার চিত্রবন্ধনীর মধ্যে টানিয়া আনে।

ধ্বনি–বিজ্ঞানে বলে যে, প্রত্যেক স্বরটির একটি মৌলিক সুর বা Fundamental note আছে। বেহালার 'সা' বা হারমোনিয়ামের 'সা' মূলতঃ একই সুর। কান বলে তাদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে, যাহার দ্বারা কোন্ যন্ত্র হইতে সুরটি বাহির হইতেছে তাহা ধরিতে কিছুমাত্র মুস্কিল হয় না। কি সে বিশেষত্ব? বিজ্ঞান বলে যে, মূল সুরটিকে ঘেরিয়া অনেকগুলি Harmonics বা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ক্ষীণ ধ্বনির অনুরণন আছে। তাহারা মূল সুরটিকে বজায় রাখিয়া তাহাকে বিশেষ বিশেষ রঙ্গে যেন অনুরঞ্জিত করে—কালো মেয়ের মুখে সায়াহ্নের সোনার আলো যখন পড়ে তখন সে মুখে যেমন ত্রিদিব কান্তি ফুটিয়া উঠে। সাহিত্যে সেই অনুরঞ্জনা যাহা বস্তুতান্ত্রিকের স্থূল রূপের উপর একটা অনির্ব্বচনীয় অতীন্দ্রিয় আভা মাখাইয়া দেয়। তখন অসুন্দরও সুন্দর হয়, তখন বেহালার ছড়ের মধুনিষ্যন্দিনী সুরধারার সঙ্গে হারমোনিয়ামের কাংস্যনিনাদিনী মধুস্রবার প্রভেদ বুঝিতে আর বেগ পাইতে হয় না। কাগজের ফুলে গোলাপী আতর মাখাইয়া দর্শকের চক্ষু নাসিকায় ক্ষণিকের বিভ্রম উৎপাদন করা যাইতে পারে, কিন্তু তার পাশে সদ্য প্রস্ফুট গোলাপ যদি রাখেন তবে দেখিবেন যে ভ্রমর উড়িয়া গিয়া সেই সাচ্চা গোলাপটির উপরই বসিবে, তা' পার্শ্ববর্ত্তিনীর যতই রঙ্গের বাহার ও গন্ধের তীব্রতা থাকুক না কেন!

Realism in Art নিয়ে যে বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের আমদানী আজকাল বাজারে দেখা দিয়াছে তাহার সহিত ঘনিষ্ট পরিচয় না থাকিলেও একেবারে চোখাচোখি হয় নাই তাহা নয়। তাহাদের দেখিয়া আমার যাহা মনে হইয়াছে তাহা বলিব? আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া যখন আমার হ্যাট্ কোর্ট–পরিহিত ইঙ্গ বঙ্গ মূর্ত্তিটি দেখি তখন যে হাস্যকর চিত্রটি চোখে জাগে, এই সব রচনায় তাহার আদল পাই। এই সকল লেখায় যে Contimental Literature–এর দোকান হইতে হ্যাট, কোট, টাই–এর আমদানী সব সময় হয় তা নয়, কিন্তু যে নগ্নতা পশ্চিমী সাহিত্যে মাঝে

www.pathagar.com

মাঝে চোখে পড়ে সেই বেআব্রু রচনার একটা সচেষ্ট নির্লজ্জ অনুকরণ আছে। একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, বেশভূষা সম্বন্ধে যে একটা কলাবিধি Aesthetic convention আছে তাহা দেশে দেশে কালে কালে বিভিন্ন। কিন্তু মনের উপর প্রতিক্রিয়া হিসাবে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে নিকট আত্মীয়তা আছে। নারীর নগ্ন পদ আমাদের দৃষ্টি কটু নয়, কিন্তু পাশ্চাত্য রূচির চক্ষুশূল। সেইরূপ যে সব দেশে ও সমাজে স্ত্রী পুরুষের মুক্ত গতিবিধি ও অবাধ মিলনের আনুকূল্য আছে, তাহাদের সে স্বৈরগতি ও অকুণ্ঠিত আচার ব্যবহারে রুচি ও নীতিকে আঘাত দেয় না এবং সকল স্থলে বিতৃষ্ণা উৎপাদন করে না। দেশ ভেদে ও পাত্র পাত্রী ভেদে সেইরূপ আচরণ সঞ্চরণ ন্যক্কারজনক হইতে পারে, নীতিবাগীশের তরফ হইতে এ কথা বলিতেছি না? রূপদক্ষের সমীভূত দৃষ্টিতেও সে দৃশ্য দৃষ্টিকটু ও শ্রুতিতে বেসুরা লাগিতে পারে, সেই কথাই বলিতে চাই। সাহিত্যে কতটা পরিমাণে আবরণ খসান যাইতে পারে তাহার কোন ধরা বাঁধা আইন কানুন আছে বলিয়া মনে হয় না। তবে এ কথা ঠিক যে নিরাবরণ প্রকটতা, যাহা এক স্থলে কোন গ্লানি উৎপাদন করে না, অন্যত্র তাহা বীভৎস হইয়া দাঁড়ায় কেন, বলা শক্ত। তবে মনে হয়, প্রকাশ বা অপ্রকাশ আসল কথা নয়, আসল কথা যে আলোকে যবণিকার উত্থান পতন হইতেছে সেই আলোকের এমন একটি অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে যাহা অসুন্দরকে সুন্দর এবং সুন্দরকে কুৎসিৎ করিতে পারে, সুরুচি কুরুচির মুণ্ডু বদল করিয়া দেয়। সেইরূপ রূপদক্ষ প্রাণের প্রদীপে যে শিখাটি জ্বালিয়া লন সেই আলোকে কোন ছবিটি কতক্ষণ কি ভাবে ধরিবেন তাহাতে বিরক্তি বিতৃষ্ণা বা কলুষের সৃষ্টি করিবে না, তাহা তাহার অভিজ্ঞ দৃষ্টি ও নিপুণ লেখনীর উপর নির্ভর করে। বাইসাইকেলের দু'চাকার উপর ভার কেন্দ্রটি ঠিক রাখিয়া, আছাড় না খাইয়া চলিতে পারার প্রধান সহায় গতি। যে লেখকের রচনায় গণ্ডীর ভিতর, বাস্তবের ভিতর, একটা কল্পলোকাভিসারিণী প্রগতি আছে, তিনিই কর্দ্দমাক্ত পথে অচল প্রতিষ্ঠা লাভ না করিয়া সৌন্দর্য্যের অমৃতলোকে উত্তীর্ণ হইতে পারেন, আর আমাদের মত অপটু লোকেরা তাঁহাদের পৃষ্ঠে ভর রাখিয়া চক্রবাহনে বিনা খরচায়, বিনা বিপত্তিতে সাদা কাপড়ে, বানীমন্দিরের ব্যঞ্জনা, অপূর্ণতার ভিতর পূর্ণতাভিমুখী ইঙ্গিত, জড়ের ভিতর অতীন্দ্রিয়ের ঝংকার যে লেখার ফাঁকে ফাঁকে আছে, সেই রচনাই সাহিত্য পদ বাচ্য।

আমরা দেহী জীব হইলেও, এই রক্তমাংসের বুনিয়াদের উপর আমাদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা অনুভূতি দিয়া একটি ইমারত গাঁথিয়া তুলিতেছি। দেহলোকের উপর দোহাই আমাদের স্বরচিত আধ্যাত্মলোক। এই লোকেই বাণীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের পাষাণ ভিত্তির ফাঁকে যাহারা গর্ত্ত করিয়া, কুরিয়া কুরিয়া মাটি বাহির করে, তাহাদের এই মূষিকবৃত্তিকেই সাহিত্যে কুরুচি বলিতেছি। সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, অবিচার-অত্যাচার লইয়া আমাদের সামাজিক জীবন। ইহাদের সকলেরই সৎসাহিত্যে স্থান আছে। কিন্তু সাহিত্যিককে পঙ্ক হইতে পঙ্কজ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে, পঙ্কজ হইতে পঙ্কোদগীরণ করা তাঁহার ধর্ম্মনয়।

কাব্যের ও কথা সাহিত্যের একটা প্রধান মৌলিক উপাদান নর-নারীর প্রেম। স্ত্রী-পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ প্রাণসৃষ্টির মূলে। মানবসভ্যতা বহু যুগব্যাপী সাধনায় ইহাকে চাপে পিষিয়া

www.pathagar.com

ছাঁচে ঢালিয়া দাম্পত্য প্রেমের আকার দান করিয়াছে। মানবের এষণা ও চেষ্টায় যাহার সৃষ্টি, তাহা এক হিসাবে কৃত্রিম, 'সহজিয়া' নয়। সামাজিক বিধি নিষেধের ভিতর দিয়া, দেশে দেশে কালে কালে স্ত্রী-পুরুষের যে আত্মীয়তার ধারা পত্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে তাহা প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে মোটের উপর এক পথ দিয়া চলে নাই। পূর্ব্ব এবং পশ্চিম দুই-ই নর-নারীকে শৃঙ্খলিত করিয়াছে বটে কিন্তু এই গ্রন্থিবন্ধনের প্রণালীর ভিতর মূলতঃ পার্থক্য আছে। পশ্চিমে পাত্র পাত্রীর পরস্পর মনোনয়নের পথ আমাদের দেশের তুলনায় অনেকটা অবারিত। আমাদের দেশে সহজিয়া ব্যবস্থা যে একেবারে ছিল না তাহা নয়, তবে আমাদের দেশে সাধারণতঃ প্রাগ্‌বৈবাহিক পূর্ব্বরাগের ব্যবস্থা ছিল না, পশ্চিমে আছে, বর্ত্তমানে যুগে পশ্চিমের হাওয়া আমাদের দেশের উপর উত্তরোত্তর প্রবলভাবে বহিতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আটচালায় ভাঙ্গনের মড়মড়ানি স্থানে স্থানে জাগিয়া উঠিতেছে। সেই ঝোড়ো হাওয়া কথা সাহিত্যে লাগিয়াছে। সাহিত্য, সমাজের ভড়ে পালের হাওয়া, সুতরাং উনপঞ্চাশ বায়ুর ফুৎকার এই ভরা পালে লাগিবেই। কিন্তু নোঙর গাড়িয়া, হালে, দাঁড়ে মাঝি দাঁড়ী না বসাইয়া যদি কেবল ঝোড়ো হাওয়ায় পাল মেলিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তীরে বসিয়াই নৌকা ডুবির সুব্যবস্থাই করা হয়।

আকাশের মুক্ত বাতাসের মতই সাহিত্যের মুক্ত গতি। তাহার সদর অন্দর নাই। অসূর্য্যম্পশ্যার কাছেও সে অবাধ প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে। সামাজিক রীতি-নীতির মর্য্যাদা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া যদি তরুণ কথা-সাহিত্য কঞ্চুরীর মত অন্তঃপুর চরোবৃদ্ধে'র নিরংকুশ গতিবিধি লাভ করে তাহা হইলে 'যথারণ্য, তথাগৃহ' ; এর অবস্থায় সমাজকে পৌছিতে বিশেষ গৌণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। স্ত্রী-স্বাধীনতা, বিধবা-বিবাহ, যৌবন-বিবাহ, এমন কি স্থল বিশেষে 'ডাইভোরসে'রও প্রয়োজনীয়তা না হয় মানিয়া লইলাম, কিন্তু এ সকল সমাজ-সংস্কারের ব্যবস্থা যদি এক দল গুণ্ডা ও লম্পটের হাতে দেওয়া যায়, যাহারা গ্রামে গ্রামে, গৃহে গৃহে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া Free love বা অবাধ প্রেমের সুসমাচার প্রচার করিবে, এবং পৌরহিত্যের কর্ত্তব্যভার বহন করিবে, তাহা হইলে গ্রামবাসী রমণীদের পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সংকার করিবেন তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, উক্ত মহোদয়গণ সশরীরে প্রবেশাধিকার আপাতত না পাইলেও সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকারের জন্য সাহিত্যিক পাসপোর্ট বা ছাড়পত্র সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন। এরূপ লেখক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব সম্প্রতি সাহিত্যে দেখা দিয়াছে। তবে ইহাদের তাড়াইবার ভার বোধ করি পুরুষদের না লইলেও চলে। যাঁহাদের কল্যাণ হস্তের সম্মার্জ্জনী এখনও বাংলার ঘরে ঘরে গৃহের আবর্জ্জনা কাঁটাইয়া আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে, তাঁহারাই ইহাদের সদ্গতি করিবেন। নীতি জিনিষটা কেবলমাত্র বিধি নিষেধ নয়—উহা Instinct of self preservation-আত্মরক্ষার অমোঘ অস্ত্র। প্রাণের ধর্ম্ম প্রাণরক্ষা। ভাবী দেশমাতৃহারা দশভূজা হইয়া দশসম্মার্জ্জনী-ধারিণী হইবেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। সব সমাজেই গলদ আছে আমরাও সৃষ্টিছাড়া সাধু নাই। আমাদের সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িতে হইবে এবং সেই জীর্ণ-সংস্কারের প্রধান অস্ত্র সাহিত্য। সে অস্ত্র যেন

www.pathagar.com

'ভালুকের হাতে খোন্তা' না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সাহিত্যে শুচিতা পাপীকে বা পতিতাকে ঘৃণা করিয়া রক্ষিত হয় না, রক্ষিত হয় পাপকে ঘৃণা করিয়া জঘন্যতাকে ঘৃণা করিয়া।

মনে পড়ে, বিলাতে কসাই-এর দোকানে বড়দিনের উৎসব-সজ্জা দেখিয়াছিলাম। শ্বেতপাথরের টেবিলের উপর একটি ছাল-ছাড়ানো শূকরের মুণ্ড তাহার কানে ও নাকে ফুল গুঁজিয়া গলায় মালা দিয়া তাহাকে সজ্জায় সাজান হইয়াছে। বর্ত্তমান সাহিত্যে এইরূপ রক্তমাংসের পূজার আয়োজন আমার চক্ষে পড়িয়াছে। ঘোরতর মাংসাশীর পক্ষেও এরূপ দৃশ্যে রসভঙ্গ হয়। মাংসের পূজা ফুলে নয়, পেঁয়াজ, রসুন, গরম মসলায়। আর্টের এমন বীভৎস দুর্গতিও মাঝে মাঝে দেখিতে হয়!

উপসংহারে আর একটিমাত্র কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব। উদীয়মান তরুণ সাহিত্যিকদের ভিতরে এমন সব লেখক দেখা দিয়াছেন—যাঁহাদের ললাটে নবরবির অনাবিল দীপ্তিচ্ছটা আছে। তাঁহারা সকলেরই অকৃত্রিম শ্রদ্ধা প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন। পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া যখন নবসৃষ্টির অভ্যুদয় হয় তখন তাহার বিদ্রোহ, প্রমত্ততা, আবেগান্ধতা উদ্দাম হইয়া ওঠে। বিজয়ী সেনাপতি যখন প্রাচীন দুর্গের পর দুর্গ ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া অগ্রসর হন তখন সে জয়যাত্রার ধূলির অন্তরালে সামরিক অরাজাকতা বিশৃঙ্খলার সুবিধা লইয়া দুর্ব্বৃত্তের দল নারীবিগ্রহ পরস্বাপহরণ বৈরনির্য্যাতন ইত্যাদি পাশবিক অত্যাচারের মরশুম পায় এবং 'নলিচার আড়ালে গুডুক ফুঁকিয়া লয়।' ধর্ম্মযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে নৃশংস বর্ব্বরতার বাঁধ ভাঙ্গা বন্যা আসিয়া পড়ে। বাংলা সাহিত্যে নবযুগ আনিতে যাঁহারা বদ্ধপরিকর তাঁহাদের বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক যে, তাঁহাদের প্রচেষ্টার আশ্রয়ে এই সাহিত্যকে দুর্বৃত্তেরা প্রশ্রয় না পায়। উচ্চ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করিয়া যিনি ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ইতিহাস তাঁহার সাত খুন মাপ করিতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র পাশবিক প্রবৃত্তির চরিতার্থতাই চরমরূপ ধারণ যাহাতে না করিতে পারে সেজন্য প্রবর্ত্তকবর্গের আত্মসংযমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। কারণ পশুরাজ আমাদের সমস্তের ভিতরই বিদ্যমান। দশভূজার বাহনও কেশরী। কিন্তু সোয়ার হুঁসিয়ার না হইলে বিদ্রোহী বাহনের নখদন্তে উচ্চাদর্শের অন্তেষ্টিক্রিয়া অনায়াসেই নিষ্পন্ন হইতে পারে সত্য বটে, স্রষ্টা প্রাণের আনন্দেই সৃজন করেন, কিন্তু দ্রষ্টাকে একেবারে বাদ দিয়া নয়। কারণ মানুষ আপনার শ্রেষ্ঠ সার্থকতা লাভ করে অপরের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে, বিশ্বের সহিত নিবিড়তম যোগের দ্বারা। সুতরাং সত্যমকে শিবম্ হইতে হইবে। এবং প্রীতির বন্ধন, যিনি সুন্দম্ তিনিই কেবল বাঁধিতে পারেন। যাহা কদর্য্য অসুন্দর, তাহা প্রীতিকে, আনন্দকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারে না। মেঘমালার মতই কাব্য সৃষ্টির ঋজু বংকিম রেখাধৃত সুনির্দ্দিষ্ট আকার আয়তন নাই। কিন্তু বায়ুবিজ্ঞানের মত মেঘেরও শ্রেণীবিভাগ আছে, কালাকাল আছে, যাহার সহিত ধরণীর শুভাশুভ নিত্যযুক্ত। মেঘ-রাশি কখনও বা ঊষরক্ষেত্রের শ্যামলিমার উর্ব্বরতার রসধারা কখনও বা ঝড়ঝঞ্ঝা অশনিসম্বলিত মহাপ্রলয়ের বারুদখানা। অন্ধ প্রকৃতির সৃষ্টিলীলায় প্রজননী রক্ষণী ও বিধ্বংসিনী শক্তির বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাত। কিন্তু এই চিরবৈচিত্র্য ও বিরুদ্ধতার ভিতর মানবকল্পনা সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের একটি মূর্ত্তির ছায়া দেখিতে পাইয়াছে। কারণ এই যে ঐক্যের একটি অখণ্ড তাৎপর্য্য তাহার প্রাণে আছে। মানুষ স্বয়ং যেখানে স্রষ্টা, সাহিত্যের সেই সৃজন ক্ষেত্রে এই harmony বা সুগভীর সমন্বয়ের

www.pathagar.com

ঐক্যতানটি তাহার প্রাণে সজাগ রাখিতে হইবে। নতুবা তাহার সৃজন সার্থকতা লাভ করিবে না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই দেহই অধ্যাত্মলোকের বুনিয়াদ। এই ইন্দ্রিয়ের তারেই অতীন্দ্রিয় সুর বাজে, বে-তার বীণায় নয়। যে সভ্য নর সমাজের স্রষ্টা, সাহিত্য তাহারই অধ্যাত্ম সৃষ্টি। আজ যাহা চিন্তনে ও ধ্যানে, কাল তাহাই উদ্ভিন্ন হইবে জীবনে, গৃহ পরিবারে, সমাজে, সাহিত্যিক ঋষির ন্যায় মন্ত্রদ্রষ্টা—তিনি আজ যাহা চোখে দেখিতেছেন অনাগত ভবিষ্যতে তাহাকেই আমরা সমাজে, রাষ্ট্রে মূর্ত্তিমান দেখিব। সেইজন্য সাহিত্যিককে ঋষির সম্মান দিতে চাই। 'জবাকুসুমশংকো কাশ্যপেয়ং মহদ্দ্যুতিং' তরুণ সাহিত্যিকদের আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত প্রণাম করিতে চাই। তাই বলি তাঁহারা নমস্য হউন, 'শুদ্ধম-পাপবিদ্ধ' হউন, তাঁহাদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

www.pathagar.com

বৃটিশ ভারতে মুসলমান আইন

আবুল হুসেন

মানুষ আপনার শক্তি বিকাশ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আইন গঠন করে। তাই আইন ও মানুষের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। একে অপরকে এড়িয়ে যেতে পারে না। বরং একে অপরের হাত ধরাধরি করে চলে। তাই বলে যে আইন ও মানুষ সনাতন অপরিবর্ত্তনীয় হয়ে থাকে তা নয়। মানুষ তার আপনার প্রয়োজনে আইন গড়ে, ভাঙ্গে, পরিবর্ত্তন করে ও ছেড়ে দেয়—সঙ্গে সঙ্গে আইন মানুষকে ক্রমেই বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। মানুষের এগিয়ে চলা যেমন স্বাভাবিক, আইনের পরিবর্ত্তন করবার শক্তিও তার তেমনি অনিবার্য্য। কিন্তু যে মানুষ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চায় ও আইনকেও ধরে রাখতে চেষ্টা করে সে মানুষ তার জীবনস্রোত হারাতে বাধ্য।

যুগে যুগে মানুষ তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার তাড়নায় আপনার সত্তার প্রয়োজনে আইন গড়েছে। সেই অবস্থা বিশেষতই আইনের জন্ম দিয়েছে। কাজেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হলে আইনের পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী।

হজরত মুহম্মদের যুগে আরব দেশের প্রয়োজন অনুসারে যে আইন রচিত হয়েছিল তা আইন জগতের সর্ব্বত্র সর্ব্ব অবস্থাতেই প্রযোজ্য বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। কিন্তু সে বিশ্বাস মানুষের সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিহাস সমর্থন করতে পারে না। সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হয়ে এদেশের মুসলমানদের জন্য ব্রিটিশ প্রভু যে মুসলমান আইনের প্রচলন করেছেন তার জন্মভূমি ছিল আরব-মরু, বোখরারা, খোরাসান ও সমরকন্দ যাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে আধুনিক ভারতীয় মুসলমানের পরিপার্শ্বের আদৌ মিল নাই। এই জীবন্ত পরিপার্শ্বকে তুচ্ছ করে জোরজবরদস্তী খোরাসান বোখারার আইন হুবহু প্রবর্ত্তন করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ফলে ভারতীয় মুসলমান-মানুষ ও মুসলমান আইনের মধ্যে যে বিরোধ দিন দিন প্রবল হয়ে উঠেছে এবং তাতে ভারতীয় মুসলমান সমাজের যে অবস্থা হয়েছে তা চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রই ইচ্ছা করলে দেখতে পারেন। আজ আমি ব্রিটিশ ভারতের মুসলমান-মানুষ ও মুসলমান-আইনের পরস্পরের সম্বন্ধ কি ও তার ফলাফল কি হয়েছে ও হচ্ছে সে সম্পর্কে সামান্য কিছু ইঙ্গিত করেই ক্ষান্ত হব। এ সম্বন্ধে যোগ্যতর ব্যক্তি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করলে ভারতীয় মুসলমান সমাজের বহু ব্যধি দূরীকরণের পথ উন্মুক্ত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

গোড়াতেই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, বৃটিশ রাজ ভারতীয় মুসলমানের মাত্র ওয়ারিশী স্বত্ব, দান, বিবাহ, তালাক, ওয়াক্‌ফ ও হক্‌শোফা সম্পর্কিত আইনের প্রচলনে সম্মতি দিয়েছেন, কিন্তু অপরাপর আইনের প্রচলন বন্ধ করেছেন। তারপর ঐ সমস্ত প্রচলিত আইন পরিচালনার জন্য মুসলমান আইনসম্মত যে বিধি বিধান প্রচলিত ছিল, যেমন ইজ্‌মা, কেয়াস, ইজতিহাদ, তাও বন্ধ করেছেন। তাতেও পক্ষান্তরে ব্রিটিশ অনুমোদিত

www.pathagar.com

মুসলমান আইনের ব্যবহার (practice) অনেকেখানি ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তাতে মুসলমান সমাজে মুসলমান-আইনের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা ও ভয় অনেকখানি কমে গেছে এবং সে জন্যই মুসলমান সমাজের শ্রী ফুটতে পারছে না। আর একদিক থেকে ভারতীয় মুসলমানদের জীবন বিকশিত হতে পারছে না। আরবী না জানার দরুন অনেক ক্ষেত্রেই মুসলমান আইনের প্রকৃত মর্ম্ম বিচারকগণ উপলব্ধি করতে না পেরে ভুল অর্থে আইনের প্রয়োগ করায় মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার সাথে মুসলমান-আইনের সামঞ্জস্য হারিয়ে গেছে ও প্রতিনিয়ত যাচ্ছে। কথাটা বেশী বিস্তৃত করে বলবার ইচ্ছা প্রবল হলেও এ প্রবন্ধে বলতে পারলাম না বলে দুঃখিত। এ ক'টি কথা কেবল বন্ধুদের পুনঃপুন তাগিদের জন্য লিখতে বাধ্য হয়েছি।

দুই একটি দৃষ্টান্ত দিই। হকশোফার (Right of Pre-emption) আইন বলেছে, যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তি আপনার কোন শরিকের অংশ ক্রয় করে তবে আপনি সেই অংশ ঐ তৃতীয় ব্যক্তির নিকট হতে কিনে নিতে বা ফিরিয়া নিতে পারেন। উদ্দেশ্য আপনার কোন শত্রু বা অপ্রীতিকর পড়শী এসে আপনার সংসারকে বিপর্য্যস্ত না করে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের নজির অনুসারে যদি কোন হিন্দু আপনার শরিকের অংশ খরিদ করে, তবে আপনি তার থেকে সেই অংশ ফিরিয়ে নিয়ে আপনার সংসার শান্তিময় রাখতে পারবেন। কিন্তু বাংলাদেশে হকশোফার আইন হিন্দু খরিদদারকে আপনার শরিকের অংশ খরিদ করতে অনুমতি দিয়েছে। মুসলমান আইনের উদ্দেশ্য এখানে অনেকখানি ব্যর্থ হয়ে গেছে। ফলে বাংলাদেশের সমস্ত শহরে মুসলমানের সম্পত্তি হিন্দুর হাতে চলে গেছে ও যাচ্ছে ; কিন্তু মুসলমান ইচ্ছা থাকলেও ফেরাতে পারে নাই ও পারছে না। তাই দেখতে পাবেন অনেক শহরে আজ যেখানে হিন্দুর বড় বড় এমারত উঠেছে সেখানে অতি নিকট অতীতে মুসলমানের বসতি ছিল। মুসলমান সম্পত্তি বিক্রয় করেছে বা করছে কেন, তার কারণ ঢের আছে। কিন্তু হকশোফার আইন এমনি করে ক্ষুণ্ণ হয়ে যাওয়ায় মুসলমান একেবারে শহর থেকে বিতাড়িত হচ্ছে।

তারপর ধরুন ওয়াকফ আইন। মুসলমান তার বংশধরদের জন্য সম্পত্তি ওয়াকফ করতে পারে। মুসলমান বাদশাহদের আমলে এই অনুসারে বহু মুসলমান বড় বড় সম্পত্তি আপন বংশধরদের জন্য ওয়াকফ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশ আমলের বিচারকগণ ঐ প্রকার ওয়াকফের বাতিল করে দিলেন। ফলে শত শত সম্পত্তি হস্তান্তরযোগ্য হয়ে গেল। বংশধরগণ নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঝগড়া বিবাদে প্রবৃত্ত হল—মহাজন জমিদার নিলাম করে ওয়াকফ সম্পত্তি গ্রাস করতে লাগল। ক্রমশঃ এক নজিরের বলে শত শত মুসলমান পরিবার অনিবার্য্য দারিদ্র্যের পথে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। তার গতি এখনও প্রতিহত হয় নাই।

তারপর ওয়ারিশী স্বত্বের আইন। এই আইন প্রচলিত থাকায় ভারতীয় মুসলমান, বিশেষতঃ বাংলার মুসলমান, বাটোয়ারা (partition) মোকদ্দমা করতে করতে সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছে। একদিন আমার জনৈক সিনিয়র হিন্দু উকিল বন্ধু মুক্ত চিত্তে বলেছিলেন, 'Thanks to the great prophet of the desert, Because but for his law of Inheritance 60% libigation of our courts would have been diminished and half of our Judges would have been discharged.' এতেই আপনারা বুঝতে পারবেন এই

www.pathagar.com

আইনের ব্যবহার বাংলার মুসলমানকে দিন দিন অশান্তি ও দারিদ্র্যের চরম সীমায় নিয়ে যাচ্ছে।

অবশেষে বিবাহ ও তালাকের আইনের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিবাহের ভিত্তি হচ্ছে, স্বামী–স্ত্রীর সম্মতি ও উভয়ের স্বাধীন ব্যক্তিত্ব। এই সম্মতি ও ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্য যখন হারিয়ে যায় তখনই তালাকের আইন ব্যবহৃত হওয়া উচিত। এই আইন ব্যবহার করবার অধিকার মুসলমান স্বামী, স্ত্রী উভয়েরই সমান। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে মুসলমান স্ত্রী এই সমান অধিকার হতে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে স্ত্রীর উপর অত্যাচার ও নির্য্যাতনের অবধি নাই। স্ত্রী আজ মূক, নিরূপায়। সমাজের অর্ধ্বাংগ যদি এমনি করে আইনের অধিকার হতে বঞ্চিত থাকে এবং তার জন্য অপর অর্ধ্বের স্পর্ধা যদি বৃদ্ধি পায়, তবে সমাজের স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি প্রতিহত হতে বাধ্য। আজ মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরীণ অবস্থা লক্ষ্য করলে এই তালাকের অধিকার পুরুষের একচেটে হয়ে পড়ায় কতখানি ক্ষতি হয়েছে ও হচ্ছে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

উপসংহারে, এই কথা বলতে চাই যে, বর্ত্তমান ব্রিটিশ ভারতের প্রচলিত মুসলমান আইন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্ধ্বন করা দরকার, নতুবা মুসলমান সমাজের স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভবপর হতে পারে না। সে আইন আধুনিক ভারতের অবস্থার সাথে মুসলমান মানুষের সামঞ্জস্য সাধন করবে। তা করতে হলে আমাদের দেখতে হবে মুসলমান বাদশাহদের আমলে মুসলমান আইনের অবস্থা কি ছিল। আমি যতদূর জানতে পেরেছি তাতে মনে হয় এ দেশের অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মুসলমান বাদশাহগণ আইন রচনা করেছিলেন। গজনীর বাদশাহ মাহমুদের ফতোয়া–ই–মহম্মদী ও ফিরোজ শাহ তোগলকের ফতোয়া–ই ফিরোজশাহী হতে আরম্ভ করে টিপু সুলতানের ফতোয়া–ই–আহমদী ও যাখিরা–ই–ওয়ারেন হেষ্টিংস পর্য্যন্ত যে সমস্ত আইনের পুস্তক রচিত হয়েছে তাতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, এ দেশের মুসলমানদের জীবনের প্রয়োজনে ঐ সমস্ত আইন রচিত হয়েছিল। আরব, পারস্য, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের মধ্যযুগীয় ফিকাহ্ বা ব্যবহার শাস্ত্রের বিধি বিধান তাঁরা অন্ধভাবে প্রবর্ত্তন করেন নাই। বর্ত্তমানে এ দেশের রচিত ও প্রবর্ত্তিত ব্যবহার শাস্ত্রের মধ্যে একমাত্র ফতোয়া–ই–আলমগীরি' ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু ফতোয়া–ই–আমলমগীরি' হতে মুসলমান বাদশাহদের আইন রচনার অধিকার ও তার স্বাধীন ব্যবহার সম্বন্ধে কিছুই পাওয়া যায় না। ফতোয়া–ই–আলমগীরি Reaction–এর যুগে রচিত ও প্রবর্ত্তিত হয়েছিল। সে সময় বাদশাহ আলমগীর ভারতে না দেখে দেখেছিলেন মক্কার মরুভূমির পবিত্রতা। সেই মনোভাব ফতোয়া–ই–আলমগীরিকে অনেকখানি technical ও artificial করেছে। সেই মনোভাব ব্রিটিশ ভারতে আজও আমাদের রাজা ও প্রজা উভয়কেই মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে।

www.pathagar.com

মুসলিম জাগরণ

নাজির উদ্দীন আহ্‌মদ এম.এ

পৃথিবীতে মুসলমানের জনসংখ্যা কত, সে বিষয়ে একাধিক মত বিদ্যমান আছে। নানা মুনির নানা মত। কেহ বলেন, ২৫ কোটি কেহ বা বলেন ৪০ কোটি, বা তার কাছাকাছি। সংখ্যা যতই হউক, নগণ্য নহে। মানব সমাজের ন্যূনাধিক এক পঞ্চমাংশ যে সমাজের জনবল তাহার ভালমন্দ অনেকটা সারা দুনিয়ারই ভাল মন্দ। তাই ইহার উত্থান পতনের ইতিহাস ও বর্ত্তমানের নব জাগরণের চাঞ্চল্য সকলেরই প্রণিধানযোগ্য।

তারপর মুসলিম জনসমষ্টি মরক্কো হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত যে বিচিত্রভাবে বিস্তৃত, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, মুসলমানের জাগরণই প্রকৃতপক্ষে এশিয়ার জাগরণ। পাশ্চাত্য সভ্যতার গতিরোধ ও প্রবুদ্ধ এশিয়ার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ—এ দুইয়ের একটিও মুসলমান না জাগিলে হইয়া উঠিবে কিনা সন্দেহ। আজকাল কেহ কেহ মুসলমান হিসাবে মুসলমানের জাগরণে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন, আরবী জাগিতে পারে, তুর্কী জাগিতে পারে—কিন্তু সে মুসলমান বলিয়া নয়, নূতন জাতীয় প্রেরণার অপূর্ব্ব আন্দোলনের ফলেই এই উত্থান। কথাটা যতই সত্য হউক, সমগ্র মুসলিম জগতের ঐক্যকে এজন্য অস্বীকার করা যায় না। আজ যদিও খিলাফতের ন্যায় কোন বাহ্যিক প্রতিষ্ঠান মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্রীভূত করিতেছে না। তথাপি সমস্ত মুসলিম জগতে একটা অভ্যন্তরীণ মিল পরিব্যাপ্ত আছে, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে অস্বীকার করিয়া নয়, তাহাকে বেষ্টন করিয়া সমস্ত মুসলিম সমাজ যেন একটি বিনা সুতায় গাঁথা ফুলের মালা। প্রত্যেকটি অংশ স্ব স্ব ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ রক্ষা করিয়াও এক বিরাট সমষ্টির অঙ্গীভূত। এই রক্ষা করিয়াও এক অদৃশ্য শৃঙ্খল প্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে আকার প্রদান করিয়াছে ভৌগলিক সীমারেখাকে মানুষ হইতে মানুষের ব্যবধান প্রকাশক বলিয়াই মানিয়া লয় নাই। এর মূলে আছে উর্দ্ধ তেরশত বৎসরের ঘটনাবহুল বিচিত্র ইতিহাস ও কালচারের আদান-প্রদানজনিত এক সামঞ্জসীভূত মনোবৃত্তি। তাই দেখিতে পাই সুখে দুঃখে সমগ্র মুসলিম জগতে সহানুভূতি। এই প্রকাণ্ড দেহের এক প্রান্তে যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তাহা তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় সারা অঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এই হিসাবে সমস্ত মুসলিম সমাজ একটি বিশিষ্ট আন্তর্জ্জাতিক প্রতিষ্ঠান সমগ্র মুসলমান এক বিরাট জাতি। মুসলমানের উন্নতি ও অবনতির সমগ্র ইতিহাস এক সূত্রে গাঁথা। সর্ব্বপ্রথমে জাগরণের ক্রমবিকাশের হেতু নির্ণয়ের পূর্ব্বে অবনতির কারণ সন্ধান আবশ্যক। ইসলামের অভ্যুদয় জগতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। মরু প্রস্রবণ ইসলাম যত সহজে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তত সহজে আর কোন ধর্ম্ম স্বীয় সাধনাকে স্ব প্রতিষ্ঠ করিতে পারে নাই। সভ্যতার গণ্ডী-বহির্ভূত আরব প্রাণে যখন ধর্ম্মের প্রস্রবণ প্রবাহিত হইল, তখন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহে যিশুখৃষ্ট ও যরোস্টারের শিক্ষার আধ্যাত্মিক প্রেরণা আচার-প্রীতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাই সে যুগে আরবের জয় কোরানের মার্জ্জিত শিক্ষা ও উন্নত আধ্যাত্মিক প্রতিভারই জয়। সে সময় হইতে ১০০০

www.pathagar.com

খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিন শত বৎসর মুসলিম অধ্যুষিত ও মুসলিম শাসিত দেশসমূহ পৃথিবীতে সভ্যতার উন্নতি প্রচেষ্টায় অন্যান্য দেশ ও জাতি হইতে অধিকতর অনুরাগী ছিল। তারপর হইতে অবনতির আরম্ভ। প্রায় তিন শত বৎসর অবনতি ধীর ভাবে চলিয়াছিল, এবং মুসলিম জগৎ এই সময়ে মনের উৎকর্ষে মোটের উপর খৃষ্টান জগতের অগ্রবর্ত্তীই ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মোঙ্গল আক্রমণ ও বাগদাদ ধ্বংসের পর হইতেই মুসলিম জগৎ জীবন সংগ্রামে ও সভ্যতার বাহনরূপে ইউরোপের পশ্চাৎগামী হইতে আরম্ভ করিল।

এই অধঃপতনের মূলে অনেক কারণ নিহিত আছে। কিন্তু এর প্রধান কারণ—মুসলমানের সত্যানুসন্ধিৎসা ও মুক্ত বুদ্ধির লোপ, প্রথম যুগের মুসলমান কোরানের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত ছিল। সে শিক্ষা খুবই উচ্চগ্রামের তাই সে যুগের মুসলমানের মধ্যে অনেক মহৎ চরিত্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাহারা অতি সহজে গ্রীস ও পারস্য সভ্যতার মূল উপকরণগুলি নিজেদের করিয়া লইতে পারিয়াছিল, কিন্তু বেশী দিন এ ভাব রহিল না। ধীরে ধীরে ধর্ম্ম ও সামাজিক কাঠামো শক্ত হইয়া উঠিল। মুসলিম ধর্ম্মানুশাসন আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে বিশিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইল। একদিকে আল-আশারী অন্য দিকে ইবনে হাম্বনের ধর্ম্ম ব্যাখ্যা যখন সমগ্র মুসলিম সমাজ মানিয়া লইল, তখন হইতে এই সমাজে সর্ব্বপ্রকার চিন্তার স্ফুরণ লয় প্রাপ্ত হইল। কীটদষ্ট পুষ্পকলির মত মুসলমানের অভ্যন্তরীণ সম্ভাবনা আর বিকাশ লাভ করিতে পারিল না। তাই আল গাজ্জালীর পর একমাত্র ইবনে রোশদ ব্যতীত মুসলিম জগতে আর কোন প্রথম শ্রেণীর চিন্তা নায়কের জন্ম হয় নাই। মোতাজিয়া আন্দোলনের অবসান হইল ও তৎসঙ্গে সর্ব্বপ্রকার দর্শন-বিজ্ঞানের চর্চ্চা মুসলমান সমাজ হইতে বিদায় গ্রহণ করিল ; সমগ্র মুসলিম জগৎ চিন্তার দৈন্যে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। ধর্ম্ম ও রাজনীতিতে দাসত্বের বিরুদ্ধাচারী বেদুইন আবার তাহার মরুভূমিতে আশ্রয় নিল। যে শক্তি-প্রবাহ মরু হইতে নির্গত হইয়া সংসার উর্ব্বর করিতে চলিয়াছিল ক্ষুধিত মরুর বুক তাহাকে শুষিয়া লইল।

অধিকন্তু হালাকুর বাগদাদ ধ্বংসের পরে যাহারা ইসলামের পতাকাকে উড্ডীন করিয়া ধরিল সেই তুর্কীজাতি নবদীক্ষিতের উদ্যম-পরবশ হইয়া ধর্ম্মে গোঁড়ামীর সহায়তা করিতে লাগিল। তাহাদের মনের কপাট খুলিল না ; ফলে তাহাদের বাহ্যিক বিজয়ের অন্তরালে কালান্তক হলাহল ক্রিয়া করিতে লাগিল। তাই যে শক্তি এক যুগে ভিয়েনার নগর প্রাচীর পর্য্যন্ত সমগ্রী ইউরোপের ত্রাসরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহা উত্তরকালে খৃষ্টান শক্তিপুঞ্জের তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সামগ্রী হইয়াছিল। মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের যখন নূতন যুগ আরম্ভ হইল তহন মুসলমান পাথরের মূর্ত্তির মত পথের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। এশিয়ার তামস রজনী গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয়। অবস্থা দেখিয়া পাশ্চাত্য জগতের ধারণা জন্মিয়া গেল যে, ইসলামের জীবনীশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তখন হইতে ইউরোপ মুসলমান দেশসমূহের সীমা প্রান্তে হানা দিতে লাগিল। শ্বেত জাতি নিজ উদর পূর্ত্তির জন্য অন্যান্য জাতিসমূহকে আর্থিক দাসত্বে পরিণত করিল। ভিন্ন ধর্ম্মী ও ভিন্ন সভ্যতার কবলে পড়িয়া নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাইবার ভয় ইসলামের নিশ্চল দেহে স্পন্দন জাগাইয়া তুলিল। সে স্পন্দনের বেগ ধীরে ধীরে প্রবল হইতে প্রবলতর হইতেছে। আজ নবজাগ্রত মুসলিম সমাজ পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

www.pathagar.com

ইসলামের এই নবজীবনের চেতনা দুইভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। একদিকে, ওহাবী আন্দোলন মুসলমানদিগের মধ্যে খোলাফায়ে রাশেদিনের যুগের আদর্শকে মুসলমানদিগের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিতেছে। তাহাদের মতে সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হওয়ায়ই মুসলমানের অবনতির কারণ। এই আন্দোলন এক সময়ে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। প্রায় সব দেশেই মোল্লা শ্রেণী এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক। ইবনে সৌদের মক্কা বিজয় ইহার শ্রেষ্ঠ সফলতা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। এই আন্দোলনের মূলে ইবনে হাম্বলের শিক্ষার গোঁড়ামী বিশেষভাবে মিশ্রিত আছে। এই আন্দোলন হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া উত্তর আফ্রিকায় সেনৌসী আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। এই দুই আন্দোলন সর্ব্বপ্রথম মুসলমানদিগকে ইউরোপের বিরুদ্ধে প্রবুদ্ধ করিয়া তুলে।

কিন্তু এই আন্দোলন শ্বেত শক্তির গতিরোধ করিতে পারিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সভ্যতার যে চাপ মুসলিম জগতের সীমান্ত প্রদেশে মাত্র অনুভূত হইয়াছিল, তাহা উনবিংশ শতাব্দীতে মরক্কো হইতে চীন পর্য্যন্ত অভিভূত করিয়া ফেলিল। একটি একটি করিয়া পশ্চিমের রাহু মুসলিম দেশসমূহ গ্রাস করিতে লাগিল। এই অসমর্থতা ধীরে ধীরে দূর দৃষ্টিশালী মুসলমানের দৃষ্টি ওহাবী আন্দোলনের দুর্ব্বলতার দিকে আকর্ষণ করিল। তাঁহারা দেখাইলেন যে অন্ধ গোঁড়ামী দ্বারা কোন ফল লাভ হইবে না। ইউরোপের বিরুদ্ধে টিকিয়া থাকিতে হইলে ইউরোপের জ্ঞান গরিমাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে তুরস্কে মিদহাত পাশা, টিউনিসে খয়রদ্দিন পাশা, ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ ও সর্ব্বোপরি জামাল উদ্দিন আল্-আফগানী মুসলমানদিগকে এইপথে আহ্বান করেন। তুরস্কের নব্যতুর্কী আন্দোলন এই মনোভাবের পরিচায়ক। কামাল পাশার তুরস্কের নব সংগঠনে এই আন্দোলনের প্রভাব বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়।

বিগত মহাযুদ্ধের পরমুহূর্ত্ত মুসলিম জগতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় সময়। উর্দ্ধ একশত বৎসর ব্যাপী খৃষ্টান শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনের পর ১৯১৯ সনে এই ফল দাঁড়াইল যে, সেভার্সের সন্ধির পর সমগ্র জগতে প্রকৃত পক্ষে আর একটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্যও রহিল না। দুঃখে ও ক্ষোভে মুসলমান মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই দীপ্তভাবে জাগরণের নবীন শিখা জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষুব্ধ মুসলমান ইউরোপের অবসন্নতার সুযোগ বুঝিয়া যুদ্ধ দেহি বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। বিজিত তুর্কী বিজেতাকে অগ্রাহ্য করিয়া কামালের পতাকার নীচে সমবেত হইল। রীফ জাতি আবদুল করিমের নেতৃত্বে স্পেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামিল। ত্রিপলীর অধিবাসীগণ ইটালীর বিরুদ্ধাচারী হইল, মিসের ইংরাজের বিরুদ্ধে আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিল, সানার ছমান আদন আক্রমণ করিল, সিরিয়া, ইরাক, আফগানিস্তান স্বাধীনতার জন্য অস্ত্র-সজ্জায় সজ্জিত হইল, ভারতে খিলাফত আন্দোলন বৃটিশ সিংহকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। পৃথিবী বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল ও মনে মনে বলিল, 'এ যৌবন জলতরঙ্গ রুধিবে কে !"

মুসলিম জাগরণের এই আশ্চর্য্য বিকাশ অত্যন্ত চমকপ্রদ। এর ফলে কামাল পাশা যে নূতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন তাহাতে মুসলমানের সমস্যাগুলিকে নূতনভাবে সমাধান করিবার চেষ্টা চলিতেছে। এ যুগে মুসলমানের ইতিহাসে বড় ঘটনা খিলাফতের অবসান। মুসলমান এখন তাহার সবচেয়ে পুরাতন প্রতিষ্ঠানকে বাদ দিয়া নূতনভাবে সমাজ সংগঠন করিতেছে। অনেকে মুসলমানদের মধ্যে জাতিগত বৈষম্যের (racial antagonism) প্রতি ইঙ্গিত করিয়া

www.pathagar.com

বলেন যে, ইসলাম শতধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে, ইহার পূর্ব্বতন একতা আর নাই। প্রকৃত পক্ষে ইসলাম জাতীয়তার বিরুদ্ধাচারী নহে। ইহার দাবী জাতীয়তার অতীত, আরো উচ্চতর গ্রামের। খিলাফতের অবসান ইসলামের ভিতরে বিভিন্ন জাতি সংগঠনের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইসলামের একতা কোন বাহ্যিক আকার বা অনুষ্ঠানের অপেক্ষা রাখে না। তাই দেখিতে পাই তুরস্কের সহিত অন্যান্য মুসলিম জগতের ধর্ম্ম বিষয়ে মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও সারা মুসলিম জগৎ তাহার সহিত মিলিত হইয়া ইউরোপের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সদাই প্রস্তুত।

মুসলিম জাগরণের ঘটনাবলী লক্ষ্য করিলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব ধীরে ধীরে মুসলমানকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। সর্ব্বত্র আজ মুসলমান ইউরোপীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছে। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন আন্দোলনই তেমন ব্যাপকভাবে মুসলিম সমাজের সর্ব্বসাধারণকে প্রভাবান্বিত করিয়া তাহাদিগকে নূতন জীবন দান করিতে পারিতেছে না। সাধারণ মুসলমান এখনও প্রাচীনের মোহে আচ্ছন্ন। তুরস্কের ধর্ম্মকে রাজনীতি হইতে পৃথক করিয়া সমাজকে নূতন ছাঁচে ঢালাই করার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু সাধারণ তুর্কী আঘাতে সম্মত নহে। এই ব্যর্থতার কারণ বোধ হয় আমাদের চেষ্টার পশ্চাতে আধ্যাত্মিকতার ও মর্ম্ম দৃষ্টির অভাব। মুসলমান দুই দলের মাঝখানে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতেছে। একদল চাহিতেছে পুরাতনকে আঁকড়াইয়া থাকিতে, আর একদল চাহিতেছে ইউরোপের পাছে পাছে ছুটিতে। অনুকরণ উভয়ের জীবনসর্ব্বস্ব, কেহই প্রাণের সন্ধান পাইতেছে না। যে দিন নূতন আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়া মুসলমান ধর্ম্মকে নূতন করিয়া পাইবে, সে দিন তাহার প্রাণের সমস্ত বাঁধন টুটিয়া যাইবে, সৃষ্টির অপূর্ব্ব আনন্দ তাহার প্রাণে নূতন ফসল ফলাইবে। তখনই হইবে প্রকৃত পক্ষে মুসলমানের গণজাগরণ। সেইদিন সুপ্রভাত।

শিখা

১ম বর্ষ	।৹
২য় বর্ষ	৸৹
৩য় বর্ষ	১৲
৪র্থ বর্ষ	।৹

www.pathagar.com

‘মুসলিম সাহিত্য সমাজে’র মুখপত্র
(বার্ষিকী)

শিখা

পঞ্চম বর্ষ, ১৩৩৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

‘মুসলিম সাহিত্য সমাজে’র মুখপত্র

[বার্ষিকী]

শিখা

সম্পাদক

আবুল ফজল বি.এ., বি.এট.

www.pathagar.com

'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'র মুখপত্র

[বার্ষিকী]

শিখা

পঞ্চম বর্ষ, ১৩৩৮

সম্পাদক
আবুল ফজল বি.এ., বি.টি.

প্রকাশক
সৈয়দ ইমামুল হোসেন
ম্যানেজার, মডার্ণ লাইব্রেরী
নবাবপুর, ঢাকা

PRINTED BY M MUNZER ALI
AT THE MUNZER PRESS
MAHULTULY, DACCA

মূল্য : বার আনা

www.pathagar.com

মুসলিম সাহিত্য সমাজের নিয়মাবলী

১। নাম : এই প্রতিষ্ঠানের নাম 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'।

২। উদ্দেশ্য : সত্যপ্রীতি ও সাহিত্যচর্চ্চা।

৩। সভ্য :

ক) কর্ম্ম-সংসদের অনুমোদনক্রমে যেকোন ব্যক্তি ইহার সভ্য হইতে পারিবেন।

খ) প্রতি সভ্যের বার্ষিক চাঁদা কমপক্ষে এক টাকা হইবে। বৈশাখ হইতে সমাজের বর্ষ আরম্ভ হইবে।

৪। বিশিষ্ট সভ্য : কর্ম্ম সংসদের প্রস্তাবে ও সাধারণ সভার অনুমোদনে বিশিষ্ট সভ্য মনোনীত হইতে পারিবেন।

৫। সাধারণ সভা নয়জন সভ্যের কর্ম্ম সংসদ গঠন করিবেন—সম্পাদক ও দুইজন সহকারী সম্পাদক ও ছয়জন নির্ব্বাচিত সভ্য।

৬। প্রতি বৎসর নূতন কর্ম্ম-সংসদ গঠিত হইবে।

৭। বৎসরে অন্ততঃ ছয়বার সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।

৮। বার্ষিক সভা সাধারণত Easter-এর ছুটিতে হইবে।

৯। কর্ম্ম-সংসদ হইতে সাধারণ সভা একজন কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করিবেন।

১০। সম্পাদক নিজে, অথবা সাতজন সাধারণ সভ্যের চাহিদায়, সাধরণ সভা আহ্বান করিবেন।

১১। বৎসরে দুইবার হিসাব পরীক্ষার জন্য সাধারণ সভা দুইজন হিসাব-পরীক্ষক নিযুক্ত করিবেন।

১২। সম্পাদক নিজে, অথবা কর্ম্ম-সংসদের দুইজন সভ্যের চাহিদা কর্ম্ম-সংসদ আহ্বান করিবেন।

১৩। কর্ম্ম-সংসদের 'কোরাম' চারিজন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে।

১৪। বার্ষিক চাঁদা পূজার বন্ধের পূর্ব্বে দিতে হইবে।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ : অধ্যাপক আবদুর রব চৌধুরী এম.এ ৫৪১

সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ : হাকিম হাবিবুর রহমান ৫৪৫

পঞ্চম বার্ষিক বিবরণী : আবুল ফজল বি.এ., বি.টি ৫৫৮

নাস্তিকের ধর্ম্ম : অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, এম.এ ৫৬২

সভ্যতার উত্তরাধিকার : কামাল উদ্দীন ৫৬৮

ভারতের আদর্শ : আলী নূর এম.এ ৫৭২

আলবেরুনী : মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ ৫৭৬

ইউরোপে এখানে ওখানে কিছুদিন : অধ্যাপক আবদুল হাকিম এম.এ. (ঢাকা), বি.এ. (ক্যান্টার) ৫৮৪

আমাদের রাজনীতি : আবুল হুসেন এম.এ., বি.এল ৫৯২

মোহাদ্দেস প্রসঙ্গ : আবুজ-জোহা নূর আহমদ ৬০১

মুসলিম নারীর কথা : ডাক্তার শামস্ উদ্দীন আহমদ ৬১৩

হিন্দু মুসলমানের কথা : মোহাম্মদ আবদুর রশীদ বি.এ., বি.টি ৬১৬

রবীন্দ্রনাথ ও বৈরাগ্য-বিলাস : মোতাহের হোসেন চৌধুরী বি.এ ৬২১

স্বাধীন ভারতের দাস : অধ্যাপক নাজির উদ্দীন আহমদ এম.এ ৬৩৪

মিলন সৌধ : মোসলেম উদ্দীন খাঁ ৬৩৮

পাটের কথা : আবদুল ওহাব এম.এ ৬৪৩

www.pathagar.com

শিখা
পঞ্চম বর্ষ

জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ
বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট
— মুক্তি সেখানে অসম্ভব।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ

অধ্যাপক আবদুর রব চৌধুরী এম.এ

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

মুসলিম সাহিত্য সমাজের এই পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির তরফ হইতে আপনাদিগকে অভিবাদন করার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। আমি বিশেষ করিয়া অনুভব করিতেছি যে এই কর্ত্তব্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তির উপর ন্যস্ত হইলেই সাহিত্যের মর্য্যাদা বজায় থাকিত। যাহা হউক অভ্যর্থনা সমিতির আহ্বান আদেশরূপেই গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে সাদর সম্ভাষণ জানাইতেছি। প্রার্থনা অদ্যকার অধিবেশন সফল হউক।

সাহিত্যচর্চ্চা ভিন্ন জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। সাহিত্যচর্চ্চা জাতীয় জীবনের পরিচায়ক ও পরিপোষক। যে জাতির মধ্যে সাহিত্যচর্চ্চা নাই, তাহার প্রাণ চাঞ্চল্যেরও সাড়া পাওয়া যায় না। যে জাতির জীবন চারদিক দিয়া পুষ্ট ও বিকশিত হইয়া ওঠে নাই, তাহার নিকট হইতে কোন সাহিত্যের আশা রাখা বিড়ম্বনা মাত্র। বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে আমরা এই সত্যের নিদর্শন দেখিতে পাই। লোকসংখ্যায় আমরা অর্দ্ধেকের অধিক, কিন্তু লোকসংখ্যা ভিন্ন অন্য কোন কিছুতেই বা কোনরূপ যোগ্যতায়ই আমরা বঙ্গীয় সমাজের মধ্যে কোন বিশিষ্ট অনুপাতের দাবী করিতে পারি না। শিক্ষায়, শিল্পে ব্যবসায় বাণিজ্যে আমরা পশ্চাদ্‌পদ। ইহারই নিদর্শনস্বরূপ আমরা দেখিতে পাই, সাহিত্যচর্চ্চায় আমরা উদাসীন। বাংলা সাহিত্য আজ বিশ্বের দরবারে গৌরবান্বিত আসনে সমাসীন, কিন্তু ঐ গৌরবের প্রতিষ্ঠানে আমাদের দান কিছুই নাই ; আমরা সাহিত্যচর্চ্চা করি না বলিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে গভীর হইতে গভীরতর অবসাদে নিমজ্জিত হইতেছি।

সাহিত্যের আসরে আমরা মুসলমানেরা করিতেছি কি? যাঁহারা শিক্ষিত তাঁহাদের অনেকেই ত ইংরাজী বা উর্দ্দুর মোহেই পড়িয়া আছি। আর যাহারা অশিক্ষিত তাহাদের মধ্যে অনেক 'ছহি সোনাভান' বা 'আসল কেয়ামত নামা' নিয়া মশগুল আছি। এই বিভিন্নমুখী ব্যর্থ প্রয়াসের মধ্যভাগে আমাদের সমস্ত সাহিত্য চর্চ্চা ব্যবস্থিত রহিয়াছে।

www.pathagar.com

ভাষা–সমস্যার পূর্ণ সমাধান প্রকৃতভাবে এখনও আমাদের হইয়া উঠে নাই। হয়ত তর্কের খাতিরে যেন বিশেষ দয়াপরবশ হইয়া আমরা স্বীকার করি যে বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। কিন্তু এই কথার পূর্ণ অনুভূতি আমাদের মনে এখনও জাগে নাই। বাংলা ভাষাকে এখনও আমরা অন্তরের সহিত নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে শিখি নাই। কাজেই বাংলা সাহিত্যে আমাদের দান আজও এরূপ নগণ্য।

কিন্তু ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মুসলমান আমলেই বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বশেষ পুষ্টিসাধন হয়, তখন মুসলমানেরা বাংলার প্রতি এইরূপ উদাসীন ছিলেন না। বরং বাংলার মুসলমান বাদশাহ ও ওমরাহ্গণের উৎসাহে ও সাহায্যেই সংস্কৃতের গুরুচাপ এড়াইয়া বাংলা সাহিত্যের বিকাশ সম্ভবপর হয়। সেই আমলে দৌলত, আলাওল, মর্ত্তুজা প্রভৃতি বহু মুসলমান কবি বাংলা সাহিত্যে অমর কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান নরপতিগণের উৎসাহে ও প্রেরণারই বাংলা সাহিত্য তৎকালে সংস্কৃত ও ফার্সীর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারিয়াছিল।

ধীরে ধীরে মুসলমানের জাতীয় জীবনে নানারূপ অবসাদ আসিতে থাকে। তাহারই ফলে তাঁহারা ক্রমশঃ রাজ্যহারা ও বিত্তহারা হইয়া পড়েন। এ সত্ত্বেও বহুকাল মুসলমানগণ শিক্ষার প্রতি একেবারে উদাসীন ছিলেন না। লর্ড বেন্টিঙ্কের আমলে প্রাচ্য শিক্ষা ও প্রতীচ্য শিক্ষা নিয়া এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। এই আন্দোলন বেন্টিঙ্কের আমলের পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু বেন্টিঙ্কের আমলেই ইহা বিরাট সমস্যার আকার ধারণ করে। লর্ড মেকলে ও তাঁহার সহযোগীদের প্রেরণায় ১৮৩৫ সালে প্রতীচ্য শিক্ষার পত্তন হয়। ইহার পর হইতেই হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষায় এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়। হিন্দুগণ প্রতীচ্য শিক্ষা বিপুল আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেন আর মুসলমানগণ মনে করেন, 'রাজ্যহারা হইয়াছি বলিয়া কি নিজ কালচারও খোয়াইয়া' তাঁহারা নব উৎসাহে আরবী ও ফার্সীর চর্চ্চায় লাগিয়া যান। সমস্ত বাংলা জুড়িয়া মুসলমানেরা একমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকেন। ইহারই ফলে মুসলমানেরা স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার দিকে মন দেয় নাই। সেই মাদ্রাসা শিক্ষার জের এখনও মিটে নাই। মাদ্রাসা এখনও মুসলমান শিক্ষার এক বড় সমস্যা রহিয়া গিয়াছে। স্যাডলার কমিশনে বলেন, যদি ১৮৫৪ সালের Education dispatch এর ফলে মাদ্রাসা শিক্ষাকে সময়োপযোগী করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার অন্তর্গত করা হইত, তবে মুসলমান শিক্ষার ধারা একবারে বদলাইয়া যাইত। দেখা যাইতেছে, মাদ্রাসা শিক্ষার যাহায্য ভিন্ন মুসলমান শিক্ষার পথে আসিতে চায় না। এই জন্যই ১৯১৪ সালে মাদ্রাসা শিক্ষাকে বহু পরিমাণে Secular করিয়া Reformed Madrasah Scheme–এর ফলে মাদ্রাসা বহু পরিমাণে Secular ও সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। ইদানীং ঢাকা বোর্ড মাদ্রাসা বোর্ডকে আরও Secular করিয়াছেন। এই স্কীম মুসলমানকে অনেকটা সাধারণ শিক্ষার দিকে টানিয়া আনিতেছে। বর্ত্তমানে ৬৩৬টি Reformed Madrasah আছে। কিন্তু এখনও বাংলা জুড়িয়া বহু ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা রহিয়াছে। গত ১৯৩০ সালের লিস্টে দেখা যায় যে গভর্ণমেন্টের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়াও এখন বাংলায় ২০৮টি ওল্ড স্কীম মাদ্রাসা রহিয়াছে। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি মুসলমানের এই যে বিপুল আগ্রহ ইহাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া আমাদিগকে শিক্ষার পানে অগ্রসর হইতে হইবে।

www.pathagar.com

মাদ্রাসা শিক্ষা সুনিয়ন্ত্রিত হইলে ধীরে ধীরে স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমান ছাত্রে ভরিয়া যাইবে।

আমার বিশ্বাস শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যচর্চ্চাও বাড়িতে থাকিবে ও আমাদের দানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পুষ্ট ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আমাদের দানের জন্য অপেক্ষা করিতেছে; কারণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টি ও সমৃদ্ধির জন্য মুসলমানের দান অপরিহার্য্য।

ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে Norman conquest–এর পর হইতে প্রায় কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত এ্যাংলো স্যাক্সনদের সহিত নবাগত নর্ম্মানদের প্রকৃত মিলন হয় নাই। বহুকাল তাহাদের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান সম্ভবপর হয় নাই। ধীরে ধীরে পরস্পরে পরস্পরকে চিনিতে পারে। এই উভয় জাতির মিলনে যে নূতন জীবনের সৃষ্টি হয় তাহারই মূলে ইংরাজী সাহিত্যে ও ভাষায় জীবনী শক্তি ও সমৃদ্ধির নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। এই মিলনের ফলেই Anglo-Saxon Common sense–এর সহিত Norman imagination–এর সিন্‌থেসিস হয়। তাহারই ফলে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে চসার ও ষোড়শ শতাব্দীতে শেক্‌সপীয়র দুই স্বর্ণযুগের অবতারণা করেন। বাংলা সাহিত্য ও ভাষাতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান এই দুইটি ধারা দেখিতে পাই। একটী উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, অপরটি এখনও আমাদের মাতৃভাষার একটি অনাহত তন্ত্রী রহিয়া গিয়াছে। কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে এই উভয় জাতির প্রকৃত মিলন হইবে, কোন্ ভাগ্যবানের মঙ্গল হস্তে এই উভয় তন্ত্রী একতানে বাজিয়া উঠিয়া সমগ্র বাংলাকে এক গভীর আনন্দ-গানে মুখরিত করিবে। হয়ত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামে আমরা সেই স্বর্ণযুগের পূর্ব্বাশার আভাস পাইতেছি।

বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে মুসলমানদের আশা আকাঙ্ক্ষা কি? মুসলমানেরা ভাষায় বা সাহিত্যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা আনিতে বলে না। ভাষা ও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা চলিতে পারে না। যে ভাষা ও সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতা যত বেশি ভাষা ও সাহিত্য হিসাবে তাহা তত খাট। মুসলমানগণ যে ভাষা ও সাহিত্যকে আদর্শ মনে করে তাহা সাম্প্রদায়িকতা বা আভিজাত্য প্রভৃতি অহমিকা হইতে বহু উর্দ্ধে। সাম্প্রদায়িকতা ও আভিজাত্যের বিরুদ্ধেই তাহাদের অভিযান। তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এই যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বাংলার মাটি বাংলার জলের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।

লেখ্য ভাষা ও কথ্য ভাষার অতি নিকট সম্বন্ধ। লেখ্য ভাষা কথ্য ভাষা হইতে যতই দূরে চলিবে, ততই উহা আড়ষ্ট ও প্রাণহীন হইবে; লেখ্য ভাষা যতই কথ্য ভাষার নিকটবর্ত্তী হইবে ততই উহা সতেজ, সহজ ও সুন্দর হইবে এবং ততই কথ্য ভাষাকে আদর্শের দিকে টানিয়া তুলিতে পারিবে এবং কথ্য ভাষার বহুরূপী রূপকে একত্বের দিকে টানিয়া আনিবে। বাংলার লেখ্য ভাষা প্রথমতঃ আড়ষ্ট ও প্রাণহীন ছিল, ধীরে ধীরে উহা কথ্য ভাষার দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং কথ্য ভাষাও ধীরে ধীরে একত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এখনও সংস্কৃতের মোহ কাটে নাই। আভিজাত্য দূর হয় নাই; ফলে হিন্দু সমাজের কথ্য ভাষাই সাহিত্যের বাহন হইয়াছে। এই সংস্কৃতের মোহ ও আভিজাত্য দূর হইলেও বাংলা ভাষার প্রকৃত উপকার হইবে। সংস্কৃতের সহিত আমার কোন বিরোধ নাই। আমার বিরোধ তাহাদের সহিত যারা বলে যে, যে সব শব্দ দেবভাষা হইতে আসে তাহাদের কোন বিশেষ আভিজাত্য আছে। আমরা মুসলমানগণ নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যের জন্য আমাদের কথ্য

www.pathagar.com

ভাষায় যে সব শব্দ ব্যবহার করি, তাহা সংস্কৃত নয় বলিয়াই পরিহার করিলে চলিবে না। ঐসব ভাব প্রকাশ করিতে যদি মুসলমানদিগকে অনুবাদের সাহায্য লইতে হয়, তবে পূর্ণভাবে ভাব প্রকাশ হয় না। আমাদের কথ্য ভাষার এইসব শব্দ সংস্কৃত না হইতে পারে, কিন্তু এগুলি প্রকৃত বাংলা শব্দ এবং এগুলি ব্যবহারে আমাদের লজ্জার কোন কারণ নাই। অনেক সময় হিন্দু লেখক ও সমালোচকগণ সুবিবেচনার অভাবে এইসব শব্দ ব্যবহারের জন্য তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু তাহাদের মনে রাখা উচিত বাংলা ভাষা কেবলমাত্র তাহাদের নয়, আমাদেরও। শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মূক মুসলমান যতই কথা কহিতে শিখিবে, তাহার কথ্য ভাষা ততই বাংলা ভাষাকে নব শব্দ-সম্পদে ভূষিত করিবে।

সাহিত্যের দিক দিয়াও আমাদের ভাব ও আমাদের আদর্শ এখনও বাংলা সাহিত্যে ফুটিয়া উঠে নাই। এই জন্য আমাদের অনেকেই বলেন, বাংলা সাহিত্যে হিন্দুয়ানী এত বেশী যে আমাদের আদর্শ উহাতে কখনও স্থান পাইতে পারে না। সাহিত্যের উৎস প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে। কাজেই হিন্দু লেখকগণের লেখায় যে কতক হিন্দুয়ানী থাকিবে, তাহা অনিবার্য্য। আমরা মুসলমানগণ বাংলা সাহিত্যে নিজ কর্ত্তব্য করি নাই, আমাদের নিজের আদর্শ ও ভাব ফুটাইয়া তুলি নাই। কি যাঁহারা নিজ কর্ত্তব্য করিয়াছেন, নিজেদের আদর্শ ও ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাদের দোষ দেওয়া চলে? দোষ দেওয়ার যে মনোবৃত্তি তাহা হইতে আমাদিগকে বহু উর্ধ্বে উঠিতে হইবে, এবং আমাদের নিজ আদর্শ ও ভাব সাহিত্যে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। তবেই আদর্শ জাতীয় জীবন ফুটিয়া উঠিবে ও প্রকৃত সাহিত্য গঠিত হইবে। সুখের বিষয় ইদানীং বহু হিন্দু লেখকগণেরও লেখায় আমাদের আদর্শ ও ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে। এরাও নবযুগের অগ্রদূত। আমার বিশ্বাস, আমাদের তরুণ কবি ও লেখকদের লেখায় আমাদের আদর্শ ও ভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে এবং নবযুগ আরও নিকটবর্ত্তী হইবে। হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় আদর্শের মিলন ও সমবায় বাংলা সাহিত্যের এই নবযুগের ভিত্তি হইবে।

মুসলমান সম্প্রদায়ই প্রকৃতপক্ষে বাংলার কৃষক। মুসলমান কৃষকের আশা ও আকাঙ্ক্ষার সোনার বাংলা সোনার ফসলে ভরিয়া উঠে। মুসলমান সাহিত্যিকদের এই বিপুল আশা আকাঙ্ক্ষায় কি সোনার বাংলা সোনার সাহিত্যে ভরিয়া উঠিবে না?

www.pathagar.com

সাধারণ সভাপতির অভিভাষণ

হাকিম হবিবুর রহমান

বন্ধুগণ,

পারস্য ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—আদমিয়ান্ গুম্ শুদন্দ ও মূলক্-ই-খোদা খর্ গিরফ্ত—আপনাদের সবারই বোধগম্য বাংলাভাষায় ইহার অনুবাদ দিয়া নিজেকে নিতান্তই লাঞ্ছিত করা সঙ্গত নয়। বর্ত্তমানে আমাদের সমাজে কর্ম্মক্ষম লোকের দুর্ভিক্ষ সুস্পষ্ট ; তবু আমাকে আপনাদের এই সম্মেলনের সভাপতি নির্ব্বাচন বিশেষভাবে অপ্রশংসার যোগ্য এই জন্য যে, আমার মাতৃভাষা উর্দ্দু, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ু সেবন আমার ভাগ্যে কোনো কালেই ঘটে নাই। যাহা হউক আমাদের উভয় পক্ষের ভুল-ত্রুটির জালে ধৃত হইয়া যখন সভাস্থল পর্য্যন্ত আসিয়া জুটিয়াছি তখন মুখ ত আমাকে খুলিতে হইবেই। আমার মত একজন সেকেলে ও সেকালপ্রিয় লোকের বাগ্‌বিস্তার যদি শেষ পর্য্যন্ত আপনারা সহ্য করতে পারেন তবেই যথেষ্ট।

ইসলামের প্রথম শতাব্দীতেই মুসলমানগণ আমাদের এই ভারতভূমিতে পদার্পণ করেন। ভারতের সঙ্গে আরববাসিগণের পরিচয় সুপ্রাচীন, কিন্তু এদেশের অধিবাসীরূপে পরিগৃহীত তাঁহারা হন নাই। মুসলমানগণ কিন্তু এদেশের স্থায়ী অধিবাসীই হইয়া গেলেন।

ভারতের উপকূলভাগ তাহাদের প্রথম অবতরণভূমি এবং 'আল্ আক্‌রাবু ফাল্ আক্‌রাবু' (যত কাছে তত আগে) নীতির অনুসরণে ঐ সকল ভূভাগে নবাগতগণের সংখ্যাধিক্য স্বাভাবিক। তাই পাঞ্জাব ও দোআব মোগল তুর্কীগণের, এবং সিন্ধু, বঙ্গ, সিঙ্গাপুর ও যবদ্বীপের উপকূলভাগ আরব বণিকগণের ও মুসলিম প্রচারকগণের বিচিত্র কর্ম্মভূমি। এই সমুদ্র-উপকূলবাসীদের যে স্বরভঙ্গী ও তাহাদের মুখমণ্ডলের যে গঠন তাহাই অনেকখানি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেয়, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষদের আদি বাসস্থান কোথায়।

সবাই জানেন আবর, তুর্ক, মোগল ও হাবসীদের হাজার-করা একজনও এদেশে স্ত্রীপুত্র সঙ্গে লইয়া আসেন নাই। তৎকালীন ঔপনিবেশিক প্রথানুযায়ী এদেশ হইতেই তাঁহারা স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানী সৈয়দ, হিন্দুস্থানী তুর্ক ও হিন্দুস্থানী মোগলের বংশ-ভিত্তি স্থাপন এই ভাবেই। তারপর, ইহারা আবু মা'শেরে ফলকী ও আলবেরুনীর ন্যায় বিদ্যাচর্চ্চার ব্রত লইয়া এদেশে আসেন নাই। তাই এদেশের যে ভাষা তাহাতেই তাহারা ব্যুৎপত্তি লাভ করিবেন ইহা সম্ভবপর নয়। এ ভিন্ন বিজেতা ও বিজিত উভয়েই উভয়ের ভাব ও ভাষা আয়ত্ত করিতে চির-উৎসুক। তাই ইহাদের ভিতরে এক নবভাষার উৎপত্তি হইতে লাগিল—তাহার নাম হইল হিন্দি ও হিন্দুস্থানী। পারস্য ঐতিহাসিকগণ এদেশের হিন্দুগণের ভাষা 'হিন্দুভি' ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য, হিন্দিভাষা মূলতঃ হিন্দু-মুসলমানের সম্মেলন-জাত ভাষা, আর ক্রমশঃ রূপান্তরিত অবস্থার উহা দেশের চতুর্দ্দিকে

www.pathagar.com

বিস্তার লাভ করিতে থাকে। এইরূপে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের কিছু পূর্ব্বে পাঞ্জাবে এই ভাষার বর্ণমালা 'গুরুমুখী'তে পরিণত হয়।

মুসলমানগণ তাহাদের আনীত বর্ণমালা স্ব স্ব প্রাদেশিক ভাষায় ব্যবহার করিতেন। যেমন সিন্ধু প্রদেশের আরবগণ তথায় আরবী (নস্খ) বর্ণমালা ব্যবহার করিতেন। অদ্যাবধি সিন্ধুবাসিগণ আরবী বর্ণমালায় দেশীয় ভাষায় পত্রাদি লিখিয়া থাকেন। দাক্ষিণাত্য অধিবাসিগণের ব্যবহৃত বর্ণমালা মোগল প্রভাবে ফার্সী (নস্তালিক) বর্ণমালায় পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যের ভাষাসমূহ দশম শতাব্দীর লিখিত। অধুনা ইউরোপের বহু গ্রন্থাগারে রক্ষিত, পত্রাদি আমার এই উক্তির স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

এইরূপে দোআবের ভাষায় ফার্সী বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সৈন্যবাহিনীর ভিতরে যে ভাষার জন্ম হইয়াছিল তাহাই উর্দ্দু ভাষা—তুর্ক ভাষায় সৈন্যবাহিনীকে উর্দ্দু বলা হয়। দাক্ষিণাত্যের ভাষা ও উর্দ্দু ভাষা প্রকৃতপক্ষে একই ভাষা। ইহাদের ভিতরে পার্থক্য এই যে, দিল্লীতে আসিয়া উর্দ্দু ভাষা অধিক পরিমাণে পরিমার্জ্জিত হইয়াছে এবং রাজশক্তির আশ্রয়ে থাকিয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার করয়িা বিপুল কলেবর হইতে সমর্থ হইয়াছে।

বাংলায় যে সকল মুসলমান সর্ব্ব প্রথম দেশের উপকূলভাগে বসতি স্থাপন করেন তাঁহারা বাণিজ্য ও নাবিক তাতেই আত্মনিয়োগ করেন। কেহ বা দেশে আল্লার নাম ও বাণী পৌঁছাইতে নিযুক্ত হন। এই আরব ও পারস্য–আগত মুসলমানগণ তাঁহাদের বংশধরদের ভাষায় এমন কতকগুলি বিশিষ্টধ্বনিযুক্ত শব্দ রাখিয়া গিয়াছেন যাহার উচ্চারণযোগ্য বর্ণ বাংলা ভাষায় আদৌ নাই।

পশ্চিম হইতে দ্বিতীয় জাতি যাঁহারা বাংলায় আসিয়াছিলেন তাহারা তুর্ক ও পাঠান। ইঁহারা সকলেই সৈনিক পুরুষ ছিলেন, আর রাজ্য বিস্তারই ছিল ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, বিদ্যার্জ্জন বা অধ্যাপনা নয়। বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের 'তুর্ক' বলা হইয়াছে, আর এদেশে নবদীক্ষিতকে 'খান' উপাধি দেওয়া হয়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়। পাঠান প্রভাব বাংলায় কত গভীর। সম্রাট আকবর বাংলাকে 'বেলগাক্খানা' (ভীমরুলের চাক) বলিতেন। বাস্তবিক পাঠানগণ আফগানিস্থানের পরেই বাংলাকে তাঁহাদের দ্বিতীয় আবাসস্থল করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের সকল 'খেল' ও 'জই', যথেষ্ট সংখ্যায় এখানে বসবাস করিতেছিলেন এবং কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহারা দিল্লীর শক্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনভাবে পূর্ণ গৌরবে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, শেষ ভাগে বাংলার সন্তান শের শা ও ইসলাম শা সমগ্র ভারতবর্ষের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। হুমায়ুন হইতে জাহাঙ্গীর পর্য্যন্ত সকলকেই বাংলায় আধিপত্য বিস্তার কালে পাঠানদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

পাঠানগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ছিলেন সৈনিক যোদ্ধা। তবু মাদ্রাসা স্থাপন, অনুবাদকরণ, স্বাধীন রচনাবলীর দ্বারা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন, ইত্যাকার বিদ্যানুরাগের পরিচয়ও তাঁহারা দিয়াছেন। বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দিনের নাম মহাকবি হাফেজ চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন।*

* কবি হাফেজ ও সুলতান গিয়াসউদ্দিন সম্পর্কিত সুবিখ্যাত গল্পটি এই—সুলতান গিয়াসউদ্দিনের সরব, গুল ও লালা নাম্নী তিনটি বাঁদী ছিল। তাহারা প্রত্যহ সুলতানকে স্নান করাইত। তাহারা সুলতানের খুব প্রিয়পাত্রী ছিল।

কিন্তু তবু বলিতে হইবে, এসব তাঁহাদের শেষ সময়ের কীর্ত্তি ; আর সেজন্যই দক্ষিণ দিক হইতে লিখিবার উপযুক্ত বর্ণমালার সৃষ্টি বাংলায় হইতে পারে নাই। বাংলার এই মুসলমানগণ যখন রাজ্যহারা হইয়া তরবারির পরিবর্ত্তে হল বা হাল ধরিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই 'পেদরম সুলতান বুদ' (আমার পিতা বাদশাহ্ ছিলেন) অবস্থায় নিজ সম্প্রদায়ও উপঢৌকনসহ লোক প্রেরণ করিয়া এই অনুরোধ জানাইলেন যে, কবিবর যেন এই শ্লোকার্ধ্ব লইয়া ও ইহার ছন্দ ও মিল বজায় রাখিয়া একটি গজল রচনা করেন। হাফেজ সুলতানের অভিলাষানুযায়ী একটি গজল রচনা করেন ও সুলতানের নিকট তাহা পাঠাইয়া দেন, কিন্তু তিনি নিজে ভারতবর্ষে আসেন নাই। সেই গজল হইতে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

১। সাকী হাদিসে সর্‌বোগুলো লালা মিরওদ
বিঁ বহস্ বা সালাসায়ে গস্‌সালা মিরওদ। হে সাকী, সর্‌ব (সাইপ্রেস) গোলাব ও 'লালা' ফুলের কথা সবাই বলছে ; তিন পাত্র শারাবের কথাও সবাই বলছে। (পারস্যের লোকেরা ফুল সামনে রেখে অথবা ছোঁড়াছুড়ি করে শারাব পান করতেন)

২। শাক্‌র শিক্‌ন শওয়ন্দ হামা তুতিয়ানে হিন্দ জ্ঁি কন্‌দে ফার্সী কে বাঙ্গালা মিরওদ। পারস্যের এই মিছিরি বাংলায় পাঠানো হলো ; এতে ভারতবর্ষের সমস্ত টিয়া মধুকণ্ঠ হবে।

৩। হাফিজ জে শওকে মজলিসে সুলতাঁ গেয়াসেদীন গাফেল মশো কেকারে তু আজ নালা মিরওদ।

হাফিজ, সুলতান গিয়াসউদ্দিনের দরবারে প্রীতি সম্বন্ধে সজাগ থেকো, নইলে তোমাকে নিদারুণ অনুশোচনায় পড়তে হবে ও ধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট পত্রিকাদিতে মুসলমানী বাংলা দক্ষিণ দিক হইতে লিখিবার প্রথার প্রচলন করেন। অতীতের এই ধরনের বহু বাংলা রচনা এখনও দুর্লভ নয়।

মুসলমানদের শাসনকালে বাংলার দফ্‌তরের ভাষা ফার্সী ছিল এবং হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে শিক্ষিত বঙ্গসন্তানগণ ইহাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। বহু হিন্দু লিপিকার ও গ্রন্থকারের সুন্দর হস্তলিপির নিদর্শন আমরা এই ঢাকা নগরীতেই পাইয়াছি। মুসলমান রাজত্ব যখন ইউরোপীয় বণিকগণের হাতে আসিল তখনও বাংলার দফ্‌তরের ভাষা ফার্সী ছিল এবং হিন্দু ও মুসলমান ভিন্ন ইংরেজগণও ইহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহাদের ফার্সী অভিজ্ঞতার পরিচায়ক বহু পুস্তক এখনও মজুদ আছে।

একদিন সুলতান এই অর্ধ শ্লোক রচনা করিলেন—'সাকী, হাদিসে সরবো গুলো লালা মিরওদ' (হে সাকী, সরব, গুল, ও লালার কথা সকলে বলিতেছে)। কিন্তু দ্বিতীয় চরণটি তিনি আর সম্পূর্ণ করিতে পারিলেন না। তাহার দরবারের কবিদের আহ্বান করিলেন। তাঁহারাও কেহ বাদশাহের মনের মত চরণ যোগাইতে পারিলেন না। অবশেষে সুলতান প্রথিতযশা হাফেজ শিরাজির কাছে অর্থ ও এই গল্পের কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা তাহা যাচাই করিবার কোনো উপায় নাই। তবুও অন্ততঃ এটুকু সত্য যে হাফেজ এই গজল সুলতান গিয়াস উদ্দিনের জন্য লিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাংলা তাই ইহাকে বিশেষতঃ ইহার এই চরণ 'জ্ঁি কন্‌দে ফার্সী কে ববাঙ্গলা মিরওদ' ইহার নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে পারে।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে দূরদৃষ্টি ইংরাজ দেখিলেন যে, আশ্রয়হীন অথচ জনসাধারণের ভাষা উর্দ্দুর ভিতরে উন্নতি সম্ভাবনা যথেষ্ট পরিমাণে রহিয়াছে। তাই কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ খোলা হইলে তথা হইতেই বর্ত্তমান উর্দ্দুর বিকাশ আরম্ভ হইল। আমার বিশ্বাস, এই কলেজের সৃষ্টি হইতেই বাংলার সরকারী দফতরের ভাষা অকস্মাৎ ফার্সী হইতে উর্দ্দুতে পরিবর্ত্তিত হইল। এই উর্দ্দুভাষা কতিপয় বৎসর বাংলার দফতরের ভাষা রহিল। এই সময়ে মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুগণও উর্দ্দুর ভক্ত হইয়া উঠিলেন। বাংলার এক প্রসিদ্ধ নেতার (শ্রীযুক্ত জে. এম. সেন গুপ্তের) ঠাকুর দাদা একটি উর্দ্দু পুস্তকের রচয়িতা, উর্দ্দুভাষার কবিগণের সর্ব্বপ্রথম বিবরণীর সংকলন জনৈক বাঙ্গালী হিন্দু ('নুস্ খাই—দিল্‌কুশা'—রাজা জনমেজয় মিত্র)। উর্দ্দুভাষা শুধু মুর্শিদাবাদ ঢাকা ও কলিকাতার সহিতই সম্পর্কিত ছিল না, সমস্ত বাংলাই ইহার চর্চ্চা ও আলোচনা স্থল হইয়া উঠিয়াছিল। এখনকার বাঙ্গালী অপেক্ষা তখনকার বাঙ্গালী অধিকতর সাহসী ছিলেন ; তাই লক্ষ্ণৌর নবাব দরবারের একজন রাজকবি ছিলেন হুগলীর জনৈক মুসলমান (মালিক–উশ্–শোয়ারা কাজী মোহাম্মদ সাদেক খান আক্তার)। হজরত মোহাম্মদ ও আম্বিয়াগণের যে জীবনী সর্ব্বপ্রথম উর্দ্দুভাষায় মুদ্রিত হয় উহার রচয়িতা ছিলেন কুমিল্লার জনৈক মুসলমান (মৌলবী মোহাম্মদ সইদ)। উর্দ্দুভাষায় সর্ব্বপ্রথম নাটকের রচয়িতা রংপুরের জনৈক মুসলমান ('সওলাতে আলমগিরি'—সৈয়দ মোহাম্মদ হায়াত)। আর সব চাইতে গৌরবের কথা এই, লক্ষ্ণৌওয়ালাদের কবিত্ব বিষয়ে গবেষণামূলক সর্ব্বপ্রথম পুস্তক সুপ্রসিদ্ধ 'তুমার–ই–আগলাত'–এর রচয়িতা এই বঙ্গমাতারই ফরিদপুরের এক সন্তান (মৌলবী আবদুল গফুর খান মস্সাখ)। উর্দ্দুর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের কাছে আজও ইহার মর্য্যাদা অতুলনীয়। মুর্শিদাবাদের জনৈক উর্দ্দু সাহিত্যিকও সবিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি উর্দ্দুতে স্ত্রীলোকের ব্যবহৃত ভাষার (রেখ্‌তি) প্রথম বিবরণ লেখক অথবা আবিষ্কারক। বাংলার স্ত্রী উর্দ্দু সাহিত্যিকদের রচনার পরিমাণও কম নয়। মোট কথা, উর্দ্দু ভাষা ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলায় এক বড় সার্থকতা লাভ করিয়া চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু এক রাজনৈতিক চালে হঠাৎ বাংলার সরকারী দফতরের ভাষা উর্দ্দু বিষম বাধা পাইল, এবং বাংলার মুসলমান ধ্বংসমুখে পতিত হইলেন। এইভাবে বাংলার মুসলমানকে যে সরকারী দফ্‌তর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল যে দুঃখের কান্না আজও আমাদের সভাসমিতিগুলি কাঁদিতেছে।

সেকালে আমাদের সাহিত্যিকদের এক বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁহারা প্রায় প্রত্যেকেই একাধিক ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপত্তি রাখিতেন। আলাওল সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি, তিনি আবার নেজামী গাঞ্জাবীর 'হাফ্‌ত পায়কর' নামক পারস্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ–কর্ত্তা। পারস্য ভাষায়ও তিনি কবিতা লিখিতেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। পুঁথি–সাহিত্যের প্রতি আমাদের শিক্ষিতদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই ; কিন্তু এই পুঁথি–সাহিত্যের মূলে যে সাধনা আছে তাহা বাস্তবিকই শ্রদ্ধার যোগ্য। শাহনামার মত অতি বৃহৎ ও সুকঠিন ফার্সী গ্রন্থে বঙ্গানুবাদ উহার উর্দ্দু অনুবাদের প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এইরূপ একাধিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন রচয়িতার সংখ্যা অদ্য হইতে ২৫/৩০ বৎসর পূর্ব্বেও কম ছিল না।

www.pathagar.com

ভ্রাতৃগণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমি একজন সেকাল-প্রিয় লোক, তাই সেকালের কথা ভিন্ন আর কিইবা আমি আপনাদের কাছে বলিতে পারি। বাংলায় উর্দ্দু চর্চ্চার কথা যে একটু বিস্তৃতভাবে বলিলাম, তাহার আর এক বড় কারণ, বাংলায় উর্দ্দু ও বাংলা চর্চ্চার ভিতরে যে একটি দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে তাহা বাস্তবিকই অবাঞ্ছনীয়। উর্দ্দু বাস্তবিকই কোন প্রদেশের খাস ভাষা ছিল না। উহা বরং সমগ্র ভারতবর্ষেরই ভাষা। লক্ষ্ণৌ ও দিল্লীবাসিগণ ইহাকে নিতান্তই এক খেলার সামগ্রী করিয়া তুলিলেন, নানাভাবে ইহার এক বিশেষ মূর্ত্তি দিলেন। তাই ইহা একটি সীমাবদ্ধ স্থানের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আজও উর্দ্দুর প্রসার ও প্রভাব বাস্তবিকই খুব বেশী। আজও ইহা ভারতের এক প্রদেশের সহিত অন্য প্রদেশের ভাব আদান-প্রদানের ভাষা, বিদেশীয়গণও ভারতবর্ষীয়গণের সঙ্গে সাধারণতঃ এই ভাষায় আলাপ করিয়া থাকেন। আর বঙ্গ ভাষা-ভাষীদেরও ক্রোধ-বিরক্তি প্রকাশের ভাষা এই উর্দ্দু ভাষা। আপনাদের মাতৃভাষা বাংলার পুষ্টিসাধন তো আপনারা করিবেন নিশ্চয়ই, কিন্তু উর্দ্দুকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলে সমস্ত ভারতের সঙ্গে আপনাদের যোগ ছিন্ন হইয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন, আপনাদের ধর্ম্মকে তো আপনারা ছাড়িতে পারিবেন না। সেই ধর্ম্মের সাহিত্য-অংশ উর্দ্দুতে যে ভাবে বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে তাহা একান্তই প্রশংসার যোগ্য। সেখান হইতে আপনারা প্রভূত প্রেরণা লাভ করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস।

আমরা বাঙ্গালী মুসলমান ভারতের সমগ্র মুসলমান জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশেরও অধিক, অথচ আমরাই সর্ব্বপ্রকারে অবনতির গভীর তলে পতিত আছি। কিন্তু আফসোস করিয়া আর কি লাভ হইবে। আপনারা একদল তরুণ কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন, এর চাইতে আশা ও আনন্দের কথা আর কি হইতে পারে? আপনারা আপনাদের মাতৃভূমির প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের পুণ্যব্রত সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করুন এই আমার একান্ত অনুরোধ।

কিন্তু কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বে কর্ম্মবিভাগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আপনারা কে কে পারস্য ভাষায় লিখিত অংশ গ্রহণ করিবেন, কে কে আরবী ভাষায় লিখিত অংশ গ্রহণ করিবেন তাহা ঠিক করিয়া ফেলুন। এই সব প্রাচীন ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া আপনারা যে শুধু প্রাচীন ইতিকথাই জ্ঞাত হইবেন তাহা নহে, আমার বিশ্বাস, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, বাংলার লোকদের উৎপত্তি-কাহিনী, ইত্যাদি বিষয়েও বহু মূল্যবান তথ্য উদ্ধার করিতে পারিবেন। যেমন, বাংলার কবিত্বের উপরে পারস্য সাহিত্যের কি প্রভাব পড়িয়াছে ও বাঙ্গালী মুসলমানদের দেহে আরব রক্ত কি পরিমাণে আছে, এবং আরবের কোন প্রদেশেরই বা প্রভাব বাংলাদেশে বেশী, ইত্যাদি বহু মূল্যবান তথ্য আপনারা উদ্ধার করিয়া স্বদেশের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিতে পারিবেন। ভারতবর্ষের কোন প্রদেশেরই মুসলিম ইতিহাস বাংলার মুসলিম ইতিহাসের মত এত অন্ধকারে পতিত নয়। অথচ এই বাংলার মুসলমান সমাজে প্রতিভাবানের জন্ম কম হয় নাই। এই বাংলার সোনার গাঁয়ে মাতামহের আলয়ে হজরত মখ্‌দুম-উল-মুল্‌কের মত মনীষী জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রথম জীবনের শিক্ষা দীক্ষা সোনারগাঁয়ে ওলামা ও 'মোশায়েখ'দের সাহায্যে নিষ্পন্ন হয়। ইমাম খাজেগীর মতো ইল্‌মে-হাদিস অভিজ্ঞ ব্যক্তি এই বাংলায়ই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এই বাংলারই জনৈক সুসন্তান সম্রাট ফিরোজ শাহের মন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

www.pathagar.com

সুপ্রসিদ্ধ মেহেদিভি সম্প্রদায়ের স্থাপয়িতা এই বাংলারই সন্তান। সে সম্প্রদায় অদ্যাবধি দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে অবস্থিতি করিতেছে। 'মানাদুর' নামক মুসলমান করদ রাজ্যটি এই মেহেদিভি সম্প্রদায়েরই স্মৃতি বহন করিতেছে। আর শুধু ধর্ম্ম চর্চ্চা নয়, কলাবিদ্যার চর্চ্চাও সেকালের বাংলায় কম ছিল না। ইব্‌নে বতুতা এরূপ গায়িকা এই বাংলাদেশে দেখিয়াছিলেন। যাঁহারা ফার্সী গজলে ও মজলিসি সঙ্গীতে কৃতিত্বের পরিচয় দিতেন। কিন্তু আফসোস, সেই বাংলার ঐতিহাসিক বিবরণ আজ আমরা শিক্ষা করিতেছি কতিপয় পক্ষপাতদুষ্ট ইংরেজি ইতিহাস হইতে! আমার ধারণা এই যে, যে সমস্ত অমুদ্রিত ফার্সী ভাষার ইতিহাসে বাংলার ইতিহাসের উপকরণ আছে, সেইগুলির এক লিস্ট তৈয়ার করিয়া আমাদের তরুণদের হাতে দিতে হইবে। (এই উদ্দেশ্যে একটি ছোটখাট লিস্ট অভিভাষণের শেষে দেওয়া হইল।) কিন্তু এই সমস্তের অনেকগুলি এখন আর এদেশে পাওয়া যায় না—ইউরোপের বিভিন্ন পুস্তকাগারে সেসব রক্ষিত আছে। তাই আমাদের দেশের যাঁহারা ইউরোপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহারা যদি ঐ সকল পুস্তকের নকলাদি প্রস্তুত করাইয়া আমাদের জ্ঞানেচ্ছু যুবকদিগের হাতে দিতে পারেন তবে বড়ই ভাল হয়। বিভিন্ন জিলার ইতিহাস উদ্ধারেও আপনাদের ব্রতী হইতে হইবে। প্রচলিত ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারসমূহে ভুলত্রুটি যথেষ্ট। এইরূপে সর্ব্বক্ষেত্রেই দেশের বিশুদ্ধ ইতিহাস উদ্ধার আপনাদের লক্ষ্য হওয়া চাই।

মুদ্রালিপি ও শিলালিপি পাঠের চেষ্টা আপনাদের সামনে আর একটি অতি বড় কাজ। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু মিঃ ভট্টশালী মুদ্রালিপি হইতে মুসলমান বাদশাহদের সম্বন্ধে বহু কিছু জ্ঞাতব্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু আরো অনেক কিছু বাকী।

ফার্সী ও আরবী শিলালিপি পাঠ আর একটি বড় ও সুকঠিন বিষয়। বাংলার বহু স্থানে এখনও বহু শিলালিপি অপঠিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এশিয়াটিক সোসাইটির ত্রৈমাসিক পত্রিকা এসবের কিছু কিছু সন্ধান মাঝে মাঝে দেয়। আমাদের এই ঢাকার প্রভিন্‌শিয়াল মিউজিয়ামে এরূপ অপঠিত শিলালিপি বর্ত্তমান। এই শিলালিপি পঠন-বিদ্যা আমাদের দেশে একরূপ লুপ্ত হইতে চলিয়াছে।

বিভিন্ন প্রাচীন হিন্দু মুসলমান বংশ হইতে ফরমান, নিশান, সোক্কা ইত্যাদি সংগ্রহের কাজও আপনাদের একদলকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলার বহু ধর্ম্মপ্রচারকের ও আউলিয়া দরবেশের হস্তলিখিত জীবনচরিত চেষ্টা করিলে ধ্বংসের কবল হইতে এখনও উদ্ধার করিতে পারিবেন। সার আর্নল্ডের সুবিখ্যাত Preachings of Islam-এ এই দুঃখ করা হইয়াছে যে, বাংলার ইসলাম-প্রচারকগণের জীবন-কাহিনী খুব কমই সংগ্রহ করতে পারা গিয়াছে। একটি বড় দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের প্রাচ্যবিদ্যার এম. এ. গণ শুধু মুদ্রিত পুস্তকই পড়িতে পারেন, হস্তলিখিত পুস্তক পড়িতে পারেন না। কিন্তু এই প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারব্রত যাঁহারা গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের হস্তলিপি পাঠের দক্ষতা অর্জ্জন করা চাই।

বন্ধুগণ, বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে এক বর্ণহীন চিত্র আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহাকে বিভিন্ন রাগ রঞ্জন দ্বারা চিত্রিত করিয়া এক মোহন মূর্ত্তিতে পরিণত করা আপনাদের কাজ। এইরূপে পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলার গীতাদি সংগ্রহে ও উহা

www.pathagar.com

হইতে ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণে আপনাদিগকে চেষ্টিত হইতে হইবে। আপনারা জানেন বর্ত্তমানে রাজপুতজার যে ইংরাজি ইতিহাস লিখিত হইয়াছে উহা স্থানীয় গীতাদি হইতেই সংগৃহীত। বাংলার গানে দোস্তগাজি, কালুগাজি, মনোয়ার খাঁ ইত্যাদি নাম সুপরিচিত। এই সব গীত হইতে তাঁহাদের কর্ম্মজীবনের সন্ধান করিতে হইবে।

'রাত্রি ছোট আর কাহিনী দীর্ঘ।' এইবার অবসান করা যাক। আপনারা সর্ব্বান্তঃকরণে কাজে লাগুন এই আমার কামনা। আমরা বৃদ্ধেরা কিছু করিতে পারি নাই। আপনাদের যুবকদের দায়িত্ব তাই অনেক বেশী। 'আগার পেদর না তাওয়ানদ পেসর তামাম কুনদ'। আপনারা গৌরবান্বিত মুসলমান হউন এই প্রার্থনা করি।

আর্ তো জাতেহেঁ বুত্‌কদেসে মীর,
ফের মিলেঙ্গে আগার খোদা লায়ে।

যে লিস্ট নীচে দেওয়া হইল তাহার প্রায় সবই অমুদ্রিত হস্তলিখিত গ্রন্থ। এগুলি এদেশে পাওয়া যায়।

১. তারিখ-ই-সালাতিনে আফাগানা

এই পুস্তকখানিতে লোদি এবং সুর বংশের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ আছে। পুস্তকখানি বঙ্গদেশ ও বিহারের অধিপতি সুলেমান কররাণীর কনিষ্ঠ পুত্র দায়ুদ শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় আহ্‌মদ ইয়াদগার কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। বাহলুল লোদির সময় হইতে হিমুর পরাভব ও মৃত্যুর বিবরণ পর্য্যন্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। পুস্তকখানির নকল এশিয়াটিক সোসাইটি লইব্রেরী ও বাঁকীপুর লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

২. তারিখ-ই-দায়ুদী

এ পুস্তকখানিও লোদি এবং সুর–বংশের ইতিহাস ; বাহালুল লোদির সময় হইতে দায়ুদ শাহের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঘটনাবলী ইহাতে লিখিত আছে। পুস্তকখানি জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আবদুল্লা কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছিল। বাঁকীপুর লাইব্রেরীতে ইহার একখানি নকল আছে।

৩. তারিখ-ই-শের শাহী

এ পুস্তকখানি তুহ্‌ফাহ্–ই–আকবর শাহীর উর্দ্দু অনুবাদ। শের শাহ্ ও তাঁহার পরবর্ত্তী পাঠান সম্রাটগণের ইতিহাস ইহাতে লিখিত আছে। মূল পুস্তকখানি ৯৮৬/১৫৭৯ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরেই সম্রাট আকবরের অনুরোধে আব্বাস খান সারওয়ানী কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল। উর্দ্দু অনুবাদক তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তিনি বলিয়াছেন যে পুস্তকখানির অনুবাদ ১২২০/১৮০৫ অব্দের মধ্যেই শেষ হইয়াছিল এবং উহা ভারতের তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল। ইহার একখানি মূলগ্রন্থ ও তাহার উর্দ্দু অনুবাদ ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

www.pathagar.com

৪. তারিখ-ই-শাহ্ শুজাই

পুস্তকখানিতে সম্রাট শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র হতভাগ্য যুবরাজ মোহাম্মদ শুজার কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থখানি ১০৭০/১৬৫৯ অব্দে মোহাম্মদ মাসুম-বিন-সোয়ালেহ্ কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। গ্রন্থকার শাহ্ শুজার অধীনে ২৫ বৎসর কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বের সমস্ত ঘটনাবলী স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তিনি শুজার জীবন কার্য্য ও শেষ জীবনের নিদারুণ কাহিনী সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের এক খণ্ড বাঁকীপুর লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে।

৫. তারিখ-ই-বাঙ্গালা মহাবত জঙ্গী

বঙ্গের নাজিম নবাব আলিবর্দ্দি খান মহাবত জঙ্গ এবং তাঁহার পরবর্ত্তী নবাব সুজাউদ্দৌলার জীবন ও রাজত্বকালের ইতিহাস। পুস্তকখানি ইউসুফ আলী খান (গোলাম আলী খানের পুত্র) কর্তৃক লিখিত। ইউসুফ আলী খান আলিবর্দ্দি খানের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং নবাব সরফরাজ খানের কন্যাকে বিবাহ করেন। পুস্তকখানি ১১৭৭/১৭৬৩ অব্দে শেষ হইয়াছিল এবং উহা বর্ত্তমানে বৃটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

৬. মজাফ্‌ফর নামা

পুস্তকখানি বঙ্গের নাজিমগণের এক বিরাট ইতিহাস। ইহাতে নবাব আলিবর্দ্দি খানের অভ্যুদয় হইতে নবাব মুজফ্‌ফর বঙ্গের কারাবাস কাল পর্য্যন্ত (১৭৬৬) লিপিবদ্ধ আছে। এই পুস্তকখানি মুর্শিদাবাদের করম আলী খান কর্তৃক প্রণীত (১১৮২/১৭৬৮) হইয়াছিল। তিনি নবাব মুজফ্‌ফর জঙ্গের অধীনে কর্ম্মচারী ছিলেন এবং স্বয়ং নাজিম বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানির কয়েক খণ্ড নকল বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে আছে।

৭. ওয়ার্‌দাত-ই-কাসেমী

১১৭৪/১৭৬০ অব্দে মীর মোহাম্মদ কাসিমের সিংহাসনারোহন কাল হইতে ১১৯৮/১৭৮৩ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। বিহারের নায়েব রাজা কল্যাণ সিংহ কর্তৃক এই পুস্তক ১৭৮৩ অব্দে লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে সেই (রাজা) বিপ্লব যুগের ঘটনাবলী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। বৃটিশ মিউজিয়ামে ইহার দুই খণ্ড নকল আছে।

৮. তারিখ-ই-বাঙ্গালা

১১০৭/১৬৯৫ অব্দে সুবা সিংহের বিদ্রোহকাল হইতে নাজিম আলীবর্দ্দি খানের মৃত্যু-কাল পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের নাজিমগণের ইতিহাস এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। ইহা বঙ্গের তদানীন্তন গভর্নর স্যার হেনরি ভ্যান্সিটার্ট (১৭৬০-১৭৬৪)-এর আদেশে মুন্সি সলিমুল্লা কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। ১৮৮৮ আব্দ মিঃ গ্ল্যাডউইন কর্তৃক ইহা ইংরাজি ভাষায়

www.pathagar.com

অনূদিত হয়। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে ইহার এক খণ্ড নকল আছে। অপর দুই খণ্ড নকলের এক খণ্ড বৃটিশ মিউজিয়ামে এবং আর এক খণ্ড এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরীতে আছে।

৯. ফতিহা-ই-এবারিয়াহ্

এই পুস্তকখানিতে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা খান খানান মীর জুমলার (১০৭২-১০৭৩) আসাম ও কুচবিহার আক্রমণের বিবরণ অতি বিস্তৃত ও সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। পুস্তকখানি শিহাব উদ্দিন তালিশ কর্তৃক প্রণীত। প্রণেতা ঐ দেশ এবং উহার অধিবাসীবর্গের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই অভিযান কালে তিনি পূর্ব্বাপর মীর জুমলার সাহচর্য্যে ছিলেন এবং কার্য্য করিয়াছিলেন। ১৮০৫ অব্দে মীর বাহাদুর আলী হোসেনী তারিখ-ই-আসাম নাম দিয়া ইহার এক খণ্ড উর্দ্দু অনুবাদ বাহির করেন ও উহা কলিকাতায় প্রকাশ করেন; ১৮৪৫ অব্দে উহা T. Paavie কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত হয়। এই পুস্তকখানি এ পর্য্যন্ত মৌলিকভাবে প্রকাশিত হয় নাই। ইহা আলমগীর নামার সহিত যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে এবং ইহার উক্ত অনুবাদ মৌলভী জাকাউল্লাহ কর্তৃক তারিখ-ই-হিন্দুস্থান গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ড: ব্লকম্যান এই পুস্তকের এক খণ্ড সংক্ষিপ্ত ইংরাজী অনুবাদ এশিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রিকায় প্রকাশ করেন এবং বর্ত্তমানে ইহার সম্পূর্ণ ইংরাজী অনুবাদ বাহির হইয়াছে।

১০. মোবারক নামা

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ১০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহাতে বঙ্গের নাজিম মোবারক উদ্দৌলার শাসনকালের বিবরণ ও তৎসংলগ্ন অন্যান্য ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ আছে। এই পুস্তক হইতে মুর্শিদাবাদের শেষ দরবার সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারা যায়। ইহার একখানি মনোরম সংস্করণ আমার নিকট আছে। ইহার অপর কোন খণ্ড অন্য কোথাও বর্ত্তমান আছে কি না তাহা আমার জানা নাই।

১১. দস্তুরুল আমল

উহাতে বঙ্গদেশের এবং ভারতের অন্যান্য পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের জনসংখ্যা, সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। এই পুস্তক ১১৮৯/১৭৭৫ অব্দে সমাপ্ত হয়। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে ইহার এক খণ্ড বর্ত্তমান আছে।

১২. খোরশিদ জাহাঁ নুমা

এই পুস্তকখানিকে একখানি বৃহৎ ভূবৃত্তান্ত বলা যাইতে পারে—ইহা ঐতিহাসিক বিবরণের আগারও বটে। পরবর্ত্তীকালের বঙ্গদেশের বিবরণ ইহাতে বিশেষভাবে লিপিবদ্ধ আছে। পৃথিবীর জন্মকাল হইতে ১২৮০/১৮৬৩ অব্দ পর্য্যন্ত ঘটনাবলী ইহাতে লিখিত আছে। আংরেজাবাদ-এর (নদীয়া) মৌলভী সৈয়দ এলাহি বক্শ্ হুসেনী কর্তৃক এই

পুস্তক প্রণীত হয়। ইহাতে প্রাচীন গৌড় ও পাণ্ডুয়া সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। গ্রন্থকারের আত্মচরিত সম্বলিত যে পুস্তকখণ্ড বর্ত্তমানে কলিকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে, বোধ হয় উহাই এই পুস্তকের একমাত্র কপি। মূল পুস্তকখানি হইতে কতক কতক অংশ উদ্ধৃত করিয়া এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরীর ২০৯ নং পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে।

১৩. তারিখ-ই-মুজাফ্‌ফরী

ইহা ভারতের তৈমুর বংশীয় সুলতানদিগের ইতিহাস। তাঁহাদের রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে ১২০৯/১৯৮৭ অব্দ পর্য্যন্ত সমস্ত বিবরণ এই পুস্তকে লিখিত আছে। এই পুস্তকের প্রণয়ন মোহাম্মদ আলী খান আসারী কর্ত্তৃক ১৮৮৭ অব্দে সমাপ্ত হয়। তিনি বঙ্গের নাজিম মুজফ্‌ফর জঙ্গের অধীনে বিহার প্রদেশে সম্মানিত পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই পুস্তকে প্রধানতঃ গ্রন্থকারের সমসাময়িক বঙ্গদেশের বহু বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে। বাঁকীপুর লাইব্রেরীতে ইহার এক খণ্ড বর্ত্তমান আছে।

১৪. মুলাখ্‌খস্‌-উত্‌-তারিখ

এই পুস্তকখানি সিরাজুল মুতাখ্‌খারীন নামক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার ; মুঙ্গেরের ফর্‌জন্দ-ই-আলী আল্‌ হুসেনী কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বাঁকীপুর লাইব্রেরীতে ইহা রক্ষিত আছে।

১৫. তারিখ-ই-দালানে মকদ্দস্‌ হোসেনী

এই পুস্তকখানি ঢাকার বিখ্যত ইমামবাড়ার ঐতিহাসিক বিবরণী। এই প্রাসাদ শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুস্তকখানি ঢাকার মির্জ্জা মোহাম্মদ শিরাজি কর্ত্তৃক লিখিত। তাঁহার 'তখল্লুস' মাখ্‌মুর। পুস্তকখানি বোধ হয় ১৩১৬/১৮৯৮ অব্দে রচিত হইয়াছিল। ইহার ঘটনাসমূহ প্রধানতঃ প্রাচীন দলিলাদি এবং জনশ্রুতি হইতে গৃহীত। আমার নিকট গ্রন্থকারের লিখিত এক খণ্ড বর্ত্তমান আছে ; বোধ হয় ইহা ছাড়া আর কোথাও এই পুস্তক বর্ত্তমান নাই।

১৬। শিগরিফ নামা-ই-বিলায়েত

এই পুস্তকে মুন্সি ইতিশাম উদ্দিনের ইউরোপ যাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তিনি ১১৮০ বঙ্গাব্দে ইউরোপ যাত্রা করেন। ভারতের শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম ইউরোপ যাত্রা করেন। এই পুস্তক ১১৯৫ বঙ্গাব্দে রচিত হয়। ইহার ভূমিকায় সেই সময়ে বঙ্গদেশে কি কি ঘটনা ঘটিয়েছিল তাহার বিবরণ আছে। এই পুস্তকের এক খণ্ড হায়দরাবাদ রাজ্যের রাজকীয় পুস্তকালয়ে রক্ষিত আছে। অপর এক খণ্ড আমার নিকট সংগৃহীত আছে। ১২৫০ বঙ্গাব্দে আমার পুস্তকখানি নকল করা হইয়াছিল। মুন্সী ইতিশাম উদ্দীন ফতিহা-ই-এবারিয়াহ্‌ নামক গ্রন্থের বিখ্যাত লেখকের পৌত্র।

www.pathagar.com

১৭. মজমুয়াতুল-ইন্‌শা

এই পুস্তকখানি চট্টগ্রামের ফৌজদার রহমত খান (মৃত্যু ১১৩৫/১৭২২) এবং জাহাঙ্গীর নগরের মহম্মদ সাদিকের (মুজফ্‌ফর হোসেন মুন্সীর পুত্র) লিখিত পত্রাদির সংগ্রহ। মোহাম্মদ সাদিক ফৌজদার রহমত খানের কর্ম্মচারী ছিলেন। এই পত্রগুলি হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মোগল ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানিতে পারা যায়। এই সংগৃহীত পত্রাবলীর একখণ্ড আমার নিকট আছে; কিন্তু অপর কোথাও আছে কি না জানি না।

১৮. মজমুয়ে মকাতিব

এই পুস্তকখানি রাজ্য-শাসন সম্পর্কিত পত্রাবলীর সংগ্রহ। ইহাতে প্রধানতঃ ১১৬২/১৭৪৮ অব্দ হইতে ১১৮৭/১৭৭৩ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের ব্যাপার লিপিবদ্ধ আছে। ইহা ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত আছে। নং ৪৮১।

১৯. মুফিদুল্ ইন্‌শা

এই পুস্তকখানিও কতকগুলি সংগৃহীত পত্রের সমষ্টি। মুন্সি লেখরাজ ওরফে মুন্সী আলীকুলী খান কর্তৃক ১১২৭/১৭১৫ অব্দে উহা সংকলিত হইয়াছিল। আলকুলী রংপুরের ফৌজদার ও পরে কুচবিহারের রাজসরকারের রেসিডেন্ট নবাব ইকরামউল্লা খাঁর অধীনে কর্ম্ম করিতেন। গ্রন্থকার তাঁহার পুত্র জান্নাৎ রায়ের জন্য এই লিপিসমূহ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সংগ্রহে মীর মুন্সি ও কুমার আজিম উশ্ শানের দেওয়ান-ই-বুয়ুতাত মহসিন খানের কতকগুলি পত্র আছে। গ্রন্থকারের সমসাময়িক বঙ্গের এই অংশের মূল্যবান তথ্যসমূহ ইহা হইতে পাওয়া যায়।

এই লিষ্টে বাংলার বহুমূল্য ইতিহাস 'বাহারিস্তানে গায়বী'র উল্লেখ করা হয় নাই। প্যারিস লাইব্রেরী হইতে ইহার এক ফটোগ্রাফ কপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনা হইয়াছে। ইহার লেখক মির্জ্জা নাথন তাঁহার বর্ণিত প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধে নিজে যোগ দিয়াছিলেন। খুবই আনন্দের কথা প্রফেসার ফিদা আলি খান ও শদানীন ইহার ইংরাজি অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছেন।

www.pathagar.com

পঞ্চম বার্ষিক বিবরণী

আবুল ফজল বি. এ., বি.টি.

মুসলিম সাহিত্য সমাজ তার পঞ্চম বৎসরের জীবন শেষ করে ষষ্ঠ বৎসরে পা দিল। আশা করা যায় এই সংবাদ সাহিত্যামোদী ও জ্ঞানচর্চ্চাকামী শিক্ষিতদের মনে আনন্দের কারণ হবে। ছয় বৎসর পূর্ব্বে যাঁদের উৎসাহে ও চেষ্টায় এই সমাজের সূচনা, কর্ম্মক্ষেত্র-পরিবর্ত্তনের অনিবার্য্য কারণে তাঁদের সকলে আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই। আজ আমাদের এই বার্ষিক মিলোনোৎসবের দিনে আমরা তাঁদেরে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

এই বৎসর আমাদের যতগুলি সভা করা উচিত ছিল ততগুলি সভা আমরা করতে পারিনি। তার প্রধান করাণ আমাদের সভা গৃহের অভাব। যাঁরা সময় সময় সাহিত্য সমাজকে তাঁদের সভা গৃহ ধার দিয়েছেন তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে ঢাকা ও জগন্নাথ হলের কর্তৃপক্ষগণের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরের জন্য রেজিস্ট্রার মহোদয়ের কাছে আমরা ঋণী। এইবারকার বার্ষিক অধিবেশন মুসলিম হলে করবার জন্য মুসলিম মহল কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিয়েছেন। তাঁদের এই অনুগ্রহের জন্য আমরা তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমাদের বিভিন্ন সভায় যে সব আনন্দ-সাধক গায়ক বন্ধু, বিশেষ করে ঢাকার সুগায়ক মোহাম্মদ হোসেন সাহেব, গান করে যে আনন্দ পরিবেশন করেছেন শুধু নিখরচা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার প্রতিদান হতে পারে না।

এই বছর আমরা সবশুদ্ধ পাঁচটি সভা করতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের প্রথম সভা হয় গত ৩১শে আগস্ট লিটন হলে—সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়। সেই সভায় সর্ব্ব প্রথম দুইটি প্রস্তাব পাশ করা হয়। প্রথম প্রস্তাবে প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ ও শিক্ষামন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে—বাংলা পুলিসের ইনেস্‌পেক্টর জেনারেল মি: লোম্যানের হত্যার জন্য নিন্দা ও দুঃখ প্রকাশ করা হয়।

তারপর অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব 'মানুষ মোহাম্মদ' নামক তাঁর প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে হজরতের জীবনের এমন এক দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেন যা সাধারণতঃ আমাদের নজরে পড়ে না। ব্যক্তিগত জীবনে হজরত মোহাম্মদ কতখানি সুরসিক ছিলেন, কথায় আলাপে তিনি কতখানি হাসি ঠাট্টা করতেন, কাজী সাহেব সেদিন তার এক সুন্দর চিত্র সভার সম্মুখে পেশ করেছিলেন। হজরত মোহাম্মদ দুঃখে শোকে আমাদের মত কাঁদতেন, সুখে বন্ধু-সংসর্গে আমাদের মত হাসি ঠাট্টা রসিকতা করতেন, এই সংবাদ তাঁর অনুবর্ত্তিগণের পক্ষে এক কল্যাণের বাণী—এক সুসমাচার নিশ্চয়ই।

www.pathagar.com

কাজী সাহেবের প্রবন্ধের পর মৌলভী মোক্তার আহমদ সিদ্দিকী সাহেব 'হজরত মোহাম্মদ' সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর প্রবন্ধ ভক্তচিত্তের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় পরিপূর্ণ ছিল।

তারপর কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব হজরত মোহাম্মদ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন– –হজরত মোহাম্মদ শেষ পয়গম্বর কিনা, কোরান ফেরেশ্‌তার মারফৎ অহিরূপে নাজেল হয়েছিল কিনা আজিকার দিনে এই সব আমাদের বড় সমস্যা নয়। আমাদের সমস্যা হচ্ছে, এই যুগে এই আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে দাঁড়িয়ে হজরত মোহাম্মদের জীবন ও কোরান থেকে আমরা আমাদের জীবনে কতখানি পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি। নানা দুঃখ দ্বন্দ্ব-পূর্ণ মানবজীবন কল্যাণের অভিসারী করবার চেষ্টা কোরানে আছে। হজরত মোহাম্মদের বিরাট ব্যক্তিত্ব যেন আমাদের চোখ ঝল্‌সে না দেয়। হজরত মোহাম্মদের জীবনের কোন ঘটনা যদি আমরা আমাদের জীবনে না নিতে পারি তবে তা পরিহার করতে যেন আমাদের এতটুকু দ্বিধা না হয়।

মৌলভী আবুল হোসেন সাহেব বলেন—হজরতের জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারকে Justify করে মুসলমানদের আর কোন লাভ নেই, তাঁকে বিচার করতে হবে একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি হিসাবে। ইতিহাসের এক অতীত যুগে, ভিন্ন আবেষ্টনে, তিনি জন্মেছিলেন—সেখানে বসে তিনি যে জীবন যাপন করেছেন, যে শিক্ষা দিয়েছেন, তার থেকে এই যুগে এই দেশে বসে আমরা যতটুকু আলো পাই আমাদের জীবন চলার পথে আমরা তাই শুধু নেব। তা না করে আমরা যদি তাঁকে শুধু পদে পদে justify করতে চাই তা'হলে তাঁকেও বোঝা হবে না, আমরা নিজেরাও শুধু বিড়ম্বিত হব। কোন একটা আদর্শের প্রতিমাকে আঁকড়ে ধরে থাকা ইসলামের শিক্ষা নয়। মুসলমানের জীবনে প্রতিমাভঙ্গের যে শিক্ষা সে শুধু মাটির প্রতিমা-ভঙ্গের শিক্ষা নয়, আদর্শের প্রতিমা-ভঙ্গেরও বটে।

সর্ব্বশেষে সভাপতি মহাশয় বলেন—কোন্ এক সুদূর অতীতে, সুদূর এক বালুকাময় দেশে, কোন্ অখ্যাত পিতামাতার ঘরে এক শিশু জন্মেছিল, আজ চৌদ্দ শত বৎসর পরে এই বাংলাদেশের এক প্রান্তে বসে আমরা তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করছি—এইত তাঁর জীবনের পক্ষে মহা অলৌকিক ব্যাপার, তাঁর মহাপুরুষত্ব। হজরত মোহাম্মদের কথা আমি অনেক সময়ে ভেবেছি। মনে হয়েছে, যিনি গাণ্ডিবধারী। তিনি যদি মানুষের প্রয়োজনে সেই গাণ্ডিব বাঁকে পরিণত করে জল সরবরাহের কাজে লাগ্‌তে পারেন তবে তাঁরই মহিমা তুলির্ত হতে পারে হজরতের মহিমার সঙ্গে।

আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে ১৬ই নভেম্বর। সভাপতি ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব। সে দিন মৌলভী কামাল উদ্দিন 'অর্থনৈতিক কলহ' শীর্ষক একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি তাঁর প্রবন্ধে বল্‌তে প্রয়াস পেয়েছেন—আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূল কারণ পরস্পরের অর্থনৈতিক অনৈক্য—ধর্ম্ম বা সামাজিক বিভিন্নতা এর কারণ নয়, এবং হিন্দু কিছু উদার এবং মুসলমান কিছু উন্নত হলেই হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্ভব হয়ে উঠবে— এই মহৎ আশা দিয়ে তিনি তাঁর প্রবন্ধের উপসংহার করেছেন।

প্রবন্ধের আলোচনা প্রসঙ্গে মৌলভী আবদুস সালাম সাহেব বলেন—অর্থনৈতিক অনৈক্যের চাইতেও রাজনৈতিক অনৈক্যই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বড় কারণ।

www.pathagar.com

মৌলভী আলী নূর বলেন—আমাদের উভয় সমাজের আদর্শের বিভিন্নতাই এই বিরোধের কারণ। এই বিরোধে ব্রাহ্ম সমাজ হিন্দু সমাজেরই পক্ষ সমর্থন করেন। তার কারণ তাঁরা সে সমাজ থেকেই উদ্ভূত এবং তাঁদের মধ্যে আদর্শের কোন পার্থক্য নেই।

মৌলভী মোসলেম উদ্দিন খাঁ বলেন—অসহযোগের দিনে হিন্দু-মুসলমান মিলনের যে অভিনয় চলেছিল তার গোড়ায়েই গলদ ছিল। সে দিন Pan-Islam-এর স্বপ্নমুগ্ধ মুসলমান মেতে উঠেছিল বেশী করে খেলাফতের নামে। হিন্দু-মুসলমানের সামনে যখন বড় কোন কর্ম্মের আদর্শ থাকে না তখনই তারা মারামারি করে—তাদের সামনে বড় একটা কাজের আদর্শ ধরতে পারলে তারা এই ঝগড়া ভুলে যাবে।

মৌলভী আমিন উদ্দীন বলেন—দেশ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের এই বিরোধ থাকবেই।

মৌলভী বিলায়েৎ আলী খান বলেন—ধর্ম্মের গোঁড়ামীই এই সব বিরোধের মূল কারণ।

মৌলভী নাজির উদ্দীন বলেন—অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য দূর হলেও এই হিন্দু-মুসলমান বিরোধের নিবৃত্তি হবে না। হিন্দু কিছু উদার, মুসলমান কিছু উন্নত হলেও নয়, কারণ উভয় সমাজের philosophic conviction-এর বিভিন্নতাই এই বিরোধের কারণ। শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানও শোচনীয়রূপে সাম্প্রদায়িক। কাজেই শিক্ষা পেলেও এই বিরোধের অবসান হবে মনে হয় না। অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুই যখন ভারতের শাসনভার গ্রহণ করবে তখন মুসলমান আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। কাজেই তিনি মনে করেন হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ভবিষ্যতে আরও বেড়ে যাবে।

মৌলভী আবদুর রশীদ বি. টি. হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করে দেখান কিভাবে ছোটকাল থেকে হিন্দু-মুসলমান ছেলে-মেয়েদের মনে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, হিন্দু-মুসলমান পরস্পর এমনি সম্বন্ধ-বদ্ধ যে এখানে economic boycott সম্ভব নয়। তথাপি এই boycott চালিয়ে উভয় সমাজে প্রচলিত বিক্ষোভকে আরও ঘনীভূত করে তোলা হয়েছে।

সর্ব্বশেষে সভাপতি সাহেব বলেন—আজকের বক্তৃতা শুনে মনে হচ্ছে—আমরা সবাই এই বিষয় ভাবছি। অর্থনৈতিক অসমতা হয়ত হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূল কারণ নয় যদিও বেশ বড় কারণ। অর্থের চাইতে চিন্তাই বেশী করে মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হবার কোন কারণ নেই—হয়ত ভবিষ্যৎ বংশধরেরা (উভয় সমাজেই) বড় চিন্তা নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নামবেন।

সাহিত্য সমাজের তৃতীয় অধিবেশন বসে ১৪ই ডিসেম্বর—সভাপতি ছিলেন খান সাহেব আবদুর রহমান খান। মৌলভী আবদুস সালাম 'সেভিং ব্যাংকের সুদ' ও মৌলভী এ. জেড. নূর আহমদ 'মুসলিম জগতে লাইব্রেরী' সম্বন্ধে যথাক্রমে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। মৌলভী আবদুস সালাম সাহেব তাঁর প্রবন্ধে মুসলমান সমাজ সেভিং ব্যাংকের সুদ না নিয়ে নিজেদেরই যে ক্ষতি করছেন তার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন—বাংলাদেশে মুসলমানের বহু ওয়াকফ সম্পত্তি গভর্নমেন্টের তত্ত্বাবধানে আছে। সেই সব সম্পত্তির গচ্ছিত টাকার সুদের দাবীদার না পাওয়ায় গভর্নমেন্ট সেই সব টাকা খৃষ্টান মিশনারীদের হাতে

www.pathagar.com

দিয়ে দেন—সেই টাকা দিয়ে খৃষ্টান মিশনারীরা ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। তিনি বলেন, এই টাকা নিয়ে আমাদের শিক্ষা কার্য্যে ব্যয় করা উচিত। মৌলভী এ. জেড্, নূর আহ্মদ তাঁর প্রবন্ধে অতীতের মুসলমানের জ্ঞান-চর্চ্চা লাইব্রেরীর মধ্য দিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে জ্ঞান পরিবেশনের ইতিহাস বর্ণনা করেন। সেদিন তাঁর প্রবন্ধ থেকে জানা গেল প্রাচীন মুসলমানেরা এই সংগ্রহের জন্য কত অর্থ ব্যয় করতেন—কিভাবে বইয়ের কদর করতেন।

প্রবন্ধ দু'টির আলোচনা করতে গিয়ে কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব বলেন—প্রাচীন আরবেরা নিজেদের জীবন সুন্দর করবার চেষ্টা করেছিল—লাইব্রেরী তারই এক পরিচয়। সেভিং ব্যাংকের সুদ গ্রহণ সম্বন্ধে তিনি বলেন, সমাজে এর প্রচলনের ভার তরুণদের গ্রহণ করা উচিত। সুদকে পাপ জেনে গ্রহণ করায় কোন কল্যাণ নেই। মুসলমাননেরা সুদ দিচ্ছে, না দিয়ে উপায় নেই বলে। আধুনিক জীবনের সমস্যা দিয়ে ইসলামকে ভাবতে হবে—দরকার হলে কোরান হাদিসের নতুন ব্যাখ্যা দিতে হবে। আমাদের মৌলভী-সমাজ কোরান হাদিসকে নতুনভাবে বুঝতে চাচ্ছেন না, বা পারছেন না। জ্ঞানী মুসলমানরাও ধর্ম্ম ব্যাপারে বিচার চর্চ্চা করেন না। সমস্ত কল্যাণের পথই আমাদের (ইসলামের) পথ এই যদি আমরা স্বীকার করে নেই তা হলেই আমরা এই জড়তা থেকে রক্ষা পাব। ধর্ম্ম অর্থ good life সুন্দর জীবন—এই যদি আমরা বুঝি, তা হলে অনেক কিছু সোজা হয়ে যায়। সুদ সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি বলছে তা না দেখে তা বিবেক-সম্মত কি না, জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্মত কি না দেখতে হবে।

মৌলভী হাবীবুল্লাহ্ বলেন—ওয়াক্ফ্ সম্পত্তিগুলির সুদের টাকা যদি আমরা নেহাৎ ব্যবহার না করি, তবু তা খৃষ্টান মিশনারীদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমাদের নিজে জমিয়ে রাখা ভাল। ইসলামের শরিয়তী আইন প্রণয়নের সময় Saving Bankও ছিল না, Life Insurance-এরও সৃষ্টি হয়নি, কাজেই ঐ আইনের হুকুম দিয়ে এইগুলিকে নাযায়েজ বলা অনুচিত। সুদ আদান-প্রদান যেখানে নিছক অত্যাচারে পরিণত হয়েছে সেখানে সুদ হারাম হতে পারে। কিন্তু Saving Bank-র সুদ কেন হারাম হবে? আশ্চর্য্যের বিষয় মহসিন ফান্ডের সুদ দিয়ে যে সব মৌলভী মৌলানা তৈয়ার হচ্ছেন তাঁরাই আবার সুদ হারাম বলে ফতোয়া দিয়ে বসেন।

অধ্যাপক আবদুর রব চৌধুরী বলেন—'রেবা'টাই হারাম অন্য সুদ হারাম নয়। ব্যাংকের সুদ কখনো রেবা নয়। সুদটা অর্থনৈতিক ব্যাপার, তাকে বিচার করতে হবে অর্থনীতির দিক থেকে। তবে দেখতে হবে সুদ আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে দেশের জায়গা-জমিগুলির উপর যেন সুদখোরের monopoly না হয়ে পড়ে—তা হলে ভবিষ্যতে দেশে বিপ্লব হবার সম্ভাবনা হয়ে পড়বে। ফরাসী ও রাশিয়ার বিপ্লবের কারণ ছিল এই land monopoly.

মৌলভী নূরুজ্জামান খান বলেন—এখন সুদ হালাল বলে প্রচার করলে মুসলমানরা আরও বেশী করে সুদে কর্জ্জ করা আরম্ভ করে দেবে।

মৌলভী নাজির উদ্দিন বলেন—আমরা সুদ খাব কি খাব না তা ঠিক করতে হবে কারো মত দিয়ে নয়—নিজের জ্ঞান ও বিবেক দিয়েই ঠিক করে নিতে হবে। তিনি মুসলিম এতিম খানার

www.pathagar.com

গচ্ছিত টাকার সুদের টাকাগুলি যে অনর্থক সরকারী তহবিলে যাচ্ছে তার প্রতিও ইঙ্গিত করেন।

মৌলভী মোস্‌লেম উদ্দিন খান বলেন—মহাজনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় ব্যাংক। এই প্রসঙ্গে তিনি সাহিত্য সমাজে ধর্ম্মালোচনা হয় বলে যাঁরা সমাজের প্রতি বিমুখ হয়ে আছেন তাঁদেরে লক্ষ্য করে বলেন, মুসলমান সমাজের বহু ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রসঙ্গে মুসলমান সাহিত্যিকদের দুঃখ আছে বলেই বারবার তাঁরা এই সব ব্যাপার আলোচনা করেন। মানুষের দুঃখ ব্যথা সাহিত্যিকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। সর্ব্বশেষে সভাপতি সাহেব বলেন—মুসলমানের যেখানে 'দীন' সেখানে 'দুনিয়া', কাজেই সাহিত্য সমাজে ধর্ম্ম ব্যাপারের আলোচনায় কোন আপত্তি উঠতে পারে না। তিনি লাইব্রেরী প্রবন্ধটির প্রশংসা করে সুদ সম্বন্ধে বলেন—Saving Bank-এর সুদকে যদি ব্যবসা মনে করেন তা হলে কোন আপত্তি করা চলে না। তা না হলে নিজেকে মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে কি করে কোরান হাদীসের খেলাপ কাজ করা যায়? আর, সব লোক বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে চলতে পারে না, অনেক সময়ে পূর্ব্ববর্ত্তীদের অনুসরণ করে চলতে হয়।

গত ১৮ই ডিসেম্বর জগন্নাথ হল-গৃহে সাহিত্য সমাজের ৪র্থ অধিবেশনে এক 'মুশায়েরা'র আয়োজন হয়েছিল। এই আয়োজনকে সার্থক করেছিলেন ঢাকার সাহিত্যিক ও সঙ্গীত-শিল্পীবৃন্দ। শ্রীযুক্ত চারু বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 'মীর মুশায়েরা'র আসন গ্রহণ করেছিলেন। 'মীর মুশায়েরা'র স্বাগত অভিভাষণের পর ঢাকার প্রসিদ্ধ গায়ক মোহাম্মদ হোসেন সাহেব মুশায়েরার উদ্বোধন করেন। কবি মোহিতলাল মজুমদার ও কবি পরিমল কুমার ঘোষ নিজেরা উপস্থিত হতে পারেন নি—কিন্তু তাঁরা তাঁদের কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মুশায়েরা-মজলিশে কাজী আবদুল ওদুদ, শ্রীশচন্দ্র দাস, আমীন উদ্দিন, শামসুল হুদা, মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ প্রভৃতি নিজ নিজ কবিতা, কাজী মোতাহার হোসেন একটি রস-রচনা ও মোসলেম উদ্দিন খান একটি নাটিকা পাঠ করেন। সঙ্গীতের দ্বারা সভার আনন্দ বর্দ্ধন করেছিলেন মোহাম্মদ হোসেন, অধ্যাপক বীরেন্দ্র চন্দ্র গাঙ্গুলী, যোগেশ চক্রবর্ত্তী, রফিক উদ্দিন আহমদ প্রভৃতি। তদুপরি বালক 'জওহরে'র আবৃত্তি ও গান সকলকে মুগ্ধ করেছিল। ধূপ ও লোবান জ্বালিয়ে, আতর ও গোলাবের সুরভিত এবং বিচিত্র পুষ্পসম্ভারে সেই দিনের 'মুশায়েরা' সার্থক করবার চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। সেই দিনের সকল আয়োজনের সমস্ত প্রশংসা সমাজের সহসম্পাদক মৌলভী শামসুল হুদা ও কাজী আবদুল ওদুদ সাহেবদ্বয়েরই প্রাপ্য। তাঁদেরে সাহিত্য সমাজের ধন্যবাদ। আরও অনেক জানা ও অজানা বন্ধু ঐ আয়োজনকে সার্থক করে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তাঁদেরে সাহিত্য সমাজের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমাদের পঞ্চম অধিবেশন বসে গত ১৮ই জানুয়ারী। সভাপতি ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন। সর্ব্ব প্রথমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—

স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম প্রেমিক বীর কর্ম্মী মৌলানা মোহাম্মদ আলীর মৃত্যুতে মুসলিম সাহিত্য সমাজের এই অধিবেশন মর্ম্মান্তিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছে।

তারপর মৌলভী আলী নূর এম. এ. কুমিল্লার মৌলভী মোতাহার হোসেন চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রবন্ধ 'আমাদের দৈন্য' পাঠ করেন। তাঁর প্রবন্ধে চৌধুরী সাহেব বাংলার মুসলমান সমাজের নানা দৈন্যের প্রতি ইঙ্গিত করেন—বিশেষ করে অর্থে, শিক্ষায় ও সাহিত্যে

www.pathagar.com

আমাদের যে দৈন্য তারই তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি বলেন—জীবনের নানা ক্ষেত্রে আমাদের এই দীনতা দূর করার জন্যে সর্ব্বপ্রথমে চাই সে সব অন্তর দিয়ে অনুভব করা। আজ সকল প্রকার দৈন্য সম্বন্ধে আমরা সজাগ নই বলে আমাদের দুর্দশার সমাপ্তি হচ্ছে না। তিনি আরও বলেন—আমাদের সমাজের লোকের অন্তরে জীবনের স্বাদ পৌঁছিয়ে দিয়ে, তা'দেরকে জগত ও জীবনের প্রতি ইংরেজের নিকট আর্জ্জি পেশ অথবা হিন্দুর প্রতি ঈর্ষাপোষণের মধ্যে নেই। আছে সমাজের জন্য মুসলমানেরই সত্যিকার পরিশ্রমের মধ্যে।

মৌলভী কামালউদ্দিন, কাজী আবদুল ওদুদ, মৌলভী নাজিরউদ্দিন প্রভৃতি, এবং স্বয়ং সভাপতি সাহেব প্রবন্ধটির খুব উচ্চ প্রশংসা করেন। তারপর মৌলভী মোসলেমউদ্দিন খান সাহেব একটি একাংক্ক নাটিকা পাঠ করার পর সেদিনের মত সভা শেষ হয়।

www.pathagar.com

নাস্তিকের ধর্ম্ম

অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন এম. এ.

ধর্ম্ম মানুষের বিপদে আশ্রয়, শোকে সান্ত্বনা এবং সম্পদেও আত্মবিকাশের প্রধান উপায়। মানুষ দুর্ব্বল বলে স্বভাবতঃই বিপদকালে অসীম ক্ষমতাশালী কারো কাছ থেকে সাহায্যের প্রত্যাশা করে। দারুণ শোকে নিজেকে এই বলে প্রবোধ দেয় যে, হয়ত এর ভিতরে এমন কোন গূঢ় মঙ্গল উদ্দেশ্য আছে যা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিশক্তির অতীত। সম্পদের সময় তার মন অন্যের দুঃখে বিগলিত হয়, এবং সেই সহানুভূতির সূত্রে হৃদয়ের সহিত হৃদয় যুক্ত হয়ে মানুষের আত্মিক বিকাশ হয়। সুতরাং ধর্ম্মভাব ব্যক্তির পক্ষে যেমন স্বাভাবিক সমাজের পক্ষে তেমনি প্রয়োজনীয়।

নানা অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে ধর্ম্ম ভাবের মনোহারিত্ব ফুটে ওঠে। মনে যে সব ধর্ম্মভাব স্বভাবতঃই উদিত হয়, অনুষ্ঠানই তার কায়াস্বরূপ। প্রত্যেকের মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা ভাব অন্যের থেকে কিছু না কিছু স্বতন্ত্র। এ জন্য ঠিক যে অনুষ্ঠানটি এক জনের ধর্ম্মভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ হতে পারে, অন্যের পক্ষে সেটা আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রাণহীন অনুকরণ মাত্র। তবু এক এক জন বিরাট মানুষের আদর্শকে সামনে রেখে লোকে সর্ব্বদা চেষ্টা করে যাতে তাদের স্বাভাবিক প্রবণতাগুলি ক্রমান্বয়ে উক্ত আদর্শের খাতে প্রবাহিত হয়। এর সুবিধা এই যে, একটা ভাল আদর্শ চোখের সামনে পাওয়া যায়। কিন্তু অসুবিধা এই যে, যা নিজের পক্ষে স্বাভাবিক নয় তাকে স্বাভাবিক বলে বিশ্বাস করবার বা প্রচার করবার প্রবৃত্তি জন্মে। এর ফলে নিজের পক্ষে যা স্বাভাবিক তাকে অবহেলা করতে করতে আত্মশক্তি ও আত্মচরিত্রে অবিশ্বাস জন্মে। সঙ্গে সঙ্গে আত্ম নিগ্রহের আদর্শ প্রবল হয়ে জীবন সরসতার স্থলে কৃত্রিমতায় পূর্ণ হয়। যাদের আত্ম প্রত্যয় বিরাট পুরুষের আদর্শের চাপে একেবারে নিষ্পেষিত হয়ে যায় নি, সংসারে তারাই জীবন্ত ও শক্তিমান লোক। কিন্তু লোকে তাঁদের ক্ষমা করে না। যত বড় বড় মহাপুরুষ, ধর্ম্ম প্রচারক, নূতন বাণী প্রচার করে গিয়েছেন, তাঁরা সকলেই তৎকালীন জনসাধারণের কাছে অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হয়েছেন। জনসাধারণ সমস্ত নূতন 'আইডিয়া' বা ভাবকেই অত্যন্ত ভয় ও সন্দেহের চোখে দেখে। এটা এক দিক দিয়ে মন্দ নয়। লোকের এই দ্বিধা ও সন্দেহ-জনিত অত্যাচারে নূতন ভাব বা সত্যের অগ্নি পরীক্ষা হয়ে যায়। তাতে নূতন সত্যের দ্যুতি যেমন শতগুণ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, নূতন মিথ্যারও তেমনি স্বাভাবিক মৃত্যু হয়। নূতন-পুরাতনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সমাজে হঠাৎ কোন আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাত না হয়ে, অধিকাংশ সময় সহনযোগ্য দ্রুততা বা মৃদুতার সহিত পরিবর্ত্তন ঘটে।

মহাপুরুষরা সকলেই নূতন নূতন সত্য প্রচার করে গেছেন, বা পুরাতন সত্যকেই নূতন দৃষ্টিতে দেখে গেছেন। যে সত্যকে কোটি কোটি লোকে কত কাল ধরে এক ভাবে বুঝে

www.pathagar.com

এসেছেন, মহাপুরুষের প্রতিভা তারই আরেকটি রূপ (হয়ত সুন্দরতর বা পরিপূর্ণতর রূপ) লোকের সামনে তুলে ধরে। লোকে প্রথম প্রথম তার প্রখরতা সহ্য করতে পারে না, কিন্তু ক্রমান্বয়ে, হয়ত কয়েক শতাব্দী পরে তার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। এইরূপে পুরুষদের প্রচণ্ড ধাক্কায় জনসাধারণ অল্পে অল্পে অগ্রসর হয়। যুগ যুগ ধরে সর্ব্ববিধ ধারণার ক্রমিক পরিবর্ত্তন হচ্ছে, ধর্ম্ম বিষয়ে ধারণাও যে এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়, তা' অধুনা প্রচলিত ধর্ম্মমতের লিস্ট দেখলেই বোঝা যায়।

বোধ হয় আদিম মানুষ সহজ সরল বিশ্বাসে তাঁর দেবতার সান্নিধ্য বেশী করে অনুভব করতেন। পাহাড়ে, জঙ্গলে, সমুদ্রে, আকাশে, বাতাসে তাঁর জাগ্রত দেবতা ছিল। দেবতা রাখাল ভক্তের সাথে গামছা পেতে বসে কত মধুর আলাপ করতেন, গুরুতর জাতীয় সমস্যার সময় পাহাড় বা আকাশ থেকে দৈববাণী করতেন, কখনও বা স্বয়ং মানবকুলে জন্ম গ্রহণ করে অসুর দলন করতেন, ভক্তকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলে সে অগ্নিকে কুসুম-শয্যায় পরিণত করতেন, এবং ভক্তের অনুরোধে অনায়াসে মৃতকে জীবন, অন্ধকে চক্ষু, তোত্‌লাকে স্পষ্ট বাক্‌শক্তি দান করতেন। বিশ্বাসের বলে পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করত, আর শত নির্য্যাতন নিষ্পেষণের পরীক্ষা অতিক্রম করেও পরিণামে ধর্ম্মের অবধারিত জয় হত। কিন্তু লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে শুরু করলো। জীবনের দুঃখ-দৈন্য, অসম্পূর্ণতা, রোগ, শোক দেখে তারা দেবতাকে ভগবান বা করুণা-নিধান পূর্ণব্রহ্ম বলে স্বীকার করতে ইতস্তত করতে লাগল। কেউ শোকে দেবতাকে অভিশাপ দিতে আরম্ভ করল, কেউ বা ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে স্ফীত হয়ে দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য আকাশে তীর ছুঁড়তে আরম্ভ করল। কেউ দেবতার অস্তিত্বেই অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করল, কেউ বা নিজেকেই খোদা বলে প্রচার করতে লাগল। কিন্তু অধিকাংশ লোকই যে পরম নির্ভরশীলতার সহিত সৃষ্টিকর্ত্তাকে মঙ্গলময় রূপেই ভাবতে চায়, এমন কি তাঁর জাজ্জ্বল্যমান নিষ্ঠুর রূপের সম্মুখীন হয়েও সংসারকে মায়াময় মনে করে নিজের অসহ্য দুঃখেও তাঁর মঙ্গল হস্ত দেখতে ভালবাসে, তাতে আর সন্দেহ নাই। দুঃখ-চিন্তাকে ভুলে থাকাই নিরুপায় দুঃখীর উৎকৃষ্ট পন্থা। তাই সান্ত্বনার জন্য নানারূপ কাল্পনিক মোহে নিজেকে আচ্ছন্ন করে রাখা ছাড়া উপায়ান্তর নাই। কিন্তু নিরীশ্বরবাদী বলে বসল, ঈশ্বর মানুষের মনের সৃষ্টি, কল্পনার কারসাজি। অনাদি, অনন্ত, অবিনশ্বর, জড়-প্রকৃতিই তার অন্তর্নিহিত গুণ বলে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে আপনাকে আপনি বিকশিত করতে করতে এই বিচিত্র বিশ্ব সৃষ্টি করেছে। এর জওয়াব কেউ দিতে পারল না। তর্ক করতে করতে এই পাওয়া গেল, আস্তিক যাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলছেন, নাস্তিক তাকেই নামান্তরে প্রকৃতি বলছে এমন কি যাঁরা বলছেন, বিশ্বের অনুপরমাণুতে ভগবান প্রবিষ্ট হয়ে আছেন, প্রত্যেক বস্তুই সাক্ষাৎ ভগবানের প্রকাশ, তাঁরাও তর্কশাস্ত্রের দুই এক পদ এদিক ওদিক করে ঐ একই কথা বলছেন। পার্থক্যের মধ্যে এই যে এঁরা ভগবানকে প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁকে চিন্ময় পরিচালক রূপে কল্পনা করছেন, আর প্রকৃতিবাদী বা নাস্তিক বলছেন, জড় প্রকৃতির ভিতরেই চিন্ময়ত্ব আছে, জড় ও চিৎ একই বস্তুর দুই অচ্ছেদ্য রূপ, জড়কে চালিত করবার জন্য জড়াতীত স্বতন্ত্র চিৎ-পদার্থের বা চিন্ময় পুরুষের কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। অবশ্য যাঁরা শোকের বশে বা মদ গর্ব্বে ঈশ্বরকে নিন্দা, অভিশাপ বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেন, তাঁদের উত্তেজিত মানসিক অবস্থা প্রায়ই সাময়িক হয় এবং তাঁদের

www.pathagar.com

সংখ্যাও নিতান্ত অল্প। সুতরাং এঁদের কথা আমাদের আলোচনার বাইরে রাখলেও কোন দোষ নাই।

সংসার হিতে-অহিতে ভালোয়-মন্দয় মিশানো। তাই কেউ কেউ শিষ্ট ঈশ্বর ও দুষ্ট ঈশ্বরের স্বতন্ত্র কল্পনা করছেন। প্রকৃতিবাদী বলেন, ঈশ্বর বা প্রকৃতি নিরপেক্ষ নিয়ম অনুসারে কাজ করে যাচ্ছে। কারো হিত বা অহিতের দিকে লক্ষ্য করা তার ধর্ম্ম নয়। মানুষ স্বভাবতঃই স্নেহ খোঁজে, সহানুভূতি খোঁজে, পাপের ক্ষমা চায়, পুণ্যের পুরস্কার চায়। আস্তিকের এইখানে মস্ত সুবিধা। কার্য্যতঃ যাই হোক, হৃদয়ের শান্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে মানুষের দুর্ব্বলতার একটা শেষ আশ্রয় স্থল না থাকলে কেমন করে চলে? তা যদি ভুলও হয় তবু তাতে শান্তি পাওয়া গেলে সেই ভুলকেই বরণ করতে আপত্তি কি? যাঁরা প্রকৃতির মধ্যে ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করেন, তাঁরা তো একেবারে আত্মহারা, তাঁরা অতি বড় দুঃখেও বলতে পারেন, তোমারই দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুঃখ, তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব। সুখেও বলে থাকেন, তুমি আপন লীলা-বিকাশে নিজের মধুরস নিজেই ভোগ করছ, হে আনন্দময়, আমার মধ্যে তোমারি প্রকাশ, তাইতে তো বিশ্বের যা' কিছু সব এমন সুমধুর! কিন্তু প্রকৃতিবাদী বলেন, দর্শন ও কাব্যের মিথ্যা প্রলেপে জীবনকে মধুর আশা বা স্বপ্নের মধ্যে ডুবিয়ে রেখো'না, বীর্য্যবান পুরুষের মত যা সত্য, তার নগ্নরূপের দিকে দৃষ্টিপাত কর। প্রকৃতি তোমার স্বপক্ষেও নয়, বিপক্ষেও নয়। যেমন কাজ করবে, বাঁধা নিয়ম অনুসারে তার ফল পাবে। পাপের ক্ষমা নাই, সঙ্গে সঙ্গে তার ফল ভোগ করতে থাকবে। পুণ্য করলেও তা বিফলে যাবে না, সঙ্গে সঙ্গে তার পুরস্কার পেতে থাকবে। ঠিক যতটুকু পাপ ততটুকু দণ্ড, যতটুকু পুণ্য ততটুকু পুরস্কার—এক চুল এদিক ওদিক হবার যো নেই! প্রকৃতি বড় কড়া বিচারক, এর কাছে দয়া মায়ার স্থান নাই। আগেই বলেছি, দুর্ব্বল মানুষ কোমলতা চায়। তাই বৈজ্ঞানিকের দর্শন যদি নির্ভুলও হয়, তবু মানুষ তার কঠোর সত্যকে প্রত্যাখান করে বরং আস্তিকের মধুময় ভুলের শান্তিক্রোড়েই আশ্রয় নিতে চায়।

যা হোক, সৃষ্টিকর্ত্তার স্বরূপতত্ত্ব আর ধর্ম্মভাব এক জিনিষ নয়। স্বরূপ তত্ত্ব কর্ম্ম-জীবনের উপর ক্রিয়াশীল কি না, ঠিক বলা শক্ত হলেও তা অতি গৌণভাবে এবং খুব সামান্য পরিমাণে। পক্ষান্তরে মনের স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের সঙ্গে ক্রিয়া-কলাপের খুব নিকট সম্বন্ধ। ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ধর্ম্মের বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠানগুলি ধর্ম্মভাবের স্বাভাবিক ব্যবহারিক প্রকাশ। তাই সচরাচর ভুল করা হয়ে থাকে যে, যাদের ভিতর অনুষ্ঠানের কিঞ্চিৎ শিথিলতা দেখা যায়, বোধ হয় তাদের ধর্ম্মভাব নাই। অনুষ্ঠানে নিষ্ঠা ধর্ম্মভাবের একটি প্রকাশ বটে, অনেক সময় সত্যই তার কাব্যময় রূপক প্রকাশ। কিন্তু এর কাব্যময়তা বুঝতে না পারলে সমুদয় রসভঙ্গ হয়—তখন এতে আত্মিক উন্নতি বা হৃদয়ের উন্নততর তৃপ্তি কিছুই হয় না। একান্ত নির্ভরশীলতা বা আজ্ঞা পালনের অস্পষ্ট দাস্য-তৃপ্তি যে একটু না হয়, তা নয়, কিন্তু সেইটুকুতে মানুষের সমস্ত অন্তরাত্মা তৃপ্ত হয় না। তাই অনুষ্ঠান পালন করবার সময় তার ভিতরকার গূঢ়ভাব বা Spirit আমাদের স্পর্শ করছে কি না, সর্ব্বদা তার আত্ম যাচাই করা প্রয়োজন। নইলে উদ্দেশ্যহীন কর্ম্ম ব্যর্থ হয়ে যায়। অনুষ্ঠানের অশেষ উপযোগিতা এবং অপরিহার্য্যতা সত্ত্বেও সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই ক্রমিক শুষ্কতার দিকেই এর স্বাভাবিক গতি। তাই বহু লোককে এর বিরোধী দেখতে পাওয়া যায়। এর অন্তর্গূঢ়ভাবকে

www.pathagar.com

পুনঃপুন জাগ্রত করে এর অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়। অনেক সময় নব জাগরণের গতিবেগে এর আঙ্গিক পরিবর্ত্তনও যে না হয় তা নয়। এইসব কারণে মুক্ত চিন্তা বা বিজ্ঞানের শিক্ষাকে অনেক সময় ধর্ম্ম-বিনাশী বলা হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এইরূপ শিক্ষাই ধর্ম্মের প্রাণ সঞ্চারী।

এখন অনুষ্ঠানের দিক থেকে সাধারণ জগদ্ব্যাপারের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় যে বিধিবদ্ধ অনুষ্ঠান আমাদের জীবনের কত সামান্য অংশ। এর বাইরে যে অসীম কর্ম্ম কোলাহল, তার মধ্যেই ধর্ম্ম ভাবের প্রকৃষ্টতর বিকাশ। ধর্ম্মভাব হৃদয়মনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত থেকে সমস্ত সাধনা ও কর্ম্মকে অনুরঞ্জিত করে। এক সময়ে লোকের ধারণা ছিল যে, মানুষের সংস্রব থেকে দূরে গিয়ে গভীর চিন্তা বা ধ্যানে আত্মনিয়োগ করাই বুঝি শ্রেষ্ঠ ধার্ম্মিকের কাজ। কিন্তু মানুষের সামাজিক বৃত্তির উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে উপেক্ষা করে স্বার্থপরের মত আত্মোন্নতির চেষ্টা করাকে এখন আর কেউ ধর্ম্ম বলে বড় বিশ্বাস করে না। এমন কি, প্রয়োগ-নিরপেক্ষ চিন্তনের দ্বারা যে প্রকৃত পক্ষে কোন প্রকার আত্মিক উন্নতি হয়, এ বিষয়েও অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁরা বলেন, উপযুক্ত সুপ্রয়োগ দ্বারা যার অস্তিত্ব প্রমাণিত হল না, কার্য্যক্ষেত্রে যা টিকবে কি না টিকবে তার কোনই স্থিরতা নাই, এরূপ জিনিষের কাল্পনিক মূল্য নিরূপণ করা নিতান্তই অর্থহীন।

ঐ শ্রেণীর সন্ন্যাসী ধার্ম্মিকগণ অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন করতেন। দেখাদেখি গৃহীরাও আত্ম-পীড়নকে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মভাবের একটি প্রধান অঙ্গ বলে মনে করতেন। তাঁদের মনে ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, আমাদের আত্মা ভগবানের অংশ, আর স্থূল দেহ শয়তানের খেলাঘর। কাজেই দেহ-পীড়ন করলে শয়তান নির্জ্জিত আর আত্মা পুষ্ট হবে। তাই বলে, রিপু দমন করতে গিয়ে, যা কিছু স্বভাবতঃ আমাদের মনকে মুগ্ধ করে, সেই সমুদয়ের বিরুদ্ধেই 'ক্রুসেড' আরম্ভ হয়েছিল। এইরূপে রূপ, ধন সম্পদ, যৌবন, স্বাস্থ্য, কলানৈপুণ্য, আমোদ-প্রমোদ, এ সমস্তকে লোকে অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেছিল। ঊর্ধ্ববাহু সন্ন্যাসী, শরশয্যার সাধক, কমলীওয়ালা সুফী, এঁরাই ধার্ম্মিকের আদর্শ ছিলেন। লোকের কাছে প্রশংসা শুনলে পাছে তপোনষ্ট হয়, এই ভয়ে এঁদের অনেকেই লোকের সঙ্গে যাচ্ছেতাই দুর্ব্ব্যবহার করতেন। তাঁরা ভাবতেন, একমাত্র ভগবানের সঙ্গে আমাদের কারবার, আমরা মানুষের কোন ধার ধারি না। কিন্তু আজ কাল এই সব খেয়ালকে লোকে অদ্ভুত বলেই মনে করে। এখন অদ্ভুত ভৌতিক ক্রিয়া বা অলৌকিকত্ব প্রদর্শনক্ষম সাধু সন্ন্যাসীকে উচ্চ আধ্যাত্মিক আসনের গৌরব দিতে অনেকেই দ্বিধান্বিত। বাস্তবিক, বর্ত্তমানে জনসেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলে পরিকীর্ত্তিত। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথাও ভুলে থাকলে চলবে না। স্বাস্থ্যলাভ, সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা, খেলাধুলা এবং শারীরিক মানসিক সমুদয় বৃত্তির চরিতার্থতাই আজকালকার মতে প্রকৃত ধর্ম্মভাব। চিরকাল জেলখানায় পুরে রেখে যার পবিত্রতা রক্ষা করতে হয়, তার পবিত্রতার মূল্য কি? আমাদের প্রবৃত্তিগুলিকে নিগৃহীত করে সতী না বানিয়ে ছাড়া দিতে যাতে তারা আপনা আপনি সৎ পথে চলতে পারে, তার ব্যবস্থা করাই প্রকৃত ধর্ম্ম-সাধনা।

www.pathagar.com

প্রশ্ন হতে পারে, আস্তিক যেন ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করবার জন্য, বা স্বর্গলোভে সৎকার্য্য করতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিবাদী যার বিশ্বাস যে দেহ লোপের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ, সে কিসের জন্য সৎকাজ করতে যাবে? তার মনে তো ধর্ম্মভাবের আবির্ভাব হওয়ার কোনই কারণ দেখা যায় না। 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পীবেৎ' এই আদর্শ থেকে তাকে কিসে বাঁচাবে? উত্তর অতি সহজ। প্রকৃতিবাদী আবার সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ত্তনবাদী। তার বিশ্বাস, প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে চলাই ধর্ম্ম, তার বিরুদ্ধে চলতে গেলেই লাঞ্ছনার অবধি থাকে না। যেমন স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করা প্রকৃতি-সিদ্ধ। অনিয়ম করলেই তার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। এই শাস্তিই নরক। সৎপ্রবৃত্তির অভ্যাস করতে করতে মানুষ ক্রমশঃ বিবর্ত্তনের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করছে। প্রকৃতিবাদীর কাছে এই সব সোপানই সপ্ত সর্গ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আস্তিকের স্বর্গ-নরকের ন্যায়, বিবর্ত্তন-সোপানের উঁচু নীচু ধাপগুলিই প্রকৃতিবাদীর সদস্য কর্ম্মের নিয়ন্ত্রক। আস্তিক যেমন আত্মাকে অবিনাশী মনে করে, প্রকৃতিবাদীও তেমনি এক অখণ্ড মানবতায় বিশ্বাসী। এঁর মতে, মানুষ যার যার সঙ্গে কর্ম্মসূত্রে একত্র হয়, যার যার মধ্যে নিজের ভাব ও স্বভাব সঞ্চারিত করে দেয়, তাদের ভিতর দিয়ে সে চিরকাল বেঁচে থাকে। সন্তান, শিষ্য, পরিষদ এরা সবাই মিলে লোকের ব্যক্তিত্বকে বহন করে করে তাকে চিরজীবী করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আস্তিক ও প্রকৃতিবাদী উভয়ের মধ্যে কর্ম্ম প্রেরণায় বা ধর্ম্মভাবে কোন সত্যিকার পার্থক্য নাই। যদি বলা যায়, এদের ভিতর একই মূলগত জিনিষের শুধু নামগত পার্থক্য, তা হলে হয়ত বেশী ভুল বলা হয় না। তবে উভয়ে সৃষ্টিস্তরের বিভিন্ন সোপানের লোক। সাধারণ আস্তিকের আশা ও ভয়ের চেয়ে প্রকৃতিবাদীর কর্ম্মপ্রেরণা আরও সূক্ষ্মতর। একজন প্রাথমিক ভক্তিযুগের লোক আর একজন বিচার ও চিন্তা-জগতের লোক। কিন্তু তাই বলে যে কাব্যময়তা, এবং লোকোত্তর রহস্যময়তার ভাব ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ, বৈজ্ঞানিকের বিচার ও চিন্তার ধুননে তা বিলুপ্ত তো হয়ই নি, বরং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হয়ে আরো ছড়িয়ে পড়েছে। পক্ষপুট-বিশিষ্ট বা শিঙ্গাধারী স্বর্গীয় দূতের কল্পনা, বা সগুনা ব্রহ্মের কোটি কোটি দেবরূপের কল্পনার পাশে, বিশ্বব্যাপী ইথারের অনন্ত ঘূর্ণন-বৈচিত্র্যের দ্বারা energy বা শক্তি জড়রূপ ও অধ্যাত্মরূপ প্রকাশের কল্পনাকে কাব্যের দিক দিয়েই হোক, আর রহস্যময়তার দিক দিয়েই হোক, সগৌরবে দাঁড় করান যেতে পারে। সুতরাং কল্পনার দিক দিয়ে, অনেকে বিজ্ঞানের আবির্ভাবে ধর্ম্মের শ্রীভ্রষ্ট হওয়ার যে আশংকা করেন, তা' অমূলক।

আর একটি মাত্র কথা বলেই আলোচনা শেষ করব। স্বর্গ-নরকে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সংসারে এত পাপাচরণ কেন, এটি বাস্তবিকই বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, অধিকাংশ লোকই মুখে বিশ্বাস করে, হৃদয়ে করে না। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধনের যেমন প্রকৃত কদর হয় না, বিশ্বাসেরও তাই। আপন চেষ্টার দ্বারা, চিন্তার দ্বারা, সাধনার দ্বারা, আয়ত্ব না করলে কোন জিনিষই আমাদের নিজস্ব হয় না। কিন্তু সংসারে অধিকাংশ লোকই অন্যের চোখে দেখে, অন্যের বুদ্ধিতে ভাবে, অন্যের অনুভূতির স্পন্দনকে নিজের অনুভূতি বলে ভুল করে। জাগ্রত ভাবে, নিজের জীবনের উপর প্রভু হয়ে, বেঁচে থাকার চেয়ে গড্ডলিকা স্রোতে গা ঢেলে দেওয়া ঢের বেশী সহজ ও নিরাপদ। সুতরাং চোখ বুঁজে না ভেবে চলাই সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক। দুই একটি বুলি আউড়িয়েই তারা মনে করে, বিশ্বাস করেছি। এই আত্মবঞ্চনায় সন্তুষ্ট হয়ে আত্মদৃষ্টি ও আত্মবিচার

হারিয়ে ফেলে। কোন বৃহৎ ভাব বা কল্পনাকে পাশ কাটিয়ে চলবার সবচেয়ে বড় উপায়, তাকে নির্ব্বিবাদে স্বীকার করে নিয়ে সব পেয়েছি ভেবে তাকে মনের কোণ থেকে সরিয়ে রাখা। ঠিক এই পদ্ধতিতেই জগতের সব উচ্চ আদর্শ, নীতি বাক্য, ধর্ম্ম কথা, কাব্য, কাহিনী, আর্ট, সব অভ্যস্ত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উদ্ধারের এক মাত্র উপায় সকলের ভিতর অবিরাম চেতনা সঞ্চারিত করে রাখবার জন্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শক্তিমান পুরুষদের চেষ্টা। সজ্ঞানে পথ বুঝে বা পথ খুঁজে চলবার সময় এঁরা বারংবার ভুল করতে পারেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে, শোধরানোর সম্ভাবনা থাকলে এই ভুলের ভিতর দিয়েই আছে।

www.pathagar.com

সভ্যতার উত্তরাধিকার

কামাল উদ্দীন

দুনিয়া অনেক কালের পুরানো হলেও শৈশব ছাড়িয়ে আসতে তার বহুদিন লেগেছে মনে হয়। তাই মানব ইতিহাসের অনেকটা অংশকে শিশু মানব জাতির আখ্যান বলে অভিহিত করা চলে। কিন্তু যে শৈশবের শিক্ষা ও সাধনার উপর পরিণতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, সে শৈশবকে অস্বীকার করলে পরিণতিকেও নির্ভুলরূপে বুঝতে পারা যায় না। এ কারণেই দুনিয়ার যৌবনে আজ আমরাও সেই আঁধার যুগের মানুষ জাতির ধারাবাহিক ক্রমবিকাশকে সাগ্রহ অনুসন্ধানের বিষয় মনে করি। যে সূক্ষ্ম সূত্রটি আদি পিতা হতে শুরু করে তাঁর অগণিত আগত ও অনাগত বংশধরকে স্থান-কাল অতিক্রম করে এক মিলন-মোহনায় সমবেত করেছে, মানুষকে বুঝতে হলে, তার দূর-প্রসারিত ভবিষ্যতের গতি নির্দ্দেশ করতে হলে, সেই অদৃশ্য স্পষ্ট অনুভূত রাখীটির নিবিড় পরিচয় অপরিহার্য্য।

... ... শিশু মানুষ অনেকবার অনেক করে তার খেলাঘর সাজিয়েছে, ভাল বেসেছে, হেসেছে, কেঁদেছে, ভেঙেছে, গড়েছে। এরই পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে নতুন নতুন সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছে, এক গেছে, আবার এসেছে, এবং সাথে সাথে এক বিরাট বিচিত্র ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছে। আজ আমরা চোখ খুললেই যেমন দুনিয়ার অনেকটা অংশ চট্ করে দেখে ফেলি, তখনকার দিনে নিকট পরিচয়ের এ সুযোগ তাদের ছিল না। বহু পুরানো সভ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, তারা তাদের সীমার বাইরের অসীম পৃথিবীকে স্বীকার করেনি ; বরং অযৌক্তিক বিদ্বেষ করেছে, নিজেদের ঈশ্বর-মনোনীত ভেবে অপর সকলের স্পর্শ এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছে। প্রাগৈতিহাসিক যে কয়টা বিশিষ্ট জাতির আচার-বিচারপূর্ণ গ্রন্থ ঐশী বাণীর আসন লাভ করে ধ্বংসের মুখ থেকে কোনো মতে বেঁচে গেছে, সে সব থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সেকালের অবতার মহাপুরুষ নামধেয় অসীম শ্রদ্ধেয় আসনে আসীন ব্যক্তিগণও সমগ্র মানুষ জাতিকে এক শ্রেণীতে এনে দেখতে প্রয়াস পাননি। সুপ্রাচীন মহাপুরুষদের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধদেবে বোধ হয় এর ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

কিন্তু মানুষ বড় হওয়ার সাথে সাথে দুনিয়া তাদের চোখে ছোট হয়ে দেখা দিয়েছে। পরিচয় ও মিলন প্রেমে ও সহানুভূতিতে পরিণতি লাভ করেছে গোষ্ঠী বা দল ছেড়ে তারা সম্প্রদায় গড়েছে, সম্প্রদায় অতিক্রম করে ক্রমে এক একটা বিরাট জাতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভূগোলের ছোট খাট সীমারেখার স্থানে হিমালয় আর উরাল পর্ব্বত, প্রশান্ত আর ভারত মহাসাগর বসিয়ে নূতন করে তাদের পরিধির পারিমাপ করেছে। বর্ত্তমান দুনিয়ার আবহাওয়া থেকে মনে হয় এ সীমারেখা যেমন দুর্লঙ্ঘ তেমন স্পষ্টও ! হয়ত এ অনেক দিন টিকে থাকবে।

মানুষের মুক্তবুদ্ধি কিন্তু এ সীমা ভাগকে চরম বলে মানে নি। নিজ সভ্যতার মোহে এক জাতি অপর জাতিকে অবজ্ঞা দেখাতে গিয়ে যখন নিজেও বিকৃত হয়ে যাচ্ছিল, তখন আবার নূতন বিপ্লবের প্রয়োজন অনুভূত হল। এই প্রয়োজনের আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে মানুষ বুঝল যে

www.pathagar.com

যেভাবে গোষ্ঠী থেকে সমাজ, সমাজ থেকে সম্প্রদায় এবং সম্প্রদায় থেকে জাতি গড়ে উঠেছে, সেই ভাবেই জাতি ও জাতির মিলনে মহাজাতীয়ত্বের পত্তন হতে পারে—যার দ্বারা জগতের সমৃদ্ধি অনেক বেড়ে যাবে। এই বিশ্বমানবতা—আন্দোলনের সাথে ইসলামের উৎপত্তি ও বিকাশের নিকটসম্বন্ধ আছে। প্রচলিত ইসলামে বিধর্ম্মীদের সম্বন্ধে বিশেষ সম্মানজনক ব্যবস্থা না থাকলেও মানুষের একত্ব ও সাম্যের বীজ প্রারম্ভ থেকেই এতে নিহিত ছিল। দৃপ্তকণ্ঠে বিধাতার একত্ব ঘোষণা করে কোরআন মানুষের মধ্যে সমস্ত ভেদনীতির মূলোৎপাটন করেছে ; সাথে সাথে একথাও স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে যে সব মানুষ একই মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের বড়ত্ব, ছোটত্ব নির্ভর করে ব্যক্তিগত দোষ–গুণেরই উপর, বংশমর্য্যাদা বা অন্য কোন সংস্কারের উপর নয়। ইসলামের ইতিহাস সমগ্র মানব জাতির প্রতি সব সময় সমদর্শী না হলেও অন্ততঃ বিভিন্ন জাতীয় মুসলমানের মধ্যে কোনো ভেদরেখা স্বীকার বা বরদাস্ত করেনি। 'প্যান্‌–ইস্‌লামিজমে'র নামে সহস্র প্রকারের কুৎসা রটিত হ'বার পরেও এ নীতিই তার পক্ষের একমাত্র যুক্তি। জগতের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী অথচ স্থূলতঃ একই মতাবলম্বী কতকগুলি সম্প্রদায়ের সমসাময়িক অধঃপতনের গতিরোধ করার সংকল্প নিয়ে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল মাত্র। এতে নিজ নিজ দেশের প্রতি অবহেলার দরুন তাদের জাতীয়ত্ব কথঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকলেও আন্তর্জ্জাতিকতার দিক দিয়ে এর মূল্য আছে। এই সব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি শুধুমাত্র ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত না রেখে তার সাথে ক্রমশঃ সমস্বার্থ বোধটিও জুড়ে দিলে এই ধরনের একটি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে সমগ্র এশিয়ার তথা সমগ্র নির্য্যাতিত জাতিপুঞ্জের উত্থান সম্ভবপর হত।

বাংলাদেশ পাশ্চাত্য জ্ঞান–বিজ্ঞানের প্রথম আলোকে এই বিশ্বসভ্যতার রূপটি কথঞ্চিৎ অনুভব করেছিল। কিন্তু ডিরোজিও–পন্থীদের পাল্টা আক্রমণস্বরূপ আমাদের একদল শক্তিমান ভাবুক বৈশিষ্ট্যপন্থী হয়ে পড়লেন। আমাদের কতকগুলি কুসংস্কার লালিত আচার–বিচারের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে তাঁরা অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে প্রতিভার অপব্যয় করেছেন। স্বীকার করি, স্থান–কাল–পাত্র ভেদে প্রত্যেক জিনিষের দোষগুণের তারতম্য হতে পারে। কিন্তু এঁদের যুক্তির বৈশিষ্ট্য এ নীতিতেই নিবদ্ধ নয়। বুদ্ধির প্রাখর্য্য যথেষ্ট থাকলেও সব দিক বিচার করে 'মোটের উপর ভাল ও মন্দ'—এই দুই ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক বস্তুকে দেখার প্রবৃত্তি এঁদের নেই। কোন প্রথা বা সংস্কার গ্রহণ বা পরিত্যাগ করা সম্বন্ধে যুক্তির দৌড় যখন ফুরিয়ে যায় তখন তাঁরা বলে ফেলবেন, এ ভারতের বৈশিষ্ট্য, ইস্‌লামের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। এক সুশিক্ষিত সমাজনেতার সাথে সারদা আইন সম্বন্ধে আলাপ হচ্ছিল। তাঁর বক্তব্য এই ধরনের—সারদা আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য মহৎ ; তার কার্য্যকারিতা ও পরিণাম সম্বন্ধে তিনি নিরাশ নন ; কিন্তু তাঁর আপত্তি এই যে এতে করে এই প্রথম ব্যবস্থাপক সভার মধ্যস্থতায় ইসলামী আইনের উপর হস্তক্ষেপ করা হল। এইই হচ্ছে আমাদের শিক্ষিত সাধারণের মোটামুটি মনোভাব। কোরানের চৌর্য্য অপরাধে হস্তখণ্ডন ব্যবস্থা সম্বন্ধে একজন বলেছিলেন, একে তুলে দিতে হলে কোরান থেকেই অন্য কোন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা প্রমাণ করতে হবে।

বৈশিষ্ট্যের ঠুলি আমাদের চোখ এমনিই চেপে ধরেছে যে আমরা কোনো বস্তুর আদর্শ সম্বন্ধে মতামত দেবার সময় বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অতি সংকীর্ণ সুযোগই পেয়ে থাকি। নিয়ত

www.pathagar.com

বুদ্ধিবৃত্তির এ অবমাননার ফলে কোনো মহৎ সৃষ্টির পরিকল্পনা আমাদের দিয়ে সম্ভব হয়ে উঠছে না ; প্রচলিত রীতি–নীতির জাবর কেটেই আমরা চলেছি মাত্র। যাকে আমরা আদর্শ মনে করে চোখের সামনে ধরেছি তাকে বোঝার ক্ষমতাও আজ হারিয়ে গেছে। আমাদের বৈশিষ্ট্য–প্রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা বিলাস—মোহ, একটা আত্ম–প্রবঞ্চনার সুযোগ।

আমাদের সভ্যতা কোনটি? একদল বলেন আর্য্য সভ্যতা, একদল বলেন সেমিতিক সভ্যতা, আর একদল বলেন দুটোর মাঝামাঝি। এ নিয়ে তর্কাতর্কি এত হয়ে গেছে যে, নূতন করে এসব বিশিষ্ট সভ্যতার দোষ গুণ ও কার্য্যকারিতা বিচার করতে যাওয়া নিরর্থক। কিন্তু যাঁরা আর্য্য সভ্যতা বা সেমিতিক সভ্যতার পক্ষপাতিত্ব করেন তাঁরা স্পষ্ট করে বলতে পারেন কি, তাঁরা কি চান? ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে অতি পুরাকালেও সভ্য জাতি বসবাস করতেন, আর আমাদের আজকের ভারতবাসীর অনেকে যে তাঁদের বংশধর—এ একটি সুখবর মাত্র। সভ্যতা ছাঁচে ঢালা জিনিষ নয়। তার বিকাশের মূলে একটি ইতিহাস আছে। মধ্য এশিয়ার একদল লোক ভারতে এসে আত্ম–প্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন। তখনকার দিনের অন্যান্য জাতের মত আচার–বিচারের বাড়াবাড়ি তাঁদেরও যথেষ্ট ছিল। ভারতে আসার পূর্ব্বেও এ জাতি আরও অনেক জাতির সংস্পর্শে এসেছিলেন ; অন্যান্য জাতির সাথে তাঁদের আদর্শ ও ভাবের আদান–প্রদান যথেষ্ট হয়েছিল। ভারতে আসার পরেও দ্রাবিড়—শক্–হূন জাতির ভাবধারার সাথে তাঁদের পরিচয় ও সংমিশ্রণ হয়েছে। সুতরাং পরিশেষে বাহির ও ভিতরের সংঘাত ও সমন্বয়ে যে সভ্যতা খাড়া হল তার দিকে নির্দ্দেশ করলে শুধু একটা বিশেষ জিনিষকে বোঝান হয় না, অনেক কিছুকেই এক সাথে দেখান হয়। পূর্ণ বিকাশের পথে আর্য্য সভ্যতাকে আরও নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের অভ্যুত্থান এরূপই একটি স্মরণীয় ঘটনা। এ বিপ্লবের সংঘাতে তৎকালীন হিন্দুত্ব বিশেষ রূপে পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু সভ্যতার শেষ পর্য্যন্ত এই প্রকার বড়-ছোট পরিবর্ত্তন পূর্ণমাত্রায় চলেছে। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদর্শ মতবাদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত এত বৈচিত্র্য দেখা যায় যে, আদতে এদের এক জিনিষ বলে দাবী করা সত্যের অপলাপ বৈ নয়। এদের মধ্যে যে সাদৃশ্য জগতের যে কোনো দুই জাতির মধ্যেই তা অল্প–বিস্তর দেখতে পাওয়া যায়।

অন্যান্য সভ্যতা সম্বন্ধেও এই একই কথা কম বেশী খাটে। আরব জাতি সপ্তম শতাব্দীতে যে কৃষ্টির মশাল জ্বেলে তুললেন, তার শিক্ষা ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম্মের ভস্মে লুপ্ত হয়েছিল মাত্র। ইসলাম মূলতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী 'কিতাবী' ধর্ম্মাবলীর যুগোপযোগী বর্দ্ধিত সংস্করণ। বিভিন্ন জাতি এ'কে বিভিন্ন আলোকে গ্রহণ করেছে। দ্রুত বিস্তারের যুগে একেই নানা বিচিত্র চিন্তাধারা ও আচার পদ্ধতি সমাহরণ করতে হয়েছে। আরবে ও পারস্যে প্রবর্ত্তিত ইসলামের মধ্যে মতভেদ নগণ্য নয়। ভারতের বিপরীতমুখী কালচারের সংস্পর্শে এসে তাকে আরও জটিলতায় সমাচ্ছন্ন হতে হয়েছে—প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য যা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। হিন্দু–মুসলিম কালচারের যাঁরা সমন্বয়-পন্থী, তাঁদের প্রচেষ্টাকে উদার বলতে আপত্তি নেই, কিন্তু সে প্রচেষ্টা আপোষের, বা চলতি কথায়, গোঁজা মিলের,—সত্যসন্ধানের নয়।

আমাদের দৃষ্টি শক্তি আজ বহুদূর বিস্তৃত হয়েছে। আমাদের জ্ঞানের পরিধি দিন দিন দ্রুত বেড়ে চলেছে। আজিকার প্রত্যেকটি সমস্যা সমাধানে আমাদের এই জ্ঞান, এই দূরদৃষ্টির সাহায্য নির্ভয়ে নিতে হবে। ভারতীয় বা আরবীয় সভ্যতার প্রাণবস্তু যা ছিল তা তাদের পরবর্ত্তী সভ্যতার স্থান পেয়েছে। যুগে যুগে যে আত্মত্যাগের বাণী ভারতের তপোবন থেকে

www.pathagar.com

প্রচারিত হয়েছিল, সমষ্টির মঙ্গলের নামে আজও আমরা তা শুনছি। ইসলামের সাম্যবাদই আজ আরও প্রবল আকারে democracy, dignity of labour, equal distribution of wealth—ইত্যাদি নামে বর্ত্তমান সভ্যজগতকে প্রভাবান্বিত করে তুলেছে। এ সত্য যদি আমরা অস্বীকার করি তবে আমাদের উপর প্রতীচ্যের দুরন্ত শোষণ–নীতিই জয়ী হবে ; তাদের শতবর্ষব্যাপী সাহর্য্যে আমাদের দিক থেকে শোচনীয়রূপে ব্যর্থ হয়ে যাবে। পুষ্পক রথ আর উড়বে না ; চারি সহধর্ম্মিনীর সাহচর্য্য মানবসংখ্যা বৃদ্ধির অবসরও নেই। আর্য্যত্ব ও মুসলিমত্বের মোহ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত মানুষকে যদি উপনিষদ ও কোরান মহত্ত্বের, কল্যাণ–পথের, ইঙ্গিত দিতে পারে, তবেই আজিকার যুগে তাদের বেঁচে থাকার অধিকার স্বীকৃত হবে।

বিশ্ব– সভ্যতা বলতে আজ আমরা প্রকারান্তরে ইউরোপকেই নির্দ্দেশ করি। তাঁর কারণ, যুগ যুগের সাধনা দিয়ে ইউরোপবাসী দুনিয়ার অন্যান্য সভ্যতাকে গ্রাস করে নিয়েছে এবং নিজেদের শক্তিমান দানে তার সর্ব্ববিধ পরিপুষ্টি–সাধন ও তার সত্যিকার উত্তরাধিকার অর্জ্জন করেছে। বিভিন্ন সমস্যা ও অভিজ্ঞতা তাদের মনীষী সম্প্রদায়কে আজ গণবাদের যে জীবন্ত রূপের দিকে চালিত করে এনেছে, ভবিষ্যৎ ভারতকে তার বৈশিষ্ট্যের সমস্ত অন্ধ মোহ ত্যাগ করে হয়ত সেই 'সমাজতন্ত্র'ই গ্রহণ করতে হবে।

তাই জাতীয়তা ও আন্তর্জ্জাতিকতার মধ্যে একটা কল্যাণকর আপোষ চাই। যুগের আলো বিশ্বের সম্মুখে মানব সভ্যতার যে বিপুল সম্ভাবনা প্রতিভাত করেছে, তাকে সুন্দর করে গড়ে তোলার বেলায় আমরা যেন পেছনে পড়ে না থাকি। স্মরণীয়া নাইডুর কথায় উপসংহার করি—

'I am a bad nationalist. I am a nationalist only by the compulsion and the tragedy of the circumstances of my country. I am first and last a human being and I do not recognise divisions of humanity merely because of race or geographical barriers.'

www.pathagar.com

ভারতের আদর্শ

আলী নূর এম. এ.

আমাদের এ প্রাচীন ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ। হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ, আর সিন্ধু দেশ হইতে আসাম, এই সুবিস্তীর্ণ আয়তনের মধ্যে কত প্রকারের রঙ্গের খেলাই না কাল খেলিয়া গিয়াছে। আর্য্য–অনার্য্যের ঘাত–প্রতিঘাতে ভারতের মাটি রঙ্গীন হইয়াছে। শক–হূন–পাঠন–মোগলের অভিযানে ভারতের আকাশে ধূলির মেঘ উড়িয়াছে। প্যাচাত্য বণিকের তরণীতে ভারতের কূল উপকূল ছাইয়া গিয়াছে। ভারতের বুকের উপর কালের এই অবিরাম খেলাই আজ ভারতকে এক মহা সমস্যার সম্মুখীন করিয়াছে। শতধা বিভক্ত ভারত কি সেই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে? যে বৈচিত্র্য ভারতের সম্পদ তাহাই আবার তাহার ঐক্যের পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। তাই ভারত আজ পরাণ খুলিয়া জোর গলায় সবার হইয়া কথা বলিতে পারিতেছে না। এদিক ওদিক হইতে মাঝে মাঝে যা একটু সাড়া পাওয়া যাইতেছে তাহাও বেসুরা বলিয়া কানে বাজিতেছে।

ভারতের আদর্শ সম্বন্ধে কথা বলিতে গেলে গোটা ভারতবর্ষকেই মনে রাখিয়া তাহা করিতে হইবে। কোন সমাজ কিংবা কোন যুগবিশেষের আদর্শকে ভারতের আদর্শ বলিয়া ডংকা বাজাইলে ত আর তাহা প্রকৃতপক্ষে গোটা ভারতের আদর্শ হইয়া যাইবে না। এবম্প্রকার প্রচেষ্টা দেশের পক্ষে বরং অকল্যাণকর বলিয়া মনে করিয়া সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। প্রাচীন ভারতের আদর্শ যেমন প্রাচীন ভারতেরই থাকিবে, মধ্যযুগীয় ভারতের আদর্শ তেমনি মধ্যযুগের ভারতেরই রহিবে। প্রাচীন ভারতের অবস্থা যেমন মধ্যযুগে অপরিবর্ত্তিত ছিল না, তেমন আবার মধ্যযুগীয় ভারতের অবস্থারও পরিবর্ত্তন সাধন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আদর্শেরও পরিবর্ত্তন হইবে। ভারতের ইতিহাস হইতে কোন পরিচ্ছেদকে মুছিয়া ফেলিলে চলিবে না, কোন অধ্যায়কে accident বলিয়া উড়াইয়া দিলেও ভুল করা হইবে। সমস্ত কিছুকেই বিধাতার ইঙ্গিতরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা ইতিহাসকে এড়াইয়া লাফাইয়া চলিতে গেলে হোঁচট খাইয়া আমাদের খানায় পড়িবার সম্ভাবনা আছে। মোহমুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ ইতিহাসটিকে চক্ষের সামনে না রাখিয়া ভারত–বর্ষের আদর্শ আশা আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে ভারতবর্ষেরই প্রতি অবিচার করা হয়।

আজ ইংরেজের দৌলতে হিন্দু হিন্দু হিসাবে এবং মুসলমান মুসলমান হিসাবে নয়, উভয়ে ভারতবাসী হিসাবে এক মঞ্চে দাঁড়াইবার সুযোগ পাইয়াছে। এই সুযোগ বর্ত্তমান ভারতের গ্রহণ করিতেই হইবে, নতুবা ভবিষ্যৎ ভারতের কাছে তাহাকে জবাবদিহি হইতে হইবে।

ভক্তিতে গদ গদ হইয়া পুরাকালের আদর্শের চরণযুগল আঁকড়াইয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিলে বাকী জগৎটাই আমাদের নিকট হইতে যে অনেক দূরে সরিয়া পড়িবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে? কবি মরা মানুষের মাথার খুলি লক্ষ্য করিয়া চমৎকার কবিতা

www.pathagar.com

লিখিয়াছেন। আমরা সে কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। কিন্তু তাই বলিয়া আমরা নির্ব্বাপিত ভস্মাচ্ছাদিত চিতা অথবা উলুবন–সমাচ্ছন্ন কবরগাহ্–এর পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে রাজী হইব কি? এক কালের ভারতবর্ষের বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্যকে তার মৃগচর্ম্ম–সমাসীন ভস্মাচ্ছন্ন মৌন মূর্ত্তিকে যতই প্রশংসা করি না কেন, ভাবে যতই বিভোর হই না কেন, কিন্তু স্বর্গচ্যুত মানুষ আমরা কর্ম্মের সংসারে পড়িয়া ভারতের বুকে টিকিয়া থাকিতে পারিতেছি কই! যাহা কবিতার–সামগ্রী তাহা কবিতাতেই থাক,—জীবনে তাহাকে ফুটাইয়া তুলিতে যাইয়া নাকাল হওয়ার মত মতি খোদা যেন আমাদের না দেন।

ভারতবর্ষের তথাকথিত বৃহৎ ও মহৎ আদর্শের বুলি আওড়াইয়া আমরা জগতের কতটুকু মঙ্গলসাধন করিতে পারিতেছি? মুখে আমরা দেবতার অর্চ্চনা করি, মন্দিরে তাঁর পায়ে দিই অঞ্জলি, আবার বাইরে তাঁরই হাতে গড়া মানুষকে করি পদাঘাত। তাই ভগবানের সৃষ্ট মানুষ যখন গঙ্গায় ডুবিয়া মরে একদিকে ভগবানের অর্চ্চনাকারী যোগী–সন্ন্যাসীরা তীরে বসিয়া তার আত্মার সদ্‌গতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে, অন্য দিকে আমেরিকান পর্য্যটক তাহাকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত আস্তিন গুটাইয়া লাফাইয়া পড়ে ক্ষিপ্ত গঙ্গার বক্ষের উপর। ইহা সত্য ঘটনা নাও হইতে পারে। গল্পও হইতে পারে। কিন্তু গল্প হইলেও ইহার চাইতে সত্য গল্প আমি আর কিছু শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না।

আমরা আত্মার উন্নতির জন্য দেহকে পীড়ন করিয়াছি। কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছি যে, পীড়িত দেহে আত্মা পরিপুষ্টিলাভ করিতে পারে না। আমরা আমাদের জাতীয় জীবনেও এই ফলই পাইয়াছি। কিন্তু নিজের দৈন্য ঢাকিবার জন্য জড়তাকে আধ্যাত্মিকতা বলিয়া খুব ঢাক পিটাইতে কসুর কিছুই কম করি নাই। যাহা আধ্যাত্মিকতা, যাহা সত্য যাহা সুন্দর, যাহা মঙ্গল তাহা আপনার গুণে আপনিই প্রতিভাত হয়। তাহাকে বুঝাইবার জন্য বিনাইয়া বিনাইয়া তাহার ভিতর হইতে তাৎপর্য্য বাহির করিবার কোন প্রয়োজন করে না। আমাদের সহজ জীবনযাত্রার জন্য হাজার কি পাঁচ হাজার বছর আগেকার অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ্য বিধানগুলিকে নির্ব্বিচারে মাথা পাতিয়া লইয়া ব্যাখ্যার উপর ব্যাখ্যা করিয়া বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি বানাইয়া তাহা উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিকতা বলিয়া বেড়াইবার যে কি সার্থকতা থাকিতে পারে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা বাস্তবিকই দুষ্কর। অপ্রমত্ত শুদ্ধ চিত্ত ও মুক্ত বুদ্ধিই আমাদের জীবন যাত্রার পক্ষে যথেষ্ট পাথেয়। প্রকৃতপক্ষে আমাদের আধ্যাত্মিকতার অর্থ দায়িত্বকে গ্রহণ না করা ছাড়া আর কিছু হইতে পারে বলিয়া আমার মনে হয় না।

শুনিতে পাই যে, ভারতবর্ষ সমস্ত কিছুই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছে; সমস্ত কিছুরই ঠাঁই করিয়াছে; সমস্ত কিছুই স্বীকার করিয়াছে। ভারতবর্ষের এই স্বীকৃতির রূপটি কি তাহা কি কেহ বহিয়া দিতে পারেন? যে সমস্ত কিছুই স্বীকার করে সে বস্তুত কিছুই স্বীকার করল না। নিজেকে এইভাবে ফাঁকি দিয়া আজ ভারতবর্ষ কাঙ্গাল সাজিয়াছে। ভগবান এইখানে মিলনের যে আয়োজন করিয়াছেন তাহা ভারতের জড়ত্বে এতদিন ব্যর্থ হইয়াছে। আজ ভারতকে জাগ্রত হইতে হইবে। বিধাতার এই মঙ্গল ইচ্ছাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ তার মেলায় বিচিত্র জাতিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্যদিকে দেখিতেছি এ নিমন্ত্রণে 'পংক্তি ভোজনে'র ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আজিকার ভারতকে ইহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত

www.pathagar.com

করিতে হইবে—এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। এই বিচিত্র জাতিকে এমন করিয়া গঠিত করিতে হইবে, যাহাতে কোথাও কোন অসামঞ্জস্য—কোথাও কোন ক্ষোভের লেশ মাত্র না থাকে। ভারতবর্ষকে কি ভারতবাসীর বুকের ধন করিয়া দিতে পারা যায় না? ভারতবর্ষের বুকের উপর যত অভিযানের বন্যা আসিয়াছে, যত বিদেশী আসিয়াছে, সবারই প্রতি ভারতবর্ষের যেন একটি কথাই ছিল, একটি ভাবই ছিল! 'তুমি আসিয়াছ? থাকিতে চাও? আচ্ছা এইখানেই থাক; তোমার জন্য এই জায়গাটা ছাড়িয়া দিলাম। আমার এতেই চলিবে।' কিন্তু সব কিছু বিদেশীর পায়ে বিকাইয়া দিয়া নিজের পেটের সেবা যখন আর চলিল না তখন কপালে একবার করাঘাত হানিয়া বিদেশীর পদসেবায় নিয়ত হইতে আধ্যাত্মিক ভারতকে খুব বেশী লজ্জা হইয়াছিল বলিয়া ত মনে হয় না।

আত্মাকে প্রাধান্য দিতে গিয়া আমরা দেহকে অস্বীকার করিয়াছিলাম। ফলে দেহ ত আমাদের পঙ্গু হইলই, আত্মারও ধ্বংসসাধন হইল। রাষ্ট্রের দিকে পিঠ ফিরাইয়াছিলাম বলিয়াই জাতীয়তাও আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন রহিয়া গেল। যে যার ঘরে বড় লোক হইলাম। কেহ যোগী তাপস হইলাম; কেহ কুবের হইলাম; কেহ জায়গীরদার হইলাম; কেহ সেনাপতি হইলাম; আর কেহ বা রাজার সভায় বিদূষক হইলাম। বাকী দেশের কে যে কোথায় পড়িয়া রহিল তাহার কোন সন্ধান পাইলাম না। হেথায় হোথায় কেহ বা কিছু জ্ঞান বিতরণ করিতেন বটে, কিন্তু তাহা গুরু মশায়ের রুচির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিত। বৈঠকখানায় মজলিশ বসিত বটে; যাত্রা এবং কবি-গানে আসর জমিত বটে, কিন্তু তাহা বৃহৎ জীবনযাপনের পক্ষে মোটেই যে যথেষ্ট ছিল না, তাহা বলাই বাহুল্য। সমাজ ব্যবস্থার যা অবস্থা ছিল তাহা গোযানের মতই ছিল। এখন আমরা যদি সময়ের গুণে বাষ্পযানের সন্ধান পাইলাম, তাহাকে যেন নিজের কাজে খাটাইবার মত উপযোগী করিয়া তুলিবার অভিরুচি আমাদের হয়।

রাষ্ট্রের ভিতর দিয়া দেশের জনসাধারণকে একটি সংযোগস্থলে আনিবার যে সহজ সুবিধা আছে আজকার দিনে তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এইখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, দেশ যে এই সংযোগস্থলে মিলিবে তাহা কোন আদর্শে? উত্তরে বলা যাইতে পারে--তাহা হইবে বাঁচিবার আদর্শ। কারণ বৃহৎ ভারতীয় সমাজের পরতে পরতে যে সমস্ত ক্ষুদ্র সমাজসমূহ বিদ্যমান আছে, তাহাদের এই বাঁচিবার কথাটাই খাঁটি, স্বাভাবিক ও সাধারণ কথা। তাই বলিয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন প্রয়োজনীয় বিরোধাত্মক সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করিলে ভুল করা হইবে। বরং রাষ্ট্রের বন্ধন যেখানে দৃঢ়, ধর্ম্মের গতি সেখানে সহজ এবং মুক্ত হবারই সম্ভাবনা বেশী। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ভারত যখন আজ স্বাধীনতা সংগ্রামে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গেছে তখন এখানে এই রাষ্ট্র কথাটার প্রতি এত জোর দেওয়ার কি সার্থকতা থাকিতে পারে! কিন্তু ব্যাপারখানা যাঁহারা তলাইয়া দেখিবেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, আজিও ভারতের ভাবুক রাষ্ট্র-গৌরবকে তুচ্ছ জ্ঞান করাই শ্রেয় মনে করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সময়ের তাগিদে পড়িয়া আমাদের কর্ম্মধারা যেন আমাদের ভাবধারাকে পেছনে ফেলিয়া উল্টাদিকে চলিয়াছে। কর্ম্মধারার সঙ্গে ভাবধারার এই বিরোধ অস্বাভাবিক এবং অকল্যাণকর। ইহা যেন ভারতবর্ষকে দুই নৌকায় পা রাখার অসুবিধায় ফেলিয়াছে। ইহাতে, বাস্তবকে স্বীকার করিবার মত সাহস আমাদের এখনও হয় নাই, এই

www.pathagar.com

কথাটাই কি প্রতিপন্ন হয় না? আমাদের ভাবধারাকে টানিয়া আনিয়া বাস্তবের ক্ষেত্রে আজ হাজির করিতে হইবে।

এইখানে একটা চরম কথা বলিতেছি। দেহকে রক্ষা করিতে যাইয়া আত্মা যদি আমাদের ধ্বংসপ্রাপ্তও হয় তাহাও স্বীকার্য্য। কারণ, তবু দেহটিকে পাইলাম। দেহের ধ্বংস সাধন হইলে আত্মার চাষ করিবে কে? এইখানে আত্মা কথাটি যে জীবনীশক্তির অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই সে কথা বলাই বাহুল্য।

আপনারা বলিতে পারেন, তুমি যতগুলি কথা বলিলে সবগুলির মধ্যেই একটা moral tone-এর অভাব দেখিতে পাইতেছি এবং এই moral tone যে সভ্যতার গোড়ায় না থাকে সেই সভ্যতা আপাততঃ চক্‌চকে হইতে পারে বটে, তবে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সভ্যতার এই moral tone টির রূপ কি? ইহা কি পাঁচবার কুচ্‌ কাওয়াজ করা অথবা তিনবার ঘণ্টা বাজানোতেই পর্য্যবসিত? আমি বলি, সমস্ত মানব সাধারণের মধ্যে, এমন কি সমস্ত জীবজগতের মধ্যে নিজের সম্বন্ধ অনুভব করার মধ্যেই আছে সভ্যতার সেই moral tone টি। মর্ম্মের এই উপলব্ধি এবং কর্ম্মে তার পরিচয়েই আছে মানুষের মুক্তি।

উপসংহারে আবার বলিতে চাই যে, আধ্যাত্মিকতার দোহাই দিয়া, প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়া, সংস্কারের দোহাই দিয়া নিজেকে পেছনের দিকে টানিয়া রাখিয়া জগতের কাছে হাস্যস্পদ হওয়ার মত দুর্ব্বুদ্ধি আমাদের যেন না হয়। তথাকথিত আধ্যাত্মিকতা আমাদিগের জন্য মুক্তি না আনিয়া বরং মৃত্যুই আনয়ন করিবে। আমাদের অহমিকাগুলিকে লালন করিয়া চলিবার দিন উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আজ আমাদিগকে নিষ্ঠুর হইতে হইবে। অহমিকার মূলসুদ্ধ উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। আজ আমাদিগকে এক দিকে যেমন শুধু মৃগচর্ম্ম সমাসীন জটাজুটধারীর প্রেম তন্ময় হইলে চলিবে না, অন্য দিকে তেমনি খেজুর বনের খোশবুতে মশগুল হইলেও বেওকুফিফ করা হইবে। এই আদর্শই হইবে ভাবী ভারতের আদর্শ। ভবিষ্যৎ আমাদের।

www.pathagar.com

আলবেরুনী

মোহাম্মদ আবদুল ওদুদ

তুর্কিস্থানের অন্তঃপাতী খীভ প্রদেশে ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে আবু রায়হান মোহাম্মদ এব্‌নে আহমদ আলবেরুনী জন্মগ্রহণ করেন। যেই ভাগ্যবান পিতামাতার ঘরে এই জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত সর্ব্বপ্রথম বিচিত্র পৃথিবীর আলো দর্শন করেন, আমাদের দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত তাঁহাদের বিস্তৃত জীবন জানিবার কোন উপায় নাই। এমন কি খীভ প্রদেশের কোন্ পল্লীর আলোবাতাসে তাঁহার শৈশবের স্বভাব-সুন্দর দিনগুলি অতিবাহিত হইয়াছিল, কোন্ ভাগ্যবান পল্লীশিক্ষক তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম অক্ষর পরিচয় করাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন,—সমস্তই আজ অতীতের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত। আলবেরুনী সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যত গবেষণা হইয়াছে, তাহাতে শুধু আমরা এইমাত্র জানিতে পারি যে, তিনি অতি অল্প বয়সেই সাহিত্যে ও বিজ্ঞানে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া খীভের তৎকালীন স্বাধীন সুলতানের মন্ত্রণাপরিষদের সদস্য মনোনীত হন। তৎকালে খীভ প্রদেশে মামুন বংশীয় স্বাধীন সুলতানগণ রাজত্ব করিতেন। গজনীর অধিপতি সুলতান মাহমুদ তাঁহাদের অতি নিকট আত্মীয় ছিলেন। কিন্তু আত্মীয়তার শীর্ণ শৃঙ্খল দিগ্বিজয়ী সিংহকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। মাহমুদের লোলুপ দৃষ্টির কবল হইতে আলবেরুনীর জন্মভূমিও রক্ষা পাইল না। গজনীপতি খীভ আক্রমণের ছল খুঁজিতে লাগিলেন। দূরদর্শী পণ্ডিত আবেরুনীর তীক্ষ্মদৃষ্টিতে মাহমুদের উদ্দেশ্য অধিক দিন গুপ্ত রহিল না। তিনিও খীভের সুলতানকে এমনভাবে পরিচালিত করিতে লাগিলেন যে গজনীপতির পক্ষে সহসা খীভ আক্রমণ সম্ভবপর হইয়া উঠিল না। এই সুপণ্ডিত যুবকের বুদ্ধির নিকট দূরদর্শী, রাজনীতিজ্ঞ, দিগ্বিজয়ী বীরকেও কিছু দিনের জন্য হার মানিতে হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই সুলতান মাহমুদ ও তদীয় প্রধানমন্ত্রণাদাতা হাসান মায়মুন্দির কোপদৃষ্টি আলবেরুনীর উপর পতিত হয়, এবং কতকটা বোধ হয় এই কারণেই পরবর্ত্তীকালে মাহমুদের মত জগদ্বিখ্যাত বিদ্যোৎসাহী নৃপতির রাজ সভায় থাকিয়াও আলবেরুনীর মত মহাপণ্ডিত রাজ সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই।

যাহা হউক মাহমুদের অসাধারণ রাজনৈতিক চালবাজীর প্রবল প্রবাহে আলবেরুনীর বালির বাঁধ অধিক দিন টিকিল না। মাহমুদ ১০১৭ খৃষ্টাব্দে খীভ অধিকার করিয়া স্বীয় সেনাপতিকে তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। পরাজিত মামুন-রজবংশীয়গণ ও খীভ প্রদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে বন্দী করিয়া, অপরিমিত লুণ্ঠিত দ্রব্য ও পরাজিত খীভ সৈন্যের কিয়দংশ লইয়া বিজয়ী সুলতান বিজয় গৌরবে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন; আর সেই সঙ্গে সুবিখ্যাত পণ্ডিত আলবেরুনীও গজনীতে আনীত হইলেন। মামুন বংশীয়গণ গজনীর বিভিন্ন দুর্গসমূহে রাজবন্দীরূপে প্রেরিত হইলেন আর মাহমুদ খীভ হইতে আনীত সৈন্যদল লইয়া ভারত অভিযানে যাত্রা করিলেন।

www.pathagar.com

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মাহমুদ ও তদীয় মন্ত্রণাদাতা হাসান মায়মন্দির কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া আলবেরুনী স্বীয় গুণের পুরস্কার প্রাপ্ত হন নাই। ১০১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৩০ খৃষ্টাব্দ, অর্থাৎ সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি রাজকীয় সাহায্য বা সহানুভূতি লাভ করিতে পারেন নাই। এই সম্বন্ধে সুবিখ্যাত কবি ফেরদৌসীর মত তিনিও সুলতানকে লক্ষ্য করিয়া একস্থানে বলিয়াছেন "Scholars are well-aware of the use of money, but the rich are ignorant of the nobility of Scienee." আলবেরুনীর Indika-র ইংরেজী অনুবাদক ডাক্তার সেচো (Dr. Edward Ce. Sachau) অনুমান করেন, তিনি সম্ভবতঃ এই সময়েই ভারতবর্ষ ভ্রমণে আসিয়াছিলেন।

গজনী প্রবাসী খীভের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গে সুবিখ্যাত পণ্ডিত আবুল খায়েরও ছিলেন। গ্রীক সাহিত্য, দর্শন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এই মহাপুরুষ ক্রমে অসাধারণ প্রতিভাশালী চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। অনেকের মতে, এই আবুল খায়েরের নিকটেই আলবেরুনী গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। গজনী আক্রমণের ত্রয়োদশ বৎসর পরে তাঁহার Indika নামক পুস্তক প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই আলবেরুনী গ্রীক ও হিন্দু এই উভয় জ্যোতিষেই অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, তিনি সুলতান মাহমুদের রাজসভায় রাজকীয় জ্যোতিষীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তিনি কখন সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন ; এবং কিরূপেই বা সংস্কৃত সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করেন তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানিবার কোন উপায় নাই।

সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজপুত্র মোহাম্মদ ও মাসউদ সিংহাসন লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হন। দূরদর্শী আলবেরুনী সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কোন পক্ষেই যোগাদান করেন নাই। কিন্তু উত্তরকালে মাসউদ যখন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করিয়া গজনীর সিংহাসন লাভে সমর্থ হন, তখন তাঁহার কৃপাদৃষ্টি এই বিদেশীয় পণ্ডিতের উপর বিশেষভাবেই পাড়িয়াছিল মনে হয়। আলবেরুনী তাঁহার রচিত গ্রন্থে মাসউদের যে যশোগাথা কীর্ত্তন করিয়াছেন, মরমানবের সম্বন্ধে এতদপেক্ষা উচ্চতর প্রশংসা আর কাহারও দ্বারা কখনও কীর্ত্তিত হইয়াছে কি না জানি না। সেই ন্যায়দর্শী আলবেরুনী কঠোরভাবে সুলতান মাহমুদের কার্য্যাবলীর সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। মাসউদের কতটুকু সমাদর যে তাঁহার হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। তাঁহার এই প্রশংসা হইতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি রাজকীয় বৃত্তি এবং রাজদরবারে উচ্চ সম্মান লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। আলবেরুনীর এই ভাগ্য পরিবর্ত্তনের কতকগুলি সঙ্গত কারণ রহিয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ তাঁহার প্রথম জীবনের রাজনীতি ক্ষেত্রের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হাসান মায়মুদি মাহমুদের মৃত্যুর তিন বৎসর পরেই ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। সুতরাং আলবেরুনীর উন্নতির পথ তখন সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টকই ছিল। দ্বিতীয়তঃ, সুলতান মাসউদও পিতার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী, এবং বিজ্ঞানের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি আলবেরুনী এই সুবর্ণ সুযোগ উপেক্ষা করিলেন না। তিনি অনতিবিলম্বে ফলিত জ্যোতিষ সম্বন্ধে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্বপূর্ণ একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাহার নাম রাখিলেন Canon Masudicus. তদুপরি সুলতানের উপর অপরিমিত প্রশংসা-বৃষ্টি। সুতরাং

www.pathagar.com

সুলতানের বিশেষ অনুগ্রহদৃষ্টি যে তাঁহার উপর পড়িয়াছিল তাহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই। আলবেরুনীর এই ভাগ্য-পরিবর্ত্তনের ভুরি ভুরি প্রমাণ তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যেও পাওয়া যায়।

জ্ঞানের এই একনিষ্ঠ সাধকের অসাধারণ মনীষার ছাপ জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাতেই রহিয়া গিয়াছে। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, ইতিহাস, ভূগোল, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, প্রত্যেক বিষয়ে তিনি তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলিতে রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আলবেরুনীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থ লইয়া নহে। তাঁহাকে আমরা জানি, তাঁহার রচিত গ্রন্থ Indika-র ভিতর দিয়া। এই একখানি পুস্তকেই তিনি একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ভারতবর্ষের যে চিত্র আঁকিয়া গিয়াছেন তাহা জ্ঞানের রাজ্যে সম্পূর্ণ নূতন, এবং অনুপম। তাঁহার Indika-র তুলনা Indika ; ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই প্রকার দুইখানা পুস্তক আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই।

প্রকৃত সত্যদ্রষ্টার দৃষ্টি ও সত্যানুসন্ধিৎসুর আকাঙ্ক্ষা লইয়া তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, রীতিনীতি প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হইতে যে তাঁহাকে কত নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ম্লেচ্ছ বলিয়া তাঁহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, সামান্য শূদ্র পর্য্যন্ত তাঁহার ছোঁওয়া জল ঘৃণায় পাত্র সমেত ফেলিয়া দিয়াছে, তাঁহার ছায়া স্পর্শ করাকে পর্য্যন্ত ভারতীয়েরা অকল্যাণকর মনে করিয়াছে, তবু সাধনামগ্ন তাপসের মত তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে নির্ব্বিকার ভাবে নিযুক্ত রহিয়াছেন। খোদার অপরিসীম অনুগ্রহে এবং নিজের অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় বলে পরিণামে তাঁহার এই মহতী সাধনা জয়যুক্ত হইয়াছিল। এত প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিয়াও তিনি ভারতীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, খগোল, ভূগোল, রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি প্রভৃতি জ্ঞানের প্রত্যেক শাখাতেই এত সঠিক জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, আলবেরুনী তাঁহার রচিত গ্রন্থে সাহসের সহিত বলিয়া গিয়াছেন, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা তদীয় প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট।

ভারতভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর, একদা আলবেরুনী তদীয় জনৈক বন্ধুর সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্য দর্শন ও ধর্ম্ম শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। বন্ধুটি আমাদের মেকলে সাহেবের মতই বলিলেন "বর্ব্বর জাতির ইতিহাসে ক্ষীর সমুদ্র ও দধি সমুদ্র ছাড়া আর কি আছে?" সদাশয় মহাপুরুষ একটা প্রাচীন সভ্যজাতির প্রতি এতটুকু অন্যায় উক্তি সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা বন্ধুটিকে নিরস্ত ত করিলেনই, অধিকন্তু অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ Indika লিখিয়া অনেকের ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করিলেন। তিনি ভারতীয় সমাজের ছিদ্রানুসন্ধানের উদ্দেশ্য লইয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রকাশে অগ্রসর হন নাই, তাঁহার স্বজাতীয়দের অন্ধবিশ্বাস দূরীভূত করিতেই এই মহৎ কার্য্যে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। সুতরাং তদীয় রচিত পুস্তক নিঃসন্দেহে আমাদের নিকট নিরপেক্ষতার দাবী করিতে পারে। তাঁহার Indika-র প্রতি পৃষ্ঠা তদীয় মহৎ উদ্দেশ্য পাঠকদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরে। Dr. Sachau তাঁহার এই সুবিখ্যাত গ্রন্থ সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন, 'It is like a

www.pathagar.com

magic island of quiet, impartial research in the midst of a world of clashing swords, burning towns and plundered temples.'

ভারতীয় সভ্যতার প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা লইয়াই আলবেরুনী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সুলতান মাহমুদের ন্যায় আলবেরুনীর ভারতবর্ষ শুধু পৌত্তলিকতার লীলা-ক্ষেত্রই নহে, জ্ঞানের পূণ্যভূমিও। আলবেরুনী উচ্ছ্বসিত ভাষায় ভারতীয় দর্শনের প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু এখানেও তাঁহার নিরপেক্ষ লেখনী শুধু প্রশংসা করিয়াই বিরত হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় দার্শনিকের বাগাড়ম্বর প্রিয়তার তীব্র নিন্দাও করিয়াছে। ভারতীয় পণ্ডিতেরা যেখানে এক কথায় কাজ সারিতে পারা যায় সেখানে নিতান্ত বিনা প্রয়োজনে দশটি কথা ব্যবহার করিয়া পাঠকের ধৈর্য্যের উপর হস্তক্ষেপ করেন, এই কথা তিনি বারংবার বলিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যের অতিরিক্ত অলংকার প্রিয়তাও তাঁহাকে যথেষ্ট বিরক্ত করিয়াছে। এতদ্দেশীয় ভাস্কর্য্য বিদ্যায় তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন। ভারত-বর্ষের স্নানের ঘাটের অত্যাশ্চর্য্য কারুকার্য্যের প্রশংসা তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন।

গ্রীক ও ভারতীয় দর্শনে মূর্ত্তি পূজার প্রভাব দর্শনে তিনি কতকটা হতাশ হইয়াছেন। মূর্ত্তি পূজা সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন 'The first cause of idolatry was the desire of commemorating the dead and of consoling the living ; but on this basis it has developed, and has finally become a fow and pernicious abuse.'

এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ভগবদ্গীতার অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের দুই স্থানে তিনি ব্যাসের অমূল্য উপদেশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোন কোন স্থানে হিন্দু পণ্ডিতগণের অসাধারণ পাণ্ডিত্বে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাদিগকে স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক অনুপ্রাণিত বলিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। বরাহ মিহিরের সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'বৃহৎসংহিতা'র ব্যাখ্যা লিখিতে যাইয়া তিনি সেই সুবিখ্যাত হিন্দু পণ্ডিতের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'বরাহ মিহির ঈশ্বরের নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত'। বিশ্বাসী মুসলমান হইয়াও একটা কাফেরের সম্বন্ধে এত বড় একটা কথা বলিলে আজিকার দিনে আমাদের তথাকথিত সমাজপতিরা আমাদের পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিবেন ; কিন্তু আলবেরুনীর পুস্তক পাঠে মনে হয় তাঁহার ধর্ম্ম বিশ্বাস আজিকার কোন মোমেন মুসলমানের চেয়ে কোন অংশেই দুর্ব্বল ছিল না। আলবেরুনীর ধর্ম্ম বিশ্বাস সম্বন্ধে Dr. Sachau বলেন, 'yet he was a Muslim' ; কিন্তু তাঁহার নিরপেক্ষ সমালোচনায় হিন্দু মুসলমান কেহই বাদ পড়ে নাই। তিনি একদিকে যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, বিবাহ, সাম্যবাদ, সামাজিক রীতিনীতি, ইসলাম ও বৈদিক ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয়ে তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া হিন্দুর চাইতে মুসলমানকে উচ্চে স্থান দান করিয়াছেন, তেমনি আবার অন্যদিকে সেই মুসলমানকেই ইরানীয় সভ্যতার ধ্বংসকর্ত্তারূপে কঠোর ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। সুলতান মাহমুদের আক্রমণে ভারতবর্ষ দলিত মথিত হইয়াছে, হিন্দুদের মুসলমান-বিদ্বেষের ইহা একটি বড় কারণ, একথাও তিনি বলিয়াছেন।

www.pathagar.com

আলবেরুনী ভারতীয় রসায়নের উপর কিছুতেই আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। কারণ তৎকালে ভারতবর্ষে অসংখ্য ধূর্ত্ত লোক রসায়নের নামে লোক ঠকানো ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া (যথা রসায়নের সাহায্যে রৌপ্যকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করা, বৃদ্ধকে যৌবন দান করা ইত্যাদি) বিজ্ঞানের এই মহতী শাখাকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল যে, কোনটা বিজ্ঞান আর কোনটা জুয়াচুরি তাহা ধরিবার কোনই উপায় ছিল না। কিন্তু তৎকালীন ভারতীয় রাজন্যবর্গ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এমন সব তথাকথিত রসায়নিকেরও যথেষ্ট সমাদর করিতেন। এতৎপ্রসঙ্গে আলবেরুনী লিখিয়াছেন, 'The greediness of the ignorant Hindu princes for gold making does not know any limit.'

বহুদিন পরে মেকলে সাহেব সংস্কৃত সাহিত্যের যে 'ক্ষীর সমুদ্র ও দধি সমুদ্র' নিয়া মাথা ঘামাইয়াছেন, অনুসন্ধিৎসু আলবেরুনীর দৃষ্টিও তাহার উপর পড়িয়াছিল। বস্তুতঃ ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদের অদ্ভুত জ্ঞান তাঁহাকে একান্ত নিরাশ করিয়াছে। তিনি তাঁহার Indika-র এক জায়গায় এই প্রকার এক ভূতত্ত্ববিদ্‌কে পরিহাস করিয়া লিখিয়াছেন, 'We, on our part, found it already trouble some enough to enumerate all the seven seas, together with the seven earths, and now this author thinks he can make the subject more easy and pleasant to us by inventing some more earths below those already enumerated by ourselves.'

আলবেরুনী বর্ত্তমানকালের ভাষাতত্ত্ববিদের মত সম্পূর্ণ বৈজ্ঞনিক প্রণালীতে প্রাচীন ভারতের অনুলিপি প্রণালীর তীব্র আলোচনা করিয়াছেন। অনেক পাণ্ডুলিপির বিশুদ্ধতায় তিনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া অনেক বিকৃত শব্দের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ আলোচনা করতঃ যথাসম্ভব সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছেন। অনেক স্থলেই অনুলেখকের অমনোযোগিতা ও অজ্ঞতার দরুন মূল গ্রন্থের অনেক স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন 'ভারতীয় গ্রন্থরাজি যদি এইভাবে অনুলিখিত হইতে থাকে তবে অনতিবিলম্বেই গ্রন্থকারগণ নিজ নিজ গ্রন্থ চিনিতে পারিবেন না।' তাঁহার এই অনুমান পরবর্ত্তীকালে অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

সমালোচনার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও তিনি হয়ত ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইয়াছেন ; বিশেষতঃ ব্রহ্মগুপ্তের বেলায় তাঁহাকে আমরা হয়ত পুরোপুরিভাবে সমর্থন করিতে পারি না। কিন্তু আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে যেই যুগে আলবেরুনী এই সমস্ত সমালোচনা করিয়াছেন, সেই যুগে ভারতবর্ষে সংস্কৃত শিক্ষা সহজ ব্যাপার ছিল না। তৎকালে অলঙ্কার ও শব্দাড়ম্বরের কাঁটাবন আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কুসংস্কারের বিরাট প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যের কমল-বনে পুরোপুরি প্রবেশ করা এক প্রকার অসম্ভব ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিশেষতঃ আলবেরুনী যাহা শিখিয়াছিলেন এবং তাঁহার অমূল্য গ্রন্থাবলীতে আমাদিগকে যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহা অসাধারণ, এবং তিনি ছাড়া বোধ হয় আর কেহই এমন দুরূহ কার্য্য এমন সুন্দরভাবে সমাধা করিতে পারিতেন না।

www.pathagar.com

তিনি ভারতীয়দের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে যাইয়া মামুলি কথায় পাঠকের মনস্তুষ্টি সাধনে প্রয়াস পান নাই। পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহাদের সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার লিখিত কথার যাথার্থ প্রমাণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের আলোচনা করিতে যাইয়া প্রথমতঃ তিনি সেই প্রশ্ন দ্বারা নিজে কি বুঝেন, দ্বিতীয়তঃ সেই সম্বন্ধে হিন্দুদের কি মত, তাহাদের সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম শাস্ত্র, ফলিত জ্যোতিষ ইত্যাদি তৎসম্বন্ধে কি বলে, এবং তৃতীয়তঃ, তিনি নিজের চোখে ভারতীয় সামাজিক আচার ব্যবহার কি দেখিয়াছেন ও লোক মুখে কি শুনিয়াছেন, তৎসমুদয় সরল সতেজ ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

অনেক স্থলেই বর্ণিত বিষয় বিদেশীয় পাঠকের নিকট সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য প্রাচীন গ্রীস ও অন্যান্য দেশীয় অনুরূপ বিষয়ের সহিত তাহার তুলনা করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে গ্রীক সাহিত্য, ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, দর্শন-বিজ্ঞান, চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতিতে তাঁহার অগাধ জ্ঞান বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। বস্তুত কোন একটি বিষয় তিনি উল্লেখ মাত্র করিয়াই বিরত হন নাই, প্রকৃত সমালোচকের দৃষ্টিতে তাহার দোষ গুণ, সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন।

আলবেরুনীর গ্রন্থাবলী প্রধানতঃ জ্যোতির্ব্বিদ্যা, গণিত শাস্ত্র, Chronology (কাল নির্ণয়), ইতিহাস, গাণিতিক ভূগোল, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন শাস্ত্র, ভাষাতত্ত্ব, গতিবিজ্ঞান, খনিজ বিজ্ঞান ও আলোক বিজ্ঞান সম্বন্ধে লিখিত, এতদ্ব্যতীত তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রায় কুড়িখানা মৌলিক ও অনুবাদ গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। এই সুজলা সুফলা ভারতভূমি একদিন মহাসমুদ্রের অতল তলে নিমজ্জিত ছিল, আজ যেখানে হিমালয়ের অত্যুঙ্গ শিখর আকাশ স্পর্শ করিতে চলিয়াছে হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে সেখানে সমুদ্রের গভীর গর্জ্জন শ্রুত হইত, ভূতত্ত্ববিদের এই বিচিত্র বার্ত্তা আলবেরুনীই সর্ব্বপ্রথম জগতের সমক্ষে প্রচার করেন। ইরান ও ভারতীয় প্রাচীন কথাসাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁহার কয়েকখানি উপাদেয় পুস্তক পাওয়া যায়। ডাক্তার সেচো আলবেরুনীর লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলির প্রসঙ্গে আরও দুইখানা অমূল্য গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন—ইহার একখানা আলবেরুনীর জন্মভূমি খীভের ইতিহাস ও আর একখানা কার্ম্মাথিয়ানদের ইতিবৃত্ত। পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, এই দুইখানা অমূল্য গ্রন্থই আজ আর পাইবার কোন উপায় নাই।

ধর্ম্মনৈতিক ও দার্শনিক চিন্তার রাজ্যে আলবেরুনী সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছেন। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন তাহা স্পষ্ট ও জ্বলন্ত ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, 'He abhors half truths, veiled words and wavering action.' তাঁহার রচিত গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় তিনি আত্ম বিশ্বাসকে বীরপুরুষের মত সরল ও সতেজ ভাষায় রূপদান করিয়াছেন। শুধু ধর্ম্মনীতি ও দর্শনেই নহে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি অকুতোভয়ে নিজের মত ব্যক্ত করিতেন। রাজনীতিক হিসাবে তিনি রক্ষণশীল দলের ছিলেন, এবং রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির মিলনের জন্য আজীবন সাধনা করিয়া গিয়াছেন। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, 'This union represents the highest development of human society, all that man can desire'.

www.pathagar.com

মুসলমান হইয়াও তিনি খৃষ্টান ধর্ম্ম শাস্ত্রের জ্ঞানগর্ভ সরল নীতি বাক্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু সেই মুগ্ধতা তাঁহার সত্যদৃষ্টিকে কখনো আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। 'তোমার এক গালে চপেটাঘাত করিলে আরেক গাল পাতিয়া দাও', 'শত্রুকেও আশীর্ব্বাদ কর', ইত্যাদি সহজ ও সরল কথার অভ্যন্তরেও অনেক বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জগতের সমস্ত লোকই দার্শনিক নহে। তাহারা ভুল করে ; তাহারা ইচ্ছা করিয়া পাপের পথে যায় ; তাই ত তাহাদিগকে শাসনে রাখিতে Penal Code ও তরবারির প্রয়োজন হয়। অতি বড় দার্শনিক পণ্ডিত হইয়াও এতটুকু দুনিয়াদারী বুদ্ধি তাঁহার ছিল। খলিফা মাবিয়া সিসিলি দ্বীপের স্বর্ণ নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তিগুলি মাহমুদের মত ধ্বংস না করিয়া সিন্ধুরাজের নিকট প্রচুর অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করিয়াছিলেন বলিয়া আলবেরুনী তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তিনি যদিও ধর্ম্মনীতি আর রাজনীতির মিলনের জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়াছেন, এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত খাঁটি মুসলমানের জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তথাপি তথাকথিত আলেমগণ কর্তৃক মুসলমানের স্বাধীন চিন্তার উপর অন্যায় আক্রমণের তীব্র নিন্দা করিতেও ছাড়েন নাই।

তিনি পরের সম্বন্ধে যেরূপ কঠোর বিচারক ছিলেন নিজের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। নিজে যেমন একান্ত সরল ছিলেন, অন্যের নিকট হইতেও তদ্রূপ সরলতাই দাবী করিতেন। তাঁহার এই অনন্যসুলভ সরলতা Indika-র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিদ্যমান। যেখানেই তিনি কোন বিষয় বুঝিতে পারেন নাই সেখানেই সরলভাবে তাহা স্বীকার করিয়াছেন ; এবং নিজের অজ্ঞতার জন্য হয় পাঠকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, অথবা ৫৮ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ হইয়াও সেই সম্বন্ধে ভবিষ্যতে গবেষণা করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাঁহার এই অদম্য জ্ঞানপিপাসা বাস্তবিকই বিস্ময়কর।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রকৃত সত্যানুসন্ধিৎসার প্রেরণায় আলবেরুনী ভারতীয় পৌত্তলিকের ধর্ম্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং প্রকৃত সত্যদ্রষ্টার দৃষ্টিতেই তিনি এই সকলের সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। জাতি, দেশ বা ধর্ম্মের কোন বাধা তাঁহার সত্যানুসন্ধিৎসার পথে দাঁড়াইতে পারে নাই। তিনি বিশ্বাসী মুসলমান হইয়াও ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ পৌত্তলিকতার আলোচনায় জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি কাটাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের মধ্যে প্রয়োজন হইলে তিনি কোরান ও বাইবেলের উক্তি পাশাপাশি উদ্ধৃত করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। এই সমস্তই কি আলবেরুনীর উদারতার ও নিরপেক্ষতার যথেষ্ট প্রমাণ নহে?

এই মনীষী তাঁহার Indika-র এক স্থানে ভারতীয়দের সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, এই জাতির পতন অনিবার্য্য কারণ ইহারা মনে করে, ভারতের বাহিরে কোন জ্ঞান নাই। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার এই ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। জ্ঞানের রাজ্যে উদারতার আশ্রয় লইয়া প্রাচীন ভারতে হিন্দুজাতি উন্নত হইয়াছিল, আবার জ্ঞানের রাজ্যে ভূগোলের সৃষ্টি করায় পরবর্ত্তীকালে হিন্দুর পতন হইয়াছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, যেই মুসলমান সমাজে আলবেরুনীর মত উদার হৃদয় জ্ঞানসাধকের আবির্ভাব

www.pathagar.com

সম্ভবপর হইয়াছিল সেই মুসলমান সমাজও আজ আর নাই। ইসলামের প্রাথমিক যুগে আলবেরুনীর মত শত শত উদার হৃদয় মনীষী মোসলেম চিন্তাজগতে নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই গৌরবময় জাতীয় জীবনের অতীত দিন আজ আমরা কল্পনার চোখেই নিরীক্ষণ করি। অনেক দিন হইতে সংকীর্ণতার কারা প্রাচীরে আমাদের চিন্তাশক্তি বন্দিনী হইয়া রহিয়াছে। কবে, কাহার কঠোর শাবলাঘাতে, এই কারা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে, কবে আমাদের চিন্তাশক্তি বাহিরের মুক্ত আলো বাতাসে আবার বাহির হইবে ? জানি না, সে কবে !

—

www.pathagar.com

ইউরোপে এখানে ওখানে কিছুদিন

আবদুল হাকিম এম. এ. (ঢাকা), বি. এ. (ক্যান্টাব)

একদিন ছিল যখন আমাদের কেহ কেহ ইউরোপকে বেশ একটু সম্মানের দৃষ্টিতে দেখিতেন, যাহা কিছু ইউরোপীয় তাহার সবই নির্ব্বিচারে উত্তম ও অনুকরণীয় এই ছিল তখন ভাব। আজ নানা কারণে আমাদের সে সম্মোহন কাটিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় রীতিপদ্ধতিকে আমরা সকল দিক দিয়া সমালোচনা করিতে শিখিয়াছি। আজ আমরা যাহারা ইউরোপে যাই প্রায় সকলেই দৃষ্টিকে যথাসম্ভব খোলা রাখিতে চাই এবং এমন কিছু প্রায়ই আশা করি না যাহা একেবারেই আমাদিগকে অবাক করিয়া দিতে পারে। যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রধানতঃ ইউরোপীয়দের চেষ্টায় উন্নত, তাহা এবং ইউরোপের জাতীয় জীবনের সুশৃঙ্খলা ও কর্ম্মপ্রাণতা, আমাদের সাগ্রহ ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি পায়, কিন্তু সেখানকার সমাজ জীবনের অনেক কিছু গলদকে আমরা গলদ বলিয়াই জানি।

আমার ইউরোপ-প্রবাসের প্রায় দু বৎসর ইংল্যান্ডে ও শেষ তিন মাস মাত্র (বিগত গ্রীষ্মের সময়) মধ্য ইউরোপের কয়েকটি দেশে কাটিয়াছে। ইংল্যান্ডের প্রথম অভিজ্ঞতার বিষয়ে আমি এর আগে কোন কোন জায়গায় লিখিয়াছি। তবে তার থেকে একটু বেশী বলা আবশ্যক, তাইই মাত্র এইখানে বলিতে চাই। ওদেশে পদার্পণ করিলেই নবাগতের চোখে যে সব বিষয় বেশ একটু জোর নজরে পড়ে তার দু'একটি হল এই—ওদের জাতীয় জীবনের চমৎকার কর্ম্মপ্রণালী (বা ইংরাজী কথায় organisation ও discipline) এবং পারস্পরিক ব্যবহারের ভদ্রতা। মুটে মজুরেরা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া কখনও দাম চায় না, ইচ্ছামত দিতে হয়—ভুলচুকে না দিলেও মুখে কিছু বলে না। দোকানে দরদস্তুর নাই বলিলেই চলে, ঠকাবার উদ্দেশ্যে জিনিষে ভেজাল একেবারেই অজানা, দৈনন্দিন ব্যাপারে সাধুতার পরিচয় প্রায় সর্ব্বত্র পাওয়া যায়—যদিও Hatry case-এর মত লাখ লাখ টাকার জুয়াজুরির মত ঘটনাও কখনও কখনও দেখা যায়। যখন যেখানে যে পরিবারে থাকিয়াছি, সকলের ব্যবহারে মনে হইয়াছে যেন নিতান্ত আপনার লোকের মধ্যেই আছি—অবশ্য বিলের টাকা দেবার সময় কিন্তু এ মন্তব্য খাটে না।

জীবনের প্রায় সকল ব্যাপারে নারীর অপ্রতিহত কিন্তু নিতান্ত স্বাভাবিক প্রভাব বোধ হয় আমাদের চোখে প্রথমতঃ বেশ একটু বড় হইয়া দেখা দেয়। এর কারণ আমাদের নিজের দেশে বা সমাজে নারীদের যারপরনাই অস্বাভাবিক অবস্থা। দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ প্রভৃতিতে বেশীর ভাগ কাজই মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত হয়। লেকচার রুমে ও সিনেমা-থিয়েটারে পুরুষ ও নারী এক সঙ্গে পাশাপাশি থাকে। সাধারণ কাজকর্ম্ম উপলক্ষে পুরুষের চেয়ে নারীর সংস্পর্শেই যেন বেশী আসিতে হয়। সংখ্যাধিক্যবশতই হউক বা অপর কারণেই হউক

www.pathagar.com

বিলাতী পুরুষের চেয়ে নারীই যেন সাধারণতঃ কিছু বেশী সভ্যভব্য বলিয়া মনে হয়। সকল সময়ে সকল অবস্থায় হাসিমুখে নম্রভাবে কথা বলা এঁদের মজ্জাগত অভ্যাস। আমরা এত দূর থেকে বিলাতী নারীর যেরূপ নিন্দা সচরাচর শুনিয়া থাকি তার সবটুকু মিথ্যা ও সবটুকুই সত্য বলিয়া মনে হয় না। মেয়েদের সংখ্যাধিক্য, সাধারণ লোকের মধ্যে অর্থনৈতিক কারণে বিবাহের সংখ্যাল্পতা, দেশীয় আইনানুসারে বারবণিতা শ্রেণীর অভাব ইত্যাদি কারণেই হয় ত আমাদের দেশের Standard অনুযায়ী বেশ একটু বিসদৃশ কিছু সময়ে সময়ে চোখে পড়ে।

অনেকেই আজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বিলাতে আমরা অর্থাৎ ভারতীয়রা কিরূপ ব্যবহার পাই। এ কথার খুব সোজাসুজি উত্তর দেওয়া হয়ত ঠিক হইবে না। কারণ দেশ-কাল-পাত্রের উপর এর উত্তর অনেকটা নির্ভর করে। অক্সফোর্ড কেমব্রিজে দেশী-বিদেশী সকল ছাত্রেরই বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সমান অধিকার—এবং অশ্বেত বলিয়া কেহ এখানে খারাপ ব্যবহার পায় বলিয়া বড় একটা শোনা যায় না। তবে বিলাতের আপামর সাধারণ আমাদিগকে অন্তরের সঙ্গে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে, এ কথা আমি হলফ করিয়া বলিতে পারি না। আমাদের গাত্র বর্ণের চেয়ে আমাদের রাষ্ট্রীয় হীনাবস্থা বোধ হয় এর বৃহত্তর কারণ। কিন্তু এর সব চেয়ে বড় কারণ আমার মনে হয় আমাদের দেশ সম্বন্ধে বিলাতীদের নিদারুণ অজ্ঞতা। অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিতদের না হয় বাদই দিলাম—শিক্ষিতেরাও ভারত ও ভারতীয়দের সম্পর্কে খুব সামান্যই জানে বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশের সর্ব্বত্র সাপে-বাঘে ভরা, আমরা কাপড় বা বিছানা কখনই ধুইয়া ব্যবহার করি না, এবং রাম-রাজ্যের সকল রকম সুখসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের fanatics-এর দল শ্বেতাঙ্গদের দেশ-ছাড়া করিবার জন্য কেন এমন হৈ চৈ করে—ইত্যাদি কথা ইউনিভার্সিটির শিক্ষকদের মুখেও শুনিয়াছি। বস্তুতঃ ভারত সম্বন্ধে কোন কিছু শিক্ষা দিবার সাধারণ ব্যবস্থা বিলাতের শিক্ষা পদ্ধতির কোথাও নাই—শুধু Sensation monger ও খবরের কাগজ থেকেই এরা প্রধানতঃ আমাদের কথা জানে।

মুখ্যভাবে ভারতীয়েরা যেখানে সেখানে, যখন তখন খারাপ ব্যবহার পায় এমন কথা বলিতে পারি না। তবে আমার জানা অনুসারে দু'একটা তেমন নমুনা দিতেছি। আমাদের মধ্যে যাঁহাদের চেহারা একটু কালো অনেক সময়ে পথে ঘাটে নিম্নশ্রেণীর ছোট ছোট ছেলে মেয়ের দল তাঁহাদিগকে 'ব্লাকি-ব্লাকি' বলিয়া খেপাইতে চেষ্টা করে দেখা যায়। একবার আমাদের একজন রাত্রি গোটা দশেকের সময় academic dress পরিয়া Cambridge-এর পথে একা যাইতেছিলেন—রাস্তার এক জায়গায় ৫/৭ জন ওদেশী অকর্ম্মা গোছের লোক জটলা পাকাইতেছিল। ভারতীয়কে দেখা মাত্র তাদের একজন মাথা থেকে তাঁর টুপিটা টান মারিয়া রাস্তার এক জায়গায় ফেলিয়া দিল! বছরখানেক আগে কেমব্রিজের কাছে এক জায়গায় একটা উড়োজাহাজের কসরত হয়। তাহা দেখিবার জন্য আমাদের সকলের সুপরিচিত জনৈক সুপ্রবীণ বাঙ্গালী সিভিলিয়ান, তাঁহার ছেলে (যিনি Cambridge-এ পড়েন) ও আমি এই তিনজন এক সঙ্গে যাই। অন্যান্য উড়োজাহাজের সঙ্গে সেখানে একটা খুব বড় বিশেষ রকমে তৈরী উড়োজাহাজ প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ প্রকাণ্ড উড়োজাহাজের

www.pathagar.com

ভিতরের অংশটা অনেকেই ভিতরে যাইয়া দেখিতেছিল। উড়োজাহাজের চার্জ্জে যে এক ব্যক্তি ছিল সে অত্যন্ত সমাদরে সমস্ত দেখাইতেছিল। কিন্তু আমরা তিনজন ভারতীয় যখন ভিতরে উঠিয়া দেখিতে চাহিলাম তখন সে অম্লান বদনে আমাদিগকে উঠিতে দিবে না বলিল। আমাদের সিভিলিয়ান মহোদয়–এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "I wont allow you, thats final."

বিগত জুলাই মাসের প্রথমেই ইউরোপে কিছু দিন ঘুরিবার উদ্দেশে যাত্রা করি। সর্ব্বপ্রথমেই বার্লিন।

বার্লিন অত্যন্ত আধুনিক নগর। অধিকাংশ রাস্তারই দু'ধারে সারি সারি বড় বড় গাছ—প্রধানতঃ Linden বা 'লাইম' গাছ। স্কোয়ার ও খোলা জায়গার সংখ্যা খুব বেশী—ফুলের গাছ, লতা–বীথিকা, প্রশস্ত পায়ে–চলার পথ ও বহু সংখ্যক বেঞ্চি, কৃত্রিম সরসী, এ সকলের বিশেষত্ব। প্রধান রাজপথগুলি খুবই চওড়া। এই সব বড় বড় রাস্তার মাঝখান দিয়া নানা রং এর পুষ্পবেদী, বসবার বেঞ্চি ইত্যাদি রয়েছে—সমস্ত রাস্তাটাকে যেন এক সুদীর্ঘ বাগান বলিয়া মনে হয়।

পরিষ্কার–পরিচ্ছন্নতা জার্ম্মানদের একেবারেই মজ্জাগত। রাজপথগুলি প্রত্যহ ধুইয়া একেবারে নির্ম্মল করিয়া রাখা হয়। নোংরা কাপড়চোপড় পরা লোক পথে ঘাটে দেখিতে পাইলে বিস্ময়ের ব্যাপার মনে করিতে হইবে। স্টেশন বা পথে এক টুকরা কাগজ পর্য্যন্ত ফেলিয়া ধরা পড়িলে তৎক্ষণাৎ দুই মার্ক বা প্রায় দেড় টাকা জরিমানা দেওয়া আইনের বিধি। দেখিতে খারাপ হইবে বলিয়া পথের যেখানে সেখানে বা দেওয়ালের গায়ে পোস্টার বা বিজ্ঞাপন লটকাইতে দেওয়া হয় না এ জন্য জায়গা বিশেষে মোটা মোটা স্তম্ভ রহিয়াছে।

এই সময় বার্লিন ইউনিভার্সিটির Deutsches Institut Fur Austander-এ বিদেশীয়দের জন্য Summer Course পড়ানো শুরু হইতেছিল। জার্ম্মান ভাষায় কিঞ্চিৎ দখল লাভের জন্য ও ভিতর থেকে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় একটু দেখবার জন্য এতে যোগ দেওয়া গেল। দেখা গেল দুনিয়ার প্রায় সকল সভ্য দেশের লোকেই ইহাতে যোগ দিয়েছেন। প্রাচ্য দেশের মধ্যে বিশেষ করিয়া চীনা ও জাপানীদের সংখ্যাই বেশী। ভারতীয় জনকয়েক ছিলাম। যে সকল বিদেশীয় শিক্ষালাভের জন্য জার্ম্মানীতে আসেন তাঁদের অনেকেই প্রথমে এই Summer Course-এ যোগ দিয়া থাকেন। শুধু জার্ম্মান ভাষাই এতে শিক্ষা দেওয়া হয় না—জার্ম্মান সাহিত্য, সভ্যতা, শিক্ষা–পদ্ধতি, চারু–শিল্প, প্রভৃতি অনেক বিষয়েই বক্তৃতা হয়। ছয় সপ্তাহে full course—দক্ষিণা ছয় পাউন্ড বা ১২০ মার্ক। আরম্ভেই একদিন সকল সভ্যকে আহূত করিয়া এক সভা হইল। তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় অধ্যাপক ঐ ইনষ্টিটিউটের উদ্দেশ্য বিশদরূপে বুঝাইয়া দিলেন। জার্ম্মান সভ্যতা ও শিক্ষার সঙ্গে বিদেশীয়দের কিঞ্চিৎ পরিচয় লাভের সুযোগ করিয়া দেওয়ার জন্যই এর অস্তিত্ব। এই সভার শেষে কিছু আহার্য্যেরও যোগাড় ছিল—তার ব্যবস্থা একটু অদ্ভুত রকমের—নানা রকমের খাদ্য ও পানীয় মজুদ আছে—কিন্তু পরিবেশন করিবার জন্য কেউ নাই—স্বহস্তে ইচ্ছামত নিয়া খাইতে হইল।

www.pathagar.com

এই সময় রবীন্দ্রনাথ বার্লিনে ছিলেন, এবং তাঁহার স্বহস্ত অঙ্কিত প্রায় ৯০ খানি জল চিত্র লইয়া একটি চিত্র প্রদর্শনী খুলিয়াছিলেন। তাঁহার ছবিগুলির বিশেষত্ব সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার যোগ্যতা নাই ; তবে বহু জার্ম্মান যুবক যুবতীদের অত্যন্ত মনোযোগের সহিত ছবিগুলির অনুকরণ করিতে দেখিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের দুইটি সভায় উপস্থিত থাকিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। উহার প্রথমটি একটি পার্টির ধরনের ছিল—তিনি যে বাড়ীতে ছিলেন সেইখানেই উহার অধিবেশন হইয়াছিল। বার্লিন হইতে মাইল কয়েক দক্ষিণে 'বিখ্যাত বিদেশীয়দের অভ্যর্থনা মন্দির' নামক বাড়ীতে তিনি অবস্থান করিতেছিলেন—রবীন্দ্রনাথের দশ বৎসর পূর্ব্বের জার্ম্মানী ভ্রমণ ও বর্ত্তমান ভ্রমণের অভিজ্ঞতার পার্থক্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি প্রায় ঘণ্টাখানেক ইংরেজী ভাষায় কিছু বলিলেন। ভারতবাসীদের জার্ম্মানীর প্রতি বিশেষ আকর্ষণের কারণ বলিতে যাইয়া তিনি বলিলেন যে, জার্ম্মান জাতি ভারতীয় সভ্যতা ও কালচার সম্বন্ধে আলোচনার জন্য যেরূপ আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন—কোন পাশ্চাত্য জাতিই তাহা করেন নাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রশংসা করিয়াই বিরত হন নাই। ইউরোপ কিরূপে প্রাচ্যের নিকট তাহার স্বার্থের মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছে তাহা তিনি সুন্দরভাবে বলিলেন। একদিন ছিল যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতা প্রাচ্যকে মুগ্ধ করিয়াছিল—যখন পাশ্চাত্যের স্বার্থের রূপ ইহার পিছনে অজানাভাবে লুক্কায়িত ছিল। আজ প্রাচ্যের সে মোহ কাটিয়া গিয়াছে। কোন কোন পাশ্চাত্য জাতি কিরূপ বীভৎসভাবে প্রাচ্যজাতিসমূহকে আপন আপন স্বার্থের আবেষ্টনে নিষ্পিষ্ট করিবার প্রচেষ্টায় আছে—তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি এই বলিয়া অনুযোগ করিলেন যে, জার্ম্মানীর তরুণের দল কেন এই অন্যায় আচরণ বিনা প্রতিবাদে শুধু দেখিয়া যাইতেছেন। রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শেষে জনৈক জার্ম্মান অধ্যাপক এই অনুযোগের প্রত্যুত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন যে জার্ম্মান জাতি বিশেষত তরুণ দল, সাক্ষাৎভাবে প্রাচ্যের প্রতি পাশ্চত্যজাতিদের দুর্ব্ব্যবহারের কোন কিছু প্রতিবাদ করিবার মত অবস্থায় না থাকিলেও ভারতের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত আছে।

রবীন্দ্রনাথের আর একটি বক্তৃতা বার্লিন ইউনিভার্সিটিতে প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি 'The Principles of Art' বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা পাঠ করেন। এই সভা 'বিখ্যাত বিদেশীয়দের অভ্যর্থনা সমিতি'র তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত হয়। প্রবেশমূল্য থাকিলেও গ্যালারী সম্বলিত সুবৃহৎ বক্তৃতা গৃহ যাহাকে বাংলা ভাষায় বলে তিল ধারণের স্থান তাহাও ছিল না। শতকরা কয়জন জার্ম্মান শ্রোতা রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী বা দর্শন বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিতে পারি না—কিন্তু ঘণ্টা দেড়েকের জন্য জনাকীর্ণ গৃহে শুধু রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ ব্যতীত টু শব্দমাত্র হয় নাই। আশ্চর্য্য সুশৃঙ্খলা ও আত্মসংযম জার্ম্মান চরিত্রের এক মস্ত বড় বিশেষত্ব।

নূতন স্থানের ভ্রমণকারী মাত্রেরই যেটা প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া দেখা যায়—অর্থাৎ ঐতিহাসিক স্থান মিউজিয়াম, চিত্রশালা, প্রদর্শনী, নূতন বা পুরাতন রাজপ্রাসাদ, শিক্ষানুষ্ঠান, প্রভৃতি পরিদর্শন করা—ইহার সবগুলিই অল্প বিস্তর দেখা শোনা করিয়া থাকিলেও এইখানে তৎসম্পর্কে বিশেষভাবে কিছু বলিতে চাই না। এজন্য অবসর ও যোগ্যতা সম্প্রতি দুয়েরই প্রবল অভাব। বার্লিনে এ সকলই প্রচুররূপে বিদ্যমান। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে প্রাসাদে

www.pathagar.com

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ কাইজার ও কাইজারিগণ বিরাজ করিতেন। কাল প্রভাবে আজ তাহা কয়েক আনা পয়সার পরিবর্ত্তে সকলের জন্য অবারিত দ্বার। ভূতপূর্ব্ব সম্রাট-সাম্রাজ্ঞীর শয়নকক্ষ এবং নিতান্ত ব্যক্তিগত আসবাবপত্র পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের দর্শনের জন্য খোলা রহিয়াছে। জার্ম্মান পার্লামেন্ট বা 'রাইখ্‌স'-এর ভিতরটা দেখিয়া একটু বিশেষত্ব নজরে পড়িল। রাইখ্‌স-এর সভাপতি যে চেয়ারে বসেন প্রত্যেক দর্শকই ঐ গৃহ দর্শনকালে তাহাতে বসিবার অধিকারী। ঘন ঘন ব্যবহারে সভাপতি মহাশয়ের আসনের অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ মনে হইল। সভাপতির আসনে বসিয়া কেহ কিছু অনুপ্রেরণা পাইতে পারে—এই হয়ত এই রীতির উদ্দেশ্য।

বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জীবনযাত্রা প্রণালী ইংলন্ডের, বিশেষতঃ ইংলন্ডের পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়ের, ছাত্রদের তুলনায় খুবই সাদাসিদা রকমের বলিয়া মনে হইল। গ্রীষ্মকালে ছাত্রদের অনেকেই কোট না পরিয়া শুধু সার্ট বা পুলোভার পরিয়াই ক্লাসে উপস্থিত হয়। অনেক ছাত্রের কাজ করিয়া পড়াশুনা করিতে হয়। অনেকেই হাতব্যাগে করিয়া খাবার জিনিষ ইউনিভার্সিটিতে লইয়া আসে, ক্লাস শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি কার্য্যস্থলে যাইবার কালে রাস্তায় খাইতে থাকে—কোনো কোনো ছাত্রদেরও এরূপ করিতে দেখিয়াছি। যাহারা কিছু বেশী পয়সা যোগাইতে পারে তাহাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব খাবার রেস্তোরা আছে। তথায় অপেক্ষাকৃত সস্তায় খাবার জিনিষ মিলে। ইউনিভার্সিটির ক্লাস সকাল ৯টা হইতে রাত্রি ৭/৮টা পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। শুধু ডক্টরেট ছাড়া বার্লিন (বা জার্ম্মানীর অন্য কোন) বিশ্ববিদ্যালয়ে অপর কোন ডিগ্রির ব্যবস্থা নাই। কোন ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে ছাত্রের চেয়ে ছাত্রের Supervising শিক্ষকেরই বেশী বদনাম হয়। ডিগ্রি পরীক্ষার পরীক্ষক নির্ব্বাচনেও পরীক্ষার্থী ছাত্রের অভিমত লওয়া হয়। বস্তুতঃ স্বাধীনভাবে ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুরণ করিতে সাহায্য করাই যেন জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়—শিক্ষা প্রণালীর প্রধানতম লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। আমাদের দেশের মত রুচি ও যোগ্যতা-ভেদ ও নির্ব্বিশেষে সকলকে এক ছাঁচে ঢালাই করিয়া ডিগ্রির ছাপমার্কা দিয়া চালান দিবার নিরর্থক চেষ্টা তথায় নাই।

এই সময়ে ড্রেসডেনে একটি আন্তর্জ্জাতিক স্বাস্থ্য প্রদর্শনী হইতেছিল। ইউরোপের সর্ব্বত্র এই বিষয়ে বহুল বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল। এই প্রদর্শনী দেখিবার উদ্দেশ্যে বার্লিন ছাড়িয়াই ড্রেসডেনে চলিলাম। দুই একদিন হোটেলে থাকিয়াই প্রদর্শনী দেখিয়া চলিয়া যাইব এই ছিল ইচ্ছা। কিন্তু দৈবক্রমে এক ক্ষুদ্র কিন্তু বিশেষ ভদ্র জার্ম্মান পরিবারে আশ্রয় পাইলাম, এবং প্রদর্শনীও এত চমৎকার লাগিল যে, দু'একদিনের জায়গায় ড্রেসডেনে আট দিন থাকিয়া গেলাম। ঐ প্রদর্শনীটি দেখিলে জার্ম্মান জাতির কার্য্যতৎপরতা, সুশৃঙ্খলা, বিজ্ঞানস্পৃহা প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে মনে না উঠিয়াই পারে না। প্রদর্শনীর বিষয় মাত্র একটি অর্থাৎ স্বাস্থ্য—কিন্তু উহার আয়তন এত বড় যে প্রদর্শনীর এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইবার জন্য মিনিয়েচার রেল লাইন পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। অল্প এবং মাঝামাঝি খরচে স্বাস্থ্যপ্রদ বাড়ী কিরূপে প্রস্তুত করা যায় তাহার আদর্শ মাত্র দেখাইবার জন্য দশ/বারোখানা আস্ত দালান সকল আসবাবপত্রে সজ্জিত করিয়া বাগবাগিচাসহ প্রস্তুত করা হইয়াছে। ঐ আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনীতে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেরই কিছু কিছু প্রদর্শন হইয়াছিল। তজ্জন্য রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও তুরস্কের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাশিয়া হইতে ঐ দেশের

www.pathagar.com

সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিমূলক এত চমৎকার নিদর্শনসমূহ দেখান হইয়াছিল যে, তাহাতে এত দিন ইংল্যান্ডে আসিয়া রাশিয়া সম্বন্ধে যে সকল ভয়ানক বদনাম শুনিয়া আসিয়াছি, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে বিষম সন্দেহ জাগিল।

অনেক দিন যাবৎ চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট মাসারিকের নাম শুনিয়া আসিতেছিলাম, তাঁহার একখানি জীবনচরিত পড়িয়াছিলাম। ড্রেসডেন হইতে ঐ দেশ বেশী দূর নহে। অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যবাদীদের হাত হইতে নিস্তার পাইয়া এই নূতন স্বাধীনতালব্ধ দেশ আপন ঘরের কাজ কিরূপে গোছাইয়া লইয়াছে তাহার একটু সাক্ষাৎ পরিচয় পাইবার জন্য উহার রাজধানী প্রাগে গেলাম। শুধু রাজধানীটার বর্দ্ধিষ্ণু চেহারা দেখিয়াই মনে হইল পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন করিয়া দেশটা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাচিয়াছে। এই একমাত্র শহরে নির্ম্মাণাধীন যতগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৌধ দেখিতে পাইলাম ইউরোপের আর কোথাও তেমন দেখি নাই। বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ব্যবহারেও ঐ দেশ খুব অগ্রসর হইয়াছে। দেশের যাবতীয় শিল্প ও বিজ্ঞান — প্রসূত দ্রব্য লইয়া প্রকাণ্ড নয়তলা অট্টালিকায় স্থায়ী জাতীয় প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। ঐ একটি জায়গায় কয়েক ঘণ্টা ঘুরিলেই ও-দেশের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু ঐশ্বর্য্যের যথেষ্ট চাক্ষুষ পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাগে অবস্থানকালে কথাবার্ত্তা লইয়া একটু মুস্কিলে পড়িতে হইয়াছিল। প্রাগের ভাষা চেক্--কেহ কেহ হয়ত জার্ম্মান জানে—কিন্তু ইংরাজী জানা লোক খুবই কম। হোটেলে খাওয়া দাওয়ার সময় কতকটা বরাতের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হইত।

ইউরোপ যে কিরূপে আমেরিকানদের মদিনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রাগে তাহার বেশ একটু পরিচয় পাইলাম। ইউরোপের প্রত্যেক নামকরণ শহরেই ভ্রমণকারীদের স্থানীয় দর্শনীয় জায়গা ও বস্তু দেখাইবার জন্য 'গাইড'সহ মোটর কোম্পানী আছে। প্রাগে একদিন এমন একটি গাড়ীতে চড়িয়া বাইশটি ইংরেজী-ভাষী পরিব্রাজক বাহির হইলেন—তাঁহাদের মধ্যে একশটিই মার্কিন দেশীয়, তার আবার অধিকাংশ মহিলা—এবং অবশিষ্ট একজন মাত্র এই নগণ্য ভারতবাসী। চেকোশ্লোভাকিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট উইলসনের নিকট খুব ঋণী। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য প্রাগের প্রধানতম রেলস্টেশনের নাম রাখা হইয়াছে Wilsonova Nadrezi এবং শহরের অন্তঃস্থলে উইলসনের প্রকাণ্ড প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে—তাহার পদতলে উইলসনের নিজের কথা খোদিত হইয়াছে—The world must be free for democracy.

কয়েকদিন পরেই প্রাগ ছাড়িয়া ঘণ্টা সাতেক রেলগাড়ীতে চড়িয়া ভিয়েনাতে আসিলাম। এখানে সপ্তাহখানেক কাটান গেল। ভিয়েনার স্থাপত্য শিল্প অত্যন্ত চমৎকার। এখানে দর্শনীয় ও উপভোগ্য বিষয় প্রচুর থাকিলেও আজ সে সমস্ত আমি কিছুই বলিতে চাই না। অস্ট্রিয়ার জাতীয় ভাষাও জার্ম্মান। জার্ম্মান ভাষায় অস্ট্রিয়ার নাম Deuteshes Osterreich অর্থাৎ 'জার্ম্মান পূর্ব্বরাজ্য'। জার্ম্মানীর জাতীয় কবি, দার্শনিক, চিত্রকর, সঙ্গীতকার, প্রভৃতিকে অস্ট্রিয়নেরাও আপন জাতীয় গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করে। ভিয়েনাতে গ্যোটে, শিলার, ভাগনার, স্যুবার্ট প্রভৃতির স্মৃতি মন্দির প্রচুররূপে আছে। কিন্তু জার্ম্মান জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে অস্ট্রিয়ান জাতীয় চরিত্রের অনেকটা প্রভেদ। মহাযুদ্ধের ভীষণ পরাজয়টাও যেন জার্ম্মানীর গায়ে কোন বড় রকমের আঁচড় রাখিয়া যাইতে পারে নাই—ভিতর হইতেই

www.pathagar.com

জার্ম্মানীকে এমন মনে হয়। কিন্তু রণশ্রান্তি ও পরাজয় অস্ট্রিয়াকে শুধু Politically বহুধা বিভক্তই করে নাই–অস্ট্রিয়া যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা যেন একেবারে নিৰ্জ্জীব হইয়া আছে। রাজনীতিতে আপামর সাধারণ অস্ট্রিয়ানদের নাকি মোটেই উৎসাহ নাই—কোন কোন অস্ট্রিয়ান আমাকে বলিলেন যে, এই জন্যই ভূতপূর্ব্ব কোন ছাত্রশাসক স্কুল–পণ্ডিত আজ অস্ট্রিয়ার প্রধান রাষ্ট্র শাসকরূপে বিরাজিত।

ভিয়েনা ত্যাগ করিয়া পথে দুই দিন বাভেরিয়ার রাজধানী মিউনিকে কাটাইয়া দক্ষিণ বাভেরিয়ার পাহাড়বেষ্টিত ক্ষুদ্রপল্লী অধুনা বিশ্ববিখ্যাত 'ওবেরামের গাও'তে Passion play দেখিতে যাই। এখানে বিগত তিন শত বৎসর যাবৎ প্রতি দশ বৎসর অন্তর যিশু খৃষ্টের জীবনী সম্বন্ধে একটি ধর্ম্মনাটক গ্রামবাসীদের দ্বারা অভীনীত হইয়া আসিতেছে। এবার তাহার তিন শত বার্ষিকী পূর্ণ হইল। অন্যান্য স্থানে আমরা সচরাচর যে সকল নাটকের অভিনয় দেখিয়া থাকি তাহা হইতে এই পল্লীবাসীদের অভিনীত নাটকে অনেকটা পার্থক্য আছে। শুধু রঙ্গমঞ্চের উপরেই নয় এই নাটকের অভিনেতারা বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই নাটকবর্ণিত বিষয়ের অনুরূপ অবস্থায় জীবনযাপন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। অভিনয়ের বিষয়টা নিতান্ত প্রাচীন ধরনের হইলেও অভিনয়কৌশলে ও প্রাণময়তা গুণে ইহার সফলতা বাস্তবিকই চমকপ্রদ।

'ওবেরামের গাও' ছাড়িয়া সুইজারল্যান্ডের সুপরিচিত নগর জুরিতে চলিলাম। এই পথটি এত সুন্দর যে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবার কথা। টিরল উপত্যকার উপরিস্থিত আল্পস্ পাহাড়ের উপর দিয়া রেলগাড়ী চলিয়াছে। ঠিক নীচে, অতি নীচে খরস্রোতা স্রেতস্বিনী টিরল ও টিরল উপত্যকার জনপদসমূহ। উপর হইতে ঠিক যেন একখানা প্রকাণ্ড জীবন্ত ছবির মত মনে হইতেছে।

জুরিক নগর এই নামের একটি হ্রদের তীরে অবস্থিত—অদূরে আল্পস্ পাহাড়ের আবেষ্টন। সুইজারল্যান্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা সকলের এত জানা আছে যে, এখানে আমার কিছুই বলিবার দরকার নাই। জুরিকে যে কয় দিন ছিলাম তার মধ্যে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা জুরিকের বাৎসরিক পুষ্পউৎসব যাহা আমার সৌভাগ্যবশতঃ ঐ সময় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে শহরের সমস্ত প্রধান অংশ পুষ্পে পুষ্পময় করিয়া রাখা হইয়াছিল। শ্রেষ্ঠ পুষ্প-উৎপাদকের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল। দুই দিন দুইটি প্রকাণ্ড পুষ্প-মিছিল বাহির হইল। মিছিলদ্বয় আয়তনে ঢাকার জন্মাষ্টমী মিছিলের সঙ্গে কতকটা তুলনীয়। এই মিছিলে ভারত সম্বন্ধেও একটি প্রদর্শন ছিল। একটা নকল হাতীর উপর চারিদিকে পুষ্পবেষ্টিত হইয়া কতকটা মহাত্মা গান্ধীর চেহারার অনুকরণে সাজিয়া একজন চলিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তনের দলের মত এক দল লোক ঢিলা পোষাক ও পাগড়ী বাঁধিয়া পায়ে হাঁটিয়া চলিয়াছে। এই উৎসব উপলক্ষে এক রাত্রে হ্রদের উপর খুব বাজী পোড়ানও হইল।

জুরিক ছাড়িয়াই প্যারিসে আসিয়া কয়েক দিন কাটানো গেল। প্যারিস এত কসমোপলিটন যে আমি যাহা এখানে অল্প সময়ে বলিতে পারিব—তাহার চেয়ে বেশী হয়ত সকলেরই জানা আছে। কাজেই কিছুই বলিব না।

www.pathagar.com

বিগত মহাযুদ্ধের পরেই ইউরোপের চিন্তাধারা এবং out look-এর যে অত্যন্ত দ্রুত পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, ইউরোপের আধুনিকতম চিত্র শিল্পের মধ্য দিয়া তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। বার্লিন, ড্রেসডেন, ভিয়েনা, জুরিক ও প্যারিস সর্ব্বত্রই অতি আধুনিক চিত্র প্রদর্শনী দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। এই চিত্র শিল্পের অতি সংক্ষেপে পরিচয় দিতে হইলে "free art" কথাটিই আজকাল ব্যবহৃত হয়। চিত্রকরের তুলিকাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন নৈতিক, ধর্ম্ম-বিষয়ক, বা সামাজিক বিধি-নিষেধের অস্তিত্ব আর স্বীকার্য্য নহে—এই হইল এই নব চিত্র শিল্পের মূলনীতি। এই জন্য ইউরোপের প্রত্যেক আধুনিক চিত্র প্রদর্শনীতে নগ্ন নারী দেহের সকল অবয়ব যথাযথ পরিষ্কার ভাবে অঙ্কিত করা চিত্রের সংখ্যা এত বেশী দেখা যায়। বার্লিন, ভিয়েনা ও প্যারিসের কোন কোন নৃত্যশালা এই নবনীতির অনুসরণ করিয়া আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়াছে—তথায় এই প্রকার জীবন্ত চিত্র প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

www.pathagar.com

আমাদের রাজনীতি

আবুল হুসেন এম. এ., বি. এল.

আপনারা জানেন—রাজনীতির প্রয়োজন রাষ্ট্রগঠন, সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য ; আর রাষ্ট্র গঠিত হয় বিশিষ্ট ভৌগলিক আবেষ্টন-লালিত দেশ ও অধিবাসীদের অবিচ্ছেদ্য সংযোগে। ভারতবর্ষ ও তার অধিবাসীদের অবিচ্ছেদ্য যোগে যে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে তার সংরক্ষণ ও পরিচালনার জন্য যে নীতির প্রয়োজন তাই হবে আমাদের রাজনীতি।

একই ভৌগলিক-পরিপার্শ্বর্বপুষ্ট ভূভাগের অধিবাসীদের বিভিন্ন ধর্ম্মের পোষাক পরিয়া পৃথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। একই রাষ্ট্রের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ গঠিত হতে পারে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র হতে পারে না। পৃথক পৃথক ব্যক্তির সমন্বয়ে পরিবার ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের সমন্বয়ে সমাজ এবং বিভিন্ন সমাজের সমন্বয়ে রাষ্ট্র গঠিত হয়। ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সকল মানুষ এক বৃহত্তর সমাজ বা জাতির অন্তর্ভুক্ত। কোরানে এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

সকল মানুষ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত ; সুতরাং আল্লাহ্ পয়গম্বরগণকে সুসমাচার প্রচার দ্বারা সতর্ক করতে অবতীর্ণ করেছেন ভিন্ন ভিন্ন দেশে। সুরা বকর-২১৩

কাজেই রাষ্ট্রের দিক দিয়ে ভারতবাসীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে দেখা যেতে পারে না। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী মিলে এক অখণ্ড রাষ্ট্র গঠন করেছে। ভারতবর্ষের কোলে জন্মলাভ করে বা আশ্রয় নিয়ে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান কেউই পৃথক পৃথক রাজনীতির দাবী করতে পারে না। বর্ত্তমান ভারতে মুসলমানের রাজনীতি বা হিন্দুর রাজনীতি বা মুসলমান রাষ্ট্র বা হিন্দু রাষ্ট্র বলে কোন কথা হতেই পারে না। অতএব আমাদের রাজনীতি বলতে বুঝতে হবে—ভারতের কোলে যাঁরা জন্মেছেন বা আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের 'রাজনীতি'।

এ কথার প্রমাণের দরকার নাই যে, মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিপুষ্টি লাভ করে সমাজে, এবং সমাজ পরিপুষ্টি লাভ করে রাষ্ট্রে। তাই ব্যক্তিবিশেষের চেয়ে সমাজ বড় এবং সমাজবিশেষের চেয়ে রাষ্ট্র বড়। ফলতঃ মানুষের বৃহত্তর ব্যক্তিত্ব (Greater personality of the Individual) ফুটিয়ে তুলতে হলে সুপরিচালিত রাষ্ট্রের প্রয়োজন এবং রাষ্ট্রকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল করবার জন্য সুচিন্তিত রাজনীতির প্রয়োজন।

এমন এক যুগ চলে গেছে যখন মানুষ তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আদৌ জাগ্রত ছিল না। তখন জনসাধারণ ব্যক্তিবিশেষের প্রভুত্ব স্বীকার করে চলত। যে যুগে ছিল পুরোহিতের বা দলপতির প্রাধান্য। রাষ্ট্র তখন রাজা বা পুরোহিত বা দলপতিতেই পর্য্যবসিত ছিল।

কিন্তু সে যুগ আর নাই। এখন গণশক্তি বলে একটা শক্তি রাষ্ট্রের 'প্রাণ' বলে পরিগণিত হয়েছে। একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের জন্য রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের জন্য মানুষ নয়। কাজেই

www.pathagar.com

রাজা রাষ্ট্রের দোহাই দিয়ে মানুষের উপর অন্যায় অবিচার অত্যাচার করবার ক্ষমতা আজ হারিয়েছেন। তাঁকে আজ ব্যক্তির কাছে জবাবদিহি করতে হচ্ছে, রাষ্ট্র পরিচালনায় তার পরামর্শ নিতে হচ্ছে। এতেই মানুষ তার বৃহত্তর ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি করছে এবং তাতেই তার নব জীবন চরিতার্থ হচ্ছে।

অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রের রূপ ও গঠন নিয়ে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের মাতৃভূমিতে জন্মেছে যে-মানুষ তার যে সমাজ ও রাষ্ট্র, তার রূপ ও গঠন সম্বন্ধে কিছু ইঙ্গিত করবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ভারতবর্ষ একটা প্রকাণ্ড দেশ ; নানা বর্ণের নানা গন্ধের ফুলের ন্যায় বিভিন্ন রঙের ও বিভিন্ন সৌরভের মানুষ এদেশের কোলে জন্মলাভ করে এবং আশ্রয় নিয়ে ধন্য হয়েছে।

সুজলা সুফলা এদেশ, প্রাকৃতিক সম্পদের রানী—খাদ্যের অভাব নেই, জীবনচর্চ্চায় যা কিছু প্রয়োজন তার যথেষ্ট আয়োজন এখানে আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজ এদেশের অধিকাংশ মানুষ পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না, তারা অবিকশিত অথবা বড়জোর অর্দ্ধবিকশিত মানুষনামধেয় জীবমাত্র। পূর্ণাঙ্গ মানুষের সংখ্যা এদেশে অত্যন্ত কম। কেন এ অবস্থা?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, এদেশে সকল মানুষ জীবনের প্রয়োজনে চালিত না হয়ে ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষের প্রয়োজনে পরিচালিত হয়েছে। ব্রাহ্মণ-প্রধান যুগ হতে বৃটিশ প্রধান যুগ পর্য্যন্ত এদেশে রাষ্ট্র জনসাধারণের বা গণের বৃহত্তর জীবন বিকাশে সাহায্য না করে শ্রেণীবিশেষের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অর্জ্জনে সাহায্য করেছে। ব্রাহ্মণ-শূদ্রের সম্বন্ধই এদেশের সকল রাজাই অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। মানুষ ও রাষ্ট্রের সম্বন্ধ এদেশে আজ পর্য্যন্ত মোটের উপর ব্রাহ্মণ-শুদ্রের সম্বন্ধ।

কিন্তু আজ ভারতের বাইরে অনেক দেশেই রাষ্ট্রগণের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে সাহায্য করেছে ও করছে। সে হাওয়া এদেশে এসে পৌছেছে। বৃটিশ পরিচালিত রাষ্ট্র এদেশের সাধারণ ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে বিশেষ চেষ্টা না করলেও বৃটিশ-সংস্পর্শে এসে এদেশের গণশক্তি তাজা হয়ে উঠেছে। তাই এদেশে ইদানীং রাষ্ট্রের রূপ ও বিধিবিধান পরিবর্ত্তন করবার জন্য আন্দোলন শুরু হয়েছে। বৃটিশ মোটের উপর ব্রাহ্মণ-পরিচালিত রাষ্ট্রকেই বজায় রেখে চলেছিলেন। পার্থক্য এই যে, তাঁরা শূদ্রকে ব্রাহ্মণত্ব লাভে কিছু সাহায্য করেছেন ; কিন্তু শূদ্র ও ব্রাহ্মণকে গুলিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষ করবার জন্য তাঁরা কোন বিশেষ আয়োজন করেছেন বলে আমি জানি না। ব্রাহ্মণ যেমন শূদ্রকে তার ব্যক্তিত্ব-বোধ লোপ করে দিয়ে তার উপর প্রভুত্ব করে রাষ্ট্রীয় সকল অধিকার ভোগ করতেন, বৃটিশও তেমনি দেশবাসীকে তার অধিকার সম্বন্ধে চাঙ্গা করে না তুলে তাকে রাজভক্ত করে তুলেছেন। ফলে দেশের লোক কি হিন্দু কি মুসলমান, শূদ্র হয়েই দিন যাপন করেছে, তাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় নাই, আর বৃটিশও মনের সুখে এদেশের ধন-সম্পদ আহরণ করে স্বদেশ ও স্বরাষ্ট্রের ঐশ্বর্য্য ও গৌরব বাড়িয়েছেন।

সুখের বিষয়, বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ভারতবাসী শনৈঃ শনৈঃ তার ব্যক্তিত্ব ও রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে চেতনা লাভ করেছে। শূদ্রত্ব পরিহার করে মানুষ হয়ে সে বাঁচতে চাচ্ছে। মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষায় জাগ্রত ভারতীয় রাষ্ট্রের একদল মানুষ যে আন্দোলন শুরু করেছে তার পরিপূর্ণ রূপ এখনও প্রকট হয় নাই। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এই

www.pathagar.com

আন্দোলনের ফলে ভারতবাসী পূর্ণাঙ্গ হয়ে বেঁচে থাকবার যে সব আয়োজন তা লাভ করতে সমর্থ হবে, ভারতীয় রাষ্ট্র ও ভারতীয় মানুষের যোগে সহজ সুন্দর অথচ সুদৃঢ় হবে, এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া না হয়ে সকলেরই উপভোগ্য হবে। কিন্তু সে সুদিন সহজে বা আপনা আপনিই আসবে না, তাকে আনতে হবে। সে জন্য চাই শূদ্রত্ব হতে মুক্তিলাভের যে আন্দোলন শুরু হয়েছে সে আন্দোলনকে পরিপূর্ণ ও সাফল্যমণ্ডিত করতে উঠে পড়ে লাগা।

দুঃখের বিষয়, ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীরা ভারতীয় রাষ্ট্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়েও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও সাধনাকে সন্দেহের চক্ষে দেখছেন, এবং তাঁদের সাথে বিরোধ করে বৃটিশ পরিচালকদের হাত ধরে থাকতে চাচ্ছেন। তার কারণ, তাঁরা ভারতীয় রাষ্ট্র বলে কোন আদর্শকে দেখতে চাচ্ছেন না। কিন্তু কোরানের আদর্শ অনুসারেই তাঁদের দেখা উচিত যে, ভারত ভূমির মানুষ এক জাতি, কাজেই তাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও সাধনা পৃথক করতে যাওয়া আহম্মকি। হিন্দু ও মুসলমান একই আল্লাহ্‌র প্রেরিত আদমের সন্তান, যে আদমকে তিনি পাঠিয়েছিলেন দুনিয়াতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। কোরান বলছেন—আমি পৃথিবীতে এমন একজনকে প্রেরণ করব যিনি সেখানে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবেন। —সুরা বরক ।।, ৩০

তাহলে বলতে হবে, এ ভারতে আজ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কিন্তু সে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না উভয়ের সম্মিলিত সাধনা ও শক্তি নিয়োগ ব্যতিরেকে। কিন্তু রাষ্ট্রের সাধনায় হিন্দু মুসলমানে কি সত্যকার কোন বিভেদ হতে পারে? কোরান বলছেন—যিনি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে আল্লাহ্‌র নিকট সমর্পণ করেন এবং যিনি অপরের হিত করেন তিনি প্রভুর নিকট হতে পুরস্কৃত হবেন, তিনি নির্ভয় ও দুঃখ-ক্লেশের অতীত। —কো:, ।।, ১১২।

অন্যস্থলে বলেছেন—এবং যাঁরা এক অল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করেন এবং অপরের হিতসাধন করেন তাঁরা এই স্বর্গোদ্যানে বাস করতে পারবেন এবং এখানেই তাঁরা থাকবেন।

আমার মনে হয়, কোরানের প্রচারিত ধর্ম্মের মূল শর্ত্ত হচ্ছে দু'টি, আল্লাহ্‌তে আত্মসমর্পণ উও মানুষের কল্যাণ-সাধন। যে মানুষ এই দুইটি শর্ত্ত পালন করবে তাকে মুসলমান বলে ধরা যেতে পারে। কারণ সে বেহেশ্‌তের অধিকারী। হিন্দু এক পরমব্রহ্ম বিশ্বপ্রভুতে আস্থাবান ও তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করতে সতত যত্নবান,—সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মানুষের কল্যাণ সাধনায় সহস্র অনুষ্ঠান খুলেছেন ; কাজেই কোরানের উদ্দেশ্য অনুসারে হিন্দুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকা কোন ক্রমেই উচিত হচ্ছে না। পরন্তু মুসলমানই আজ মানুষের কল্যাণ-সাধনায় পরাঙ্মুখ ও আল্লাহ্‌তে আস্থাহীন হয়ে পড়েছে। এমন অবস্থায় বৃটিশ প্রভুর হাত ধরে চলবার আশা বা প্রবৃত্তি পোষণ করে সে কিছুমাত্র উপকৃত হতে পারবে না।

বর্ত্তমান ভারতে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ। এ বিরোধের উৎপত্তি মূলতঃ বৃটিশ প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি বা Policy of administration (শাসনের রীতি), বৃটিশ বণিকেরা মুসলমানদের বদান্যতা ও উদারতার সুযোগ নিয়ে প্রতিপত্তি লাভ করতে করতে রাজত্ব লাভ করলেন। তারপর মুসলমান ক্ষোভে অভিমানে বহুদিন নূতন রাজশক্তির সাথে সাহচর্য্য না করে দূরে সরে রইল ; কিন্তু দুনিয়া এগিয়ে চলল।

www.pathagar.com

তারপর যখন হঠাৎ জেগে উঠল তখন সে দেখে—হিন্দু সমাজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তখন সে তার অনুকরণে প্রবৃত্ত হল ; সে তখন হিন্দুর মত চাকরী করতে চাইল—কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিতে হিন্দুর থেকে পিছনে থাকায় তাদের সাথে এঁটে উঠতে না পেরে সরকারের কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে হাজির হল। সরকারও দেখলেন বড় সুযোগ, তার পিঠে হাত চাপড়ে বললেন, 'বেশ, চাকরী পাবে।' তারপর রাষ্ট্রশক্তি অর্জ্জনে হিন্দু আন্দোলন শুরু করল, কিন্তু মুসলমান ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে সে-আন্দোলনে যোগ দিতে সাহস করল না। হিন্দু রাষ্ট্রশক্তি অর্জ্জন করল ; মুসলমান দেখল যে, 'আবার তারা হটে গেল।' তখন সে আবার সরকারের কাছে ভিক্ষা চাইল, 'আমায়ও কিছু রাষ্ট্রশক্তি ভিক্ষা দাও!' এমনি করে হিন্দু dynamic (সক্রিয়) সাধনার বলে সরকারের কাছ থেকে তার অধিকার আদায় করে নিচ্ছে, আর মুসলমান হিন্দুর পিছনে পিছনে সরকারের পা ধরে কান্নাকাটি করে দু'একটি অনুগ্রহ ভিক্ষা পেয়ে চরিতার্থ হতে চাচ্ছে।

এমনি করে হিন্দুর প্রতি মুসলমানের ও মুসলমানের প্রতি হিন্দুর পরস্পর বিদ্বেষ হিংসা ও ক্রোধ দিন দিন বেড়ে চলেছে। ফলে মুসলমান হিন্দুর সংখ্যাধিক্যে ভীত হয়ে সরকারের হাত আঁকড়ে ধরে শিক্ষায়, চাকরীতে ও রাষ্ট্রে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করে নিয়েছে। মুসলমান সরকারের মারফতে সর্ব্বত্র representation by religion (ধর্ম্মগত প্রতিনিধিত্ব) নীতির প্রবর্ত্তন করিয়েছেন।

এ যাবৎ এই নীতি চলে এসেছে। কিন্তু গান্ধী-আরউইন সন্ধির পর মুসলমান আবার এক নূতন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তারা দেখছে, মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রীয় আন্দোলন থেকে দূরে থাকলেও হিন্দুর সংকল্প ও সাধনা জয়যুক্ত হতে আদৌ বাধা পায় না, — লর্ড আরউইন সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছেন। এতে মুসলমান অন্তরে অন্তরে বেশ শংকিত হয়েছে। তাই একদল বলছেন, 'না, মিলনে বিপদ,—হিন্দু বিজয়-মদে মত্ত হয়ে মুসলমানকে নিষ্পেষিত করবে, সংখ্যাধিক্যের গর্ব্বে সে ন্যায় ও নীতির মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারবে না, কাজেই বৃটিশের হাত ধরে চলাই অনিবার্য্য।'

এখন কোন্ নীতি মুসলমান ভারতবাসীর পক্ষে অধিকতর কল্যাণপ্রদ, তাই হল বিবেচ্য। মুসলমান হিন্দুর স্বরাজ-সাধনায় পুরোপুরি সাহায্য না করলেও স্বরাজকে প্রতিহত করতে তার ইচ্ছা নাই। তবে তার ভয়, স্বরাজ হলে হিন্দু তার উপর অত্যাচার করবে। সে মনে করে, বৃটিশ থাকলে সে ঐ অত্যাচার হতে নিরাপদ হবে, এজন্য স্বরাজের যুগেও সে চায় তার স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখতে, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনে তার অস্তিত্ব বজায় থাকবে বলে সে বিশ্বাস করছে। বর্ত্তমানে মুসলমান কেবল স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের দাবী করেই ক্ষান্ত হচ্ছে।

এখন দেখা যাক, স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন বাস্তবিক মুসলমানকে রক্ষা করতে পারবে কি না। বাংলাদেশের কথা ধরা যাক। আজ প্রায় একুশ বৎসর স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত আছে—কিন্তু তাতে মুসলমান কি লাভ করেছে? তাদের স্বাস্থ্য, নীতি, শিক্ষা, অর্থনৈতিক পরিতৃপ্তির জন্য নানা প্রকার মঙ্গলকর আয়োজন চাই ; কিন্তু মুসলমান-নির্ব্বাচিত সভ্যগণ কয়টি আয়োজন করতে পেরেছেন? অতি সামান্য তার কারণ, হয়তো তাঁরা অকর্ম্মণ্য, অথবা হিন্দুর সাহায্য ব্যতিরেকে কোন অনুষ্ঠানই সম্ভবপর নয়। বিগত দশ বৎসর

www.pathagar.com

যাবৎ বৃটিশ পরিচালক মুসলমানের সাহায্য করেছেন, কিন্তু মুসলমান তার কোন সুযোগ নিতে পারে নাই। স্থানে স্থানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হয়েছে, শত শত মুসলমান নিহত আহত হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্র-পরিচালকগণ ত তাদের মৃত্যু ও আসন্ন ক্ষতি হতে রক্ষা করতে পারেন নাই!

মুসলমান ভিক্ষুক, কারা-নিগৃহীত, অশিক্ষিত, দরিদ্র, কিন্তু তাদের দারিদ্র্য, মূর্খতা ও দুঃখ দূর করবার জন্য বিদেশীয় রাষ্ট্র-নিয়ন্তা কয়টি ব্যবস্থা করেছেন? যা দু' একটি দায় শোধ দেওয়া গোছের (apology) খাড়া করেছেন তাতে যথেষ্ট সাহায্য দিচ্ছেন না। তবু মুসলমান তার পানে চেয়ে আছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ-কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজ ও নিউ স্কীম মদ্রাসা খাড়া হয়েছে কিন্তু তার উন্নতির জন্য যথেষ্ট সাহায্য মিলছে না।

সরকারী চাকরীর নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা সার্কুলার ও নোটিফিকেশনে লিপিবিদ্ধ আছে, কিন্তু তা কি পুরোপুরি মিলছে? নিশ্চয় না, কারণ হিন্দু বড় বাবুরা মুসলমান উমেদারদের চেষ্টা নানা প্রকারে ব্যর্থ করে দিচ্ছেন। মুসলমানরা প্রকৃতপক্ষে কি হিন্দুর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে? নিশ্চয়ই না। মুসলমান-নির্ব্বাচিত মেম্বরের মধ্যে অনেকেই হিন্দুদের থেকে টাকা ধার নিয়ে ভোটের লড়াই করেন ; আবার কেউ কেউ হিন্দুকে দিয়ে বক্তৃতা লিখিয়ে নিয়ে কাউন্সিলে পাঠ করেন। হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী ও মহাজনের হাতে মুসলমান বাঁধা। বৃটিশ পরিচালকগণ কি তাদের হাত থেকে মুসলমানকে রক্ষা করতে পারছেন? তাহলে স্বাতন্ত্র-নীতি অবলম্বনে মুসলমান আদৌ উপকৃত হয় নাই ও হচ্ছে না। এতে করে বরং হিন্দুর প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ প্রবৃত্তি আরও প্রখর হয়ে উঠেছে ও উঠ্‌ছে। আজ যে সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখে স্বাতন্ত্র্য-নীতির সমর্থন করা হচ্ছে, সে সমস্তই এই স্বাতন্ত্র্য-নীতির ফল। স্বাতন্ত্র্য-নীতির ফলে মুসলমান সংকীর্ণ-চিত্ত, ভীরু, স্বার্থপর এবং হিন্দু অধিকতর সংকীর্ণ ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়েছে, আর উভয়ের মধ্যে বিশ্বাস ও প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে। এর ফলে উভয়ে দেশের স্বার্থ ও কল্যাণকে না দেখে দেখছে নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ। মুসলমান মেম্বরগণ তাঁদের নির্ব্বাচক-মণ্ডলীর প্রয়োজন সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে কেবল খানাপিনা ও রাহ্-খরচ নিয়েই ব্যস্ত, এবং কখনো কখনো মন্ত্রীপদ নিয়ে দল পাকাপাকি করেই নিজেদের কর্ত্তব্য সাধন করছেন। বিরাট মুসলমান সমাজের প্রয়োজন সুনির্দ্ধারিত করে ক'জন দলবদ্ধ হয়ে একটি কর্ম্ম-তালিকা নিয়ে কাউন্সিলে কাজ করতে চেষ্টা করেছেন? স্বাতন্ত্র্য-নীতির ফলে মুসলমান ভোটদাতা আদৌ সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারছে না। নির্ব্বাচিত মেম্বরগণও সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারছে না। তাই দেখতে পাই, এদের কেউ হিন্দু নেতার পেছনে ছুটছেন, কেউ সাহেবদের পদলেহন করছেন, আবার কেহ পেটের দায়ে মুখবন্ধ করে ব্যক্তিবিশেষের মোসাহেবীতে আত্মবিক্রয় করেছেন। মুসলমান চাকুরেদের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁদের অনেকেই পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে বিবেককে গলা টিপে মেরে ফেলতে বাধ্য হন। তাঁরা হিন্দুর কলমের ভয়ে মুসলমানের প্রতি ন্যায় বিচার পর্য্যন্ত করতেও কুণ্ঠিত হন। তাঁরা কেবল বৃটিশ বড় সাহেবদের সুনজর অর্জ্জনেই জীবনের সকল শক্তি ও বুদ্ধি ব্যয় করে দিয়ে খয়েরখাঁ হতে ব্যস্ত। এঁরাই নাকি খুব হুঁশিয়ার চাকুরে বলে খ্যাতি লাভ করে থাকেন।

www.pathagar.com

এমনি করে মুসলিম স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে, যে স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজ নিজ ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা সাধন করেই তাঁরা তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ করেন। এতে করে কোটি কোটি মূক, অসহায়, দরিদ্র মুসলিম নরনারীর আত্মাকে অপমানিত লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত করা হয়েছে ও হচ্ছে,—মুসলিম সমাজের স্বাভাবিক ক্রমবিকাশকে প্রতিহত করা হয়েছে, মুসলিম যুবকের সৃষ্টিশক্তিকে ব্যর্থ করা হয়েছে—এতে তার আকাঙ্ক্ষা ক্ষুণ্ন হয়েছে, বুদ্ধি বিকশিত হতে পারছে না, হৃদয়বৃত্তির কোনো সহজ স্ফূর্ত্তি ঘটছে না ; মুসলিম সমাজমন রাষ্ট্রচেতনায় উদ্বুদ্ধ হচ্ছে না—মহত্তর ও বৃহত্তর জীবনের আস্বাদ পাচ্ছে না। পক্ষান্তরে স্বাতন্ত্র্য-নীতি দুর্ব্বলকে লালন করছে, ভীরু অকর্ম্মণ্য হৃদয়হীন ক্ষুদ্রচেতা ভণ্ডের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে, ইসলামের প্রাণশক্তি ও সৃষ্টিধর্ম্ম মুক্ত হতে দিচ্ছে না।

আজ স্বাতন্ত্র্যনীতি যাঁরা দাবী করছেন তাঁরা দেশের বৃহত্তর কল্যাণ ও তার আয়োজনের ধারণা করতেও অসমর্থ। দেশের লোকের ব্যক্তিত্ব বিকশিত করবার জন্য যে রাজনীতির প্রয়োজন তার মূল নীতি হচ্ছে গণতন্ত্র। ভারতবাসী তারা নিজের প্রয়োজন নিজেই নির্দ্ধারণ করবার ক্ষমতা চায়। সে ক্ষমতা তাকে দিলে সে যে আয়োজন করবে, তাতে সকলের ঠিক সূর্য্যের আলোক ও বর্ষার বারিধারার ন্যায় সমান অধিকার থাকবে এবং তা সকলের পক্ষে সমানভাবে কল্যাণকর হবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক—যদি বাংলাদেশের মৃত বা মৃতপ্রায় নদীগুলির সংস্কার হয়, যদি প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়, যদি সেচন ও সার সরবরাহের সুবিধা বাংলার সর্ব্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে হিন্দু মুসলমান উভয়েই উপকৃত হবে। স্বাতন্ত্র্যনীতির ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মেম্বরগণ মিলে কখনও একযোগে বৃহত্তর কল্যাণের দ্বার উদ্ঘাটন করতে পারবেন না। একে অপরকে সন্দেহ করবেন, একের প্রস্তাবে অন্যে প্রমাদ গুণবেন। তা'ছাড়া, স্বরাজ কখনও কার্য্যকরী হবে না। হিন্দু মন্ত্রী মুসলমান মন্ত্রীর সঙ্গে একমত না হলে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। ব্যবস্থাপক সভার নিকট তাঁরা কখনও সম্মিলিত দায়িত্ব অনুভব করবেন না। এমনি করে স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচন প্রণালী গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত করবে। মিশ্র নির্ব্বাচন প্রণালীতে উভয় সম্প্রদায়ের মনোভাব পরিমার্জ্জিত হবে। হিন্দু-মুসলমান সভ্যপদপ্রার্থী (candidates) হিন্দু-মুসলমান ভোটদাতাদের নিকট যেতে বাধ্য হবেন। তা হলে ভোটদাতা বুঝবে তার নিজের মূল্য—ক্রমে সে সভ্যপদপ্রার্থীদের (candidates) নিকট কাজ (programme) তলব করতে শিখবে ও হিন্দু-মুসলমানের পার্থক্য যোগ্যতার মাপকাঠিতে বিচার করতে শিখবে। এই হল নির্ব্বাচনের একটা মস্ত বড় শিক্ষা। স্বতন্ত্র-নির্ব্বাচনে ভোটদাতা তার আপনার শক্তি ও ব্যক্তিত্বে উদ্বুদ্ধ হতে পারে না। এইটাই হল সবচেয়ে বেশী মারাত্মক।

মুসলমান নেতৃবৃন্দ হিন্দু-সংখ্যাগুরুত্বের ভয়ে স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন চাচ্ছেন, কিন্তু সে মনোভাব ভিক্ষুকের। ভিক্ষা করে কেউ কখনও শক্তিমান ও মহৎ হতে পারে না। তৃতীয় পক্ষের হাত ধরে চললেও হিন্দু বড় দল (majority), ইচ্ছা করলে মুসলমানকে নির্য্যাতিত করতে পারবেন। এখনই আমরা চোখের সামনে তা দেখছি। কিন্তু যদি আমরা আমাদের নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখি তা হলে হিন্দু বড় দল সসম্ভ্রমে আমাদের দাবী বিবেচনা করবেন। সংখ্যায় গুরু হলেই মানুষের শক্তি বাড়ে না। মানুষের শক্তি বাড়ে বুদ্ধি চরিত্র ও জ্ঞানে।

www.pathagar.com

স্বাতন্ত্র্য–নীতি দুর্ব্বলের নীতি. সে নীতির ফল হচ্ছে চির দাসত্ব। এতে মুসলমানের মনের ভয় কখনও দূর হবে না। হিন্দুর প্রাতি তার বিশ্বাস কখনও ফিরবে না। কিন্তু সৃষ্টি লোলুপ মুসলিম যুবকের অভিধানে ভয় দাসত্ব ও ভিক্ষা বলে কোন শব্দের স্থান নাই। সে চায় প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে তার ভিতরকার শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম বৃত্তিগুলির পরিপূর্ণ বিকাশ। সে চায় নিজেকে জগতের সভায় একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে দাঁড় করাতে—যাকে দেখলে সভ্য জগত সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে নমস্কার করবে। সে চায় মানব জীবনের বৃহত্তর কল্যাণ তার জন্মভূমির প্রতি গৃহে পৌঁছে দিতে, সে চায় হিন্দুর প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষকে স্নেহ ও প্রীতিতে পরিণত করতে, সে চায় দেশের জলবায়ুতে জন্মেছে যে মানুষ তারই পরিপূর্ণ জীবনের জন্য সকল প্রকার আয়োজন করতে।

সে এমন কিছু চায় না, যার কোন মূল্য তাকে দিতে হবে না। সে কিছুই ভিক্ষা চায় না, কিংবা কারও অনুকম্পার পাত্র হয়ে এ জগতে থাকতে চায় না। কারণ, তার চেয়ে বড় অপমান মুসলমানের পক্ষে আর কিছুই নয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলিম স্বার্থ তখনই রক্ষা হবে যখন মুসলিম মানুষ বুদ্ধি জ্ঞান ও চরিত্রে উৎকর্ষ লাভ করে হিন্দুর সাহচর্য্যে কর্ম্মক্ষেত্রে মানুষের বৃহত্তর কল্যাণকে সফল ও সার্থক করে তুলতে পারবে।

নির্ব্বোধ মূর্খ হয়ে দল পাকিয়ে অপরের হাত ধরে ধরে যে সকল মুসলমান নামধারী মানুষ চলে, তারা মুসলমান নয়। মুসলমান যে, সে মুক্ত, সে তার দেশের সম্পদ ও কল্যাণকে রক্ষা করবার জন্য সতত ব্যগ্র। তার কাছে মুসলমানের চেয়ে মানুষ বড়, সমাজের চেয়ে দেশ বড়।

স্বাধীনভাবে নিজেকে নিজের ইচ্ছামত ফুটিয়ে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করবার অধিকারকে আমি বলি রাষ্ট্রীয় অধিকার, সে অধিকার অনেক বড়। মানুষ সে অধিকার হতে বঞ্চিত হলে পঙ্গু হয়ে থাকতে বাধ্য। আজ ভারতে সে অধিকার পাওয়ার জন্য আন্দোলন চলছে। কিন্তু মাতৃভূমির প্রত্যেক মানুষ যাতে সে অধিকার অর্জ্জন করতে পারে, সে–পথ উন্মুক্ত করবার জন্য তথাকথিত মুসলমান নেতৃবৃন্দকে কিছুমাত্র চিন্তা–ভাবনা বা চেষ্টা করতে না দেখে মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাই, এবং নিজেকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত মনে করি। তাঁরা নির্ব্বাচন প্রণালী নিয়ে হিন্দুর সাথে জিদ করছেন। কিন্তু সে অধিকার প্রত্যেকের উপভোগ্য করবার জন্য সমবেত চেষ্টা করা দরকার—সে চেষ্টা তাঁরা করছেন না। তাঁরা ঘোড়া কোথায় তার খোঁজ না করে খোঁজ করছেন চাবুকের। কিন্তু ঘোড়া কেনা চাই, ঘোড়ায় চড়তে শেখা চাই, তবে চাবুকের প্রয়োজন হয়। আমরা এখনও আমাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার পাইনি, কিন্তু আগে থেকেই তাঁরা হৈ চৈ করছেন রাষ্ট্রীয় অধিকার পরিচালনা করবার প্রণালী নিয়ে।

তাই 'সাহিত্য–সমাজে'র তরুণ বন্ধুদের নিকট আমার এই নিবেদন যে, রাষ্ট্রীয় অধিকার মানুষের বড় অধিকার। সে অধিকারকে সার্থক ও চরিতার্থ করতে না পারলে মানব জীবনের কোন সাধনাই সাফল্য মণ্ডিত হয় না। কাজেই সে অধিকারকে আয়ত্ত করবার সাধনার চেয়ে কোন সাধনাই মহত্তর হতে পারে না। কিন্তু বলতে লজ্জা হয়, ভারতীয় মুসলমানের সে সাধনা যো–হুকুম ও ভিক্ষুকের কাকুতি–মিনতি ও ক্রন্দন বৈ আর কিছু নয়। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিকার ভিক্ষা করে অর্জ্জন করা যায় না। সে অধিকার লাভের জন্য সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মূল্য দিতে হয়। সে মূল্য হচ্ছে হাসিমুখে সকল দুঃখ বরণ, অমিত

www.pathagar.com

সাহস ও নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগ স্বীকার। কিন্তু মুসলমান নেতৃবৃন্দ দুঃখকে এড়িয়ে ভয়কে বরণ করে চূড়ান্ত স্বার্থপরতাকেই রাষ্ট্র-সাধনার পাথেয় করে নিয়েছেন। তাঁদের থেকে আপনারা কি আশা করতে পারেন? কাজেই সে মূল্য দেওয়ার জন্য আপনাদের প্রস্তুত হতে হবে—আপনাদের হিন্দু বড়-দলের (Hindu Majority) প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষকে স্নেহ ও প্রীতিতে পরিণত করবার সাধনা করতে হবে। হিন্দুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবার জন্য আপনাদের তৈরী হতে হবে। কূপমণ্ডুক হয়ে বৃটিশ সঙ্গীনের আওতায় 'ইত্‌মিনানে' বসে হিন্দুর হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য স্বাতন্ত্র্য (separate representation) বা সংরক্ষণ (safeguards) ভিক্ষা করলে মুসলিম সমাজের মৃত্যু অনিবার্য্য। তাতে আপনারা বৃটিশের কাছেও ঘৃণ্য হবেন এবং হিন্দুরও বিরক্তিভাজন হবেন। হিন্দু আপনাদের মনে করবে পথের কণ্টক, বৃটিশ মনে করবে এরা অপদার্থ। এমনতর দশা কি আপনাদের কাম্য? তাতে কি আপনাদের আত্মা পরিতৃপ্ত হবে? জোর গলায় বলুন, 'না, না'—বলুন, 'আমরা চাই আমাদের অধিকার অর্জ্জন করতে, ভিক্ষা করতে চাই না।' আপনারা মানুষ হলে হিন্দু আপনিই তাঁর বড় আয়েজন সার্থক করবার জন্য আপনাদের সাদরে গ্রহণ করে তাঁদের কাজে লাগাবেন। আপনারা শ্রদ্ধেয় হলে দেশের কল্যাণ-সাধনায় আপনাদের ডাক অনিবার্য্য হবে। স্বাধীনতার আবহাওয়ায় মানুষের সংকীর্ণতা দূর হয়ে যায়—পশুবৃত্তিরও অবসান হয়। তখন জীবনায়োজনের সম্ভার চতুর্দ্দিক হতে উৎসারিত হয়ে সকলকে মঙ্গলের দিকে, শান্তির দিকে, প্রীতির দিকে, আকৃষ্ট করে। তখন হিন্দু মুসলমানের বর্ত্তমান মনোভাব কিছুতেই থাকতে পারে না। হিন্দু তা না হলে কিছুই করতে পারবে না, আর মুসলমানও কোলাহল করতে থাকবে। কাজেই উভয়ের জীবনের প্রয়োজনেই উভয়েই আপনাপন স্থান বেছে নিয়ে কর্ম্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের বৃহত্তর কল্যাণ সার্থক ও চরিতার্থ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে ফিরবে।

আপনারা এখন আপনাদের জীবন দিয়ে প্রমাণ করুন, মুসলিম সমাজের কোলে ইসলামের আদর্শে এমন মানুষ তৈরী হতে পারে যাঁদের সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতীয় রাষ্ট্র একেবারেই সার্থক হতে পারে না। বেড়া দিয়ে কোন সমাজকে অন্য সমাজের দৌরাত্ম্য বা নির্য্যাতন হতে রক্ষা করা যায় না, তাতে রক্ষা না হয়ে হয় ধ্বংস। মহাত্মা গান্ধী তাই বলছেন, মুসলমান যা চায় তাই দাও—তবু আমাদের পূর্ণ স্বরাজ হোক্। মুসলমান মনে করছে—'মার দিয়া কিল্লা।' কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বেশ জানেন যে, এতে মুসলমানের মৃত্যু অবশ্যাম্ভী।

উপসংহারে বলি, আপনারা হিন্দুর হিংসা-বিদ্বেষের কথা ভুলে যান, তাঁরা আল্লাহ্‌র প্রেরিত আদম সন্তান। তাঁরাও মানুষ ; স্নেহ-প্রীতি, দয়া-মমতাও তাঁদের যথেষ্ট আছে। তাঁদের সেই সুপ্রবৃত্তিগুলি আকর্ষণ করার চেষ্টা করুন নিজেদের কাজ ও চিন্তা দ্বারা। মুসলমানদের যাঁরা নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা মুসলমান সমাজের অন্তরতম মর্ম্মকথা জানেন না, বা তাকে সার্থক করতে হলে যে আয়োজন করা দরকার সে সমস্ত আয়োজন যে হিন্দুর সাহায্য ব্যতিরেকে একেবারেই সার্থক হতে পারে না, সে কথা তাঁরা বুঝতে পারছেন না। আপনাদের নূতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলমান মানুষের নেতা হতে হবে। আজ আমাদের রাজনীতি হবে—'দেশের মানুষকে পূর্ণাঙ্গ করতে হবে।' তার জন্য বড় আয়োজন করতে হবে, সে-আয়োজন সম্পূর্ণ হবে হিন্দু-মানুষ ও মুসলমান-মানুষ উভয়েই

www.pathagar.com

পূর্ণাঙ্গ হলে। দেশের মানুষের কল্যাণ হবে আমাদের লক্ষ্য, ও এক আল্লাহ্‌তে বিশ্বাসই হবে আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের মিলনসূত্র। তাহলে বোধ হয় আর কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যাই আমাদের উঠতে পারবে না, তখন কেবল কাজের কথাই হবে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

আপনারা হিন্দু বড়–দলের ভয় মন থেকে দূর করে দিন। আপনারা পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে দাঁড়ান। বড়–দল হলেও আপনাদের দাবী উপেক্ষা করবার মত শক্তি অতি বড় বড়–দলেরও কখনও হবে না, এই নূতন বিশ্বাস নিয়ে আপনারা জীবন্ত জাগ্রত ক্রিয়াশীল হয়ে চলুন, তা হলেই সকল দ্বন্দ্ব সকল দ্বেষ ঘুচে যাবে—আর ভারতের বুকে ছোট–দল ও বড়–দলের (minority and majority) এমন এক চমকপ্রদ সমন্বয় সাধিত হবে বিশ্বকল্যাণ–সাধনায় যার আদর্শ অপরিহার্য্য হবে।

www.pathagar.com

মোহাদ্দেস প্রসঙ্গ

আবুজ্-জোহা নূর আহ্‌মদ

ইমাম বোখারী

হজরত মোহাম্মদের (দঃ) বাণীকে আরবী ভাষায় হাদীস বলে। আর এই হাদিসের বর্ণনাকারীগণকে মোহাদ্দেস বলে। যেই সব মহাত্মদের জীবনব্যাপী সাধনা ও পরিশ্রমের ফলে হজরতের পবিত্র বাণী অদ্যাপি অম্লান অক্ষয় রহিয়াছে তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন মোহাদ্দেস-প্রবর ইমাম বোখারী।

আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন ইসামাইল বোখারীর প্রপিতামহ 'বার-দেজবা' খজুসি সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তাঁহার পুত্র মুগাইরা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পুত্র ইব্রাহিমের বংশে ইসলাম জগতের গৌরব রবি ইমাম বোখারী বোখারা প্রদেশে ১৯৪ হিজরী ১৩ই শওয়াল জুমার নামাজের পর জন্মগ্রহণ করেন।

ইমাম বোখারী মধ্যম আকৃতির ছিপ্‌ছিপে ও সুশ্রী পুরুষ ছিলেন। পিতার নিকট হইতে অগাধ সম্পত্তি লাভ করতঃ দরিদ্র লোকদের মধ্যেই তাহা বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সম্পত্তি হইতে নিজের ভোগ বিলাসের জন্য তিনি কিছুই রাখেন নাই। তিনি সামান্য আহারেই পরিতুষ্ট থাকিতেন এবং পরের ক্ষুধা নিবারণেই তৃপ্তি পাইতেন। ফল কথা তাঁহার যেরূপ অগাধ ধন ছিল—সেরূপ বিরাট আত্মাও ছিল।

দৈবদুর্ব্বিপাকে অতি শৈশবকালে তাঁহার চোখের জ্যোতি কমিয়া গিয়াছিল। তজ্জন্য তাঁহার স্নেহময়ী জননী অহরহ বিষণ্ন থাকিতেন। আর পুত্রের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য খোদার নিকট প্রার্থনা করিতেন। এই পুত্রগত প্রাণ মহিলা এক রাত্রে নিদারুণ মনোবেদনা লইয়া পুত্রের চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে তিনি স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে, হজরত ইব্রাহীম (আঃ) আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন—'আপনার দুঃখ দূর হইল, আপনার পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইয়া খোদাতালা আপনার পুত্রের চোখে স্বর্গীয় জ্যোতি প্রদান করিয়াছেন।' — নিদ্রাভঙ্গে প্রাতঃকালে তিনি দেখিতে পাইলেন, সত্য সত্যই তাঁহার হৃদয়রত্ন পুত্রের চোখ দুইটি বিমল জ্যোতিতে ভরিয়া গিয়াছে।

দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বালক বোখারী নিজ গ্রাম্য মক্তবে যাতায়াত করিতেন, আর আলেমদের মুখে যেই সমস্ত হাদীস শুনিতেন তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া লইতেন। এইভাবে এই বালক বড় বড় আলেমদের অজ্ঞাতে পরম আনন্দের সহিত সেখানকার মক্তবের শিক্ষা সমাপ্ত করতঃ উচ্চ শিক্ষার জন্য চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে অচিরেই জ্ঞানপিপাসু বালকের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেখা দিল। লোক পরম্পরা বোখারা শহরের খ্যাতনামা আলেম দাখেলীর নাম যেই মুহূর্ত্তে তাঁহার কর্ণে আসিয়া পঁহুছিল,

www.pathagar.com

সেই মুহূর্ত্তেই তিনি বোখারা যাত্রা করিলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই মহাপণ্ডিতের সমীপে আসিয়া আপন মনোবাসনা নিবেদন করিলেন। দাখেলী সাহেব আনন্দের সহিত এই বালককে শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। ...একদা অধ্যাপনা কালে এই জ্ঞানগুরু যখন একটি হাদিসের 'সনদে' ভুল বলিতেছিলেন তখন এই নির্ভীক বালক শিক্ষকের ভুল দেখাইয়া দিয়া সেই মূল হাদিসটি এবং তাহার বর্ণনাকারীদের নামধাম ধারাবাহিকভাবে মুখস্থ বলিয়া দিলেন। ইহাতে অভিজ্ঞ দাখেলী সাহেব পরম আনন্দের সহিত এই অদ্বিতীয় শিষ্যের ভূয়সী প্রশংসা করতঃ তাঁহার উজ্জল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সকলকে আনন্দ সংবাদ দিলেন।

অনন্যসাধারণ স্মরণশক্তি বলে ইমাম বোখারী ষোল বৎসর বয়সে হাদিস সম্বন্ধীয় সমস্ত কেতাব কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া ছিলেন। হামিদ বিন ইসমাইল নামীয় তাঁহার জনৈক সহপাঠী বলেন—'ইসমাইল বিন বোখারী দোয়াত কলম বা খাতাপত্র লইয়া কোন দিন হাদিস পড়িতে যাইতেন না। ইহাতে আমরা বিস্মিত হইয়া একবার তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'ওস্তাদের বক্তৃতার কিছুই তুমি লিখিয়া লও না, ইহাতে তোমার কি বিদ্যা হইবে?' তাহার উত্তরে তিনি বলিলেন, 'তবে এসো বন্ধুগণ, তোমাদের লেখার সঙ্গে একবার আমার স্মরণশক্তির প্রতিযোগিতা করা যাউক।' আমরা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া আমাদের বহু দিনের পরিশ্রমলব্ধ পনের হাজার হাদিস লিখিত বিরাট খাতাগুলি লইয়া উপস্থিত হইলাম। তাহা দেখিয়া প্রতিভার দুলাল ইমাম বোখারী অনর্গল ভাবে সেই পনের হাজার হাদিস মুখস্থ বলিয়া দিলেন, আর সেইদিন হইতে আমাদের বুকে আঁকিয়া দিলেন তাঁহার অতুলনীয় মনীষার এবং অশ্রুতপূর্ব্ব স্মরণশক্তির অম্লান ছাপ। বস্তুতঃ সেইদিন হইতেই বোখারীর বিরাট ব্যক্তিত্বের নিকট আমরা অবনত মস্তক হইয়া পড়িলাম।'

একদা ইসহাক বিন্ রস্সের মজলিসে অনেক বিদ্বানমণ্ডলীর মধ্যে ইমাম বোখারীও উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় কথা প্রসঙ্গে কতিপয় লোক দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, 'কোন কোন বর্ণনাকারীদের অজ্ঞতানিবন্ধন হজরত রসুল আকরমের বর্ণিত হাদিসে ভ্রান্তিরুচ্যুতির লক্ষণ দেখা দিয়াছে। এমন সময় যদি কোনও সুবিজ্ঞ আলেম বিশুদ্ধ হাদিসগুলি চয়ন করতঃ একখানি হাদিস গ্রন্থ সংকেলন করিতেন তবে কতই না ভাল হইত, আর ইহা দ্বারা কত মানুষই না প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাইত। সেই সভাতে এই আলোচনাটি আর বেশীদূর গড়াইল না সত্য, ইমাম বোখারীর প্রাণে কিন্তু ইহা তীক্ষ্ণ কাঁটার মত বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে হাদিস সংগ্রহে অবিরাম প্রেরণা দিতে লাগিল। তিন ইহার পর হইতে একান্ত মনে হাদিস সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার নিজের নিকটেই ছয় লক্ষ্য হাদিস মজুদ ছিল। তাহা হইতে বিশুদ্ধ হাদিসগুলি নির্ব্বাচন করতঃ হাদিস সংগ্রহ ব্যাপারে দেশ-দেশান্তরে দীর্ঘ ষোলটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সহি বোখারী' প্রণয়ন করিলেন।

'সেহা-সেত্তা বা ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থের মধ্যে 'সহি বোখারী' সব চেয়ে বিশুদ্ধ বলিয়া আলেমগণ একমত। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ সংকলন কালে তিনি যেরূপ পরিশ্রম ও পদ্ধতির অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিতেও বিস্ময় লাগে। এই সম্বন্ধে ইমাম বোখারী

www.pathagar.com

বলেন—'আমি ষোল বৎসর পরিশ্রম করতঃ ষাট হাজার হাদিস দ্বারা সহি বোখারী সংকলন করিয়াছি। প্রত্যেক হাদিস লেখার পূর্ব্বে স্নান করতঃ দুই 'রাকাত' নামাজ পাঠ করিয়াছি এবং নামাজান্তে এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছি 'হে খোদা, আমি অজ্ঞ, আমার হৃদয়ে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দাও। হাদিস গ্রন্থ প্রণয়নে আমি যেন ভুল না করি।' এইভাবে প্রার্থনা সমাপ্ত করতঃ হজরতের কবরের পাশে বসিয়া তিনি একটি হাদিস লিখিতেন—অতঃপর স্নান করতঃ আবার প্রার্থনা করিতেন।

বোখারা, মক্কা এবং বস্‌রা এই তিন স্থানে বসিয়া ইমাম সাহেব 'সহি বোখারী' লিখিয়াছেন বলিয়া আলেমদের মতভেদ আছে। পক্ষান্তরে তিন স্থানের বিষয়ই ঠিক, কেননা তিনি আপন লেখাতেও এই তিনটি স্থানের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি যে 'সহি বোখারী'র অনুবাদগুলি রসুলুল্লার কবর এবং মিম্বরের মধ্যে বসিয়া লিখিয়াছেন সেই সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই।

হাদিস সংগ্রহ ব্যাপারে ইমাম বোখারী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পর্য্যটনে যে পরিমাণ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা কল্পনা করিতেও বিস্ময় লাগে। এক কথায় বলিতে গেলে, আহার-বিহার-জাগরণ-স্বপ্ন সর্ব্বসময়েই প্রিয় নবীর হাদিস সংগ্রহই তাঁহার কাম্য ও সাধনার বস্তু ছিল। নিশাপুরের ইতিহাসে আবু আবদুল্লাহ বলেন, 'ইমাম বোখারী মক্কায় যাইয়া আবুল ওলীদ, আবদুল্লাহ বিন এজিদ, ইসমাইল বিন সালেম প্রভৃতি মনীষীর নিকট হাদিস শ্রবণ করিয়াছেন। মদিনাতে ইব্রাহিম বিন মুন্‌জের, আবু সায়েত মোহাম্মদ বিন ওবায়েদ উল্লাহ্‌র নিকট হাদিস শ্রবণ করিয়াছেন। স্বপ্নদেশে মোহাম্মদ বিন ইউসুফ ফরিয়াবী, আবু নসর ইসহাক বিন ইব্রাহিমের নিকট ; বোখারাতে মোহাম্মদ বিন সালাম, হারুন বিন আল আশায়াসের নিকট ; বলখে মক্কী বিন ইব্রাহিম, এহিয়া বেশর প্রভৃতির নিকট ; হেরাতে আহমদ বিন আবিল অলীদের নিকট ; নিশাপুরে ইসহাক বিন রাহবিয়া এবং এহিয়া বিন এহয়ার নিকট ; রাইপ্রদেশে ইব্রাহিম বিন মুসার নিকট, বোগ্‌দাদে মোহাম্মদ বিন ইসা, মোহাম্মদ বিন সাবেক এবং আহমদ বিন হাম্বলের নিকট ; বস্‌রাতে আবু আসেম এবং সাফওয়ান বিন ইসার নিকট ; কুফাতে ওয়াবেদ উল্লাহ্ বিন মুসা এবং আহমদ বিন ইয়াকুবের নিকট ; মিসরে ওসমান বিন আবি মরিমের নিকট ; জর্জ্জিয়াতে আহমদ বিন আব্দুল মালেক এবং আহমদ বিন এজিদের নিকট।

ইমাম বোখারী বলেন, 'আমি বিশুদ্ধ হাদিস সংগ্রহ করিবার জন্য উল্লিখিত স্থানসমূহে ভ্রমণ করিয়াছি এবং প্রত্যেক শিক্ষকের নিকট কিছুকাল অবস্থান করতঃ তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবগত হইতে চেষ্টা করিয়াছি।'

জাফর বিন মোহাম্মদ বলেন, 'আমি ইমাম বোখারীর নিকট হইতে শুনিয়াছি যে তিনি বলিতেন, 'আমি এক হাজার শেখ বা শিক্ষকের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছি। আর আমার নিকট এমন একটি হাদিসও নাই যাহার বর্ণনাকারী সম্বন্ধে আমি বিশেষভাবে জ্ঞাত নই। ইমাম বোখারীর নিকট হইতে প্রায় নয় হাজার লোক হাদিস শ্রবণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে—আবুল হুসেন মুস্‌লিম বিন আলহেজাজ, আবু ইসা তির্‌মিজী এবং আবু আবদুর রহমান নসয়ি'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

ইমাম বোখারী যখন বোগদাদে যান তখন তথাকার আলেমগণ তাঁহার জ্ঞান পরীক্ষার জন্য এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে দশ জন লোক দশ দশটি করিয়া এক শতটি হাদিস উলট পালট ভাবে মুখস্থ করিয়া লইলেন। প্রথম ব্যক্তি এহেন নূতন হাদিসগুলি পাঠ করতঃ উহা সম্বন্ধে ইমাম বোখারীর মত চাহিলে তিনি বলিলেন,—'আমি এইরূপ হাদিস সম্বন্ধে কিছুই জানি না।' অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদিস শ্রবণ করিয়াও তিনি তদ্রূপ উত্তর দিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের সেই এক শত হাদিস শেষ হইলে তিনি বলিলেন—'বন্ধুগণ, এইরূপ হাদিস হজরত মোহাম্মদ কখনও বলেন নাই, বরং তিনি অন্যরূপ বলিয়াছেন।' এই বলিয়া তিনি সেই এক শত হাদিস বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ ভাবে মুহস্থ বলিয়া দিলেন। ইহা দেখিয়া বোগদাদের আলেমদের মুখ বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহারা পরম শ্রদ্ধার সহিত ইমাম বোখারীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া লইলেন। প্রকৃতপক্ষে ইমাম বোখারী একজন অসাধারণ কর্ম্মক্ষম পুরুষ ছিলেন, তিনি অসীম পরিশ্রম করতঃ শুধু সহি বোখারী প্রণয়ন করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই বরং আরও বহু প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

ইমাম সাহেব তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ বোখারী প্রণয়ন কালে একদা হজরত মোহাম্মদ (দঃ)কে স্বপ্নে দর্শন করতঃ বিশেষ প্রেরণা পাইয়াছিলেন। সেই সম্বন্ধে তিনি বলেন—'আমি একদা হজরতকে এই অবস্থায় স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম,—আমি যেন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছি আর আমার হাতে একখানি পাখা ছিল তাহা দ্বারা আমি তাঁহার ক্লান্তি দূর করিতেছিলাম।'

বোখারী গ্রন্থের বিশুদ্ধতা এবং ইমাম বোখারীর অগাধ জ্ঞান সম্বন্ধে বহু আলেম প্রশংসা করিয়াছেন,—তন্মধ্যে জ্ঞানিপ্রবর ইসহাক রাহবিয়া তাঁহার শিষ্যগণকে বলেন,—'হে হাদিস অধ্যয়নকারিগণ, এই যুবক বোখারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, আর তাঁহার নিকট হইতে হাদিস লিখ। যদিও তিনি হাসান বসরীর সমসাময়িক তথাপি হাদিস সম্বন্ধীয় ব্যাপারে তাঁহার নিকট এই যুবকের কোনও প্রয়োজন নাই।'

আবু ইসা তিরমিজী বলেন,—'হাদিসের ইতিহাস, হাদিস বর্ণনাকারীদের ধারাবাহিক সম্বন্ধ, এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে ইরাক বা সমরখন্দে ইমাম বোখারী অপেক্ষা আর কোন শ্রেষ্ঠ আলেমকে আমি দেখি নাই।'

ইমাম মুসলিম ও বোখারীর শিক্ষাগুরু মোহাম্মদ বিন বেশার বলেন, 'পৃথিবীতে চারিজন শ্রেষ্ঠ হাফেজ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যথা, রাইশহরে আবু জোরয়া, নিশাপুরে মুসলিম বিন হেজাজ, সমরখন্দে আবদুল্লাহ্ বিন আবদুর রহমান দারেমী আর বোখারায় মোহাম্মদ বিন ইসমাইল বোখারী।

এই জ্ঞানবীর ইমাম বোখারীর নিঃসন্তান অবস্থাতেই মৃত্যু হয়। ২৫৬ হিজরী, ঈদুল ফিত্র রাত্রে ৬২ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবনলীলা সাঙ্গ হইয়া যায় এবং ঈদের দিন জোহরের নামাজের পর সমরখন্দের অন্তর্গত খরতঙ্গ গ্রামে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। কথিত আছে, তাঁহার পবিত্র দেহ যখন কবরস্থ করা হইল তখন তাঁহার কবরের মাটি হইতে এমনই মনোমুগ্ধকর সুঘ্রাণ বাহির হইতে লাগিল যে সমরখন্দের লোকগণ কোহ্-ই-তুরে'র মাটির মত

www.pathagar.com

সেই সমাধির পবিত্র মৃত্তিকা বাড়ীতে নিতে লাগিল। আর তাহারা অবাক বিস্ময়ে স্মরণ করিতে লাগিল এই কবিতাটির কথা :

جمال همنشين لر كرل.

وكر له من همان خاكم كه هستم

বন্ধুর সৌন্দর্য্য মোরে করিয়াছে খাঁটি
—নতুবা আমি যে শুধু কবরের মাটি।

আন্-নস্য়ি

আবু আবদুর রহমান নসয়ি—খোরাসান প্রদেশে ২১৫ হিজরী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পবিত্র হাদিস অধ্যয়ন ও হাদিস সংগ্রহে মনস্থ করতঃ খোরাসান, হেজাজ, ইরাক, শাম, মিসর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং কোতায়বা বিন সাইদ, ইসহাক বিন রাহবিয়া, হেশাম বিন ওমর, মোহাম্মদ বিন মরুজি প্রভৃতি জ্ঞানীদের নিকট হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইভাবে বহু দেশে বহু আলেমের নিকট হাদিস শিক্ষা সমাপ্ত করতঃ মিসরে আসিয়া তিনি স্থায়ী ভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

মিসরে অবস্থানকালে আবু বশর দুলাবী, আবু আলী আল্ হুসেইন, হাম্জাতুল্ কেনানী, আবুল কাসেম তিবরানী, হাসান বিন রশীক প্রভৃতি মনীষিগণ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই নস্য়ি সাহেব বিদ্যার্জ্জনের জন্য অপরিসীম পরিশ্রম করিয়াছেন। মাত্র পনের বৎসর বয়সে তিনি বহু দূরস্থ জ্ঞানিপ্রবর কোতায়বা'র নিকট যাইয়া দেড় বৎসর অবস্থান করতঃ হাদিস শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তাঁহার আর্থিক অবস্থা নেহায়েত অস্বচ্ছল ছিল। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহাকে বহু রাত্রে মিসরের ছোট গলিতে সরকারী বাতির নীচে বসিয়া পুস্তক পাঠক করিতে দেখা যাইত।

নস্য়ি সাহেব সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল অতি লাবণ্যময় ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার চর্ম্মের ভিতর দিয়া শরীরের রক্তের চলাচল দেখা যাইত। সাধারণতঃ তিনি সবুজ রঙ্গের নিউবিয়া দেশের চাদর পরিধান করিতেন এবং এই চাদর খুবই পসন্দ করিতেন। তাঁহার অটুট স্বাস্থ্যের আর একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে, বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার চারি স্ত্রী ছিলেন, এবং তাঁহাদের প্রত্যেককেই তিনি পর্য্যায়ক্রমে দর্শন করিতেন। তিনি খুবই মোরগ খাইতেন, মোরগ ক্রয় করিয়া তাহাদিগকে বহু দিন যত্নসহকারে পালন করিতেন এবং মাংসবহুল করতঃ ভক্ষণ করিতেন। নস্য়ি সাহেবের এক শিষ্য বলেন, তিনি সর্ব্বদা আঙ্গুরের এক প্রকার শরবত পান করিতেন, তাহারই ফলে বৃদ্ধকালেও তাঁহার দেহের শ্রী এইরূপ অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তাঁহার শরীরের রক্ত এইভাবে টগবগ্ করিত।

ইমাম নাস্য়ি সাহেব 'খাসায়েসুল আলী' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিলে মোহাম্মদ বিন মুসা আল্ মামুনী নামক তাঁহার জনৈক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হুজুর আপনি ইমাম

www.pathagar.com

বোখারী বা মুসলিমের জীবনী না লিখিয়া হজরত আলী সম্বন্ধে পুস্তক লিখিলেন কি প্রয়োজনে? ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন—'আমি যখন দামেসকে প্রবেশ করি তখন দেখিতে পাইলাম বহু লোক হজরত আলীর নিন্দা করিতেছে এবং তাঁহার সম্বন্ধে ভুল ধারণাপোষণ করিতেছে। তাহাদের সেই অমূলক ভ্রান্তি দূর করিবার জন্যই আমি এই পুস্তক লিখিয়াছি। আমি আশা করি ইহা পাঠে তাহাদের সেই ভুল দূর হইবে।' ইহার পর নস্‌য়ি সাহেব সাহাবীদের প্রশংসামূলক আর একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। খোরাসানের প্রসিদ্ধ হাফেজ আবু আলী বলেন, আবু আবদুর রহমান নস্‌য়ি আমাদের নিকট যে সমস্ত হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে মোটেই মতানৈক্য নাই।

ইবনে তাহের বলেন—'আমি একবার হাদিস বর্ণনাকারী জনৈক লোক সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ আলেম সায়াদ বিন আলীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তখন তিনি এই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমি বলিলাম—'নস্‌য়ি সাহেব কিন্তু এই লোকটিকে হাদিস বর্ণনায় দুর্ব্বল বলিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন 'হে বৎস নিশ্চয়ই আবু আবদুর রহমান নস্‌য়ি লোক-নির্ব্বাচনে এমন জটিল শর্ত্ত রাখিয়াছেন যাহা বোখারী বা মুসলিমও রাখেন নাই। সুতরাং নস্‌য়ি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।'

মিসরের হাফেজ মোহাম্মদ বিন মুজাফফর বলেন, 'নস্‌য়ি সাহেব রাত্রি দিন ভক্তি সহকারে এবাদত করিতেন। একবার তিনি মিসরের আমীরের সহিত যুদ্ধে যোগদান করতঃ কয়েক বৎসর ধরিয়া মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ তিনি বড় লোকেদের প্রতি উদাসীন ছিলেন, এবং কৃচিৎ তাঁহাদের সভাতে যোগদান করিতনে। দরিদ্র ও সাধারণ লোকদের দলেই তাঁহাকে প্রায়ই দেখা যাইত। তিনি আনন্দের সহিত দরিদ্র লোকদের সহিত মিশিতেন এবং তৃপ্তির সহিত তাহাদের সহিত খাওয়া দাওয়া করিতেন।

দারে কুতনী বলেন, 'ইবনুল্ হাদ্দাদ আবু বকর শাফী বহু হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। তবে তিনি নস্‌য়ি ছাড়া আর কাহারও হাদিস বর্ণনা করিতেন না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, 'আমার এবং খোদার মধ্যে নস্‌য়ি সাহেবকে মধ্যস্থ রাখিয়া আমি সন্তুষ্ট আছি।'

বৃদ্ধ বয়সে মিসর হইতে বাহির হইয়া তিনি যখন দামেসক আসেন তখন তথাকার লোক মাবিয়া সম্বন্ধে তাঁহার মত জানিতে চাহে। ইহাতে তিনি বলিলেন, 'এক মস্তকের পরিবর্ত্তে আমি অপর মস্তক দান করিতে চাহি না।'

ইহাতে দামেসকবাসী বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে অতি নির্দ্দয় ভাবে আঘাত করিতে করিতে মক্কার দিকে পাঠাইয়া দেয়, এবং মক্কার পথে রম্‌লা নামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

এই সম্বন্ধে দারে কুত্‌নী বলেন,—ইমাম নস্‌য়ি সাহেব হজ করতঃ দামেসকে গমন করেন এবং তথায় মাবিয়ার পক্ষীয় লোকদের হাতে ৩০৩ হিজরী শাবান মাসে নিহত হন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বলিতে থাকেন, 'আমাকে মক্কাতে লইয়া যাও, আমাকে মক্কাতে লইয়া যাও।' তাঁহার শেষ অনুরোধ অনুসারে দামেসকবাসী তাঁহাকে মক্কাতে পাঠাইয়া দেয়। অতঃপর ছাফা এবং মারওয়া পাহাড় দ্বয়ের মধ্যে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়।

www.pathagar.com

তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে আবু সাইদ বিন্ ইউনুস বলেন—মিশরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফেকাহ্শাস্ত্রবিদ মোহাদ্দেস ইমাম নস্য়ি সাহেব ৩২০ হিজরী মিসর হইতে বাহির হইয়া ফেলেস্তিন আসেন ; তথায় আসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন, এবং সমাধিস্থ হন।

তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে এহেন মতভেদের মধ্যে দারে কুত্নী'র বর্ণনাই সমধিক যুক্তিসঙ্গত এবং বিশ্বযোগ্য বলিয়া বোধ হয়।

আবু দাউদ

আশ্আস-তনয় আবু দাউদ বস্রার অন্তর্গত সিজিস্তান প্রদেশে ২০২ হিজরী জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার মত পুস্তকপ্রিয় বিদ্বান ব্যক্তি অতি কমই ছিলেন। বিশেষতঃ হজরতের বিশুদ্ধ হাদিসগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য দেশ বিদেশে ঘুরিয়া তিনি যেই পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা অতুলনীয়। সেই অক্লান্ত পরিশ্রমের সুবর্ণ ফলস্বরূপ তিনি 'সনদে আবু দাউদ' নামক যেই বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন তাহা চিরদিন তাঁহার স্মৃতিকে মুস্লিম জগতে সজীব করিয়া রাখিবে। তিনি সুকঠোর পরিশ্রম দ্বারা পাঁচ লক্ষ হাদিস হইতে চার হাজার আটটি বিশুদ্ধ হাদিস মনোনীত করিয়া তাঁহার সঙ্কলিত পুস্তকে স্থান দিয়াছেন। আর এই হাদিস বুঝিবার পক্ষে তাঁহার যেই অসীম ক্ষমতা ছিল সেই সম্বন্ধে মোহাম্মদ বিন্ ইসহাক হাসানী বলেন,—'দাউদ নবীর জন্য লোহা যেরূপ নরম ছিল, আবু দাউদের জন্য হাদিসও সেরূপ নরম ছিল।' আবু দাউদ বলেন, আমার এতগুলি হাদিসের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে চারিটি হাদিসানুযায়ী কাজ করাই যথেষ্ট, যথা :

ক) 'নিয়ত' বা সংকল্প অনুসারেই কার্য্য।

খ) প্রকৃত মুসলমান হওয়ার চিহ্নের মধ্যে ইহাও একটি যে তাহার অপ্রয়োজনীয় বস্তু সে ত্যাগ করিবে।

গ) তোমাদের মধ্যে কেহই প্রকৃত বিশ্বাসী হইবে না যে পর্য্যন্ত না সে আপনার জন্য যাহা ভালবাসে আপন ভাইয়ের জন্যও তাহা ভালবাসিবে।

ঘ) হালাল বা সিদ্ধ এবং হারাম বা নিষিদ্ধ ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সন্দেহজনক বিষয় আছে। যে ব্যক্তি এই সন্দেহজনক বিষয় হইতে বাঁচিয়া আছে, সে আপন ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে পবিত্র রাখিয়াছে।' তাঁহার সম্বন্ধে হাফেজ মুসা বিন্ ইব্রাহিম বলেন 'আবু দাউদের জন্ম হাদিসের জন্য, আর মৃত্যু স্বর্গের জন্য।'

ইব্নে দাস্তা বলেন, 'আবু দাউদ বলিতেন, আমার গ্রন্থে যাহা কিছু বিশুদ্ধতার গুণ রাখে তাহাই সংগৃহীত হইয়াছে। আর কোনও হাদিসে একটুখানিও দুর্ব্বলতার আভাস থাকিলে আমি তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছি।'

আবু দাউদ যেরূপ জ্ঞানী সেরূপ কর্ম্মী এবং চরিত্রবানও ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কতিপয় আলেম বলেন, 'চরিত্রের বিশুদ্ধতায় এবং ব্যবহারের অমায়িকতায় আবু দাউদ আহমদ বিন্ হাম্বলের মত ছিলেন। আহমদ বিন্ হাম্বলের চরিত্র অকীর মত ছিল। অকীর চরিত্র সুফিয়ানের চরিত্রের মত ছিল। সুফিয়ানের চরিত্র মনসুরের চরিত্রের মত ছিল । মনসুরের চরিত্র ইব্রাহিমের চরিত্রের মত ছিল। ইব্রাহিমের চরিত্র আল্কামার চরিত্রের মত ছিল।

www.pathagar.com

আলকামার চরিত্র ইব্‌নে মসুদের চরিত্রের মত ছিল। ইব্‌নে মসুদের চরিত্র হজরত মোহাম্মদের (দঃ) চরিত্রের মত ছিল।'

হাকেম বলেন—'আবু দাউদের সময় তাঁহার হাদিসে মতানৈক্য ছিল না।'

ইব্‌নে দাস্‌তা বলেন,—'আবু দাউদ এমনই পুস্তকপ্রিয় ছিলেন যে ভ্রমণকালে সঙ্গে পুস্তক রাখিবার জন্য কামিজের একটি আস্তিন বড় করিয়া সেলাই করিতেন, আর অতিরিক্ত খরচের ভয়ে আর একটি আস্তিন ছোট করিয়া সেলাই করিতেন।'

ইব্‌নে আবিদাউদ বলেন, 'আমি আমার পিতাকে বলিতে শুনিয়াছি যে, উত্তম কথা উহা, যাহা কানের সাহায্য ব্যতীত কানের ভিতর প্রবেশ করে।'

যাকেরিয়া বলেন,—'কোরান যেরূপ ইসলামের মূল সনদে আবুদাউদও সেরূপ ইসলামের মূল।'

সারাটি জীবন ভরিয়া ক্লান্তিহীনভাবে হাদিস সংগ্রহ করিতে করিতে ২৭৫ হিজরী যে দিন আবুদাউদের জীবনপ্রদীপ নিভিয়া গেল, সত্য সত্যই সে দিন সিজিস্তানের বুক হইতে একটি জ্বলন্ত জ্ঞান-শিখা কালের অন্তহীন শূন্যে চিরতরে বিলীন হইয়া গেল।

ইব্‌নে মাজা

আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ এজিদ ইবনে মাজা ইরাকের অন্তর্গত কাজবিন প্রদেশে ২০৯ হিজরী জন্মগ্রহণ করেন। ছয়টি বিশুদ্ধ হাদিস গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার সঙ্কলিত 'সনদে ইবনে মাজা' অন্যতম। এই বিশুদ্ধ হাদিস সংগ্রহ ব্যাপারে তিনি ইরাক, আরব, শাম, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি বহু দেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইবনে খালিকানের মতে, তিনি হাদিস ছাড়া কোরাণের টীকা এবং ইতিহাস সম্বন্ধে দুইখানি মূল্যবান পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

ইবনে মাজা বলেন, আমার হাদিস গ্রন্থ সঙ্কলিত হওয়ার পর আমি যখন তাহা সুপ্রসিদ্ধ আলেম আবিজরয়া'কে দেখাইলাম তখন তিনি তাহা দেখিয়া বলেন, 'আমার বোধ হয় এই হাদিস গ্রন্থ যখন লোকদের হাতে পড়িবে তখন ইহার পূর্ব্বকার বহু হাদিস বাতিল হইয়া যাইবে। আর এত বিরাট গ্রন্থের এতগুলি হাদিসের মধ্যে ত্রিশটি হাদিসও দুর্ব্বল পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। বিশেষতঃ এই বিরাট গ্রন্থে চারি হাজার হাদিস, বত্রিশ খণ্ড, এবং পনের শত অধ্যায় আছে। আর শৃঙ্খলা এবং সংক্ষিপ্ততার দিক দিয়াও ইহা অতুলনীয়।'

আবু ইয়ালী আল্ খলিলী বলেন—'হাদিস বর্ণনায় ইবনে মাজা যে পরম বিশ্বাসী, তিনি যে একজন হাদিস-কণ্ঠস্থকারী এবং হাদিস সম্বন্ধে তাঁহার যে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত।'

'সনদে ইবনে মাজা'র স্থান তিরমিজি নস্য়ি এবং আবু দাউদের উপরে। 'সনদে'র বিশুদ্ধতার হিসাবে কেহ কেহ ইহাকে 'সহি মুসলিম' হইতেও শ্রেষ্ঠ মনে করেন।

ইব্‌নে হজর 'তক্‌রিবুত্তাহাজীবে' বলেন, 'মোহাম্মদ বিন এজিদ ইব্‌নে মাজা ছিপছিপে গড়নের লোক ছিলেন। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ নেতা, হাদিসের হাফেজ, এবং তফসীর, ইতিহাস প্রভৃতি বহু পুস্তক প্রণেতা ছিলেন।'

www.pathagar.com

দিল্লীর প্রসিদ্ধ আলেম আবদুল হক্ মোহাদ্দেস বলেন, 'ইব্‌নে মাজার কেতাব ঐ সমস্ত কেতাবের অন্তর্ভুক্ত যাহা 'সেহাসিত্তা' বা 'উসুলে সেহাসিত্তা' নামে অভিহিত।'

'সনদে ইব্‌নে মাজা'র একটি হদিসে কজবিন প্রদেশের নাম উল্লেখ থাকাতে কোনও কোনও আলেম ইহাকে 'সেহাসিত্তা' শ্রেণীভুক্ত করিতে আপত্তি করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অন্য কয়েকজন আলেম এই কজবিন সম্বন্ধীয় হাদিসগুলিকে বাদ দিয়া ইহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছেন। বিশেষতঃ মোহাদ্দেসগণ যখন কোনও একটি হাদিস বর্ণনা করিয়া বলেন যে, এই হাদিসটি 'জামায়াত' বর্ণনা করিয়াছেন তখন সেই 'জামায়াত' শব্দে বোখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা, আবুদাউদ, নস্য়িকে বুঝায়। আর যখন বলা হয় এই হাদিসটি চারিজন বর্ণনা করিয়াছেন তখন ইব্‌নে মাজা, তিরমিজি, আবুদাউদ, নস্য়িকেই বুঝায়। ইহাতে সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হয় যে ইব্‌নে মাজার হাদিস গ্রন্থ 'সেহাসিত্তা' শ্রেণীভুক্ত।

জালাল উদ্দীন সইউতী, বোরহান উদ্দীন হলবী, মোহাম্মদ বদিউজ্জামান প্রভৃতি জ্ঞানিগণ 'সনদে ইব্‌নে মাজা'র টীকা ও অনুবাদ লিখিয়াছেন।

প্রিয় নবীর হাদিস সংগ্রহে সারা জীবন নিয়োজিত করিয়া ২৭৩ হিজরী ৬৪ বৎসর বয়সে ২২শে রমজান ইমাম ইব্‌নে মাজা এই নশ্বর জগতের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া অবিনশ্বর জগতে চলিয়া গিয়াছেন।

ইমাম মুসলিম

হুজ্জাতুল ইসলাম আবুল হুসেন মুসলিম বিন আল্‌হেজাজ খোরাসানের অন্তর্গত শিকাপুর প্রদেশে ২০৪ (কাহারও মতে ২০৬) হিজরী কশিরী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। হাদিস সংগ্রহের মহা প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া অতি বাল্যকালেই তিনি হেজাজ, ইরাক, মিসর, বোগ্‌দাদ, বোখারা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করতঃ প্রায় ২১৮ জন গুরুর নিকট হাদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে সাইদ আহমদ বিন ইউনূস, ইসমাইল বিন আবি উম্মেস, আহমদ বিন মনসুর, আহমদ বিন জম্বল, ইব্‌নে রাহবিয়া প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে তিরমিজি, ইব্রাহিম বিন আবিতালেব, ইব্‌নে খাজিমা, ইব্‌নে সাদ, প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। হাদিস সম্বন্ধীয় বিদ্যায় ইমাম মুসলিম যে খোরাসানের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই সম্বন্ধে আবু জরয়া এবং আবু হাতেম বলেন, 'সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে মুসলিম বিন হেজাজ সকলের শ্রেষ্ঠ।' আলেমপ্রবর ইসহাক কুসজ বলেন, 'হে মুসলিম বিন হেজাজ, খোদা আপনাকে যতদিন জীবিত রাখিবেন ততদিনই মুসলিম সমাজের হিত সাধন হইবে।'

ইমাম মুসলিম হাদিসের প্রতি যেরূপ অনুরক্ত ছিলেন, সেরূপ হাদিসের আদেশানুযায়ী কার্য্যও করিতেন। এক সময় তাঁহার জনৈক প্রতিবেশীর তাঁহার নিকট কিছু প্রাপ্য ছিল। তাঁহাকে তিনি বলিলেন—'দেখ বন্ধু, তুমি তোমার প্রাপ্য বস্তু লইবার জন্য আমার নিকট আসিও না। আমি তোমার বাড়ীতে যাইয়া তাহা দিয়া আসিব। কেননা রসুলউল্লাহ বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি তাহার প্রাপ্য বস্তু প্রত্যার্পণের জন্য নিজে হাঁটিয়া যায় তাহার প্রত্যেক পদবিক্ষেপের জন্য সে পুণ্য পাইবে। আর যে ব্যক্তি পথের কাঁটা সরাইয়া দেয় সেও পুণ্যের ভাগী হইবে।'

www.pathagar.com

আবিসদুক এবং অবিকোরায়েশ বলেন, 'দুনিয়াতে চারিজন হাদিস কণ্ঠস্থকারী আছেন, তন্মধ্যে ইমাম মুসলিম একজন।'

ইমাম মুসলিম তাঁহার সংকলিত 'সহি মুসলিম' সম্বন্ধে বলেন, 'আমি ত্রিশ হাজার হাদিস দ্বারা 'মুসলিম গ্রন্থ' সংকলিত করিয়াছি।'

আহমদ বিন সাল্‌মা বলেন, 'আমি ইমাম মুসলিমের সঙ্গে থাকিয়া পনর বৎসরে বাইশ হাজার হাদিস লিখিয়াছি।

আবু আলী নিশাপুরী বলেন, 'সহি মুসলিমে'র মত বিশুদ্ধ পুস্তক আকাশের নীচে আর নাই।'

বহু আলেমের মতে তিনি ছয় লক্ষ হাদিস হইতে 'সহি মুসলিম' সংকলন করিয়াছেন। আর তাহা সংকলনকালে অতি সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি এমনই পবিত্র জীবন যাপন করিতেছেন যে ভুলেও কখনও কাহারও নিন্দা বা কাহারও প্রতি মন্দ ব্যবহার করিতেন না।

ইমাম বোখারীর হাদিসে শামদেশবাসী একবার একটি ভুল বাহির করিয়াছিল, ইমাম মুসলিমের হাদিসে কেহ কখনও ভুল বাহির করিতে পারে নাই।

'সহি মুসলিম' ছাড়া তিনি 'আলমস্‌নদুল্‌ কবির', 'কিতাবুল ইফরাদ' প্রভৃতি অসংখ্য পুস্তক প্রণয়ন করতঃ তাঁহার জ্ঞানপিপাসু আত্মার এবং ক্লান্তিহীন জীবনের পরিচয় দিয়াছেন।

তাঁহার প্রসিদ্ধ 'মুসলিম' গ্রন্থ সম্বন্ধে তিনি বলেন, 'আমি বিনা প্রমাণে এই গ্রন্থে একটি হাদিসও স্থান দেই নাই, আর বিনা প্রমাণে একটি হাদিসও বর্জ্জন করি নাই।'

'আবু হাতেমরাজী বলেন, 'আমি এক রাত্রে ইমাম মুসলিমকে স্বপ্নে দেখিতে পাইলাম, তিনি বলিতেছিলেন, 'দয়াময় খোদা আমার জন্য স্বর্গবাসের অনুমতি দিয়াছেন। আমি ইহাতে যথাইচ্ছা তথা বিচরণ করিতে পারি।' ইমাম আবু আলীর মৃত্যুর পর জনৈক খোদাভক্ত ব্যক্তি তাঁহাকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি প্রকারে মুক্তি পাইয়াছেন?' তিনি বলিলেন, 'আমার হাতে যেই পুস্তকখানি আছে তাহাতেই খোদা আমায় মুক্তি দিয়াছেন।' তাঁহার হাতে তখন এক খণ্ড 'সহি মুসলিম' ছিল।

হাফেজ আবদুর রহমান বলেন, 'ইমাম বোখারী ও মুসলিম সম্বন্ধে লোকগণ যখন আমার সম্মুখে তর্ক করিতেছিল আমি তখন বলিলাম, বিশুদ্ধতার দিক দিয়া যেরূপ ইমাম বোখারী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, সুন্দর গাঁথুনির দিক দিয়া সেরূপ মুসলিম শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন।'

২৬১ হিজরী ইমাম মুসলিম বহু দেশ ভ্রমণ করতঃ নিশাপুরে আসিয়া স্থায়ীভাবে বাস করিতেছিলেন, এবং ঐ বৎসর ৫ই রজব সোমবার সন্ধ্যাকালে তাঁহার পুণ্য আত্মা নশ্বর দেহ ছাড়িয়া জান্নাতুল ফেরদাউসে চলিয়া যায়।

তাঁহার মৃত্যুও আশ্চর্য্যরূপে হইয়াছিল। কথিত আছে, তিনি বহু মোহাদ্দেসের সঙ্গে হাদিস প্রতিযোগিতা সম্মিলনীতে বসিয়া হাদিস আলোচনা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে জনৈক আলেম তাঁহাকে একটি হাদিসের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ঘটনাক্রমে সেই হাদিসটি তাঁহার স্মরণ ছিল না। তখন তিনি বাড়ীতে আসিয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তথায় এক বস্তা খোরমা ছিল। তিনি অন্যমনস্কভাবে খোরমাগুলির পাশে বসিয়া এক একটি মুখে দিতে দিতে

www.pathagar.com

হাদিসটি স্মরণ করিতেছিলেন। পক্ষান্তরে সেই হাদিসের চিন্তায় তিনি এমনই বিভোর ছিলেন যে, এক একটি করিয়া কতগুলি খোরমা তিনি খাইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁহার হুঁশই ছিল না। পরিশেষে যখন তিনি এক বস্তা খোরমা শেষ করতঃ শেষ খোরমাটি মুখে দিলেন, তখন তিনি জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

তির্মিজি

আবু ঈসা মোহাম্মদ বিন ঈসা তির্মিজি—বল্খের নিকটবর্ত্তী তির্মিজ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম জীবনের 'রশীদ বোখারী'র নিকট হাদিস শিক্ষা আরম্ভ করতঃ পরে ইমাম মুসলিম ও আবুদাউদের নিকট হইতেও হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন। হাদিস সম্বন্ধীয় উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি বস্‌রা, কুফা, খোরাসান, হেজাজ প্রভৃতি দেশ দেশান্তরে বহু বৎসর ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সেই ভ্রমণকালে প্রত্যেক দেশেই কিছু কিছু হাদিস মুখস্থ করিয়াছিলেন।

তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁহার 'জামেউত্ তিরমিজী' কেতাবখানি সর্ব্বদিক দিয়া অপূর্ব্ব ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রত্যেক হাদিসেরই বিশ্লেষণ করিয়াছেন—যেমন 'সহি', 'জয়িক', 'হাসান', 'গরিব' ইত্যাদি কোন হাদিস কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়া শিক্ষার্থীদের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ 'জামেউত তিরমিজি' অপেক্ষা সহজ ও সুন্দর গ্রন্থ কল্পনাও করা যায় না। আর এই বিরাট গ্রন্থ সংকলনকালে তিনি যেরূপ খোদাভক্তি ও ভয়ের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব। বোখারা নিবাসী তাঁহার জনৈক শিষ্য বলেন, 'ইমাম সাহেব ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে পরিশেষে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।'

ইমাম তিরমিজী বলেন, 'এই হাদিস গ্রন্থ সমাপ্ত করতঃ আমি বহু দেশের আলেমদিগকে তাহা দেখাইয়াছি। প্রথম হেজাজের আলেমদিগকে দেখাইয়াছি, তাঁহারা ইহা সম্পূর্ণরূপে পসন্দ করিয়াছেন। অতঃপর ইরাকের আলেমদিগকে দেখাইয়াছি, তাঁহারাও ইহাতে কোন ভুল পান নাই। তাহার পর খোরাসানের আলেমদিগকে দেখাইয়াছি, তাঁহারা এই কেতাবের বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। পরিশেষে উন্দুলুসের আলেম যখন এই কেতাব দেখিয়া শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন, তখন আমি আমার প্রিয় 'জামেউত তিরমিজী' গ্রন্থ সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশিত করিয়াছি।'

এক সময়ে ইমাম তিরমিজী সাহেব একখানি পুস্তকে দুইটি হাদিস প্রাপ্ত হন, এবং শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া তাহা মুখস্থ করিয়া লন। কিছুদিন পরে তিনি যখন মক্কায় যাইতেছিলেন তখন ঘটনাক্রমে সেই শিক্ষকের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই পরিচয়ের পর তিরমিজী সাহেব যখন সেই শিক্ষকের নিকট সেই হাদিস দুইটি মুখস্থ করার অনুমতি চাহিলেন তখন তিনি তিরমিজী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনার নিকট যদি সেই কেতাবটি থাকে তবে তাহা হইতে ঐ হাদিস পাঠ করুন।' বস্তুতঃ ঐ সময় তিরমিজী সাহেবের নিকট ঐ কেতাবখানি ছিল না, বরং একটি সাদা বই ছিল। তিনি দূরে বসিয়া সেই সাদা কাগজ দেখিয়া দেখিয়া ঐ হাদিস দুইটি মুখস্থ পাঠ করিতে লাগিলেন। ইহার পর ঐ গুরুপ্রবর যখন টের পাইলেন যে, ঐ পুস্তকে কালির দাগও নাই, সাদা সাদা পাতা দেখিয়া ইমাম তিরমিজী হাদিস পড়িতেছেন, তখন তিনি ভয়ানক রাগ করিয়া বলিলেন,—'তুমি নেহায়েত ধূর্ত্ত লোক, আমার

www.pathagar.com

সহিত প্রতারণা করিবার তোমার কি প্রয়োজন ছিল? তুমি পূর্ব্ব হইতেই অন্য কাহারও নিকট এই হাদিস শ্রবণ করতঃ বহুদিন হইতে তাহা মুখস্থ করিয়া করিয়া আজ আমার নিকট বাহাদুরী দেখাইতে আসিয়াছ? যাও যাও তোমাকে আমি আমার এ দুইটি হাদিসের অনুমতি দিব না।' পরিশেষে তিরমিজী সাহেবের অনুনয়ে শান্ত হইয়া তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা আমি এই চল্লিশটি 'গরিব' হাদিস বলিতেছি ; ইহা আমি ছাড়া আর কেহই জানে না ; যদি তুমি শুনা মাত্রই পুনরায় তাহা মুখস্থ বলিতে পার তবে অনুমতি পাইবে।' এই বলিয়া সেই শেখ বা গুরু চল্লিশটি জটিল হাদিস তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার বলা শেষ হইতে না হইতেই ইমাম তিরমিজী সেই হাদিসগুলি মুখস্থ বলিয়া দিলেন। বস্তুতঃ ইমাম তিরমিজী জীবনে একবার যাহা শ্রবণ করিতেন তাহা আর ভুলিতে পারিতেন না।

তাঁহার এই প্রকার তীক্ষ্ণ ও অসাধারণ স্মরণশক্তিতে বিমুগ্ধ হইয়া সেই ওস্তাদ প্রবর তাঁহাকে হাদিস বর্ণনা করিবার অনুমতি দিলেন।

২৭৯ হিজরী রজব মাসের ১৭ই তারিখ সোমবার রাত্রে তাঁহার জীবন-প্রদীপ চিরতরে নিভিয়া গেল।

www.pathagar.com

মুসলিম নারীর কথা

ডাক্তার শাম্‌স্‌ উদদীন আহ্‌মদ

ইসলামে অবরোধ নাই, আছে ইসলামী শরিয়তের 'হেজাব' ও তদনুমোদিত 'হারেম' অর্থাৎ নারীর আবরণ ও অন্তঃপুর।

হারেম কথাটি আরবী হারাম পদ হইতে নিষ্পন্ন এবং অর্থ হইতেছে 'নিষিদ্ধস্থান'—যেখানে সর্ব্বসাধারণ পুরুষের প্রবেশাধিকার নাই।

এই অন্তঃপুর কথাটি ইসলামের বহু পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিলেও ইসলাম ইহার উচ্ছেদ সাধন না করিয়া বরং ইহাকে বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য সুনিয়ন্ত্রিতই করিয়া দিয়াছে। বিশেষতঃ ইসলামের পর্দ্দা বা হেজাব সম্বন্ধে যে 'ফারজ' হুকুম আছে, তার সহিত এই হারেমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই বিদ্যমান। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা বন্য যাযাবর অবস্থা হইতে মানুষকে নিয়মাবদ্ধ পারিবারিক জীবনের অধীন করিয়া দিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা নারী জীবনের উৎকর্ষ ও প্রগতির লীলাস্থল।

এইখানে নারীর মর্য্যাদা জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে, তাহার নারীসুলভ প্রকৃতি ও চরিত্রের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অনুকূল আবহাওয়ার সাহায্যে লজ্জাশীলতা ও পবিত্রতার উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে। এতদ্বারা ইহাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, অন্তঃপুর প্রথা, নর-নারীকে অবাধ মেলা-মেশার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে। সেই বিপদ যে কতখানি মারাত্মক হইতে পারে, তার পরিচয় পাশ্চাত্য সমাজবিধি ও culture-এর পরিণতি (?) হইতেই আমাদের চোখে প্রস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। এতটুকু উপলব্ধি করিতে পারিয়াই প্রতীচ্যের নারী Dr. Helen Wilson মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে,—'Adults who intend to come together for vicious purposes cannot be prevented by any measure short of absolute separation of the sexes' : যে যত বড় শিক্ষিতই হউক না কেন, প্রত্যেকেরই পক্ষে এই মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। রক্তমাংস গঠিত দেহীর কোন না কোন সময় সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়া আদৌ অসম্ভব ও অস্বাভাবিক নয়। আমাদের মেয়েরা অন্তঃপুরে থাকিয়া সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতাই ভোগ করিতেছে, শৃঙ্খলিত বন্দিনীরূপে কাল কাটাইতেছে না।

সাধারণতঃ বলিতে গেলে আমাদের সমাজের নারীর ব্যক্তিত্ব, কর্তৃত্ব, মহত্ত্ব ও মহিমা অন্দরমহলেই অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া আমাদের চোখে ফুটিয়া উঠে। সেখানে তাহাকে জীবনের কোন দিক দিয়া ব্যাহত বা ক্ষুণ্ণ মনে করিতে পারি না, তথায় অবরুদ্ধ বন্দী বলিয়া তাহাকে কল্পনা করাই বৃথা।

সেখানে স্ত্রী গৃহিনী, কর্ত্রী—উপার্জ্জনশীল স্বামী তাহার অর্জ্জিত অর্থ স্বীয় স্ত্রীর হস্তে ন্যস্ত করেন, স্ত্রী সংসারের ছোট বড় যাবতীয় কার্য্য পরিচালনা করেন। সুযোগ সুবিধামত স্ত্রীও ঘরে থাকিয়াই শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া সংসার সমৃদ্ধ করিয়া তোলেন। ছেলেমেয়েদিগকে লালনপালন ও শিক্ষাদীক্ষা দিয়া থাকেন। বিভিন্ন কার্য্যে পরিশ্রম করিয়া স্বাস্থ্য অটুট ও শরীর

www.pathagar.com

কান্তিময় করিয়া তোলেন। আত্মীয় কুটুম্বের বাড়ীতে যাতায়াত করিয়া বাহিরের আলো বাতাসে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রফুল্লতা লাভ করেন। দরিদ্র নিরন্নকে দান-খয়রাত করিয়া ও পরিবারের ও পল্লীর বিভিন্ন লোকের সঙ্গে সদ্ব্যবহার দ্বারা স্বীয় অন্তরের সদ্‌গুণরাজি পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে সক্ষম হয়েছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি স্বাস্থ্যে, সম্পদে, স্নেহ-মমতায়, সদাচারে, সহানুভূতিতে ও চারিত্রিক মাহাত্ম্যে মহীয়সী হইয়া অধিষ্ঠান করেন। আমাদের উক্তির পোষকতার জন্য প্রতীচ্যের লেখক John Davenport-কে এখানে সাক্ষী করিতেছি।

'So far from the Harem being a prison to the women, it is a place of liberty, where the husband himself is treated as or interloper. The moment his foot passes the threshold, everything remains him that he is no longer lord and master. Children, servents and slaves look alone to the principal lady.; in short, she is paramount".

আমাদের অন্দরের মহিমা যে পাশ্চাত্য নারীরও আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আমরা Lady Dufferin-এর চিত্তাকর্ষক উক্তিতে দেখিতেছি—'Indeed, I can imagine many a weary and toiling woman in this our overcrowded and busy world sighing for such a harbour or refuge as the zenana might appear to afford'.

'And I certainly am able to have a more kindly sentiment towards the nation as a whole, because I have seen happy wife and happy mother in India, and because I believe in happy Indian homes'.

তবে আমাদের সমাজের কোন কোন অন্তঃপুরে যে নারীদের প্রতি নিগ্রহ ও নির্য্যাতন হইতেছে না তাহা আমরা বলি না। কোন কোন গৃহস্থঘরের বালিকা বধূর প্রতি অত্যাচারের খবর আমরা কিছু না কিছু রাখি। কিন্তু সে দোষ কাহার? আমাদের সমাজের অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও কুসংস্কার এজন্য দায়ী নয় কি? কেহ অন্দরের দ্বার খুলিয়া দিলে এ সমস্যার সমাধান হইবে না। মনে হয়, যে পর্য্যন্ত যথাযোগ্য শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা এ সকল পরিবারের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন সাধন করা না হইবে, সে পর্য্যন্ত রোগের প্রতিকার অসম্ভব।

এখন কথা হইল ইসলাম নারীকে বাহিরে যাইবার অধিকার দিয়াছে কিনা। মহানবী হজরত মহম্মদের (দঃ) চিরন্তন বাণী, 'প্রয়োজনের অনুরোধে বাহিরে যাইবার অধিকার আল্লাহ্‌তায়ালা নারীগণকে দিয়াছেন।' ইতিহাসের পৃষ্ঠার প্রতি তাকাইলে আমরা দেখিতে পাই, এই হাদিসকে অবলম্বন করিয়া মহান হজরতের (দঃ) আমলে, বিভিন্ন বংশীয় খলিফাদের সময়ে, ভারতের পাঠান মোগলের রাজত্বে, বহু প্রতিভাশালী সুযোগ্যা ধার্ম্মিকা বীরবালা ধর্ম্মানুষ্ঠানে, অধ্যাপনায়, রাজকার্য্যে, এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও যোগদান করিতে যাইয়া ঘরের বাহির হইয়াছেন। এখনও হজ্জব্রত উদ্‌যাপনে পুণ্যশীলা মুসলিম নারীরা আরব সাগর পাড়ি দিয়া থাকেন। এ অবস্থায় কি করিয়া বলা যায়,—ইসলাম, তথা মুসলিম, নারীর পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে?

কিন্তু কথা হইল এই যে, মুসলিম নারীকে দেশ, কাল, স্থান, পাত্র ও সুযোগ বিবেচনা করিয়া, বহির্গমনের প্রয়োজন ও কার্য্যের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এবং সর্ব্বোপরি শ্লীলতা, সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা রাখিয়াই ঘরের বাহির হইতে হইবে। আমার কথার পোষকতার জন্য নারী প্রগতির জনৈক বিশিষ্ট লেখকের সুরে সুর মিলাইয়া বলি যে, 'মানুষ সামাজিক জীব ;

www.pathagar.com

সমাজের কল্যাণ–অকল্যাণের দিকে চাহিয়া তাহাকে জীবনের অনেক কিছু নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। ... (তদুপরি) মানুষের জীবনে যৌন ব্যাপারই বোধ হয় সৃষ্টির চরম রহস্যময় কাণ্ড এবং এখানেই বোধ হয় মানুষের দুর্ব্বলতম বন্ধন। কাজেই সমাজে নরনারীর সম্বন্ধকে এমনিভাবে নিয়মাবদ্ধ করিতে হয়, যাহাতে মানুষের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া না হয়।'

কিন্তু নারী স্বাধীনতার প্রচারকেরা দিক–বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া যেন সর্ব্বসাধারণ নারীকে স্বাধীন ও অবাধ গতিতে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে যথেচ্ছা ভ্রমণ ও বিচরণ করিবার জন্য গুরু–লঘু নির্ব্বিশেষে তাকিদ দিতেছেন। মানুষের পক্ষে মানুষকে আলো বাতাস হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা যেরূপ বর্ব্বরতার পরিচায়ক, সেরূপ নর–নারীর জীবনের গতিকে অবাধ, অসংযত ও উচ্ছৃংখল করিয়া দেওয়া যে বর্ব্বরতার পরিচায়ক নহে, তাহা কে জোর করিয়া বলিতে পারে?*

---

* আধুনিক জগৎ নারীর ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীন পরিস্ফূরণ কামনা করে ; এজন্য নারীর আর্থিক অনধীনতাও তার কাম্য। এই আদর্শের সঙ্গে 'অন্তঃপুর জীবনে'র কোন বিরোধ আছে কিনা, অথবা বিরোধ থাকলেও কোন্ জীবন অধিকতর কল্যাণপ্রসূ, সেসব কথার আলোচনা লেখকের প্রবন্ধে থাকলে আনন্দের বিষয় হত। তিনি মুসলিম অন্তঃপুর জীবনের যে ছবি এঁকেছেন তার সঙ্গে মুসলিম অন্তঃপুর–বাসিনী'র আঁকা ছবির পার্থক্য কোথায় সেটি দেখতে পাওয়া যাবে ৪র্থ বর্ষের 'শিখা'য় মিসেস ফাতেমা খানমের 'তরুণের দায়িত্ব' প্রবন্ধে। লেখকের দীর্ঘ প্রবন্ধ থেকে এই অংশটুকু গ্রহণ করা গেল।

— শিঃ. স.।

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলমানের কথা

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ বি.এ., বি.টি.

হিন্দু-মুসলমান শিশুর শিক্ষা

হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্বন্ধে যত বক্তৃতা হইয়াছে তাহা একত্র ছাপিলে আকারে হয়তো Encyclopoedia Britannica-কেও ছাড়াইয়া যাইতে পারে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান বালকের শিক্ষার ভিতর দিয়া এ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার কথা আলোচনা হইতে কখনও শুনি নাই। উভয় বাড়ীর শিশু বাড়ীতে কি প্রকার ধারণায় অনুপ্রাণিত হয় এখন তাহাই বলিব। কিন্তু উভয় দিকটা না শুনিয়া আশা করি কেহই আমার প্রতি রুষ্ট হইবেন না।

প্রত্যেক শিক্ষিত হিন্দু পরিবারই এখন পত্রিকা-বিলাসী। তাহা ছাড়া মুদী দোকানে মুদী, কাপুড়িয়া দোকানের কাপুড়ে, এমন কি দুখানা গামছা লইয়া যে রাস্তার ধারে বসে তাহাকেও পত্রিকা পড়িতে এবং বিভিন্ন ব্যাপারের সমালোচনা করিতে দেখা যাইবে। পত্রিকা পাঠ ব্যাপারের শেষ conclusion এই—'মুসলমানের জন্য কিছু হইল না।' এই কথাটির মধ্যে রাজনৈতিক সত্য কতদূর আছে তাহা আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। শিশু মনের সবচেয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষাই হইতেছে 'জয়লাভ'। শিশু নিজে যতই দুর্ব্বল ও নিঃসহায় হউক না কেন, বীরত্ব, ত্যাগ ও রোমাঞ্চকর সাহসিক কার্য্যাদি তাহাদের প্রাণে পুলক আনয়ন করে। যখন হিন্দু সমাজের এত বীরত্ব কেবল মুসলমানের জন্যই পণ্ড হইয়া যাইতেছে তখন এই জাতটার প্রতি তাহার বিদ্বেষ হওয়ার মধ্যে কিছুই অস্বাভাবিক নাই।

এখানে ওখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাগুলির জন্য মুসলমান দায়ী না হিন্দু দায়ী এ প্রশ্ন মীমাংসা করিতে চেষ্টা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সাধারণ হিন্দু-শিশু বাড়ীতে সমস্ত দাঙ্গার মূলে মুসলমান বলিয়াই শুনে। যে সকল বিশেষ স্থানে হিন্দুগণ মুসলমানকে কিছু 'নেস্ত-নাবুদ' করিতে সক্ষম হন সেখানকার সম্পর্কে হিন্দু শিশু শুনিয়া থাকে, 'বীরত্বে হিন্দু আর কাহারও অপেক্ষা কম নয়।' যেখানে মুসলমানেরা কিছু 'গালেব' হন সে সম্পর্কে হিন্দু শিশু শুনে, 'মুসলমানগণের হৃদয়ে সাধারণ মানবোচিত দয়াধর্ম্মও নাই' ইত্যাদি।.....

বাড়ীতে হিন্দু বালক যে সাহিত্যচর্চ্চা শুনে তাহা মুসলমান-বিদ্বেষ দুষ্ট। জগতে সকল জাতির ইতিহাসেরই একটা কলংকের দিক আছে। কিন্তু মুসলমানের কলংকের দিকটা হিন্দু শিশুকে অনেক বড় করিয়া দেখান হয়। মোটের উপর সকল প্রকার দোষ-গুণ বিচার করিয়া সম-দেশবাসী মুসলমানের উপর হিন্দু শিশুর একটা সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে এমন কোন শিক্ষাই তাহাকে দেওয়া হয় না।

মুসলমান বালকের প্রতি হিন্দু বালকের খারাপ মনোভাবের কয়েকটা বিশেষ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া আমি আমার জনৈক হিন্দু বন্ধুকে বলিয়াছিলাম যে, 'হিন্দু শিশুকে বাড়ীতে ইচ্ছা

www.pathagar.com

করিয়াই মুসলমানকে ঘৃণা করিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।' বন্ধু বলিলেন, 'আমার ছেলে যখন চক্ষের সম্মুখে দেখিল যে মুসলমানগণ বিনা কারণে আমার বাড়ী ঘর লুণ্ঠন করিয়া তথায় আগুন ধরাইয়া দিতেছে, তখন আমি তাহাকে মুসলমানগণকে ভালবাসিতে শিক্ষা দিলেও সে তাহা শিখিবে না।' আমি বলিয়াছিলাম, 'আমার সম্মুখে বিশটি মুসলমানকে হিন্দুগণ বধ করিলেও আমি আমার পুত্রকে 'হিন্দু জাতিটা খারাপ' একথা শিক্ষা দিতে সাহস করিতাম না। কারণ লুণ্ঠন, দস্যুতা, নরহত্যা, এইগুলি সমাজের স্বাভাবিক অবস্থা নয়। আমি জানি সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় আমার পুত্রকে দিনরাত বাধ্য হইয়াই হিন্দুর সহিত আদান প্রদান করিতে হইবে। সে যাহাকে শত্রু বলিয়া জানে তাহার সহিত কোন প্রকার আদান প্রদানেই সে সুবিধা করিতে পারিবে না।

অন্যদিকে মুসলমান বালক বাড়ীতে শিক্ষা করে, 'মুসলমান হোনা বড়ি নেয়ামত হ্যায়।' যে স্কুলে কেবল মুসলমানই পড়ে এমন স্কুলে পড়িতে পারিলেই সে সুখী হয়। ইংরেজী বাংলা যে তাহাকে পড়িতে হয় তাহা কেবল দুনিয়াদারীর কয়েক দিনের জন্য। হিন্দুরা দুনিয়াদারীর যে সম্পদ ও প্রতিপত্তি ভোগ করিতেছেন আরবী শিক্ষা দ্বারা তাহার অর্দ্ধেক হাসিল হইলেও বাকী অর্দ্ধেকের দাবী সে আল্লার ওয়াস্তে ত্যাগ করিতে পারিত ; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কেয়ামত 'নজদিক' বলিয়া তাহা হইবার নহে। ইংরেজী শিক্ষা, ইংরেজী বিজ্ঞান, তাহাকে অন্ততঃ দুনিয়াদারীর জন্য শিখিতে হইতেছে। হিন্দু-ইতিহাসের যেটুকু তাহাকে শিখিতে হয় তাহা সে বড়ই অনিচ্ছার সহিত শিক্ষা করে। সত্যকে বুঝিবার জন্য ও পাইবার জন্য বুদ্ধের রাজ্য-ঐশ্বর্য্য ভোগকে নবীন বয়সে ত্যাগ করিয়া যাওয়ার মধ্যে সে মহীয়ান কিছু দেখিতে শিক্ষা করে না। যে উদার আদর্শ লইয়া মুসলমান বাদশাহ্ ও নবাবগণ রামায়ণ মহাভারতের ও অন্যান্য পুস্তকের ফার্সী ও বাংলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন সে আদর্শ মুসলমানের আর প্রাচীন হিন্দুর সাধনার মধ্যে কোন 'রোমান্স' পাইতেছেন না। সুতরাং মুসলমান শিশু ইতিহাসের হিন্দু অংশটুকু পরীক্ষার জন্য মুখস্থ করে। একেত মুসলমান-গৃহে শিক্ষাপ্রদ আবহাওয়া একান্ত কম, তাহাতে আবার এই সকলে মিলিয়া হিন্দু সম্বন্ধে সে কখনও উচ্চ ধারণা পোষণ করিতে শিখে না।

মুসলমান শিক্ষায় যতই অবনত হউক না কেন, সে এই কথা এখন ধরিতে পারিয়াছে যে, হিন্দু সময় সময় তাহার উচ্চ শিক্ষাকে জগতের চক্ষে মুসলমানকে হেয় প্রতিপন্ন করিতে নিয়োজিত করিতেছে। সকল স্থানে হিন্দু মুসলমানের নামে যে সকল অলীক এবং আজগুবী কথা প্রচার করিতেছেন, সে সকল কথা প্রায় মুসলমান বাড়ীতে সংবাদপত্র চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত হইয়া থাকে। মুসলমান বালক এই সকল কথা দিন দিন গলাধঃকরণ করিয়া যাইতেছে। এই সকল বালক যুবক হইয়া হিন্দুর প্রতিবাদ করিতে যাইয়া অনেক সময় সংযম ও সমীহের সীমা অতিক্রম করিয়া বসিতেছে। মোটের উপর শিক্ষার ও বিশেষ করিয়া গৃহ শিক্ষার, গুণেই মুসলমান ও হিন্দু বালক নিজেদের অজ্ঞাতসারে একে অন্যকে ঘৃণা করে।

যদি হিন্দু মুসলমানের একে অন্যকে বধ না করিয়া রক্ষা করার মধ্যেই পুণ্য থাকিয়া থাকে ; যদি উভয়ের মিলন দ্বারা উভয় জাতির ধর্ম্মের নিকৃষ্টতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্বই কোন কালে প্রমাণ করা যাইবে না একথা সত্য হয়, তবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় বালকের গৃহ-শিক্ষার মধ্যেই পরিবর্ত্তন আনয়ন করা দরকার। যে কোন স্কুলেই হিন্দু মুসলমান

www.pathagar.com

বালকের একের অন্যের প্রতি এইরূপ সহানুভূতিহীন attitude সর্ব্বত্রই অল্পাধিক পরিলক্ষিত হইবে। তবে সুখের বিষয় কিছু সংখ্যক বালক এই সকল ভাব বর্জ্জিত, প্রকৃত সহানুভূতিসম্পন্ন পাওয়া যাইবে।

মুসলমানেরাও যে জগতকে অনেক কিছু মূল্যবান দান করিয়াছেন, একথা সত্যকার সহানুভূতির সহিত হিন্দু ছেলেকে শেখান দরকার, মুসলমানদের মহাপুরুষগণ যে কেবল তৃতীয় শ্রেণীর মহাপুরুষ নন একথাও হিন্দু শিশুকে শেখান দরকার। সত্যের জন্য ধর্ম্মের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পথে বাহির হওয়ার দৃষ্টান্ত মুসলমানের মধ্যেও আছে, একথা আমার কয়েকটি হিন্দু ছাত্রকে বিশ্বাস করাইতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইয়াছিল।

অন্যদিকে বিশ্বজগত যে হিন্দু কাল্চারকে একটা উচ্চ আসন দিয়াছে, এ কথা মুসলমান বালককেও শিক্ষা দেওয়া দরকার। জগতে অহিন্দুগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে মুসলমানেরাই হিন্দু বিজ্ঞান ও নীতি ও চিকিৎসা শাস্ত্র অনুবাদ করাইয়াছিলেন। যাঁহারা এই কার্য্যের অগ্রণী ছিলেন সেই আরবীয় খলিফাগণ ভারতের হিন্দুদের সহিত বসবাস করেন নাই। অথচ আজ হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি বাস করিয়া একে অন্যের 'কালচার' গ্রহণ করিতে এত অনিচ্ছুক!

হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার

হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নূতন এক বিঘ্ন হইতেছে একের অন্যের ধর্ম্ম গ্রহণ। সেইদিনও করাচীতে রামানন্দ বাবু বলিলেন যে, হিন্দুগণ আপনাদের নষ্ট সংখ্যা পুনরুদ্ধার করিতে চাহেন। তাহা হইলে হিন্দুগণ ভারতে হিন্দু প্রধান বা হিন্দু রাজত্ব পুনঃ স্থাপন করিতে চাহেন এ কথা অস্বীকার করেন কেন? আমরা বুঝি, যে ধর্ম্ম মানুষকে কল্যাণের দিকে যত আকর্ষণ করিতে পারিবে মানুষ ততই সেই ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকিবে। আপন মুক্তি ও কল্যাণ কামনা করা মানুষের সাধারণ আত্ম-অনুভূতির অন্তর্গত। সুতরাং যে ধর্ম্মের নীতি বা পালন দ্বারা মানুষ উচ্চ, মহান হইতে পারে, যে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া মানুষ মনের শান্তি, প্রাণের আরাম বোধ করিবে, সে ধর্ম্মের দিকে'ত মানুষ ঝুঁকিবেই। গায়ের জোরে মানুষকে সে আকর্ষণ পথ হইতে ফিরান যাইবে না। যদি এই কথা স্বীকার করি, তাহা হইলে বলিতে হয়, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর আপন আপন ধর্ম্ম প্রচার করিবার অধিকার আছে। সে অধিকার প্রত্যেক হিন্দুকে প্রত্যেক মুসলমানের যেমন দিতে হইবে প্রত্যেক মুসলমানকে প্রত্যেক হিন্দুরও তেমন দিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে যাহারা অপরকে এই অধিকার দিতে নারাজ তাহারা আপন ধর্ম্মের আকর্ষণী শক্তি এবং Potency-তে বিশ্বাসবান নহেন। এইখানেই 'Cat is out out of the bag' হইয়া পড়ে। নিজের ধর্ম্মের কল্যাণ দ্বারা আকর্ষণের শক্তিতে তোমার আস্থা নাই, তুমি চাও আপনার দল ভারী করিতে। তাহাই যদি হয় তবে ধর্ম্ম বেচারাকে ইহার মধ্যে টানিও না। কারণ তদ্দ্বারা নিজেরাই ধ্বংসপথে পতিত হইবে। প্রকৃত ধর্ম্মের পোষণ করিবার শক্তি যেমন অসাধারণ, শাসন করিবার শক্তিও তেমন অসাধারণ। যাহারা ধর্ম্মের নামে কোনও এক বিশেষ মতলব চালাইয়াছে তাহারাই পতিত হইয়াছে।

www.pathagar.com

আজ মুসলমানের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারটা লক্ষ্য করিলে চট্টগ্রাম অঞ্চলের একটি গানের কথা মনে পড়ে—

আমার মনের দুখ কারে কই
যার লাগি বৈরাগী হইলাম
তারে পাইলাম কই।

আজ ইসলাম ইসলাম করিয়া জগতের সব কিছু বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছি—কিন্তু ইসলাম কোথায়? তাহার spirit আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে। গত পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমার গ্রামে এবং তাহার চতুষ্পার্শে দুই মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্ততঃ চারিটি পাকা মস্‌জিদ প্রস্তুত হইয়াছে। এর মধ্যে অন্ততঃ তিনটির ইঁট সুরকীর মূল্য হিন্দু মহাজনের খাতায় অঙ্ক হইয়া বিরাজ করিতেছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি মস্‌জিদের মধ্যস্থিত ব্যবধান একশত হাতও হইবে না। পিতা পড়েন এক মস্‌জিদে নামাজ এবং পুত্র পড়েন অপরটিতে। পুত্র যখন আপনার জমাতের মস্‌জিদের জন্য আজান দিতে থাকেন, তখন পিতা অপর মস্‌জিদের প্রাঙ্গণ হইতে বলিয়া থাকেন, দূর-দূর-লানত-জাহান্নামে যা। এই দুইটির নূতনটিতে এই অধম লেখকও নামাজ পড়িয়া থাকে, কারণ অপরটিতে ঢুকিতে জানের ভয় আছে। এই মস্‌জিদটি অল্প দিন হইল নির্ম্মিত হইয়াছে। নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে আমি দেশের মওলানা সাহেবকে বলিয়াছিলাম—'পাঁচ মিনিটের পথ দূরে বাদশাহী আমলের প্রকাণ্ড মস্‌জিদটি বিরাণ পড়িয়া থাকে, সেখানে যাইয়া নামাজ পড়িলে ক্ষতি কি?' তিনি বলিলেন, 'যে সকল উম্মি লোগ আমার জামাতে আছে তাহারা পাঁচ মিনিটের পথ দূরে যাইতে হইলে আর নামাজই পড়িবে না। সুতরাং আমি গোনাগার হইব। সুতরাং কি করি, একটা নূতন মস্‌জিদ তৈয়ার করিয়া লওয়া যাউক। কারণ যেটিতে এত দিন নামাজ পড়িতাম সেটিতে যে আমাদিগকে প্রতিপক্ষ ঢুকিতে দেয় না।' আমি বলিলাম, 'একটি মস্‌জিদের এত নিকটে আর একটি পাক্কা মস্‌জিদের বুনিয়াদ করিলে ইহা চিরদিনের কলহের কারণ হইয়া থাকিবে। আর পাঁচ মিনিটের পথ যাইয়া যাহারা নামাজ পড়িতে নারাজ তাহাদের নামাজ পড়িয়াও কোন লাভ নাই।' মওলানা সাহেব তখন আমাকে দীর্ঘ ফতোয়া দেখাইলেন, সেই ফতোয়ার চুম্বক এই—এক মসজিদে এত্তেফাক বা মিল না থাকিলে মসজেদের মাঝখান দিয়া দেওয়াল দিয়াও নামাজ পড়িতে দোষ নাই। সেই ফতোয়াখানিতে বহু হিন্দুস্থানী মওলানা দস্তখত করিয়াছেন। তখন আমার মনে হইল মওলানা হালীর দুইটি লাইন—

ایا عقل و لین سی نه کیج کام انون لی
کیا لین مو حقا کو بد نام انهوننی
وهلین جسلی اعلا کو اخوان بنا یا
وحوش اور بها ئم کو انسان بنا یا

আমরা আজ কাল اعدا কে اخوان (শত্রুকে ভাই) করিব কি জগতের সর্ব্বত্র আমরা اخوان কে اعدا ভাইকে শত্রুতে পরিণত করিয়া ফেলিতেছি। এই ভারতবর্ষে সাত কোটি 'পারিয়া'কে হিন্দুগণ অনেক সময় সদর রাস্তায় চলিবার অধিকার পর্য্যন্ত দিতে চাহেন না। আজ ইংরাজের কল্যাণে এই 'পারিয়া' গণও এমন লোক প্রস্তুত করিতে পারিতেছেন যিনি ইংরেজ রাজ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধির সহিত সমান আসন পাইতে পারেন।

এই 'পারিয়া' গণকে আমরা اخوان করিয়া ফেলিতে পারি নাই। তাহারাও আমাদের সহিত শত্রুতার উল্লেখ করিয়া উচ্চতর হিন্দু সমাজে মিশিবার জন্য propaganda করিতেছে।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ ও বৈরাগ্য-বিলাস

মোতাহের হোসেন চৌধুরী বি. এ

১

রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য-বিলাসিতার চির-বিরোধী। তাঁর সমগ্র কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে এমন কতকগুলি স্থান দেখতে পাওয়া যায় যা' বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। বাস্তবিক পক্ষে এই জরায়-মরা দেশে যেখানে জন্মলাভ করা মাত্র 'ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা', 'দুনিয়া কিছু নয় সব ফাঁকি' এ প্রকারের নানা বৈরাগ্যসূচক বচন শুনতে হয়, সেখানে রবীন্দ্রনাথই প্রথমে জীবনের গান গেয়ে এসেছেন। অবশ্য তাঁর আগেও কেউ যে এ ধরনের গান গাননি তা' নয়। তবে যাঁরা গেয়েছেন তাঁদের ভিতর মৌলিকতা জিনিষটা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। তাঁদের কেউবা ইংরাজ কবির কবিতা অনুবাদ করে গেছেন, আর কেউবা ইংরাজ কবির কবিতা হতে অনুপ্রেরণা লাভ করে লিখতে প্রয়াস পেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ Longfellowর Pslam of lifeর অনুবাদ কর্ত্তা হেম বাবুর নাম করা যেতে পারে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সুর তাঁর নিজস্ব, তাঁর অন্তরের স্বতঃউৎসারিত সুর। এই বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময়ী ধরণী তাঁর নিকট মিথ্যা বলে মনে হয়নি। এই মুক্ত নীল আকাশের তলে শ্যামল দুর্ব্বাদলের উপরে বসে কি-এক অনির্ব্বচনীয় রসে তাঁর অন্তরআত্মা পুলকিত হয়ে উঠেছে! তাঁর অনন্ত রূপ পিয়াসী মন এই অপরূপ রূপসী পৃথিবীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে তার কান্না-হাসি, আলো-ছায়ার খেলার মাঝে বাঁচবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। বাস্তবিক এই স্বাভাবিক বাঁচবার সাধটিই মানুষ তার বুদ্ধির দ্বারা ঢেকে রেখে বিশ্বের প্রতি বৈরাগ্য প্রকাশের দ্বারা নিজের বুজরগী জাহির করতে চেষ্টা করে। মনে করে, দুনিয়াকে অবহেলা করলেই বুঝি মস্ত বড় একটা কাজ করা গেল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ ভান করেন নি। তিনি তাঁর মনের কথাটি চাপা না দিয়ে বলে ফেলেছেন—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই!
ধরায় প্রাণের খেলা চিরতরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রুময়—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি অমর-আলয়!

www.pathagar.com

তা' যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই।
হাসি মুখে নিয়ো ফুল; তার পরে হায়,
ফেলে দিয়ো ফুল, যদি সে ফুল শুকায়॥

বাংলা সাহিত্যে এ একেবারে অপূর্ব্ব। ধরণীর প্রতি এমন প্রাণের টান এদেশে আর কোন কবির কাব্যেই দেখা যায় না। আশ্চর্য্য এই যে, যে দেশে কি দর্শনে, কি কাব্যে জগত ও জীবনকে 'কিছু না' বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারই রসাল নন্দনে' ধরনের গানই চির-পরিচিত ও চির-আদৃত, সে দেশের কবি রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়েই বেরিয়েছে—

স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্যে থাক দুঃখে-সুখে-অনন্ত-মিশ্রিত
প্রেমধারা অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গ খণ্ডগুলি॥

কী নিবিড় ধরণী-প্রীতি ফুটে উঠেছে এ কটি লাইনে! আমাদের মত সাধারণ মানুষের নিকট এ বড় অদ্ভুত বলে মনে হয়। কারণ আমরা দেখছি সব মানুষই মরছে, কেউই অমর হয়ে থাকছে না; এবং এই দেখে ঠিক করে নিয়েছি যে, মরণটাই মানুষের জন্য সত্য, জীবনটা মিথ্যা। কিন্তু এটুকু ভেবে দেখছিনে যে যত দিন বেঁচে আছি ততদিন এই জীবনটারও একটা মূল্য আছে, এবং সে মূল্য একটা বড় রকমের মূল্য।

রবীন্দ্রনাথের নিকট জীবনের সত্যতা আলোকের মত উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি জানেন, মরণটা যেমন সত্য, জীবনটাও তমনি সত্য। তাঁর মতে জীবনটাকে এড়িয়ে চললে খুব বড় একটা শক্তিমত্তার পরিচয় দেওয়া হয় না, বরং হীন দুর্ব্বলতারই পরিচয় দেওয়া হয়। জগত, জীবন ও মরণকে তিনি কিভাবে দেখেছেন 'বলাকা'র একটা কবিতায় তা' অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন—কিভাবে তিনি এই জগতকে ভালোবেসেছেন। তাঁর সমস্ত জীবন এই জগতের সঙ্গে জড়িত হয়ে গেছে। প্রভাত সন্ধ্যার আলো-অন্ধকার তাঁর চেতনায় ভেসে গেছে। কিন্তু তিনি এও জানেন যে, একদিন তাঁকে এই জগত হতে বিদায় নিতে হ'বে—একদিন তাঁর বাণী আর এ বাতাসে ফুটবে না, তা'র আঁখি আর এ আলোকে লুটবে না;—একদিন তাঁকে তাঁর শেষ দৃষ্টি, শেষ কথা, শেষ করে যেতে হবে। কিন্তু এ চিন্তার দ্বারা আমাদের মত তাঁর চিত্ত অবসাদগ্রস্ত হয়নি, তাঁর অন্তরের আনন্দ উবে যায়নি। কেননা তিনি জানেন—

এমন একান্ত করে চাওয়া
    এও সত্য যত—
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
    সেও সেই মত।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনখানে আছে কোন মিল;

www.pathagar.com

নহিনে নিখিল
এত বড় নিদারুণ প্রবঞ্চতা
হাসি মুখে এত কাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

এই তাঁর বিশ্বাস, এবং এই বিশ্বাসই তাঁর অন্তরকে বলীয়ান ও উৎসাহপূর্ণ করে তুলেছে। এই বিশ্বাস আছে বলেই তিনি এই 'জগতের পাকে পাকে ফেরে ফেরে' ভালোবাসতে শিখেছেন। তাঁর জগতকে ভালোবাসার প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁর অন্তরের কবিজন-সুলভ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যানুভূতি। এই সৌন্দর্য্যানুভূতিই তাঁকে চালিত করে নিয়েছে রূপের পথ দিয়ে, ভোগের পথ দিয়ে, এবং শেষে অরূপ রাজার দুয়ারে এনে হাজির করেছে। অন্য কথায় সৌন্দর্য্যানুভূতি শেষে সর্ব্বানুভূতিতে পরিণত হয়েছে।

২

এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যানুভূতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা উচিত মনে করি। প্রথমে 'কড়ি ও কোমলে'র সনেটগুলিতেই তাঁর সৌন্দর্য্য প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। এই কবিতাগুলিকে অনেকে ভোগের কবিতা বলে উল্লেখ করে থাকেন, এবং এই জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনেকের নিকট খোঁচাও খেতে হয়েছে। আমরাও এগুলো ভোগের কবিতাই বলি ; কিন্তু ভোগের কবিতা বলে এ উপেক্ষার বস্তু মনে করিনে। ভোগের যে একটা সত্য আনন্দ আছে তাই এই কবিতাগুলোয় ফুটে উঠেছে। এই সম্বন্ধে 'রবীন্দ্র কাব্যপাঠে'র লেখক অধ্যাপক ওদুদ সাহেবের উক্তি তুলে দিচ্ছি :—

'এই সব সনেটের কতকগুলোর ভিতরে যে ভোগের সুর বাজছে তার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট নিন্দা সহ্য করতে হয়েছে। মনে হয়, নানা অর্দ্ধ সত্যের অত্যাচারে আমাদের জাতীয় জীবন বড় ক্লিষ্ট বলেই একটুখানি সংস্কারমুক্ত হয়ে কাব্যের সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার ক্ষমতা আমাদের ভিতরে এমন ব্যাহত। কাব্য আত্মারই এক প্রকাশ, কাজেই এর সৌন্দর্য্যও 'ন বলহীনেন লভ্যঃ।'

এই ভোগের 'কুসুমের কারাগার' থেকে উদ্ধার পাবার জন্য পরে কবির অন্তরে আকাঙ্ক্ষা জেগেছে বলেই যে কবি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র তা' সত্য নয়। অনেক বড় কবির ভিতরে এ বিদ্রোহ জাগেনি। তাই বলে তাঁদের কাব্য আমাদের কম প্রিয় নয়। .....

তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদেরও বিশেষত্ব আছে। নৈতিক বোধ তাঁর ভিতর দুর্ব্বল ছিল, পরে সবল হয়েছে বলে যে তাঁর মনে এই প্রতিবাদ জেগেছে তা সত্য নয়। কুসুমের কারাগারে বদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা তাঁর পক্ষে যেমন স্বাভাবিক, এর থেকে মুক্তি পাওয়ার ইচ্ছাও তাঁর ভিতরে তেমনি বলবতী। কেননা, এই দুই-ই একই মূল থেকে উৎসারিত হচ্ছে—তাঁর ভিতরকার সেই চিরজাগ্রত রহস্যের সন্ধানপরতা থেকে।' ওদুদ সাহেবের সঙ্গে আমরাও একমত। কবি গুরুর নিকট চিরদিনই নতুনের ডাক আসছে, আর তা'রই উত্তরে তিনি পুরাতনের জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে সাড়া দিয়ে উঠছেন।

'কাড়ি ও কোমলে'র সনেটগুলি ক্ষুদ্র হলেও এক একটি সৌন্দর্য্যের আকর। 'যৌবন স্বপ্ন' কবিতায় তিনি বলেছেন—

www.pathagar.com

আমার যৌবন—স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।
পরাণে পুলক বিকাশিয়া বহে কেন দক্ষিণা বাতাস
যেথা ছিল যত বিরহিনী সকলের কুড়ায়ে নিশ্বাস।
বসন্তের কুসুম-কাননে গোলাপের আঁখি কেন নত?
জগতের যত লাজময়ী যেন মোর আঁখির সকাশ
কাঁপিছে গোলাপ হয়ে এসে, মরমের শরমে বিব্রত।
প্রতি নিশি ঘুমাই যখন পাশে এসে বসে যেন কেহ,
সচকিত স্বপনের মতো জাগরণে পলায় সলাজে।
যেন কার আঁচলের বায় উষায় পরশি যায় দেহ,
শত নূপুরের রুনুঝুনু বনে যেন গুঞ্জরিয়া বাজে।
মদির প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটে ফুটে বকুল-মুকুলে;
কে আমারে করেছে পাগল—শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে,
যেন কোন্ উর্ব্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

'কড়ি ও কোমল' রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের লেখা। সুতরাং এর কবিতাগুলিতেও যৌবনসুলভ ভোগানুরাগ বর্ত্তমান। জগতের সকল বৈচিত্র্যই এখন তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু নারী সৌন্দর্য্য যতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে ততটা আর কিছুই পারেনি। 'যৌবন স্বপ্ন' কবিতাটিতে কবি যৌবনের চিরন্তন রূপটিকে কি অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। চিরদিনই এটি যুবকদের জন্য নতুন আনন্দ বহন করে আনবে। এ কবিতাটি শুধু কবির নিজের মনের কল্পনা নয়, সমগ্র যুবক সম্প্রদায়েরই মনের কথা। দুর্ভাগা আমরা যা প্রকাশ করতে পারছিনে—অথচ প্রাণের ভিতর আকুলি বিকুলি করছে, যে ভাবটা আমাদের নিকট সম্পূর্ণ ধরা না দিয়ে 'অর্ধেক ধরা পড়েছি গো অর্ধেক আছে বাকি' অবস্থায় আছে, সেই কথাটা এবং সেই ভাবটাই রবীন্দ্রনাথের কলমের একটু আঁচড়ে ফুলের মত বিকশিত হয়ে উঠেছে।

'চুম্বন' নামক কবিতাটিও একটি ভোগের কবিতা—

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা,
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে—
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থ যাত্রা করিয়াছে অধর সঙ্গমে।

* * * *

দুখানি অধর হতে কুসুমচয়ন
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে?
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর শয়ন।

আমরা এ কবিতাটিকে আর ভেঙেচুরে দেখাবার চেষ্টা করলাম না, কেননা, তাতে সৌন্দর্য্য হানি হবার আশংকা আছে। সৌন্দর্য্য মানুষের চেহারাতেই পরিলক্ষিত হয়। এই জন্য আর

www.pathagar.com

তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি ফেড়ে বিশ্লেষণ করে দেখাতে হয় না। কারণ, তা করলে যা' বের হয় তা' হাড়গোড় নাড়িভুঁড়ি ছাড়া আর কিছুই নয়, এবং সেগুলি যে কত সুন্দর তা' সকলেরই জানা আছে।

'রাহু', 'অঞ্চলের বাতাস', 'দেহের মিলন', 'তনু', 'হৃদয়-আসন', 'কল্পনার সাথি', 'হাসি' প্রভৃতি এবং আরো কতকগুলি কবিতাও ভোগের কবিতা। এগুলির সৌন্দর্য্য এক তাঁরাই নিবিড়ভাবে অনুভব করবেন যাঁরা একটি রঙ্গীন মন, তথা, কবিতার রক্ত গ্রহণ করবার একটি স্বাভাবিক শক্তি নিয়ে এসেছেন। আর যাঁরা প্রথমেই কবিতা থেকে উপদেশ গ্রহণ করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকেন, সেই হতভাগ্য অরসিকদের পক্ষে এগুলির রস আস্বাদন করবার পথ একেবারে বন্ধ। কারণ, আমাদের মনে হয়, ফাল্গুনীর কবিশেখর যে বলেছেন, 'আমার কবিতা বুঝবার নয়, বাজবার জন্য', এ কথাটি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই কথা।

জীবনকে ভালোবেসেছেন বলে জীবনের একটা দিক ভোগকেও তিনি অবহেলা করেন নি। অবহেলা করলে হয়তো বুদ্ধিমানের কাজই করতেন, কেননা, তা হলে তিনি নিন্দা হতে মুক্তি পেতেন ; কিন্তু সত্যকে ফাঁকি দেওয়া হত।

নারী সৌন্দর্য্যকে আমরা তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকি, কিন্তু এই নারী-সৌন্দর্য্য যে কীভাবে আমাদের জীবনকে মহিমান্বিত করে তুলেছে সে দিকে আমরা মোটেই দৃক্‌পাত করিনে। যখন যৌবন আমাদের দুয়ারে এসে হাজির হয় তখন রমণীর রূপ-লীলা আমাদের নিকট কতই না মোহন হয়ে দেখা দেয়। মনে হয়, তার চলার ভঙ্গি, চোখের চাউনি, কণ্ঠের সুর, মুখের হাসি, সমস্তই আমাদের হৃদয়ের সুরের সঙ্গে বাঁধা ;—মনে হয়, আমাদেরই মনের স্বপ্নময়ী রঙ্গীন ইচ্ছাখানি তরুণী -আকারে, তন্বী-আকারে হয়ে মূর্ত্ত উঠেছে। সৌন্দর্য্য-প্রিয় কবির নিকট সে যে আরো সুন্দর হয়ে দেখা দেবে তা বলা বাহুল্য। সে তাঁর 'কল্পনার সাথি', 'হৃদয়ের ধন' আরো কত কি।

যে দেশে 'নারী নরকস্য দ্বারী', 'নারীই মানুষের সর্ব্বপ্রকার পতনের মূল', এই প্রকারের নানা কথা প্রচলিত আছে সে দেশের কবিরই নারীর প্রতি এহেন অনুরাগ সাধারণের চোখে আশ্চর্য্য ঠেকবে বই কি ! সাধারণে নারী জাতিকে মুক্তির অন্তরায় বলে মনে করে থাকে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তা'দিগকে মুক্তির সহায়স্বরূপ মনে করেন। নারীর সঙ্গ ব্যতীত পুরুষের কোমল বৃত্তিগুলির বিকাশ হয় না। পুরুষের অন্তরে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় যে স্বপ্নালোক পড়ে আছে নারী-সৌন্দর্য্যস্বরূপ সোনার কাঠির স্পর্শ ব্যতীত তা জাগ্রত হতে পারে না। সৌন্দর্য্য-প্রিয় কবির নিকট তাই নারীর এত সমাদর।

'কড়ি ও কোমলে' কবির প্রাণ বেশী কল্পনাপ্রবণ। কিন্তু, 'সোনার তরী'তে দেখতে পাই তিনি কল্পনা থেকে বাস্তবতার দিকে, আকাশ থেকে নীচের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তাই সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের মধ্যেও তিনি অনন্ত আনন্দের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটিতে যেন সেই আনন্দই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। সেখানে এক খেয়ালী, বিশ্ববিমুখ মানুষ জগতের সুখ-আনন্দ শোভা-সৌন্দর্য্যকে উপেক্ষা করে আকাশের চাঁদ হাতে পাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে চলেছিল। পথে তাকে কত পথিক কত কি জিজ্ঞেস করলে ; কিন্তু সবার উত্তরে তার একই কথা—'আকাশের চাঁদ চাই।'

www.pathagar.com

হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ—
এই হল তার বুলি।
দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া,
কাঁদে সে দু-হাত তুলি।

কিন্তু যেতে যেতে যখন তার চোখ পড়ল মানুষের দৈনন্দিন সংসারযাত্রার উপর তখন তার অন্তর কি এক অনন্ত রস পুলকে ভরে উঠল। তখন তার নিকট মানুষের ছোট ছোট কাজ-কারবারও আর তুচ্ছ করবার জিনিষ নয়।

এমন সময়ে সহসা কী ভাবি
চাহিল সে মুখ ফিরে,
দেখিল ধরণী শ্যামল মধুর
সুনীল সিন্ধু তীরে।
. . .   .
দেখিল চাহিয়া জীবন পূর্ণ
সুন্দর লোকালয়
প্রতি দিবসের হরষে বিষাদে
চির-কল্লোলময়।
স্নেহসুধা লয়ে গৃহের লক্ষ্মী
ফিরিছে গৃহের মাঝে,
প্রতি দিবসেরে করিছে মধুর
প্রতি দিবসের কাজে।
সকাল বিকাল দুটি ভাই আসে
ঘরের ছেলের মতো,
রজনী সবারে কোলেতে লইছে
নয়ন করিয়া নত।

এমনি করে অবাক নয়নে সে চেয়ে রইল, আর স্বভাব-সুন্দরী তার নয়নে এক অপরূপ রূপের অঞ্জন বুলিয়ে দিল। এমনি করে সম্পূর্ণ অনাদৃত ও অবহেলিত জিনিসের পানে চেয়েও তার অন্তর-আত্মা পুলকে ভরে উঠল। তাই—

যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া
চাহে নি কখনো ফিরে,
নবীন আভায় দেখা দেয় তারা
স্মৃতি-সাগরের তীরে।

'বসুন্ধরা' কবিতায় কবিগুরু 'বসন্তের আনন্দের মত' 'দিগ্‌বিদিকে আপনারে বিস্তারিয়া' দিবার আকাঙ্ক্ষা জানাচ্ছেন। বিশ্ব-চেতনা আর বিশ্বানন্দের সঙ্গে নিজের অন্তরের যোগ সাধন করবার এই যে চেষ্টা তাই রবিবাবুর কাব্যকে এতটা মোহন ও বরণীয় করে তুলেছে। এত

www.pathagar.com

সুখ, এত বৈচিত্র্য ও এত আনন্দ, তবু কবির স্বদেশবাসীরা বিশ্বের প্রতি এতটা বিমুখ ; — এই ভাবটাই এখন তাঁকে মস্ত বড় পীড়া দিচ্ছে। তাই তিনি বলেছেন,

হা রে নিরানন্দ দেশ, পরি জীর্ণ জরা,
বহি বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছে মনে—
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িয়াছে ধরা
সুচতুর সূক্ষ্মদৃষ্টি তোমার নয়নে।
লয়ে কুশাঙ্কুরবুদ্ধি শাণিত প্রখরা
কর্ম্মহীন রাত্রিদিন বসি গৃহ কোণে
মিথ্যা বলে জানিয়াছে বিশ্ব বসুন্ধরা
গ্রহতারাময় সৃষ্টি অনন্ত গগনে।
যুগযুগান্তর ধরে পশু পক্ষী প্রাণী
অচল নির্ভয়ে হেথা নিতেছে নিশ্বাস
বিধাতার জগতেরে মাতৃক্রোড় মানি,
তুমি বৃদ্ধ কিছুরেই করনা বিশ্বাস।
লক্ষ্য কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা ;
তুমি জানিতেছ মনে, সব ছেলে খেলা।

প্রেম, পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, মান, অভিমান, এইসব দেবতাদেরই জন্য মানুষের জন্য নয়, এই ভাবটিরও প্রতিবাদ তিনি করেছেন—তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বৈষ্ণবের গানে'।

শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান !
পূর্ব্বরাগ অনুরাগ, মান অভিমান,
অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ–মিলন,
বৃন্দাবন গাথা,—এই প্রণয় স্বপন
শ্রাবণের শর্ব্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শরমে সম্ভ্রমে—একি শুধু দেবতার !
. . . .
আমাদেরই কুটির কাননে।
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা–চরণে,
কেহ রাখে প্রিয়জন–তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ।

. . . .

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা !
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

www.pathagar.com

বিশ্বের মাঝে ভগবানের লীলা চলছে। জাগতিক হর্ষ-বিষাদ-স্নেহ-প্রেমের মধ্যে তাঁরই আমরা অনুভূতি লাভ করি। বস্তুতঃ যা পাই এবং দিই, একটু অনুধাবন করলেই দেখতে পাব, তা ভগবানের নিকট হতেই পাই, এবং তাঁকেই দিই। সুতরাং তাঁকে নিয়েই আমাদের দেওয়া নেওয়া, হর্ষ-বিষাদের খেলা চলছে ;—লীলাবাদের এই মর্ম্মোক্তিটিই এই কবিতাটিতে প্রকাশ পেয়েছে।

৩

সংসারের সুখদুঃখের দিকে দৃষ্টি দিলেও 'সোনার তরী'র লেখাগুলিও কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু 'নৈবেদ্যে'র আমলে তিনি এমন একটি উচ্চস্তরে পা দিয়েছেন যেখান থেকে আরম্ভ হল তাঁর সাধক জীবন। আগেকার কবিতার মত এ কবিতাগুলিতে কল্পনা বিলাস ও চঞ্চলতা নেই। এগুলি ঋষি-দৃষ্ট বাণীর মতই বীর্য্যবন্ত এবং গম্ভীর। সাধক জীবনের লেখা হলেও এ কবিতাগুলি সাধারণ আধ্যাত্মিক কবিতার মত নয়। বিশ্বপিতার ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে তিনি জগতকে ভুলে যাননি। কারণ তিনি জানেন ভগবান কোন বিশেষ আকার ধারণ করে কোন বিশেষ স্থানে বসে নন। জলে স্থলে, আকাশে বাতাসে, সর্ব্বত্রই তিনি নিবিড়ভাবে মিশে আছেন। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ দুঃখ হর্ষ বিষাদের মধ্য দিয়ে তাঁরই লীলা চলছে। জন্ম-মৃত্যুর রহস্যের মধ্য দিয়ে তিনি এই লীলাকেই চির-প্রবহমান রেখেছেন। 'আনন্দ রূপমমৃতং যদ্বিভাতি', রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের এই মন্ত্রটির উপাসক। তাই তিনি জগত হতে বৈচিত্র্যকে উচ্ছেদ করে দিয়ে একের ধ্যানে নিমগ্ন হন নি। বরং বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই অরূপ একের সন্ধান পেতে চেষ্টা করেছেন। আকার যে নিরাকারেরই আকার, এবং রূপ যে অরূপেরই রূপ এই ধারণা তাঁর অন্তরে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। 'আকার এঁকে এঁকে চল্‌ছে নিরাকার' এবং 'রূপের মাঝে অরূপ বীণা লুকিয়ে বাজে' এ দু'টি লাইনেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিশ্বের সাথে যে ভগবানের যোগ আছে, এবং বিশ্ব-পরিচয়ের মধ্য দিয়েই যে ভগবানের পরিচয় পাওয়া যায় 'নৈবেদ্যের' নিম্নলিখিত কবিতাটাই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে—

নির্জ্জন শয়ন-মাঝে কালি রাত্রিবেলা
ভাবিতেছিলাম আমি বসিয়া একেলা
গত জীবনের কত কথা ; হেন ক্ষণে
শুনিলাম তুমি কহিতেছ মোর মনে—

ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্মভোলা
রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা ;
চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখশোক,
যত ভালোমন্দ, যত গীতগন্ধ লয়ে
বিশ্ব পাশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।

www.pathagar.com

সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্য বার এসেছিনু নামি।

দ্বার রুধি জপিতিস যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম।

নানা রূপ, নানা আকার, নানা দুঃখসুখের অনুভূতির ভিতর দিয়েই ভগবান মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করেন। তিনি আনন্দরূপে নিজেকে সতত প্রকাশিত করে রেখেছেন ; একবার হৃদয় খুলে বরণ করে নিলেই হল। 'ধর্ম্মের আনন্দরূপ' নামক প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি বলছেন—

'সত্যং জ্ঞানমনন্তম্। তিনি বাক্যের মনের অতীত। কিন্তু অতীত হইয়া রহিলেন কৈ? এই যে দশ দিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতেছেন। তিনিও লুকাইলেন না। যেখানে আনন্দ অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়াছেন, সেখানে প্রাচুর্য্যের অন্ত কোথায়, সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল, সেখান রূপ যে কেবলি নূতন নূতন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে ফুরায় না।

. . . .

ধন্য হইলাম—আমরা ধন্য হইলাম—এই প্রকাশের মধ্যে প্রকাশিত হইয়া ধন্য হইলাম। পরিপূর্ণ আনন্দের এই আশ্চর্য্য অপরিমেয় প্রাচুর্য্যের মধ্যে আমরা ধন্য হইলাম। পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে, তৃণের সঙ্গে, কীট পতঙ্গের সঙ্গে, গ্রহ তারা সূর্য্য চন্দ্রের সঙ্গে, আমরা হইলাম।'

উপরের কথাগুলি রবীন্দ্রনাথের জীবনে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। আলোছায়া, সন্ধ্যা-প্রভাত এবং ঋতু-পর্য্যায়ের ভিতর দিয়ে ভগবানের আগমনবার্ত্তা শুনতে পেয়ে তিনি পুলকিত হয়ে উঠেছেন। তাঁর গানে ও কবিতায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

গাছের পাতায় আলো নাচতে দেখে তিনি বলেছেন—

এইতো তোমার প্রেম ওগো
হৃদয়-হরণ,
এই যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ।

ভোরের বেলায় তিনি বলেছেন—

ভোরের বেলায় কখন এসে
পরশ ক'রে গেছ হেসে।

সন্ধ্যায় বলেছেন,—

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ
তোমায় করিগো নমস্কার
মম অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ
তোমায় করিগো নমস্কার।

www.pathagar.com

ফাল্গুনে বলেছেন—

'বসে ছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুণে
দেখা পেলেম ফাল্গুনে।'

ঝড়ের রাতে বলেছেন—

ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার।

শরতে গেয়েছেন—

শরতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে
আনন্দ গান গা রে হৃদয়
আনন্দ গান গা রে।

এমনি করে খুব কম কবিই বিশ্বের সকল কিছুতে ভগবদসত্তার সন্ধান লাভ করতে পেরেছেন। বিশ্ব-প্রীতি তাঁর অন্তরে এক মহান পুলকের সঞ্চার করে তাঁকে বৈরাগ্য-বিরোধী করে তুলেছে। তাই 'নৈবেদ্যে' দেখতে পাই—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

ইসলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষ হজরত মুহম্মদ ব্যতীত পূর্ব্বে আর কারো মুখ দিয়ে এ হেন মহাবাণী প্রকাশ পায়নি। ইসলামের এই দিকটা রবীন্দ্রনাথের জীবনে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাস্তবিক শুধু ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করে জপ তপ ধ্যান ধারণা করলেই যে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়, এ ধারণা মানুষের জীবনে এক মহা অন্ধকারের সৃষ্টি করেছে। ভগবৎ লাভ এত সোজা ব্যাপার নয়। কর্ম্ম-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হবে। ভগবান যে উদ্দেশ্যে আমাদের এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, সে উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে হবে। জগতেরও আমাদের নিকট কিছু পাওনা আছে, সে পাওনা হতে রেহাই পেতে হবে। নইলে মুক্তি নেই। প্রকৃতির প্রতিশোধে সন্ন্যাসীর জীবনে তা-ই দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। মুক্তি কখনো ক্লীবতা ও নির্জ্জীবতার দ্বারা আসতে পারে না। সে জন্য জাগ্রত সাধনা চাই। মানবকল্যাণে ও বিশ্বহিতে আপনার শক্তি নিয়োগ করা চাই। কর্ম্ম মুক্তির অন্তরায় নয় বরং সহায়স্বরূপ।

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙে করছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয়রে ধূলার পারে।

মুক্তি? ওরে, মুক্তি কোথায় পাবি মুক্তি কোথায় আছে!
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে।

www.pathagar.com

রাখোরে ধ্যান, থাক্‌রে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধূলা বালি,
কর্ম্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম্ম পড়ুক ঝরে।

কর্ম্মকুণ্ঠ বাঙ্গালীর জাতীয় জাগরণী-গান হওয়া উচিত এটি।

নির্জ্জীব আলস্যপরায়ণ বাঙালী জাতির অন্তরে কর্ম্ম ও জীবনের সাড়া আনবার জন্যও তিনি অনেক গেয়েছেন। বাঙালি জীবনের বৈচিত্র্যহীনতা দেখে তিনি দুঃখিত। তাই এই জাতিকে জাগাবার জন্য তিনি বঙ্গমাতার নিকট কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত্ত বঙ্গভূমি—তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু করে আর রাখিও না ধরে।
দেশদেশান্তর-মাঝে যার সেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোটো ছোটে নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে।
প্রাণ দিয়ে, দুঃখ সয়ে আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালোমন্দ-সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষীছাড়া করে!
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধা জননী,
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি।

দেশবাসীকে এমনি জীবনের বেগে চঞ্চল করে তুলতে তিনি চেয়েছেন। বাংলাদেশব্যাপী এই বহুভঙ্গিম জাগরণের সাড়া যে কতকটা রবীন্দ্রকাব্য-প্রেরণারই ফল তা' বলা বাহুল্য।

এই বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজের সত্তাকে বেমালুম বিস্তৃত করে দিবার ইচ্ছাই রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য, যা' অন্য কবি থেকে তাঁকে পৃথক করেছে। বহু কবিতায়, তিনি নানা দেশ, নানাকাল, ও নানা ধর্ম্মের মানুষের সঙ্গে আত্মীয় রূপে বাস করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বিশ্বনৃত্য কবিতায় তাঁর এই ইচ্ছা বলবতী হয়ে উঠেছে, তাতে বিশ্বমানবের সঙ্গে মিলনের সাধটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
    মানবহৃদয়ে মিশিতে
নিখিলের সাথে মহা রাজপথে
    চলিতে দিবস নিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত
    জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন-অমৃত
    কেগো দিবে এই তৃষিতে?

'গীতাঞ্জলিতে'ও এর সমভাবের একটি গান আছে—

আমার একলা ঘরের আড়াল ভেঙে
বিশাল ভবে
প্রাণের রথে বাহির হতে
পারব কবে।
প্রবল প্রেমে সবার মাঝে
ফিরব ধেয়ে সকল কাজে,
হাটের পথে সবার সাথে
মিলন হবে,
প্রাণের রথে বাহির হ'তে
পারব কবে।

এমনি গভীর প্রাণের টান নিয়েই তিনি বিশ্বলীলায় যোগ দিয়েছেন, এবং শেষে এই বিশ্বলীলার ভিতরেই ভগবানের সন্ধান লাভ করে ধন্য হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন একখানি সুগীত সঙ্গীতের মত। ওস্তাদ যেমন তা–না–না থেকে আরম্ভ করে মাঝখানে গমক গিটকিরী এবং মীড়ের ছড়াছড়ি করে সমে এসে পৌছান, রবীন্দ্রনাথও তেমনি ছেলেবেলার খেলাধুলা থেকে আরম্ভ করে কৈশোর ও যৌবনের ভোগ–বিলাসিতার ভিতর দিয়ে এমন একটি স্থানে এসে পৌচেছেন যেখান থেকে তাঁর বীণায় বেজে উঠেছে বিরাট একের সুর। কৈশোর ও যৌবনের দাবীগুলি পূর্ণ না করলে তাঁর জীবনে এ ধরনের সম্পূর্ণতা আসত কিনা সন্দেহ। কবিগুরুর জীবনে এক অপূর্ব্ব ক্রমোন্নতি দেখতে পাওয়া যায় যা অন্যান্য কবির জীবনে খুব বিরল ;—তিনি যেন ক্রমশঃই প্রাণ থেকে মনে এবং মন থেকে আত্মার উন্নতি লাভ করেছেন। তাই তাঁর কাব্য এতটা সম্পূর্ণ, এত সুন্দর।

৪

রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্যকে জীবনে কিরূপ স্থান দেন, এ প্রবন্ধে আমরা তাই আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি, এবং দেখেছি যে তিনি কখনো বৈরাগ্যের ভক্ত নন। তিনি সৌন্দর্য্য ও আনন্দবাদী সাধক। সৌন্দর্য্য ও আনন্দ সংযম ছাড়া লাভ করা যায় না। কিন্তু এ সংযম সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করা নয়, জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও সংহত করা মাত্র। তাই তাঁর জীবনে সাধারণ–সংসার বিরাগী–সুলভ ক্লীবতা ও নিজ্জীবতা না দেখে অনেকে তাঁর সৌন্দর্য্য–রসাত্মক আধ্যাত্মিকতার প্রতি প্রায়ই বিদ্ধপোক্তি প্রকাশ করে থাকে। তারই প্রত্যুত্তরে যেন 'যৌবন বেদনারসে উচ্ছল আমার দিনগুলি' কবিতায় তিনি বলেছেন—

তপোভঙ্গদূত আমি মহেন্দ্রের, হে রুদ্র সন্ন্যাসী !
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।
দুর্জ্জয়ের জয়–মালা পূর্ণ করে মোর ডালা,
উদ্দামের উতরোল বাজে মোর ছন্দের ক্রন্দনে।

www.pathagar.com

ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাঁণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহলকোলাহল আনি
মোর গান হানি॥

. . . .

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্য-বিলাসী
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খল খল উঠে অট্ট হাসি,
দেখে মোর সাজ।
হেন কালে মধুমাসে মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য বিকশিত লাজ।
সেদিন কবিরে ডাক, বিবাহের যাত্রাপথতলে,
পুষ্পমাল্যমাঙ্গল্যের সাজি লয়ে সপ্তর্ষির দলে
কবি সঙ্গে চলে।

বাস্তবিক পৃথিবীব্যাপী যে চির-বিবাহ-উৎসব, যে চিরন্তন মিলন-মেলা চলেছে সেখানেই কবির আসন-সেখানেই ত তিনি পরম বিলাসে 'পুষ্পের মত সঙ্গীতগুলি আকাশ ভালে' ফুটিয়ে তুলবেন। রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য-বিরোধী, কিন্তু তাই বলে তিনি অতিরিক্ত সাংসারিক নন। অতিরিক্ত সাংসারিকতা, যা দেখে wordsworth, বলেছিলেন, 'The world is too much with us', তা যে আধ্যাত্মিকতার পথে বিঘ্নস্বরূপ এ কথা তিনিও বিশ্বাস করেন। তাঁর জীবনে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সমন্বয় হয়েছে। এই সমন্বয়ের ফলেই তিনি এই জগতকে স্বর্গীয় আলোকে মণ্ডিত দেখেছেন। তাই 'বলাকা'য় তিনি বলেছেন—

স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটির মায়ের কোলে
বাতাসে তার খবর ছোটে আনন্দ কল্লোলে।

উপসংহারে বলতে চাই, যদিও তিনি এই দৈনন্দিন জীবনের দুঃখসুখময় বিচিত্র ভোগের মধ্য থেকে রস সংগ্রহ করে মানসিক পরিপুষ্টি লাভ করেছেন, তথাপি তাঁর দৃষ্টি রয়েছে উর্ধ্বে অতি উর্ধ্বে—এক অচিন্তনীয়, অতীন্দ্রিয়, চিন্ময় জগতের দিকে। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ও নগণ্য বস্তুর মধ্যে অনন্তের কম্পন অনুভব করে তাঁর অন্তর আত্মা অসীমের পানে অভিসারী হয়েছে। তাই Words worth-এর ভাষায় তাঁকে সম্বোধন করে বলতে ইচ্ছা করছে—

Type of the wise that soar but never roam,
True to the kindred points of heaven and home.

স্বাধীন ভারতের দাস

নাজির উদ্দীন আহমদ এম. এ.

স্বাধীন ভারতের দাস, কথাটা শুনিয়া অনেকেই হয়ত চিন্তা করিবেন এই পরস্পরবিরোধী কথার অর্থ কি? কিন্তু স্বাধীনতা ও দাসত্ব এ দুইয়ের একত্র সমাবেশ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল নয়। কত উন্নত স্বাধীন জাতির গৌরবের ইতিহাসের পশ্চাতে কত না নিপীড়িত কাতর ক্রন্দন! স্বাধীন রোম ও স্বাধীন গ্রীসের ইতিহাস গৌরবোজ্জ্বল; তথাপি তাহাদের স্বাধীনতা অসংখ্য মানবের দাসত্বের পরিপন্থী ছিল না। তাই ভারত-ইতিহাসের যুগ-সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া মনে প্রশ্ন জাগিতেছে, মুক্তির যে স্বপ্ন আজ আমরা দেখিতেছি, তাহা জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে অখণ্ড ভারতবাসীর জন্য সত্য হইবে কি না। নানা কারণে মহানন্দের মধ্যেও মন দ্বিধায় শংকাকুল হইয়া উঠিতেছে, মনে জাগিতেছে ভারত-ইতিহাসের নানা দ্বন্দ্ব ও কলহের কথা, এই মহা দেশের অধিবাসীগণের আচার ব্যবহার, শিক্ষা-সভ্যতার-বৈষম্যের কথা, এবং সর্ব্বোপরি মনে হইতেছে ঋণ-ক্লিষ্ট, অশিক্ষিত মুসলমান সমাজের কথা। নানা ঘটনার মধ্য দিয়া ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, আমাদের নানাবিধ মহৎ আশা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে এক মহাপরিণামের সম্মুখীন হইতেছে। হিন্দু-মুসলমানের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দিনদিনই বিরাটাকার ধারণ করিতেছে; স্বার্থের কোলাহল চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। স্বনিয়ন্ত্রিত ভারতে মুসলমানের অবস্থা সংকটাপন্ন হইবে বলিয়াই বোধ হইতেছে।

ভারতবর্ষে পাঞ্জাব এবং বঙ্গদেশ ব্যতীত সর্ব্বত্র মুসলমান সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প। তাই ভবিষ্যৎ ভারতের শাসনভার হিন্দুর হাতেই ন্যস্ত হইবে, সন্দেহ নাই। হিন্দু যে সে-ক্ষমতা খুব নিরপেক্ষভাবে ব্যবহার করিবে তার অনুকূল প্রমাণ বর্ত্তমানে পাওয়া যাইতেছে না। মুসলমানের উপর হিন্দুর বিদ্বেষ প্রত্যহই প্রকট হইয়া পড়িতেছে। ভারতবর্ষ ধীরে ধীরে দুইটি স্বতন্ত্র সৈন্যাবাসে পরিণত হইতেছে। হিন্দু পূর্ব্বে যাহাকে ঘৃণা করিত তাহার প্রতি তাহার দরদ যেন নিমেষে নিমেষে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম, নমঃশূদ্র সবাই তাহাদের পার্থক্য ভুলিয়া হিন্দুর সহিত এক হইয়া দাঁড়াইতেছে, এবং সে-একত্বের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে মুসলমানের উপর একটা বিজাতীয় ক্রোধ। পুরুষানুক্রমে হিন্দুসমাজ মুসলমান বিদ্বেষকে তাহার রাজনৈতিক জীবনের এক মূলমন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক ভাষায় মোসলেম-বিদ্বেষী এক একটা সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। মুসলমান আমলের যে কোন বিদ্রোহী এখন জাতীয় বীর পুঙ্গব রূপে হিন্দুর আদর্শ স্থানীয় হইয়া গিয়াছে। হিন্দু ঐতিহাসিক সমস্ত মুসলমান রাজত্বকালটাকে ব্যর্থ বলিয়া উড়াইয়া দিতেছে এবং হিন্দু-নিষ্পেষণই যে মুসলমানের একমাত্র ধর্ম্ম একথা প্রমাণেই তার ঐতিহাসিক গবেষণার অনেকটা ব্যয়িত হইতেছে। মানুষ হিসাবে মুসলমানের প্রতি হীন ধারণা পোষণ হিন্দুদের মধ্যে প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যায়। একবার কলিকাতার এক সভায় এমন কথাও অবলীলাক্রমে বলা হইয়াছিল যে, ভিন্ন জাতীয় নারীহরণ মুসলমানের এক ধর্ম্ম-

www.pathagar.com

কাজ। ইহা দ্বারাই হিন্দুর মনের পরিসর বুঝা যায়। শত শত বৎসর ভারত শাসন করিয়া মুসলমান যে অপরাধ করিয়াছে, হিন্দুর নিকট তাহা অমার্জ্জনীয়।

এই মুসলিম-বিদ্বেষ হিন্দুর জাতীয়তার আদর্শেও প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতের জাতীয়তার যে আদর্শ হিন্দু গড়িয়া তুলিয়াছে তাহা সম্পূর্ণ হিন্দু-জাতীয়তা ; তাহাতে স্বতন্ত্র-সত্তা-বিশিষ্ট অন্য সম্প্রদায়ের স্থান নাই। পরলোকগত ভূদেববাবু তাঁহার 'সামাজিক প্রবন্ধে' হিন্দু-মুসলমান মিলনের এক ছবি আঁকিয়াছেন। এই জটিল সমস্যার তিনি যে সমাধান করিয়াছেন তাহা মৌলিক না হইলেও খুবই উপদেশ-ব্যঞ্জক। তাঁহার মতে 'জৈন ও শিখদিগকে যখন সাধারণ হিন্দু সমাজের সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়, কালে এখানকার মুসলমানেরাও যে ভারতসমাজের মধ্যে একটি বর্ণ বিশেষরূপে লক্ষিত হইবে তাহার বিশেষ সম্ভাবনা। হিন্দু ইচ্ছা করে, প্রাচীন ভারতে শক-হুন-দ্রাবিড় যে ভাবে হিন্দু সমাজে বিলীন হইয়া গিয়াছে, মুসলমানেরাও সেইরূপ নিজেদের বিশিষ্ট রূপ বিসর্জ্জন দিয়া সেইভাবে লুপ্ত হইয়া যাউক। তাই দেখিতে পাই যে সমস্ত মুসলমান হিন্দুয়ানী পোষাক পরে, হিন্দু হাবভাব নকল করে, তাহারা সহজেই আমাদের প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের বাহবা পাইয়া থাকে। ভূদেববাবুও আনন্দের সহিত বলিয়াছেন যে, অনেক স্থানের মুসলমান হিন্দু পূজা পার্ব্বণাদিতে যোগ দেয়। মুসলমানের সভ্যতার প্রতি হিন্দুর এই লোলুপ দৃষ্টির মধ্যে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত বিবাদের বীজ নিহিত রহিয়াছে। গান্ধিজী দিল্লীর বণিক সভায় বলিয়াছেন, "We do not say that our civilization is higher than that of the Englishman. We feel that if the English want us to live in the way of their civilization, there will be a great clash between the two civilization." ভারতে হিন্দু মুসলমান সমস্যার মূলেতেও এই কথা।

স্বাধীন ভারতে majority (বড়) সম্প্রদায়ের এই প্রকার মনোভাবকে ভয় করার মুসলমানের যথেষ্ট হেতু আছে। বর্ত্তমান সময়ে এদেশ অনেকটা হিন্দুর দ্বারাই শাসিত হইতেছে। মুসলমান এ শাসনের উপরও সম্পূর্ণ প্রত্যয় করিতে পারিতেছে না। যেখানে হিন্দু প্রাধান্য সেখানেই মুসলমানের অবিশ্বাস। হিন্দুরা মুসলমান সমাজের উন্নতির সাহায্য করা দূরে থাকুক বরঞ্চ তাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতেছে তাহাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে। কিছু দিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ব্যাপারে হিন্দু সম্প্রদায় যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছে তাহা বাস্তবিকই অত্যন্ত লজ্জাজনক। তাই ভবিষ্যৎ ভারতে হিন্দু শক্তির অপব্যবহার মুসলমানেরা ভয় করিতেছে। কারণ হিন্দু আদর্শ ও হিন্দু মনোবৃত্তির প্রতিকূলতাকরণ হিন্দু সহ্য করিবে না। বিলাতী বস্ত্র বিক্রয়ের অপরাধে কিছু পূর্ব্বে বেনারসে আগা মোহাম্মদ জান হিন্দুর গুলিতে প্রাণ হারাইলেন। কংগ্রেসের কথামত হরতাল না করিবার জন্য কানপুরে কত লোকের প্রাণ নষ্ট হইল। এগুলি দৃষ্টান্ত মাত্র। প্রকৃত দ্বন্দ্ব শুধু এই দৃষ্টান্তের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে ; তাহা সুবিস্তৃত উভয় সম্প্রদায়ের জীবনের প্রতি কার্য্যকলাপের মধ্যে।

এক দিকে হিন্দুর 'যুদ্ধংদেহী' ভাব যেমন বাড়িতেছে, তাহার শক্তি শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। মুসলমান অপর দিকে ম্রিয়মাণ হইতেছে। সামাজিক কারণেই হউক কিংবা ধর্ম্মনৈতিক প্রতিবন্ধকতার দরুনই হউক, বর্ত্তমান জগতে অন্য জাতির সমকক্ষ হইয়া টিকিয়া থাকিবার ক্ষমতা মুসলমান হারাইয়া ফেলিতেছে। প্যালেস্টাইনে মুষ্টিমেয়-ইহুদীর

www.pathagar.com

সহিত মুসলমান প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে না। ভারতবর্ষেও তেমনি। সাত শত বৎসর রাজত্ব করার পর গত দুই শত বৎসরের মধ্যে মুসলমান যে শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক। শিক্ষায় পশ্চাৎপদ, অর্থে হীনবল, হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া তাহারা জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিবার উপযুক্ত সম্বল আর খুঁজিয়া পাইতেছে না। একমাত্র বাংলাদেশে কৃষক সম্প্রদায়ের ঋণ ন্যূনকল্পে একশত কোটিতে গিয়া উঠিয়াছে। ভূমির উর্ধ্বতন স্বত্বগুলি মুসলমান অনেক দিন হয় এক প্রকার হারাইয়াছে ; এখন নিম্ন স্বত্বও হারাইয়া ভূমিহীন দিন মজুরে পরিণত হইতেছে। অনাহার, অর্ধ্বাশন মুসলমান সমাজে লাগিয়াই আছে। অর্থাভাব তাহার সমস্ত উন্নতিকে ব্যাহত করিতেছে। দিন দিন ভিক্ষুক বাড়িতেছে, কিন্তু ভিক্ষা মিলিতেছে না ; রোগ বাড়িতেছে, কিন্তু পয়সার অভাবে ডাক্তার মিলিতেছে না। সংখ্যা বাড়িতেছে, কিন্তু জীবিকার পথ সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইতেছে। এ দাসত্ব হইতে মুক্তি কোথায়?

একদিকে হিন্দু প্রাধান্য ভীতি, অন্য দিকে নিজের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা ভাবিয়া মুসলমান ভাবিতেছে যে, কংগ্রেসের সহিত অগ্রে একটা কিছু চুক্তি করিয়া লইতে পারিলেই ভবিষ্যতের পথ সুগম হইবে। তাই নানা প্রকার কল্পনা জল্পনার হিড়িক পড়িয়া গিয়াছে। 'চৌদ্দ শর্ত্ত' ও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন নিয়া মহা বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, যে-গুণ একটা জাতিকে শত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাঁচাইয়া রাখে তাহা তাহার প্রাণ-শক্তি, সে শক্তি কোন সন্ধির অপেক্ষা রাখে না। তাহা উৎসারিত হয় তাহার দেহের প্রতি ধমনী হইতে, তাহাই হইল তাহার অস্তিত্বের কারণ ও নিয়ামক। গত মহাযুদ্ধের পর ফরাসীর জিঘাংসার হাত হইতে জার্ম্মানী আপনাকে রক্ষা করিতে পারিত না যদি তাহার মধ্যে এই প্রাণ-শক্তি প্রচুর পরিমাণে না থাকিত। মুসলমানের সে-প্রাণ শক্তির সঞ্চয় যেন শুকাইয়া গিয়াছে। বিগত মুসলিম লীগের অধিবেশনে ডাঃ ইকবাল বলিয়াছিলেন যে, ভারতীয় মুসলমানেরা সঙ্ঘ চেতনা হারাইয়াছে এবং তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত নেতার সৃষ্টি হইতেছে না। এ গুলি খুবই চিন্তার বিষয় বটে, কিন্তু ততটা প্রকৃত রোগ নয়, যতটা তাহার লক্ষণ।

সব অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বাস্তবিকই মন আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। আমরা শক্তি হারাইয়াছি আত্মপ্রত্যয় হারাইয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া বিধি-লিখন হইতে মুক্তি পাই নাই। অন্য সমাজের সহিত জীবনের যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এতদিন আড়ালে আড়ালে চলিয়াছিল, তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ্যে নিষ্পন্ন হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। আমরা 'শর্ত্ত' দ্বারা মুক্তি চাহিতেছি। কিন্তু সন্ধি কিংবা চুক্তি জীবনযুদ্ধের মীমাংসা করিবে কি করিয়া? হিন্দুর সহিত মুসলমানের যে সংঘর্ষ তাহা উভয় সম্প্রদায়ের জীবনের অতি নিগূঢ় প্রদেশ হইতে উদ্ভূত। বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুর যা cultural inheritance তাহা মুসলমান হইতে এত বিভিন্ন যে, ভয় হয়, উভয় সম্প্রদায়ের বিবাদ কখনও মিটে কি না। একবার মহাত্মা গান্ধী তাঁহার আশ্রমের লোকদের টিকা লইবার বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, টিকা লওয়া ও গো-মাংস খাওয়া এক কথা। গোজাতির প্রতি এই অনন্যসাধারণ ভাব যে সমাজ পোষণ করে, সে কখনও গো-খাদক অন্য সমাজের সহিত প্রাণে প্রাণে মিশিতে পারে না। তাই হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান নাই, শেষ নাই বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু ভবিষ্যতের সংঘর্ষ চোখে দেখিয়াও মুসলমানের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আসিতেছে না। চুক্তির জন্য আমরা এত ব্যস্ত যে, প্রকৃত সমস্যার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেছে না।

www.pathagar.com

আমরা যদি আমাদের শিক্ষা সমস্যা ও আর্থিক সমস্যার সমাধান করিয়া নিজেদের বিংশ শতাব্দীর দ্রুত-উন্নয়নশীল ভারতে বাঁচিয়া থাকিবার উপযোগী করিতে না পারি, তবে আমাদের ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন। কারণ অদূর ভবিষ্যতে স্বরাজের ফলে যে নতুন নতুন পথ ভারতবাসীর সম্মুখে উন্মুক্ত হইবে আমরা তাহা দ্বারা কোনো উপকার লাভ করিতে পারিব না। ফলে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অর্থে, জ্ঞানে, শক্তিতে, যে ব্যবধান এখন বর্ত্তমান তাহা তীব্র হইতে তীব্রতর হইবে।

তাই মনে হইতেছে, যদিও ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইতেছে, তথাপি সমস্ত ভারতবাসীর জন্য তাহা সত্য হইবে কিনা সন্দেহ। সমস্ত বড় কথার অন্তরালে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদটাই অতি বড় সত্যরূপে দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। সাত কোটি মুসলমানের ভবিষ্যৎ ছাব্বিশ কোটির সহিত নির্ম্মম প্রতিযোগিতায় কি হইবে স্থির করিতে বেশী চিন্তা করিতে হয় না। জানি না মুসলমান সমাজের অন্তর্নিহিত কোন অনন্যসাধারণ প্রতিভা এ বিপদের হাত হইতে তাহাকে ত্রাণ করিতে পারিবে কি না।

www.pathagar.com

মিলন-সৌধ

মোসলেম উদ্দীন খাঁ

সমগ্র ভারতে একটা খণ্ড প্রলয় হয়ে গেল ; আশা-নৈরাশ্য, সাহস-শংকা, আরাব হুংকার, রোষ-দ্বেষ, দণ্ডদান, চণ্ডনীতি, কাজ-অকাজ, সমস্ত মিলে একটা মহা কুরুক্ষেত্র হয়ে গেল। তারপর অশান্তির কূজ্ঝটিকা কেটে শান্তির আলো প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু এখনও যে কার্য্যটি সুকঠিন এবং বিশ্রী ঠেকছে, সেটি হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সমস্যা। কত কূট রাজনীতিকের মাথা যে এর পাল্লায় পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছে তা ভুক্তভোগীইর ভাল জানবার কথা। ভূতগ্রস্ত লোক সময় সময় এরূপ হাবভাব করে যে, অনেক লোকই ভেবে আর কার্য্য কারণ খুঁজে পায় না। কেবল তার হাত-পা ছোঁড়া হাসি-কান্না, ভীত চকিত দৃষ্টি ও অর্থহীণ প্রলাপ দর্শকের কৌতুক ও বিস্ময় উৎপাদন করে। এই যে সাম্প্রদায়িক কলহের ভূতটা ভারতের ঘাড়ে চেপে বসল, তার কার্য্য কারণও খুঁজে পাওয়া যায় না। কেবল সময় সময় লাঠালাঠি, বাকবিতণ্ডা, অবিশ্বাস আশংকা, অর্থহীন শর্ত্ত-বাজী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শোনা যায় ভূতগ্রস্ত লোকের ভূত দূর করবার জন্য ওঝা আছে, কিন্তু এই যে সাম্প্রদায়িকতার ভূত তার ওঝার সন্ধান আজও পাওয়া যাচ্ছে না। এই কলহের ডজন খানেক কারণ নির্দ্দেশও করা যায়, এবং তার দু'চার গণ্ডা প্রতিকারও বের করে ফেলা তেমন কিছু শক্ত নয়। অনেকে করেছেনও তাই। কিন্তু তাতে করে তার মীমাংসা হয়ে গেছে বলে জানা নেই।

এই যে সৃষ্টি-ছাড়া কাণ্ড এর স্বরূপটা কি? আমার ত পুরাদস্তুর বিশ্বাস সমস্যাটি এই যে রূপ নিলে এ তার প্রকৃত রূপ নয়। শতকরা পঁচানব্বুই জন মুসলমানের এর সঙ্গে সম্বন্ধ কি? যদি এই পঁচানব্বুই জন মুসলমানের স্বার্থ এখানে না থাকে, তবে তা'কে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা আখ্যা দেওয়া কেন? জিন্নার চৌদ্দ দফার সঙ্গে এর কতখানি সম্বন্ধ? অথবা অর্থনৈতিক বৈষম্য কিম্বা ধর্ম্মীয় কলহ কি এর স্বরূপ? ধরা যাক জিন্নার চৌদ্দ দফা হিন্দুরা মেনে নিল। অর্থনৈতিক বৈষম্যও দূরীভূত হয়ে ধনের সমান ভাগ হল। ধর্ম্মকর্ম্মও সকলে নিরাপদে এবং নির্ব্বিবাদে পালন করতে পেল। তবেই কি সব লেঠা চুকে যাবে? মনে ত হয় না। যারা মারামারি করে মাথার খুলি ভাঙছে তারা কোথাও জিন্নার চৌদ্দ দফার জন্য বায়না ধরেছিল এমন ত শোনা যায় না। কিম্বা যে শতকরা পঁচানব্বুই জন লোক গ্রামের বাসিন্দা তারাও যে তার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে এমন ত মনে হয় না। এতে তার পাটের দাম, এক কথায় কৃষিজাত দ্রব্যের দাম, কতটুকু বাড়বে? তার ঋণ শোধ কতটুকু হবে? অর্থনৈতিক ব্যাপারে তারা একেবারে 'তাওয়াক্কুল' (নির্ভর) করে আছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্বন্ধে তারা এখনও সজাগ হয়নি, হলে মুসলমান বণিকেরও নিস্তার ছিল না। আবার যদি এটি ধর্ম্মীয় কলহই হত, তবে আমরা সমস্ত দেশময় একটি ভীষণ 'ক্রুসেড' দেখতে পেতাম। আর মুসলমান আলেম-সভাকে হিন্দুর সঙ্গে একযোগে কাজ করতে দেখতে না পেয়ে জেহাদের ফতোয়া জাহির করতে দেখতে পেতাম। ব্যাপার তা ত নয়। তবে

www.pathagar.com

মাঝে মাঝে বাদ্য এবং গরু–কোরবানী নিয়ে যে কলহটা হয় তা ধর্ম্মের অজুহাতে হলেও কারণ তার অন্য রকম তা আমরা পরে দেখাব। এইগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে যে, মোটে শতকরা একজনের স্বার্থ নিয়ে একটা হিন্দু–মুসলিম সমস্যা দাঁড় করান হয়েছে এবং তার মীমাংসা অসম্ভব করে তোলার মূলে রয়েছে আরও অসংখ্যক লোকের ন্যাকামী। এখন প্রশ্ন হল এই, তবে হিন্দু মুসলিম বিরোধ কি মোটেই নেই? বিরোধ যথেষ্টই আছে। এমন কি আশার অতিরিক্ত আছে। তা ত প্রত্যক্ষই দেখতে পাচ্ছি। এর মূল কোথায়?

আমার মনে হয় ইতিহাসে এর পতন, অবিশ্বাসে এর বৃদ্ধি, এবং বিদ্বেষে এর পরিণতি। ইতিহাসে আছে মুসলমান ছিল তখন শাসক, হিন্দু শাসিত। শাসক–শাসিতের বিদ্বেষ স্বাভাবিক। আবার ধর্ম্মের গোঁড়ামী তার ভিতরে ঢুকে তাকে পোক্ত এবং জটিল করে দিল; এবং অবিশ্বাসের উপর অবিশ্বাস পুঞ্জীভূত হতে হতে শেষটায় এই হিন্দু মুসলিম বিদ্বেষের আগ্নেগিরির সৃষ্টি।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাস জিনিষটা যে কত দূর মারাত্মক এবং সংক্রামক তা একটি উদাহরণ দিলেই উপলব্ধি হবে। জনৈক ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের মুসলমান কেরানী গিয়েছিল কোন স্টেশনের টেলিফোনটি ব্যবহার করতে। স্টেশন মাস্টারটি অতিশয় ভদ্র–স্বভাব বলে খ্যাত। মুসলমানটিকে তিনি বোধ হয় হিন্দু বলে ভ্রম করেছিলেন, চাওয়া মাত্রই বল্লেন, 'O yes, it is at your disposal.' মুসলমানটি ফোন ধরে যেই বল্লেন, 'Hallow, I wish to speak with Mr. Karim'—অমনি মাস্টারবাবু প্রকৃত ব্যাপারখানা বুঝে বল্লেন 'excuse me, private ব্যাপারের কোন কাজের জন্য ফোন দেওয়া নিষেধ। মুসলমানটি ত অবাক। মিনিটের মধ্যে আধখানা কথা বলতেই হয়ে গেল! তিনি ত বাড়ী এসে প্রতিজ্ঞা করলেন তাঁর আফিসে হিন্দুর উপর এর দাদ নেবেন। তিনি হয়ত তাঁর আফিসে হিন্দুর উপর দাদা নিলেন। যাদের উপর দাদ নিলেন তারাও যে তাদের কায়দা মত মুসলমানের উপর দাদ না নিল তার বিরুদ্ধে কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি? মাস্টারবাবুটি মুসলমান হলেও হিন্দুর প্রতি এরূপ ব্যবহার করতেন এবং যাবতীয় কাণ্ড ঘটত। এরূপভাবে সাম্প্রদায়িক বিরোধের মেঘ ক্রমশঃ ঘনীভূত হয়ে হঠাৎ একদিন এক পশলা হয়ে যায়। তা যে–কোন সময়ে যে–কোন আকারে দেখা দিতে পারে। ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকলে কর্ষণের দেরী হয় না। এরূপে এই দুর্ভাগা দেশে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধ এমন প্রবল মহামারী রূপে দেখা দিয়েছ যে, তা নিবারণ করতে পরাক্রান্ত স্বাস্থ্যনীতিবিদেরাও হার মেনেছেন।

এর মাঝে সবচেয়ে বেশী বেকায়দায় পড়েছেন জাতীয়তাবাদী এবং উদার ধর্ম্মনৈতিকরা। কেননা তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় না দিলেও তার হলাহল থেকে মোটেই রেহাই পাচ্ছেন না। বিনা দোষে অনেক সময়েই উভয় সম্প্রদায়ের নিকট নির্য্যাতিত হচ্ছেন। ভিন্ন জাতীয়রা ভাবছে ওরা বিজাতীয়, স্বজাতীয়েরা ভাবছে ওরা বিপক্ষ–ঘেঁষা। স্বজাতীয়ের বিদ্বেষের বিষদন্তের তীব্র দংশনে জর্জ্জরিত হয়ে হয়ত তাঁদের কারও বিজাতি–আক্রোশ ফেনিয়ে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ন্যায় বিচারের কষ্টি পাথরে যাচাই করলে দেখা যাবে এই যে নির্দ্দোষ লোক নির্য্যাতন ভোগ করে। তা কোন বিশেষ চিন্তার ফল নয়, পরন্তু তা ভুলের ভিত্তির

www.pathagar.com

উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাঁদের উচিত ভুল ভাঙানোর সাহায্য করা, ভুলের প্রতি মিথ্যা আক্রোশ পোষণ করা নয়।

এখন এই যে ভুলের রাজত্ব, তা ভাঙার উপায় কি? উপায় বড় সহজ নয়। আগেই বলেছি, অবিশ্বাসে ওর শ্রীবৃদ্ধি। সুতরাং অবিশ্বাসের টুঁটি চেপে ধরতে হবে। অবিশ্বাসকে বিশ্বাস দ্বারা জয় করতে হবে, বিদ্বেষকে ভালবাসার দ্বারা জয় করতে হবে, এবং উল্টা নিয়মে বিশ্বাস বিশ্বাস আনয়ন করবে, ভালবাসা ভালবাসায় পুঞ্জীভূত হতে থাকবে এবং প্রতিষেধক ঔষধের ন্যায় রোগ-বীজকে পদে পদে আক্রমণ করে বিতাড়িত করবে, এবং তখনই আমরা মহাত্মা গান্ধীর কথার তাৎপর্য্য বুঝতে পারব যে—It is not a question of loaves and fishes but a question of love and faith. কিন্তু এই বিশ্বাস এবং ভালবাসা আনয়ন কি এতই সহজ? এ কি শিকারীর পোষা পাখী যে ইশারা মাত্রই এসে হাজির হবে? এত যুগের বিদ্বেষবহ্নি এক যুগের ফুৎকারে নিভে যাবে? প্রথম সমস্যা দাঁড়ায়, বিশ্বাস এবং ভালবাসা কোন্ পক্ষ থেকে প্রথম আরম্ভ হবে? তা উভয় পক্ষ থেকে যুগপৎ আরম্ভ হওয়া কার্য্যক্ষেত্রে তত সহজ বলে মনে হয় না। সবল পক্ষ হতে প্রথম এর পত্তন সহজ এবং যুক্তিসংগত বলে মনে হয়।* যেমন বৃটিশ ভারতের অবিশ্বাসে সবল বৃটিশ পক্ষ থেকে প্রথম বিশ্বাসের হস্তপ্রসারণ যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয়েছিল।

এতেই যে বিরোধের শান্তি হয়ে যাবে তেমন মনে হয় না। কিন্তু এতেই যে পথ সুগম হবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্থায়ী শান্তির জন্য চাই ভিন্ন পন্থা। তা হচ্ছে আমাদের আদর্শ সম্পূর্ণ নতুন করে গড়া। প্রথমত এমন একটি আদর্শ স্থির করা দরকার, যাতে সার্ব্বভৌম বিশ্ব-কল্যাণ নিহিত থাকবে। যার অমিয়মোহন সৌন্দর্য্য মনকেই শুধু ব্যাকুল করবে না, পরন্তু আমাদের মধ্যে এমন একটা কর্ম্মক্ষমতা এবং আগে-চলার শক্তি এনে দেবে যে আমাদের জিজ্ঞেস করবার অবসরই থাকবে না আমরা কে বা কোন্ জাতি। শুধু লক্ষ্য থাকবে সম্মুখ, আর অগ্রগতি।

এখানে মনে হওয়া অসম্ভব নয় যে, আমি একটা কাল্পনিক রাজ্যে বিচরণ করছি। কিন্তু তা মোটেই নয়। নূতন আলোকে উদ্ভাসিত, নূতন প্রেরণায় অনুপ্রাণিত কয়টি দেশের আন্দোলনের দিকে তাকালেই আমার ইঙ্গিতের তাৎপর্য্য বোঝা যাবে। এ বিষয়ে আমরা গান্ধিজীর নিকট হতে হতাশ হয়ে ফিরেছি। তাঁর কঠোর বৈরাগ্য এবং সেকেলে ফিলজফি যৌবন রাজ্যের মধুবনে শিশির ভেজা শীত ঋতুর মত পিলেচমকান ভাব আনয়ন করে। অবশ্য এও স্বীকার্য্য যে, তাঁর অমানুষী শক্তি যখন কর্ম্মপ্রেরণার দিকে ধাবিত হয়, তখন আবার আমরা কথিত আদর্শের গন্ধ পাই। দুর্য্যোগের যাত্রীরা যেমন হঠাৎ পথে চলার জন্য বিনা বাক্য ব্যয়ে একজন পথ-নির্দ্দেশকের অনুসরণ করে, কলহমান ছেলের দল যেমন হঠাৎ পথে চলা একদল

---

* কিন্তু কোন্ পক্ষ 'সবল'? সংখ্যাগুরুত্ব বা পদ-মর্য্যাদা ত এ ক্ষেত্রে সবলতার পরিচায়ক নয়। যাঁরা প্রেমের অনুভূতিতে ও কর্তব্য-জ্ঞানে ভাগ্যবান তাঁরাই সত্যকার সবল-পক্ষ, দেশের কল্যাণ-সাধনের ভার তাঁদের উপর ন্যস্ত।

— শি: স:

www.pathagar.com

বাদ্যকারকের, কিম্বা সুসজ্জিত মিছিলের আবির্ভাবে কলহ ভুলে তার অনুধাবন করে, সেই আদর্শও আমাদের তেমনি ভাবে আকর্ষণ করবে। আমাদের দেশেও যে তেমন একটা আন্দোলন শুরু হয়নি তা বলা যায় না। এই যে যুব আন্দোলন তা যে আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছাতে পারবে তাতে আমার দস্তুরমত ভরসা আছে। কিন্তু এর ভিতর কতকগুলি গলদ রয়ে গেছে।

আমাদের দেশের যুব-আন্দোলনটি এত বেশী পরিমাণে রাজনৈতিক চর্চ্চা নিয়ে মশগুল যে, অন্যদিকে দৃষ্টি দেবার যেন তার অবসরই নাই। সেটি আবার প্রাণের অদম্য পিপাসা থেকে উৎসারিত হচ্ছে কি না, সে সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করবার অবসর আছে। অবশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ না দেওয়ার পক্ষপাতী আমি অন্ততঃ নই। তবে কথা হল এই, রাজনৈতিক আন্দোলন না হলে এবং দলবদ্ধভাবে হুজুগ প্রকাশ না পেলে যেন তাঁদের কার্য্য প্রেরণা জাগে না। এই জন্যই সন্দেহ আসে। প্রমাণ, সুদীর্ঘ বন্ধে গ্রামে তাঁদের অধিকাংশের নির্জ্জীব জীবন যাপন। এ যৌবন-ধর্ম্মের এবং আমাদের কথিত আদর্শের বিপরীত।

যৌবনের এই যে বিশ্ব-প্রাণের খেলা এর মাঝে সাম্প্রদায়িকতা ঘেঁষতেই পারে না, যদি তা প্রকৃত উৎস থেকে প্রবাহিত হয়। এখানে শুধু একদিকে নয় বিভিন্ন দিকে নিজের প্রতিভাকে ধাবিত করতে হবে। তখন লাঠি নিয়ে স্বসম্প্রদায়ের স্বার্থ বা আত্মরক্ষার জন্য ছুটতে হবে না। কিম্বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে বিষাক্ত হয়ে অবিশ্বাসকে আঁকড়ে থাকতে হবে না ; কেননা, যৌবনের কোন জাতি ধর্ম্ম নেই, সে জানে শুধু বিশ্ব-কল্যাণ, সে জানে শুধু পরহিতৈষণা। সে অন্ধের পথ-প্রদর্শক, ব্যথিতের সান্ত্বনা, নিপীড়িতের আশ্রয়, অবিচারের শত্রু, অত্যাচারের যম।

ঢাকার এই সাহিত্য-সমাজ সেই আদর্শের খোঁজে আছে। অবশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনে তার সামর্থ যথোচিত প্রয়োগ না হওয়ার পথ রোধক কারণ আছে। কিন্তু হিন্দুরা যদি তার সঙ্গে যোগদান করে এরূপ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করতেন, কিম্বা বরাবর সাহায্য করতেন, তবে তার আয়তন বৃদ্ধি হত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁরা প্রাচীন পঙ্ক হতে মুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানে সর্ব্বস্বপণ করা এরূপ আদর্শের প্রতিষ্ঠায় উদগ্রীব নন। এক কথায় কতকগুলি সাম্প্রদায়িক লোকের গোঁড়ামীর জন্য তাঁরা প্রাণ খুলে অবিশ্বাস দূর করে মুসলমান তরুণদের সঙ্গে মিশতে পারছেন না।

আমাদের এই মিলন-মেলায় আর একটি প্রকৃতিগত অন্তরায় আছে। সেটি উজ্জ্বল অতীতের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি। সেটি প্রবল অন্তরায় বলে মনে হয়। অবশ্য অতীত যদি আমাদের বর্ত্তমানের এবং ভবিষ্যতের সাহায্য করতে পারে তবে তা অন্তরায় না হয়ে অনুকূলই হবার কথা। তবেই আমরা ভলটেয়ারের কথায় বলতে পারি—It things had been allowed to stand hitherto, because they were approved by the past, they were to be permitted hence forth only because they were serviceable and necessary to the present. এই অতীতের মোহের জন্য আজকাল বিভিন্ন প্রকার কালচার, ট্রাডিশন, এবং সাম্প্রদায়িক দর্শনের কিম্ভূতকিমাকার বচন আওড়াতে এবং পুরাতনকে সেই অজুহাতে আঁকড়ে ধরে থাকতে দেখি। কিইবা সে গৌরবময় অতীত যাকে ইউরোপীয়দের এক

www.pathagar.com

পদাঘাতে যঃ পলায়তি সঃ জীবতি বলে দৌড়াতে হল, এবং অতীতের সেই পূতিগন্ধময় নর্দ্দমায় পড়ে গড়াগড়ি দিতে হবে ! যখন দেখি মনীষী ব্যক্তিরাও এই অতীতের মোহ দেখিয়ে জাতির যৌবন–অভিসারকে প্রতিহত করে রাখছেন এবং তরুণ দলেরও কয়জন তারই পোঁ ধরতে শুরু করেছেন, তখনই মনে হয় দিন এখনও অনাগত। এ জন্যই আমাদের মিলন ধ্বসে পড়বার উপক্রম হয়। আবার আর এক দল আছেন জগতের দরবারে আপনাদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবার জন্য পুরাতনের চালের সঙ্গে নূতনের চাল মিশ্রিত করে একটা অদ্ভুত রকমের ভারতীয় খিচুড়ী পাকাবার ফিকিরে। বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ হতে আরম্ভ করে ইস্তক রবীন্দ্রনাথ সে–খিচুড়ী পাকানেওয়ালা। এ বর্ত্তমান ভারত গঠনের জন্য একেবারেই বদহজম। এই সকল অতি–পুরাতন এবং সদ্য পুরাতন ভাবকে নবযুগের খরস্রোতে বিসর্জ্জন দিয়ে সেই জলে পূত–স্নাত হয়ে আমরা যদি উভয় সম্প্রদায়ের দুই হস্তে দেশ–মাতৃকার রত্ন–সিংহাসন ধারণ করে চলার পথে অগ্রসর হই তবেই আমাদের ভার লঘুতর হবে, চলার পথ সরল এবং সুগম হবে।

www.pathagar.com

পাটের কথা

আবদুল ওহাব এম. এ.

পাট বাংলার এক অতুল সম্পত্তি। বাংলার মাটি, বাংলার আলো, বাংলার জলবায়ুকে পাট এমন নিবিড় করে ভালোবাসে যে মনে হয় যেন পাট তার বহুদিনের হারানো প্রিয়াকে খুঁজে পেয়েছে এই বাংলার মাটির বুকে ; তাকে ছেড়ে যেন পাটের আর কোথাও থাকা চলে না।

কোন সুদূর অতীতে যে পাট এই বাংলার মাটির বুকে তার প্রিয়ার খোঁজ পেয়েছে, সে কথা সঠিক বলা চলে না। আইনী-ই-আকবরীতে পাটের কাপড়ের বর্ণনা পাওয়া যায় বটে, সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার হতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যখন আসে এদেশে, তখন রাশিয়ার 'হেম্প'কে সিংহাসনচ্যুত করবার মানসে পাটের আবাদ আরম্ভ হয় এই বাংলার বুকে। হাজার রকমের চেষ্টা চললো, 'হেম্প'কে বনবাস দিয়ে পাটকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবার আশায়। আশা প্রথমে ফলবতী হয় নি। কিন্তু মানুষের চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই। যুগের পর যুগ ধরে চেষ্টার পর চেষ্টা চললো। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুদূর ইংল্যন্ডে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভল্যুশন আরম্ভ হয়। দেশ বিদেশে পণ্যদ্রব্য আমদানী-রপ্তানীর জন্য লক্ষ লক্ষ থলের প্রয়োজন হল। তারই কল্যাণে বাংলার পল্লীর মাঠে মাঠে পাটের আবদ চললো, অতল সাগরের চঞ্চল ঢেউয়ের বুকে দোলা খেয়ে সে পাট শত শত জাহাজ বোঝাই হয়ে চলল সুদূর ইংল্যান্ডে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, ১৮২০ খৃষ্টাব্দে দৈত্যের মত বিরাট যন্ত্রের সাহায্যে পাটকে সাফল্যমণ্ডিত করবার চেষ্টা চললো। সে চেষ্টা তখনও ফলবতী হয়নি। বাংলার গৃহে গৃহে তখন লক্ষ লক্ষ দড়ি ছালা ও চট তৈরি হতে লাগল হাজার হাজার নর নারীর বিপুল চেষ্টায়। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সমুদ্রসৈকতে ডাণ্ডির কোলে কলের সাহায্যে প্রথম বিরাটভাবে পাটের সফলতা অর্জ্জিত হয়। রাশিয়ার হেম্পর টলটলায়মান সিংহাসন এতদিনে পূর্ণভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়।

১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ডাণ্ডিতে প্রথম পাট বুনান আরম্ভ হয়। বাংলা মায়ের রক্ত মাংস দিয়ে তৈরী যদিও পাট, তথাপি ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাংলায় কোন স্পিনিং মেশিনও স্থাপিত হয় নি। সেই বৎসরেই প্রথম শ্রীরামপুরের সন্নিকটে স্পিনিং মেশিন স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বরানগরে প্রথম পাওয়ার লুম ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হয়। আজ কলিকাতার অনতিদূরে হুগলীর দুই তীরে প্রায় নব্বুইটি বিরাট পাটের কল স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে মাত্র চারটি কলই ভারতীয় মূলধনে ভারতীয় পরিচালকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। বাকীগুলো বিদেশীর দ্বারা চালিত হচ্ছে। ভারতীয় কলগুলির কোন কোনটি আবার বিদেশী বেতনভোগী ম্যানেজারের দ্বারা চালিত হচ্ছে। কোটি কোটি বাঙালীর পক্ষে এটা নিশ্চয়ই গৌরবের কথা

www.pathagar.com

নয়। কিন্তু বিখ্যাত রবীন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্রের পাশে জমসেদজী টাটার প্রয়োজন আজ কত বেশী?

বাংলার কলগুলো যে-সব জিনিষ তৈরী করছে ডাণ্ডির কলগুলো তার চেয়ে ভালো জিনিষ তৈরী করছে। উৎকৃষ্টতর যন্ত্র ব্যবহার করছে বলে যে এই ব্যবধান ঘটছে সে কথা বলা চলে না, কেননা উৎকৃষ্টতর যন্ত্র বাংলায়ও সহজে আমদানী করা যেতে পারে। বিলাতের শ্রমিকেরা ভারতীয় শ্রমিকদের চেয়ে অধিক দক্ষ, এবং সেই কারণেই ভারতীয় শ্রমিকেরা বেতন পেয়ে থাকে অনেক কম। এত কম বেতন তারা পায় যে তাতে স্বচ্ছলভাবে জীবন যাপন করা দূরের কথা, পেট পুরে দুবেলা ভাতও খেতে পারে না। অর্দ্ধভুক্ত, কঙ্কালসার বাংলার শ্রমিকদের পানে তাকিয়ে কার না মনে ব্যথা বাজে? এই হতভাগ্যদের উন্নত করবার কি কোন প্রকার উপায় নেই? মৃতপ্রায় জীবন বহন করবার জন্যই কি বিধাতাপুরুষ এদেরে সৃষ্টি করেছেন? কম কার্য্যক্ষম বলেই কি এদের এই শোচনীয় জীবন বহন করতে হচ্ছে? — না, অল্প বেতন পায় বলেই এরা জীবনটাকে একটুখানি উন্নত করতে পারছে না? এ সমস্যা জটিল হলেও মীমাংসার বহির্ভূত নয়। আলো যেখানে নেই সেখানে অজ্ঞানতা অন্ধকার না থাকাই হবে অস্বাভাবিক এবং সে-কারণেই সেখানে সৃষ্ট হবে জরা ব্যাধি, রোগ শোক, দুঃখের অনলে দগ্ধ হয়ে জীবন হবে তাদের কাছে দুর্ব্বিসহ, প্রাণের প্রতি মমতা হবে অতি অল্প। জীবনের প্রতি তখন অন্যায় আচরণ করতে বিন্দুমাত্র বাধবে না, হাসতে হাসতে তারা একে অন্যের মাথা ভাঙবে, তারপর দিনান্তে পর্ণকুটিরে বা মৃত্তিকাগহ্বরসম বাসস্থানে আশ্রয় নিয়ে দুর্ব্বিসহ জীবনের বেদনার ভারে নুয়ে পড়বে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবার আশায়। স্ত্রী-পুত্র পরিবারের প্রতি এদের মমতা হবে কম। সন্তানের পর সন্তান সৃষ্টি করবে চিন্তাহীন ভাবে, — ভাববে না কি করে এদের মানুষ করবে, ভাববে না কি করে এদের মুখে দুমুঠো অন্ন দেবে। এমনি করে কাটে যাদের জীবন, তাদের বেশী কার্য্যক্ষম দেখবার আশা করা সুদূর পরাহত।

কিন্তু এই শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী শুধু এই হতভাগ্যরাই নয়, তার জন্য দায়ী সমাজও যথেষ্ট পরিমাণে। সুদূর ইংল্যান্ডে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রমিকদের এই দুরাবস্থা ছিল। কিন্তু ভাগ্য-দেবতার ঘাড়ে সমস্ত দোষ না চাপিয়ে সে দেশের সমাজ ও সরকার এদের উন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা যত্ন করেছিলেন। তাঁদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। আজ বাংলাদেশে সে চেষ্টার কত প্রয়োজন!

আমাদের বাংলার বা ভারতের শ্রমিকদের শিক্ষা দীক্ষা দিলে যে এরা পৃথিবীর অন্যান্য কোন দেশের শ্রমিকদের চেয়ে কম কার্য্যক্ষম হবে তার কোন মানে নেই। চাই ঐকান্তিক সাধনা, চাই শিক্ষা, চাই ব্যথিতদের জন্য প্রাণের দরদ।

পাট কলগুলিতে যত শ্রমিক আছে তার অধিকাংশই বাঙালী নয়—বাংলার বাইরে থেকে আমদানী। বিহার ও উড়িষ্যা থেকেই আসে প্রায় সব শ্রমিক। মাদ্রাজ ও যুক্ত প্রদেশ থেকে কিয়ৎ পরিমাণ শ্রমিক আসে। মোটের উপর বর্ত্তমানে শতকরা নব্বুই জন শ্রমিক আসে বাংলার বাইরে থেকে। নিজ নিজ প্রদেশে এদের জীবিকা উপার্জ্জনের উপায় খুব কম। তাই তারা আসে পেটের তাড়নায় অল্প বেতনে কাজ করতে পাট কলগুলিতে। এইভাবে

www.pathagar.com

শ্রমিকদলকে আসতে দেওয়া বাঙালীর পক্ষে সুবিধাজনক হচ্ছে না সত্যি, কিন্তু এদের অবাধ আমদানীকে বন্ধ করাও কতখানি সম্ভবপর হবে সে সম্বন্ধে অনেক বিবেচনা করবার আছে। এদের অবাধ আগমন বন্ধ করলে বাঙালী শ্রমিকদের সুবিধা হবে সত্যি, কিন্তু তাতে বাংলা ও বাংলার বাইরের প্রদেশগুলিতে রেষারেষি বেড়ে যাবে। জাতীয়তা গঠনের দিক থেকে এটা বিশেষ মারাত্মক হবে।

শ্রমিকদের উন্নত করতে হলে, ভবিষ্যতের জন্য একটা বিরাট কার্য্যক্ষম জাতি গড়ে তুলতে হলে, শ্রমিকদের দেওয়া চাই শিক্ষা, তাদের বাসস্থানগুলো করতে হবে আরো স্বাস্থ্যকর, বেতন করতে হবে বৃদ্ধি, তার সাথে সাথে তাদের প্রাণে জাগিয়ে দিতে হবে সুন্দর একটি জীবন যাপনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এ যতদিন সম্ভব না হবে, ততদিন সম্ভব হবে না ইংল্যান্ডের মত সুস্থ বলিষ্ঠ ও অধিক-কার্য্যক্ষম একটি শ্রমিক দল গঠন করা। জাতি তাতে পড়ে থাকবে সভ্য জগতের অনেক পেছনে—বর্ব্বরতার গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে।

এদের পাশাপাশি এদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক গুণ বেশী বাংলার কৃষকদের কথাও আলোচনা করা দরকার। শতকরা নব্বুই জন এদেশে কৃষিজীবী। এদের মধ্যে পাটও করে অধিকাংশ লোকই। পাটের ব্যবসায়ের উপর এদের জীবনের অনেকখানি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। শুধু এদের নয়, গোটা বাঙালী জাতির আর্থিক উন্নতি এর উপর নির্ভর করে। সরকারের আর্থিক অবস্থাও নির্ভর করে এই পাট ব্যবসায়ের উপর। কোটি কোটি বাঙালীর পাটই যেন খাদ্যদ্রব্য। এমন কোন কোন জায়গা আছে, সেখানে পাট ছাড়া ধান ভাল জন্মে না। আর কোথাও কোথাও ধান জন্মালেও তাকে বর্ষার বাধাবন্ধনহীন উচ্ছৃঙ্খল প্লাবনের অত্যাচার হতে বাঁচিয়ে রাখা দায় হয়। কোথাও কোথাও পাট না করে অবশ্য ধান করা যায়, কিন্তু নিরক্ষর, অশিক্ষিত, কৃষক অতি লাভের আশায় ধান না করে পাট বপন করে নিজের সর্ব্বনাশ নিজে টেনে আনে। এজন্য বোকা কৃষকদের দোষ দেওয়া যায় বটে, কিন্তু এ দোষ না করাটাও যে তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক তাও ভাববার বিষয় বটে! কে না চায় বেশী লাভ করতে? কে চায় নিজে লাভ না করে অন্যের লাভের অংশ বাড়িয়ে দিতে? মানুষের স্বভাবকে না বদলিয়ে এর সমাধান সম্ভবপর নয়,—যদি না সরকার এদিকে কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। এ বিষয়ে সরকারের একটা কঠোর কর্ত্তব্য আছে দেশের লোককে শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু আপাততঃ দেশে যে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে এবং পাট করতে গেলে দেশে অদূর ভবিষ্যতে যে আরো হৃদয়বিদারক দৃশ্যের আবির্ভাব হবে, সে সব দিক লক্ষ্য করে মনে হয় সরকারের প্রধান কর্ত্তব্য হয়ে পড়েছে শিগ্‌গিরই ইউনিয়ন বোর্ড, লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির সাহায্যে দেশে পাটের চাষ কমিয়ে দেওয়া। এমন ব্যবস্থা হওয়া দরকার যে, সরকারের প্রদত্ত হিসাবের বেশী পরিমাণ জমিতে পাট করতে গেলে চাষীকে জরিমানা ও শাস্তি ভোগ করতে হবে, অথবা পাটের চাষ কমিয়ে দেওয়ার জন্য 'একর' প্রতি একটা নির্দ্দিষ্ট ট্যাক্স বসালেও মন্দ হয় না। এতে অসুবিধা হবে এই যে চাষী তার জমিতে পাট ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। তার জন্য কি ব্যবস্থা করা হবে? দ্বিতীয়তঃ, প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ট্যাক্স ব্যাপারের বন্দোবস্ত করতেও খরচ পড়বে অনেক ; — হয়ত বা এটা সরকারের পক্ষে লাভজনক হবে না। তৃতীয়তঃ, কৃষকেরা এতে সন্তুষ্ট হবে না,—বিশেষতঃ ট্যাক্স তখন তাদের ঘাড়ে চাপানো যাবে। এ কথাও

www.pathagar.com

হয়ত কেউ বলতে পারেন যে অসহায় কংকালসার কৃষকের বুকের উপর লবণ কর, কাপড় কর, প্রভৃতির উপরেও আর কত বোঝা চাপাতে চাও? বাংলার কৃষক করের ভারে মাটি পর্য্যন্ত নুয়ে পড়ে আছে সত্য, কিন্তু এই কর অপর করের মত তাদের ভূতের বোঝা না হয়ে ভূত তাড়াবার মন্ত্র স্বরূপ দাঁড়াবে। চাষী যত পাট কম করবে, ততই সে বেশী লাভ করতে পারবে। মনে রাখতে হবে বাংলার পাট পৃথিবীর মধ্যে একছত্র আধিপত্য স্থাপন করতে পেরেছে। এ পাট ছাড়া পৃথিবীর থলে দড়ি চট প্রভৃতি জিনিষগুলো তৈরী সম্ভবপর হয় না। যতই পাট কম জন্মান হবে ততই বেশী দর পাওয়া যাবে। বাংলার অন্নবস্ত্রহীন রুগ্ন কৃষকের কাছে এ সব কথা অর্থপূর্ণ হবে তখন যখন সরকার চেষ্টা করে তাদের লাভের মুখ দেখিয়ে দেবেন।

পাটের চাষ কমিয়ে দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে আরো বিশদভাবে আলোচনা হওয়া দরকার। ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত পাটের চাষ কমিয়ে দেওয়ার জন্য একটি আইনের পাণ্ডুলিপি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করেছেন। আলোচনার জন্য বিলটি এখন সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। The Mussalman পত্রিকায় ১৯৩১ ইং ২রা এপ্রিল মিঃ এ. হোসেন বলছেন—'Present economic distress is not wholly due to the falling price of jute but due to the many other factors which have lowered the jute price. The restriction is therefore not the only remedy'. একমাত্র remedy নয়, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি। কিন্তু পাটের চাষের সাথে বাংলার চাষীর আর্থিক স্বচ্ছলতার কি নিবিড় সম্বন্ধ রয়েছে সে কথা ভাবতে গেলে মনে হয় পাটের চাষ কমিয়ে দেওয়া একমাত্র remedy না হলেও chief remedy নিশ্চয়ই। একথা খুব পরিষ্কার হয় তখন যখন আমরা জানতে পারি যে পাটে monopoly থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত পরিমাণে পাট করার ফলে চাষী কত কম দরে পাট বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে। এবং এত কম দরে বিক্রী করার জন্য কি দারুণ শাস্তি ভোগ করছে। নিম্নে একটা হিসাব দিচ্ছি। মিঃ এ. হোসেন বলেছেন যে, 'Time was when the Bengal peasants sold jute at /8/-annas per maund. In 1885 jute was sold at Re. 1/4/-per maund.' তখন চাষীর এ দুর্দ্দশা ছিল না, এবং এতেই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, পাটের দর কমার জন্য নয় বরং অন্যান্য কারণে চাষীর বর্ত্তমানে এ দুর্দ্দশা ঘটেছে। হোসেন সাহেবের মতে পাটের এই কমতি দর চাষীর পরোক্ষভাবে উপকারই করছে। মামলা মোকদ্দমা কমে গেছে, মহাজনেরা তেমন মুক্তহস্তে কর্জ্জ দিচ্ছেন না। এতে চাষীর মঙ্গল হচ্ছে। কথাটায় খানিকটা সত্য নিহিত নেই বলা চলে না। কিন্তু তারও সাথে বলা চলে, এতটুকু মঙ্গল আসছে : কতখানি দুঃখের ভিতর দিয়ে। তার উপর এ কথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে বোকা চাষী এত ব্যথা পেয়েও প্রাণে প্রাণে অনুভব করছে না যে, অতিরিক্ত পাট করার ফলেই তাদের এই দুর্দ্দশা। এ ঠেকার শিক্ষাও তাদের প্রাণে বেশী দিন টিকে থাকবার নয়। কেননা এ তো অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা হয়নি। অশিক্ষাই হয় এত অনর্থের মূল কারণ!

হোসেন সাহেব বলেন, 'This restriction must be left to the automatic tendency of the growers.' ঠেকার শিক্ষা হয়ত পাকা শিক্ষাই হয়, যদি এতে অন্ততঃ মনের সাড়া জাগে। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, বাংলার চাষী নিজের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি

www.pathagar.com

কতখানি অজ্ঞ ও উদাসীন। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের কথায় বলতে গেলে বলতে হয় 'of all the interests connected with jute, the cultivator is the least fitted to take care of himself and that he has been exploited by others.'* দরিদ্রপীড়িত কৃষকের অসহায়তার কথা ভেবে আমরা মিঃ হোসেনের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে পারি না—'The peasants should in general be left to themselves and should not be compelled by legislation to adopt a particular mode of utilising their soil." স্বীকার করি আইনের সাহায্যে পাটের চাষ কমিয়ে দেওয়াতে দোষ আছে। কিন্তু এ কথা স্বীকার করতে ইচ্ছা হয় না যে 'The benefits will be disproportionately out weighed by the injuries that will surely result from the administration of the provision of the Bill.'শাসন প্রণালী যদি দূষণীয় হয়ে পড়ে তবে বিপদ শুধু এ ক্ষেত্রে নয়, সমাজের প্রতি পদে পদেই বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা থাকবে।

পাটের চাষ কমিয়ে দিলে অনেক জমিতে কি উৎপন্ন করা হবে? কতক জমিতে ধান দেওয়া সম্ভব হবে। কতক জমিতে অন্যান্য ফসল জন্মাবার চেষ্টা করতে হবে। হোসেন সাহেব নিজেই বলেছেন, 'The jute growers can casually divert their jute lands to other crops and can reap the return of their labour.' তারপর তিনি বলেন, 'This specialisation in jute production has resulted in the gradual annihilation of local industries which once supplemented the income of the cultivators and other functional groups, most of whom have now become unemployed Babus'. হোসেন সাহেব আরও বলেন যে 'Only 60 or 70 years ago East Bengal especially was a great centre of cotton cultivation. ঢাকাই মসলিন আজ অতীতের জিনিষ ; স্বপ্নের কাহিনী স্বরূপ। কিন্তু চেষ্টা করলে কি আজ আবার গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গমস্থলে পূর্ব্বের ন্যায় ১৯৬০ বর্গমাইল উৎকৃষ্টতম কার্পাস উৎপন্ন করা যেতে পারে না? সাধনার অসাধ্য কি আছে? হোসেন সাহেবের সাথে একমত হয়ে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, বাংলার চাষীর উন্নতির জন্য, তাদের আর্থিক মুক্তির জন্য 'Diversity of induatries and cultivation of diverse products in our soil should be advocated and encouraged.' কিন্তু পূর্ণভাবে স্বীকার করি না যে 'the economic distress alone will teach them the proper lessons they have to learn.' দুঃখে ব্যথায় আছাড় খেয়ে খেয়ে মানুষের শিক্ষা হয় মানি ; কিন্তু কেবলমাত্র দুঃখ ব্যথাই যে মানুষকে পূর্ণ শিক্ষা দেয়, সে কথাটিই মানতে পারিনে। দুঃখের সাগরে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে খেয়ে জলমগ্ন ব্যক্তি ইচ্ছা করতে পারে বটে কোন প্রকারে বেঁচে উঠতে, কিন্তু তার মাথায় কখনো গজিয়ে উঠবে না নূতন নূতন কলা-কৌশল আবিষ্কারের কথা। সে কাজ রইবে বৈজ্ঞানিকের হাতে। বাংলার চাষী দুঃখ ব্যথায় জর্জ্জরিত হয়ে হয়ে জীবন বাঁচাবার পন্থা খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে পারে হয়তো ; কিন্তু নির্ব্বোধ অশিক্ষিত

* শ্রীযুক্ত সরকারের এ সকল কথা Bengal Chamber of Commerce-এর Conference-এ সভাপতিরূপে প্রদত্ত বক্তৃতার অংশ থেকে গৃহীত। Vide The Liberty, Nov. 14, 1930.

www.pathagar.com

চাষীর পক্ষে নূতন কোন পন্থা আবিষ্কার করা হয়তো সম্ভবপর হবে না। তাই চাই সরকারের চেষ্টা, সমাজের যত্ন, শিক্ষিতদের কঠোর সাধনা। জার্ম্মানী, রাশিয়া ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যদি সরকার জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য সকল প্রকার কাজকর্ম্মের ভার নিজের কাঁধে বহন করতে পারেন, বাংলার কোটি কোটি সহায়হীন বুভুক্ষুর প্রাণ রক্ষার জন্য সরকারের পাটের চাষ কমানোর ব্যবস্থা করতে না পারা নিতান্ত শোচনীয় ব্যাপার হবে নিশ্চয়ই।

আরও একটা উপায় আছে। সে হচ্ছে কোটি কোটি কৃষকের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যে দর দাবী করবে সকল ক্রেতাই সে দর দিতে বাধ্য হবে। কিন্তু অশিক্ষিত চাষীদের কানে এ শুধু স্বপ্নের কাহিনীর মত শোনাবে। তাই এ পন্থা কার্য্যকরী হবে না। বাংলার কৃষক নিজের রক্ত জল করে উৎপন্ন করে পাট। চৈত্রের খাঁ খাঁ রৌদ্র এদের মাথায় বর্ষণ করে অনল, বুক ও পিঠের চামড়া পুড়িয়ে দেয়, বর্ষার অশ্রান্ত বারিধারা দগ্ধ কালো চামড়াকে সতেজ করবার চেষ্টা করে ; শীতের কন্‌কনে হাওয়া তাদের প্রাণে কাঁপুনি ধরায়, পাটের পচা জল পান করে করে এদের দেহ হয় ম্যালেরিয়ার বাসস্থান। অমাবশ্যার বিরাট নৈরাশ্য এদের চোখে মুখে, সাহারার অন্তহীন তিয়াস এদের বুকে বুকে ! এমনি করে কাটে এই ভাগ্যহতদের জীবন। কিন্তু পাটের ব্যবসায় হতে কতটুকু লাভের অংশী হয় এরা ?

পাট জন্মে বাংলার শ্যামল পল্লীর বুকে। সে পাট আড়ৎদার দালাল ফড়িয়াদের হাত হয়ে হয়ে শেষে এসে পড়ে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী পাটকলগুলোতে। সেখানে অধিকাংশ পাটই চট বা থলিয়ায় পরিণত হয়। বাকী পাট ইংল্যান্ড, জার্ম্মানী, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইটালী, স্পেন প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়। অনেক সময় মিলের কর্তৃপক্ষ নিজেদের লোক নিযুক্ত করে পাট খরিদ করে। এতে শতকরা ষাট ভাগ পাট মিলের হস্তগত হয় মধ্যস্বত্ব ভোগীদের একটি পয়সাও না দিয়ে। বাকী চল্লিশ ভাগ দালাল ও আড়ৎদারদের হাত হয়ে আসে। বাংলায় বার্ষিক একশত কোটি টাকার পাটের কারবার হয়। হিসাবে দেখা গেছে মহাজন ও দালালেরা লাভ করে পঁচিশ ভাগের এক ভাগ।

পাটকলের অংশ বিক্রী হয়ে থাকে। অংশীদারেরা লাভ করে দেড় কোটি টাকার মত। লাভের কত ক্ষুদ্রতম অংশ পেয়ে যে এরা সন্তুষ্ট থাকে সে কথা সূক্ষ্ম ব্যবসায়–বুদ্ধি–সম্পন্ন ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের বুঝবার উপায় নেই। শ্রমিকদের বেতন হয় এক কোটি টাকা। আর কৃষকেরা প্রায় চৌত্রিশ কোটি টাকা। এই চৌত্রিশ কোটি টাকার হিসাব শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকার মহাশয়ের প্রদত্ত। কৃষকেরা এই হিসাব অনুযায়ী আট টাকা মণ প্রতি পেয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে এটা পাট তৈরির মূল্য সমেত। পণ্যের মূল্য বাদ দিলে মাত্র ছয় কোটি পঁচাত্তর লক্ষ টাকা এ দেশের মহাজন, শ্রমিক ও দালালদের হাতে আসে। ভাববার বিষয় বটে একশ কোটি টাকার কারবারের মধ্যে কত টাকা বাঙালী দালাল মহাজন কৃষক ও শ্রমিকদের ভাগ্যে আসে।

১৯২৬ সনে দেড় কোটি টাকা লাভ পেয়েছিলেন চট কলের অংশীদারেরা। কিন্তু মনে রাখতে হবে সে বৎসর প্রতি মণ পাট একত্রিশ টাকা দরে বিক্রয় হয়েছিল। বাংলার পাটের ব্যবসার এ কাহিনী বাঙালীর পক্ষে লজ্জাকর বটে !

www.pathagar.com

হতভাগ্য কৃষক হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে তৈরী করে পাট। বিক্রীর মৌসুমে দুটো টাকা পাওয়ার আশায় তাকিয়ে থাকে ক্রেতাদের মুখের পানে—যেমন করে তৃষিত চাতক তাকিয়ে থাকে স্নিগ্ধ জলের পানে। যেমন দরই পাক না কেন বিক্রী না করে এদের নিস্তার নেই। বস্ত্রহীনা স্ত্রীর লজ্জা নিবারণের জন্য এক টুকরা বস্ত্র চাই-ই চাই। রুগ্ন সন্তানদের মুখে দুমুঠো অন্ন না দিলে যে এদের কাঁচা প্রাণ আর বাঁচে না। মহাজন পাওনা টাকার জন্য যে রোজই দ্বারে ধন্না দেয়। জমিদার বাবুর বার পার্ব্বণের তের কিস্তির নজরানা না দিলে পেয়াদা বেটার অত্যাচারে প্রাণ যে অতিষ্ট হয়ে ওঠে। এমন কপাল নিয়ে যার জন্ম সে অভাগা কি করে অপেক্ষা করতে পারে পাটের এতটুকু দর বেশী পাওয়ার আশায়। যে জাতির মেরুদণ্ড এমনি ভারে বাঁকা, তার বাঁচবার কি কোন পন্থা নেই?

প্রতিমণ পাটে যদিও খরচ পড়ে কমপক্ষে পাঁচ/ছয় টাকা, তবুও যে কোন দরেই যে এদের পাট বিক্রী না করে নিস্তার নেই। চাই টাকা, চাই অন্ন, চাই জীবন রক্ষার উপায়, দুটো টাকা হাতে এলে এদের মুখে কিছুদিনের জন্য তেমনি হাসি ফোটে—যেমন হাসি ফোটে সদ্য-রোগমুক্ত ব্যক্তির অন্ন পথ্যের পরে। নিদাঘের রঙীন প্রভাতে যেমন ফুটে ওঠে ফুল, নির্ম্মল হাসিটুকু তার পাপড়ির ঠোটে ঠোটে ফুটিয়ে ফুটিয়ে, তেমনি ভাবে বাংলার চাষীর ঘরে ঘরে ক্ষণিকের তরে ফুটে ওঠে হাসি—তার স্ত্রী পুত্র পরিবারের মুখে। কিন্তু সে হাসি কতক্ষণের? কেমন করে এই দারুণ অভাবগ্রস্ত ভাগ্যহতদের জীবনকে সুন্দর মধুময় করে তোলা যায়?

যে পর্য্যন্ত বাংলার সরকার পাটের সমস্যার একটা সমাধান না করবেন, সে পর্য্যন্ত নাই মুক্তি এই চাষীদের,—নাই উন্নতি বাংলার সরকারের আয়ের। কুটিরবাসী বাঙালীকে নিয়ে জাতি গড়ে উঠেছে। এদের উন্নতি না হলে জাতির উন্নতি অসম্ভব। এদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হলে সরকারের আয় বৃদ্ধির আশা সদূরপরাহত। আর আয় যদি বৃদ্ধি না হয়,—শিক্ষাদান, শিল্পের উৎকর্ষ, বেকার সমস্যার সমাধান—কিছুই সম্ভব হবে না সরকারের দ্বারা। জাতি চিরদিন পড়ে থাকবে সভ্য জগতের বহু পেছনে।

একটা কথা বলা দরকার মনে করি। পৃথিবীর যে কোন জাতি যদি কোন জিনিষের একমাত্র অধিকারী হয়, এবং সেই জিনিষের প্রয়োজন যদি থাকে বিশ্বের খুব বেশী, তবে সে জাতি প্রায় যেমন ইচ্ছা তেমন দরই আদায় করতে পারে বিশ্বের কাছ থেকে। এ জিনিষের রপ্তানির উপর শুল্ক বসালে সে শুল্ক বহন করতে হয় বিদেশীকে। এতে সে দেশের সরকারের আয় হয় বৃদ্ধি, লোকের আর্থিক অবস্থা হয় স্বচ্ছল। বাংলাদেশের পাট এই লোভনীয় অবস্থার ভাগী হলেও তেমন দর আদায় করতে পারে না; শুল্কের বোঝা নিজের ঘাড়েই চাপাতে হয়। এমনি দুরবস্থা শুধু নির্ব্বোধ চাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার অভাবে। সরকারের এদিকে আশু দৃষ্টিপাত করা একান্ত আবশ্যক।

পৃথিবীব্যাপী যে আর্থিক দুরবস্থার কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়েছে, বাংলার আকাশেও তার প্রসার কম হয়নি। বরং বলা যেতে পারে, এখানে সে মেঘমালা গাঢ়তর হয়েই দেখা দিয়েছে। যে এক খণ্ড মেঘ গত বৎসর বাংলার ভাগ্যাকাশে ছিন্ন টুকরার মত ভেসে বেড়াত, আজ তা সারা

www.pathagar.com

আকাশ জুড়ে রাজত্ব ফলিয়েছে। কে জানে অচিরেই এই মেঘরাশি থেকে ভীষণ দুর্য্যোগের তাণ্ডবলীলা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পরিগ্রহ না করবে?

পাটের ভবিষ্যতের কথা আজ বিশদভাবে গ্রামে গ্রামে আলোচনা করবার বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। কথাটা পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য একটা হিসাব দিচ্ছি। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ১লা জুলাই বাংলার কলে মজুদ ছিল এক কোটি সত্তর লক্ষ মণ পাট। মোট বাংলাদেশে মজুদ ছিল দু' কোটি পনরো লক্ষ মণ। ১৯৩০ সনে জন্মান হয়েছিল পাঁচ কোটি ষাট লক্ষ মণ। সুতরাং সর্ব্বসমেত আট কোটি আশি লক্ষ মণ পাট ছিল সারা বাংলায়। এ বৎসর এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মণের বেশী রপ্তানী হয়নি। আগামী ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ জুলাই পর্য্যন্ত উদবৃত্ত থাকবে চার কোটি পঁচানব্বই লক্ষ মণ পাট। কিন্তু ১৩৩৮ সনের চাহিদা হবে বাংলার কলে দু' কোটি মণ, বিদেশে হবে দেড় কোটি মণ। সুতরাং এ বৎসর পাট না জন্মালেও উদ্‌বৃত্ত থাকবে এক কোটি মণেরও উপর। কিন্তু কলওয়ালা যদি ভবিষ্যতের জন্য বেশী করে পাট মজুদ রাখতেও চায় তবু এ বৎসর দেড় কোটি মণ পাটের বেশী জন্মান উচিত হবে না। এ হিসাব মত চলতে গেলে বাংলার চাষী মণ প্রতি মাত্র আট টাকা করে পেতে পারবে। সুতরাং মাত্র দেড় কোটি মণ পাটের বেশী করলে খরচের পাঁচ/ছয়টি টাকাও প্রতি মণে আদায় করা অসম্ভব হবে। তারপর বাংলার চাষীর কি দারুণ দুর্দ্দশা হবে সে কথা কল্পনারও অতীত। বাংলার প্রতি পল্লীতে পল্লীতে প্রতি ঘরে ঘরে এই কথাটি বলবার আজ কত প্রয়োজন। এ বাণী তাদের কানে কানে বলে দেবার জন্য কি শিক্ষিত সমাজের বিশেষ করে যুবক সম্প্রদায়ের কোনো কর্ত্তব্য নেই?

বাংলার চাষীর সত্যি সত্যিই কপাল ভেঙেছে বলে ভাবি তখন, যখন চাউল-উৎপন্নকারী বর্ম্মীই চাষীদের মন্দ ভাগ্যের কথা স্মরণ করি। জাপান, চীন, শ্যাম প্রভৃতি যে সব দেশ আগে ভারত থেকে চাউল যে পরিমাণে আমদানী করত সেই পরিমাণেই আজ তারা নিজেরা চাউল জন্মাচ্ছে। সুতরাং বাইরে রপ্তানি যদি এমনি করে চিরদিনের তরে বন্ধ হয়ে যায় তবে বাংলা ও বর্ম্মী চাষীদের কপালে কি দারুণ দুঃখ ভোগ আছে, সে কথা ভাবতেও দেহ-মন ব্যথায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে।

তাই বাংলা-সরকারের কর্ত্তব্য অতি কঠিন। কিন্তু বাংলা-সরকারের মন্দ ভাগ্যের কথাও না বলে থাকা যায় না। পাটের ব্যবসা থেকে যে তিন/চার কোটি টাকা আয় হয়, তা পেয়ে থাকেন ভারত সরকার। কিন্তু ভারত সরকার বাংলার চাষীদের এই দারুণ দুর্দ্দিনে একটি পয়সা দিয়েও সাহায্য করেন নি। ভারত সরকারের এ আচরণ নিষ্ঠুর হলেও তাঁরও অসহায়তার কথা চিন্তার বিষয় বটে। এই সব ভেবে ভেবে মাঝে মাঝে ভয় হয় না জানি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' অচিরেই আবার বাংলার নরনারী মুখরিত শ্যামল পল্লীর বুক শ্মশানে পরিণত করে।

পৃথিবী ব্যাপী যে আর্থিক দুর্দ্দশা তার শীঘ্র উপশম হবে না,—যদি সারা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের সরকারসমূহ মিলিত চেষ্টা না করেন। বাংলাদেশের নিঃসহায় চাষীর দুরবস্থার কথা ভাবতে ভয় হয়। কিশোরগঞ্জের হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক সমস্যা সাম্প্রদায়িক হিংসা নয়। নবশক্তি (২৫ই জুলাই ১৯৩০ খৃষ্টাব্দ) পত্রের

www.pathagar.com

সম্পাদকের কথায় বলতে গেলে বলতে হয়, সমস্ত মন দিয়ে কিশোরগঞ্জের মুসলমানদের নিন্দা করতে পারি না, অনুকম্পায় চিত্ত ভরে ওঠে, মনে হয় মানুষের কৃত্রিম ব্যবস্থা এমনি করেই মানুষকে পশু করে ফেলে। প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক বিরোধের চেয়ে অর্থনৈতিক বিরোধের গুরুত্ব অনেক বেশী। সম্প্রদায়িক বিরোধের অবসান হয় অনিষ্টকারী কতগুলো লোককে জব্দ করতে পারলে। কিন্তু অর্থনৈতিক বিরোধ সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন দাবী করে। অল্প কয়েকটি মানুষের কৃত্রিম কতকগুলি ব্যবস্থা বহুকে পঙ্গু করে রেখেছে, অসহায় করে রেখেছে। বহুর দৃষ্টি যখন সে দিকে যাবে তখন স্বল্প অল্পে রেহাই পাবে না। অর্থনৈতিক বিরোধের মাঝে তাই থাকে একটা প্রলয়ের আভাস।' তাই চাই সমাজ ও জাতির মঙ্গলের জন্য এই অন্নহীন, বস্ত্রহীন চাষীদের চরম দুর্দ্দশার কবল থেকে মুক্তি দান। মুক্তির প্রথম চেষ্টাই হবে ভাগ্যহতদের হাতে দুটি টাকা প্রদান করা। এ সম্ভব শুধু সরকার যদি তাদেরে কিছু দিনের জন্য টাকা কর্জ্জ দেন। কিন্তু সে দিন Bengal Chamber of Commerce-এর conference-এ যখন মিঃ এ, মার বলেন যে, 'As regards loan he could say that neither the District Board, nor the Local or Union Board could stand as security for distributing loans by the Govt. As regards the Zaminders he could give specific instance which showed that even big Zaminders were not willing to stand securities for loans to be advanced by the Govt. to their tenants.' তখন মনে হয় বাংলার কৃষক সম্প্রদায় সমাজের কোন স্তরে অবস্থিত। এদের দিকে একটুখানি স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপ করবর জন্য সারা বাংলা জুড়ে আজ একজনও নেই। এমনি লাঞ্ছিত বাংলার চাষী সম্প্রদায়। এইত গেল বাংলা সরকারের জবাব। ভারত সরকারের উত্তর তারো চেয়ে ব্যথাদায়ক। ভারত সরকারের Offg. Finance Member, the Hon Mr. Tukes বলেন, 'In matters concerning jute the central govt. has no loans stands.' তারই উত্তরে শ্রীযুক্ত নলিনী সরকার মহাশয় উক্ত কনফারেন্সের সভাপতিরূপে বলেন, 'I shall also say that by professing indifference to a trade from which they derive an annual income of Rs. 3 to 4 crores, the Govt. of India give us an impression of cynical callousness which, to put it mildly, is unfortunate.' নলিনী বাবু বলেন যে, 'It is true that the Provincial Govt. must do the actual work, but they will have to go to the Central Govt. for the necessary financial resources.' ভারত সরকারের আর্থিক দুরবস্থা সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞাত নন ; তাই তিনি বলেন, 'My contention is that the Govt. of India might obtain the necessary finance by issuing emergency currency. এতে অতিরিক্ত টাকার চলতি হবার ভয় আছে বটে, কিন্তু এ কথা সত্যি যে এক বৎসরের মধ্যে এই অতিরিক্ত টাকা উঠিয়ে নিলেই দেশে কোন প্রকার অকল্যাণ হবে না। শ্রীযুক্ত সরকার বলেন যে এমনি ভাবে আকস্মিক টাকা প্রচলনের প্রথা নূতন নয়। তিনি বলেন 'The Brazilian Govt. did issue similar additional paper currency in order to make the activities of the Sao Paulo coffee Institute successful.' তাই তিনি জোর গলায় বলেন যে, 'I am of opinion that the Govt. should not at all hesitate to issue

www.pathagar.com

this emergency currency in order to help the poor cultivator just as, under the old Scottish credit system, the banks manufactured and issued the instruments of credit to the oxtent which the borrower could be trusted to repay. The extraordinary situation demands extraordinary measures for the solution of the problems arising out of it.'

বাংলার চাষী অন্নহীন, বস্ত্রহীন এই জন্য নয় যে বাংলায় অন্ন বস্ত্র মিলে না। বর্ত্তমানে বরং অন্ন–বস্ত্রের প্রাচুর্য্যই দেখা যায়। যে পদার্থটির অভাবে সমুদয় কাজ কারবার বন্ধ, চাষীর দুর্দ্দশার একশেষ, সে জিনিষটি হল টাকা। কোটি কোটি চাষীর ঘরে আজ টাকা নাই। আমরাও নলিনী বাবুর সাথে এক হয়ে সরকার বাহাদুরকে মিনতি জানাই, কোটি কোটি মানবের দুঃখ ব্যথার অবসানের জন্য আকস্মিক টাকার প্রচলন করা হউক।

শ্রীযুত সরকার মহাশয় আরও একটি প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন ১৯২৯ সনের American Marketing act-এর মত বাংলায়ও একটি Central Jute Committee করা হউক। এতে চাষী, শ্রমিক, মধ্যস্বত্ব ব্যক্তি, এবং কলের স্বত্বাধিকারিগণ সকলেরই সমান অধিকার থাকবে। এই সমিতি স্থির করবে বৎসরে কত পাট জন্মাতে হবে। কোথায় বিক্রী দেওয়া যাবে ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার। এইরূপ কমিটির যে প্রয়োজন খুব বেশী সে সম্বন্ধে বোধ হয় কারও দ্বিমত নেই।

আমাদের আর একটি বক্তব্য, দেশের এই দারুণ দুর্দ্দশার উপশম করবার জন্য সরকার অধিক বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের বেতন হতে ক্রমবর্দ্ধনশীল হারে কিছু টাকা কেটে রেখে সে টাকা দিয়ে চাষীদের নকট থেকে সমস্ত পাট কিনে নিন। এ পন্থাও সভ্য জগতে অভিনব নয়। এতে বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের উপরও কোন প্রকার অন্যায় অত্যাচার করা হবে না ; কেননা প্রায় প্রত্যেক জিনিষেরই দর অত্যন্ত কমে গেছে। ভারতে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা যত বেতন পান পৃথিবীর অন্য কোথাও কোন কর্ম্মচারীরা এত বেতন পান না। তাই অন্ততঃ পক্ষে দেশের যারা প্রাণ, যারা দেশের জন্য সমস্ত খাদ্যসামগ্রী জোগায়, তাদের এই ঘোর দুর্দ্দিনে বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের পক্ষে এটা নিতান্ত শোভন হবে যে, তাঁরাও তাদের সাহায্যের জন্য কিছুদিনের জন্য ক্ষতি স্বীকার করেন। কোটি কোটি মানবের মঙ্গলের জন্য এ ত্যাগের আজ কত প্রয়োজন !

রক্ষণশীল চাষীর দল সহজে কোন নূতন জিনিষ গ্রহণ করতে চায় না। আজ হাতে কলমে শেখাতে হবে, উন্নত প্রণালীতে কৃষিকর্ম্ম তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে। উৎকৃষ্টতর যন্ত্র দ্বারা কৃষিকার্য্য সম্পাদন করতে গেলে এদের ধন দৌলত বেড়ে যাবে অনেক গুণে অতি শীঘ্রই। এরা তখন সমৃদ্ধিসম্পন্ন জীবন যাপন করতে পারবে। তারাও তখন ধীরে ধীরে উন্নতির দিকে চালিত হবে। বিশ্বের সভ্যতার ভাণ্ডারে এদের দানেরও প্রয়োজন আছে।

সর্ব্বশেষে একটা ভয়াবহ কথা বলতে চাই। বাংলার পাট পৃথিবীতে এতদিন একচ্ছত্র সম্রাট ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু ১৯২৭ ইংরেজি সনের কৃষি কমিশনের অভিমতে মনে হয় 'বাংলার পাট–ব্যবসায়ের একচ্ছত্র সম্রাটের আসনের টলটলায়মান অবস্থা।'

www.pathagar.com

উক্ত কশিনের রিপোর্টের ৬৫ পারায় বলা হয়েছে—'বর্ত্তমানে পাট ভারতেরই এক চেটিয়া সম্পত্তি আছে, কিন্তু ভবিষ্যতেও যে তেমনি থাকবে এমন কোন স্থিরতা নেই ; কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন অভিনব কোন পণ্য দ্বারা স্থানচ্যুত হতে পারে, এমন আশংকাও আছে ; উক্ত পণ্যের মূল্য পাটের মূল্য অপেক্ষা কম হলে তাইই যে বাজারে প্রচলিত হবে এ কথা বলাই বাহুল্য। এ সম্পর্কে ভারতের নীল চাষের উচ্ছেদের ইতিহাস উক্তরূপ সম্ভাবনার পক্ষে জ্বলন্ত প্রমাণ।' অন্য প্রকার তন্তুময় ফসল যদি অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে উৎপন্ন করা সম্ভব হয় তবে বাংলার পাটের মূলে এমন কঠিন কুঠারাঘাত করা হবে যে, সে আঘাতে সারা বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়বে। সে দায় চাষীর পক্ষে সামলানো খুব শক্ত হবে। তাই যে রূপে পাটের উন্নতি করা যায়, অথবা এমন একটা আকস্মিক বিপদপাত না হয়, সে দিকে সমুদয় জাতির মনোযোগ দেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য হয়ে পড়েছে।

গত কয়েক বৎসর ধরে ভারত সরকার পাটের পরিবর্ত্তে আর কোন প্রকার জিনিষ ব্যবহৃত হতে পারে কিনা তার পরীক্ষা করছেন। ডেকান হেম্প বলে এক জাতীয় শন পাটের পরিবর্ত্তে অনেকস্থলে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু এখনও ব্যাপকভাবে এর চাষ আরম্ভ হয়নি। কে জানে অদূর ভবিষ্যতে পাটের অবস্থা কি দাঁড়ায়? পাটের যেদিন সিংহাসন ছেড়ে দিতে হবে সেদিন সারা বাংলাময় এক হাহাকার ধ্বনি কোটি কোটি চাষীর হৃদয় থেকে ধ্বনিত হয়ে উঠবে। কোটি কোটি নয়নে নেমে আসবে অশ্রান্ত বর্ষার ধারা। সেই ধ্বনি ও ধারা আকাশে বাতাস মিলে মিলে বাংলার বুকে এক বিরাট ঝটিকার সৃষ্টি করবে। সে ঝটিকায় কত লক্ষ লক্ষ বাঙালী প্রাণ আহূতি দেবে সে কে জানে?

তাই বলি, জাগো বাংলার চাষী। মৃত্যু তোমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে। বাঁচবার জন্য একবার প্রাণপণ চেষ্টা করো। বাংলার শিক্ষিত সমাজ,—যাদের রক্তমাংসরূপ অর্থ ব্যয় করে শিক্ষা লাভ করছ, সেই শিক্ষার সমস্ত শক্তি নিয়ে নেমে এসো বাংলার চাষীর ঘরে ঘরে,—তাদের কানে কানে জীবন বাঁচানোর গান গেয়ে যাও। বলে দাও 'ভাই চাষী, পাট করো না, পাটই তোমার মরণের দূত।' বাংলার জমিদার, কৃষকের ষোল কোটি টাকার বৎসর বৎসর যে অসদ্ব্যবহার করেছো, তার প্রায়শ্চিত্ত করবার সময় এসেছে। যে যে প্রকারে পার অর্থ দিয়ে, অন্ন দিয়ে চাষীর এতদিনের ঋণ শোধ কর। বাংলার চাষীকে আর শোষণ করো না। ভবিষ্যৎ তোমার অন্ধকারময় কে জানে ঘুমন্ত প্রাণ জেগে উঠলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য হবে কি না। বাংলার মহাজন, পাপের বোঝা আর বাড়িয়ো না ; হিন্দু মুসলমানের বিবাদ বলে যতই মিথ্যা ঘোষণা কর না কেন, — আর্থিক বিবাদের যে সূচনা কিশোরগঞ্জে শুরু হয়েছে কালে সেই বিবাদের তাণ্ডবলীলা সারা বাংলাকে ধ্বংস করতে হয় ত ছাড়বে না। এই উৎপীড়িতদের অন্তর-দেবতা বেদনার তীব্র কষাঘাতে জেগে উঠলে সমাজে যে বিরাট প্রলয়ের সৃষ্টি হবে সে প্রলয়ের হাত হতে সমাজ, সরকার, জমিদার, মহাজন—কারোও মুক্তি পাওয়া হয়ত সম্ভব হবে না।

www.pathagar.com

'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'
গ্রন্থাবলী

শিখা	....	১ম বর্ষ	।।০
শিখা	....	২য় বর্ষ	৸০
শিখা	....	৩য় বর্ষ	১৲
শিখা		৪র্থ বর্ষ	।।০
শিখা		৫ম বর্ষ	৸০

অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ এম. এ. প্রণীত

নব পর্য্যায় প্রথম খণ্ড	....	৸০
নব পর্য্যায় দ্বিতীয় খণ্ড		৸০

আবুল হুসেন এম. এ. বি. এল. প্রণীত

বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা-সমস্যা		।০
বাংলার বোল্‌শি	.....	।০
মুসলিম কালচার	....	।।০
The Problem of Rivers in Bengal		১৲

মডার্ন লাইব্রেরী
নবাবপুর, ঢাকা

www.pathagar.com